ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ

তৃতীয় খণ্ড

নেপাল মজুমদার
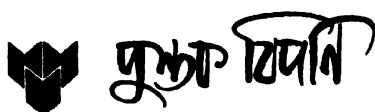
২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

লেখকের কথা

'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫—এই কালের মধ্যে ভারতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা ও গোষ্ঠীর পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিক চিন্তা-চেতনা ও ভূমিকার কালানুক্রমিক বিস্তারিত তথ্য-সম্বলিত ইতিহাস আলোচনা করা হইয়াছে। সেই সঙ্গে গান্ধীজী, পণ্ডিত মালব্য, মতিলাল নেহরু, ডাঃ আন্সারী, খান্ আবদুল গফ্ফর খাঁ, জিন্না, মহম্মদ শফি, সৌকত আলি, সপ্রু, জয়াকর, আম্বেদকর, বিঠলভাই, বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের রাজনীতিক চিন্তাধারা ও বক্তব্যের বিচার-বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

স্মরণ রাখা দরকার, ১৯৩০-৩৪ সাল বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যের দারুণ মন্দা ও অর্থনৈতিক সংকটের যুগ। শুধু অর্থনৈতিক সংকটই নয়, সারা বিশ্বে বিশেষত ইউরোপীয় রাজনীতিতে তখন এক মহা সংকট। এই সংকটকালেই ইউরোপে ফ্যাসিবাদ ও হিটলারী-নাৎসীবাদের অভ্যুদয় ঘটে। বিশেষত জাপানের মাঞ্চুরিয়া গ্রাস ও উত্তর চীন আক্রমণ এবং ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণ—এই দুই ঘটনায় বিশ্বের রাজনীতিক সংকট অত্যন্ত ঘনীভূত হয়। অন্যদিকে এই সংকটকালে রোলাঁ-বারবুস-আইনস্টাইন প্রমুখ চিন্তানায়কের নেতৃত্বে যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলন এবং বিশ্বশান্তি আন্দোলন ক্রমেই বিস্তৃত ও ব্যাপক আকার ধারণ করিতে থাকে। সূচনাকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই আন্দোলনে এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা-সংকট ও বিশ্ব ঘটনা-প্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতে ভারতের বিভিন্ন দল-গোষ্ঠী ও নেতা এবং সেই সাথে রবীন্দ্রনাথের মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়, এবং কিভাবে তাঁহারা সাড়া দেন,—এক কথায় ভারতে আন্তর্জাতিক চিন্তা-চেতনা ও আন্দোলনের ইতিহাস গ্রন্থমধ্যে বিস্তারিত-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

জাতীয় ক্ষেত্রে এই কালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, পূর্ণ স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও আইন-অমান্য আন্দোলন। মডারেট ও মুসলিম সাম্প্রদায়িক দল ও গোষ্ঠীগুলির কথা বাদ দিলে দেশের প্রায় সমস্ত দল ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীই এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। অবশ্য এই আন্দোলনের প্রধান নেতৃত্ব ছিল গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের হাতে।

কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য

যে বলিষ্ঠ সংগ্রামী নীতি-কৌশল এবং নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল, বলাবাহুল্য, কংগ্রেসের তাহা ছিল না। সত্য কথা গান্ধীজীর জীবনদর্শন ও অহিংস সত্যাগ্রহ সংগ্রামনীতি বিশ্বের উদারনীতিক ভাবুক সম্প্রদায়ের মনে যথেষ্ট শ্রদ্ধা, উৎসাহ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিলেও সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার পক্ষে—জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যের পক্ষে উহা মোটেই যথেষ্ট ছিল না। তাই বৃটিশের প্রবল নির্যাতন ও হিংস্র দমননীতির মুখে বার বার আন্দোলনের পরাজয় ঘটিতে থাকে। এই পরাজয়ের মুখে গান্ধীজী ও কংগ্রেসের প্রবীণ নেতারা বার বার বৃটিশের সঙ্গে আপস-মীমাংসার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। আর দাম্ভিক ইংরাজ শাসকগোষ্ঠী ততই তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার সঙ্গে বার বার সে-সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এবং কংগ্রেস নেতাদের গোলটেবিল বৈঠক, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, ও 'ভারত শাসন আইনের' (১৯৩৫) বিরোধিতা সত্ত্বেও পার্লামেণ্টারী বা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথ গ্রহণে তাঁহাদের বাধ্য করিয়াছে। ফলে সুবিধাবাদী প্রতিক্রিয়াশীল এবং সাম্প্রদায়িক দলগুলি প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ এবং দেশের প্রগতিশীল সংগ্রামী আবহাওয়াকে নষ্ট করিয়া কংগ্রেসকে বিপর্যস্ত করিবার সুযোগ পায়। এমন কি কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী নির্বাচন ও মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য কংগ্রেসের মধ্যে প্রবল চাপ সৃষ্টি করিতে থাকে। কিন্তু এইটিই সম্পূর্ণ চিত্র নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই যে, এই আন্দোলনের সূচনা কাল থেকেই কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র প্রমুখের নেতৃত্বে কংগ্রেসের বামপন্থী ও প্রগতিশীল সংগ্রামী শক্তির বিরোধ ক্রমেই তীব্রতর আকার ধারণ করে। তাছাড়া আন্দোলনের এই পরাজয় ও ব্যর্থতার মধ্যেই দেশে ক্রমেই বৈজ্ঞানিক রাজনীতি-চর্চার প্রসার ঘটিতে থাকে, যাহার ফলে কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্ট পার্টি সাংগঠনিক দিক থেকে প্রসার ও পুষ্টিলাভ করে।

রবীন্দ্রনাথ যদিও এই আন্দোলনের কোনো বিশেষ 'ইজ্‌ম্‌' কিংবা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হন নাই এবং যদিও গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও সত্যাগ্রহ সংগ্রাম-নীতির প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল, তা সত্ত্বেও নানা বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য ছিল ; বিশেষত গান্ধীজীর জীবনদর্শন ও অর্থনৈতিক মতবাদকে তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। রাজনীতিক দিক থেকে কবিমানসের নানা পরস্পর-বিরোধী চিন্তা ও প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও তাঁহার মন ক্রমেই প্রগতিশীল চিন্তা ও আন্দোলন এবং স্পষ্টতই সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে থাকে,—বিশেষত সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণের পর। কবির মন যে কতখানি সংস্কারমুক্ত, কতখানি প্রগতিশীল ছিল এবং রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও গঠনকার্য যে কী পরিমাণ তাঁহাকে বিচলিত ও প্রভাবিত করিয়াছিল 'রাশিয়ার চিঠি'-র প্রতিটি ছত্রে তাহার স্বাক্ষর রহিয়াছে। অবশ্য ঐ বয়সে নূতন করিয়া বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ বা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ চর্চা ও অনুশীলনের প্রশ্নই আসে না এবং সে-রকম মানসিক

প্রস্তুতিও কবির ছিল না। কবি তাঁহার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং ক্ষমতার এক্তিয়ার সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন এবং এই কারণেই সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে তাঁহার মনে যে-সব প্রশ্ন জাগে, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তিনি সেখানে তাহা উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সোভিয়েট দেশে মার্কসবাদের বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিশ্বের নির্যাতিত দেশ ও মানুষের মুক্তিসংগ্রামে রাশিয়ার বিরাট ভূমিকা সম্পর্কে তাঁহার আশা ও আস্থা ক্রমেই দৃঢ়তর হয়। পক্ষান্তরে পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে তাঁহার ঘৃণা, বীতরাগ এবং সংগ্রাম আরও তীব্র হয়।

আইন-অমান্য আন্দোলনের সূচনাতেই কবি ইউরোপ যাত্রা করেন। স্মরণ রাখা দরকার, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রচার-যন্ত্র এই আন্দোলন সম্পর্কে মিথ্যা ও বিকৃত সংবাদ পরিবেষণায় খুবই তৎপর হয়। এবার ইউরোপ-আমেরিকায় কবি ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের পক্ষে এবং এই আন্দোলন দমনে ইংরেজের নৃশংস নির্যাতন ও দলননীতির তীব্র নিন্দা ও ভর্ৎসনা করিয়া যে-সব বক্তৃতা ও বিবৃতি দেন তাহার ফলে সেখানে কম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় নাই। শুধু তাহাই নয়, দেশে ফেরার পর থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও বৃটিশের পৈশাচিক দমননীতির বিরুদ্ধে তিনি ক্ষমাহীন সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন।

অবশ্য ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ কবির—বিশেষত রবীন্দ্রনাথের মত কবির পক্ষে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিক সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার কোনো প্রশ্নই আসে না। তাছাড়া অধুনাকালে আমারা যাহাকে 'পেশাদার রাজনীতিক' বলি, তাহা তিনি কোনোদিনই ছিলেন না এবং যদিও তিনি তাঁহার বিশ্বভারতী ও নীরব গঠনমূলক কর্মসূচীতেই বেশি গুরুত্ব দিতেন, তা' সত্ত্বেও দেশের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি নানাভাবেই যুক্ত ছিলেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম যখনই ব্যাপক ও তীব্র হইয়াছে, যখন ইংরেজের প্রচণ্ড আক্রমণ ও মারের মুখে দেশের লোক বিচ্ছিন্ন ও আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া দিশাহারা হইয়াছে, যখনই তাহাদের পক্ষ থেকে ডাক আসিয়াছে, তখনই কবি সব কিছু বিস্মৃত হইয়া—তাঁহার কাব্যের কল্পলোক ও সাধনপীঠ হইতে নামিয়া আসিয়া ময়দানে বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়াইয়াছেন। আহত ও লাঞ্ছিত দেশবাসী কবিকে নিজেদের মাঝখানে পাইয়া তাহাদের হৃত মনোবল ও আত্মশক্তি ফিরিয়া পাইয়া প্রচণ্ড আনন্দ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় গর্জন করিয়া উঠিয়াছে। এমনি দেশের যে-কোনো সমস্যায় যখনই কবির ডাক পড়িয়াছে তখনই কবি তাহাতে সাড়া দিয়াছেন।

দেশের তৎকালীন এমন একটিও গুরুতর সমস্যা ছিল না, যে-বিষয়ে কবি চিন্তা না-করিয়াছেন বা কথা না-বলিয়াছেন। এই কালের মধ্যে দেশের যতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—পূর্ণ স্বাধীনতা ও আইন-অমান্য আন্দোলন, ব্রিটিশের দমননীতি, 'দিল্লী-চুক্তি', 'গোলটেবিল বৈঠক', পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে বন্যাপ্লাবন, ঢাকা ও চট্টগ্রামে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হিজলী গুলিচালনা, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, গান্ধীজীর অনশন ও 'পুণা-চুক্তি', অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও মন্দির প্রবেশ আন্দোলন, আন্দামান বন্দীদের

অনশন ও বন্দীমুক্তি আন্দোলন, 'হোয়াইট পেপার' ও 'জে. পি. সি. রিপোর্ট', টাকার মূল্যমান বিতর্ক, গান্ধীর কংগ্রেস ত্যাগ ও কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সংশোধনী প্রস্তাব, পল্লী পুনর্গঠন আন্দোলন ও 'অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘ' (A. I. V. I. A), 'ভারত শাসন আইন' (১৯৩৫)—প্রতিটি বিষয়ে ও সমস্যায় কবি গভীরভাবে বিচলিত হইয়া সাড়া দিয়াছেন। এক কথায় দেশের রাজনৈতিক সমস্যায় ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে, সমাজ সংস্কারে, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ও সাম্প্রদায়িক সমস্যায়, দেশের ছাত্র, যুব ও নারী আন্দোলনে, দেশের শিল্প-সংস্কৃতি ও শিক্ষা-সংস্কারে বাস্তব জীবনের প্রতিটি সমস্যায় কবি তাঁহার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তায় সক্রিয় প্রচেষ্টায় অগ্রসর হইয়াছেন। এই সমস্ত বিষয়ে কবির বক্তব্য ও চিন্তা এবং কর্ম-প্রচেষ্টার বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত ইতিহাস এই খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে।

গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক গ্রন্থের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। সামাজিক, শিক্ষা সাংস্কৃতিক, আর্থনীতিক এ রাজনীতিক চিন্তায় উভয়ের চিন্তার সাযুজ্য ও পার্থক্য এবং পত্রবিনিময় ইত্যাদি কালানুক্রমিক ভাবে গ্রন্থ মধ্যে সংযোজিত হইয়াছে।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া, আমেরিকা (১৯৩০), পারস্য (১৯৩২) এবং সিংহল (১৯৩৪) প্রভৃতি কবির বিদেশ ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণও এই খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে। বিশেষত এবার আমেরিকা-ভ্রমণকালে কবি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে বক্তৃতা-বিবৃতি দিতে থাকিলে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী প্রচারযন্ত্র সম্পর্কে সেখানে তাঁহার যে নিদারুণ তিক্ত অভিজ্ঞতা জন্মে, তাহার কথাও বিস্তারিত ভাবে এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

এই পর্বে 'বিশ্বভারতী'র (শ্রীনিকেতনসহ) কালানুক্রমিক ইতিহাসও সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। বলাবহুল্য, কবির কাব্য ও শিল্প চর্চার এবং তাঁহার বহুমুখী ও বিচিত্র সৃষ্টিকার্যের মধ্যেও প্রায়শঃই এই কথাটিই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, 'বিশ্বভারতী'ই তাঁহার অন্তরের প্রায় সবটুকু জায়গা জুড়িয়া অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ জীবনের শেষার্ধে 'বিশ্বভারতী'ই ছিল তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান। একটি কথা আমরা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, কবি যে দেশের অত্যন্ত দুঃসময় ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতেও সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে ডুবিয়া যাইতে পারেন নাই তাহার অন্যতম প্রধান কারণ, 'বিশ্বভারতী।' বিশ্বভারতীকে যে কবি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় করিতে চাহেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। বিশ্বভারতীর শিক্ষাবিধি ব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি ইংরেজশাসিত ভারতের শিক্ষার বিধি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চাহিয়াছিলেন সত্য কথা কিন্তু 'এহ বাহ্য'। তার চেয়েও বড় কথা ছিল, বিশ্বভারতীর সুমহান আদর্শবাদ। কবির স্থির বিশ্বাস ছিল, এই উগ্র জাত্যাভিমান-প্রিয়তা ও যুদ্ধ-সংঘর্ষভরা পৃথিবীতে বিশ্বভারতীর এক মহান বাণী—এক মহান মিশন আছে। বিশ্বমানবিকতার সাধনপীঠ এবং আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক আদান-

প্রদান ও চর্চা-অনুশীলনের প্রধান কেন্দ্র হইবে বিশ্বভারতী, এই ছিল কবির অন্তরের অন্তঃস্তলের কথা। এই কারণেই বৃদ্ধবয়স পর্যন্তও কবি বার বার বিদেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ঐ-সব দেশের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনই যে তাঁহার এই সব ভ্রমণের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল, একথা বলাই বাহুল্য। বিশেষত এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনে তিনি শেষ জীবনে অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই কালের মধ্যেই তিনি সোভিয়েট রাশিয়া, ইরাণ, সিংহল ও চীন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্কের সূচনা করিয়া যান, তাঁহার বিশ্বভারতীতে। এইসব কারণেই বিশ্বভারতীকে তিনি বাহিরের ও ভিতরের সমস্ত আঘাত থেকে বাঁচাইতে চাহিয়াছিলেন।

এই বিশ্বভারতীর জন্যই তিনি দেশে-বিদেশে ভিক্ষাপাত্র হাতে ছুটিয়াছেন। আর্থিক সমস্যায় প্রায় পাগল হইয়া তিনি দেশের রাজ-মহারাজা ও শেঠজীদের দ্বারস্থ হইয়াছেন। ফল যা পাইয়াছেন তাহা বলাই বাহুল্য। অনিচ্ছুক কৃপণ হস্তের যৎসামান্য দান এবং নানা হীনতা ও অবমাননা মাথায় করিয়া তবুও বার বার তাঁহাকে ধনীরই দুয়ারে হাত পাতিতে হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হইয়া তিনি গান্ধীজীর শরণাপন্ন হইয়াছেন। আলোচ্য পর্বে বিশ্বভারতীর এই আর্থিক সমস্যা কবি যে কী পরিমাণ উদ্বিগ্ন ও বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহার কথাও এই খণ্ডে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থপ্রণয়নে বিশেষত তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে আমি 'বিশ্বভারতী'র-পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করিয়াছি। শান্তিনিকেতনে 'রবীন্দ্র সদন'-এ রক্ষিত তথ্যাদি ও চিঠিপত্রাদি প্রকাশের অনুমতি দিয়া বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ আমাকে চিরবাধিত করিয়াছেন। বিশ্বভারতীর উপাচার্য পরম শ্রদ্ধাস্পদ ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য, প্রাক্তন উপাচার্য শ্রীসুধীররঞ্জন দাস, ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এবং রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে সর্বদাই উৎসাহ ও প্রেরণালাভ করিয়াছি।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। তৃতীয় খণ্ডের পুঁথি বহুদিন পূর্বেই প্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল। কেন্দ্র ও রাজ্য-সরকারের অর্থানুকূল্যে উহার প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে।

সর্বশ্রী শোভনলাল গাঙ্গুলী, চিত্তরঞ্জন দেব, রণজিৎ রায়, ডঃ সুশীল রায়, বিমলচন্দ্র দত্ত, নিত্যরঞ্জন মুখার্জী, জানকীনাথ দত্ত, অজয়েন্দ্রনাথ দত্ত এবং 'রবীন্দ্র সদন', 'বিশ্বভারতী সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী' ও বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের কর্মীদের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করিয়াছি। 'ন্যাশনাল লাইব্রেরী' এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা' কর্তৃপক্ষ পুরাতন পত্রিকার ফাইলগুলি দেখিবার অনুমতি দিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন। হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ লাইব্রেরী হইতেও এবারে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। তাছাড়া 'রবীন্দ্র সদন'-এ রক্ষিত গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের পত্রগুলি ব্যবহারের অনুমতি দিয়া 'নবজীবন ট্রাস্ট' (Navajivan Trust) এবং নেতাজী

রিসার্চ ব্যুরো' (Netaji Research Bureau) আমাকে বাধিত করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় শৈলেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট হইতে যে সাহায্যলাভ করিয়াছি তাহা কোনোদিনও বিস্মৃত হইবার নয়। গ্রন্থপ্রকাশ এবং নানা বিষয়ে বন্ধুবর অরুণ রায় এবং শ্রদ্ধেয় শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী ও নগেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট হইতে যে সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করিয়াছি তাহা কোনোদিন বিস্মৃত হইবার নয়। বন্ধুবর অধ্যাপক রাশীদুল হাসানের নিকট হইতেও আমি নানা দিক থেকে উপকৃত। তাছাড়া শ্রদ্ধেয় উমাপ্রসাদ চক্রবর্তী, ডাঃ নারায়ণচন্দ্র সাহা, অধীর বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঘোষ, আবদুল লতিফ, শঙ্করলাল গড়াই, রণজিৎকুমার দত্ত, সুরতোষ দত্ত, ফণীন্দ্রচন্দ্র রায় এবং নবশক্তি প্রেসের কর্মীদের নিকট আমি নানা বিষয়ে কৃতজ্ঞ। সকলের নাম উল্লেখ সম্ভব নয়—যাঁহাদের নিকট আমি উপকৃত সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরিশেষে একটি কথা। দ্রুত প্রকাশের জন্য গ্রন্থমধ্যে কিছু কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। তার মধ্যে যেগুলি গুরুতর, গ্রন্থশেষে তাহার একটি শুদ্ধিপত্র দেওয়া হইল।

পোঃ হেতমপুর
৮ই মাঘ, ১৩৭৪
বীরভূম

নেপাল মজুমদার

লেখকের কথা

দ্বিতীয় সংস্করণে

'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হইল। উল্লেখযোগ্য, প্রায় বাইশ বৎসর আগে ১৯৬৮ সালে তৃতীয় খণ্ডটি প্রথম প্রকাশিত হয়। দীর্ঘকাল আগেই এটি নিঃশেষিত হইয়া যায়। তাহার পর হইতেই তৃতীয় খণ্ডটি পুনরমুদ্রণের জন্য নানা মহল হইতেই তাগিদ আসিতে থাকে। কিন্তু আমার এই গবেষণাগ্রন্থের বাকি তিনটি খণ্ড প্রকাশের কাজে খুবই ব্যস্ত থাকায় তৃতীয় খণ্ডটি পুনরমুদ্রণ সম্ভব হয় নাই। ইচ্ছা ছিল, বহু প্রাসঙ্গিক ঘটনা উপাদান এবং তথ্যাদির আলোকে তৃতীয় খন্ডটি নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজাইয়া লিখিব। কিন্তু 'দেজ পাবলিশিং'-এর কর্ণধার, বন্ধুবর শ্রীসুধাংশুশেখর দে মশায়কে ধন্যবাদ। তিনি আমার এই গ্রন্থের সব কয়টি খণ্ডই দ্রুত প্রকাশের ইচ্ছা জ্ঞাপন করায়, সে-ও সম্ভব হইল না। 'চার অধ্যায়' ও আরও দু'একটি অধ্যায়ে সামান্য কিছু পরিমার্জন এবং পরিশিষ্টে কয়েকটি মূল্যবান তথ্যাদির সংযোজন ছাড়া আর তেমন কিছু পরিবর্তন করা হয় নাই। তবে প্রসঙ্গত বলা দরকার, শান্তিনিকেতনে জার্মান কন্সাল্ জেনারেল ডঃ হাবার্ট রিক্টরের বক্তৃতা ও সৌম্যেন্দ্রনাথের হুঁসিয়ারী, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক এবং পুলিশের গোপন বিভাগের নিশ্ছিদ্র কড়া নজরদারী ; 'চার অধ্যায়' এর ইংরেজি তর্জমা নিষিদ্ধ করা—ইত্যাদি সম্পর্কে অন্যত্র বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া এখানে তাহার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন বোধ করি নাই। প্রুফ-সংশোধন ও মুদ্রণের নানা কাজে বন্ধুবর শ্রীসুবীর ভট্টাচার্য এবং বিশেষভাবে শ্রীতপন দে যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাহায্য করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়, যাহাদের কাছে সাহায্য লাভ করিয়াছি সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছি আমার প্রথম সংস্করণেই—এই উপলক্ষেও পুনরায় জ্ঞাপন করিতেছি।

৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯৭ — নেপাল মজুমদার

কলিকাতা : ৯১

২৫শে নভেম্বর, ১৯৯০

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের বই

ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা
এবং রবীন্দ্রনাথ
(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

রবীন্দ্রনাথ ও হ্যারি টিম্বার্স
সম্পাদিত গ্রন্থ

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বোম্বাই রায়ৎ

বিষয় সূচী

পৃঃ

ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা
এবং রবীন্দ্রনাথ
তৃতীয় খণ্ড

সবরমতীতে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎকার

লাহোর কংগ্রেসের সাথে সাথেই সারা ভারতের জনমানসে এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। চারিদিকে একটা গুমোট ও থমথমে ভাব—'কী হয় কী হয়' ভাবনা। গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতারা কী নির্দেশ দেন, দেশের লোক অধীর আগ্রহে তাহারই প্রতীক্ষায় রহিল।

লাহোর কংগ্রেসের অনতিকাল পরেই কংগ্রেসের নবনির্বাচিত 'ওয়ার্কিং কমিটি'র এক সভা হয় (২রা জানুয়ারি ১৯৩০)। ইহাতে আসন্ন সংগ্রামের প্রস্তুতিতে দেশের জনমানসে স্বাধীনতা-স্পৃহা ও সংগ্রামী-চেতনাকে তীব্রতর করার উদ্দেশ্যে আগামী ২৬শে জানুয়ারি, সারা দেশব্যাপী সভা-সমিতি ও মিছিল করিয়া 'স্বাধীনতা দিবস' উদ্‌যাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়। কাউন্সিল বয়কটের সিদ্ধান্তটি কার্যকরী করার জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ব্যবস্থা পরিষদ ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির কংগ্রেসী সদস্যদের পদত্যাগ করিবার নির্দেশ দিলেন। অল্পসংখ্যক সদস্য বাদে প্রায় সকলেই ঐ নির্দেশানুযায়ী সভ্যপদে ইস্তফা দেন।

পৌষ-উৎসবের পর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনেই ছিলেন। দেশের এই তীব্র উত্তেজনাময় পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে কোন কথা বা মন্তব্য করিতে দেখা যায় না। রাজনীতিক আন্দোলন ও স্বাধীনতা-সংগ্রামকে তিনি কী চোখে দেখিতেছিলেন তাহা আমরা পূর্বখণ্ডেই বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। ঘটনা-স্রোত কোন মুখে ধাবিত হয়, বোধ হয় কবি তাহাই পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করিতে চাহিলেন। বিশ্বভারতীর কাজ, নানা সামাজিক অনুষ্ঠান তো আছেই,—তাছাড়া এই সময় বরোদা কলেজে কয়েকটি বক্তৃতার জন্য কবি প্রস্তুত হইতেছিলেন। কয়েকমাস পূর্বে বরোদার মহারাজা সায়জীরাও গায়কোবাড়ের নিকট হইতে কবির নিকট এই বক্তৃতার অনুরোধ আসিয়াছিল। কয়েক বৎসর হইতে তিনি বিশ্বভারতীতে বাৎসরিক ছয় হাজার টাকা দান করিয়া আসিতেছিলেন। তীব্র বিরক্তি ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এই অনুরোধ রক্ষা করিতে কবি সম্মত হন। কয়েক মাস পূর্বে কবি এক পত্রে ইন্দিরা দেবীকে লিখিয়াছিলেন (২৭ আশ্বিন ১৩৩৬/১৩ অক্টো' ২৯):

"কিন্তু একটা বাজে কাজের দায় আমার কাঁধে চেপেচে। বরোদায় গিয়ে একটা বক্তৃতা দিতে হবে এই আদেশ। বাঁধা আছি সেই রাজদ্বারে রূপোর শৃঙ্খলে—বিশ্বভারতীর খাতিরে মাথা বিকিয়ে বসেচি। তাই আজ সেই মাথা ঠুকছি একখানা বক্তৃতা বের করবার জন্যে। একটুও ভালো লাগচে না—এই শরৎকালে ছুটির হাওয়ায় শিউলি বন বিকশিত হয়ে উঠল কিন্তু পূর্বজন্মের কোন পাপে কবিকে লাগাতে হোলো কথার ঘানি ঠেলে বক্তৃতার তেল বের করতে. সেই তেল রাজ পদ সেবার জন্যে।"... [চিঠিপত্র ৫ : পত্র ২৯ : পৃঃ ৭০]

বিশ্বভারতীর তখন ভয়ানক অর্থসংকট চলিতেছে। কবির আশা—এই উপলক্ষে বিশ্বভারতীর আর্থিক সমস্যার কিছুটা সুরাহা হইবে। ১০ই জানুয়ারি কবি বরোদার পথে যাত্রা করেন। তাঁহার সঙ্গে চলিলেন শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী ও ডঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেন। পথে লক্ষ্ণৌ ও কানপুরে ঘুরিয়া তাঁহারা আমেদাবাদে পৌঁছিলেন। এখানে কবি আম্বালাল সারাভাইদের গৃহে অতিথি হইয়া উঠিলেন (১৭ই জানুয়ারি)। কবির আমেদাবাদ আসার আসল উদ্দেশ্য ছিল, গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করা, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। গান্ধীজী কী ভাবিতেছেন, আসন্ন সংগ্রাম কিভাবে শুরু ও পরিচালনা করিবেন—বোধ হয় তাঁহার নিজ মুখে সব কথা শুনিবার ও জানিবার ইচ্ছা তাঁহার প্রবল হয়।

১৮ই জানুয়ারি কবি সবরমতী আশ্রমে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সকলের দৃষ্টি তখন সবরমতীর দিকে নিবন্ধ। তাঁহাদের সাক্ষাৎকার ও আলোচনার দীর্ঘ বিবরণ সমসাময়িক প্রায় সমস্ত দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

কবি বলিলেন,—'বয়স আমার সত্তর হল মহাত্মাজী। এবং সে-হিসেবে আপনার থেকে বয়সে আমি বেশ কিছুটা বড়ো।'

গান্ধীজী রহস্য করিয়া জবাব দিলেন—'কিন্তু যখন ষাট বছরের বুড়ো নাচতে পারে না তখন সত্তর বছরের জোয়ান কবিও নাচতে পারেন।'

গান্ধীজীর ঐ 'রেডি-মেড' ব্যবস্থাপত্রের জন্য কবি কপট ঈর্ষা প্রকাশ করিতে গিয়া বলিলেন :

—'কিন্তু আপনি তো গ্রেপ্তারী-নিরাময়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, আমার ইচ্ছা ওরা আমাকেও এমনি একটা দাওয়াই দেন।'

তিরস্কারের সুরে গান্ধীজী বলিলেন,—'কিন্তু আপনি নিজের সঙ্গে ঠিক সঙ্গত আচরণ করছেন না?' তারপরেই দুজনেই উচ্চহাসিতে ভাঙিয়া পড়িলেন।

বিভিন্ন বিষয়েই কবি গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা করিয়া অবশেষে তাঁহার মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য ক্ষমা চাহিলেন। গান্ধীজী মৃদু অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিলেন,—'না। আপনি আমার সময় নষ্ট করেন নাই। আমাদের কথাবার্তার মাঝে সারাক্ষণই আমি সুতো কেটেছি অথচ তাতে আলোচনার কোন ছেদ পড়ে নি। আমি যে সুতো কাটছি তার প্রতিটি মিনিটই আমি সচেতন আছি যে, এর দ্বারা আমি জাতির সম্পদ বৃদ্ধি করছি। আমার হিসেবটা হচ্ছে এই যে, যদি দেশের এক কোটির মত লোক প্রত্যহ এক ঘণ্টা করে সুতো কেটে অলস সময়টাকে কাজে লাগাত তাহলে প্রত্যহ আমরা ৫০,০০০ টাকার মত জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করতাম। আমাদের মাথা-পিছু দৈনিক গড় আয় ৭ পয়সা এবং এতে যদি আরও একটি পয়সাও যোগ হয় তবে তা বেশই উল্লেখযোগ্য হবে। চরকার দ্বারা একজনও নরনারী তার বৃত্তি হারাবে না। এতে করে আমাদের লক্ষ লক্ষ লোকের প্রতিটি অলস মুহূর্তকে আমাদের সাধারণ উৎপাদনবৃদ্ধির কাজে লাগাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। নির্বোধ অসহায় হতাশাগ্রস্ত এই মানুষগুলির কাছে এর থেকে ভালো হাল্কা এবং লাভজনক আর কোনকিছু উপায় বা জীবিকার পন্থা নেই। কৃষিসম্পদ বাড়ানোর কথাও তারা ভাবতে পারে না। আমাদের মাথাপিছু গড় জমির পরিমাণ ২ একরেরও কম। আর Agricultural

Commission যে বিরাট কলেবরযুক্ত সুপারিশ করেছেন তাতে গরীব চাষীদের কোনই উপকার হবে না। এবং তাঁরা যে সব সুপারিশ বা প্রস্তাব করেছেন তা কোনদিনই বাস্তবে বা কাজে পরিণত হবে না।'

কবি উহাতে সায় দিয়া বলিলেন যে, এইসব কমিশনগুলি কোন কাজেরই নয়, কেবল সরকারী আরও কতকগুলি বিভাগ ও দফ্তর বাড়ায় মাত্র; এবং উহাতে তাঁহার এতটুকুও আস্থা নাই।

কবির প্রধান জিজ্ঞাসা—গান্ধীজী দেশের রাজনীতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কী ভাবিতেছেন,—আগামী দিনের জন্য কী কর্মপন্থা তিনি দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে চাহিতেছেন। বস্তুতপক্ষে গান্ধীজী তখনও পর্যন্ত পরিষ্কার কোন আলো বা পথও দেখিতে পাইতেছিলেন না। তিনি বুঝিতে পারেন, ইংরাজ শাসনকর্তৃপক্ষের সীমাহীন দম্ভ ও মূঢ়তার ফলে দেশবাসীর কাছে শেষপর্যন্ত সংগ্রামের প্রশস্ত পথই উন্মুক্ত রহিল, কিন্তু কীভাবে এই সংগ্রামের সূচনা করা যায় তাহা তিনি তখনও পর্যন্ত কিছু ভাবিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন:

'আমি রাতদিন এই নিয়ে সাংঘাতিকভাবে চিন্তা করছি কিন্তু চারদিকের এই অন্ধকারের মধ্যে আমি এখনও পর্যন্ত কোন আলো দেখতে পাচ্ছি না। যদিও আমরা কোন সক্রিয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভেবে উঠতে পারিনি তবু এই মুহূর্তে যখন ডোমিনিয়ন স্টেটাস্ বলতে আমরা এতকাল যা বুঝে এসেছি তার অন্য ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে তখন, আমরা একথা স্পষ্টই বলব যে, পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।'

এইভাবে দীর্ঘ আলোচনার শেষে কবি গান্ধীজীর নিকট বিদায় লইবার কালে আশ্রমবাসীরা কিছু উপদেশ দিবার জন্য কবিকে অনুরোধ করেন। কবি বলিলেন:

"Talking is a wasteful effort, and involves the unnecessary exercise of lungs. Rather than talk, as I usually have to do, I shall leave you a message in just a single sentence. It is, this, that the sacrifice needed for serving our country must not consist in merely emotional enthusiasm, which is indulged in as a sort of luxury, but it should be a real discipline, the severe discipline of truth. I know that you boys and girls are going through it and will go through it as long as you have your great teacher with you. I know, you will fulfil the great promise I claim from you. Let us not think of making a political picnic of speeches and other demonstrations, but willingly accept the drudgery and trouble of quiet and silent work. It is not here even necessary for me to say it. It is there in the atmosphere. I feel deeply the influence of it all around you and I envy you. I have no faith in noisy demonstraions. Let us not talk, but have faith in silent work, faith in humble beginnings, and I

know truth will take wing of itself, and, like a fire, will spread through the country, though its origin may be small and insignificant. Let us no longer blow the siren and allow steam to be wasted away." [*The Hindu* : Madras—23 January 1930]

কিন্তু ইহা গতানুগতিক ও আনুষ্ঠানিক কোন উপদেশবাণী নহে। ইহা সত্যই কবির আন্তরিক বিশ্বাসের কথা এবং চিরদিনই দেশকর্মীদের তিনি এই উপদেশই দিয়াছেন। নিছক রাজনীতিক আবেগ-উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনাকে কবি কোনদিনই ভালো চোখে দেখেন নাই। স্বদেশ প্রেমের পুঞ্জীভূত সমস্ত আবেগ ও কর্মোদ্যমকে সংযত করিয়া নীরব গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করিবার নির্দেশ তিনি দিয়া আসিতেছিলেন। বলা বাহুল্য, গান্ধীজীও তাঁহার প্রিয় ও সুপরিচিত গঠনমূলক কার্যসূচীর উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়া আসিতেছিলেন।

কিন্তু স্বয়ং গান্ধীজীই এখন রণতূর্য হাতে স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতাকে ডাক দিলেন। তিনি দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা-স্পৃহা ও সংগ্রামী-চেতনাকে প্রতিদিনই ধাপে-ধাপে উন্নীত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ৯ই জানুয়ারি গুজরাট বিদ্যাপীঠের ছাত্রদের এক সভায় গান্ধীজী তীব্র আবেগময়ী ভাষায় বলিলেন :

"...Votary as I am of non-violence, if I was given a choice between being a helpless witness to chaos and perpetual slavery, I should unhesitatingly say that I would far rather be witness to chaos in India, I would far rather be witness to Hindus and Muslims doing one another to death than that I should daily witness our gilded slavery...

"You will be ready of course to march to jail, but I do not think you will be called upon to go to jail. The higher and severer ordeal I have just now pictured to you awaits you. I do not know what form civil disobedience is to take, but I am desperately in search of an effective formula." [*Mahatma*; Voll-III : pp. 2-3]

আসন্ন স্বাধীনতা-সংগ্রামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া কয়েকদিন পর গান্ধীজী আর একটি বিবৃতিতে বলিলেন :

..."Complete Independence does not mean arrogant isolation or a superior disdain for all help. But it does mean complete severance of the British bondage, be it ever so slight or well concealed. It must be clearly understood that the largest nationalist party in India will no longer submit to the position of a dependent nation or to the process of helpless exploitation. It will run any risk to be free from the double curse. The nation wants to feel its power more even than to have independence. Possession of such power is independence."

স্বাধীনতা বলিতে গান্ধীজী কী বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন তাহা উপরিউক্ত বিবৃতি হইতে কিছুটা বুঝা যায়। তিনি আরও বলিলেন :

"That the civil disobedience may resolve itself into violent disobedience is, I am sorry to have to confess, not an unlikely event. But I know that it will not be the cause of it. Violence is already corroding the whole body politic. Civil disobedience will be but a purifying process and may bring to the surface what is burrowing under and into the whole body. With the evidence I have of the condition of the country and the unquenchable faith I have in the method of civil resistance, I must not be deterred from the course the inward voice seems to be leading me to." [*Idib.* : pp. : 7-8.]

এইভাবে দিনের পর দিন গান্ধীজী বিক্ষুব্ধ দেশবাসীর মনে প্রচণ্ড উত্তেজনা ও উত্তাপের সঞ্চার করিতে লাগিলেন।

অবশেষে ২৬শে জানুয়ারি আসিয়া পড়িল। বিপুল উত্তেজনা ও উন্মাদনার মধ্যে সারা দেশে সভা-সমিতি ও মিছিল করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্পবাণী পাঠ করা হয়। স্বয়ং গান্ধীজী স্বাধীনতার এই সংকল্প-বাক্যটি রচনা করেন :

"আমরা বিশ্বাস করি যে, আত্মবিকাশের পূর্ণ সুযোগলাভের জন্য অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের ন্যায় ভারতবাসীদেরও স্বাধীনতা লাভ করিবার, স্বীয় শ্রমার্জিত বিত্ত ভোগ করিবার এবং জীবনধারণের জন্য উপযোগী উপকরণ পাইবার অবিচ্ছেদ্য অধিকার আছে। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, যদি কোনও গভর্নমেণ্ট কোন জাতিকে এই সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করে এবং তাহাকে নির্যাতন করেন, তবে সেই গভর্নমেণ্টকে পরিবর্তন বা ধ্বংস করিবার অধিকারও সেই জাতির আছে। ভারত গভর্নমেণ্ট ভারতবাসীকে শুধু স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াই বিরত হয় নাই, অধিকন্তু জনসাধারণের শোষণের উপরই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতবর্ষের অর্থনীতি ও রাজনীতি, সভ্যতা ও অধ্যাত্মসমুন্নতির সর্বনাশ করিয়াছে, সুতরাং ভারতের পক্ষে ব্রিটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বরাজ অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

"ভারতের অর্থনৈতিক সর্বনাশ হইয়াছে। আয়ের তুলনায় অত্যধিক পরিমিত রাজস্ব আমাদের দেশের লোকের নিকট আদায় করা হয়। আমাদের দৈনিক আয় গড়পড়তা সাত পয়সা মাত্র। আমরা যে গুরু করভার বহন করিতে বাধ্য হই, তাহার শতকরা বিশ টাকা কৃষকদের নিকট হইতে ভূমি কর স্বরূপ এবং শতকরা তিন টাকা লবণ শুল্ক বাবদ আদায় করা হয়। এই শুল্কভারে দরিদ্র জনসাধারণ অত্যন্ত পীড়িত হইতেছে।

"সুতা-কাটা প্রভৃতি গ্রাম্যশিল্পের ধ্বংসসাধন করিয়া তাহার পরিবর্তে অন্যান্য দেশের ন্যায় কোনও নূতন শিল্পের প্রবর্তন করা হয় নাই, ফলে দেশের কৃষক-সম্প্রদায়কে বৎসরে অন্তত চারিমাস কাল অলসভাবে সময় কাটাইতে হয় এবং শিল্প-নৈপুণ্যের অভাবে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিও খর্ব হইতেছে।

"বাণিজ্য-শুল্ক এবং মুদ্রানীতি এরূপ চতুরতার সহিত পরিচালিত করা হইতেছে যে তাহার ফলে কৃষকদের বোঝা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের দেশের আমদানী পণ্যের মধ্যে অধিকাংশই ইংলণ্ডে প্রস্তুত। বাণিজ্য-শুল্কধার্য করিবার পদ্ধতি ব্রিটিশ শিল্পের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় এবং উক্ত শুল্কলব্ধ রাজস্ব দরিদ্রের দুঃখ নিরাকরণের জন্য ব্যয়িত না হইয়া ব্যয়বহুল শাসনতন্ত্র পরিচালনার জন্য ব্যয়িত হয়। মুদ্রাবিনিময়নীতি আরও অধিক যথেচ্ছাচারিতার পরিচায়ক ; ইহার ফলে কোটি কোটি টাকা দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে।

"ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থা যত হীন হইয়াছে, এরূপ আর কখনও হয় নাই। কোন প্রকার শাসন-সংস্কারই ভারতবাসীকে প্রকৃত রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করে নাই। আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিকে পর্যন্ত বিদেশী শাসকগণের নিকট অবনত হইতে হয়। আমরা স্বাধীন মত প্রকাশ এবং স্বাধীনভাবে সঙ্ঘ সমিতি গঠনের অধিকারে বঞ্চিত। আমাদের দেশের অনেককেই নির্বাসিত অবস্থায় বিদেশে কাল কাটাইতে হইতেছে। তাঁহারা স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারেন না। শাসনকার্য পরিচালনার উপযোগী সমস্ত প্রতিভার বিলোপসাধনের ফলে জনসাধারণকে শুধু কেরানীগিরি এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েতী লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে।

"সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক দিয়া, বৈদেশিক শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদিগকে আমাদের বিশিষ্ট ভাবধারা হইতে বিচ্যুত করিয়াছে। ফলে যে শৃঙ্খল আমাদিগকে দাসত্বের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সেই শৃঙ্খলকেই আমরা আদর করিতে শিখিয়াছি।

"বাধ্যতামূলক নিরস্ত্রীকরণ আমাদের নৈতিক সর্বনাশ করিয়া আমাদিগকে নির্বীর্য করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতাকে নিষ্পেষণ করিবার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত বিজাতীয় সৈন্যদলের উপস্থিতির মারাত্মক ফল এই হইয়াছে যে, উহাদিগকে দেখিয়া আমরা মনে করি যে, বিদেশীয় আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে, এমন কি, চোর, ডাকাত, গুণ্ডা প্রভৃতির হস্ত হইতে নিজেদের গৃহ রক্ষা করিতেও আমরা অসমর্থ।

"যে শাসন-পদ্ধতি আমাদের দেশের এই চতুর্বিধ সর্বনাশ সাধন করিয়াছে, সেই শাসন-পদ্ধতির অধীনে আর মুহূর্তকাল বাস করা আমরা মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া মনে করি। এ কথা আমরা অবশ্যই স্বীকার করি যে, হিংসাই স্বাধীনতা অর্জনের প্রকৃষ্টতম পন্থা নহে ; সুতরাং আমরা ব্রিটিশের সহিত সর্বপ্রকার স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা যথাসাধ্য বর্জন করিবার জন্য প্রস্তুত হইব এবং করপ্রদান বন্ধ ও অন্যান্য উপায়ে নিরুপদ্রব প্রতিরোধনীতি অবলম্বন করিবার জন্য প্রস্তুত হইব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, উত্তেজনার কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আমরা যদি হিংসামূলক উপায় অবলম্বন না করিয়া স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা বর্জন করিতে পারি এবং করপ্রদানে বিরত হই, তাহা হইলে এই অমানুষিক শাসনতন্ত্রের অবসান সুনিশ্চিত। অতএব এতদ্দ্বারা আমরা শান্ত ও সংযত দৃঢ়তার সংকল্প গ্রহণ করিতেছি যে, পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেস যখন যেরূপ নির্দেশ দিবেন, আমরা সেই নির্দেশ ঐকান্তিকভাবে পালন করিব—বন্দেমাতরম্।"

স্বাধীনতা-দিবস পালনের উদ্দেশ্য সফল হইল ; গান্ধীজী এবং কংগ্রেস নেতারা দেশের সুস্পষ্ট সংগ্রামী মনোভাব উপলব্ধি করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই গভর্নমেন্টের দমন-নীতি পুনরায় সচল হইয়া উঠিতে থাকে। ২৩শে জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র, কিরণশঙ্কর রায়, ডাঃ যতীন দাশগুপ্ত প্রমুখ বাংলা কংগ্রেসের বার জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে এক বৎসর করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। উল্লেখযোগ্য আলি ভ্রাতৃদ্বয় প্রমুখ দেশের মুসলিম নেতারা শুরুতেই এই আন্দোলন হইতে মুসলমান সম্প্রদায়কে বিরত থাকিবার নির্দেশ দিয়া এক ইস্তাহার প্রচার করিলেন।

ঠিক এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ বরোদা রাজ্য সফর করিতেছেন। ২৬শে জানুয়ারি কবি বরোদা পেঁীছাইলেন ;—সেখানে তিনি বরোদার রাজ-অতিথি।

পরদিন, ২৭শে জানুয়ারি তিনি বরোদা কলেজে ভাষণ দেন, বক্তৃতার বিষয় ছিল 'Man the Artist'.। বরোদায় তিনি আরও কয়েকদিন ছিলেন এবং একদিন বরোদার শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকদের সভায় দেশের শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

বরোদা ভ্রমণকালে রাজনীতিক প্রবন্ধ

কবির এই বরোদা-ভ্রমণের বিস্তারিত কোন বিবরণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তাই দেশের ঐ পরিস্থিতিতে তাঁহার মনে কী প্রতিক্রিয়া হইতেছিল—এবং এই ভ্রমণকালে তিনি আর কোন ভাষণ ও বিবৃতি দিয়াছিলেন কিনা জানা শক্ত। তবে এইকালে রাজনীতি বিষয়ক দুটি প্রবন্ধ পর পর প্রকাশিত হয়। সম্ভবত এই দুটি প্রবন্ধ এই ভ্রমণকালেই রচিত ও পঠিত হয়। 'Organizations' ও 'Wealth and Welfare' শিরোনামায় প্রবন্ধ দুটি 'মডার্ন রিভ্যু' পত্রিকায় (*The Modern Review* —Jan.-Feb.-1930) প্রকাশিত হয়। কবির রাজনীতিক-চিন্তার ক্রমবিকাশের দিক হইতে বিচার করিলে প্রবন্ধ দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, এই কারণেই ইহার কিছুটা আলোচনা হওয়া দরকার।

প্রথমেই 'Organizations' প্রবন্ধটি লইয়া আলোচনা করা যাক। এই প্রবন্ধে তিনি আধুনিক পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার সমাজ-আর্থনীতিক ও রাষ্ট্রিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্যটি বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আর এই রাষ্ট্রযন্ত্রটিকেই—পোলিটিকাল ইকনমিতে যাহাকে Capitalist State-machine বলা হয়—উহাকেই তিনি 'Organizations' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি দেখিতেছেন, এই সব পুঁজিবাদী দেশ তাহাদের বিপুল উৎপাদিকা-শক্তিকে ক্রমাগতই বিপুলতর করিবার জন্য পরস্পরের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। আর তাহাদের এই উৎপাদিকা শক্তির বিপুলতা কোন মানবিক বা সামাজিক প্রয়োজনের স্বার্থে চাহিদা মিটাইবার জন্য নয়,—কোন মহান আদর্শ ও উদ্দেশ্যেও নয় ; পরন্তু

তাহাদের মুনাফার পাহাড়কে ক্রমাগত বিপুলতর করিবার বাসনায় কোন এক অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন অন্ধ শক্তির তাড়নায় উদ্দাম ঝড়ের গতিতে তাহারা ছুটিতেছে।—এই মুনাফা-লালসার গতিবেগকে সংযত করিবার ক্ষমতাও তাহাদের নাই। পরন্তু এই প্রতিযোগিতা শেষ পর্যন্ত অস্ত্র-প্রতিযোগিতা, যুদ্ধ, সামরিক সংঘর্ষ ও বিনাশের দিকে তাহাদের ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে, এটি কবির চোখে পরিষ্কার ধরা পড়িয়াছে। কবি অবশ্য ঈশ্বরের ক্রোধ ও রোষানলের (God's Vengeance) ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি লিখিলেন :

"When the cannibal eats up his fellow beings, it is some satisfaction to know that it allays his hunger and nourishes him. But when we realize that not only we, who belong to alien continents, but numberless individuals of the West, are made to offer their very life-blood, not to fulfil human need, but to help in the increase of the record breaking height of the non-essential, then we cannot help hoping that God's vengence will strike these idolators to the dust and with them the blood-stained altar of their ugly image, the fetish of organization for production or profit that is superfluous, and the hungry spirit of possession that is unmeaning."

তাই তিনি বলিলেন, "When a people begins to seek its safety principally in the augmentation of its armour and the increase of its material wealth, then it is a race of death for that people. For these things have no end in themselves; they are dead, and therefore their weight kills. ……But because the scientific facility of communication to-day has spread its conquest in every realm of the elements, the field for fighting and profit-making has also become boundless in dimension. And therefore the organization of offensive and defensive measures is taxing a large part of the resources of the whole population of the country. …To satisfy the growing claims of your military machine of a monstrous proportion you need an amount of money which is almost farcical in its absurdity. And for that you need to multiply your money-making machines, which again in their turn, in order to keep pace, need a parallel organization of whips and shouts in the donkey race of military expansion."

তিনি আরও সতর্ক করিয়া দিতে চাহিলেন যে, এই অটোমেটন-যন্ত্র-পূজারী সমাজ তাহার সমরাস্ত্র ও সমরোপকরণ নির্মাণে যে যথেচ্ছ পরিমাণ বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করিতেছে তাহা একরকম বলপূর্বক ক্ষুধিত, পীড়িত এবং কৃষকদের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইতেছে, যাহার জন্য শেষ পর্যন্ত তাহাদের হালের বলদজোড়াও বিক্রয় করিতে তাহারা বাধ্য হয় :

"I ask our people, who suffer from an infatuation with the complexity and immoderate bulk of organization in the West, to take notice how it produces the ludicrous and yet tragic mentality that has its worshipful tenderness for the automaton. The money that is recklessly lavished in order to manufacture and maintain the unproductive military doll is forcibly snatched away from the hungry, from the sick, from the tillers of the soil, who must sell their plough-bullocks to make their contribution."

এই গেল পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পশ্চিমী মহাদণে চেহারা। তারপর তিনি ভারতে ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র-যন্ত্রটির স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে গিয়া এক দীর্ঘ মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়াছেন। কবির বক্তব্য, এখানে ইংরাজ তাহার সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য 'সরকার' নামক রাষ্ট্র-যন্ত্রটিকে নিখুঁত ও নিপুণভাবে চালু রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। অথচ ইংরাজ বণিক ও শিল্পপতিরা যখন ভারতের অগণিত নিরন্ন কৃষক ও শ্রমজীবীদের নিঃশেষে শোষণ করিয়া এক ভয়াবহ দারিদ্র্য ও মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলিয়া দিতেছে, তখন এই সরকার নামক নিখুঁত যন্ত্রটির বধিরতা ও হৃদয়হীনতার ভান এক চরম বিস্ময়কর নির্লজ্জ ভণ্ডামী ছাড়া আর কি হইতে পারে। অন্নকষ্ট, জলকষ্ট ও অবর্ণনীয় দারিদ্র্যযন্ত্রণায় ভারতের অগণিত জনগণ নির্জীব ও মৃতপ্রায়—কিন্তু শাসকশক্তির ঐ হৃদয়হীন যন্ত্রের নিকট উহাদের প্রায় কোন বাস্তব অস্তিত্বও নাই। ইহাই চিরদিন কবিকে গভীরভাবে পীড়িত করিয়াছে। তাই তিনি বলিলেন :

"I have had my experience of what water scercity means for people who live under the tropical sun, when drinking water has to be extorted from the grip of the miserly mud, when a chance spark burns down a whole village to ashes with not a drop of water in the neighbourhood but tear-drops for quenching the fire. The daily suffering, during the sultry months of summer, of numberless men and women is intense and widespread. But care is taken that this suffering must not, in the least, touch the imperfectly human, who dwell in the doll-house barracks and the offices of the organization agency. I blush to mention the paltry sum that is allotted in my country by the high priests of Organization to provide the thirsting millions with a mockery of water supply.

"What stupendous cruelty is implied in all this is never realized by the devotees of the *Machine* who cannot even imagine where lies the inequity of turning human blood into oil for the smoother working of their engine."··· [*Modern Review* : Jan. 1930 : pp, 1-2]

বিগত যুদ্ধের সময় ভারতে দরিদ্র শ্রমিক ও কৃষকদের কী হীন ও অপকৌশলে

শোষণ করিয়া ইংরাজ পুঁজিপতিরা তাহাদের মুনাফার পাহাড়কে স্ফীত করিয়াছে তাহারই এক দীর্ঘ মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়া কবি বলিলেন :

"It is known that a four hundred percent profit was made in Bengal during war time in some jute factories for the sake of which innumerable individuals were made to live an unnatural life in surroundings which are ugly both in their physical and moral aspects. It is an insult to humanity when the defenders of faith in behalf of the Organszation-idol compare the amount of the wages which the mill-hands now earn with their income in former days. It is a part of their impious creed to believe that money can compensate for curtailment of personality···

"And we know what an amount of cunning is exercised by the money-mongers to cheat the starving peasants of their legitimate dues. As they are kept ignorant of the market value, it is easy to play a waiting game against them. This was specially so during the war when exportation was stopped, and these cultivators were compelled to sell their crops below cost price. And yet when individuals who are fully human and produce food are driven to famine, the organization which sucks blood and grinds bones is fraternally helped by another organization named administration. They publish forecasts of the jute crop in order to enable their kindred to realize the wisdom of the proverb, that knowledge is power, that to be forewarned is to be forearmed. Such a pious frame of mind is luxuriously cultivated in the present civilization which, holding humanity cheap, offers its best devotion to the *Machine.*"

পাশ্চাত্য দেশগুলি তাহাদের আইন ও বিচার-ব্যবস্থার খুবেই বড়াই করেন। তাঁহারা বলেন, তাহাদের বিচার-ব্যবস্থায় ও আইনের চক্ষে সকল ব্যক্তিই সমান এবং সকলেই সমান সুবিচার পায়। এই 'বিচার' নামক প্রহসনের আসল রহস্যটি উম্ঘাটন করিয়া কবি দেখাইলেন যে, এই যন্ত্রপূজারী সমাজ-ব্যবস্থায় তাহাদের আইনের সূক্ষ্ম জটিলতা ও তার অপ্রচলিত দুর্বোধ্য পরিভাষা জনসাধারণের বোধগম্য না হওয়ার দরুন এবং তার ফলাফলের অনিশ্চয়তার দরুণ এইসব বিচারালয়গুলি এক-একটি বেআইনী জুয়ার আড্ডায় পরিণত হইয়াছে আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধনী ব্যক্তিরাই তাহাতে কৃতকার্য ও লাভবান হয়। তাই কবি বলিলেন :

"···In fact, the uncertainty of justice which is the inevitable consequence of the most difficult and complex technicalities of law, has made our Law Court an unlicensed gambling hall in which the chances of success most often lean towards the rich."

কবির মতে, আধুনিক আইনশাস্ত্রের এই জটিলতা (এবং সমাজের সব কিছুতেই এই জটিলতার) মূল কারণ এই যে, এই সমাজের সৃজনশক্তির উৎস শুকাইয়া মরিয়া গিয়াছে। অবশ্য ইহার সমাধান ও মুক্তির কোন পরিষ্কার চিত্রও কবি দেখিতে পান নাই। তবে সমাধানের একটি সূত্রে তাঁহার দৃঢ় আস্থা ছিল, এবং সেটি হইতেছে—সমাজের সাধারণ জনগণের উন্নতিবিধান। অর্থাৎ তাঁহার মতে—সমাজের এই সাধারণ জনগণের শর্তেই সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং সমস্ত কিছু ব্যবস্থাপনা নিরূপণ হওয়া দরকার। তিনি বলিলেন :

…"Things that are of vital importance to our society should never become too difficult of comprehension for the average intelligence of the people. For that creates a profound chasm between life's need and the means of its satisfaction, and in that gaping hole, all kinds of mischief find their lodging, because it is beyond the reach of the entire mind of the people." [*Ibid* : pp. 3-4]

লক্ষ্য করিবার বিষয়, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রকে ইতিপূর্বে প্রায়ই কবি 'The Nation', 'Nationalism' ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এই প্রবন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবেই 'Organization' ও 'Machine' শব্দ দুটির পুনঃপুন ব্যবহার করিয়াছেন, শব্দ দুটির বিশেষ তাৎপর্যগত অর্থজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই।

বলা বাহুল্য, এই প্রবন্ধে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী সমাজ-সভ্যতার নৈতিমূলক সমালোচনাটিই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সমাধানের স্পষ্ট কোন চিত্রও তাঁহার নিকট পরিষ্কার ছিল না। ভাবীকালের সমাজ-সভ্যতার আদর্শ ও জীবনদর্শন কী হইবে, এ'সম্পর্কে তাঁহার চিন্তা খুব বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিত না, একথা পূর্বেই বহুবার উল্লেখ করিয়াছি। ইউরোপের প্রগতিশীল চিন্তানায়করা বর্তমান পুঁজিবাদী সভ্যতার এই সংকটের অনিবার্য পরিণতি দেখিতেছিলেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের জীবনদর্শন ও রাজনীতি কবিকে তখনও পর্যন্ত বিশেষ আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। ভারতের রাজনীতিক ও সমাজ-আর্থনীতিক বিকাশের ইতিহাসের যে-বিশেষ যুগ ও পরিবেশে কবিমানস জন্মলাভ করিয়া বিকশিত হইয়াছে, স্বভাবতই তাহাতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের জীবনদর্শনের কোন সংবেদন-প্রতিক্রিয়া থাকিতে পারে না। তাছাড়া মানসিক গঠনপ্রকৃতিতে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি। ইংরাজীতে যাহাকে বলা হয়—methodical and consistent thinking, অর্থাৎ সুসম্বন্ধ ও সুশৃংখল প্রণালীবদ্ধ চিন্তা যেন কবিমানসের ধাতুগত বৈশিষ্ট্যেরই কতকটা বিরোধী। এই কারণেই কোন একটি গভীর ও জটিল বিষয়ে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই হঠাৎ ইঁহাদের চিন্তার যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং স্বভাবতই তখন নানা পরস্পরবিরোধী ভাব ও অসঙ্গতি দেখা দেয় চিন্তার মধ্যে।

যিনি 'Organizations' বা 'money making machine'-গুলির এত তীব্র সমালোচনা করিলেন তিনিই 'Wealth and Welfare' নামক পরবর্তী প্রবন্ধে

ব্যক্তিগত ধনসম্পদ ও সম্পত্তির পক্ষে বলিলেন। এই সম্পর্কে উক্ত প্রবন্ধের নিম্নোদ্ধৃত অংশটি হইতে কবির চিন্তার প্রকৃতি ও ধরনটি স্পষ্ট হইয়া উঠে। সমাজতন্ত্রবাদীরা—যাহারা *Abolition of private property*-র কথা বলেন—কতকটা তাঁহাদের উপলক্ষ্য করিয়া কবি বলিলেন :

"There are some who belive that the eradication of the idea of property will give the communal spirit its full freedom. But we must know that the urge which has given rise to property, is something fundamental in human nature. If you have the power you may tyrannically do violence to all that constitutes property ; but you cannot change the constitution of mind itself.

"Property is medium for the expression of our personality. It we look at the negative aspect of this personality, we see in it the limits which seperate one person from another. And when, in some men, this sense of seperateness takes on an intense emphasis, we call them selfish. But its positive aspect reveals the truth, that it is the only medium through which men can communicate with one another···

"Through this creative limitation which is our personality, we receive, we give, we express. Our highest social training is to make our property the richest expression of the best in us, of that which is universal, of our individuality whose greatest illumination is love. As individuals are the units that build the community, so property is the unit of wealth that makes for communal prosperity, when it is alive to its function. Our wisdom lies not in destroying seperateness of units, but in maintaining the spirit of unity in its full strength."

[*Modern Review* : Feb. 1930 : pp. 161-62]

বলাবাহুল্য, তিনি এখানে 'property' শব্দটি সাধারণভাবে প্রয়োগ করিলেও ইহার দ্বারা তিনি আধুনিক পুঁজিবাদী সংস্থাগুলির কিংবা মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের হাতে কেন্দ্রীভূত ধনসম্পদগুলির কথা বুঝান নাই কিংবা উহার সমর্থনেও কিছু বলেন নাই। পরন্তু তার বিরুদ্ধেই তাঁহার প্রধান অভিযোগ। সম্পত্তির এই আধুনিক রূপান্তরের (পুঁজিবাদী) বিরোধিতা করিবার জন্য তাঁহার এই প্রবন্ধ রচনা। অন্তত এই প্রবন্ধে তিনি ভারতের প্রাচীন সরল অনাড়ম্বর সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সেদিনকার ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির বিশেষ তাৎপর্যগত ভূমিকার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাহিলেন। তাঁহার বক্তব্য, সেদিন জনমত ও সমাজ রাজা-মহারাজা ও ধনিকদের ধনসম্পদের এক বৃহৎ অংশের উপর দাবি—অর্থাৎ গৌণ বা পরোক্ষ কর বসাইত। সমাজের জলসরবরাহ, চিকিৎসা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজে ধনীরা তাহাদের উদ্বৃত্ত ধনসম্পদ নিয়োজিত করিত। সেদিন সম্পত্তি ছিল সভ্যতার স্তম্ভ এবং এই ধনসম্পদ ধনীদের স্বার্থত্যাগের

সুযোগ ঘটাইয়া দিত। কিন্তু কিভাবে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিল, সে-সম্পর্কে তিনি বলিলেন :

"When life is simple, wealth does not become too exclusive, and individual property finds no great difficulty in acknowledging its communal responsibility, rather, it becomes its vehicle.

"But with the rise of the standard of living, property changes its aspect, It shuts the gate of hospitality, which is the best means of social intercommunication. It displays its wealth in an extravagance which is self-centred. It begets envy and irreconcilable class division. *In short, property becomes anti-social.* (*Italics : mine*) Because, with what is called material progress, property has become intensely individualistic, the method of gaining it has become a matter ot science and not of social ethics. It breaks social bonds ; it drains the life sap of the community."

অর্থাৎ এখানে তিনি সরল উৎপাদন ব্যবস্থা হইতে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক পুঁজিবাদী সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশের কথাই বুঝাইতে চাহিতেছেন। কিন্তু তাঁহার বক্তব্য হইতেছে যে, এই রূপান্তরের মূল কারণ আর্থনীতিক নহে—আরও গভীরে। এবং সেটি হইতেছে, সরল জীবনযাত্রার আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া যেদিন হইতে সমাজের সমস্ত মানুষই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ধনাড়ম্বরপূর্ণ ভোগবিলাসিতায় জীবনসম্ভোগের জন্য অন্ধ উন্মাদের মত ধাবিত হয় সেইদিন হইতেই এই সর্বনাশা সভ্যতার শুরু হইয়াছে। অর্থাৎ মানুষের সীমাহীন লোভ-রিপু, বিলাস-ব্যসন এবং বল্গাহীন সম্ভোগ প্রবৃত্তি হইতেই যেন পুঁজিবাদ জন্মলাভ করিয়াছে, ইহাই কবির ধারণা। সরল উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে পণ্য-উৎপাদন এবং উৎপাদন ব্যবস্থা হইতে কিভাবে পুঁজিবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ করে—এই বৈজ্ঞানিক অর্থনৈতিক শিক্ষা ও চেতনা কবির ছিল না। তিনি বলিলেন :

"Civilization, to-day has turned into a vast catering establishment. It maintains constant feasts for a whole population of gluttons. The intemperance which could safely have been tolerated in a few has spread its contagion to the multitude. The universal greed, produced as a consequence, is the cause of the meanness, cruelty and lies, in politics and commerce that vitiate the whole human atmosphere." [*Ibid* : p. 162]

কিন্তু প্রায় সারাজীবন তিনি পুঁজিবাদী সমাজ-সভ্যতার যে বীভৎস চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে শ্রমিক, কৃষক ও সমাজের বৃহত্তর জনসাধারণের নিরতিশয় দুঃখ-দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনযাপনের মর্মান্তিক চিত্রই অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তাছাড়া মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের মুনাফার লোভ ও উদগ্রলালসা হইতেই বর্তমান সভ্যতার ভয়ঙ্কর সঙ্কটসৃষ্টির কথাও তিনি অন্যত্র পুনঃপুন ঘোষণা করিয়াছেন।

উহার সঙ্গে কবির এই প্রবন্ধের বক্তব্যের সঙ্গতি কোথায়? সে যাহাই হউক, আলোচ্য প্রবন্ধের কবির উপরোক্ত দুটি তত্ত্বের সূত্র ধরেই আর একটু অগ্রসর হইলেই আমরা গান্ধীজীর 'হিন্দ-স্বরাজ-অর্থনীতি'র ও 'অছিবাদ' তত্ত্বে (Theory of Trusteeship) উপনীত হইব। অবশ্য কবি-মানসে এই চিন্তার ঝোঁক নূতন নয়, কয়েক বৎসর পূর্বে 'City and Village' প্রবন্ধে (*Visva Bharati Quarterly* : October 1924) এই একই বক্তব্য রাখিয়াছিলেন।

অথচ তত্ত্বগতভাবে ইহার বিপরীত ঝোঁকগুলি কবিমানসে খুবই প্রবল ছিল। তিনি অন্যত্র আধুনিক উপকরণ-সভ্যতা ও যন্ত্রবিজ্ঞানকে পুনঃপুন স্বাগত জানাইয়াছেন, সর্বোপরি কৃষিতে ব্যক্তিগত জোত-জমা ও প্রাচীন পদ্ধতির পরিবর্তে সমবায় প্রথা ও যন্ত্রবিজ্ঞান প্রবর্তনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়া আসিতেছিলেন।

স্মরণ রাখা দরকার, পূর্বাপর বিস্তর লেখায় ও বক্তৃতায় তিনি দেখাইয়াছেন কিভাবে পুঁজিবাদী যন্ত্রসংস্থা ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণনীতি ভারতের সমৃদ্ধ কুটির-শিল্পকে বিধ্বস্ত করিয়াছে, কিভাবে জমিদার-মহাজনের হাতে ক্ষুদ্র চাষীর জোতজমা দ্রুত কেন্দ্রীভূত হইতেছে, কিভাবে সমাজের একটি মেরুতে সমস্ত ধনসম্পদ কেন্দ্রীভূত হইতেছে অপর মেরুতে নিঃস্ব ক্ষুধাশীর্ণ মানুষেরা ভীড় করিতেছে। এই যদি সমাজের বাস্তব চিত্র হয়, তবে সেই সমাজে অথবা তাঁহার পরিকল্পিত ভাবী সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভূমিকা কী হইবে তাহার পরিষ্কার নির্দেশ তিনি দিতে পারেন নাই, উপরোক্ত প্রবন্ধে।

বলা বাহুল্য, সম্পত্তি সম্পর্কে সমাজতন্ত্রবাদীদের বক্তব্য কবি ঠিক জানিতেন না। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় Means of production ও Personal Property-র মধ্যে যে পার্থক্য রাখা হয় তাহাও তিনি জানিতেন না।

অবশ্য ইহার অল্প কয়েকমাস পরে সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণকালে তিনি মানব-সভ্যতার এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখিতে পান এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির 'কল্যাণকর ভূমিকা সম্পর্কে" তাহার ধারণা অনেকখানি আঘাত পায়। যথাসময়ে আমরা এ আলোচনায় আসিব।

কবি যখন পশ্চিম-ভারত সফর করিতেছিলেন সেই সময় কলিকাতায় ভবানীপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মেলনের ঊনবিংশতম অধিবেশন শুরু হয় (২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩০)। রবীন্দ্রনাথ উহার সভাপতিত্ব করিবেন, কবির সম্মতিক্রমে পূর্বাহ্নেই স্থির হইয়াছিল। কিন্তু বরোদার পথে আমেদাবাদেই কবি অসুস্থ হইয়া পড়েন। যথা-নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইয়া সম্মেলনে যোগদান করিতে পারিবেন না বুঝিতে পারিয়া কবি আমেদাবাদে অসুস্থ অবস্থায়ই সম্মেলনে পাঠ করার জন্য 'পঞ্চাশোর্ধ্বম' নামক ভাষণটি লিখিয়া অবনীন্দ্রনাথের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

স্মরণ রাখা দরকার, ইহার বেশ কিছুকাল পূর্বেই বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিসিজমের প্রতিবাদে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া 'বাস্তববাদী' ও 'প্রগতিবাদী' কয়েকটি ছোট-ছোট সাহিত্যিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়। সাহিত্যের প্রচলিত বা সনাতনী ধ্যান-ধারণা ও রাজনীতির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করিয়া ইহারা তুমুল তর্কাতর্কি শুরু করেন। জাভা যাত্রার পূর্বে এবং প্রত্যাবর্তনের পর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ইন্ধন যোগাইয়া

এই বিতর্ক ও আলোচনাকে তীব্র ও ব্যাপকতর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেদিন তিনি বিদ্রোহী এই নবীন সাহিত্যিক গোষ্ঠীর তীব্র সমালোচনা করিয়াও তাঁহাদের মহান উদ্দেশ্য ও বিদ্রোহ-প্রবণতাকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন। এ সব কথা আমরা পূর্বখণ্ডেই বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। 'পঞ্চাশোর্ধ্বম' প্রবন্ধেও তিনি সাধারণভাবে এই বিদ্রোহী ও প্রগতিবাদী নবীন সাহিত্যিক গোষ্ঠীকে পুনরায় স্বাগত অভিনন্দন জানাইলেন। তাছাড়া, এই প্রবন্ধে তিনি বিনয়ের সহিত শুধু তাঁহার নিজেরই সাহিত্যকর্ম ও সৃজনীশক্তির সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করিলেন না;—সাধারণভাবে সব সাহিত্যিকেরই সাহিত্যকর্ম ও সৃজনীশক্তি তাঁহাদের আপন-আপন দেশ-কাল-যুগগত সীমায় সীমাবদ্ধ, একথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন। তিনি বলিলেন:

"সাহিত্যের সেই শিথিল শাসনের দিন থেকে আরম্ভ করে গদ্যে পদ্যে আমার লেখা এগিয়ে চলেছে, অবশেষে আজ সত্তর বছরের কাছে এসে পৌঁছলেম। আমার দ্বারা যা করা সম্ভব সমস্ত অভাব ত্রুটি সত্ত্বেও তা করেছি। তবু যতই করি-না কেন আমার শক্তির একটা স্বাভাবিক সীমা আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। কারই বা নেই।

"এই সীমাটি দুই উপকূলের সীমা। একটা আমার নিজের প্রকৃতিগত, আর-একটি আমার সময়ের প্রকৃতিগত। জেনে এবং না-জেনে আমরা একদিকে প্রকাশ করি নিজের স্বভাবকে এবং অন্য দিকে নিজের কালকে। রচনার ভিতর দিয়ে আপন হৃদয়ের যে পরিতৃপ্তি সাধন করা যায় সেখানে কোনো হিসাবের কথা চলে না। যেখানে কালের প্রয়োজন সাধন করি সেখানে হিসাবনিকাশের দায়িত্ব আপনি এসে পড়ে। সেখানে বৈতরণীর পারে চিত্রগুপ্ত খাতা নিয়ে বসে আছেন। ভাষায় ছন্দে নূতন শক্তি এবং ভাবে চিত্তের নূতন প্রসার সাহিত্যে নূতন যুগের অবতারণা করে।···

"কখন কালের পরিবর্তন ঘটে, সব সময়ে ঠিক বুঝতে পারি নি। নূতন ঋতুতে হঠাৎ নূতন ফুল-ফল-ফসলের দাবি এসে পড়ে। যদি তাতে সাড়া দিতে না পারা যায় তবে সেই স্থাবরতাই স্থবিরত্ব প্রমাণ করে তখন কালের কাছ থেকে পারিতোষিকের আশা করা চলে না, তখনই কালের আসন ত্যাগ করবার সময়।"

কবি আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন:

"যাকে বলছি কালের আসন সে চিরকালের আসন নয়। স্থায়ী প্রতিষ্ঠা স্থির থাকা সত্ত্বেও উপস্থিত কালের মহলে ঠাঁইবদলের হুকুম যদি আসে, তবে সেটাকে মানতে হবে। প্রথমটা গোলমাল ঠেকে। নতুন অভ্যাগতের নতুন আকারপ্রকার দেখে তাকে অভ্যর্থনা করতে বাধা লাগে, সহসা বুঝতে পারি নে—সেও এসেছে বর্তমানের শিখর অধিকার করে চিরকালের আসন জয় করে নিতে। একদা সেখানে তারও স্বত্ব স্বীকৃত হবে, গোড়ায় তা মনে করা কঠিন হয় ব'লে এই সন্ধিক্ষণে একটা সংঘাত ঘটতেও পারে।

"মানুষের ইতিহাসে কাল সব সময়ে নূতন ক'রে বাসা বদল করে না। যতক্ষণ

দ্বারে একটা প্রবল বিপ্লবের ধাক্কা না লাগে ততক্ষণ সে খরচ বাঁচাবার চেষ্টায় থাকে, আপন পূর্বদিনের অনুবৃত্তি ক'রে চলে, দীর্ঘকালের অভ্যস্ত রীতিকেই মাল্যচন্দন দিয়ে পূজা করে, অলসভাবে মনে করে সেটা সনাতন। তখন সাহিত্য পুরাতন পথেই পন্য বহন ক'রে চলে, পথনির্মাণের জন্য তার ভাবনা থাকে না। হঠাৎ একদিন পুরাতন বাসায় আর তার সংকুলান হয় না।…

[পঞ্চাশোর্ধ্বম : রবীন্দ্ররচনাবলী : ২৩'শ খণ্ড : পৃঃ ৫১৬]

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি ভালো করিয়া পাঠ করিলে দেখা যায়, সাহিত্য বিচারের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নে এখানে কবি স্পষ্টভাবেই প্রগতিবাদী ও বাস্তববাদী সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গীকেই সমর্থন করিলেন এবং প্রকারান্তরে শাশ্বত ও সনাতনী সাহিত্যিকদের যান্ত্রিক ও পিউরিটান মনোবৃত্তির বিরূপ সমালোচনা করিলেন। কিন্তু কবি প্রগতিবাদী নবীন সাহিত্যিকদের এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিতে চাহিলেন যে, অসংযতভাবে শুধু পুরাতনের নিন্দা করিলেই হয় না, অথবা 'যে-করেই হোক একটা নূতন কিছু সৃষ্টি করা চাই', আকাশ-বাতাস মথিত করিয়া এই আওয়াজ তুলিয়া সাহিত্যে নূতন যুগ সৃষ্টি অথবা তার প্রতিনিধিত্ব করা যায় না। বস্তুতপক্ষে নূতন যুগের বাণী ও ঐতিহাসিক প্রয়োজনটি যে কি তাহা ভালো করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার প্রকাশ ও রূপ দিতে হইবে এবং তবেই তাহা সার্থক সৃষ্টি হইবে, ইহাই কবির মূল বক্তব্য। তিনি বলিলেন :

…"বস্তুত নূতন আগন্তুককেই প্রমাণ করতে হবে, সে নূতন কালের জন্য নূতন অর্ঘ্য সাজিয়ে এনেছে কি না।

"কিন্তু নূতন কালের প্রয়োজনটি ঠিক যে কী সে তার নিজের মুখের আবেদন শুনে বিচার করা চলে না, কারণ প্রয়োজনটি অন্তর্নিহিত।…কালের মান রক্ষা ক'রে চললেই যে কালের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করা হয়, এ কথা বলব না। এমন দেখা গেছে, যাঁরা কালের জন্য সত্য অর্ঘ্য এনে দেন, তাঁরা সেই কালের হাত থেকে বিরুদ্ধ আঘাত পেয়েই সত্যকে সপ্রমাণ করেন।"

তাই তিনি বলিলেন :

…"নবাগত যাঁরা তাঁরা যে-পর্যন্ত নবযুগে নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে নিজেরা প্রতিষ্ঠালাভ না করবেন সে-পর্যন্ত শান্তিহীন সাহিত্য কলুষলিপ্ত হবে। পুরাতনকে অতিক্রম করে নূতনকে অভূতপূর্ব করে তুলবই, এই পণ করে বসে নবসাহিত্যিক যতক্ষণ নিজের মনটাকে ও লেখনীটাকে নিয়ে অত্যন্ত বেশি টানাটানি করতে থাকবেন, ততক্ষণ সেই অতিমাত্র উদ্‌বেজনায় ও আলোড়নে সৃষ্টিকার্য অসম্ভব হয়ে উঠবে।"

সাহিত্যের মহান ঐতিহাসিক দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বলিলেন :

…"বিশেষ যুগের ইচ্ছা, বিশেষ সমাজের ইচ্ছা সেই যুগের সেই সমাজের আত্মরূপসৃষ্টির বীজশক্তি। এই কারণেই যাঁরা রাষ্ট্রিক লোকগুরু তাঁরা রাষ্ট্রীয় মুক্তির ইচ্ছাকে সর্বজনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করতে চেষ্টা করেন, নইলে মুক্তির সাধনা দেশে সত্যরূপ গ্রহণ করে না।

"সাহিত্যে মানুষের ইচ্ছারূপ এমন ক'রে প্রকাশ পায় যাতে সে মনোহর হয়ে ওঠে,

এমন পরিস্ফুট মূর্তি ধরে যাতে সে ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ের চেয়ে প্রত্যয়গম্য হয়। সেই কারণেই সমাজকে সাহিত্য একটি সজীব শক্তি দান করে; যে ইচ্ছা তার শ্রেষ্ঠ ইচ্ছা সাহিত্যযোগে তা শ্রেষ্ঠ ভাষায় ও ভঙ্গীতে দীর্ঘকাল ধরে মানুষের মনে কাজ করতে থাকে এবং সমাজের আত্মসৃষ্টিকে বিশিষ্টতা দান করে।......" [ঐ : পৃঃ ৫১৭-১৯]

সাধারণত কবি ও শিল্পীরা বৃদ্ধবয়সে একটু রক্ষণশীল হইয়া পড়েন। তাঁহারা তাঁহাদের শিল্প ও সাহিত্যকর্ম এবং তাঁহাদের যুগের চিন্তা-ভাবনা ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে যেমন অসাধারণ মমতা ও সুউচ্চ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, তেমনি নূতন কিছু ভাব ও চিন্তাকে স্বীকার করিয়া লইতে ইঁহাদের চিত্তের দৈন্য ও অনৌদার্য প্রকট হইয়া দেখা দেয়। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার, ৭০ বৎসরের মুখে পা দিয়াও রবীন্দ্রনাথের চিত্ত ও মনকে এই জরা ও বার্ধক্য আক্রমণ করিতে পারে নাই। সত্য কথা, কবি অত্যন্ত অভিমানী ছিলেন। আর এ ব্যাপারে তাঁহার মনটিও ছিল খুব স্পর্শচেতন। নবীন সাহিত্যিক গোষ্ঠীর আক্রমণে মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হইতেন কিন্তু নূতনকে তাহার প্রাপ্য আসন ও স্থান করিয়া দিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। এই প্রবন্ধটিই কবিচিত্তের সেই বলিষ্ঠ মহানুভবতার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। অবশ্য কবি মাঝে মাঝে এই নবীন সাহিত্যিকদের কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিয়াছেন কিন্তু সে শুধু তাহাদের মঙ্গলকামনা করিয়াই। তাহার কারণ তিনি তাহাদের কাছে আরও বেশি ও মহান কিছু প্রত্যাশা করিতেন বলিয়াই। কেননা রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এক মহান আশাবাদী ও ভাববাদী কবি। আধুনিক সমাজ-সভ্যতার শত বীভৎসতা ও বিকার সত্ত্বেও তাঁহার মন অন্ধ নৈরাশ্য ও প্রতিক্রিয়ার মুখে পা বাড়ায় নাই। তাই উদীয়মান ও নবীন সাহিত্যিকদের রচনায় সেই মহোত্তম সৃষ্টির পূর্বরাগ শুনিবার প্রত্যাশায় তিনি উন্মুখ ছিলেন। কিন্তু যখন এই নবীন সাহিত্যিকদের রচনায় সেই মহান সৃষ্টির কোন বাণী শুনা গেল না,—যখন এই নবীনদের বিশেষ একটি গোষ্ঠী বাস্তবতার নামে জীবনের পরাজয়, বিকার, ব্যর্থতা, নৈরাশ্য ও যৌন-আবিলতায় বাংলা-সাহিত্যের মানস-সরোবরকে দূষিত ও কলুষিত করিতে উদ্যত হইল, তখনই কবি তাহাদের কঠোর ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করিয়াছেন। কিন্তু তবুও তিনি নবীনদের উপরই ভরসা করিয়াছেন। কবি চিরদিনই চিরনবীনেরই জয়গান গাহিয়াছেন। তাই কলিকাতায় বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে তাঁহার লিখিত-ভাষণের উপসংহারেও বাংলা সাহিত্যের এই নবীন আগন্তুকদের তাঁহার আন্তরিক আশীর্বাদ জানাইয়া বলিলেন :

"বঙ্কিম যে-যুগ প্রবর্তন করেছেন আমার বাস সেই যুগেই। সেই যুগকে তার সৃষ্টির উপকরণ জোগানো এ-পর্যন্ত আমার কাজ ছিল। য়ুরোপের যুগান্তর-ঘোষণার প্রতিধ্বনি ক'রে কেউ কেউ বলছেন, আমাদের সেই যুগেরও অবসান হয়েছে। কথাটা খাঁটি না হতেও পারে। যুগান্তরের আরম্ভে প্রদোষান্ধকারে তাকে নিশ্চিন্ত করে চিনতে বিলম্ব ঘটে। কিন্তু, সংবাদটা যদি সত্যই হয় তবে এই যুগসন্ধ্যার যাঁরা অগ্রদূত তাঁদের ঘোষণা-বাণীতে শুকতারার সুরম্য দীপ্তি ও প্রত্যুষের সুনির্মল শান্তি আসুক; নবযুগের প্রতিভা আপন পরিপূর্ণতার দ্বারাই আপনাকে সার্থক করুক।...

"পথ চলতে চলতে মর্তলীলার প্রান্তবর্তী ক্লান্ত পথিকের এই নিবেদনপত্র সসংকোচে 'তরুণ সভায়' প্রেরণ করলেম। এই কালের যাঁরা অগ্রণী তাঁদের কৃতার্থতা একান্তমনে কামনা করি। নবজীবনের অমৃতপাত্র যদি সত্যই তাঁরা পূর্ণ ক'রে এনে থাকেন, আমাদের কালের ভাণ্ড আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে যদি রিক্ত হয়েই থাকে, আমাদের দিনের ছন্দ যদি এখনকার দিনের সঙ্গে নাই মেলে, তবে তার যাথার্থ্য নূতন কাল সহজেই প্রমাণ করবেন—কোনো হিংস্রনীতির প্রয়োজন হবে না। নিজের আয়ুদৈর্ঘ্যের অপরাধের জন্য আমি দায়ী নই; তবে সান্ত্বনার কথা এই যে, সমাপ্তির জন্য বিলম্বিত অনাবশ্যক। সাহিত্যে পঞ্চাশোধর্বম্ নিজের তিরোধানের বন নিজেই সৃষ্টি করে, তাকে কর্কশকণ্ঠে তাড়না ক'রে বনে পাঠাতে হয় না।"

[ঐ : পৃঃ ৫১৯ ২০]

কিন্তু কলিকাতায় সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্যোক্তারা কবির এই লিখিত ভাষণে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা কবির নিকট বড়ো বেশী প্রত্যাশা করিতেন; তাঁহাদের অভিমানের কারণ, রবীন্দ্রনাথ কেন সশরীরে সম্মেলনে যোগদান করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন না। অবশ্য সম্মেলনের শেষদিন (৪ঠা ফেব্রুয়ারী) স্বর্ণকুমারী দেবী কবির এই ভাষণটি পাঠ করিয়া শুনান।

পরদিনই,—৫ই ফেব্রুয়ারী কবি শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করেন। মনে হয়, সাহিত্য-সম্মেলনের ঘটনাটি নানাভাবে পল্লবিত হইয়া তাঁহার কানে উঠে। কবি বড়ো অভিমানী ছিলেন। কয়েকদিন পর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে এক পত্রে (১১ই ফেব্রুয়ারি) স্বদেশবাসীর আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া লেখেন :

"বরোদার পথে আহমদাবাদে শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হয়। যখন নিশ্চয় বুঝলুম কোনোমতে সাহিত্যসম্মেলনে এ শরীর নিয়ে পৌঁছতে পারব না তখন বহু কষ্টে ডাক্তারের নিষেধ অমান্য ক'রে একটা লেখা অবনের মারফত, সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছিলেম। দেশের লোক আমাকে সহজে ক্ষমা করেন না জেনেই এই কষ্টসাধ্য কাজ করতে হয়েছিল। তাও ব্যর্থ হল—ক্ষমা পাইনি। শুনলুম ডাক-পেয়াদার মারফত না গিয়ে অবনের মারফতে লেখাটা যাওয়াতে তাঁরা অসম্মানের ক্ষোভে লেখাটার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। এসকল বিষয়ে আমার বুদ্ধির ত্রুটি আছে, কিন্তু কাউকে অসম্মান করবার কারণ ও ইচ্ছা আমার ছিল না। এত ক্লেশ করে আমার জীবনে আর কোনোদিন লিখি নি। এর থেকে প্রমাণ হয় স্বদেশবাসীকে আমি যমদূতের চেয়ে বেশি ভয় করতে আরম্ভ করেছি। যতটা সম্ভব দূরে থাকবারই চেষ্টা করব।" [প্রবাসী : ১৩৪৮ আষাঢ় : পৃঃ ২৭৬]

কবি ফিরিয়াই শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে (৬ই ফেব্রুয়ারি) যোগদান করেন। এইবারের উৎসবে এলমহার্স্ট সপরিবারে যোগদান করেন। মেলার শেষভাগে (১০ই ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশের সমবায় সমিতির প্রতিনিধি ও কর্মীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করিলেন বাংলার লাট স্ট্যানলি জ্যাকসন্। রবীন্দ্রজীবনী-কার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিতেছেন, "বিশ্বভারতীর কোনো অনুষ্ঠানে গবর্নরকে নিমন্ত্রণ এই প্রথম ; এই ব্যাপার লইয়া কাগজপত্রে রবীন্দ্রনাথকে

সমালোচনার ভাগী হইতে হয়, অথচ এসব বিষয়ে তাঁহার প্রত্যক্ষ কোনো যোগ ছিল না।”

স্মরণ রাখা দরকার, লাহোর কংগ্রেস ও ২৬শে জানুয়ারি ‘স্বাধীনতা-দিবস’ উদ্‌যাপনের পর সারা দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও রাজপুরুষদের সম্পর্কে এক তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষের আগুন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে থাকে। এমন দিনে লাটসাহেবকে দিয়া সম্মেলনের উদ্বোধনের ব্যাপারটি লোকে ভালো চোখে দেখিবে না, ইহা খুবই স্বাভাবিক। মনে হয় কবির অনুপস্থিতিতে সমবায় আন্দোলনের সরকারী কর্ম-কর্তাদের আগ্রহাতিশয্যে লাটসাহেবকে দিয়া সম্মেলন উদ্বোধনের প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। কিন্তু তবুও এ ব্যাপারে বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতনের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব একেবারেই ছিল না অথবা কবির বিনা সম্মতিতেই ব্যাপারটি ঘটিয়াছিল, এ কথা বলা যায় না। আসলে এ সব ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের বাস্তব জ্ঞান অল্পই ছিল বলিয়া মনে হয়। তাছাড়া বিশ্বভারতীর আর্থিক সমস্যা তখন তাঁহাকে প্রায় পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। শুধু এই ঘটনাটিই নয়,—ইতিপূর্বে এবং ইহার পরেও লাটসাহেব বা রাজপুরুষেরা শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের আগ্রহ প্রকাশ করিলে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে কবিকে তাহাতে সম্মতি দিতে হয়। আর তার অবশ্যম্ভাবী দুর্ভোগও কবিকে পোহাইতে হয়।

এই দিন সম্মেলনে কবি তাঁহার ভাষণের শুরুতেই শ্রীনিকেতন পল্লীপুনর্গঠন কেন্দ্রের মূল আদর্শ ও বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করিয়া অবশেষে ইহার বর্তমান সমস্যার বিভিন্নদিকগুলি আলোচনা করিতে গিয়া বলেন :

“আগের দিনে আমাদের গ্রামগুলি নিজেদের মঙ্গলের জন্য আমাদের মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিত। কিন্তু ফলে, গৌণভাবে কর নির্ধারণের মাত্রা এরূপ বাড়িয়া যাইত যে, উহা প্রায়ই অতিরিক্ত হইয়া পড়িত। সেই দিনে সম্পত্তি ব্যক্তিগত অধিকারের গণ্ডী সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে সমাজেরই অধিকারভুক্ত ছিল। সুতরাং সমাজসেবা ও সামাজিক মর্যাদার আদান-প্রদানের জন্য গ্রহীতা দাতার নিকট হইতে দান গ্রহণের দরুণ অবমাননা বোধ করিতে পারিতেন না। কিন্তু বর্তমানে সেই অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে এবং এক্ষণে যাঁহারা সমাজকে সাহায্য করিতে সর্বাপেক্ষা যোগ্য, তাঁহারা সহরের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং পল্লীর মঙ্গলসাধনের স্বাভাবিক ধারা এমন একটি ধারায় প্রবাহিত হইতেছে, যাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ। আজিকার দিনে ধনসম্পত্তি এমন ব্যক্তিগত রূপ ধারণ করিয়াছে যে, মাঝে মাঝে উহা হইতে যে সাহায্য পাওয়া যায়, তাহাতে উহার উদ্দেশ্যকে হীন এবং দাতাকে দানশীলতার বিলাসিতার মধ্যে পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে।

“কাজেই গ্রামবাসীদিগকে এক্ষণে বর্তমান যুগের ভাবধারার সঙ্গে নিজেদের মন যুক্ত এবং উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে, নতুবা জীবন-সংগ্রামে তাহাদিগকে পরাজিত হইতে হইবে। আমরা আমাদের চতুর্দিকে আজ যে-সমস্ত পল্লী দেখিতে পাইতেছি, উহার চতুর্দিকে আজ সন্ধ্যার ম্লান ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে এবং জীবনধারণের আনন্দকে বিদায় দিয়া সমস্ত প্রকারের আনন্দের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সমতাকে পর্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছে।

কবি আরও বলেন :

"আমাদের ব্রত হইতেছে, ঐ সমস্ত লোককে উৎসাহ দেওয়া, তাহাদের আত্ম-বিশ্বাসকে বাড়াইয়া তোলা, এবং সুবিবেচনার দ্বারা চালিত হইয়া নিজেদের ভাগ্য গড়িয়া তুলিবার জন্য নিজেদের বাহুবলকে শক্তিসম্পন্ন করা। সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন জীবনকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য, নগর ও পল্লীর বৈষম্যকে দূর করিবার জন্য এবং শ্রেণী ও জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ ঘুচাইবার জন্য যে দুশ্চর ব্রত আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তাহার মধ্যে আমরা কোন পক্ষপাতিত্ব কিম্বা কোন শত্রুতার ভাব পোষণ করি না—যিনিই তাঁহার দুই বাহু আমাদের দিকে প্রসারিত করিয়া দিন না কেন, আমরা সাগ্রহে তাঁহার সেই ভ্রাতৃত্বকে বরণ করিয়া লইব। আমাদের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে এই যে, প্রতিদিনের জীবনযাত্রার পথে যে বাধা-বিঘ্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, সেগুলিকে আমরা আপোষ করিয়া লইব। কারণ মানব সভ্যতা যদি বাঁচিয়া থাকিতে চায়, তবে উহার ক্ষতগুলিকে আরোগ্য করিতে হইবে।

উপসংহারে কবি তাঁহার মহান প্রচেষ্টায় সরকারী সাহায্যের প্রত্যাশা ও দাবী জানাইয়া—কতকটা গভর্নর জ্যাকসনকেই উদ্দেশ করিয়া বলেন :

"আমি যথাযথভাবে যে কার্য আরম্ভ করিয়াছি, উহার ভবিষ্যৎ পরিণতি অত্যন্ত আশাপ্রদ বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। এই জন্য গভর্নমেণ্টের নিকট হইতেও আমরা সাহায্য পাইবার যোগ্য,—ইহাও আমি দাবী করিতে পারি।" —ফ্রী প্রেস্

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৯শে মাঘ ১৩৩৬, ১২ই ফেব্রু, ১৯৩০]

ধূর্ত জ্যাকসন্ এমন একটি সুযোগের অপব্যবহার করিলেন না। তদুত্তরে তিনি শ্রীনিকেতন পল্লীপুনর্গঠন কেন্দ্রে পাঁচ হাজার টাকা সরকারী সাহায্য প্রদানের আশ্বাস দিয়া বলেন :

"আপনার প্রচেষ্টার ফল বিষয়ে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনি যে আশা পোষণ করেন, আমিও তাহাতে একমত। আপনি গভর্নমেণ্টের নিকট যে সহানুভূতির জন্য অনুরোধ করিয়াছেন কার্যতঃ গভর্নমেণ্ট তাহা প্রদর্শন করিতে পারিবেন—এইজন্য আমি আনন্দিত। এখানে যে কার্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা সহানুভূতি ও উৎসাহ পাইবার যোগ্য। শ্রমশিল্প ও কৃষিবিভাগের মান্যবর মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী পাঁচ হাজার টাকা সরকারী সাহায্যপ্রদান করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।" [ঐ]

এই ছিল ইংরাজ সরকারের সাহায্যের নমুনা!

এই সামান্য অর্থসাহায্যের জন্য গভর্নরকে দিয়া সম্মেলন উদ্বোধনের কী প্রয়োজন ছিল, একথা লোকে ভাবিয়া পাইল না। সম্ভবত কবি স্বয়ং ইহা আশা করেন নাই—হয়ত ইহার জন্য তীব্র আত্মধিক্কার ও অনুশোচনা ভোগ করিয়াছিলেন। কেননা তিনি এবার লক্ষ্ণৌ ও কানপুরেই প্রায় ২০ হাজার টাকা সাহায্য পাইয়াছিলেন। মনে হয় বিশ্বভারতীর সেই নিদারুণ অর্থসংকটের দিনে একটা বেশ মোটা অঙ্কের সরকারী সাহায্যের আশ্বাস দিয়া সমবায় আন্দোলনের কর্মকর্তারা লাটসাহেবকে দিয়া সম্মেলন উদ্বোধনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন আর কবির পরামর্শদাতা বন্ধুরা হয়ত কবিকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া এই প্রস্তাবে তাঁহার সম্মতি আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কবি যদিও এ ব্যাপারে সরকারী সাহায্য গ্রহণে দূষণীয় কিছু দেখেন নাই তবুও

কতকটা নীতিগতভাবেই তিনি পল্লীপুনর্গঠন কার্যে সরকারী সাহায্য বা আনুকূল্য লাভের বিরোধী ছিলেন। কবি আশা করিয়াছিলেন, দেশের শিক্ষিত ও বিত্তবানেরা —বিশেষত নেতারা তাঁহার এই কর্মপ্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিতে আগাইয়া আসিবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবিকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে নিরাশ হইতে হয়। এসব কথা পূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি।

আইন অমান্য আন্দোলন

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-৩৪) এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

এই আন্দোলন সারা দেশব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের যে তীব্র গতিবেগ ও উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছে,—সুদূর পল্লীঅঞ্চলের ও সীমান্ত প্রদেশের মানুষের মনে স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তাহাদের সংগ্রামের ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়াছে, ইতিপূর্বে তেমনটি আর দেখা যায় নাই। এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের অধিনায়কত্ব করিয়াছেন মহাত্মা গান্ধী।

চৌরি-চাওরার ঘটনার পর প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আহ্বানের ব্যাপারে গান্ধীজী অত্যন্ত সতর্ক হইয়া যান। কিন্তু ক্রমে ইংরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যখন অনিবার্য হইয়া উঠে, দেশের চতুর্দিকে যখন স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ ও সংগ্রাম-সংঘর্ষ দেখা দিতে থাকে তখনই তিনি সংগ্রামের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া সকলের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গান্ধীজী অত্যন্ত দৃঢ়হস্তে এবং খুবই সুপরিকল্পিত উপায়ে আন্দোলনকে তাঁহার ভাবাদর্শ অনুযায়ী অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পথে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু গান্ধীজীর কঠিন সতর্কতা সত্ত্বেও আন্দোলন তাহার ইতিহাস নির্দেশিত গতিপথ সৃষ্টি করিয়া লইতে উদ্যত হয়। আর তখনই 'আপসহীন গান্ধী' সংগ্রাম স্থগিত রাখিয়া বার বার আপস করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন। এই কারণেই 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি' ও 'পুণা প্যাক্ট',—এই কারণেই আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া তিনি কাউন্সিল নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সম্মতি দিয়াছেন। কিন্তু ইহার জন্য শুধু গান্ধীজীর স্ববিরোধিতাই দায়ী নয় ;—বস্তুত এই স্ববিরোধিতা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতা ও শক্তির মধ্যেই—কংগ্রেস নেতাদের শ্রেণীচরিত্রের মধ্যেই।

লাহোর কংগ্রেসে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। সত্য কথা, কংগ্রেসের কাউন্সিল বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল এবং ভবিষ্যতে আইন অমান্য আন্দোলন ও ট্যাক্স বন্ধেরও ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সংগ্রামের কোন কার্যসূচী গৃহীত হয় নাই। সংগ্রামের সুস্পষ্ট কোন রাজনীতিক পরিপ্রেক্ষিতও ছিল না নেতাদের সম্মুখে।

সভাপতি জওহরলাল নেহরু স্বয়ং প্রখ্যাত সমাজতন্ত্রবাদী ও একজন সর্বজনপ্রিয়

বামপন্থী নেতা। লাহোর কংগ্রেসে সভাপতির অভিভাষণে তিনি প্রকাশ্য গণ-সংগ্রামের আহ্বান জানাইলেন অথচ ঐ কংগ্রেসে আসন্ন সংগ্রামের বিস্তারিত কার্যসূচী তো দূরের কথা,—ন্যূনতম একটি কর্মসূচীও তিনি উপস্থাপিত করিতে পারিলেন না, ইহাই বিস্ময়ের কথা। কী ভাবে যে সংগ্রাম শুরু করা যায়, তিনি তখনও নিজেই তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছিলেন না,—একথা পরে তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :

"ভবিষ্যৎ তখনও অনিশ্চিত। কংগ্রেসের উৎসাহ ও উদ্দীপনা সত্ত্বেও, দেশ কি ভাবে সাড়া দিবে সে সম্বন্ধে কাহারও কোন ধারণা ছিল না। আমরা তো তরী ডুবাইয়া দিয়া সম্মুখে চলিয়াছি, কিন্তু কোন্ অপরিচিত অজানা রাজ্যে, কে জানে!"… [আত্মচরিত : পৃঃ ২১৮]

বলা বাহুল্য, এই উক্তি নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির উপযুক্ত নহে। মার্কসবাদে বিশ্বাসী জওহরলালের পক্ষে জাতীয় আন্দোলনের ন্যূনতম কার্যসূচী উদ্ভাবন ও পেশ করা মোটেই শক্ত ছিল না। আসলে তিনি জানিতেন, কংগ্রেসে কতকটা গান্ধীজীর আনুকূল্যে ও অনুগ্রহে তিনি সভাপতি—যে-কংগ্রেস নেতৃত্বে গান্ধীজীর অসীম প্রভাব ও প্রতিপত্তি, সেখানে গান্ধীজী যাহা বলিবেন তাহাই কংগ্রেসে গৃহীত হইবে ; তিনি যাহা অনুমোদন করিবেন না কংগ্রেসে তাহা অনুমোদিত হইবে না। তাছাড়া জওহরলালের চারিত্রিক ও মানসিক গঠনপ্রকৃতির মধ্যে যে স্ববিরোধিতা ছিল তাহা চিরদিনই তাঁহার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গ্রহণের পথে অন্তরায়স্বরূপ হইয়াছে। মার্কসবাদ ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-দীক্ষায় তাঁহার মানসিক বিকাশ ঘটিয়াছিল এই কারণেই মৌল আদর্শ ও রাজনীতিগত প্রশ্নে তিনি গান্ধীজীর সহিত একমত হইতে পারিতেন না অথচ গান্ধীজীর বিরোধিতা করিবার মতও তাঁহার সেই মানসিক দৃঢ়তা ছিল না। তাহার অন্যতম প্রধান কারণ হয়ত এই, তিনি গান্ধীজীর অপরিসীম স্নেহ ও প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। তাছাড়া গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে তাঁহার 'মহত্ত্ব'কে অতি নিকট হইতে জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ তাঁহার হইয়াছিল। অথচ তাঁহার যুক্তি ও বিবেকবুদ্ধির তাড়নায় যখন আদর্শ ও নীতিগত প্রশ্নে তিনি প্রত্যক্ষভাবে গান্ধীজীর বিরোধিতার সম্মুখীন হইতেন তখন তাহা করিতে তিনি সক্ষম হন নাই। বস্তুত গান্ধীজীর প্রচন্ড ব্যক্তিত্বের যেন এক সম্মোহনকারী আকর্ষণে তাঁহার সমস্ত যুক্তিবুধি শান্ত ও নিস্তেজভাবে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বসিত। এইসব নানা কারণেই লাহোর কংগ্রেসের পর সেদিন তিনি অসহায়ভাবেই কতকটা গান্ধীজীর মুখের দিকে তাকাইয়াছিলেন,—'তিনি কি বলেন, তিনি কিভাবে সংগ্রাম শুরু করিবার কথা ভাবিতেছেন।'

অথচ লাহোর কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বামপন্থী গোষ্ঠীর একটি অংশ সংক্ষিপ্ত আকারে হইলেও পরিষ্কার এক বলিষ্ঠ সংগ্রাম-নীতির প্রস্তাব পেশ করেন। চূড়ান্ত সংগ্রাম ও পাল্টা-সরকার গঠনের লক্ষ্য ও পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দেশের শ্রমিক, কৃষক ও যুব সংগঠনের সাহায্যে আন্দোলনকে বেগবান করিবার আহ্বান জানাইয়া লাহোরে এক প্রস্তাব আনিলেন। এ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র পরে লিখিয়াছেন :

"On behalf of the Left Wing, a resolution was moved, by the

writer, to the effect the Congress should aim at setting up a parallel Government in the country and to that end, should take in hand the task of organising the workers, peasants and youths. This resolution was also defeated, with the result that though the Congress accepted the goal of complete independence as its objective, no plan was laid down for reaching the goal—nor was any programme of work adopted for the coming year."… [*The Indian Struggle* : p. 174]

সুভাষচন্দ্র ভালোভাবেই জানিতেন, কংগ্রেসে তাঁহাদের সংগ্রামী কর্মসূচী ভোটে পরাজিত হইবে কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি দৃঢ়তার সহিত তাঁহার রাজনীতিক বিশ্বাস ও মতামত কংগ্রেস মঞ্চে ঘোষণা করিতে এতটুকু দ্বিধা করেন নাই। আর জওহরলালের বিরুদ্ধে এই কারণেই সুভাষচন্দ্র ও অপরাপর বামপন্থী নেতাদের গুরুতর অভিযোগ। যে-কংগ্রেস নেতৃবর্গের মধ্যে গান্ধীজীর এতখানি প্রভাব-প্রতিপত্তি, যেখানে গান্ধীজীর অঙ্গুলিহেলনেই কংগ্রেসের মূলনীতি ও সব কিছু নির্ধারিত হইবে, সেখানে কংগ্রেস সভাপতির মত গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করা তাঁহার উচিত হয় নাই, ইহাই তাঁহাদের বক্তব্য। বস্তুত এর মধ্যে তাঁহারা গান্ধীজীর কৌশলের জয়ই লক্ষ্য করিলেন। কেননা জওহরলালকে তাঁহাদের মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী শক্তি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িবে। গান্ধীজী এই উদ্দেশ্যেই কংগ্রেসের সভাপতির পদে জওহরলালের নাম প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। সুভাষচন্দ্রের মতে :

…"Therefore, for the Mahatma it was essential that he should win over Pandit Jawaharlal Nehru if he wanted to beat down the Left Wing opposition and regain his former undisputed supremacy over the Congress. The Left Wingers did not like the idea that one of their most outstanding spokesmen should accept the Presidentship of the Lahore Congress, because it was clear that the Congress would be dominated by the Mahatma and the President would be a mere dummy. They were of opinion that a Left Wing leader should accept the Presidentship only when he was in a position to have his programme adopted by the Congress. But the Mahatma took a clever step in supporting the candidature of Pandit Jawaharlal Nehru and his election as President opened a new chapter in his public career, Since then, Pandit J. L. Nehru has been a consistent and unfailing supporter of the Mahatma."

[*The Indian Struggle* : pp. 169-70]

জওহরলালের ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনা যতই প্রগতিশীল হউক না কেন, বস্তুতপক্ষে সুভাষচন্দ্রের এই অভিযোগের ভিত্তি খণ্ডন করিবার মত তিনি তাঁহার পরবর্তী আচরণ ও কার্যকলাপে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য করেন কাজ নাই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, লাহোর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মনোনয়নের সময় গান্ধীজীর ইচ্ছানুসারেই সুভাষচন্দ্র ও শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের নাম বাদ পড়ে। সুভাষচন্দ্র প্রমুখেরা ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের ব্যাপারে মনোনয়নের পরিবর্তে নির্বাচন দাবী করিয়াছিলেন,—তাহাও গৃহীত হয় নাই। আর এর কোন ক্ষেত্রেই কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে জওহরলাল তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি খাটাইতে পারেন নাই এবং এই সব ব্যাপারের জন্য তিনি তাঁহার মানসিক উদ্বেগ কিংবা অসন্তোষও কংগ্রেসে প্রকাশ করেন নাই। অথচ তিনি যে শুধু গান্ধীজীর ইচ্ছা ও অনুগ্রহেই সভাপতি হইয়াছিলেন তাহা নহে। ইতিমধ্যেই দেশের তরুণ-যুবকসম্প্রদায় ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে তিনি অবিসম্বাদী প্রিয় নেতা হিসাবে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থানাধিকার করিয়াছিলেন। স্মরণ রাখা দরকার, লাহোর কংগ্রেসের অল্প কিছুদিন পূর্বে নাগপুরে নিঃ ভাঃ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং এই প্রশ্ন হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, যেখানে ওয়ার্কিং কমিটি হইতে তাঁহার সমস্ত বামপন্থী সাথীদের বাদ দেওয়া হইয়াছে সেখানে তিনি কী আশা ও কিসের মোহে কংগ্রেস সভাপতিপদের দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হইলেন ?

কিন্তু জওহরলালেরও আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য আছে। এ সম্পর্কে তিনি স্বয়ং তাঁহার আত্মচরিতে সেদিনের তাঁহার চিন্তা-ভাবনার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন :

…"কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে একই ব্যক্তির পক্ষে জাতীয় কংগ্রেসে ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে যুগপৎ সভাপতিত্ব করা এক অনন্যসাধারণ ঘটনা। আমার আশা ছিল যে, যোগসূত্ররূপে আমি এই উভয় প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর ঘনিষ্ঠ করিব—জাতীয় কংগ্রেস অধিকতর সমাজতান্ত্রিক এবং অধিকতর গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে এবং জাতীয় সংঘর্ষের জন্য শ্রমিকদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া তুলিবে।

"কিন্তু সম্ভবতঃ এ আশা নিষ্ফল, কেননা, জাতীয়তাবাদ নিজেকে বিসর্জন দিয়াই সমাজতান্ত্রিক বা সর্বহারাদের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। জাতীয় কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী বুর্জোয়া হইলেও ইহাই দেশের বৈপ্লবিক শক্তির প্রতিনিধি। অতএব শ্রমিকশক্তি নিজেদের মতবাদ ও স্বাতন্ত্র্য সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়াও ইহার সহিত সহযোগিতা ও ইহাকে সাহায্য করিতে পারে। আমি আশা করিয়াছিলাম যে, প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কার্যপদ্ধতির গতিপথে কংগ্রেস অধিকতর চরম মতবাদ গ্রহণ করিয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সম্মুখীন হইবে। গত কয়েক বৎসরে কংগ্রেস কৃষক ও পল্লীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। যদি এই গতি অব্যাহত থাকে তাহা হইলে একদিন কংগ্রেস বিরাট কৃষক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে, কিম্বা অন্ততঃপক্ষে কৃষকেরাও কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।"… [আত্মচরিত : পৃঃ ২১৪]

কিন্তু এই স্বচ্ছ চেতনা থাকা সত্ত্বেও তিনি দেশের আভ্যন্তরীণ প্রশ্নে কংগ্রেস রাজনীতির উল্লেখযোগ্য তেমন কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারেন নাই। কংগ্রেস রাজনীতির মধ্যে এই পরিবর্তন আনিতে হইলে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে উদীয়মান ও প্রগতিশীলদের লইয়া যে শক্তিশালী দল বা জোট্ গঠনের প্রয়োজন ছিল সে ব্যাপারে তিনি সবিশেষ গুরুত্ব দেন নাই। বস্তুতপক্ষে তিনি তাঁহার সমগোত্রীয় সাথীদের

অপেক্ষা গান্ধীজীর অনুগ্রহ ও আনুকূল্যলাভের উপরই অধিক নির্ভর করিতে-ছিলেন। কখন কখনও তিনি ভাবিতেন—অন্তত এই রকম একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন যে, গান্ধীজীর সহিত আলাপআলোচনা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার স্বমতে আনিতে না পারিলেও অন্তত অধিকতর প্রগতিশীল পথে তাঁহাকে আনিতে সক্ষম হইবেন এবং শেষপর্যন্ত তাহা দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। কিন্তু লাহোর কংগ্রেস হইতে করাচী কংগ্রেস (১৯২৯—মার্চ ১৯৩১)—এই দীর্ঘকালের মধ্যে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে জওহরলালের কোনই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নাই; আসলে গান্ধীজীই কংগ্রেসের সর্বাধিনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। এই কারণেই দেখা যায়, 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি'-র মত তিক্ত-বটিকা বা গরল কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তাঁহাকে গলাধঃকরণ করিতে হইয়াছে। পরবর্তীকালেও 'পুণাচুক্তি'-র সময় এবং বেশ কিছুকাল পরে গান্ধীজী কর্তৃক আন্দোলন প্রত্যাহার ও কাউন্সিল প্রবেশ অনুমোদন লাভ করিলে (১৯৩৪) অত্যন্ত ক্ষোভ ও মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে তাঁহাকে তাহা মানিয়া লইতে দেখা যায়।

পক্ষান্তরে গান্ধীজী ও জওহরলালের প্রতি অভিযোগ করিয়াই সুভাষচন্দ্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য শেষ হয় না। লাহোর কংগ্রেসের সমাপ্তির মুখে তিনি 'Congress Democratic Party' নামে একটি নূতন দল গঠন করার কথা ঘোষণা করেন। আসন্ন সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহারা কংগ্রেস ও সকল সংগ্রামীদলের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া উহাতে অংশ গ্রহণের প্রতিশ্রুতির কথা ঘোষণা করিলেও সংগ্রামের বিস্তারিত কার্যসূচী তাঁহারা কংগ্রেসে বা দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই, আর তাহাতে তাঁহার কোন বাধাও ছিল না।

এইকালে সুভাষচন্দ্র ও বামপন্থীরা গান্ধীজীর 'কূট-কৌশলে'র বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু গান্ধীজীর জীবনদর্শন ও ভাবাদর্শের দিক হইতে বিচার করিলে তাঁহার পক্ষেও অজস্র কথা বলিবার থাকিয়া যায়। বস্তুতপক্ষে, ১৯২৭ সাল হইতেই তিনি কংগ্রেসের অভ্যন্তরে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বামপন্থীদের ক্রমবর্ধমান প্রসার ও প্রভাব লক্ষ্য করিয়া মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিতে থাকেন। তাছাড়া এই সময় হইতেই যুব আন্দোলন, ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘট এবং সন্ত্রাসবাদী ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রসার লক্ষ্য করিয়া তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। কেননা দেশের বামপন্থী শক্তিগুলির নিকট এইসবের তাৎপর্য যতই গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন 'সত্য ও অহিংসা'র সাধক গান্ধীজীর পক্ষে সত্যই ইহা ততোধিক নিরাশার কথা। তিনি জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ব্যাপক বিস্তারই চাহিতেছিলেন কিন্তু সে-সংগ্রাম হইবে অহিংস সংগ্রাম। তাই সংগ্রামের নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে,—বিশেষত বিপ্লববাদীদের হিংসাত্মক নীতি-কৌশলের সহিত আপস করিতে তিনি রাজী ছিলেন না। তাই লাহোর কংগ্রেসের পর হইতেই গান্ধীজীর অহোরাত্র চিন্তা-ভাবনার বিষয় হয়, কিভাবে দেশের লক্ষ লক্ষ মুক্তিপাগল মানুষের ক্রোধ ও আবেগকে সংহত করিয়া তাহাকে অহিংস সত্যাগ্রহ সংগ্রামের পথে পরিচালিত করা যায়। জানুয়ারির (১৯৩০) মধ্যভাগে গান্ধীজী দেশের বিপ্লববাদী দল ও গোষ্ঠীগুলিকে লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত বিনয়ের সহিত তাঁহার বক্তব্য ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন :

"There is undoubtedly a party of violence in the country. It is as patriotic as the best among us. What is more, it has much sacrifice to its credit. In daring it is not to be surpassed by any of us···I have in my mind that secret, silent, persevering band of young men and women who want to see their country free at any cost. But whilst I admire and adore their patriotism, I have no faith in their method. I am convinced that their methods have cost the country much more than they know or care to admit. But they will listen to no argument, however reasonable it may be, unless they are convinced that there is a programme before the country which requires at least as much sacrifice as the tallest among them is prepared to make. They will not be allured by our speeches, resolutions or even conferences. *Action alone has any appeal for them.* (*Italics.—mine*). This appeal can only form non-violent action which is no other than civil resistance, In my opinion, it and it alone can save the country from impending lawlessness and secret crime. That even civil resistance may fail and may also hasten the lawlessness is no doubt a possibility. But if it fails in its purpose, it will not be civil resistance that will have failed. It will fail, if it does, for want of faith and consequent incapacity in the civil resisters."

[*Mahatma* : Vol. III : p. 6.]

গান্ধীজী তাঁহার মতাদর্শের দিক হইতে দেশবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রস্তুত করিবার জন্য হয়ত আরও কিছু কালক্ষেপ করিতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি তাঁহাকে সংগ্রাম আহ্বান করিতে প্রায় বাধ্য করিয়াছিল। ইংরাজ গভর্নমেণ্টের ক্রমবর্ধমান শোষণ ও নির্যাতন তাঁহাকে পুনরায় ক্ষুব্ধ ও অশান্ত করিয়া তুলিল। তাছাড়া দেশের মুক্তিপাগল যুবকেরাও আর কোন কথা শুনিতে রাজি ছিল না ;—তাহারা Action বা সংগ্রামের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সংগ্রামের ডাক দিয়া গান্ধীজী সকলের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বস্তুত তিনি সংগ্রামের সূচনা করিয়া দিয়াই সংগ্রামকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিলেন। তাছাড়া নেহরু প্রমুখ বামপন্থী নেতাদেরও এইটুকু বুঝিবার অবসর দিলেন যে, 'তাঁহার মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইয়াছে এবং স্থানবিশেষে আকস্মিক হিংসার জন্য আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিবার প্রয়োজন নাই।'

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর গান্ধীজী সংগ্রামের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন অথচ এবারে গান্ধীজী কিন্তু আন্তরিকভাবে সংগ্রাম-সংঘর্ষ চাহেন নাই এবং উহা এড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

দেশের স্বাধীনতার দাবীতে কিংবা আশু দাবীগুলির প্রশ্নেও তিনি ইংরাজের সহিত আপস-আলোচনার জন্য বার বার অগ্রণী হইয়াছেন। ইহা তাঁহার সত্যাগ্রহ

নীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বলিয়া তিনি দাবী করিতেন। তাই স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের পর শেষমুহূর্তেও তিনি আপস-আলোচনার চেষ্টা করিয়া বড়লাটের উদ্দেশে এগার-দফা দাবী সম্বলিত এক আবেদন করিলেন (৩১শে জানুয়ারি—১৯৩০)। ঐ আবেদনে তিনি একথাও জানাইতে দ্বিধা করিলেন না যে, কংগ্রেসের ঘোষিত লক্ষ্য পূর্ণস্বাধীনতার পরিবর্তে আপাতত ঐ এগার দফা দাবী-সম্বলিত 'স্বাধীনতার সারাংশ' (বা Substance of Independence) পাইলেই তিনি আইন অমান্য আন্দোলন হইতে নিরস্ত হইবেন। তাঁহার ঐ এগার দফা দাবীগুলি সংক্ষেপে ছিল এই ঃ (১) সম্পূর্ণ মাদকদ্রব্য বর্জন ; (২) টাকার বিনিময় মূল্য (exchange rate) ১ শিলিং ৪ পেন্স নির্ধারণ করা ; (৩) শতকরা ৫০% ভূমিরাজস্ব হ্রাস ; (৪) লবণ শুল্ক রদ ; (৫) সামরিক খাতে শতকরা ৫০% ভাগ ব্যয় হ্রাস ; (৬) সিবিল সার্ভিসে নিযুক্ত কর্মচারীদের অর্ধেক বেতন হ্রাস ; (৭) বিদেশী বস্ত্রের উপর রক্ষণশুল্ক ; (৮) ভারতীয় জাহাজের স্বার্থে Coastal Traffic Reservation Bill-এর আইন প্রণয়ন ; (৯) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান এবং ফাঁসির আসামীদের প্রাণদণ্ডাদেশ মকুব ; (১০) সি. আই. ডি. পুলিশ-এর অবলোপ ; (১১) আত্মরক্ষার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র রাখার বৈধকরণ, (জনপ্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাধীনে) ইত্যাদি।

গান্ধীজীর এই বিবৃতিতে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বামপন্থী নেতারা বিমূঢ় ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। লাহোর কংগ্রেসে যিনি 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র প্রস্তাব আনিলেন, এই অল্পসময়ের মধ্যে তিনিই আবার 'স্বাধীনতার সারাংশে'র প্রস্তাব কি করিয়া উত্থাপন করিতে পারেন, উহাই সকলের পরম বিস্ময়। গান্ধীজীর এই অসংগতি ও স্ববিরোধিতায় প্রায় সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, অধিকাংশ পত্র-পত্রিকায় ইহার তীব্র সমালোচনা চলিল। গান্ধীজী স্বয়ং এই অসংগতির কথা স্বীকার করিয়াও বলেন যে, স্বাধীনতার রূপ দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট নহে ;—ঐ এগার দফা দাবীর মধ্যেই স্বাধীনতার একটা বাস্তব প্রতীকচিত্র দেশবাসীর নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। তিনি বলিলেন :

…"Independence means at least those eleven points, if it means anything at all to the masses. Mere withdrawal of the English is not independance. By mentioning the eleven points I have given a body in part to the illusive word independence."

লক্ষ্য করিবার বিষয়, কংগ্রেসের মডারেট নেতারা এতকাল যে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের দাবী করিয়া আসিতেছিলেন, গান্ধীজীর ঐ এগারদফা দাবীতে তাহা অপেক্ষাও অত্যন্ত কম দাবী করা হয়। ফলে দেশের চারিদিকে,—বিশেষত বামপন্থী ও প্রগতিশীল মহলে গান্ধীজীরঐ আপস প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ ও ক্ষোভ দেখা দেয়। কিন্তু সংগ্রাম শুরু করার ব্যাপারে প্রবীণ কংগ্রেস নেতারা অসহায়ভাবে গান্ধীজীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন ; বস্তুত আন্তরিকভাবে তাহারাও সংগ্রাম চাহেন নাই। ফেব্রুয়ারি মাসের (১৯৩০) মাঝামাঝি নাগাদ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় একমাত্র অহিংস সত্যাগ্রহে বিশ্বাসী নেতা ও কর্মীদের পরিচালনায় আইন

অমান্য আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অর্থাৎ কার্যত গান্ধীজীর উপরই সব কিছুর নেতৃত্বভার অর্পণ করা হয়।

সহসা 'লবণ' শব্দটি গান্ধীজীর নিকট এক গভীর অর্থবহরূপে প্রতিভাত হয়। ভারতের অগণিত নিরন্ন ও দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে এই লবণ কর এক চরমতম অন্যায় বলিয়া তাঁহার বোধ হয়। এই লবণকর রদের দাবীতেই তিনি আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনার পরিকল্পনা করিতে লাগিলেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারি (১৯৩০) "ইয়ং ইণ্ডিয়া'-য় তিনি লবণ আন্দোলনের একটি কর্মসূচীর পরিকল্পনা ও নির্দেশ দেন। এই আন্দোলন শুরু করার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। প্রথমে তিনি স্বয়ং সবরমতী আশ্রমের কর্মীদের লইয়া আন্দোলন শুরু করার কথা ঘোষণা করেন। তাঁহার বক্তব্য, ইহার ফলে এই সংগ্রামের আদর্শ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জনগণের সমক্ষে এক বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থিত হইবে এবং পরে সারা দেশের জনগণ সংগ্রামের এই আদর্শ অনুসরণ করিতে সক্ষম হইবে।

গান্ধীজীর এই প্রস্তাবেও সকলেই প্রায় হতভম্ব হইয়া গেলেন। লবণকর কি এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, তাহার মূল্যই বা-আর কত;—লবণকর রদ আন্দোলনের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের কি এমন গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে, তাহা কেহই ভাবিয়া উঠিতে পারিলেন না! এ সম্পর্কে জওহরলাল লিখিতেছেন :

"সহসা লবণ শব্দটি অপূর্ব রহস্য ও শক্তিতে মণ্ডিত হইল। লবণকরকে আক্রমণ করিতে হইবে, লবণ আইন ভঙ্গ করিতে হইবে। আমরা হতভম্ব হইলাম। জাতীয় সংঘর্ষের সহিত অতি সাধারণ লবণের সম্পর্ক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। গান্ধীজী 'এগার দফা দাবী' ঘোষণা করায় আরও বিস্ময় বাড়িয়া গেল। যদিও প্রস্তাবগুলি ভাল সন্দেহ নাই, তথাপি যখন আমরা পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলিতেছি, তখন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারমূলক কতকগুলি প্রস্তাবের সার্থকতা কি?"...

[আত্মচরিত : পৃঃ ২২৬]

এইখানে গান্ধীজীর সঙ্গে ভারতের তৎকালীন অন্যান্য নেতাদের পার্থক্য। বলা হইয়া থাকে, সারা দেশ জুড়িয়া এক সর্বাত্মক গণ-সংগ্রাম সূচনা করার তাঁহার যেন এক অত্যাশ্চর্য ও যাদুকরী শক্তি ছিল। গান্ধীজীর সংগ্রামের নীতি-কৌশলের এমনই এক বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি অনায়াসে ভারতের অতিসাধারণ জন-মানুষের চিন্তা-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সংগতি রাখিয়া এমনই এক সংগ্রামী নীতি-কৌশলের উদ্ভাবন করিতেন যাহাতে দেশের অতি সাধারণ মানুষেরাও ব্যাপকভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। 'লবণ আন্দোলন' নাকি তেমনই এক ঐতিহাসিক গণ-সংগ্রাম। কিন্তু লবণ আন্দোলন একটি উপলক্ষ মাত্র। বস্তুত সারা দেশব্যাপী এমনই একটি গণ-সংগ্রামের ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল, এবং দীর্ঘকাল হইতেই উহার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল। এই সংগ্রাম-পদ্ধতি ভারতের জাতীয় বুর্জোয়া চরিত্রের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল। গান্ধীজী নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া খুবই সুকৌশলে এই আন্দোলনের সূচনা করিলেন, ইহাই তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব। অবশ্য এই লবণ আন্দোলন অতি দ্রুত এবং সর্বাত্মক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহণ করিতে থাকে। কিন্তু উপযুক্ত

সংগঠন, পরিকল্পনা ও নেতৃত্বের অভাবে শেষ পর্যন্ত তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যথাস্থানে এই আলোচনায় আসিব।

যাহাই হউক, আপসের শেষ চেষ্টায়, ২রা মার্চ গান্ধীজী রেজিনেল্ড রেনল্ডস্‌-এর মাধ্যমে বড়লাটকে লবণকর রদ ও তাঁহার এগার দফা দাবী মানিয়া লইবার অনুরোধ জানাইয়া এক পত্র দেন। এই ঐতিহাসিক পত্রের উপসংহারে তিনি বড়লাটকে সতর্ক করিয়া পরিষ্কার জানাইয়া দিলেন যে তাঁহার ঐ দাবীগুলি মানিয়া না-লইলে তিনি আন্দোলন শুরু করিতে বাধ্য হইবেন। তিনি লিখিলেন :

…"But if you cannot see your way to deal with these evils, and my letter makes no appeal to your heart, on the eleventh day of this month, I shall proceed with such co-workers of the ashram as I can take, to disregard the provisions of the salt laws. I regard this tax to be the most iniquitious of all from the poor man's standpoint. As the independence movement is essentially for the poorest in the land the beginning will be made with this evil. The wonder is that we have submitted to the cruel monopoly for so long. It is, I know open, to you to frustrate my design by arresting me. I hope that there will be tens of thousands ready, in a disciplined manner, to take up the work after me, and, in the act of disobeying the Salt Act to lay themselves open to the penalties of a law that should never have disfigured the statute book." [*Mahatma* : Vol-III : p. 18]

কিন্তু এই আপস চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। বড়লাট পরিষ্কার জানাইয়া দিলেন, গান্ধী যেখানে দেশের শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত করিবার উদ্যোগ করিতেছেন তখন তাঁহার সহিত কোন আলোচনাই চলিতে পারে না। সুতরাং সংগ্রাম অনিবার্য হইয়া উঠিল।

তারপর শুরু হয় ঐতিহাসিক 'ডাণ্ডী-অভিযান'।

১২ই মার্চ (১৯৩০) প্রাতে গান্ধীজী সবরমতী আশ্রমের ৭৮ জন অনুগামীদের লইয়া ডাণ্ডী অভিমুখে অভিযান শুরু করেন। তাঁহার এই যাত্রাপথে প্রত্যহ সহস্র সহস্র মানুষ তাঁহার দর্শন পাইবার জন্য ভীড় করিয়া আসিতে থাকে। এই সময় গান্ধীজী সমস্ত দেশবাসীর উদ্দেশে সতর্কবাণী করিলেন যে, তিনি জালালপুরে না-পৌঁছান পর্যন্ত তাঁহারা যেন ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করেন। তিনি বলেন যে, কংগ্রেস হইতে তাঁহার উপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে তাঁহার গ্রেপ্তারের পর তাহার অবসান হইবে। ইতিমধ্যে তিনি দেশবাসীকে আইন অমান্য ও পূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত থাকিবার নির্দেশ দেন।

২১শে মার্চ সবরমতীতে আসন্ন সংগ্রামের কার্যসূচী নির্ধারণের জন্য নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয়। উহাতে ওয়ার্কিং কমিটির বিগত অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়া গান্ধীজীর উপর আন্দোলন শুরু ও পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। গান্ধীজী গ্রেপ্তার হইলে কংগ্রেস সভাপতি এবং তিনি

গ্রেপ্তার হইলে তাঁহার পরবর্তী সভাপতি—এইভাবে পর্যায়ক্রমে আন্দোলনের অধিনায়ক মনোনয়নের ব্যবস্থা হয়। প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক কমিটিগুলিকেও অধিনায়ক মনোনয়নের ব্যাপারে অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়।

গান্ধীজী তখন সদলবলে ডাণ্ডীর পথে চলিয়াছেন। যাত্রাপথে বিশ্রামকালে তিনি দিনের পর দিন বক্তৃতা ও বিবৃতি দিয়া সারা দেশের মানুষের মনে প্রচণ্ড উত্তাপ ও উত্তেজনার সঞ্চার করিতে লাগিলেন। ২৭শে মার্চ 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'-য় (*Young India*) তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে এক তীব্র উত্তেজনাময়ী ভাষায় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার আহ্বান জানাইয়া বলিলেন :

..."The present state is an institution which if one knows it, can never evoke loyalty. It is corrupt...It is then the duty of those who have realized the awful evil of the system of India Government to be disloyal to it and actively and openly to preach disloyality. Indeed, loyalty to a state so corrupt is a sin, disloyalty a virtue."

আমেদাবাদে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের পর জওহরলাল ও মতিলাল নেহরু জাম্বুসারে গিয়া গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। জওহরলাল লিখিলেন,—"যষ্টিহাতে সকলের পুরোভাগে তিনি দৃঢ়পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন—তাঁহার মুখমণ্ডল নির্ভীক প্রশান্ত। কি মহিমময় দৃশ্য !"

কিন্তু এ অভিযান শুধু গান্ধীজীরই নয়,—সারা জাতিরই মানস-অভিযান। গান্ধীজীর প্রতি দৃঢ় পদক্ষেপ যেন সারা জাতির পদক্ষেপ ; যাহার লক্ষ্য শুধু ডাণ্ডী নয়,—দিল্লী। ডাণ্ডী শুধু উপলক্ষ্য মাত্র।

৫ই এপ্রিল গান্ধীজী ডাণ্ডী পৌঁছাইলেন। পরদিন সদলবলে তিনি সমুদ্রস্নান করিয়া ডাণ্ডী উপকূল হইতে লবণ সংগ্রহ করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে লবণ আইনভঙ্গের সূচনা করিলেন। ঐদিনই সারা জাতির উদ্দেশে লবণ আইন ভঙ্গ করিবার আহ্বান জানাইয়া তিনি নির্দেশ দেন যে, আপাতত সমগ্র 'জাতীয় সপ্তাহ'ব্যাপী (৬-১৩ই এপ্রিল) এই আন্দোলন চলিবে।

গান্ধীজীর নির্দেশের প্রায় সাথে সাথেই দাবানলের মত সারা দেশে লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলন শুরু হইয়া যায়। বাংলাদেশে সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের নেতৃত্বে একদল সত্যাগ্রহী মহিষবাথানে লবণ আইন ভঙ্গ শুরু করিলেন। কলিকাতায় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত কর্নওয়ালিস স্কোয়ারে প্রকাশ্য জনসভায় নিষিদ্ধ রাজনীতিক পুস্তক পাঠ করিয়া সিডিশন আইনভঙ্গের অভিযোগে গ্রেপ্তার হইলেন (১২ই এপ্রিল)। সাথে সাথে বিদেশী বস্ত্র বয়কট ও মাদকদ্রব্য বর্জন ব্যাপকভাবে শুরু হইয়া যায়। ১৪ই এপ্রিল জওহরলাল গ্রেপ্তার হইলেন। তাঁহার পিতা মতিলাল নেহরু হইলেন কংগ্রেসের পরবর্তী সভাপতি।

গান্ধীজী দেশের নারীদের এই আন্দোলনে পূর্ণশক্তিতে সহযোগিতা ও অংশ গ্রহণের আহ্বান জানাইলেন। (১০ই এপ্রিল ১৯৩০) *Young India*-য় তিনি লিখিলেন :

"The impatience of some sisters to join the fight is to me a healthy sign.…

"In this non-violent warfare, their contribution should be much greater than men's. To call women the weaker sex is a libel, it is man's injustice to woman…If by strength is meant moral power, then woman is immeasurably man's superior."…

এইভাবে গান্ধীজী আন্দোলনের সর্বাত্মক প্রসারতা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, ইংরাজ গভর্নমেণ্ট আন্দোলনের প্রথম দিকে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার বা কোনরূপ বাধা দেয় নাই। দ্বৈপায়ন মনোবৃত্তির সীমাহীন দম্ভে ইংরাজ রাজপুরুষেরা সেদিন ঐ ছোটখাট অর্ধনগ্ন মানুষটির চরমপত্র ও সংগ্রাম পরিকল্পনাকে 'পাগলামী' বলিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিয়াছিল। তাহারা ঘুণাক্ষরেও অনুমান করিতে পারে নাই, তাঁহার এই 'পাগলামি' সারা দেশের মানুষকে কী প্রচণ্ডভাবে মুক্তিপাগল করিয়া তুলিবে।

কিন্তু উহা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, অল্পসংখ্যক জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতাদের কথা বাদ দিলে,—প্রায় অধিকাংশ মুসলিম নেতাই সূচনা হইতেই এই আন্দোলন হইতে দূরে থাকিলেন।

মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা মিঃ জিন্না মডারেট নেতাদের মত নিয়মতান্ত্রিক পার্লামেণ্টারী রাজনীতিতে বিশ্বাস করিতেন। লাহোর কংগ্রেসের পূর্ব মুহূর্তেও তিনি বড়লাট আরউইনের সঙ্গে আপস আলোচনায় আসিবার জন্য গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতাদের অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। তিনি ও বিঠলভাই প্যাটেল সবরমতীতে গিয়া গান্ধীজীকে এ ব্যাপারে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতারা ডোমিনিয়ান স্টেটাসের ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি চাহিতেই শেষপর্যন্ত বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা ফাঁসিয়া যায়। গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতারা সোজা লাহোর কংগ্রেসে যোগদান করিতে চলিয়া গেলেন। লাহোর সিদ্ধান্ত পাঠ করিয়া জিন্না গান্ধীজী ও মতিলাল নেহরুর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এক বিবৃতি দেন (বোম্বাই ২রা জানুয়ারী ১৯৩০):

"I have read accounts of the proceedings of the Congress with extreme pain and disappointment. I think Mr. Gandhi and Pandit Motilal Nehru have taken on themselves the greatest responsibility in taking the decisions which they did in breaking up pourparlers with the Viceroy and therefore, in getting the Congress to adopt the resolutions which, in my opinion are most misleading, unpractical, unsound and unwise. They are calculated to do enormous harm to the interests of India."…

পরিশেষে দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়া তিনি বলিলেন:

"This is the moment when I urge on them to follow the advice of those who yield to none in honesty of purpose or patriotism, but

who believe that India stands to gain by negotiations more than by any other action violent or nonviolent."

[*The Statesman* : January 3, 1930]

এমন কি খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় যে-আলি ভ্রাতৃদ্বয় গান্ধীজীর প্রধান সহকারীরূপে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন তাঁহারাও এবার গান্ধীজী প্রবর্তিত স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর অত্যন্ত বিরূপ হইয়া উঠিলেন। ২৬শে জানুয়ারি 'স্বাধীনতা-দিবস' উদ্‌যাপনের পূর্ব মুহূর্তে মহম্মদ আলি, সৌকত আলি, সফি দাউদী এবং ইসমাইল খাঁ প্রমুখ মুসলিম নেতারা এক বিবৃতির মাধ্যমে সমস্ত মুসলিম সমাজকে এই মর্মে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, তাঁহারা যেন কংগ্রেসের এই আন্দোলনে যোগদান কিংবা উহার সহিত কোন প্রকার সংস্রব না রাখেন,—কেননা মুসলমানদের ইহাতে কোনই স্বার্থ নাই।

এই প্রসঙ্গে মুসলিম লীগের তৎকালীন রাজনীতিটি সংক্ষেপে বলা দরকার। ১৯২৭ সালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক ভারত শাসনসংস্কারের উদ্দেশ্যে 'স্টাটুটারী কমিশন' নিয়োগ ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য সাম্প্রদায়িক দলগুলি অত্যন্ত সক্রিয় ও তৎপর হইয়া উঠে। উহার কয়েক মাস পরে ভারতবর্ষে 'সাইমন কমিশন' আসিবার পর হইতেই (১৯২৮) এই কমিশনও স্বতন্ত্র নির্বাচন ইত্যাদি লইয়া মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যে বেশ কিছুটা মতদ্বৈধতা ঘটে। ফলে মুসলিম লীগ দলটি সাময়িকভাবে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এক অংশ স্যার মহম্মদ শফির নেতৃত্বে অপরটি মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে পরিচালিত হইতে থাকে। স্বতন্ত্র-ভাবেই ইঁহারা সভা-সম্মেলন করিতে থাকেন।

স্মরণ রাখা দরকার, ১৯২৮ সালেই ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য কংগ্রেসের উদ্যোগে কয়েকবারই সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কিছুদিন আলোচনা চলার পর মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে একটি কমিটির 'পরে শাসনতন্ত্র রচনা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের ভার দেওয়া হয়। ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে (২২শে ডিসেম্বর ১৯২৮) কলিকাতায় সর্বদলীয় সম্মেলনে যখন নেহরু কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে আলোচনা শুরু হয় তখন তাহাতে মিঃ জিন্না প্রমুখ মুসলিম লীগ নেতারা এমন সব প্রস্তাব করেন যাহার ফলে সম্মেলনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ইহার পর লীগ কার্যত সর্বদলীয় সম্মেলন হইতে সরিয়া দাঁড়ায়। উহার কয়েকদিন পরই শফি-লীগের উদ্যোগে মুসলমানদের এক সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় (৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৮)। এই সময় মিঃ জিন্না মুসলিম লীগের উভয় শাখা ও মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সচেষ্ট হইয়া তাঁহার চৌদ্দ-দফা দাবী-সম্বলিত খসড়া পত্রটি পেশ করেন (১লা জানুয়ারী ১৯২৯)। উহার প্রায় তিন মাস পরে মুসলিম লীগ দল কর্তৃক উহা গৃহীত হয়। জিন্নার ঐ চৌদ্দ দফা (Fourteen points) দাবীগুলি সংক্ষেপে ছিল এই ঃ

(১) ভারতের ভাবী শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা হইবে এমন এক যুক্তরাষ্ট্র যাহাতে 'রেসিডিউয়ারী' ক্ষমতা প্রদেশসমূহের হস্তেই ন্যস্ত রহিবে।

(২) প্রদেশসমূহে সমপরিমাণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রবর্তন।

(৩) প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহে ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব এরূপভাবে নির্ধারিত করিতে হইবে যে, তাহার ফলে কোন প্রদেশে কোন সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সংখ্যালঘু অথবা সমসংখ্যক সম্প্রদায়ে পরিণত হইতে পারিবে না।

(৪) কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলমান সদস্যের সংখ্যা মোট সদস্যসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের কম হইবে না।

(৫) সাম্প্রদায়িক দলগুলি পৃথক নির্বাচনের দ্বারাই তাহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিবে, কিন্তু যে কোন দল যে কোন সময়ে যৌথ-নির্বাচনের অনুকূলে যাহাতে প্রয়োজনমত পৃথক নির্বাচন পরিহার করিতে পারে, তাহার পথ উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

(৬) পাঞ্জাব, বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাহার দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, এমন কোন প্রাদেশিক পুনর্বিভাগের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারিবে না।

(৭) সকল সম্প্রদায়কে ধর্মবিশ্বাস, পূজা-অর্চনা, আচার-অনুষ্ঠান, প্রচার ও সাহচর্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিতে হইবে।

(৮) কোন বিল, প্রস্তাব বা তাহার অংশবিশেষ কোন আইন পরিষদে অথবা যে কোন প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে গৃহীত হইতে পারিবে না—যদি সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের তিন চতুর্থাংশ সদস্য তাহাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থের পক্ষে হানিকর হিসাবে তাহার বিরোধিতা করে।

(৯) সিন্ধুকে বোম্বাই প্রদেশ হইতে পৃথক করিতে হইবে।

(১০) অন্যান্য প্রদেশের মত বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও শাসন সংস্কার প্রবর্তন করিতে হইবে।

(১১) যোগ্যতার বিচারসাপেক্ষরূপে সরকারী চাকুরিতে মুসলমানদের যথাযোগ্য অংশ ধার্য করিতে হইবে।

(১২) মুসলিম কৃষ্টি, শিক্ষা, ভাষা, ধর্ম, ব্যক্তিগত বিধান, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও সরকারী সাহায্যের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ পাইবার অধিকার রক্ষার জন্য যথাযোগ্য রক্ষা-ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(১৩) কেন্দ্রে অথবা প্রদেশে এমন কোন মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারিবে না, যাহাতে মুসলমান মন্ত্রীর সংখ্যা মোট মন্ত্রীসংখ্যার অন্ততঃপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ নয়।

(১৪) কেন্দ্রীয় পরিষদে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির সম্মতি ব্যতিরেকে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবে না।

এখানে উল্লেখযোগ্য, জিন্নার এই চৌদ্দ-দফা দাবীই পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী মুসলমান বহির্ভূত মুসলমান সমাজের দাবী হইয়া দাঁড়ায়। আরও উল্লেখযোগ্য, পরবর্তীকালে মিঃ ম্যাকডোনাল্ড এই চৌদ্দ-দফা দাবীর ভিত্তিতেই 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' প্রস্তাবটি রচনা করেন।

কলিকাতা কংগ্রেসে (১৯২৮ ডিসেম্বর) নেহরু কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে সর্বদলীয় সম্মেলনের প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে যে চরমপত্র দেওয়া

হয়, বস্তুত উহার জন্য মিঃ জিন্না প্রমুখ মুসলিম লীগ নেতারা ক্ষুব্ধ ও সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ক্ষোভ ও সন্দেহের কারণ এই যে, কংগ্রেস নেতারা মুসলিম লীগের সহিত কোন মীমাংসা না-করিয়া এবং তাঁহাদের একরূপ অবজ্ঞা করিয়াই কলিকাতা কংগ্রেসে ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কংগ্রেস নেতারা ঐ চরমপত্রের (ultimatum) দ্বারা ব্রিটিশের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের স্বার্থে সুযোগ-সুবিধা করিয়া লইতে চায় বলিয়া তাঁহাদের সন্দেহ হয়। তারপর ১৯২৯ সালের শেষভাগে কংগ্রেস নেতারা বড়লাট আরউইনের ঘোষণাপত্রটি সর্তসাপেক্ষে গ্রহণ করিয়া যে সম্মিলিত ইস্তাহার প্রচার করেন তাহাতেও মুসলিম লীগ নেতাদের ঐ সন্দেহ বর্ধিত হয়। অবশেষে লাহোর কংগ্রেসে যখন পূর্ণ স্বাধীনতা ও আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয় তখন তাঁহাদের ক্ষোভ ও সন্দেহ ক্রমশ ঘৃণা ও বিদ্বেষে পরিণত হয়। 'স্বাধীনতা-দিবস' উদ্‌যাপনের (১৯৩০—২৬শে জানুয়ারি) প্রাক্‌কালে মুসলিম লীগ নেতারা যে বিবৃতি প্রচার করেন, পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ১৯৩০ সালে এপ্রিল মাসে সর্বভারতীয় মুসলিম সম্মেলনের এক সভায় মহম্মদ আলি সরাসরি গান্ধীজীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়া বলিলেন :

"We refuse to join Mr. Gandhi, because his movement is not a movement for the *complete independence of India* but for making the seventy millions of Indian Musalmans dependents of the Hindu Mahasabha.

[*History of Freedom Movement in India* : Vol. III : P. 544]

উল্লেখযোগ্য, ১৯২৮ সালে কলিকাতায় সর্বদলীয় সম্মেলনে মহম্মদ আলি "পূর্ণ স্বাধীনতার" দাবী উত্থাপন করিয়াছিলেন, সেই মহম্মদ আলির এই প্রতিক্রিয়া ও পরিবর্তন অত্যন্ত দুঃখজনক হইলেও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। যাহাই হউক, এইভাবে খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের মুসলিম নেতারাও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তিসংগ্রাম হইতে ক্রমশ দূরে সড়িয়া দাঁড়াইলেন। শুধু তাহাই নয়, এই সময়ই বিখ্যাত উর্দু কবি স্যার মহম্মদ ইক্‌বাল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবী জানান। ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে নিঃ ভাঃ মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে তিনি উপরোক্ত দাবী জানাইয়া বলেন :

"অতএব দেখা যাইতেছে, ইসলামের মধ্যে যে ধর্মনৈতিক আদর্শ রহিয়াছে, তাহা ইহার সৃষ্ট সমাজব্যবস্থার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়া চলিতে গেলে শেষপর্যন্ত অন্যটিও বাদ পড়িয়া যাইবে। কাজেই, জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র সংগঠনের অর্থ যদি দাঁড়ায় ইসলামের সৃষ্ট সংহতি-নীতির বর্জন, তবে সে বস্তু মুসলমানের পক্ষে কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হইবে না···কাজেই ভারতে এক সংহত জাতি যদি গড়িয়া তুলিতে হয়, তাহা করিতে হইবে বহুর সহযোগিতা ও পারস্পরিক সমন্বয়ের মধ্য দিয়া, বহুকে বর্জন বা অস্বীকার করিয়া নহে।···এইদিকে একত্র সংহতির পন্থা আবিষ্কারের উপরেই বস্তুতঃ ভারতের তথা এশিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে···

"অথচ আভ্যন্তরীণ সমন্বয় সাধনের একটি নীতি আবিষ্কার করিতে যত চেষ্টা এখনও পর্যন্ত আমরা করিয়াছি, সমস্ত বিফল হইয়াছে। ইহা দুঃখের কথা। আমাদের চেষ্টা বিফল হইল কেন? হয়তো ইহার কারণ, আমরা পরস্পরের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রত্যেকেই সন্দিহান, মনে মনে প্রত্যেকেই অপরকে নিজের কর্তৃত্বাধীন করিয়া লইবার মতলব রাখি। হয়তো ইহার কারণ, যে সকল একচ্ছত্র ক্ষমতা ঘটনাক্রমে আমাদের কাহারও হাতে আসিয়া পড়িয়াছে, পারস্পরিক সহযোগিতার বৃহত্তর প্রয়োজনেও আমরা তাহা হস্তচ্যুত করিতে প্রস্তুত নহি; জাতীয়তার আবরণে আমরা আমাদের স্বার্থবুদ্ধিকে লুকাইয়া পোষণ করিতেছি; বাহিরে আমরা মহৎপ্রাণ দেশ-প্রেমিকের ভাণ করিতেছি, কিন্তু মনে মনে আমরা একটা 'জাতি' বা উপজাতির মতই সংকীর্ণচেতা। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই তাহার স্বকীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুসারে স্বাধীনভাবে বাড়িয়া উঠিবার অধিকার আছে, হয়তো একথাটাও আমরা স্বীকার করিতে রাজী নই। কিন্তু আমাদের বিফলতার কারণ যাহাই হউক, আমি এখনও মনে আশা রাখি। আমার মনে হয়, ঘটনাচক্রে কোন-প্রকারের একটা আভ্যন্তরীণ সমন্বয় স্থাপনের দিকেই গড়াইয়া চলিয়াছে এবং মুসলমান সমাজের মনোবৃত্তি আমি যতদূর অধ্যয়ন করিতে পারিয়াছি, তাহাতে একথা ঘোষণা করিতে আমার কোনই দ্বিধা নাই, ভারতীয় মুসলমান তাহার নিজের দেশে নিজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুসারে নিজেকে সম্পূর্ণ বিকশিত করিয়া তুলিবার অধিকারী। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা স্থায়ী মীমাংসার ভিত্তি হিসাবে যদি এই নীতিটিকে মানিয়া লওয়া হয়, তবে ভারতীয় মুসলমানও ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাহার সর্বস্ব উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত থাকিবে। প্রত্যেক সম্প্রদায় তাহার নিজস্ব পদ্ধতিতে স্বাধীনভাবে বাড়িয়া উঠিবার অধিকার পাইবে, এই নীতির মূলে কোনরূপ সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার কথা নাই।...অন্যান্য সমস্ত সম্প্রদায়ের রীতি-নীতি, আইন-কানুন, ধর্মনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখি। শুধু তাহাই নয়, প্রয়োজন হইলে তাহাদের উপাসনাস্থানকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করাও আমার কর্তব্য; ইহাই কোরাণ-শরীফের শিক্ষা।"

তারপর তিনি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে বলিলেন:

"ইউরোপের দেশগুলিতে যে সব দল লইয়া সমাজ গঠিত হয় তাহারা বিভিন্ন স্থানের অধিবাসী বলিয়াই পৃথক। ভারতে তাহা নয়।...সাম্প্রদায়িক দলগুলিই ভারতে বিশেষ লক্ষণীয়, ইহাকে অস্বীকার করিয়া ইউরোপীয় গণতন্ত্রের নীতি এদেশে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। সুতরাং মুসলমানগণ যে ভারতের অভ্যন্তরে একটি মুসলিম ভারতবর্ষ সৃষ্টি করিতে চাহিতেছেন, এই দাবী সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত।... আমার মতে পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানকে একত্রিত করিয়া একটি মাত্র রাষ্ট্রে পরিণত করা উচিত।...আম্বালা বিভাগ এবং সম্ভবতঃ আরও কয়েকটি অ-মুসলমান প্রজাবহুল জিলাকে ইহা হইতে বাদ দিতে হইবে। তাহাতে ইহার আয়তন হ্রাস পাইবে এবং জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানের আনুপাতিক পরিমাণ বেশী দাঁড়াইবে।...এইরূপে ভারতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে থাকিয়াও নিজেকে

বিকশিত করিয়া তুলিবার পূর্ণ সুযোগ পাইলে তখন সেই উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমানগণই হইবে বৈদেশিক অভিযানের হাত হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার শ্রেষ্ঠ সেনা,—সে অভিযান মতবাদের অভিযানই হউক, আর অস্ত্রের অভিযানই হউক।··· আমার মনে হয়, স্বাধীন ভারতের পক্ষে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা একেবারেই অচল। অবশিষ্ট ক্ষমতা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিতে হইবে অভ্যন্তরস্থ রাষ্ট্রগুলির হাতে ; ইহারা স্ব স্ব ব্যাপারে স্বাধীন শাসন-ক্ষমতা ভোগ করিবে ও যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন সম্মতিক্রমে যে ক্ষমতাগুলি স্পষ্ট ভাষায় কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ করিবে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার মাত্র সেগুলিরই অধিকারী হইবে।" [খণ্ডিত ভারত : ২৩৯—৪১]

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইকবাল যদিও ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতেই রাষ্ট্রীয় স্বায়ত্তশাসন দাবী করিতেছিলেন, তবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে কোন স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের (অর্থাৎ 'পাকিস্তান'-এর) পরিকল্পনা করেন নাই। তিনি আন্তরিকভাবেই কেন্দ্রে একটি শক্তিশালী ও সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের উপরও গুরুত্ব দিতেছিলেন। তাঁহার ঐ ভাষণে অনেক ভালো কথাও আছে কিন্তু তবুও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের আশু প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বটি তিনি সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্তু শুধু কবি ইকবালই নহেন ;—বস্তুতপক্ষে মিঃ জিন্না ও শফি-পন্থী মুসলীম লীগের নেতৃত্বাধীনে ভারতের বৃহৎ সংখ্যক মুসলিম বুদ্ধিজীবীসমাজ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়মুক্তি আন্দোলনের প্রায় সম্পূর্ণই বাহিরে রহিয়া গেলেন। প্রকৃতপক্ষে শাসন-সংস্কারের ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমানের বোঝাপড়াকে ইঁহারা আশু জাতীয় মুক্তি অপেক্ষাও গুরুত্ব দিতেছিলেন।

পক্ষান্তরে ডাঃ আন্সারি, মৌলানা আজাদ, আব্বাস তয়াবজী, সৈয়দ মহম্মদ, শেরওয়ানী ও খান আব্দুল গফ্ফর খাঁ প্রমুখ জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের নেতৃত্বে বেশ কিছুসংখ্যক মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও জনসাধারণ আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া অশেষ লাঞ্ছনা ও নির্যাতন ভোগ করেন। বিশেষত খান্ আব্দুল গফ্ফর খাঁ'র নেতৃত্বে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবাসী ব্রিটিশের পৈশাচিক নির্যাতন নীতিকে উপেক্ষা করিয়া এই আন্দোলনে যে-অসীম বীরত্ব ও নৈতিক মনোবল প্রদর্শন করেন ইতিহাসে তাহার তুলনা খুবই বিরল।

সর্বশেষ একটি কথা—আইন-অমান্য আন্দোলনকালেই ভারতবর্ষের বিপ্লববাদীদের মধ্যে মার্কসবাদ চর্চা ও অনুশীলন শুরু হয়। ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের ব্যর্থতার মধ্যেই তাঁহারা মার্কসবাদী রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন। এই ব্যাপারে 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা'র ঐতিহাসিক অবদান আছে। ১৯৩১ সালে মে মাস হইতে ঐ মামলার বিচার শুরু হয়। আসামীরা কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া তাঁহাদের আদর্শ লক্ষ্য ও কর্মপন্থা সম্পর্কে যে-সব বিবৃতি দেন দিনের পর দিন সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশিত হয়। বস্তুত 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা'ই ভারতে বিপ্লবী তরুণ-যুব সম্প্রদায়কে মার্কসবাদী রাজনীতিতে আকৃষ্ট করে। এই মামলার অনতিকাল পরেই ভারতে "কমিউনিস্ট পার্টি" সুসংগঠিত হয়। তাছাড়া "কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি"ও এই আন্দোলনের সময় গঠিত হয়।

ইউরোপ যাত্রা ঃ বিলাতে হিবার্ট বক্তৃতা

সারা দেশে আসন্ন এই ঝটিকার ঠিক পূর্বমূহূর্তে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ যাত্রা করেন। ২রা মার্চ গান্ধীজী বড়লাটকে চরমপত্র দেন, আর ঐদিনই রবীন্দ্রনাথ সদলবলে ইউরোপ যাত্রা করেন। এবার সঙ্গে চলিলেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, নন্দিনী, ডাঃ সুহৃৎনাথ চৌধুরী এবং কবির সেক্রেটারী মিঃ আরিয়াম (আর্যনায়কম্)।

একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার মত, অসহযোগ-আন্দোলনের পূর্বমুহূর্তে কবি ইউরোপ-আমেরিকা ভ্রমণে যাত্রা করেন। এবারও আইন-অমান্য আন্দোলনের পূর্বমুহূর্তে তাঁহাকে বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইতে হয়। বেশ কিছুকাল পূর্বেই তাঁহার ইউরোপ যাইবার কথা হয়, কিন্তু নানাকারণে তাহা আর হইয়া উঠে নাই। এবার যাত্রার প্রধান উপলক্ষ, বিলাতে হিবার্ট-লেক্‌চার দান। স্মরণ রাখা দরকার, প্রায় দুই বৎসর পূর্বে হিবার্ট বক্তৃতার উদ্দেশ্যে তিনি বিলাত যাত্রার উদ্যোগ করিয়াও মাদ্রাজ পর্যন্ত গিয়া শারীরিক অসুস্থতার জন্য শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে যাত্রা স্থগিত রাখিতে হয়। তাছাড়া রাশিয়া যাইবার আমন্ত্রণও কয়েকবার পাইয়াছিলেন, নানা গোলমালে সেখানেও যাওয়া হয় নাই। এই যাত্রায় রাশিয়া ঘুরিয়া আসাও তাঁহার একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আরও একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহ। পূর্বেই বলিয়াছি,—বিশ্বভারতীর তখন চরম অর্থসংকট চলিতেছিল।

২৬শে মার্চ কবি সদলবলে মার্সেলস্ পৌঁছিলেন। সেখানে হইতে কবি তাঁহার বন্ধু কাহ্নের কাপ্ মার্তার (*Cap Martin*) ভিলাতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেই সময় স্যর অস্টেন চেম্বারলেন এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট মাসারিক্ রিভেরাতে (*Riviera*) অবসর যাপন করিতেছিলেন। তাঁহারা উভয়েই রবীন্দ্রনাথের সহিত কাহ্নের কাপ্-মার্তার ভিলায় সাক্ষাৎ করেন। কয়েকদিন পর এণ্ড্রুজ আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সোজা কাপ-মার্তায় কবির নিকট উপস্থিত হন এবং সেখানে কবির সহিত তিনি কয়েকদিন যাপন করিয়া লণ্ডনে ফিরিয়া যান।

প্রায় মাসখানেক বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া-ফিরিয়া কবি প্যারিসেই অবস্থান করিতেছিলেন। এবারে প্যারিসে আসার তাঁহার একটি বিশেষ উদ্দেশ্যও ছিল। প্রায় দুই বৎসর পূর্বে তিনি চিত্রশিল্পে মন দেন। প্যারিস চিত্রশিল্পের গুণী সমঝদার এবং সমগ্র পৃথিবীর আধুনিক চিত্রকলা ও শিল্প-চর্চার প্রধান কেন্দ্রস্থল। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রগুলি সম্পর্কে প্যারিসের শিল্প-রসিক মহলের অভিমত জানিবার একটা গোপন বাসনাও তাঁহার ছিল। প্যারিসে রবীন্দ্রানুরাগী মহল এইসময় কবির একটি চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করেন (২রা মে)। এই ব্যাপারে প্রধান আগ্রহ ও উদ্যোগ গ্রহণ করেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, আঁদ্রে কার্পেলেস ও কঁতেস দ্য নোআলিস প্রভৃতি রবীন্দ্রভক্তেরা। ইহার কয়েকদিন পূর্বে ইন্দিরা দেবীকে এক পত্রে কবি লিখিতেছেন (২৬শে এপ্রিল) :

…"ধরাতলে যে রবিঠাকুর বিগত শতাব্দীর ২৫শে বৈশাখ অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁর কবিত্ব সম্প্রতি আচ্ছন্ন—তিনি এখন চিত্রকর রূপে প্রকাশমান—তার সম্পূর্ণ বিবরণ যখন পাবি তখন চমক লাগবে, কিন্তু নিজ মুখে এ সম্বন্ধে সত্য কথা বলতে গেলে অহঙ্কার করা হয়। পরম্পরায় যখন শুনবি তখনকার জন্যে নীরবে অপেক্ষা করাই ভালো। ২রা মে তারিখে প্রদর্শনীর দ্বারোন্মোচন। এইবার আমার চৈতালী—বর্ষশেষের ফসল সমুদ্রপারের ঘাটে সংগ্রহ হল। আমার পরম সৌভাগ্য যে আমাদের নিজপারের ঘাট পেরিয়ে এসেচি। আমার এই শেষ কীর্তি এই দেশেই রেখে যাব।"

[চিঠিপত্র : ৫ম খণ্ড : পত্র-৩২ : পৃঃ-৭০]

এ যেন এক সম্পূর্ণ নূতন রবীন্দ্রনাথ। প্রায় একমাস কাল তিনি ফ্রান্সে অবস্থান করিতেছেন। সারা ভারতবর্ষ জুড়িয়া তখন ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন ও সংঘর্ষ চলিতেছে। ইউরোপ-আমেরিকার পত্র-পত্রিকায়ও অল্পবিস্তর এইসব সংবাদ প্রচারিত হইতেছিল। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার, এইবার ইউরোপ-ভ্রমণের প্রথমভাগে বেশ কিছুকাল পর্যন্ত দেশের ঐ-স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে কবি আশ্চর্যরকম নীরবতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আর এইটিও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, জীবনের শেষার্ধে প্রায় প্রতিটি জাতীয় সংগ্রামের সূচনার মুখে কবি আশ্চর্য বাক-সংযম ও নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন। হয়ত কবির একটিমাত্র নীরব কৈফিয়ত ছিল,—'আমি কবি। যে-দুর্বার অন্ধশক্তিকে কী করিয়া নিয়ন্ত্রিত ও সংযত করিতে হয় আমার জানা নাই, তাহাতে জড়িত হওয়া কিম্বা কোন মন্তব্য করা আমি উচিত বোধ করি না।' তাছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে কবির ব্যক্তিগত ধারণা কি তাহা পূর্বখণ্ডেই বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। অবশ্য শুধু দেশের রাজনীতিক সমস্যা সম্পর্কেই নয়,—কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি সমাজবিজ্ঞান—কোন কিছুতেই এখন তাঁহার যেন মন ও বিশেষ কোন আগ্রহ-আকর্ষণ নাই। রবীন্দ্রনাথ এখন চিত্রশিল্পী। প্রত্যহ দুই তিনটি ছবি আঁকিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের মত বিশাল ও প্রবলপ্রাণ এক সৃজনশীল প্রতিভা নিয়তই বিচিত্রমুখে ধাবিত হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। এই কারণেই নিয়তই তাঁহার চিন্তা ও আকর্ষণ বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ছুটিয়াছে; যাহার ফলে আপাতদৃষ্টি তাঁহার জীবন এবং চিন্তা ও সাধনায় অসঙ্গতি ও বিচ্ছিন্নতা (inconsistency) সময় সময় অত্যন্ত প্রকট হইয়া দেখা দেয়। কিন্তু তবুও রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। তাই এই চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথকে না-জানিলেও সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথকে জানা যায় না। আবার অংশে-অংশে, খণ্ডে খণ্ডেও রবীন্দ্রনাথকে জানা যায় না। সমস্ত অংশে অংশে মিলাইয়া যে সমগ্র ও সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথ, উহাই কবির মানসসত্তার যথার্থ পরিচয়।

যাহাই হউক ২রা মে প্যারিসে কবির চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। বিলাতের 'মাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান'-এর সংবাদদাতা এই সংবাদ দিয়া লিখিলেন :

"An exhibition of his pictures was opened in Paris yesterday. A large gathering mainly composed of French and British members of the artist colony, examined the collection of 125 water-colours and pen-and-ink drawings, notable for their firm lines and sparing but

effective use of bright colour. The subject-matter of the pictures ranges from landscapes in dull blue to human figures and representations of strange beasts. None of the works is named, but all are defined in Hindu Characters."

[*Manchester Guardian* : 3rd May, 1930]

২৫শে বৈশাখ প্যারিসে ভারতীয় সমিতির উদ্যোগে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উহার কয়েকদিন পরেই আর্যনায়কমকে সঙ্গে লইয়া কবি লণ্ডনে যান (১১ই মে)। সেখান হইতে দুইদিন পরে বার্মিংহামে বিলাতের কোয়েকারদের বা Friends Society-র উডব্রুক-সেটল্‌মেণ্টে যান। অমিয় চক্রবর্তী তখন সেখানে ;— কিছুদিন পূর্বে কোয়েকারদের আমন্ত্রণে তিনি সেখানে যান। কোয়েকার কলোনীতে কবি কিছুদিন কাটান।

কবি সেখানে Sellyoak College-এর ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে ধর্ম ও সাহিত্য লইয়া আলোচনা করেন ; নিজের কবিতাও আবৃত্তি করিয়া শুনান। তাছাড়া এখানে হিবার্ট বক্তৃতার ভাষণগুলি তিনি প্রস্তুত করিতে থাকেন।

এদিকে ভারতবর্ষে তখন আইন অমান্য আন্দোলন অত্যন্ত ব্যাপক ও তীব্র আকার ধারণ করিতে থাকে। ইংরাজ-গবর্নমেণ্টের দমননীতিও ক্রমশ নৃশংস ও ভয়াবহ আকার ধারণ করে। কংগ্রেস ও সমস্ত রাজনৈতিক দল বেআইনী এবং সভা-সমিতি-মিছিল ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়। তাছাড়া কলকাতা, বোম্বাই, করাচী, মাদ্রাজ প্রভৃতি নগর ও শহরে বিক্ষুব্ধ জনতার উপর লাঠি ও গুলি বর্ষণ করা হয়। সহস্র সহস্র সত্যাগ্রহী ও আন্দোলনকারী বন্দীতে জেলখানাগুলি ভরিয়া উঠিতে থাকে। এইরকম প্রবল নির্যাতন ও অত্যাচারের মুখে বিপ্লবপন্থী আন্দোলন পুনরায় তীব্র আকার ধারণ করে।

১৮ই এপ্রিল বিপ্লবীনেতা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়। ২২শে এপ্রিল সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতারা আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে নিদারুণ ভাবে প্রহৃত হইলেন। এই সংবাদে সারা বাংলাদেশে দারুণ উত্তেজনা দেখা দেয়। বাংলা সরকার এই আন্দোলনকে চূর্ণ করিয়া দিবার জন্য ২৩শে এপ্রিল 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স' জারি করিলেন। ঐদিনই ভারতের উঃ পঃ সীমান্তে পেশোয়ারে এক প্রচণ্ড গণ-অভ্যুত্থান দেখা দেয়। পরদিন খান্ আব্দুল গফ্‌ফর খাঁ প্রমুখ নেতাদের গ্রেপ্তার করা হইলে বিশাল এক বিক্ষুব্ধ জনতা পেশোয়ারের রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া নেতাদের আটকস্থানটির চতুর্দিক ঘেরাও করিয়া ফেলে। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য কর্তৃপক্ষ শেষপর্যন্ত 'সৈন্যবাহিনী' তলব করে। বিক্ষুব্ধ জনতা একটি সাঁজোয়া গাড়ি পোড়াইয়া ফেলে এবং শেষপর্যন্ত মিলিটারীর প্রবল গুলিবর্ষণের মুখে জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। উল্লেখযোগ্য এই সময় '১৮নং রয়েল গাড়োয়ালী রাইফেল বাহিনীর' কয়েকজন হিন্দু সৈনিক ঐ নিরস্ত্র মুসলমান জনতার উপর গুলি চালাইতে অস্বীকার করিয়া এক ঐতিহাসিক ঘটনার সূচনা করে। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়া গবর্নমেণ্ট পেশোয়ার হইতে সশস্ত্র রাইফেল বাহিনী অপসারণ করে। বস্তুত ২৫শে এপ্রিল হইতে ৪ঠা মে পর্যন্ত

পেশোয়ারের শাসনক্ষমতা জনগণের হাতে ছিল। শেষপর্যন্ত আকাশ হইতে বিমান-বাহিনীর সাহায্যে বোমা ও গুলিবর্ষণ করিয়া ইংরাজ গবর্নমেণ্টকে ক্ষমতা পুনর্দখল করিতে হয়। পরে কোর্টমার্শাল বিচারে ১৭জন গাড়োয়ালী সৈন্যের দীর্ঘ সাজা দেওয়া হয়। বিদ্রোহ ও আন্দোলনের সংবাদ যাহাতে প্রকাশিত না হয় তজ্জন্য গবর্নমেণ্ট ১৯১০ সালের প্রেস আইনটি পুনরায় এক অর্ডিন্যান্সের সাহায্যে বলবৎ করে (২৭শে এপ্রিল)। ইহার ফলে দেশে ১৩০ খানি জাতীয়তাবাদী পত্রিকাকে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা গবর্নমেণ্টের নিকট জমানত দিতে হইল। প্রতিবাদে ১লা মে হইতে তাঁহারা পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ রাখিলেন।

ইংরাজ গবর্নমেন্টের বীভৎস পীড়ন ও দলননীতির মুখে আন্দোলন যখন বিদ্রোহাত্মক পথে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেছে গান্ধীজী স্বয়ং তখনও আন্দোলনকে অহিংস সত্যাগ্রহের পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ১লা মে গান্ধীজী বড়লাটকে তাঁহার সর্বশেষ চরমপত্রে এই বলিয়া সতর্ক করিরা দিলেন যে, তাঁহার পূর্বকথিত দাবী না-মানিয়া লইলে তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সাহায্যে ধরসনার সরকারী লবণগোলা দখল করিয়া লইবেন। ৪ঠা মে মধ্যরাত্রে গান্ধীজী গ্রেপ্তার হইলেন।

গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের ফলে পুনরায় দেশের চতুর্দিকে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। প্রতিবাদে বোম্বাইয়ে প্রায় ৫০,০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করে। কলিকাতা ও দিল্লীতে বিক্ষুব্ধ জনতার উপর লাঠি ও গুলিবর্ষণ করা হয়। কিন্তু পরিস্থিতি সবচেয়ে গুরুতর আকার ধারণ করে শোলাপুরে। সেখানে বিক্ষুব্ধ জনতা ছয়টি পুলিশ চৌকি পোড়াইয়া ফেলিলে পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ করে। ফলে ২৫ জন নিহত ও প্রায় শতাধিক লোক আহত হয়। ইহার ফলে সমগ্র শোলাপুরে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। সরকারী শক্তি পরাভূত হয় এবং জনতা ক্ষমতা দখল করিয়া সেখানে পাল্টা-সরকার গঠন করে। শেষ পর্যন্ত ইংরাজ সরকারকে মিলিটারীর শরণাপন্ন হইতে হয়। ১২ই মে শোলাপুরে মার্শাল ল' ঘোষিত হয়। তারপর শুরু হয় সরকারপক্ষের জঘন্য প্রতিহিংসা গ্রহণ। মিলিটারী শাসনের হাতে সমগ্র শোলাপুরবাসী সেদিন অসহায়ভাবে পড়িয়া-পড়িয়া মার খাইল। দিনের পর দিন নানা অকথ্য নির্যাতন অবমাননা ও লাঞ্ছনায় তাহাদের জীবন দুর্বিষহ ও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে থাকে,—এমন কি গান্ধীটুপি পরাও শোলাপুরে নিষিদ্ধ হয়।

শোলাপুরের ঐ পরিস্থিতিতে 'টাইমস্'-এর মত পত্রিকাও গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া লিখিল :

"Even the Congress leaders had lost control over the mob, which was seeking to establish a regime of its own."···[*The Times* : 14 May, 1930]

রবীন্দ্রনাথ তখন বিলাতে। কিন্তু দেশের এই নিদারুণ পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁহাকে তখনও পর্যন্ত কোন মন্তব্য করিতে দেখা যায় না। ১৫ই মে 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে'র প্রতিনিধি উড্‌ব্রুক্-সেটেলমেন্টে কবির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতবর্ষের ঐ পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁহার অভিমত জানিতে চাহিলেন। কবি তাঁহার

জবাবে এক দীর্ঘ বিবৃতি দেন। পরদিন 'মাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে' উহার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রকাশিত হয়। উহার সারমর্ম এই :

একদিন ইংরাজী সাহিত্যের মাধ্যমে আমরা মানবতা, ন্যায়বিচার ও মুক্তির বাণী শুনিয়াছিলাম। সেদিন সরল বিশ্বাসে আমরা ভাবিয়াছিলাম যে, ইংরাজ বুঝি আমাদের মুক্তি ও স্বাধীনতালাভে সাহায্য করিতে আসিয়াছে।

তারপর কালে আমাদের সেই মোহ ও ভুল ভাঙিল। তখনই আমরা আবিষ্কার করিলাম, আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের আসল রূপটি কি। পাশ্চাত্যের নির্বিবেক শোষণের ভয়াবহ রূপটি অতি নিকট হইতে আমরা যতই উপলব্ধি করিয়াছি ততই ইহার বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছে। বিশেষতঃ গত মহাযুদ্ধের পর হইতে ঐসব অন্যায় আরও ঘোরতর হইয়াছে যাহা আমাদের হৃদয় ও মনে ভয়ানক তিক্ততার সঞ্চার করিয়াছে।

সাংবাদিক জানিতে চাহিয়াছিলেন, তৎকালীন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মধ্যে পুনরায় সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক ফিরাইয়া আনা যায় কী উপায়ে। কবি তাহারই জবাবে বলিলেন যে, যতক্ষণ পাশ্চাত্যের লোভ ও শোষণমূলক মনোভাব এবং হৃদয়ের সত্যিকারের পরিবর্তন না হয় ততক্ষণ উহা সম্ভব হইবে না। তিনি বলিলেন :

"What I really believe in is a meeting between the best minds of the East and the West in order to come to a frank and honourable understanding. If once such an open channel of communication could be cut whereby sincere thought might flow freely between us, unobstructed by mutual jealousy and suspicion and unimpeded by self-interest and racial pride, then a reconciliation might be bridged over."

তারপর তিনি ভারতবর্ষে সাম্প্রতিক ব্রিটিশ নির্যাতননীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া বলিলেন যে, সাম্প্রতিক অসন্তোষ ও গোলমালের পরও ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের ব্যবহারে ও আচরণে আজ যথার্থ উদারতা, সততা ও আপসমূলক মনোভাব দেখাইতে হইবে। কেননা ইংলণ্ডবাসীদের একথা আজ খুব পরিষ্কার বুঝিয়া লইতে হইবে যে, এই পরিস্থিতিতে যে-জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কখনও দমননীতি বা ত্রাস সৃষ্টিকারী কোনো দৈহিক বলপ্রয়োগ নীতিতে সমাধান হইবে না। প্রসঙ্গত তিনি শোলাপুরে মার্শাল ল' বা সামরিক শাসনের অকথ্য নির্যাতননীতির সমালোচনা করিয়া বলিলেন :

..."Those who have experience of bureaucratic and irresponsible Governments can easily understand how the repressive measures which are being undertaken to day, culminating in martial law at Sholapur, are bound to react upon our own people, for fear and panic always make a government in power harsh and vindictive. Instances of this are wellknown in human history, and what is

happening to-day in India is not likely to be an exception to the general rule.

Though much news has been suppressed, still information keeps trickling through from those who are reaching England by sea from India. They tell us how cruel and arbritrary is the punishment that is being meted out even to those who have been entirely inoffensive. These actions are called by high-sounding names, such as 'upholding law and order' when they are themselves the worst breaches of the law of humanity, which is greater than any other."

কিন্তু শোলাপুরের ঘটনা কবিকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়া তুলে। তিনি আরও বলিলেন :

"As a slight indication of the contemptuous violence which is being exercised under the cover of material law we are told by press cables from India how the military go about the streets of Sholapur with sticks, flicking off the white caps of those who wear such a headdress in honour of Mahatma Gandhi. The physical suffering may be slight, but the insult will be deeply resented by millions who hold Mahatma Gandhi's name in reverence. If such insolent actions continue these proud people will have to pay the penalty later, for the mute cry of the defenceless and weak cannot be ignored,

[*Manchester Guardian* : 16 May, 1930]

কবির এই বিবৃতি প্রধানত ইংরাজ বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ করিয়াই। 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' এই বিবৃতির খুব তারিফ করিয়া লিখিল :

"India's best ambassador is not Mahatma Gandhi but the poet and thinker Tagore. It is obviously difficult to transact political business with Mr. Gandhi. For politics is concerned with ordinary man and Mr. Gandhi is a saint, and saints are extraordinary men. But with Rabindranath Tagore we ordinary Westerners can hope to reach an understanding. For he is not a saint but a poet and a thinker, and as such he understands and sympathises with us average men. And when we read him and hear him we feel that, after all, the average Indian is not so unlike the average Westerner and that eternal conflict between the East and West is not the fixed decree of nature." [*Manchester Guardian Weekly* : 23 May, 1930]

উহার উপসংহারে পত্রিকাটি যদিও ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি নির্ধারিত সময় ঘোষণার প্রস্তাব দেয় এবং আরও কিছু ভালো কথা বলে তবুও রবীন্দ্র-প্রশস্তির এই আপাত সুন্দর কথাগুলির মধ্যে ইংরাজ বুদ্ধিজীবীর কূট-

বুদ্ধির তারিফ না করিয়া পারা যায় না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা গান্ধীকে তাঁহাদের না-বুঝিতে পারার কথা বটে। কিন্তু 'তাপস গান্ধী' ('Saint Gandhi' নহে—"স্বাধীনতার সারাংশ" নামক অন্তত ন্যূনতম দাবীতে (পূর্ণ স্বাধীনতা নহে, এমন কি ডোমিনিয়ান স্টেটাসও নহে) যখন অত্যন্ত বাস্তববাদী গান্ধী ইংরাজের সহিত আপস-আলোচনার আবেদন জানাইলেন তখনও গান্ধী সম্পর্কে ইংরাজ বুদ্ধিজীবীর ধারণা—obviously difficult to transact political business with Mr. Gandhi. 'ঋষিকল্প তাপসমূর্তি' গান্ধী'কে নহে—তাহার সংগ্রামী রুদ্রমূর্তি'কেই তাঁহারা অপছন্দ করিতেন।

১৭ই মে রবীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী ও এন্ড্রুজ সহ অক্সফোর্ডে যান। সেখানে তিনি ডঃ ড্রুমণ্ড-এর (Dr. W. H. Drummond) আতিথ্য গ্রহণ করেন। ডঃ ড্রুমণ্ড ম্যাঞ্চেস্টার কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তাছাড়া বিলেতের 'আন্তর্জাতিক কংগ্রেস' নামক সঙ্ঘের সেক্রেটারী ছিলেন এবং শান্তি আন্দোলনেও বহুকাল যাবৎ বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন। আর হিবার্ট বক্তৃতার জন্য কবির ইংলণ্ড আগমনে তিনিই পরোক্ষ হেতু হইয়াছিলেন।

১৯শে মে রাত্রিকালে অক্সফোর্ডের ম্যাঞ্চেস্টার কলেজে রবীন্দ্রনাথ হিবার্ট বক্তৃতামালার উদ্বোধনী ভাষণ দেন। সভাগৃহে সেদিন তিলধারণের স্থান ছিল না,—বহু শ্রোতাকে সারাক্ষণ দাঁড়াইয়া বক্তৃতা শুনিতে হয়। বক্তৃতার পূর্বে ম্যাঞ্চেস্টার কলেজের অধ্যক্ষ Dr. L. P. Jacks কবির পরিচিতি উপলক্ষ্যে যে-ক্ষুদ্র ভাষণটি দেন সেটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলিলেন :

"You will listen to one who needs no credentials in this place or in any place where wisdom is sought after. There are some who have taught us that the space which separates East from West on the surface of the world had no existence in the depths of the human spirit. There is none to whom our debt is greater for that lesson, our gratitude more heartfelt, than to the thinker, poet, and prophet who will speak to you. I do not describe him untrully when I say he comes among us to-day as an anbassador of spiritual unity and of mutual understanding between the spirit of the East and the spirit of the West, which is one of the greatest needs of the world to-day. To promote that understanding is one of the great traditions of this college, in which object we have always had the strong support of the Hibbert Trustees. Never has this college been more honoured in its guest than it is to-day, and never have we been happier in the welcome we offer him." [*Manchester Guardian :* 20 May, 1930].

কবি অবশিষ্ট দুটি বক্তৃতা দেন যথাক্রমে ২১শে ও ২৬শে মে। তাঁহার বক্তৃতা ইংলণ্ডে অপূর্ব চাঞ্চল্য ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছিল। সমস্ত পত্র-পত্রিকায় বড়ো বড়ো শিরোনামায় বক্তৃতার সারাংশ প্রকাশিত হয়। কবির বক্তৃতার শেষে স্যার

মাইকেল স্যাড্‌লার (Sir Michael Sadlar) উচ্ছ্বসিত ভাষায় কবিকে অভিনন্দন জানাইয়া বলিলেন :

'We shall never forget in Oxford the gift you have given us and the inspiration you have brought to us.'

কবির হিবার্ট বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল—The Religion of Man, অনতিকাল পরে বিলাতে উপরোক্ত শিরোনামায় বক্তৃতাগুলির সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উহার প্রায় তিন বৎসর পরে 'কমলা বক্তৃতা'র সময় বাংলায় 'মানুষের ধর্ম' নামে ঐ বক্তৃতার বিষয় ও মূল বক্তব্যটি নূতনভাবে পরিমার্জিত আকারে লিখিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে আমরা উহার আলোচনায় আসিব।

২১শে মে কবির হিবার্ট বক্তৃতার দ্বিতীয় বক্তৃতাটি পাঠ করেন। বক্তৃতার পর লণ্ডন হইয়া সোজা বার্মিংহামে উড্‌ব্রুক কলোনীতে কয়েকদিনের জন্য যান। ২২শে মে বার্মিংহামে George Cadbury Memorial Hall-এ 'Civilisation and Progress' নামে একটি ভাষণ দেন। তিনি তাঁহার ভাষণে পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে গিয়া বলিলেন :

'সমৃদ্ধশালী পাশ্চাত্যের রথচক্রের পশ্চাতে আমরা—ভারতবাসীদিগকে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ধূলায় আমাদের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে, আমাদের নিরতিশয় অসহায় অবস্থায় আমরা বিনীত এবং ইহার দুরন্ত গতিবেগ আমাদের বিহ্বল ও অভিভূত করিয়াছে। আমরা স্বীকার করিতে সম্মত হই, এই রথযাত্রাই হইতেছে অগ্রগতি আর এই অগ্রগতিই হইল সভ্যতা। কিন্তু কদাপি যদি আমরা সাহস অবলম্বন করিয়া প্রশ্ন করিয়াছি, 'এই অগ্রগতি কোন দিকে,—কিসের জন্যই বা অগ্রগতি ?' অমনি ইহা বিশেষ প্রাচ্যদেশীয় উদ্ভট হাস্যকর বলিয়া উপহাসিত হইয়াছে।'

তারপর তিনি সেই সময়কার "নেশন" পত্রিকা পরিবেশিত একটি সংবাদের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সম্প্রতি আফগানিস্তানে বোমাবর্ষণকালে একটি ব্রিটিশ বোমারু বিমান মাটিতে অবতরণ করিতে বাধ্য হয়। তখন সেখানকার দলপতি ও মহিলারা সেই বৈমানিকদের কিভাবে চারিপাশের ক্রুদ্ধ জনতার ভ্রূকুটি ও শাণিত ছুরিকা উপেক্ষা করিয়া নিরাপদ আশ্রয় এবং আহার-পানীয় দ্বারা তাহাদের রক্ষা ও আপ্যায়ন করে তিনি তাহারই কথা উল্লেখ করেন। এই ঘটনার তাৎপর্য-প্রসঙ্গে কবি মন্তব্য করিলেন :

"In the above narrative, the fact comes out strongly that the West has made wonderful progress. She has opened her path across the etheral life of the earth. The explosive force of the bomb has developed its mechanical power of wholesale distruction to a degree that could be represented in the past only by the personal valour of a large number of men. But such enormous progress has made man diminutive. He proudly imagines that he expresses himself when he displays the things he produces and the power he holds in his hands.

The bigness of the results and mechanical perfection of the apparatus hide from him the fact that the man in him has been smothered."

পাশ্চাত্য সভ্যতা বর্তমান যুগে তাহার মানবিকতার আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়াছে—এই অভিযোগ কবির বহুদিনের। অবশ্য পাশ্চাত্য সভ্যতার কেবলমাত্র নৈতিমূলক সমালোচনায়ই কোনদিন কবি ক্ষান্ত হন নাই,—উহার সৃজনশীল অবদানও আছে, কবি বার বার তাহার স্বীকৃতি দিয়াছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার দুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্য আমাদের চিত্তে আলোড়ন আনিয়া কর্মের গতিবেগ সঞ্চারিত করিয়াছে, এই প্রসঙ্গে তিনি পুনরায় তাহার উল্লেখ করিলেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে তাঁহার প্রধানত অভিযোগ তেমনি প্রবল থাকে :

"Our society, which should have music in its voice and beauty in its limbs, becomes under a prolific greed like an overladen market car, grinding and creaking on the road that leads from things to nothing, tearing ugly ruts across the green life until it breaks down with its own vulgarity, reaching nowhere.'

এই বক্তৃতার পরদিনই কবি লণ্ডনে যান। ১৪ই মে লণ্ডনে কোয়েকারদের সম্মেলন হয়। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে ভারতবর্ষের পরিস্থিতি সম্পর্কে বলিবার আমন্ত্রণ জানান হয়। ঐদিনই ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কবি এক দীর্ঘ ভাষণ দেন। কোয়েকারদের এবং এক শ্রেণীর ইংরাজ বুদ্ধিজীবীর প্রশ্ন,—বৃটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা কোন পথে এবং কিভাবে সম্ভব ? সেদিন কবি তাঁহার ভাষণে যাহা বলিলেন তাহার সারমর্ম ছিল এই : (কবির স্বাক্ষরিত এই ভাষণটির পূর্ণাঙ্গ বয়ানটি আমেরিকার বিখ্যাত *Unity* পত্রিকায় প্রকাশিত) :

বহুকাল পূর্বে মহাত্মা গান্ধী যখন একবার শান্তিনিকেতনে আসেন তখন কবি স্বরাজ সম্পর্কে তাঁহার ধারণার কথা ব্যক্ত করিবার অনুরোধ জানান। গান্ধীজী সে-প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়া বলেন যে, তিনি ইংরাজ জাতির প্রতি সত্যকারের আন্তরিক শ্রদ্ধাভাব পোষণ করেন। কবি উহার ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, গান্ধীজী আত্মস্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নে বৃটেনের সঙ্গে ভারতের সমস্ত সম্পর্কচ্ছেদ একেবারে অনিবার্য ভাবিতেছিলেন না—যদি উভয় দেশের পারস্পরিক সম্পর্কটি ঠিক বা ন্যায়সঙ্গত হয়। কিন্তু এখন মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাঁহার দীর্ঘকাল পোষিত আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছেন এবং তাঁহার মতে এই বুঝাপড়া ও আপসের সকল সম্ভাবনার পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কবি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন :

"This has happened inspite of the fact that our present Viceroy is the best type of English gentleman, which according to me means the best specimen of humanity."

ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে কবি বলিলেন,—'ভারতবর্ষ এক জটিল যন্ত্র দ্বারা শাসিত হইতেছে। এই যন্ত্রের যাহারা চালক দীর্ঘকাল শক্তির দীক্ষায় তাহারা শিক্ষা

ও অনুশীলন করিয়াছে—যাহাদের মানবিকতার কোনো ঐতিহ্য নাই। আর তাহাদের আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের জন্যও তাহারা সজীব ভারতবর্ষকে বুঝিতে পারে না। ইতিমধ্যেই অবশ্য ইউরোপের আলোড়নকারী স্পর্শে ভারতের জাগরণ আসিয়াছে। কিন্তু শতাধিক বর্ষের সৃষ্ট ভারতের বর্তমান শাসনযন্ত্র ইহাকে উপেক্ষা ও অস্বীকার করিতেছে। ব্রিটিশ দলননীতি কিভাবে ভারতের সাম্প্রতিক জনজাগরণকে নিষ্পেষিত করিতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া কবি বলিলেন :

"I know at this moment there are thousands in my country who are suffering without any chance of redress, even those who do not deserve it. For the *machine-government* let loose its fury of wholesale suspicion against risks which its blindness cannot define.……

"I deliberately use the word *machine*, for it is not your great people who is behind this fight. I myself have a firm faith in what is human in your nation, and the credit is yours for this very struggle for freedom that has been made possible today in India. The courage that has been aroused in our country, the courage to suffer, carries an unconscious admiration for your own people in its very challenge. At heart it is a moral challenge, being sure of a moral response in your mind when our claim is made real to you by our sufferings. And I dare ask you to contradict me when I say that such sufferings have won your admiration, and that you allow to be perpetrated in a state of panic upon a people who are no match for you in power to return your blows adequately or retaliate your insults, for you cannot belie your real nature and all that has made you great.

"Being sure of it, Mahatma Gandhi had the temerity to ask you to take our side and help us to gain *the greatest of all human rights, freedom* and to free yourself from the one-sided relationship of exploitation, which is parasitism, surely causing gradual degeneration in your people without your knowing it."

এ পর্যন্ত বলা যায়, কবি গান্ধীজী পরিচালিত ভারতের জাতীয় সংগ্রামের—এবং বিশেষ করিয়া গান্ধীজীর চিন্তা ও আদর্শের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন। এবং গান্ধীজী পরিচালিত এই আন্দোলনের প্রতি তাঁহার সমর্থনও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতের প্রশ্নে একান্ত ও বিচ্ছিন্ন জাতীয় স্বাধীনতাকে তিনি কখনও সমর্থন করেন নাই এবং এক্ষেত্রেও করিলেন না। তিনি চিরদিনই জাতিসমূহের পরস্পর-নির্ভরতা ও সহযোগিতার আদর্শের কথা বলিয়াছেন এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে বৃটেন ও ভারতবর্ষের তথা পশ্চিম ও পূর্বের শ্রেষ্ঠ মননশীল ব্যক্তিদের শাসক-শাসিত কিংবা প্রভু-দাস সম্পর্ক নয়—পারস্পরিক

সহযোগিতা ও কল্যাণসাধনের আদর্শে মিলিত হইবার আহ্বান জানান। এইদিনের ভাষণের উপসংহারেও সেই আহ্বান জানাইয়া তিনি বলিলেন :

"There can be no absolute independence for man. Interdependence is in his nature and it is his highest goal. Let the best minds of the East and West join hands and establish a truly human bond of interdependence between England and India in which their interests may never clash, and they may gain an abiding strength of life through a spirit of mutual service without having to bear *a perpetual burden of slavery* on one side and that of a diseased responsibility on the other which is demoralising.…

"Let us, the dreamers of the East and West, keep our faith firm in the life that creates and not in the machine that constructs—in the power that hides its force and blossoms in beauty, and not in the power bares its arms and chuckles at its capacity to make itself obnoxious. *Let us know that the machine is good when it helps but not so when it exploits life.*" (*Itals—mine*).

[*Unity* : August 18, 1930]

উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের এই বক্তৃতার পর কোয়েকার সম্মেলনে কিছু বাদ-প্রতিবাদ হয়। বিলাতের এই উদারনৈতিক ভাবুক সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা প্রবণতার ও বিভিন্ন চরিত্রের মানুষের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ব্রিটেনের কায়েমী স্বার্থের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। স্বভাবত ইহারা রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতায় ক্ষুণ্ণ হন এবং দু'একজন কিছু প্রতিবাদও করেন। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের ন্যায়সঙ্গত দাবীর প্রশ্নে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই তাঁহাদের বুঝাইয়া বলেন :

"I ask you for your co-operation and that you may realise yourselves in our place and recall the time when your own brothers in America wanted to secure their freedom with the blood. *Will you realise we want the privilege of serving our own country in our own way and to solve our problems. Give us the right to serve our country.*

[(*Itals—mine*) *The Friend* : 30 May—1930]

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা একেবারে নিষ্ফল হয় নাই এবং সম্মেলনে এক বিতর্কের পর কোয়েকারদের পক্ষ হইতে ব্রিটেনের শ্রমিক গভর্নমেন্টের নিকট গান্ধীজীর সহিত আপস করিবার জন্য চাপ দিবারও প্রস্তাব হয়। এই সম্পর্কে বিলাতের একটি পত্রিকা লিখিতেছে (২৬শে মে) :

"The warning from Dr. Rabindranath Tagore has been received seriously. It might be remembered that the Society of Friends, the organisation of Quakers, recently came out with an appeal on behalf of India.…The Society's annual meeting was held on saturday and

there was a discussion as to what steps the Society should take in regard to India. ……that the Society should follow the historical precedent set up in its attitude towards American Independence and actively indentify itself with the movement for Indian freedom. A practical suggestion was made that the Society must urge on the Labour Government the immediate need for an amicable settlement with Mahatma Gandhi."

২৫শে মে কবি Chapel of Manchester College-এ "Night and Morning" নামে ভাষণ দেন। পরদিন কবি তাঁহার হিবার্ট বক্তৃতার সর্বশেষ ভাষণটি দেন। হিবার্ট বক্তৃতার শেষে তিনি পুনরায় কোয়েকারদের উডব্রুক সেটেলমেণ্টে যান।

উহার দুই তিন দিন পর কবি লণ্ডনে আসেন। লণ্ডনে তিনি ভারতের হাইকমিশনার স্যর অতুল চ্যাটার্জীর বাসভবনে ভারতসচিব স্যর ওয়েজ্‌উড বেন্‌-এর সহিত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। সমস্যার কোন সমাধান বাহির করা যায় কিনা, তাহাই ছিল কবির চেষ্টা। এই সময় কোয়েকারদের একটি ডেপুটেশনও ভারতসচিবের নিকট উপস্থিত হইয়া গান্ধীজীর সঙ্গে একটা আপস-মীমাংসায় আসিবার জন্য আবেদন জানায়।

কবি লণ্ডনে কয়েকদিনই থাকেন। বিভিন্ন সভা-সমিতি ও জনসভায় তাঁহাকে যোগদান করিতে হয়। ৪ঠা জুন লণ্ডনে Indian Society-র উদ্যোগে এক রবীন্দ্র-সম্বর্ধনা সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন স্যর ফ্রান্সিস ইয়ংহাসবেণ্ড (Sir Francis Younghusband)। সভায় নেদারল্যাণ্ডের মন্ত্রী Sir Thomas Arnold, বিখ্যাত ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রী Fox Strangways, H. S. Polak. প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য অতিথি উপস্থিত ছিলেন। সভায় আর্নল্ড বাকে (Arnold Bake) রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। সভার উদ্যোক্তারা কবির একটি চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন এবং কবিকে তাঁহার চিত্রসম্পর্কে দু-চার কথা বলিতে হয়।

৫ই জুন, লণ্ডন হইতে কবি ডার্টিংটন হলে এলমহার্স্টদের বাড়িতে যান। এই সময় এণ্ড্রুজের সহায়তায় Universal Relations Peace Conference নামে বিলাতের একটি গোষ্ঠী Rece Conference আহ্বানের বা জাতি সম্মেলনের চেষ্টা করেন। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে একটি বাণী দিতে হয়। কবি তাঁর ক্ষুদ্র বাণীতে বর্ণসমস্যা সমাধানে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়া বলেন (৫ই জুন, ১৯৩০) :

"I regard the race and colour prejudice which barricades human beings against each other as the greatest evil of modern times, which should be overcome if humanity must be realised as one in spirit :

"The different paths along which progress may be made towards recovery from this evil are manifold. My own stress would be laid upon elevation of the public mind and the collection and dissemi-

nation of accurate scientific knowledge as against the pseudo-science and pseudo-religion which, in their disguise of truth are treacherously dealing mortal blows to truth herself.

"There should be a united effort to combine the emotional forces of religion, in its broadest sense, with the spread of education based on fully assertained truth concerning the human race as a whole."

[*The Friend* : London : 13 June. 1930]

এলমহার্স্টদের বাড়িতে কবি কিছুদিন বিশ্রামের উদ্দেশ্যেই গিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের আন্দোলনের খবরে তাঁহার মন উত্তরোত্তর ক্ষুব্ধ ও অশান্ত হইয়া উঠে। স্মরণ রাখা দরকার, গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের পর আইন-অমান্য আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গান্ধীজীর গ্রেপ্তারে ধরসনা লবণগোলা অধিকারের সত্যাগ্রহ অভিযানের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয় নাই। ২১শে মে সরোজিনী নাইডু ও ইমাম সাহেবের নেতৃত্বে দুই হাজার সত্যাগ্রহী ধরসনার লবণগোলা অভিযান শুরু করেন। পুলিশের প্রচণ্ড পদাঘাত ও লাঠিবর্ষণের মধ্যেও দলে-দলে ক্ষতবিক্ষত নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের অভিযান অব্যাহত থাকে। অনুরূপ বীরত্বপূর্ণ অভিযান বোম্বাইয়ের ওয়াদালায় চলিতে থাকে। এই পৈশাচিক নৃশংসতা ও জঘন্য আক্রমণের মধ্যেও সত্যাগ্রহীদের অসীম বীরত্ব ও অপরাজেয় মনোবল অটুট দেখিয়া George Slocombe ও Mr. Miller প্রমুখ ইঙ্গ-মার্কিন সাংবাদিকরা বিস্ময়ে অভিভূত হন। তাঁহারা এই সত্যাগ্রহ অভিযানের উপর ব্রিটিশের নৃশংস নির্যাতনের দীর্ঘ মর্মস্পর্শী বিবরণ লিখিতে থাকিলে সারা বিশ্বে দারুণ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অপরদিকে পেশোয়ারে তখনও আকাশ হইতে বোমাবর্ষণ অব্যাহত থাকে। জুন মাসের প্রথম ভাগেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে আইন অমান্য আন্দোলনকে ব্যাপকতর ও তীব্রতর করিবার বিস্তারিত কর্মসূচী গৃহীত হয়। ইহার ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে মহিলারাও এবার ব্যাপকভাবে আন্দোলনে যোগ দিয়া দলে দলে কারাবরণ করিতে থাকেন।

এইসব ঘটনার নানা বিকৃত ও অর্ধসত্য সংবাদে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়া উঠেন। ৭ই জুন তিনি *The Spectator* পত্রিকায় দেশের এই পরিস্থিতির দীর্ঘ আলোচনা করিয়া প্রবন্ধাকারে একটি বিবৃতি দেন।

শুরুতেই কবি বলেন,—ভারতবর্ষ ও বৃটেনের মধ্যে যে বিরাট নৈতিক ব্যবধান ও অস্বাস্থ্যকর সম্পর্কের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূর করিয়া কিভাবে উভয় দেশের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারা যায় সে-সম্পর্কে আলোচনা করাই তাঁহার এই প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য। এই কারণেই তাঁহার এই আবেদন রাজনীতিবিদ ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর নিকট নহে,—সেই মহত্তর আদর্শের নিকট যাহা ব্রিটিশ জাতির ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছে।

কিন্তু ব্রিটিশ জাতি তাহার এই মহান আদর্শবাদ লইয়া এশিয়ায় যায় নাই। ব্রিটিশ তাহার সম্পদরাশি লইয়া নয়—অপরিমিত দম্ভ ও ক্ষমতামদে-মত্ত হইয়া তাহার

প্রয়োজন ও আত্মসমৃদ্ধির স্বার্থেই সেখানে গিয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করিয়াছে। কিন্তু এশিয়া ইহা কখনও মানিয়া লইবে না যে, মনুষ্যত্বহীন শক্তি বিজ্ঞানের সাহায্যে চিরকালের জন্য সাফল্য লাভ করিবে।

তিনি বলিলেন, ভারতবর্ষে সম্প্রতি যাহা সত্যকারের ঘটিতেছে সে-সম্পর্কে ইংলণ্ড-বাসীদের অজ্ঞ রাখা হইতেছে। কেননা এইরকম সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে এইসব গভর্নমেণ্ট,—যাহারা তাহাদের সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য বলপ্রয়োগের সহজ সংক্ষিপ্ত পথ অবলম্বন করে—তাহারা তাহাদের শত্রুদের অপেক্ষাও নিজ দেশের জনগণের মহত্তর শক্তিকে (higher spirit) অধিকতর ভয় করে। এবং এই জন্যই তাহারা নিজেদের এইসব কার্যকলাপ গোপন এবং প্রতিপক্ষের উপর কলঙ্কলেপনের জন্য চতুর্দিকে অন্ধকার ধূম্রজাল সৃষ্টি ও মিথ্যা দোষারোপ করিয়া চলে। গত মহাযুদ্ধে ইহার অপর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সুসংগঠিত শক্তির দেশগুলির উচ্চঘোষক প্রচারযন্ত্র আছে, কিন্তু আমরা—যাহাদের উপযুক্ত প্রচারযন্ত্র নাই এবং ইংলণ্ডবাসীদের সঙ্গে এমন আত্মীয়তার সম্পর্কও নাই যাহাতে তাহাদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারি, তাহাদের দীর্ঘদিনের দুর্বলতার ইতিহাসের জাতিগত প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এইসব বিকৃত ও অপপ্রচার বাধ্য হইয়া মানিয়া লইতে হয়। এই অজস্র প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে গান্ধীজীর নেতৃত্বে দেশবাসী যে অপরাজেয় মনোবল ও মহান নৈতিক সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে তাহার জন্য তাহাদের অভিনন্দন জানাইয়া তিনি বলিলেন :

…"Yet I cannot allow this occasion to pass by without declaring that with few exceptions, inevitable in the present atmosphere of panic and defiance, India in this trial has maintained her dignity of soul. Even through distortion and suppression of truth, and circulation of untruth with belated contradiction in small letters, the fact glimmers out that our people, with a pious determination, has kept unshaken the difficult ideal which they have accepted from their great leader Mahatma Gandhi, who upholds the noblest spirit of India, the spirit of Buddha himself. To us who are away from our homes there has reached the voice of the sufferers across the barriers of silence and the sea, carrying above the smothered cry of pain, the exaltation of a fulfilled vow under extreme provocation. My prayer for my people is not for the cessation of their suffering, but for the keeping up of their trust in the power of the human spirit which shows itself in all its might of truth among those who are physically weak ; for we who have both the occasion and the responsibility to prove this, not only on behalf of India, but of all humanity."

ইহা হইতেই বুঝা যায়, গান্ধীজী প্রবর্তিত জাতির এই সংগ্রাম সম্পর্কে কবি কী সুউচ্চ ধারণা পোষণ করিতেছিলেন।

পরিশেষে তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে বলেন, পীড়ন ও অত্যাচার যত কঠিনই হউক, তাহার জন্য দোষারোপ ও অভিযোগ না করিয়া হাসিমুখে তাহা সহ্য করিবার নৈতিক মনোবল আমাদের থাকা চাই। তিনি তাহাদের আরও স্মরণ করাইয়া দেন যে, ব্রিটিশের পরিবর্তে অন্য যে কোনো সাম্রাজ্যবাদী শাসক হইলে অনুরূপ ক্ষেত্রে আমাদের উপর আরোও বেশি অত্যাচার ও পীড়ন হইত। তিনি বলিলেন :

…"In fact, if the lesson of history must be acknowledged, our people should never murmur against violence on the part of their rulers when normal conditions of government have been upset. We must expect this and face it, and never complain and blame the Government for drastic measures which we have deliberately made inevitable, while fully, I hope, anticipating the consequence. To light the fire and then complain that it burns is absurdly childish. And, therefore, we should, in all fairness, take upon ourselves the ultimate responsibility of the flogging and shooting, of injuries and indignities, of indiscriminate methods of striking terror into the hearts of a helpless multitude and of the awful fact that the majority of victims must necessarily be innocent in a catastrophic outrage of this nature.…

"The only thing which is most important for us to remember is that we should heroically uphold our own *Dharma* and refuse to accept defeat by offering violence in return.

[*The Spectator* : June 7, 1930.]

স্মরণ রাখা দরকার, কয়েক বৎসর পূর্বে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' পুস্তকটি ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইলে শরৎচন্দ্র এ বিষয়ে কবিকে প্রতিবাদ জানাইবার অনুরোধ করিলে কবি জবাবে শরৎচন্দ্রকে সেদিন ঠিক এই কথাটাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন (২৭শে মাঘ, ১৩৩৩) :

…"ইংরেজরাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজরাজকে আমরা নিন্দা করব সেটাতে পৌরুষ নেই।…রাজশক্তির আছে গায়ের জোর, তার বিরুদ্ধে কর্তব্যের খাতিরে যদি দাঁড়াতেই হয় তাহলে অপরপক্ষে থাকা উচিত চারিত্রিক জোর—অর্থাৎ আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোর। কিন্তু আমরা সেই চারিত্রিক জোরটাই ইংরেজরাজের কাছেই দাবী করি নিজের কাছে নয়। তাতে প্রমাণ হয় যে, মুখে যাই বলি নিজের অগোচরে ইংরেজকে আমরা পূজা করি—ইংরেজকে গাল দিয়ে কোনো শাস্তি প্রত্যাশা না করার দ্বারাই সেই পূজার অনুষ্ঠান।…যে কোনো দেশেই রাজশক্তিতে প্রজাশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেচে সেখানে এমনিই ঘটেচে—রাজবিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকতে পারে না, এই কথাটা নিঃসন্দেহে জেনেই ঘটেচে।…

[বিশ্বভারতী পত্রিকা : ৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ; পৃঃ ৯৬-৯৭]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে কখনও কখনও এইরূপ নির্দেশ দিলেও তাঁহার

নিজের ক্ষেত্রে এই নীতি পালন করেন নাই। বস্তুত সারাজীবনই কবি ব্রিটিশের দমননীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও ভর্ৎসনা করিয়াছেন।

কবি ইংলণ্ডে আরও মাসখানেককাল কাটান। বিশ্বভারতীর আর্থিক সাহায্য সংগ্রহের জন্য তিনি তাঁহার বিলাতের বন্ধুদের নিকট আবেদন জানাইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল হয় নাই। কিছুদিন পরে তিনি ইংলণ্ড হইতে জার্মানী যাত্রা করেন।

জার্মানী ও ডেনমার্কে

১১ই জুলাই ইংলণ্ড হইতে আরিয়াম ও অমিয় চক্রবর্তীসহ রবীন্দ্রনাথ বার্লিনে পৌঁছিলেন। বার্লিনে তাঁহারা হারনাকদের গৃহে (এডলফ্ ফন্ হারনাক্) আতিথ্য গ্রহণ করেন। পরদিন কবি জার্মানীর রাইখ্স্টাগে গিয়া সদস্যদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। উল্লেখযোগ্য, ইহার অল্প কয়েকদিন পূর্বে রাইনল্যাণ্ড হইতে ফরাসী ও মিত্রপক্ষ সৈন্য অপসারণ করায় সাময়িকভাবে জার্মানবাসীরা কিছুটা আশ্বস্ত হয়। মার্শাল হিণ্ডেনবুর্গ তখন প্রেসিডেণ্ট এবং অল্প কয়েকমাস পূর্বে ব্রুয়েনিং (Bruening—March 28, 1930) চ্যান্সালার নির্বাচিত হন। রাইখ্স্টাগ সদস্যদের সহিত কবির কী বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয় তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে জার্মানী পৌঁছানর পর চারিদিক হইতে রবীন্দ্রনাথের সাদর আহ্বান ও নিমন্ত্রণ আসিতে থাকে।

কিন্তু সর্বপ্রথমে কবি আইনস্টাইনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন। ১৪ই জুলাই তিনি অমিয় চক্রবর্তীসহ আইনস্টাইনের বাড়ি কাপুথ-এ গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের আলোচনা ও কথোপকথনের বিবরণ 'The Religion of Man' গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংকলিত হইয়াছে। এই সাক্ষাৎকার ও আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ *'The New York Times Magazine'* পত্রিকায় প্রকাশিত (10th August 1930) হয়।

আইনস্টাইনের সহিত কবির কয়েকবারই সাক্ষাৎকার হয় এবং এসব আলোচনার পর আইনস্টাইন সম্পর্কে তাঁহার যে ধারণা হয় সে-সম্পর্কে কিছুকাল পরে তিনি লিখিয়াছিলেন :

"প্রথম মহাযুদ্ধের পর জারমেনিতে গিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে আমার দেখা। মনে পড়ে আমাদের আধুনিক জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নে আধুনিক যন্ত্রশিল্পের উপযোগিতা সম্পর্কে আমাদের আলাপ হয়েছিল। তখন (১৯২৬) আমি বলেছিলেম, আর আজও আমি বিশ্বাস করি, যন্ত্রবিদ্যার এই উন্নতি আসলে আমাদের শারীরিক কল্যাণবিধানের অনুকূল—বিশেষত, এই উন্নতির প্রতিরোধ যখন অসম্ভব, তখন প্রয়োজনের তাগাদায় মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি জীবনে যে সুবিধার সৃষ্টি করেছে তার সুচিন্তিত সদ্ব্যবহার করাই তো আমাদের কর্তব্য। সভ্যতার যে-স্তরে মানুষ আজ

উন্নীত, তাতে যেমন আঙুলে জমি আঁচড়ে চাষ করার কথা ভাবা যায় না, তেমনি হস্তপদ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় সেখানে পরাজিত, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি যন্ত্রসৃজন ক'রে আমাদের অক্ষমতা ঘুচিয়ে চলেছে। আইনস্টাইন আর আমার মধ্যে এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ মতের মিল হল যে, নূতন নূতন যন্ত্রাবিষ্কারের সাহায্যে প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে আমাদের জীবনযাত্রার সম্পদ আহরণ করতে হবে।

"গত বৎসরের (১৯৩০) গ্রীষ্মে আবার যখন জারমেনিতে যাই, বার্লিনের কাপুথ-এ (Kaputh) আইনস্টাইনের নিজের বাড়িতে গিয়ে দেখা করার আমন্ত্রণ পেলাম। 'দুদিন' আগে অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতামালায় যা বলেছিলাম, *The Religion of Man* নাম দিয়ে পুস্তকের আকারে গ্রথিত করতে তখন ব্যস্ত ছিলাম, সেই ভাবনায় আমার মন তখন ভরপুর। আইনস্টাইনের সঙ্গে আলাপের সূত্রপাতেই বুঝলাম যে তিনি ধরে নিয়েছেন, 'আমার বিশ্ব' মানবিক ধ্যানধারণা দিয়ে সীমাবদ্ধ বিশ্ব। এ দিকে তাঁর দৃঢ় প্রতীতি এই যে মানববুদ্ধির নাগালের বাইরেও আছে এক সত্য। আমার বিশ্বাস, ব্যষ্টিমানব ঐক্যসূত্রে বাঁধা সেই দিব্য মানবের সঙ্গে যিনি আমাদের অন্তরে, আবার বাইরেও। অনন্তের ভূমিকায় বিরাজিত মানুষ, সেই অনন্ত মূলতঃই মানবিক। আমাদের ধর্মসাধনা নয় বিশ্বভৌমিক, আবার যে সজীব ব্যষ্টিসত্তা নিয়ে তার করণকারণ, তার আছে শুভাশুভের আদর্শভাবনা। স্বভাবের মধ্যে ঐ প্রকার শুভাশুভের নীতি বা নিন্দনীয়তা বিজ্ঞানের স্বীকার্য নয়. নিরাবরণ নিরাভরণ 'অস্তি' নিয়েই তার কারবার। বিজ্ঞানে ব্যক্তিসত্তার কোনো উপযোগিতা নেই। অথচ, অধ্যাত্মপথে বা ধর্ম-সাধনায় নিছক বাস্তব তথ্য বা তৎসম্পর্কিত তত্ত্ব কোনো কাজে লাগে না।

"একক নিঃসঙ্গ মানুষ ব'লে আইনস্টাইনের খাতির আছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছের ভিড় থেকে গাণিতিক ভাবনা ও দৃষ্টি মানুষের মনকে মুক্তি দেয় যেখানে, সেখানে তিনি একক বৈকি। তাঁর জড়বাদকে তুরীয় বলা চলে, দার্শনিক ধ্যানধারণার সীমান্তচুম্বী, সীমাবদ্ধ অহমের জটিল জাল থেকে—জগৎ থেকে—নিঃসম্পর্ক মুক্তি হয়তো সেখানে সম্ভবপর। আমার কাছে, বিজ্ঞান এবং আর্ট দুটিই মানুষের স্বরূপ প্রকৃতির প্রকাশ, জৈবিক প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের বাইরে, আর আপনাতেই আপনার তার অপরিসীম এক সার্থকতা আছে।"

[বিশ্বভারতী পত্রিকা : (অনুবাদক : কানাই সামন্ত) : শ্রাবণ-আশ্বিন—১৩৬২]

১৬ই জুলাই বার্লিনে রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনী হয়। বার্লিন হইতে একপত্রে অমিয় চক্রবর্তী লিখিতেছেন :

…"আইনস্টাইন কাছেই আছেন। প্রায়ই দেখাশোনা হয়। জার্মানীর ন্যাশনাল গ্যালারি রবীন্দ্রনাথের পাঁচখানা ছবি চেয়ে নিল। হৈচৈ পড়ে গেছে।"…

[প্রবাসী : কার্তিক ১৩৩৭ : পৃঃ ৯৮]

পরদিন তাঁহারা ড্রেসডেন-এ যান। সেখানে তাঁহারা দুইদিন থাকার পর—১৯শে জুলাই প্রাতে ব্যাভেরিয়ার রাজধানী মিউনিকে পৌঁছিলেন। স্টেশনে '*Deutsche Akademie*'র পক্ষে অধ্যাপক Arnold Sommerfled প্রমুখ ও বহু গুণিজন কবিকে অভ্যর্থনা জানান। মিউনিকের হিন্দুস্থান ক্লাবের পক্ষে ডাঃ কালিপদ বসু

মাল্যদান করিয়া কবিকে ভারতীয় রীতিতে সংবর্ধনা জানান। ঐদিনই অপরাহ্ণে তাঁহারা ব্যাভেরিয়ার Oberammergau গ্রামে সেখানকার বিখ্যাত 'প্যাশন প্লে' দেখিবার জন্য যান। যীশুখ্রীষ্টের জীবনলীলার অভিনয়ই এই 'প্যাশন প্লে'র বিষয়বস্তু। ধর্মপ্রাণ ও সরলবিশ্বাসী ব্যাভেরিয়ার কৃষকেরা এই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। পরদিন সকাল ৮টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত—সারাক্ষণ বসিয়া রবীন্দ্রনাথ এই অভিনয় দেখেন। মিউনিকস্থ মাদ্রাজের *Hindu* পত্রিকার সংবাদদাতা লিখিতেছেন :

…"The whole of the next day (20th July) was spent in Oberammergau where the poet attended the world famous Passion Play. True to their oath, the bearded and untutored peasants of this unassuming village in South Bavaria have staged the life of Christ at the regular interval of ten years as a mark of gratitude to God who saved them from a devastating pestilence in the year 1633, and such is the success of their spontaneous flow of piety and devotion that even Rabindranath, one of the greatest creative minds of the world in the field of art, patiently watched the performance from 8 in the morning till 6 in the evening when it came to an end and bore testimonial to the fact that the Oberammergau Passion Play is really enchanting. [*Hindu*—Madras : Sept. 8, 1930]

রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিতেছেন :

"এই ঘটনাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই অভিনয় দেখিয়া কবির মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহাই *The Child* নামে কাব্যে রূপ লয়। কিছুকাল পূর্বে জারমেনির বিখ্যাত উফা কম্পানি কবিকে ফিল্মের উপযুক্ত একটা কিছু লিখিয়া দিবার অনুরোধ করে।…

"*The Child* রবীন্দ্রনাথের একমাত্র কাব্য যাহা মূল ইংরেজিতে রচিত, পরে তাহা 'শিশুতীর্থে' নূতন রূপ গ্রহণ করে,"…

[রবীন্দ্রজীবনী : তৃতীয় খণ্ড : পৃঃ ৩৭৭-৭৮]

অভিনয় দেখিয়া ঐদিনই সন্ধ্যায় কবি মিউনিকে প্রত্যাবর্তন করেন। পরদিন প্রাতে অধ্যাপক Forester এবং Schermann প্রমুখ মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপকদের কবি তাঁহার মিউনিকস্থ আবাসগৃহে অভ্যর্থনা জানান। ঐদিনই অপরাহ্ণে তিনি মিউনিকের International Students' Home পরিদর্শন করেন। সেখানে ছাত্রসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি ভারতের ও জার্মানীর ছাত্রসংগঠনগুলির সাদৃশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। ঐদিনই সন্ধ্যায় মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিকে একটি ভাষণ দিতে হয়। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল, Principles of Art। মিউনিকের সমস্ত পত্র-পত্রিকায় এই বক্তৃতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়।

পরদিন ২২শে জুলাই মিউনিক *Deutsches Museum*-এর প্রতিষ্ঠাতা Oskar Von Muller তাঁহাকে মিউজিয়াম পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানান। মধ্যাহ্নে প্রায় তিন

ঘণ্টা ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি কবিকে মিউজিয়ামের মূল্যবান সংগ্রহগুলি দেখান। কবির সম্মানে তিনি সেখানে এক ভোজসভার আয়োজন করেন এবং অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার সহ কিছু ভারতীয় ছাত্রও সেখানে আমন্ত্রিত হন। সন্ধ্যায় মিউনিকের মেয়র সেখানকার টাউন হলে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানান। মিউনিকের Town Register-এ কবি তাহার নাম স্বাক্ষর করেন। ঐদিনই *Deutsche Akademie* এক সান্ধ্য-ভোজসভায় কবিকে আমন্ত্রণ জানায় এবং তাঁহাদের উদ্যোগে ঐদিন রাত্রে কবির 'ডাকঘর' নাটকটি অভিনীত হয়।

পরদিন ২৩শে জুলাই মিউনিকের 'গ্যালারি ক্যাসপেরি'তে (Gallery Caspari) কবির চিত্রপ্রদর্শনী হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁহার চিত্র সম্পর্কে সাংবাদিকদের বলেন: "My poetry is for my countrymen, my paintings are my gift to the West."

জার্মানীতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনীর যে-বিরাট সমাদর হইয়াছিল সে-সম্পর্কে অমিয় চক্রবর্তী লিখিতেছেন :

…"যে রকম দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয়, ইংরেজি গীতাঞ্জলি লিখে নোবেল উপহার পাওয়ার সময় যে রকম য়ুরোপ জুড়ে আন্দোলন হয়েছিল, ছবি প্রকাশ করেও রবীন্দ্রনাথ সেই রকম আন্দোলন তুলেছেন। এ কথাটা ইতিমধ্যে আমাদের দেশের ইংরেজি খবরের কাগজে প্রকাশ পায় না, মারা পড়ে। আইনস্টাইনের নূতন আবিষ্কারের চেয়ে ইংরেজ লর্ড-লেডীর শেয়াল শিকারের খবর বেশী থাকে। যাই হোক, সমগ্র য়ুরোপে যে উৎসাহ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেচে, তার জোয়ার বঙ্গোপসাগরের কূলেও পৌঁছুবেই, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।"…

[প্রবাসী : কার্তিক, ১৩৩৭]

২৪শে জুলাই কবি ড্রেসডেন্-এ যান, সেখান হইতে পুনরায় বার্লিনে।

এবার জার্মানী ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ সেখানে যে-বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেন সেই সম্পর্কে অমিয় চক্রবর্তী ঐ পত্রেই লিখিতেছেন :

"সম্রাটের মতো জারমেনি পরিভ্রমণ করচি—শ্রেষ্ঠ যা-কিছু আপনিই আমাদের কাছে এসে পড়চে—যেখানে যা-কিছু সুন্দর, স্মরণীয়। এদেশের মনীষী যাঁরা ভাবচেন আঁকচেন লিখচেন—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সকলের পরিচয় ঘটেচে, আমরাও ভাগ পাচ্চি। এমন গভীর ক'রে বিচিত্র ক'রে য়ুরোপকে জানবার শুভযোগ কখনো হবে ভাবিনি।…পৃথিবীতে কোথাও রবীন্দ্রনাথকে এদের চেয়ে বেশি ভালোবাসে ভাবতে পারি না ; 'টাগোরে' শুনলেই হোটেলের কর্তৃপক্ষ, ট্রামগাড়ির টিকিটক্লার্ক, কলেজের ছেলেমেয়ে, অধ্যাপক বণিক রাষ্ট্রনেতা রাজকুল-প্রতিনিধি—এমন কেউ নেই এদেশে যার মুখ উজ্জ্বল হয়ে না ওঠে ; যেখানেই আমরা যাই জয়ধ্বনি আনন্দ অভ্যর্থনায় এদের পক্ষে উৎসাহ সংবরণ করা অসাধ্য হয়ে ওঠে। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে পথে পথে রৌদ্রে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে 'টাগোরে' দেখবে বলে—এদেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা যাঁরা তাঁরা সভয়ে ক্ষণেকমাত্র ওঁর কাছে এসে শ্রদ্ধা জানিয়ে উৎফুল্লচিত্তে চলে যান।"…

[প্রবাসী : কার্তিক ১৩৩৭ : পৃঃ ৯৭-১০০]

বলা বাহুল্য, আবেগ উচ্ছ্বাসপূর্ণ এইসব বিবরণী হইতে জার্মানীর অভ্যন্তরীণ চিত্রটির এতটুকুও আভাস পাওয়া যায় না।

স্মরণ রাখা দরকার, রবীন্দ্রনাথ যে-সময় ইউরোপ ও জার্মানী পরিভ্রমণ করিতেছেন তখন সারা জগদ্ব্যাপী এক নিদারুণ ভয়াবহ অর্থনীতিক মন্দা ও সঙ্কট চলিতেছে। কিছুকাল পূর্বেই আমেরিকা জার্মানীকে ঋণ দেওয়া বন্ধ করে অথচ তাহাকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের টাকাও গণিতে হইতেছিল, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে। ইহার ফলে জার্মানীর অভ্যন্তরীণ সঙ্কট ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ব্যবসা-বাণিজ্য অচল হইবার উপক্রম হয়, শতশত কল-কারখানা ও ব্যাঙ্ক-ডুবি হইতে থাকে। মার্কের দামও হু-হু করিয়া জলের দরে নামিতে থাকে। ১৯৩০ সালের শুরুতেই জার্মানীতে প্রায় ২,৩০০,০০০ লোক বেকার হইয়া পড়ে। শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে জার্মানীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীও প্রায় ধ্বংসের মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। জার্মানীর এই অর্থনীতিক সঙ্কট তাহার রাজনীতিক সঙ্কটকেও ঘনীভূত করিয়া তুলিতে থাকে। এই সঙ্কট মুহূর্তে জার্মানীর সোস্যাল ডেমোক্রাট ও কমিউনিস্টরা তাহাদের দীর্ঘকালীন দ্বন্দ্ব-কলহ ভুলিয়া কোন সম্মিলিত কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারে নাই। ফলে জনসাধারণ আরও বিভ্রান্ত হয়। আর এই প্রতিক্রিয়ার উর্বর ক্ষেত্রেই হিটলারের *Mein Kampf*-এর জীবনদর্শন জার্মানীর মধ্যবিত্ত যুবক ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে আস্তে আস্তে প্রভাবিত করিতে থাকে। জার্মানী তাহার পরাজয়ের গ্লানি ও ভার্সাই-সন্ধির অবমাননাকর শর্তের কথা যেন কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। সুতরাং সহজেই একশ্রেণীর মধ্যে হিটলারের প্রতি অনুরাগ বাড়িতে থাকে। অবশ্য তখনও পর্যন্ত এই হিটলার-অনুরাগী নাৎসীরা খুবই সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিল—উহার প্রায় তিন বৎসর পরে হিটলার ক্ষমতায় আসে। তাই জার্মানীতে এই হিটলারী ফ্যাসিবাদের গোপন প্রস্তুতির কথা বহির্বিশ্বে তেমন প্রচারিত হয় নাই এবং বস্তুতপক্ষে হিটলারকে তখন কেহ আমলই দেয় নাই। সম্ভবত এইসব কারণেই জার্মানীর রাজনীতিক পরিস্থিতির স্বরূপটি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ঠিক বুঝিয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই। তাছাড়া জার্মানীর জটিল রাজনীতি অনুধাবন করিবার জন্য যে-মানসিকতার প্রয়োজন তাহা যে রবীন্দ্রনাথের ছিল না, একথা বলাই বাহুল্যমাত্র। তবে তখনকার জার্মানীর রাজনীতির স্বরূপটি যে তিনি একেবারেই বুঝিতে পারেন নাই, তাহা নহে। অর্থনীতিক সঙ্কটের চাপে জার্মানজাতি যে ভিতরে-ভিতরে উগ্র-জাতীয়তাবাদী হইয়া উঠিতেছে তাহা তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারেন। এইবারের জার্মানী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি লিখিতেছেন, (১৪ই আগস্ট, ১৯৩০,):

…"এই যাত্রায় আগের বারের চেয়ে জর্মনির অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে আমার প্রবেশাধিকার ঘটেছে। ওদের কাছাকাছি এসেছি। এদের মধ্যে যে যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বজাতীয়তা আছে তা নয়, য়ুরোপের অন্য সকল জাতের হাতের ঠেলা খেয়ে এরা ভিতরে ভিতরে খুব কঠোরভাবেই ন্যাশানালিস্ট হয়ে উঠেছে। অথচ আমার উপরে এদের একটা বিশেষ প্রীতি কেন আছে ঠিক ভেবে পাইনে। আর যাই হোক অসামান্য এদের শক্তি, প্রকাণ্ড এদের বুদ্ধি, তা ছাড়া সব জিনিসকে সমষ্টিকরণের ক্ষমতা এদের আশ্চর্য। আমার তো মনে হয় য়ুরোপের কোন জাতেরই সকল বিষয়েই এত বেশি

জোর নেই। জর্মনির বিভীষিকা ফ্রান্সের মনে কিছুতেই যে ঘুচতে চায় না তার মানে বুঝতে পারি। এরা ভয়ংকর এক-রোখা। দারিদ্র্যের ঠেলা খেয়েই এদের শক্তি আরো যেন দুর্দম হয়ে উঠেছে।' [পথে ও পথের প্রান্তে : পত্র ৪৯ : পৃঃ ১০৯]

অবশ্য চিঠিতে একথা লিখিলেও জার্মানী ভ্রমণকালে তিনি কোন সভা-সমিতিতে জার্মানজাতির এই ক্রমবর্ধমান উগ্র-জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। ফুল-মালা-প্রশংসা-স্তুতিবাদে ভুলিবার লোক রবীন্দ্রনাথ নহেন। কেননা বিপুল সংবর্ধনা ও প্রশংসাবাদের মধ্যেও তিনি জাপানে বসিয়াই জাপানের উগ্র-জাতীয়তাবাদের তীব্র সমালোচনা করেন। ইউরোপ-আমেরিকায় তাহার অর্জিত সুনাম নষ্ট কিংবা যথেষ্ট প্রতিকূলতা বা বিরূপতার বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না-রাখিয়াই তিনি তাহাদের সাম্রাজ্যবাদ, উগ্র-জাতীয়তাবাদ ও বর্ণ-বিদ্বেষের তীব্র নিন্দাবাদ করিয়াছেন। সুতরাং জার্মানীকে খাতির করিয়া স্পষ্টকথা না-শুনাইবার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ ছিল না। উহার একটি মাত্র কারণ সম্ভবত এই যে, তখন পরাজিত জার্মানীর আর্থিক বিপর্যয় চূড়ান্ত আকার ধারণ করিয়াছে ;—যে-জার্মান জাতিকে চিরকালের মত পঙ্গু করিবার ষড়যন্ত্র ও বিধি-ব্যবস্থা তাঁহার কাছে ঘোরতর অন্যায় বলিয়া বোধ হয়, সেই মুহূর্তে জার্মানীর বিরূপ সমালোচনা করা হয়ত তিনি ঠিক যুক্তিযুক্ত বোধ করেন নাই। এবং জার্মানবাসীর এই দুঃখ ও নির্যাতনভোগের পরিণতি যে মন্দ দিকে যাইতে পারে, এই সম্পর্কে তাঁহার আশংকাও ছিল। জেনিভাতে রোমাঁ রোলাঁর সহিত জার্মান যুব আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কবি যখন উহার সম্পর্কে আশাবাদী ধারণা ব্যক্ত করেন তখন রোলাঁ উহার তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন :

"This is the result of their suffering, but they can very easily go from one end to the other."

রবীন্দ্রনাথ উহার জবাবে বলেন :

"Suffering often brings out the worse things in a nation, and it may do quite the opposite. Other nations, which too have suffered during the War, could have treated Germany with generosity and helped its rising young generation."

রোলাঁর ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী একটু স্বতন্ত্র ধরনের। তিনি ইউরোপের বিভিন্ন জাতির মধ্যে যুদ্ধের আশংকার পাশাপাশি তীব্র শ্রেণী-সংগ্রামের ও সংঘর্ষের উপর গুরুত্ব দিয়া বলিলেন :

"The rich in Germany have exploited the poor, the middle class has more or less disappeared from Central Europe, and the curious thing is that the reactionary elements in Germany, France, Austria and other countries are getting together to bring further ruin to the poor classes. So that the problem today is not so much the antagonism of nations, as the clash between different classes in the body of a nation itself. This does not, of course, justify or minimise to

any degree the real course of aggressive nationalism and the spirit of war"... [*Rolland and Tagore* : P. 102-03]

মোট কথা জার্মানীতে নাৎসী-অভ্যুত্থানের গোপন প্রস্তুতির কথা রোলাঁ কিংবা রবীন্দ্রনাথ—কেহই তখনও পর্যন্ত সঠিকভাবে অনুমান কিংবা আঁচ করিতে পারেন নাই।

এদিকে ভারতবর্ষে যখন প্রবল আন্দোলন চলিতেছে, সেই সময় 'সাইমন কমিশন' -এর বহুপ্রত্যাশিত রিপোর্ট প্রকাশিত হয় (৭ই জুন, ১৯৩০)। ঐ রিপোর্টে ভারতের শাসন-সংস্কারের জন্য মোটামুটি চারিটি বিষয়ে সুপারিশ করা হয় : (১) দেশী রাজন্যবর্গকে লইয়া একটি সর্বভারতীয় ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা ; (২) প্রদেশে দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা এবং আইনসভার নিকট দায়ী মন্ত্রীদের হস্তে পুলিশ ও বিচার বিভাগের হস্তান্তরকরণ ; (৩) প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের জন্য ভোটাধিকার সম্প্রসারণ এবং সরকারী সদস্যপদের বিলুপ্তিসাধন ; (৪) কেন্দ্রে ব্রিটিশ সরকারের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা।

বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষে প্রায় সমস্ত মহল হইতেই সাইমন রিপোর্টের তীব্র বিরোধিতা করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা কমিশনের সুপারিশগুলি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিল। গান্ধীজী ইতিপূর্বেই কারাগার হইতে ব্রিটিশ সাংবাদিক শ্লোকমের মাধ্যমে পরিষ্কার জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের পূর্বশর্ত হিসাবে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে তাঁহার পূর্ব প্রস্তাবিত 'স্বাধীনতার সারাংশ' মানিয়া লইবার প্রতিশ্রুতি এবং লবণকর রদ ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হইবে। ৩০শে জুন মতিলাল নেহরু গ্রেপ্তার হইলেন। গ্রেপ্তারের পূর্বে তিনিও এক বিবৃতিতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের প্রসঙ্গে ভারতে পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র গঠনের পূর্বপ্রতিশ্রুতি দাবী করেন।

৯ই জুলাই বড়লাট কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার এক যুক্ত অধিবেশনে ঘোষণা করেন যে, একমাত্র কনফারেন্সের মাধ্যমেই সমস্যার সমাধানের পথ দেখা যাইবে। কিন্তু বড়লাটের ঐ বক্তৃতায় কোথাও কনফারেন্সটিকে 'রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স' বলা হয় নাই। পরন্তু এই কনফারেন্সে ভারতের প্রতিনিধি কাহারা হইবেন এবং কে বা কাহারা তাহাদিগকে নির্বাচন করিবেন তাহাও সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা হয় নাই। যাহাই হউক ইহার পরই স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু ও মিঃ এম. আর. জয়াকর কংগ্রেসের সহিত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের শান্তি স্থাপনের জন্য দৌত্যাগিরি শুরু করেন। গান্ধীজী ব্যক্তিগত দায়িত্বে আপস-আলোচনা চালাইতে অসম্মত হইলে পরে মতিলাল ও জওহরলাল নেহরুকেও যারবেদা জেলে আনা হয়। ১৩, ১৪, ১৫ আগস্ট তাঁহাদের মধ্যে এই আলোচনা চলে। বলা বাহুল্য, এই আপস-আলোচনার চেষ্টাও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। গান্ধীজী, মতিলাল, জওহরলাল প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা এক যুক্ত বিবৃতিতে তাঁহাদের দাবীগুলি পরিষ্কার জানাইয়া দিলেন যে কোনো মীমাংসাই সন্তোষজনক হইবে না যদি না,—(১) ভারতের ইচ্ছামত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে যাইবার অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হয় ; (২) ভারতীয় সৈন্যদলের উপর কর্তৃত্ব, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং বড়লাটের নিকট লিখিত পত্রে গান্ধীজীর ১১ দফা দাবীসহ জনমতের

নিকট দায়ী জাতীয় গভর্নমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে ভারতে প্রবর্তন করা হয়; (৩) জাতীয় গভর্নমেণ্টের নিকট যাহা অন্যায় বিবেচিত হইবে অথবা যাহা ভারতীয় জনসাধারণের স্বার্থের অনুকূল নহে; ভারতের ঋণসহ বিভিন্ন সুবিধা প্রভৃতির ব্রিটিশ দাবী সম্পর্কে প্রয়োজন হইলে কোন নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচারকমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হইবার অধিকার ভারতকে দেওয়া হয়। তাছাড়া বন্দীমুক্তি, সমস্ত অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার, সমস্ত বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির প্রত্যর্পণ প্রভৃতির দাবী করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ ভ্রমণকালে এইসব ঘটনার বিস্তারিত কিছু সংবাদ পান নাই। তবে জার্মানী ভ্রমণকালে তিনি গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে হয়ত দু'একটি অসতর্ক মন্তব্য করিয়া থাকিতে পারেন। ভারতবর্ষে পত্র-পত্রিকায় এই সম্পর্কে নানা গুজব উঠে। স্যার তেজবাহাদুরের জনৈক আত্মীয় ভারতবর্ষে এক তারবার্তায় জানান যে, এণ্ড্রুজ ও রবীন্দ্রনাথ নাকি কংগ্রেসের গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

এবার ইংলণ্ড ও ইউরোপ ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ এমন কয়েকটি অসতর্ক মন্তব্য করেন এবং বিদেশী সাংবাদিকদের দ্বারা তাহা এমনই বিকৃতরূপ ধারণ করে যাহাতে দেশে তাঁহার সম্পর্কে নানা ভুল ধারণার সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ থাকিয়া যায়। ইহাতে কবির একান্ত সুহৃদ ও শুভানুধ্যায়ী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিতে থাকেন। তিনি 'প্রবাসী'তে ঐসব গুজবের ভিত্তি খণ্ডন করিতে গিয়াও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি অসতর্ক মন্তব্যের বেশ কিছুটা কড়া সমালোচনা করিয়া কবিকে সতর্ক করিয়া দিবার চেষ্টা করেন। তিনি লিখেন:

"দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে, যে, স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রুর এক বন্ধু লণ্ডন হইতে তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিয়াছেন, লর্ড আরুইনের বক্তৃতার বিষয় অবগত হইয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, মিস্টার এণ্ড্রুজ প্রভৃতি বলিয়াছেন, যে, লণ্ডনের কনফারেন্স ভারতীয়দের এখন সহযোগিতা করা উচিত। স্যার তেজবাহাদুরের কোন্ বন্ধু তার করিয়াছেন, জানা দরকার এবং তিনি রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির মত কিরূপে জানিলেন, তাহাও জানা দরকার। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়ের মত কিরূপ হইবে, অনুমান করিতে পারিতেছি না। কয়েকদিন হইল এণ্ড্রুজ সাহেব আমাদিগকে বিলাত হইতে তারযোগে জানান—'I have always advocated Independence, not Dominion Status.' 'আমি বারবার পূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থন করিয়া আসিতেছি, ডোমেনিয়ন স্টেটাসের নহে।' সুতরাং তিনি যে হঠাৎ বড়লাটের 'ধরি মাছ না-ছুঁই পানী' বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। তাঁহার ভারতহিতৈষণা সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছি না। কিন্তু তিনি স্বদেশ-প্রেমিক ইংরেজ; এই কারণে তাঁহার প্রত্যেক মতের অনুসরণ কোনও ভারতীয় কর্তব্য বলিয়া মনে না-করিতে পারেন।

"রবীন্দ্রনাথ কি বলিয়াছেন, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ বোধ হইতেছে। কিছুদিন আগে দৈনিক কাগজে বাহির হইয়া গেল, রবিবাবু প্যারিসে বলিয়াছেন তিনি রোজ ২।৩ খানা ছবি আঁকিতেছেন, কবিতা লিখিতেছেন না, রাজনীতিতে তাঁহার অরুচি বাড়িতেছে, ইত্যাদি। অথচ তিনি এরূপ কোন কথাই কাহাকেও

বলেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহার নিজের চিঠি স্বচক্ষে পড়িয়া একথা লিখিতেছি। সুতরাং স্যার তেজবাহাদুরের অপ্রকাশিতনামা বন্ধু যাহা তার করিয়াছেন, রবিবাবুর সম্বন্ধে তাহা সত্য না হইতে পারে। যাঁহারা দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দেন নাই এবং দেশের সব অবস্থাও যাঁহারা দূর হইতে জানিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা খুব মহৎ হইলেও নির্দিষ্ট কোন একটি পন্থা অবলম্বনের পরামর্শ তাঁহারা দিতে অসমর্থ এবং দিলেও সংগ্রামলিপ্ত লোকেরা তাহা অনুসরণ করা অকর্তব্য মনে করিতে পারেন, রবীন্দ্রনাথের ইহা ভাল করিয়া জানিবার বুঝিবার কথা। এইজন্য মনে হইতেছে স্যার তেজবাহাদুরের বন্ধু কবির সম্বন্ধে হয়ত ঠিক খবর পান নাই ও দেন নাই। অবশ্য নানাকারণে কবির বিবেচনার ভুলও ঘটিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুটি কথার উল্লেখ করিতেছি। কবির আধুনিক দুটি বিলাতী লেখায় লর্ড আরুইনের এবং ইংরেজ জাতির যে প্রশংসা আছে, তাহা তাঁহার মতে সত্য হইলেও আমাদের বিবেচনায় ঠিক প্রাসঙ্গিক নহে এবং এরূপ প্রশংসা দ্বারা তাঁহার ইংরেজ দমননীতির প্রতিবাদ নিন্দাবাদ ও সমালোচনার জোর কমিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, তিনি যে বলিয়াছেন ভারতবর্ষ ইংরেজ ছাড়া অন্য কোন সাম্রাজ্যশাসক জাতির অধীন হইলেঅত্যাচার আরও অনেক বেশী হইত, এই অপ্রাসঙ্গিক কথার দ্বারা তাঁহার সমালোচনা দুর্বল হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিতে পারেন, 'আমি সত্য কথা লিখিয়াছি'। তিনি সাম্রাজ্যস্থাপক সব জাতির সব কীর্তি পড়িয়াছেন কিনা, জানি না; কিন্তু কি হইলে কি হইত, সেরূপ অনুমান তাঁহার মত প্রভাবশালী ব্যক্তির অনুমান হইলেও তাহার মূল্য বেশী নয়।

দেশে এমন অনেক ব্যাপার ঘটিতেছে, যাহার খবর বিদেশে প্রকাশিত হওয়া দূরে যাক, ভারতবর্ষেই খবরের কাগজে বাহির হইতেছে না। সুতরাং বিদেশপ্রবাসী ভারতীয়দিগের খুব বুঝিয়া সুঝিয়া হিসাব করিয়া কথা বলা উচিত।"

[প্রবাসী : শ্রাবণ, ১৩৩৭ : পৃঃ ৬১৩-১৪]

রামানন্দ যে রবীন্দ্রনাথের যথার্থ সুহৃদ ছিলেন, ইহা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের অজস্র শুভানুধ্যায়ী ও গুণমুগ্ধ ভক্তের দল ছিল; কিন্তু তাঁহারা কেহই এমন স্পষ্টভাবে কবির ভুল-ত্রুটিগুলি তাঁহার চোখের সামনে তুলিয়া ধরিতে সাহস পাইতেন না।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বার্লিনে জনৈক সংবাদ-প্রতিনিধির নিকট ইউরোপের সাংবাদিকদের প্রচারিত তাঁহার সম্পর্কে কয়েকটি অপপ্রচারের প্রতিবাদ করেন। বিশেষত দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে তিনি যে উদাসীন নহেন পরন্তু তিনি উহা আন্তরিকভাবে সমর্থন এবং উহার জন্য গর্ব অনুভব করেন, তাহা অত্যন্ত স্পষ্ট ও দৃঢ়তার সহিত তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন। 'Tagore Proud of His Countrymen'—রয়টার পরিবেশিত এই সংবাদের বিবরণ দিয়া রামানন্দ 'মডার্ন রিভিউ'তে লিখিলেন :

"Reuter has recently cabled from Berlin that the poet Rabindranath Tagore told an interviewer that he was proud of his countrymen. This piece of news has no chance of turning out false,

as certain other mythical interviews did. How deep he loves his country and his countrymen is illustrated by his following poem, among others :

My Prayer for India

What is my longing, my dream, my prayer,
for my country, my beloved India ?
I dream of her. I fervently pray for her, that she
may no longer be in bondage to strangers. But that
she may be free !
Free to follow her own high ideals :
Free to accomplish her own important mission in the world :
Free to fill her own God-given place among the
great Nations.

[*Modern Review* : August, 1930 : P. 240]

কবির ঐ বিবৃতিটির অংশবিশেষ কিছুদিন পর *Natal Witness* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উহা এই :

"In the Indian endeavour to pursue the ideals of the Mahatma in the fight for freedom, success may or may not be achieved. But I am proud of my people that they fight for higher ideals. India must be an example to the whole world.

"What kind of government India will have cannot be foreseen. Governments develop through centuries, and should India obtain self-government this must be in accord with the character of the Indian people and with the peculiar circumstances. For the form of government suitable for India can develop only out of the atmosphere of Indian life.

"It is certain that India will have her own constitution, for India's problems are as unique as her own mental constitution. India is India." [*Natal Witness* : 20th September, 1930]

গান্ধীজী পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীন ভারতের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কী চিন্তা-ভাবনা করিতেছিলেন, এই বিবৃতিতেই তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য এবার বিলাতে যে-কয়টি লিখিত বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহাতে এত স্পষ্ট ও জোরাল ভাষায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করেন নাই, এটিও লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'My Prayer for India' কবিতাটি (১৮ই আগস্ট, (১৯৩০) আমেরিকার *Unity* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

কবি বার্লিনে থাকাকালে বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকরা সাক্ষাতে নানা বিষয় আলোচনা করিয়া তাঁহার মতামত জানিতে চাহেন। বিলাতের *Daily Herald*-এর

সংবাদদাতা এমনি একদিন কবির সহিত সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পার্থক্য সম্পর্কে তাঁহার ধারণা বা মতামত জানিতে চাহেন। কবি তাঁহার জবাবে এক দীর্ঘ বিবৃতি দেন। উহা ১৫ই আগস্ট ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বৎসর খানেক পূর্বে 'এশিয়া ও ইউরোপ' প্রবন্ধে যাহা লিখেন তাহাই আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলিলেন :

"In the root factors of human nature, Eastern or Western the inner man is the same. The idea of dissimilarity is often fostered as an excuse for one race treating another with racial discrimination, but in reality human nature is always the same.

"Mankind is essentially one. That is what I have always upheld.

"If in the East we meditate upon profound matters and think more philosophically than is the custom in the West, with its life of speed and bustle, you have science to balance this.

"Science claims martyrdom, as well as a life of retirement from the world for meditation on the Divine."

তিনি বলেন, পাশ্চাত্যকে যে একান্তই বস্তুবাদী বলা হয় তাহা ভুল। পাশ্চাত্য দেশের যে সব বৈজ্ঞানিক নিজেদের একান্তই বস্তুবাদী বলিয়া দাবী করেন, কবি তাঁহাদের এই দাবী ঠিক বলিয়া মানিয়া লইতে রাজী নহেন। কেননা বিজ্ঞান সত্য। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বিশ্বরহস্য উদ্ঘাটনের জন্য পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকরা শত দুঃখ ও নির্যাতনের মধ্যে,—এমন কি জীবন উৎসর্গ করিয়াও তাঁহারা যে কঠিন নিরলস সাধনায় নিমগ্ন থাকেন, তাহার পশ্চাতে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক শক্তিই কাজ করিতেছে। তিনি স্বীকার করেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার দুই দিকই আছে। বর্তমানে ইহা এই যান্ত্রিকতার যুগ অতিক্রম করিতেছে। কিন্তু তাহার যান্ত্রিক প্রবণতাও সাময়িক। সমগ্র বিশ্বমানব আজ অধ্যাত্ম-সত্যোপলব্ধির দিকেই ধাবিত হইয়াছে। তিনি বলিলেন :

"We are passing through this age when the mechanical is in ascendency. It is but a phase, a step farther in the evolution of man, in the great scheme of things, and there are other factors to counteract this human mechanisation.···

"Do I think that a great spiritual regenaration will come over mankind ?

"The spiritual regeneration is already ready here. I believe that deep in every man exists a conception of the Divine, even though this is often quite unrecognised by the individual."

[*Daily Herald*, : 15 August, 1930]

বার্লিন হইতে কবি ডেনমার্কে যান। সেই সময় ডেনমার্কের Helsingor শহরে "নিউ এডুকেশন্ ফেলোশিপে'র উদ্যোগে এক শিক্ষা সম্মেলনে যোগদানের উপলক্ষে

কবি আমন্ত্রিত হন। সেখান হইতে তিনি ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন-এ যান। ৯ই আগস্ট সেখানে কবির চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। ডেনমার্ক হইতে তাহারা পুনরায় বার্লিনে ফিরিয়া আসেন। এখানে এণ্ড্রুজ আসিয়া কবির সহিত মিলিত হইলেন।

জেনিভায় ঃ আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কে

১৯শে আগস্ট (১৯৩০), কবি সদলবলে জেনিভায় যান। এখানে তাঁহারা প্রায় মাস-খানেক থাকেন। কবি জেনিভাতে মিস্ স্টোরি নামে জনৈকা ইংরাজ মহিলার আতিথ্য গ্রহণ করেন। কবি জেনিভা যাত্রার পূর্বদিন এক পত্রে লিখিতেছেন (১৮ই আগস্ট, ১৯৩০):

"বিশ্বজাতীয়তার উদ্যম সংঘীভূত হয়ে উঠেছে জেনিভায়। লীগ অব নেশনে ঠিক সুর বাজেনি—হয়তো বাজবেও না—কিন্তু আপনা-আপনিই ওই শহর সমস্ত জগতের মহানগরী হয়ে উঠেছে। যাদের প্রকৃতি বিশ্বপ্রাণ তারা আপনা-আপনি ঐখানে এসে মিলবে। ঐ ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের একটা মহাকল্যাণশক্তির উদ্‌বোধন ঘটছে ব'লে আমার বিশ্বাস।" [পথ ও পথের প্রান্তে : পত্র ৪৯ : পৃঃ—১০৯]

জেনিভাতে তখন লীগ্ অব্ নেশনস-এর সম্মেলন উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হইতে প্রচারক ও ছাত্ররা সম্মিলিত হইয়াছিল ; 'লীগে'র কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভই ছিল তাঁহাদের আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে একদিন ঐসব প্রচারক ও ছাত্রদের এক সভা হয়। সভায় তখনকার প্রায় সমস্ত গুরুতর আলোচ্য বিষয়েই কবিকে প্রশ্ন করা হয়। আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কে কবির মত কী,—এইটিই ছিল তাঁহাদের প্রধান জিজ্ঞাস্য বিষয়। কবি তাঁহার জবাবে যাহা বলেন, তাহা উহার প্রায় তিন বৎসর পরে 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এ প্রবন্ধাকারে লিখিত দেন (*Calcutta Review* : October, 1933)।

কবি প্রথমেই বলেন, কিভাবে সর্বপ্রথম তিনি তাঁহার স্বদেশেরই এক শ্রেষ্ঠ পুরুষ—রামমোহন রায়ের নিকট হইতে আন্তর্জাতিকতার মহান আদর্শে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেন। তাঁহার মতে, তিনি সেকালে যথার্থভাবে আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাস করতেন এবং সমগ্র মানবতার জন্য তাঁহার বিস্ময়কর সহানুভূতি ছিল কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি বিশেষভাবে ভারতবর্ষীয় ছিলেন এবং ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মকেন্দ্রের গভীরে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন।

তিনি বলেন, তাঁহার ধারণা এই যে, প্রত্যেক জাতিরই তাহার নিজস্ব বিষয়-ব্যাপার আছে, যেগুলি তাহাদের সমষ্টিগত যোগ্যতা ও উন্নয়ন বিষয়ক। তাহাদের নিজস্ব আত্মস্বার্থ বা self-interest আছে বটে কিন্তু যদি তাহারা নিজেদের জাতিগত স্বার্থান্বেষণের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকে তবে তাহারা অন্ধ-মৃত-তারকার

ন্যায় হইবে। তাহারা আমাদের সকলের সেই সাধারণ মানবতার প্রকাশ করে না—যাহা জাতি-বর্ণ-ঐতিহ্যগত বেড়া অতিক্রম করিয়া মানুষের সম্পদরাশির অভিব্যক্তি দেয়। এখন সহজ ও অনায়াস যানবাহনের ফলে আমরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়াছি তখন আমাদের সেই মানবিকতার বিকাশ ঘটাইতে হইবে যাহা আমাদের মধ্যেকার বাহ্যিক তুচ্ছ পার্থক্য সত্ত্বেও মানবতার গভীরতম ঐক্যের উপলব্ধি আনে। সমষ্টিবদ্ধ এক জীবন সৃষ্টি করিতে হইলে মানুষের এমন এক নৈতিক আচরণের অনুশাসন সৃষ্টি করিতে হইবে যাহার ফলে তাহারা সম্মিলিতভাবে এক জাতিতে পরিণত হইতে পারিবে।

"In order to create a corporate life there should be developed a code of moral conduct which makes it possible for them to become one people. To do this several races should come closer to each other and the same effort that was within those small narrow areas in former days to save themselves from extinction has to be applied to this problem."

তিনি বলেন, 'আজিকার দিনে এই যে পারস্পরিক সন্দেহ এবং দুর্বলের প্রতি সবলের এই যে অত্যাচারের প্রবৃত্তি—ইহাতে কোনো স্থায়ী শান্তি আসিতে পারে না অথবা মানবতার মহৎ কিছু সম্পদ সৃষ্টি হইতে পারে না এবং আমি এবিষয়ে সুনিশ্চিত যে, আজিকার যুগ যে-বাণী ও সাধনা বহন করিয়া আনিয়াছে তাহা মহত্তর আদর্শের দিকেই ধাবিত হইতেছে। আজ বিভিন্ন দেশে আমাদের গোচরের বাহিরে এমন সব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ আছেন যাঁহারা এই একই সমস্যা লইয়া চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন। আর একথাও ভাবিয়া বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না যে, চারিদিকের এই জাতিতে-জাতিতে সংঘর্ষ ও পারস্পরিক সন্দেহের মাঝখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এতগুলি সমিতি বা সংস্থা গড়িয়া উঠিতেছে যাহাদের সকলেরই একমাত্র মূল লক্ষ্য হইতেছে, কীভাবে যুধ্যমান জাতিগুলির মধ্যে ঐক্য ও মিলন ঘটান যায়। আমরা এই সত্য ও ঘটনা আজ প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং তাহার অর্থ হইতেছে জগদ্ব্যাপী মানুষের মধ্যে এই সত্য আজ কাজ করিয়া চলিতেছে। এইটা আজ যুগের হাওয়ায় বহিতেছে, আর এই সমস্যাকে আমরা গ্রহণ না করিয়া পারিব না। এর আহ্বান বা ডাক আজ আমাদের মধ্যে ধ্বনিত হইতেছে এবং আপনাদের সমক্ষে আমি এই কথাই বলিতে পারি, এরই আহ্বানে এতকাল আমি সাড়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি।'

তিনি বলিলেন, কোন আশু ফললাভের আশা না রাখিয়াই এতদিন তিনি মানুষের এই আধ্যাত্মিক মিলন ও ঐক্যের আদর্শকে তাহার বিদ্যানিকেতন ও রচনাদির মধ্যে বলিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এবং তিনি সকলকে এই দৃঢ় আশা পোষণ করিবার আহ্বান জানাইয়া বলিলেন যে, আজিকার যুগের সেই সাধন-বাণী সেই সব রাজনীতিবিদের অবিমৃষ্যকারিতায় বিফলে কিংবা উপেক্ষিত হইবে না যাহারা যুদ্ধ ও রক্তপাতের ঘূর্ণাবর্তে জনগণকে ঠেলিয়া দিতেছে। মানুষের মহত্তর শক্তি বা *Higher Spirit* নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে।

তিনি আরও বলিলেন, জাতীয়তাবাদ যখন প্রাজ্ঞোচিত পথে চলে, তখন ইহা

ঠিকই। মানুষের কোনো আত্মসত্তা থাকিবে না, ইহা ঠিক কথা নহে। আমরা আমাদের স্বীয় সত্তা ছাড়া চলিতে পারি না—তবে আমরা আমাদের স্বার্থপরতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি। ঠিক অনুরূপভাবে—জাতীয়তাবাদ যখন জাতির ন্যায়সঙ্গত স্বার্থের পথে পরিচালিত না-হয় তখন ইহা ভাবোচ্ছ্বাসবাদ বা 'সেন্টিমেন্টালিজম্' মাত্র। ভাবাবেগ এমনিতে অন্যায় কিছু নহে, কিন্তু ভাবাবেগের মাত্রাধিক্য ঘটিলে তখনই ইহাকে 'সেন্টিমেন্টালিজম্' বলা হয়। ঠিক অনুরূপভাবে,—একটি জাতির নিজস্ব সত্তা আছে এবং তাহা মূল্যবান—আমাদের প্রত্যেকের জাতিগত পার্থক্য এইখানেই। ঠিক এই ক্ষেত্রেই, আমাদের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ মানবতার ভাণ্ডারে তাহা দিবার দায়িত্ব আমাদের আছে। আমাদের ঠিক ঐ জাতীয় সত্তার অধিকারই পৃথিবীতে আমাদের শ্রেষ্ঠ সব কিছু দেবার কাজে প্রেরণা দান করিবে। তিনি বলিলেন :

"Nationalism when sober is right. The idea that man should have no self at all is wrong, we cannot get rid of ourselves, we can get rid of our selfishness. In the same manner, nationalism when it is not the right spirit of a nation is like sentimentalism. Sentiments are not wrong in themselves, but a certain excess of sentiment is termed sentimentalism. In the same way a nation has its own self and that is valuable, we all have that difference. That is where we have the responsibility to offer the best that we have to humanity. That very right of our national self should urge us to make the best contribution to the world."

লক্ষ্য করিবার বিষয়, জাতীয়তাবাদেরও যে সীমাবদ্ধভাবে প্রয়োজনীয় ও কিছুটা প্রগতিশীল ভূমিকা আছে একথা ইতিপূর্বে এত স্পষ্টভাবে তিনি তাঁহার আর কোনো বক্তৃতায় বা রচনায় বলেন নাই। জাতীয়তাবাদ বলিতে এতকাল তিনি ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির উগ্রজাতীয়তাবাদকেই (national-chauvinism) বিশেষভাবে বুঝাইয়াছেন এবং তাহারই তিনি কঠোর ভাষায় নিন্দাবাদ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে রাজনৈতিক দিক হইতে তিনি জাতীয় আত্মস্বাতন্ত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যটি পরিষ্কার স্বীকার করিয়াছেন। জাতীয় আত্মসত্তা এবং জাতীয়তার আবেগকেও সীমিত ও পরিমিত আকারে তিনি সমর্থন করিলেন কিন্তু তাহার মাত্রাধিক্য ঘটিলেই যে বিপদের কারণ ঘটে—এই কথাই তিনি বুঝাইতে চাহিলেন। প্রসঙ্গত তিনি চীনের প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাসের দীর্ঘ পর্যালোচনা করিয়া বলেন যে, চীনই একমাত্র দেশ যাহারা যুদ্ধ বা সমরবাদকে কোনদিনও প্রশ্রয় দেয় নাই। তাহার কারণ, তাহারা তাহাদের জাতীয়তা সম্পর্কে সচেতন ছিল না। পরিশেষে তিনি ঐ সম্মেলনের চীনা ছাত্র-প্রতিনিধিদের উদ্দেশ করিয়া বলিলেন :

..."Your nation, because it was not too self-conscious of its own nationality, could produce its great works of art and philosophy. The

self-conscious man is too conscious of his own self and that is a sort of disease, and all self-conscious nations are too much aware of their national self and we see this in the West in such a painful measure. They never forget it, and so can never come to a real solution of the peace and war problem. Their mind is not at ease and they are not in natural relation with each other. We in India are not free from this contagion which is widespread and our minds are not superior to this passion of patriotism, we are steeped in it all over. All diseases have their breeding ground in the unfortunate condition of the people who are poor and insulted and driven to fears. They have to develop this passion of nationalism to keep their self-respect which is unhealthy and demoralising like the plague which only gets its hold upon a neighbourhood that is poor. *The plague of nationalism finds its breeding ground among those people who are oppressed by other nations and who have been impoverished.*" (*Italics*—*mine*).

[*The Calcutta Review* : October, 1933]

এখানেও লক্ষ্য করিবার বিষয়, ইউরোপীয় দেশগুলির উগ্র-জাতীয়তাবাদকে তিনি যেমন নিন্দা করিয়াছেন তেমনি ভারতবর্ষের মত পরাধীন দেশেরও উগ্র-জাতীয়তাবাদকে তিনি অস্বাথ্যকর বলিয়া অভিহিত করিয়া উহার নিন্দা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে—জাতীয়তাবাদরূপী প্লেগ-মারীর উৎপত্তিস্থলই এইসব পরাজিত ও নির্যাতিত জাতির মধ্যে, এমন কথা বলিতেও তিনি দ্বিধা করিলেন না।

বস্তুতপক্ষে জাতীয়তাবাদী আবেগ-উচ্ছ্বাস একটি অস্ত্রবিশেষ। ইতিহাসে বিজয়ী ও বিজিত, শোষক ও শোষিত—এই উভয় জাতিই এই অস্ত্রটি তাহাদের স্বার্থে ব্যবহার করিয়াছে। তাছাড়া ইউরোপে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ যখন প্রথম বিকাশ-লাভ করে তখন জাতীয়তাবাদই ছিল বুর্জোয়াদের হাতে প্রধান অস্ত্র। আবার এই ইউরোপেই বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে পরাধীন দেশগুলি তাহাদের মুক্তি আন্দোলনে জাতীয়তাবাদকেই প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে। পরাধীন দেশের মুক্তি আন্দোলনের নেতা ও অগ্রণী দলগুলি মুক্তি-সংগ্রামে জনগণকে উদ্বোধিত করার জন্য স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদকে সত্যই তীব্র করিয়া তুলিতে প্রয়াস পায়। কিন্তু এক্ষেত্রে তীব্র স্বদেশাসক্তি ও জাতীয়তাবাদ ক্ষতিকর কিংবা অস্বাস্থ্যকর নহে,—তাহা ঐতিহাসিক কারণে অনিবার্য এবং প্রয়োজনীয় আর সেই কারণেই কিছুটা স্বাস্থ্যকরও বটে। বস্তুতপক্ষে তাহাদের এই তীব্র স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদী উন্মাদনার প্রত্যক্ষ কারণ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শোষণ ও নির্যাতনের তীব্রতা। তাছাড়া শাসক ও শাসিত দেশগুলির মধ্যে সংগ্রাম-সংঘর্ষ যতই তীব্র হয়—পরাধীন দেশের জাতীয়তাবোধ ও জাতীয়-উন্মাদনা সেই পরিমাণেই তীব্র না-হইয়া পারে না। এই জিনিসটি রবীন্দ্রনাথ যে একেবারেই বুঝিতেন না তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার

আদর্শ ও নীতির দিক হইতে ইহাকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। তাই উগ্র-জাতীয়তাবাদ—সে সাম্রাজ্যবাদী অথবা পরাধীন দেশের—যাহারই হউক না কেন তিনি উহাকে কোনদিনই সমর্থন করেন নাই এবং সমভাবে উহার নিন্দা করিয়াছেন। অথচ স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় মর্যাদাবোধকেও এক অর্থে তিনি সমর্থন করিয়াছেন এবং স্বয়ং দেশবাসীর মনে স্বদেশপ্রেমকে জাগরিত করার জন্য অজস্র আবেগময়ী সঙ্গীত ও কবিতা রচনা করিয়াছেন। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকেও তিনি সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কোন আন্তর্জাতিক আদর্শ ও পরিপ্রেক্ষিত থাকিবে না—ইহা তিনি কোনদিনই স্বীকার বা সমর্থন করেন নাই। অর্থাৎ প্রত্যেক দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাথে সাথে তার আন্তর্জাতিকতার লক্ষ্য ও পরিপ্রেক্ষিত স্বচ্ছ থাকিতে হইবে,—ইহাই ছিল কবির বক্তব্য।

অবশ্য এই বিবৃতি বা ভাষণে কবি স্বয়ং আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিষ্কার কোনো পরিপ্রেক্ষিত রাখিতে পারেন নাই। জগতের কিছু ভালো ভালো লোক ও সংগঠন মিলিয়া শুধুমাত্র আন্তর্জাতিকতার মহান আদর্শবাদ প্রচার করিয়াই উহা সম্প্রসারিত বা কার্যকরী করিতে পারেন না। বস্তুতপক্ষে কবি যেন কতকটা তাহাই নির্দেশ করিয়াছেন। আন্তর্জাতিকতাবাদ তাঁহার কাছে মূলত সাংস্কৃতিক ও আদর্শ-বাদের আন্দোলন—Idea-র আন্দোলনমাত্র। উগ্র-জাতীয় উন্মাদনা ও যুদ্ধ-সংঘর্ষেভরা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিকতার আদর্শ জয়যুক্ত করিয়া তুলিতে হইলে যে সঠিক ও বাস্তব কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করা দরকার, সে সম্পর্কে তাঁহার খুব স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। পৃথিবীতে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদই যে আন্তর্জাতিকতাবাদের জয়লাভের পথে প্রধানতম বাধা এবং এইসব বৃহদাকার সাম্রাজ্যবাদের হাত হইতে পৃথিবীর সমস্ত নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তি ও আত্মস্বাতন্ত্র্যলাভই যে সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রথম সোপান, এ কথা কবি স্বীকার করিলেও সব সময় যথাযথ গুরুত্বসহকারে নির্দেশ করিতে তাঁহার স্মরণ থাকিত না। অথচ অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলিয়াছেন যে, ইম্পীরিয়ালিজম থাকিতে সত্যকার আন্তর্জাতিক মিলন-ঐক্য আসিতে পারে না। তিনি তাঁহার ঐক্যতত্ত্বের পরিষ্কার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন :

"এই ঐক্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কথা ভুল বোঝবার আশঙ্কা আছে।...একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। যারা স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। পৃথিবীতে যারা পরজাতির স্বাতন্ত্র্য লোপ করে তারাই সর্বজাতির ঐক্য লোপ করে। **ইম্পীরিয়া-লিজ্‌ম্‌ হচ্ছে অজগর সাপের ঐক্যনীতি, গিলে খাওয়াকেই সে এক করা ব'লে প্রচার করে।** পূর্বে আমি বলেছি, আধিভৌতিককে আধ্যাত্মিক যদি আত্মসাৎ করে বসে তা হলে সেটাকে সমন্বয় বলা চলে না ; পরস্পরের স্ব-ক্ষেত্রে উভয়ে স্বতন্ত্র থাকলে তবেই সমন্বয় সত্য হয়। তেমনি মানুষ যেখানে স্বতন্ত্র সেখানে তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করলে তবেই মানুষ যেখানে এক সেখানে তার সত্য ঐক্য পাওয়া যায়। সেদিনকার মহাযুদ্ধের পর য়ুরোপ যখন শান্তির জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল তখন থেকে সেখানে কেবলই ছোটো ছোটো জাতির স্বাতন্ত্র্যের দাবি প্রবল হয়ে উঠছে। যদি আজ নবযুগের আরম্ভ হয়ে থাকে তা হলে এই যুগে অতিকায় ঐশ্বর্য, অতিকায়

সাম্রাজ্য, সংঘবন্ধনের সমস্ত অতিশয়তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে। সত্যকার স্বাতন্ত্র্যের উপর সত্যকার ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হবে। যারা নবযুগের **সাধক ঐক্যের সাধনার জন্যেই তাদের স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করতে হবে ; আর তাদের মনে রাখতে হবে, এই সাধনায় জাতিবিশেষের মুক্তি নয়, নিখিল-মানবের মুক্তি।**" (বড়ো হরফ—আমার)

[শিক্ষার মিলন : কালান্তর : পৃঃ.১৮৩-৮৪]

এখানে আদর্শ ও নীতিগতভাবে তিনি জাতীয় আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের মূল ভিত্তির কথা সমর্থন করিয়াছেন বটে। কিন্তু তিনি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি ও আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের আন্দোলনের পরিষ্কার নির্দেশ কিংবা আহ্বান জানাইতে পারেন নাই। মুক্তিযুদ্ধ ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বানের প্রশ্নে তিনি অবশ্য একেবারে নীরবতা অবলম্বন না করিলেও খুব বলিষ্ঠ ও উদাত্ত আহ্বান জানাইতে পারেন নাই—এমনকি স্বদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রশ্নেও। বিলাতের *Nottingham Journal*-এর জেনিভাস্থ সংবাদদাতা বেশ কিছুদিন রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করিয়া ঐ পত্রিকায় কবির ইউরোপ ভ্রমণের একটি বিবরণী পাঠান। রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে তাঁহার ধারণার কথা ব্যক্ত করিয়া তিনি উক্ত বিবরণীতে মন্তব্য করেন :

"As to the grave questions of race conflict, like Gandhi, Tagore is profoundly convinced of the inalienable right of a people to govern themselves according to their own traditions and genius, but whilst Gandhi's genius is for present leadership in action, Tagore feels impelled to remain *above the battle* as it were searching those distant horizons where Indian nationalism will have found (as the nationalism of the West are already finding bitter experience) that it cannot be sufficient to itself."

[*Nottingham Journal* : 9th September, 1930.]

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ ঠিক '*above the battle*' বা সংগ্রামের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। তবে এই মুক্তি-সংগ্রামের বলিষ্ঠ উদাত্ত আহ্বানও তিনি জানাইতে পারেন নাই ; এবং এইখানেই রোলাঁ-বারবুস-আইনস্টাইন প্রমুখ ইউরোপীয় মনীষীদের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য। যথাসময়ে এই আলোচনায় আমরা আসিব।

এখানে উল্লেখযোগ্য, অক্সফোর্ডের খ্যাতনামা অধ্যাপক—Prof. Zimmern উপরোক্ত প্রচারক ও ছাত্রদলের একটি অংশের নেতৃত্ব করিয়া জেনিভায় আসিয়াছিলেন। ২৯শে আগস্ট (১৯৩০) অধ্যাপক জীমার্ন-এর সহিত রবীন্দ্রনাথের লীগ্-অব্-নেশন্‌স্ সম্পর্কে এক দীর্ঘ আলোচনা হয়। কয়েক বৎসর পর কবি স্বয়ং তাঁহাদের মধ্যে এই আলোচনার 'নোট'টি 'মডার্ন রিভ্যু'তে প্রকাশ করেন।

লীগের উদ্দেশ্য, গঠনতন্ত্র ও কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁহার যে কোনো স্পষ্ট ধারণাই নাই, কবি অধ্যাপক জীমার্নকে তাহা খুলিয়াই বলেন। তাঁহার ধারণা লীগ বিশেষভাবেই একটি রাজনীতিক উদ্দেশ্যমূলক প্রতিষ্ঠান—রাজনীতিবিদ্‌রা ইহাকে তাহাদের স্বার্থে পরিচালিত করিতেছে। তাই লীগ সম্পর্কে অধ্যাপক জীমার্নকে কবি তাঁহার ব্যক্তিগত ধারণার কথা বলেন যে, শুধুমাত্র রাজনীতিবিদ্‌রাই নয়—

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাবুক ও চিন্তানায়কদেরও ইহার পরিচালন ব্যবস্থায় স্থান হওয়া উচিত। তিনি বলিলেন :

…"I myself have often thought it incongruous that the League of Nations should only have politicians to represent nations. Should not others who are thinkers, dreamers, who are organizing great institutions all over the world for the same purpose of bringing peace among human races, have their place in the League ?"…

জবাবে জীমার্ন লীগের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া কবিকে বলিলেন যে, লীগের কার্যকলাপ শুধু রাজনীতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নহে—আন্তর্জাতিক শ্রম দফতর, স্বাস্থ্য, আন্তর্জাতিক বিচার-আদালত ও বিভিন্ন দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান-প্রদান প্রভৃতি মানবসমাজের বিস্তৃত ক্ষেত্রে ইহার কার্যসূচী গ্রহণের পরিকল্পনা আছে।

এই জবাবেও অবশ্য কবি খুব সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই—যদিও এই আলোচনার ফলে লীগ সম্পর্কে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য তিনি জানিতে পারিলেন বলিয়া স্বীকার করেন। তাহার সন্দেহ, লীগের ঘোষিত আদর্শ বাস্তবে কতখানি কার্যকরী হইবে। তবুও তিনি বলিলেন :

…"I entertained the notion that it was solely dominated by politics. Possibly it is still so, and the politicians have their own interests to represent and so it becomes like a game of chess—each trying to get the better of the other, but all the same the activities in connection with the League are very great. I have just been seeing that great thinker and writer, H. G. Wells, and I have been wondering whether the League would ever think of asking him or people like him to come and advise them, to criticize them and bring fresh light on to their work and a wider background to their activities. It ought to be possible that the best minds should have an opportunity to bring here their best thoughts and through that meeting a great force of internationalism be evolved."

[*The Modern Review* : December, 1933 ; pp. 609-13]

জেনিভাতে রোমাঁ রোলাঁ, এইচ্. জি. ওয়েল্‌স, স্যর. এরিক্ ড্রুমণ্ড্ (Eric Drummond) প্রভৃতি বহু মনীষী ও চিন্তাবিদের সহিত কবির আলাপ-আলোচনা হয়। ইহার মধ্যে রোলাঁর সহিত সাক্ষাৎকার ও আলোচনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ বা নোট্ পাওয়া যায়। (আলোচনার সঠিক তারিখের উল্লেখ নাই—শুধু জেনিভা, আগস্ট ১৯৩০ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।) এইদিন বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহাদের আলাপ-আলোচনা হয়। জেনিভা ও লীগ্-অব্-নেশন্‌স্ সম্পর্কে তাঁহাদের যে আলোচনা হয় সেটি এইরূপ :

"Tagore : 'Do you think that Geneva is likely to play an important role in the world of international relationship ?"

Rolland : 'It may, but a good deal depends on factors over which Geneva has no control.'

Tagore : 'The League of Nations seems to me to be but one of the various forces which are at work here. At the present moment it is by no means the most instrumental for the readjustment of international relationship. It may or may not develop into a power for bringing greater harmony in the political world. I have much faith in the various international groups and societies, and the individuals working in this place, and my hope is that they will eventually create a genuine centre of international activities in Geneva which will shape the politics of the future.' " [*Rolland And Tagore* : p. 96]

রোলাঁ তখন জেনিভার বিশেষ ঐতিহ্যের কথা বর্ণনা করিয়া শেষে বলেন যে, এমন কি বিগত মহাযুদ্ধের সময় 'বাহাই' ও 'সুফি' সম্প্রদায়ের লোকেরা যুদ্ধরত দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানদের একত্রে বৈঠকে মিলিত করিবার এবং শান্তি স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য স্বীকার করেন যে, আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির বিষয়ে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে একটা আপসের চেষ্টার ব্যাপারে জেনিভার উৎকৃষ্ট ঐতিহ্য আছে। রোলাঁ অবশ্য বলেন যে, রাজনীতিক তর্ক-বিতর্কে জগৎ আজ স্পষ্টতই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং সর্বত্রই সুউন্নত আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব অনুভূত হইতেছে। সারা বিশ্বের এক বৃহৎ সংখ্যক মানুষ আজ প্রাচ্যের নিকট হইতে বাণীর প্রত্যাশায় রহিয়াছে ; আর তাঁহারা মনে করেন, ভারতবর্ষই সেই দেশ আজিকার যুগে বিশ্বকে যে সেই বাণী শুনাইতে পারে।

তারপর ভারতের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ঐতিহ্য, অধ্যাত্মবাদ, রামমোহন রায়, বিবেকানন্দ প্রভৃতি সম্পর্কেও আলোচনা হয়। 'ভারতে বিজ্ঞান চর্চা' ও 'বৈজ্ঞানিক জাতীয়তাবাদ' সম্পর্কেও তাঁহাদের আলোচনা হয়।

এছাড়াও কাব্য ও শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহাদের আলোচনা হয়।

জেনিভাতে বহু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকেন্দ্র এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই বাণীর জন্য কবির নিকট আসেন। এই সময় 'Women's International League for Peace and Freedom' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে কবির নিকট বাণী প্রার্থনা করা হয়। জেনিভার *Pax International* পত্রিকায় কবির বাণীটি প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য, রোলাঁর ভগ্নী Madeleine এই সঙ্ঘের অন্যতমা সম্পাদিকা ছিলেন। বিশ্বশান্তি, স্বাধীনতা ও আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শে সঙ্ঘটি বেশ কিছুকাল ধরিয়া কাজ করিয়া আসিতেছিল। এই সময় এই সঙ্ঘের একটি প্রতিনিধি দলের ভারতে আসিবার কথা হয়। কবি তাঁহার বাণীতে এই সঙ্ঘের মহান আদর্শের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া লিখিলেন :

"The Women's International League for Peace and Freedom has done valuable work in bringing to bear upon the civilization of the West the ideals of spiritual life which demand social service and belief in non-violence to establish the future civilization of humanity. Women are naturally gifted with the power of Peace and the modern age needs their active co-operation in its effort to unite the different peoples of the world on the basis of mutual understanding. I am glad to know that W. I. L. has accepted its full share of responsibility in this great work."

ভারতের নারীসমাজও আজ ইউরোপের নারীসমাজের সাথে হাতে হাত মিলাইয়া এই মহান মানবিকতার আদর্শে আপনাদিগকে নিয়োজিত করিবেন, এই আশা প্রকাশ করিয়া কবি তাঁহার বাণীর উপসংহারে বলেন :

"I am sure our women of India will be happy to join hands with their sisters in the West in their service to humanity, and that the visit of the representative of the W. I. L. to India, which I hear is being arranged for, will help to bring India and Europe closer together in lasting bonds of comradeship."

[*Modern Review* : November, 1930 ; p. 595]

জেনিভাতে কবি প্রায় একমাস থাকেন। বহু সভাসমিতিতে তাঁহাকে যোগ দিতে হয় এবং কয়েকটি বক্তৃতাও করিতে হয়। তাহার মধ্যে The Principles of Art সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে তিনি কয়েকটি বক্তৃতা করেন।

এই দীর্ঘকাল ইউরোপে থাকার তাঁহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল, অর্থসংগ্রহ। বিশ্বভারতীর অর্থসমস্যা তো ছিলই ; তাছাড়া কবি তখন শান্তিনিকেতনে একটি নারী বিশ্ববিদ্যালয় খুলিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। উহার জন্যও বটে, তাছাড়া শ্রীনিকেতনের স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের জন্যও অর্থের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। এই সম্পর্কে *Nottingham Journal*-এর সংবাদদাতা লিখিতেছেন :

"His three chief purpose in coming to the West this time, are first of all to collect funds for his plan for the training of health workers at Santiniketan who after training, will go out to fight disease in the villages ; secondly, to find encouragement and support for his scheme for a women's University ; and last, but not least, to do something to interpret the feeling of his fellow-countrymen at this difficult time, so that the ideal of human unity may not be jeopardised by the growing barricades now being thrown up between the white and coloured races."

[*Nottingham Journal* : 9th September, 1930]

ইহার মধ্যে বগ্‌দানভ ও ডঃ. কলিন্স প্রমুখ ইউরোপীয় অধ্যাপকদের স্বচ্ছন্দ

ভাতা ও খোরাক যোগাইবার সমস্যাও ছিল। বিশ্বভারতীর সেই আর্থিকসঙ্কট মুহূর্তে ইহারা মাসিক বরাদ্দ ২০০৲ টাকা ভাতা পাইয়াও সন্তুষ্ট ছিলেন না। ইহাদের এই মনোবৃত্তিতে কবি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত ও অপ্রসন্ন ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে মারবুর্গ হইতে এক পত্রে তিনি বিধুশেখরকে লিখেন (২৮শে জুলাই, ১৯৩০) :

"শাস্ত্রীমশায়, বকদানভের জন্যে আমি অনেক চেষ্টা করেচি—কোনো স্থায়ী ফল আজ পর্যন্ত হোলো না। তাই থেকে থেকে আর্তনাদ ওঠে···বকদানভের এবং আপনাদের সকলের কথাই চিন্তা করে মনের মধ্যে নিয়ত ধ্বনিত হচ্চে রক্‌ফেলারং শরণং গচ্ছামি। কিন্তু বুদ্ধের শরণমন্ত্রও আজ আমার পক্ষে যতটা ফলদায়ক অন্যটাও তার চেয়ে বেশি না হতে পারে।···বিপদ এই যে য়ুরোপীয় অতিথিদের তাহা বেশি—আমাদের স্বদেশী দম্পতির অভাব ৭৫ টাকাতে একরকম করে মেটে—দুশো টাকাতেও ওদের পেট ভরে না। সেইজন্যেই আমরা নিজেদের বঞ্চিত করেও এদের জন্যে যতই চেষ্টা করি ওরা অসন্তুষ্ট হয়েই থাকে—প্রিয় সম্ভাষণও করতে পারে না, বিদায় সম্ভাষণও না। কুঁড়ে ঘরে হাতি পুষতে গেলে হাতিটা যদি বা কষ্টেসৃষ্টে থাকে গৃহস্থের থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে। আমাদের সমস্যা হচ্চে ঐ—৭৫ টাকার জীবনযাত্রার আদর্শে ২০০ টাকার জীবনযাত্রা ভরাতে হবে, তাতে ৭৫ বেচারীর জিভ বেরিয়ে পড়ে। যাই হোক এবার কিছুদিনের মত বকদানভের মেয়াদ বহু চেষ্টায় বাড়াতে পেরেচি। তারপরে রক্‌ফেলারং শরণং গচ্ছামি—আপনাদের মন্ত্রসিদ্ধি যদি ঘটে তাহলেই ৭ম অঙ্কের পরিণামে বলতে পারব সর্বং সর্বত্র নন্দতু। যশ য়ুরোপে যথেষ্ট লাভ করেছি অন্য লাভটার জন্যে আর একটা সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে। তারপরে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে যখন আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াব তখন উজার করে ঢেলে দেব—ক্ষুদ-কুঁড়োর চেয়ে যদি বেশি জোটে তাহলে ভোজের আয়োজন করবেন তাতে বকদানভেরও নিমন্ত্রণ রইল।"

[বিশ্বভারতী পত্রিকা : বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭২ ; পৃঃ. ২৮৫-৮৬]

তরল হাস্য-পরিহাসের সুরে লেখা হইলেও, কবি বিশ্বভারতীর আর্থিক সমস্যায় যে কী পরিমাণ বিপর্যস্ত ও বেদনা অনুভব করিতেছিলেন তাহা এই পত্রের প্রতিটি ছত্রে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষত বগ্‌দানভ প্রমুখ ইউরোপীয় অধ্যাপকদের ভাতা যোগাইবার সমস্যা যে তাঁহাকে কী পরিমাণ উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল তাহাও এই পত্রে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 'বকদানব' যে বগ্‌দানফ তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র।

জেনিভায় আসিয়া কবি মিস্ স্টোরির মুখে বগ্‌দানফ প্রমুখ ইউরোপীয় অধ্যাপকদের সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনেন। মিস, স্টোরি কিছুকাল পূর্বে ভারত ভ্রমণে যান এবং সেই সময় শান্তিনিকেতনেও তিনি কিছুকাল কাটান। বগ্‌দানভ প্রমুখ অসন্তুষ্ট ইউরোপীয় অধ্যাপকদের দু'একজনকে বিদেশীদের কাছে বিশ্বভারতীর নিন্দা করিতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হন এবং পরে জেনিভায় আসিয়া কবিকে তাহা বলেন। এই সম্পর্কে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিতেছেন :

···"অধ্যাপক বগ্‌দানফ ও ডক্টর কলিন্স সম্বন্ধেই অভিযোগটা ছিল। বাগ্‌দানফ ছিলেন কট্টর জারপন্থী, কলিন্স পাকা বৃটিশ। এই সময়ে আইন-অমান্য আন্দোলন

শান্তিনিকেতনের শান্তি ভঙ্গ করিতেছিল, উৎসাহী ছাত্রদের ঘটা করিয়া খেলার মাঠে কাপড় পোড়াইতে ও নানাপ্রকার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে দেখিয়া এই দুইজন বিদেশী খুই বিচলিত হন। মিস্ স্টোরিকে তাঁহারা কি বলিয়াছিলেন এবং মিস্ স্টোরি তাঁহার নাম সার্থক করিয়া কবিকে কী বলিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি না। মোট কথা, রবীন্দ্রনাথ এই মহিলার রিপোর্ট সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠেন। তখনই শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষকে লিখিয়া পাঠান যে, বিশ্বভারতীর প্রতি যাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাঁহাদের পক্ষে সেখানে অবস্থান কল্যাণকর হইতে পারে না।···কবির এই তীব্র মনোভাব জানিতে পারিয়া বাগ্দানফ ও কলিন্স কার্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। ইঁহাদের ন্যায় পণ্ডিতের স্থান বিশ্বভারতীতে আর পূরণ হয় নাই। ইঁহাদের হইতে বহুগুণিত অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের কবি অশেষ ধৈর্য ও মমতার সহিত সহ্য করিয়াছিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার এই স্থৈর্যের চ্যুতি কেন হইল জানি না।" [রবীন্দ্রজীবনী : তৃতীয় খণ্ড : পৃঃ. ৩৮০]

রবীন্দ্রজীবনীকার কেন এই মন্তব্য করিয়াছেন, বুঝা যায় না। তিনি স্বয়ং তাঁহাদের চরিত্রের ও মনোবৃত্তির যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা বিশ্বভারতীর আদর্শের স্বার্থে কতটুকু প্রয়োজনীয় ও সহায়ক ছিল তা সন্দেহ ও বিতর্কের বিষয়। কবি মিস্ স্টোরির কাছে শুনিবার পূর্বেই মারবুর্গ হইতে বিধুশেখরকে যে পত্র লিখেন তাহাতেই স্পষ্ট হয় যে, দেশে থাকিতেই তিনি ঐসব অসন্তুষ্ট বিদেশী অধ্যাপকদের লইয়া কীরূপ বিব্রত বোধ করিতেছিলেন! এই দিক হইতে বিচার করিলে মিস্ স্টোরির বক্তব্য সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিবার মত কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ তাঁহার ছিল না। তাই কয়েক মাস পর আমেরিকা হইতে কবি এক পত্রে বগ্দানভের সম্পর্কে বিধুশেখরকে সতর্ক করিয়া দিয়া লিখিলেন :

"জেনিভায় আমি ছিলুম মিস্ স্টোরির অতিথি। তাঁরই কাছে খবর পেলুম আমাদের ওখানে যে সব য়ুরোপীয় অতিথি আছেন, পাশ্চাত্যের অভ্যাগতের কাছে তাঁরা সর্বদাই আমাদের নিন্দা করে থাকেন। এতে করে আমাদের যে গুরুতর ক্ষতি হয়ে থাকে আমরা তা জানতেও পাই নে। নিজের ঘরে যার অন্ন নেই সে যত চেষ্টাই করুক শুধু শুভ ইচ্ছার দ্বারা অতিথির পেট ভরাতে পারে না। অভুক্ত জঠরের উপরেই অপ্রসন্ন চিত্তের বাসা। আপনি জানেন আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি, নিজের ক্ষতি করেও—নৈবেদ্য পুরোমাত্রায় জোগাতে পারি নি সে আমার দোষ নয়।··· আগামী বৎসর থেকে পাশ্চাত্যদেশাগত ছাত্র ও পথিকদের সংখ্যা বাড়বে। তাঁদের কর্ণকুহরকে যদি আশ্রমের নিন্দা থেকে বাঁচাতে চান তাহলে এই বেলা ঘর পরিষ্কার করতে হবে। ব্যক্তিবিশেষকে দয়া করবার উপলক্ষে যজ্ঞক্ষেত্রকে কলুষিত করা সদ্ধর্ম নয়। ফুলের গাছকে রক্ষা করা যদি কর্তব্য বলে মানেন তবে ফুলের কীটকে নির্বাসন দিতে দ্বিধা করাই ধর্মবিরুদ্ধ। আপনাদের দরবারে আমার সানুনয় প্রার্থনা এই যে, আশ্রমের মর্মস্থলশায়ী ব্যাধিগুলিকে দূর করতে বিলম্ব করবেন না।"

[বিশ্বভারতী পত্রিকা : বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭২ : পৃঃ. ২৮৬-৮৭]

কবি সকল দিক ভাবিয়া বগ্দানভদের সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহা হয়ত প্রাজ্ঞোচিতই হইয়াছিল।

এদিকে ভারতবর্ষে যখন প্রবল আন্দোলন চলিতেছে তখন পূর্ববঙ্গে ঢাকায় একটি অতিসামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া হিন্দু-মুসলমানের এক ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হইয়া যায় (২৪শে মে)। বস্তুতপক্ষে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট এবং তাহার পুলিশ বাহিনী দীর্ঘকাল এই দাঙ্গা দমন সম্পর্কে উদাসীন ও নিষ্ক্রিয় থাকে। এমনকি সরকার পক্ষ হইতে এই দাঙ্গার খবরও চাপিয়া যাওয়ার চেষ্টা চলে। বিশেষত বিলাতের অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা এই দাঙ্গা সম্পর্কে নীরব থাকে। রবীন্দ্রনাথ মিস্ স্টোরির মুখে এবং দেশ হইতে পত্রে এই দাঙ্গার খবর পাইয়া অত্যন্ত মর্মাহত ও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ইংরেজ সরকারের নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্য এবং বিলাতে পত্র-পত্রিকার এই সম্পর্কে নীরবতা লক্ষ্য করিয়া কবি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কবি জেনিভা হইতে উহার তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা করিয়া বিলাতের *Spectator* পত্রিকায় এক খোলা চিঠি লিখিলেন। ৩০শে আগস্ট উহা ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবির পত্রটি ছিল :

"Sir,— A fact of very grave significance at present crisis in the British rule in India has sorely puzzled my mind. I am impelled to write about it, for I find that its importance is not understood in England even by those who are in touch with Indian affairs.

"At Dacca in Eastern Bengal, there have been communal riots in which men of vicious character have been brought in so as to increase the mischief, and unspeakable atrocities have occurred. Yet, according to reports which have reached me, the police have either stood idly by or allowed the evil to go on with indifference and contempt. While the news of a motor accident in Europe causing a few casualties is circulated in all your newspapers, these crying evils continuing from day to day in the capital city of East Bengal (whereby the whole neighbourhood was terrorized and all work paralysed) have hardly found any mention in English journals. The number of deaths, the loss of property, the daily sufferings and terrors caused by these events have been enormous; and yet they have been ignored with a strange ominous silence. If a single English man were injured, or the comforts of English residents were menaced such silence would hardly be kept. Is it any wonder, then, that we are led to regard ourselves as of no interest or importance in the eyes of the British people, who have taken upon themselves the gratuitous task of our trusteeship? Is it strange that we consider such silence as artificially imposed rather than naturally occurring?

"We have not the least doubt that the most expensively and elaborately organised power which the British Government has in India is more than sufficient in checking at once any symptoms of

violence in our communal relationship. We have been brought up for a long time past on this belief. What has now occurred at Dacca had happened in a somewhat similar manner a few years ago in Calcutta and had been loudly proclaimed in the English Press. What is remarkable in the present instance is that amid an almost complete silence in the British Press a state of anarchy continued in Dacca for a unconscionably long time. The opinion formed about this arresting silence by our own people is unlikely to be accepted by the people of England.

"Here comes the real meaning of our helplessness. For the British people have their comfortable faith in the conduct of their own officials who rule over an alien people. They feel little direct responsibility. Therefore, when our evidence is pitted against that of their own official representatives, we have little chance of credence, Let us acknowledge that this is natural ; yet at the same time we should be allowed for the same reason to have faith in our own people when under conditions like the present they suffer and complain. For we are very unequally matched ; and while your opinion vitally affects us at every point, our opinion may easily remain unnoticed or else be even suppressed by you. But silenced though our people may be and ineffectual in their struggle, we judge ; and in the end it 'does' matter. I know from my own correspondence that this event at Dacca has alienated, more than anything else in Bengal the sympathies of those who were still clinging their faith in British justice, Other happenings had shaken public confidence but this has struck at its very foundation."

I am Sir etc.

Sd./ Rabindranath Tagore

স্মরণ রাখা দরকার প্রেস অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদে 'আনন্দবাজার' 'অমৃতবাজার' প্রভৃতি অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ রাখিয়াছিলেন। দেশের নেতা ও কর্মীরা প্রায় সকলেই জেলখানায়। সুতরাং এইসব ব্যাপার লইয়া আন্দোলন করিবার জন্য বাহিরে বিশেষ কেহই ছিলেন না।

সোভিয়েট রাশিয়ায়

বহুকাল হইতেই রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়াছিল। দেশে এবং বিদেশে সোভিয়েট রাশিয়ার সম্পর্কে পক্ষে ও বিপক্ষে নানা কথা শুনিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে কয়েকবারই তাঁহার সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণের নিমন্ত্রণ আসে। ১৯২৬ সালে কবি যখন ইউরোপ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন সেই সময় বার্লিনে তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'ভক্স'-এর পক্ষ থেকে রাশিয়া ভ্রমণের নিমন্ত্রণ-পত্র (২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৬) পান। বার্লিনে সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষা-সচিব লুনাচারস্কি স্বয়ং কবিকে আমন্ত্রণ জানাইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে সোভিয়েট দেশ ভ্রমণের পরিকল্পনা স্থগিত রাখিতে হয়।

১৯২৯ সালের প্রথমভাগে ভক্স-এর পক্ষ থেকে দ্বিতীয়বার নিমন্ত্রণপত্র পান। উল্লেখযোগ্য কবির পৌত্র সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন রাশিয়ায়। কবি একপত্রযোগে সৌম্যেন্দ্রনাথের মাধ্যমে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে রাশিয়ার অধ্যাপক বিনিময়ের পত্র দেন এবং ভক্স সানন্দে তাহাতে রাজী হয়ে পত্র দেয়। ১৯২৯ সালে কানাডা থেকে ফেরার পথে কবি যখন জাপানে যান তখনও একবার কোরিয়া হয়ে রাশিয়া যাবার কথা হয়। কিন্তু শারীরিক কারণে চিকিৎসকদের নির্দেশে এই যাত্রা স্থগিত হয়। এবারে জেনিভা থেকে রাশিয়ার যাত্রা প্রাক্‌কালে তাঁহার ইংরেজ বন্ধু-বান্ধবেরা শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে নাকি তাঁহার সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণের পরিকল্পনা বানচাল করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কবি কাহারও কথা না শুনিয়া রাশিয়া যাত্রা করেন।

সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণে কবির সঙ্গে ছিলেন, তাঁহার সেক্রেটারী আর্যনায়কম ও অমিয় চক্রবর্তী, সৌম্যেন্দ্রনাথ, চিকিৎসক হ্যারি টিম্বার্স এবং বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের কন্যা মার্গারিটা আইনস্টাইন।

১১ই সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ সদলবলে মস্কো পেঁীছলেন। রেল-স্টেশনে ভক্স ও সোভিয়েট রাশিয়ার লেখকদের যুক্তসঙ্ঘের বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণ ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন। মস্কোর গ্র্যান্ড হোটেলে তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা হয়।

১২ই সেপ্টেম্বর ভক্সের সভাপতি ফ. ন. পেত্রভের সহিত তাঁহাদের আলাপ-পরিচয় হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের সোভিয়েট লেখকদের যুক্তসঙ্ঘের ক্লাবে মস্কোর লেখক, সাহিত্যবিদ এবং রাজধানীর বিজ্ঞান-শিক্ষা কর্মীদের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলাপ হয়। সেখানে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে নিকলাই আসেয়েভ, ভেরা ইনবের, লেখক ফ. গ্লাদকভ এবং ন. ওগনেভ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা জানাইয়া অধ্যাপক পেত্রভ ও ন. সুক্লিয়ার

প্রভৃতি গণ্যমান্য কয়েকজনই বক্তৃতা করেন। কবি তাঁহার ক্ষুদ্র ভাষণের এক জায়গায় বলেন :

..."আজকে কারো পক্ষে আপনাদের বিচার করা সম্ভব নয়। ইতিহাস তার সত্য প্রমাণে দীর্ঘ সময় নেয়। আপনাদের পথ ও লক্ষ্যের সমালোচনা আমি করতে চাই নে : একটি জিনিস আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে, আপনারা সবার প্রতি শিক্ষার অমূল্য অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। এর ফলে মানবমনের যত অবরুদ্ধ ঐশ্বর্য আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাচ্ছে, আর এটা এতই বড়ো জিনিস যে তাতে গর্ববোধ করার আপনারা অধিকারী।"

[সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ : পৃঃ. ২৫]

পরদিন—১৩ই সেপ্টেম্বর মস্কোর ছাত্র ও অধ্যাপকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপ-পরিচয় হয়। ঐদিন রাষ্ট্রীয় ত্রেতিয়াকভ্ গ্যালারীর ডিরেক্টর ম. প. ক্রিস্তি, কলাবিদ অধ্যাপক আ. আ. সিদোরভ (চারুকলা মিউজিয়ম), বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিনিধি, 'নারকম্প্রস্'-এর (লোকশিক্ষা দফতর) মিউজিয়ম সংক্রান্ত বিভাগের অধ্যক্ষ আ. আ. ভাল্তের, ভক্স-এর প্রদর্শনী বিভাগের অধ্যক্ষ ইয়েশুকভের সঙ্গে পরিচয় হয়। কবি তাঁহার চিত্রকর্ম ইঁহাদের দেখাইলে পর তাঁহারা কবির অঙ্কিত চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। ত্রেতিয়াকভ গ্যালারীর অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানাইয়া বলিলেন :

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা সবাই দার্শনিক ও লেখক হিসেবেই ভাল করে জানি, কিন্তু আমরা সানন্দে বিস্ময়ের সঙ্গে জেনেছি যে তিনি চিত্রকরও। আমরা গভীর আনন্দের সঙ্গে তাঁর ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছি যাতে আমাদের বুদ্ধিজীবী ও ব্যাপক জনগণ তাদের পরিচয় পান।"

রবীন্দ্রনাথ তার জবাবে আন্তর্জাতিক শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ভাব-বিনিময়ের আদর্শটি সর্বোচ্চে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন :

..."জাতিতে জাতিতে সংযোগের শ্রেষ্ঠ উপায় হল হৃদয় ও মনের যোগ—আমার দেশের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাতে আপনাদের দেশেরও অধিকার, আপনাদের শ্রেষ্ঠ যা তাতে অধিকার সারা মানব জাতির। তাই দান প্রতিদানের প্রকৃত ক্ষেত্র সংস্কৃতি। আমার সৃষ্টির এই নতুনতম প্রকাশের ফল আপনাদের আমি সানন্দেই দেখাব।"

[ঐ : পৃঃ. ৪৩]

ঐদিন অধ্যাপক পেত্রভ পুনরায় রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়। সেদিন কবি একটি বিষয়ে পেত্রভকে সতর্ক করিয়া দিতে চাহিলেন যে, ভারতবর্ষে যখন ইংরেজের সঙ্গে দেশবাসীর তীব্র সংগ্রাম চলিতেছে তখন সামান্য কারণেও তাঁহাকে অসুবিধায় পড়িতে হইতে পারে, আর তাঁহার প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও তা ভাল হইবে না। তিনি বলিলেন :

"আজকের দিনে একটা কথা মনে রাখতে হবে। ভারতবর্ষ এখন বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে চলেছে। সেখানে গভর্নমেণ্ট আর জনগণের মধ্যে চলেছে সংগ্রাম। এই পরিবেশে সন্দিগ্ধ গভর্নমেণ্ট অতি সতর্ক। অত্যন্ত নির্দোষ ঘটনা, যার সঙ্গে রাজনীতির কোনই যোগ নেই, তাও প্রচার বলে ধরা হয়, মনে হয় বুঝি লুকিয়ে-চুরিয়ে বিপ্লবের

সহায়তা করা হচ্ছে। আমাদের এই অবস্থায় কোন রকম বিপদের ঝুঁকি নেওয়া চলে না। আমেরিকা আর ইংলণ্ডের অবস্থা একেবারেই অন্য: তারা স্বতন্ত্র, তারা স্বাধীন। ভারতবর্ষ এখন এমন পরিবেশে রয়েছে যে আমরা যদি এমন কিছু করি যার সঙ্গে আপনাদের দেশের স্বল্পতম সম্পর্কও আছে তবে তার অর্থ অত্যন্ত বিকৃত করা হবে। ওরা বলবে, এ হল বিপ্লবের ভাবধারা, প্রচারের কাজ চালানর আড়াল মাত্র, মুখোশ। আপনারা তো জানেনই আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এই সন্দেহ যাঁদের উপর পড়েছে ইংরেজ গভর্নমেণ্টের হাতে তাঁদের কী সইতে হয়েছে। তাঁরা জেলখানায় বন্দী হয়ে রয়েছেন।

"আমার এ দেশে আসাটা আমার পক্ষে খুবই সাহসের কাজ। কিন্তু এপথে বেশি দূর যাওয়াটা উচিত হবে না। আমার জীবনের একটিমাত্র লক্ষ্য হল—শিক্ষার আলোক বিস্তার। আমি পোলিটিশিয়ন নই। আমি বিশ্বাস করি, সাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটলে, জনগণের মনে চেতনার বিকাশ ঘটলে, আজকের অনেক দুঃখকষ্টই আপনা থেকেই দূর হবে।······আর সব কিছু থেকেই আমি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি। সব বাদ দিয়ে এই কর্তব্যই আমি গ্রহণ করেছি। আমার প্রতিষ্ঠানকে আমি সতর্কতার সঙ্গেই এ রকমের সব আন্দোলন থেকে মুক্ত রাখি।······

···"আমার জীবনের মূল লক্ষ্য হল—প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার। শুধু মনীষা নয়, ব্যক্তিত্বের সর্বতোমুখী বিকাশ, মানুষের সক্রিয়তার বিকাশ। সেই কারণেই আমি সারা জীবন একটি নির্দিষ্ট পথে চলেছি।"······ [ঐ : পৃঃ. ২৭-২৮]

অধ্যাপক পেত্রভের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বুঝিতে অসুবিধা হয় নাই। তিনি বুঝিতে পারেন সেই মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের এবং তাঁহার বিশ্বভারতীর সঙ্গে যে ভাবেই সহযোগিতা করিতে যাইবেন ইংরেজ গভর্নমেণ্ট তাহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিবে, যাহার ফলে সহযোগিতার আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত অথবা ব্যর্থ হইবে। অধ্যাপক পেত্রভ তাই বলিলেন :

···"ভারতবর্ষের অবস্থা যদি এমনই হয় যে আমাদের প্রতিষ্ঠানের (ভক্‌স) সঙ্গে আপনার প্রতিষ্ঠানের যোগসাধন এখন অনুচিত, তাহলে আমরা দুঃখের সঙ্গে অন্য অবস্থা, অন্য অনুকূল পরিবেশের অপেক্ষায় থাকব, যখন আপনার প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আমাদের সঙ্ঘের সঙ্গে স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হবে।··· আমাদের সংগঠন সম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক। কিন্তু যদি আমাদের সমিতির সঙ্গে এই জাতের সম্পর্ককেও সন্দিগ্ধ গভর্নমেণ্ট কমিউনিজম প্রচারের উদ্দেশ্যে গঠিত বলে মনে করে, তবে অবশ্যই আপাতত রীতিমত সম্পর্ক স্থাপন মুলতুবী রাখা ভাল। বেশ বুঝতে পারি আপনার আমাদের দেশে আসার সব রকম এমন কি অন্যায় ব্যাখ্যা হতে পারে।"··· [ঐ : পৃঃ. ২৯]

উভয়ের মধ্যে এই আলোচনা ও পারস্পরিক বুঝাবুঝির বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং ইহার কথা মনে রাখিলে পর তবেই 'রাশিয়ার চিঠি' পত্রগুচ্ছের দৃষ্টিভঙ্গীর কিংবা পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীতে ভারত-সোভিয়েট সাংস্কৃতিক সহযোগিতার অবাধ সম্পর্ক স্থাপিত না-হওয়ার একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ বা কৈফিয়ৎ খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

স্মরণ রাখা দরকার, ভারতবর্ষে তখনও আইন-অমান্য আন্দোলন চলিতেছে। সহস্র সহস্র কর্মী ও নেতারা কারাগারে। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট রাশিয়ার কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল পরিচালিত আন্দোলনকে তখন সর্বাপেক্ষা আতঙ্ক ও ভয়ের চোখে দেখিতেছিল। এই বলশেভিক-আতঙ্ক হইতেই তাহারা সারা ভারতের কমিউনিস্ট কর্মী ও নেতাদের গ্রেপ্তার করিয়া 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা' রুজু করে (১৯২৯ মার্চ—১৯৩৩)। এর কয়েক বৎসর পূর্বে 'পেশোয়ার বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা' (১৯২২-২৩) ও 'কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা' (১৯২৪) নামে আরও দুটি মামলা গভর্নমেণ্ট দায়ের করিয়াছিল।

এই সব কারণেই রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েট রাশিয়ার রাজনীতিক মতাদর্শ প্রচারে বা আলোচনায় খুব সংযম ও সতর্কতা অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কবি কি সব সময় সেই সতর্কতা ও সংযম রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন ?

কিন্তু রাশিয়ায় আসিয়া রবীন্দ্রনাথ যাহা দেখিলেন, তাহাতে নিদারুণ বিস্ময়ে ও আনন্দে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এতদিন যে সব জটিল প্রশ্নের তিনি কোনো পরিষ্কার সমাধান দেখিতে পান নাই, রাশিয়ার বিপুল সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে তাহার যেন সমাধানের ইঙ্গিত পাইলেন। কবির যেন বিস্ময়ের অবধি নাই। মস্কো থেকে প্রথম পত্রেই তিনি লিখিতেছেন :

"রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল। যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য কোনো দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলছে।

"চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন ; তাদের মানুষ হবার সময় নেই ; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে, কম প'রে, কম শিখে, বাকি সকলের পরিচর্যা করে ; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা রোগে মরে, উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে—জীবনযাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ সুবিধে সব-কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।

"আমি অনেকদিন এদের কথা ভেবেছি, মনে হয়েছে এর কোনো উপায় নেই। এক দল তলায় না থাকলে আর-এক দল উপরে থাকতেই পারে না, অথচ উপরে থাকার দরকার আছে।···একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম করে তবেই তার সভ্যতা। ···মানুষের সভ্যতায় এক অংশে অবকাশ রক্ষা করার দরকার আছে। তাই ভাবতুম, যে-সব মানুষ শুধু অবস্থার গতিকে নয়, শরীর-মনের গতিকে নীচের তলায় কাজ করতে বাধ্য এবং সেই কাজেরই যোগ্য, যথাসম্ভব তাদের শিক্ষাস্বাস্থ্য-সুখসুবিধার জন্যে চেষ্টা করা উচিত।

"মুশকিল এই, দয়া করে কোনো স্থায়ী জিনিস করা চলে না ; বাইরে থেকে উপকার করতে গেলে পদে পদে তার বিকার ঘটে। সমান হতে পারলে তবেই সত্যকার সহায়তা সম্ভব হয়। যাই হোক, আমি ভালো করে কিছুই ভেবে পাই নি, অথচ

অধিকাংশ মানুষকে তলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে, তবেই সভ্যতা সমুচ্চে থাকবে এ-কথা অনিবার্য বলে মেনে নিতে গেলে মনে ধিক্‌কার আসে।

"ভেবে দেখো-না, নিরন্ন ভারতবর্ষের অন্নে ইংলণ্ড পরিপুষ্ট হয়েছে। ইংলণ্ডের অনেক লোকেরই মনের ভাব এই যে, ইংলণ্ডকে চিরদিন পোষণ করাই ভারতবর্ষের সার্থকতা।"...

[রাশিয়ার চিঠি : রবীন্দ্ররচনাবলী-২০শ খণ্ড : পৃঃ. ২৭৩-৭৪]

রাশিয়ার বিপুল ও বিস্ময়কর কর্মযজ্ঞ কবির অবরুদ্ধ মনের দুয়ারের অর্গল খুলিয়া দিয়াছে ;—অনর্গল ভাবোচ্ছ্বাসের স্রোতে অজস্র কথার মধ্যে কবির অন্তরের গভীরে আসল মানুষটির স্বরূপটি বাহির হইয়া পড়িয়াছে, আর তাহার মূল কথাটি হইতেছে, তিনি শোষিত নিরন্ন জনগণের মানুষ। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক কর্ম-প্রচেষ্টার তারিফ করিবার উপলক্ষে তীব্র আবেগময়ী ভাষায় তিনি যেন এখন বিশ্বের সমস্ত শোষিত জনগণের পক্ষে সওয়ালে নামিয়াছেন। তিনি যথার্থ প্রাজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে রাশিয়ার রাজনীতিক ভাবাদর্শের তাত্ত্বিক আলোচনায় না-গিয়া উহার গঠনমূলক প্রচেষ্টার ফলাফল ও লক্ষ্যটিই খুঁটিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কেননা এই বাস্তব ফলাফল achievement-এর কষ্টিপাথরেই তাহার তাত্ত্বিক সভ্যতার যথার্থ সার্থকতা। অবশ্য আশু চূড়ান্ত ফললাভের কথা তিনি ভাবেন নাই। তাই তিনি লিখিলেন :

..."রাশিয়ায় একেবারে গোড়া ঘেঁষে এই সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা চলছে। তার শেষ ফলের কথা এখনও বিচার করবার সময় হয়নি, কিন্তু আপাতত যা চোখে পড়ছে তা দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। আমাদের সকল সমস্যার সব-চেয়ে বড়ো রাস্তা হচ্ছে শিক্ষা।...এখানে সেই শিক্ষা যে কী আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়।...শুধু শ্বেত রাশিয়ার জন্যে নয়—মধ্য-এশিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মতো বেগে শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে; সায়ন্সের শেষ-ফসল পর্যন্ত যাতে তারা পায় এইজন্যে প্রয়াসের অন্ত নেই।...

এইসব দেখিয়া-শুনিয়া কবি গভীর আক্ষেপের সুরে লিখিলেন :

..."আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েছি এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তাই করছে। আমাদের কর্মীরা যদি কিছুদিন এখানে এসে শিক্ষা করে যেতে পারত তা হলে ভারি উপকার হত। প্রতিদিনই আমি ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার তুলনা করে দেখি আর ভাবি, কী হয়েছে আর কী হতে পারত।"......

[ঐ : পৃঃ. ২৭৪-৭৫]

ইতিপূর্বে কবি তাঁহার এই দীর্ঘজীবনে একাদশবার বহির্ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ইহার মধ্যে ইউরোপ-আমেরিকার সহিতই তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। সেখানকার পুঁজিবাদী সভ্যতা-সংস্কৃতি তাঁহার মনে যে কী নিদারুণ ঘৃণা ও বিরূপতার উদ্রেক করিয়াছিল তাহা আমরা পূর্বেই বিস্তারিত লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ায় আসিয়া কবি চিন্তা ও মনের দিক হইতে যেন প্রচণ্ড এক ধাক্কা ও ঝাঁকুনি খাইলেন। ঐশ্বর্য ও ধনের গরিমা, ভোগোপকরণের উদগ্র লালসা, ধনসম্পদ ও শক্তির আস্ফালন এবং পাশ্চাত্যদেশের তীব্র ধন-বৈষম্য—ইহার কিছুই

তিনি রাশিয়ায় দেখিতে পাইলেন না। তাই এই দুই সভ্যতার পার্থক্য ও তুলনামূলক চিত্রটি রাশিয়া ভ্রমণকালে বার বার তাঁহার মনে আসিয়াছে। পুঁজিবাদী শোষণের অবসানে শ্রেণীগত ও ধনগত বৈষম্য লোপ পাইয়া রাশিয়ার সমস্ত জনসাধারণ সম্পূর্ণ মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,—এই দৃশ্যে রবীন্দ্রনাথ আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি লিখিলেন :

…"আহারে ব্যবহারে এমন সর্বব্যাপী নির্ধনতা য়ুরোপের আর কোথাও দেখা যায় না। তার প্রধান কারণ, আর-আর সব জায়গায় ধনীদরিদ্রের প্রভেদ থাকাতে ধনের পুঞ্জীভূত রূপ সব-চেয়ে বড়ো করে চোখে পড়ে—সেখানে দারিদ্র্য থাকে যবনিকার আড়ালে নেপথ্যে; সেই নেপথ্যে সব এলোমেলো, নোংরা, অস্বাস্থ্যকর, দুঃখে দুর্দশায় দুষ্কর্মে নিবিড় অন্ধকার।…এখানে ভেদ নেই ব'লেই ধনের চেহারা গেছে ঘুচে; দৈন্যেরও কুশ্রীতা নেই, আছে অকিঞ্চনতা।…অন্য দেশে যাদের আমরা জনসাধারণ বলি, এখানে তারাই একমাত্র।…

"এখানে এসে সব-চেয়ে যেটা আমার চোখে ভালো লেগেছে সে হচ্ছে, এই ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব। কেবলমাত্র এই কারণেই এদেশে জনসাধারণের আত্মমর্যাদা একমুহূর্তে অবারিত হয়েছে। চাষাভুষো সকলেই আজ অসম্মানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে, এইটে দেখে আমি যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হয়েছি। মানুষে মানুষে ব্যবহার কী আশ্চর্য সহজ হয়ে গেছে।"…

[ঐ : পৃঃ. ২৭৬-৭৭]

কবি রাশিয়া ভ্রমণে যাইতেছেন শুনিয়া তাঁহার পশ্চিমী বন্ধুদের কেহ কেহ নানাভাবে ভয় দেখাইয়াছিল। রাশিয়া ভ্রমণকালে তাঁহাদের কথা মনে পড়ায় তাঁহাদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখিলেন :

…"এ কথা মানতেই হবে, আমার বয়সে আমার মতো শরীর নিয়ে রাশিয়ায় ভ্রমণ দুঃসাহসিকতা। কিন্তু পৃথিবীতে যেখানে সব-চেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান সেখানে নিমন্ত্রণ পেয়েও না আসা আমার পক্ষে অমার্জনীয় হত।

"তা ছাড়া আমার কানে সেই কোরীয় যুবকের কথাটা বাজছিল। মনে মনে ভাবছিলুম, ধনশক্তিতে দুর্জয় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাঙ্গণদ্বারে ওই রাশিয়া আজ নির্ধনের শক্তিসাধনার আসন পেতেছে সমস্ত পশ্চিম মহাদেশের ভ্রূকুটিকুটিল কটাক্ষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, এটা দেখবার জন্যে আমি যাব না তো কে যাবে। ওরা শক্তিশালীর শক্তিকে, ধনশালীর ধনকে বিপর্যস্ত করে দিতে চায়, তাতে আমরা ভয় করব কিসের, রাগই করব বা কেন। আমাদের শক্তিই বা কী, ধনই বা কত।আমরা তো জগতের নিরন্ন নিঃসহায়দের দলে।" [ঐ : পৃঃ. ২৮০-৮১]

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডকে কী চোখে দেখেছিলেন তাহা আমরা যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

রাশিয়ায় তাঁহারা প্রায় একপক্ষকাল (১১-২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩০) থাকেন। এই সময়ের মধ্যে কবি রাশিয়ার বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতিবিদ, পায়োনিয়র কম্যুনের সদস্য, যৌথখামারের চাষী; ট্রেড-ইউনিয়ন কর্মী প্রমুখ যাহারা নতুন রাশিয়া গড়িয়া তুলিতেছিলেন তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাতে আলাপ-আলোচনা করেন।

রাশিয়ার ত্রেতিয়াকভ গ্যালারীও একদিন পরিদর্শন করেন। একদিন সন্ধ্যায় টলস্টয়ের বিখ্যাত 'রেজারেকশন' উপন্যাস অবলম্বনে একটি নাটক দেখিলেন। তাছাড়া রাশিয়ার বিখ্যাত বলশয় থিয়েটারে ব্যালে এবং আইজেনস্টাইনের বিখ্যাত 'ব্যাটলশিপ পতিওম্‌কিন্‌' এবং 'পুরাতন ও নূতন' ছবি দুটি দেখেন। কবির রাশিয়া ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ *Visva Bharati Quarterly* (1930-31) এবং সোভিয়েট রাশিয়া কর্তৃক প্রকাশিত 'সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি গ্রন্থে আছে।

রবীন্দ্রনাথের চোখে সোভিয়েট রাশিয়া

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, রাশিয়ায় না-আসিলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকিত ;—পৃথিবীতে যেখানে সবচেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান সেখানে নিমন্ত্রণ পেয়েও না আসা তাঁহার পক্ষে অমার্জনীয় হইত।

প্রশ্ন এই, 'রাশিয়ার চিঠি' কি এই মহান কবির ভাববিহ্বল চোখের আবেগ-উচ্ছ্বাস মাত্র, নাকি ইহার মধ্যে কবির বাস্তববাদী ও তাঁহার মর্মভেদকারী তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় কিছু ইহাতে মেলে। বস্তুত পর্যবেক্ষণের মধ্যে পর্যবেক্ষকের বা দ্রষ্টার স্বরূপ ও বিশেষ-বিশেষ প্রবণতাগুলি ধরা পড়ে। 'রাশিয়ার চিঠি' পত্রধারায় শুধু কবি হিসাবে নয়—দ্রষ্টা-রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ বীক্ষণশক্তির পরিচয় মেলে যাহা অন্তত তৎকালীন ভারতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে সেদিন কদাচ দেখা গিয়াছে।

অথচ কবিকে স্পষ্ট করিয়া ভাবিয়া-চিন্তিয়া কিছু দেখিতে বা লিখিতে হয় নাই—সমস্ত পত্রে চিন্তার একটি সহজ স্বচ্ছ ও অনর্গল গতিপ্রবাহ আছে। তাহার প্রধান কারণ, ভারতের কৃষি, শিল্প, সমবায়, অর্থনীতিক উন্নয়ন, শিক্ষা-সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য—এককথায় ভারতের সামগ্রিক উন্নয়নের কথা কবি সারাজীবন গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছেন এবং শুধু চিন্তাই নহে, তাঁহার সাধ্যমত সঙ্গতি লইয়া উহার বাস্তব রূপায়ণের সাধনায় তাঁহার পরিশ্রম ও উদ্যমের যেন অন্ত ছিল না। কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষে সেদিন তাহার সমস্যা ও বাধারও অন্ত ছিল না। ঠিকমত কবি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, কিভাবে উহার সমাধান করা যায়—কিভাবে দেশের নিশ্চেষ্ট উদ্দমহীন মানুষের মনে সাড়া জাগান যায়। এক-এক সময় এই অপরাজেয় আদর্শবাদী ও ভাবুক কবি-মানুষটিও যেন নিরুৎসাহে ভাঙিয়া পড়িতেন। এবং তাঁহার গভীর ক্ষেদ ও আক্ষেপের কারণ ছিল এই যে, দেশের নেতারা কেহই তাঁহার এই গঠনমূলক পরিকল্পনাকে কোন রকম আমলই দিতে চাহিতেন না। সোভিয়েট রাশিয়া কিভাবে এই সমস্ত বিষয়ে সমাধানের পথে অগ্রসর হইতেছে স্বভাবতই সে-বিষয়ে কবির প্রবল আগ্রহ ও প্রখর দৃষ্টি ছিল। তাই প্রতিটি বিষয়ে তিনি খুঁটিয়া জানিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আর যতই তিনি রাশিয়ার অভূতপূর্ব উন্নতির গতিবেগ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ততই বার বার কেবল নিরন্ন পরাধীন

দেশবাসীর কথা তাঁহার মনে আসিয়াছে। তাই 'রাশিয়ার চিঠি'তে রাশিয়ার কথাও যত আছে ভারতবর্ষের কথাও তাহা অপেক্ষা কম কিছু নাই। ভারতবর্ষের মঙ্গল ও উন্নতি-বিধানের চিন্তা যে তাঁহার সমগ্র মন জুড়িয়া আছে, 'রাশিয়ার চিঠি'তে সেই কথাই সুস্পষ্টভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে—এতোখানি পরিণত রাজনীতিক চিন্তা সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের আর কোনো রচনাতেই দেখা যায় না।

এখন দেখা যাক, সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের কোন্ কোন্ দিকগুলি রবীন্দ্রনাথের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ ঠেকিয়াছিল।

এক : রুশ-বিপ্লবের বিশ্ববাণী

প্রথমেই কবির চোখে ধরা পড়ে, ফরাসী-বিপ্লবের মত রুশ-বিপ্লবেরও এক সুমহান আন্তর্জাতিকতার ও বিশ্ববাণী আছে। যুদ্ধ-শোষণ-লুণ্ঠন-অত্যাচার-অবিচার ও নিপীড়নে ভরা এই ঘোর তামসিক পৃথিবীতে রুশ-বিপ্লবই ভবিষ্যৎ আশার আলোক বর্তিকা তুলিয়া ধরিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ইউরোপ-আমেরিকার অন্যান্য দেশ-গুলিতে যে উগ্র-জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিকতার উদ্দাম উন্মাদনা দেখিয়াছিলেন, যাহার বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সংগ্রাম করিয়াছিলেন, সোভিয়েট দেশে আসিয়া তাহার প্রথম ব্যতিক্রম দেখিলেন। তিনি দেখিলেন পৃথিবীতে একটি মাত্র দেশ আজ জাতীয়তার ঊর্ধ্বে আন্তর্জাতিকতার ও বিশ্বমানবের স্বার্থে চিন্তা করিতেছে। তিনি বলিলেন :

"একদিন ফরাসী-বিদ্রোহ ঘটেছিল এই অসাম্যের তাড়নায়। সেদিন সেখানকার পীড়িতেরা বুঝেছিল এই অসাম্যের অপমান ও দুঃখ বিশ্বব্যাপী। তাই সেদিনকার বিপ্লবে সাম্য সৌভ্রাত্র ও স্বাতন্ত্র্যের বাণী স্বদেশের গণ্ডি পেরিয়ে উঠে ধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু টিঁকল না। এদের এখানকার বিপ্লবের বাণীও বিশ্ববাণী। **আজ পৃথিবীতে অন্তত এই একটা দেশের লোক স্বাজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে।** এ বাণী চিরদিন টিঁকবে কিনা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু স্বজাতির সমস্যা সমস্ত মানুষের সমস্যার অন্তর্গত, এই কথাটা বর্তমান যুগের অন্তর্নিহিত কথা। একে স্বীকার করতেই হবে।"

[রবীন্দ্র রচনাবলী-২০শ খণ্ড : পৃঃ. ২৭৯]

'দুনিয়ার সর্বহারা-দুঃখজীবীরা এক হউক !' রুশ-বিপ্লবের এই মহান বাণীর—যে-কথা জাপানে তিনি কোরীয় যুবকের মুখে শুনিয়া উহার তাৎপর্য ঠিক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, এখন যেন তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। তাই তিনি লিখিলেন :

"দুঃখী আজ সমস্ত মানুষের রঙ্গভূমিতে নিজেকে বিরাট করে দেখতে পাচ্ছে, এইটে মস্ত কথা। আগেকার দিনে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে দেখেছে বলেই কোনো-মতে নিজের শক্তিরূপ দেখতে পায় নি—অদৃষ্টের উপর ভর করে সব সহ্য করেছে। আজ অত্যন্ত নিরুপায়ও অন্তত সেই স্বর্গরাজ্য কল্পনা করতে পারছে যে-রাজ্যে পীড়িতের পীড়া যায়, অপমানিতের অপমান ঘোচে ; এই কারণেই সমস্ত পৃথিবীতেই আজ দুঃখজীবীরা নড়ে উঠেছে।" [ঐ : পৃঃ. ২৮০]

দুই : সোভিয়েটের নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব ও শান্তি-নীতি

সোভিয়েট রাশিয়াকে ধ্বংস করার জন্য ঘরে-বাইরে চতুর্দিকে ইংলণ্ড-আমেরিকা প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুদের আক্রমণ ও ষড়যন্ত্রমূলক প্রচেষ্টা তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। এই কারণেই সোভিয়েটের প্রতিরক্ষা ও আত্মরক্ষামূলক প্রচেষ্টার সমর্থনে যুক্তি দিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সোভিয়েট নেতারাই যে নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব পাঠায়, তাঁহারা যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং তাঁহারাই যে প্রকৃত শান্তি চান, ইহা তিনি স্পষ্টই উপলব্ধি করেন। তিনি লিখিলেন :

"মনে রেখো, এখানে যে-বিপ্লবে জারের শাসন লয় পেলে সেটা ঘটেছে ১৯১৭ খৃস্টাব্দে। অর্থাৎ তেরো বছর পার হল মাত্র। ইতিমধ্যে ঘরে-বাইরে এদের প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার সঙ্গে লড়ে চলতে হয়েছে। এরা একা, অত্যন্ত ভাঙাচোরা একটা রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বোঝা নিয়ে।...যে আত্মবিপ্লবের প্রবল ঝড়ের মুখে এরা নবযুগের ঘাটে পাড়ি দিলে সেই বিপ্লবের প্রচ্ছন্ন এবং প্রকাশ্য সহায় ছিল ইংলণ্ড এবং আমেরিকা। অর্থসম্বল এদের সামান্য; বিদেশের মহাজনী গদিতে এদের ক্রেডিট নেই। দেশের মধ্যে কলকারখানা এদের যথেষ্ট পরিমাণে না থাকাতে অর্থ-উৎপাদনে এরা শক্তিহীন। এইজন্যে কোনোমতে পেটের ভাত বিক্রি করে চলেছে এদের উদ্যোগপর্ব। অথচ রাষ্ট্রব্যবস্থায় সকলের চেয়ে যে অনুৎপাদক বিভাগ—সৈনিক-বিভাগ—তাকে সম্পূর্ণ-রূপে সুদক্ষ রাখার অপব্যয় এদের পক্ষে অনিবার্য। **কেননা আধুনিক মহাজনী যুগের সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি এ:দর শত্রুপক্ষ এবং তারা সকলেই আপন আপন অস্ত্রশালা কানায় কানায় ভরে তুলেছে।**

তিনি আরও লিখলেন :

"**মনে আছে, এরাই লীগ অব নেশন্‌স্‌এ অস্ত্রবর্জনের প্রস্তাব পাঠিয়ে দিয়ে কপট শান্তিকামীদের মনে চমক লাগিয়ে দিয়েছিল।** কেননা নিজেদের প্রতাপ-বর্ধন বা রক্ষণ সোভিয়েটদের লক্ষ্য নয়—এদের সাধনা হচ্ছে জনসাধারণের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্নসম্বলের উপায়-উপকরণকে প্রকৃষ্ট প্রণালীতে ব্যাপক করে গড়ে তোলা, এদেরই পক্ষে নিরুপদ্রব শান্তির দরকার সবচেয়ে বেশি। কিন্তু তুমি তো জান, লীগ অব নেশন্‌স্‌'-এর সমস্ত পালোয়ানই গুণ্ডাগিরির বহুবিস্তৃত উদ্যোগ কিছুতেই বন্ধ করতে চায় না, কিন্তু 'শান্তি চাই' বলে সকলে মিলে হাঁক পাড়ে। এইজন্যেই সকল সাম্রাজ্যিক দেশেই অস্ত্রশস্ত্রের কাঁটাবনের চাষ অন্নের চাষকে ছাপিয়ে বেড়ে চলেছে।"

...(বড় হরফ—লেখকের) [ঐ : পৃঃ. ২৮৬-৮৭]

তিন : সোভিয়েট রাশিয়ার 'প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা'

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই রাজনীতিক আন্দোলন অপেক্ষা গঠনমূলক—বিশেষত অর্থনীতিক পুনর্গঠনের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। সোভিয়েট রাশিয়া কি ভাবে তাহাদের আর্থনীতিক পুনর্গঠনে অগ্রসর হইয়াছে তাহা জানিবার কবির অসীম আগ্রহ ছিল। স্মরণ রাখা দরকার, ১৯২৯ সালে সোভিয়েটের বিশেষজ্ঞ ও পরিকল্পনাবিদ্‌রা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনে অগ্রসর হন। কবি যখন রাশিয়ায় যান,

সটা তাহাদের পরিকল্পনার দ্বিতীয় বর্ষ। সোভিয়েটের অভূতপূর্ব সাফল্য ও চেষ্টাগুলি দেখিয়া কবি অত্যন্ত প্রভাবিত হন। সোভিয়েট রাশিয়ার গঠনমূলক র্মকাণ্ডের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকগুলি তিনি সুনিপুণভাবে বর্ণনা করিয়া লিখিতেছেন :

"এরা তিনটে জিনিস নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে। শিক্ষা, কৃষি এবং যন্ত্র। এই তন পথ দিয়ে এরা সমস্ত জাতি মিলে চিত্ত, অন্ন এবং কর্মশক্তিকে সম্পূর্ণতা দেবার াধনা করছে। আমাদের দেশের মতোই এখানকার মানুষ কৃষিজীবী। কিন্তু ামাদের দেশের কৃষক এক দিকে মূঢ়, আর-এক দিকে অক্ষম; শিক্ষা এবং শক্তি দুই থকেই বঞ্চিত। তার একমাত্র ক্ষীণ আশ্রয় হচ্ছে প্রথা—পিতামহদের আমলের চাকরের তো, সে কাজ করে কম, অথচ কর্তৃত্ব করে বেশি।···

···"কৃষিকে বল দান করেছে যন্ত্র। আজকের দিনে আমাদের কৃষিক্ষেত্রের কোনো কনারায় বলরামের দেখা নেই—তিনি লজ্জিত—যে-দেশে তাঁর অস্ত্রে তেজ আছে সই সাগরপারে তিনি চলে গেছেন। রাশিয়ায় কৃষি বলরামকে ডাক দিয়েছে. দেখতে দখতে সেখানকার কেদারখণ্ডগুলো অখণ্ড হয়ে উঠল, তাঁর নূতন হলের স্পর্শে হল্যাভূমিতে প্রাণসঞ্চার হয়েছে।" [ঐ : পৃঃ. ২৯৬-৯৭]

বহুকাল হইতে যন্ত্রশিল্প সম্পর্কে কবির মনে একটি অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। ন্ত্রবিজ্ঞানের জয়গান গাহিলেও এক এক সময় তাঁহার সন্দেহ হইয়াছে বুঝিবা ন্ত্রশিল্প অনিবার্যভাবে শোষণ ও ব্যক্তিগত মুনাফা প্রবৃত্তির জন্ম দেয়। যন্ত্রশিল্পের ঠিক প্রয়োগ কিভাবে এবং কোন সমাজব্যবস্থায় সম্ভব এ সম্পর্কে তাঁহার কোন বচ্ছ ধারণা ছিল না। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার যন্ত্রশিল্পের সমাজতান্ত্রিক ালিকানা তাহার মনে এক নূতন আলোকসম্পাত করে। পুঁজিবাদী শোষণ ও ্যক্তিগত মুনাফা প্রবৃত্তির চিরতরে অবসান ঘটাইয়া সোভিয়েট দেশ বিজ্ঞান ও যন্ত্র-শল্পকে সম্পূর্ণভাবে জনকল্যাণ ও সমাজকল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছে—ইহা কবিকে বশেষভাবে আকৃষ্ট করে। তিনি তাই লিখিয়াছিলেন :

"একটা কথা মনে রেখো, এরা নানা জাতির লোক কল-কারখানার রহস্য আয়ত্ত রবার জন্যে এত অবাধ উৎসাহ এবং সুযোগ পেয়েছে, তার একমাত্র কারণ যন্ত্রকে ্যক্তিগত স্বতন্ত্র স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না। যত লোকেই শিক্ষা রুক তাতে সকল লোকেরই উপকার, কেবল ধনীলোকের নয়। আমরা আমাদের াভের জন্যে যন্ত্রকে দোষ দিই, মাতলামির জন্যে শাস্তি দিই তালগাছকে। াস্টারমশায় যেমন নিজের অক্ষমতার জন্যে বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে রাখেন কে।

সেদিন মস্কো কৃষি-আবাসে গিয়ে স্পষ্ট করে স্বচক্ষে দেখতে পেলুম, দশ বছরের ধ্য রাশিয়ার চাষীরা ভারতবর্ষের চাষীদের কত বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে।··· রতবর্ষেরই মতো এ-দেশ কৃষিপ্রধান দেশ, এই জন্যে কৃষিবিদ্যাকে যতদূর সম্ভব গিয়ে দিতে না পারলে দেশের মানুষকে বাঁচানো যায় না। এরা সে-কথা ভোলে । এরা অতি দুঃসাধ্য সাধন করতে প্রবৃত্ত।

তিনি আরও লিখিলেন :

"সিভিল সার্ভিসের আমলাদের দিয়ে এরা মোটা মাইনেয় আপিস চালাবার কাজ

করছে না—যারা যোগ্য লোক, যারা বৈজ্ঞানিক, তারা সবাই লেগে গেছে। এই দশ বছরের মধ্যে এদের কৃষিচর্চাবিভাগের যে-উন্নতি ঘটেছে তার খ্যাতি ছড়িয়ে গেছে জগতের বৈজ্ঞানিকমহলে। যুদ্ধের পূর্বে এ-দেশে বীজ-বাছাইয়ের কোনো চেষ্টাই ছিল না। আজ প্রায় তিন কোটি মণ বাছাই-করা বীজ এদের হাতে জমেছে। তা ছাড়া নূতন শস্যের প্রচলন শুধু এদের কৃষি-কলেজের প্রাঙ্গণে নয়, দ্রুতবেগে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কৃষি সম্বন্ধে বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালা আজরবাইজান উজবেকিস্তান জর্জিয়া য়ুক্রেন প্রভৃতি রাশিয়ার প্রত্যন্তপ্রদেশেও স্থাপিত হয়েছে।

"রাশিয়ার সমস্ত দেশপ্রদেশকে জাতি-উপজাতিকে সক্ষম ও শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে এতবড়ো সর্বব্যাপী অসামান্য অক্লান্ত উদ্যোগ আমাদের মতো ব্রিটিশ সাবজেক্টের সুদূর কল্পনার অতীত। এতটা দূর পর্যন্ত করে তোলা যে সম্ভব, এখানে আসবার আগে কখনো আমি তা মনেও করতে পারি নি।"...

[ঐ : পৃঃ. ২৯৫]

পূর্বখণ্ডেই আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, যন্ত্রশিল্প বিশেষত আধুনিক বৃহদাকার যন্ত্রশিল্প ভারতে প্রবর্তন করা সম্পর্কে কবি ইতিপূর্বে খুব স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই কিন্তু কৃষিতে যন্ত্র ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনের জন্য তিনি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া আসিতেছিলেন এবং যত ক্ষুদ্র আকারেই হউক না কেন শ্রীনিকেতনে তিনি উহার বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করিয়া দিয়াছিলেন। সোভিয়েট রাশিয়ায় উহার সার্থক প্রয়োগে স্বভাবতই কবি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইলেন। সোভিয়েট রাশিয়া তাহার অনুন্নত জাতি-গোষ্ঠীর বিকাশসাধনে তাহাদের সর্বাত্মক উন্নতিতে উদ্যোগী হইয়াছে এবং তাহার জন্য বিকেন্দ্রীভূত ও দেশের সর্বস্তরে কৃষি, যন্ত্র ও আর্থনীতিক পুনর্গঠনের সুষম বিকাশের পরিকল্পনায় উহারা মাতিয়া উঠিয়াছে, ইহাও কবির তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে।

তাছাড়া কৃষিতে সোভিয়েটের যৌথখামার (Collective Farm) বা ঐকত্রিক চাষপ্রথার প্রচেষ্টাকে কবি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন। কবি স্বয়ং দেশে সমবায় চাষপ্রথার প্রবর্তনের জন্যে যে কী অক্লান্ত আন্দোলন করিয়াছিলেন এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। এই কারণেই তিনি যখন মস্কোর কৃষিভবনে যৌথখামারের চাষীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনা করেন (১৬ই সেপ্টেম্বর) তখন অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তিনি যৌথখামার সম্পর্কে উহাদের ধারণা সম্পর্কে খুঁটিয়া খুঁটিয়া প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কবি 'রাশিয়ার চিঠি'তে উহার উল্লেখ করিয়াছেন (পত্র-৫) এবং সম্প্রতি এই আলোচনার বিস্তারিত 'স্টেনো-রিপোর্ট'ও প্রকাশিত হইয়াছে (দ্রঃ. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ : পৃঃ. ৫৩-৫৯)। এখানে উল্লেখ করা দরকার, প্রথমদিকে এই যৌথখামার প্রবর্তনের আন্দোলনে কিছুকিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সেখানে ঘটিয়াছিল এবং সে-সম্পর্কে সোভিয়েট সরকার যে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, উহাও কবি লক্ষ্য করিয়াছেন। অবশ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে সোভিয়েট সরকারের নীতিকে তিনি পুরোপুরি সমর্থন করিতে পারেন নাই। যথাস্থানে আমরা এ-আলোচনায় আসিব।

চার : রাশিয়ার জনশিক্ষা

রবীন্দ্রনাথ যে তাঁহার গঠনমূলক পরিকল্পনায় এক এক সময় জনশিক্ষা প্রসারের আন্দোলনের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন তাহা আমরা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। বস্তুত দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও রাজনীতিক আন্দোলনের উপর তাঁহার বড়ো একটা আস্থা ছিল না এবং তিনি এও সন্দেহ করিতেন যে, দেশ রাজনীতিক স্বাধীনতা পাইলেও উহা প্রকৃত স্বাধীনতা হইবে না। সমাজের উপরিতলের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এই সুযোগে রাষ্ট্রশক্তিকে কুক্ষিগত করিয়া সমাজের বিশাল অশিক্ষিত জনসাধারণকে তেমনিই শোষণ করিয়া চলিবে। সুতরাং দেশের জনসাধারণ শিক্ষিত হইলে পরে তবেই দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র স্থায়ী এবং সার্থক হইতে পারে—ইহাই ছিল কবির ধারণা। এবং এই কারণেই রাশিয়ার শিক্ষাবিধি এবং জনশিক্ষা প্রসারে তাহাদের সর্বাত্মক অভিযান রবীন্দ্রনাথকে সবচাইতে বেশি মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিয়াছিল। কবি একটি পত্রে লিখিতেছেন :

…"রাশিয়ায় গিয়েছিলুম ওদের শিক্ষাবিধি দেখবার জন্যে। দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছি। আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে দিয়েছে। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্‌ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল আজ তারা সমাজের অন্ধকুটুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এত প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত এমন ভাবান্তর ঘটতে পারে, তা কল্পনা করা কঠিন।"…

[ঐ : পৃঃ. ২৯৬]

রাশিয়ায় জনশিক্ষা প্রসার অভিযানের অভূতপূর্ব সাফল্য দেখিয়া বার বার তিনি ভারতের নিরক্ষর, নিরন্ন জনগণের অবস্থার তুলনা করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, 'কিন্তু শতাধিক বৎসরের ইংরেজ-শাসনের পরে দেশে শতকরা পাঁচজনের কপালে শিক্ষা জুটেছে, সে শিক্ষাও শিক্ষার বিড়ম্বনা।'

উল্লেখযোগ্য, ইহার অল্পকাল পূর্বে 'সাইমন কমিশন'-এর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তাহাতে ভারতের বিশাল জনসাধারণের নিরক্ষরতার কথা কবুল করা হয়। খৃস্টান পাদ্রী এডওয়ার্ড টম্‌সন্‌ এই সমস্যার প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছিলেন, ইহাদের উন্নতি-সাধনে 'enormous difficulties' আছে। কবি 'রাশিয়ার চিঠি' পত্রধারায় বারবার সাইমন কমিশন ও টম্‌সনদের শ্লেষ ও বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, 'কতবার আমি ভেবেছি, আমাদের দেশে সাইমন কমিশন যাবার আগে একবার রাশিয়ায় তার ঘুরে যাওয়া উচিত ছিল।' 'আমাদের সম্রাটবংশীয় খৃস্টান পাদ্রীরা বহুকাল ভারতবর্ষে কাটিয়েছেন। ডিফিকাল্টিজ যে কী রকম অনড় তা তাঁরা দেখে এসেছেন। একবার তাঁদের মস্কো আসা উচিত।'…

রাশিয়ায় শিক্ষাবিধির সাফল্য সম্পর্কে আর একটি পত্রে কবি লিখিতেছেন :

"আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতম তল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ

লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায় নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে। শুধু নিজের জাতকে নয়, অন্য জাতের জন্যেও এদের সমান চেষ্টা। অথচ সাম্প্রদায়িক ধর্মের মানুষেরা এদের অধার্মিক বলে নিন্দা করে। ধর্ম কি কেবল পুঁথির মন্ত্রে, দেবতা কি কেবল মন্দিরের প্রাঙ্গণে।···

"কতবার মনে হয়েছে আর কোথাও নয়, রাশিয়ায় এসে একবার তোমাদের সব দেখে যাওয়া উচিত।···আমার মনে হয় কিছুর জন্যে নয়, কেবল শিক্ষাসম্বন্ধে শিক্ষা করতে যাওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত দরকার।" [ঐ : পৃঃ. ৩১৫]

উজবেক, তুর্কমানী, বাষ্কির্—প্রভৃতি রাশিয়ার অনুন্নত জাতি-গোষ্ঠীর জন্য সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট শিক্ষা, কৃষি ও শিল্পায়নের যে ব্যাপক অভিযান শুরু করিয়াছিল কবি তাহাতে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, 'দেখে শুনে ভাবছি, আমরা কি উজবেকদের চেয়ে তুর্কমানীদের চেয়েও পেছিয়ে-পড়া জাত। আমাদের ডিফিকালটিজের মাপ কি এদের চেয়েও বিশগুণ বেশি।'

পাঁচ : সোভিয়েট রাশিয়ার শিল্প-সংস্কৃতি ও ললিতকলা চর্চা

রবীন্দ্রনাথ শিল্প ও ললিতকলাকে পৌরুষের বিরোধী কিংবা জাতীয়-সংগ্রামের পরিপন্থী বলিয়া মনে করিতেন না পরন্তু পরস্পরের পরিপূরক বলিয়া মনে করিতেন। এবং এইটিই রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই কারণেই অসহযোগ আন্দোলনের সময় এবং পরবর্তী জাতীয় সংগ্রাম-সংঘর্ষের সময়ও তিনি কলিকাতায় গীতোৎসব ও নৃত্যনাট্যের প্রযোজনা বা ব্যবস্থাপনা করেন এবং যাহার জন্য তাঁহাকে নানা বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়।

কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ায় শিল্প ও ললিতকলা চর্চায় জনগণের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষ্য করিয়া তিনি অত্যন্ত আকৃষ্ট হন। তাছাড়া রাশিয়ায় মূল্যবান শিল্পসামগ্রী সংরক্ষণের ব্যাপারে সোভিয়েট সরকারের অতীব সতর্ক ও সযত্ন ব্যবস্থাগুলি লক্ষ্য করিয়া কবি যারপরনাই বিস্মিত ও আনন্দিত হন। একটি পত্রে তিনি লিখিলেন :

···"এতবড়ো উচ্ছৃঙ্খল উৎপাতের সময় বিপ্লবী নেতাদের কাছ থেকে কড়া হুকুম এসেছে—আর্ট-সামগ্রীকে কোনোমতে যেন নষ্ট হতে দেওয়া না হয়। ধনীদের পরিত্যক্ত প্রাসাদ থেকে ছাত্ররা অধ্যাপকেরা অর্ধ-অভুক্ত শীতক্লিষ্ট অবস্থায় দল বেঁধে যা-কিছু রক্ষাযোগ্য জিনিস সমস্ত উদ্ধার করে য়ুনিভার্সিটির মুজিয়মে সংগ্রহ করতে লাগল।···

"সোভিয়েটরা ব্যক্তিগতভাবে ধনীকে বঞ্চিত করেছে, কিন্তু যে-ঐশ্বর্যে সমস্ত মানুষের চিরদিনের অধিকার, বর্বরের মতো তাকে নষ্ট হতে দেয় নি। এতদিন যারা পরের ভোগের জন্যে জমি চাষ করে এসেছে এরা তাদের যে কেবল জমির স্বত্ব দিয়েছে তা নয় ; জ্ঞানের জন্যে আনন্দের জন্যে মানবজীবনের যা-কিছু মূল্যবান সমস্ত তাদের দিতে চেয়েছে। শুধু পেটের ভাত পশুর পক্ষে যথেষ্ট, মানুষের পক্ষে নয়—এ-কথা তারা বুঝেছিল এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বের পক্ষে পালোয়ানির চেয়ে আর্টের অনুশীলন অনেক বড়ো এ-কথা তারা স্বীকার করেছে।

"এদের বিপ্লবের সময় উপরতলার অনেক জিনিস তলিয়ে নীচে গেছে এ-কথা সত্য, কিন্তু টিঁকে রয়েছে এবং ভরে উঠেছে ম্যুজিয়ম থিয়েটর লাইব্রেরি সংগীতশালা।"

[ঐ : পৃঃ. ৩১৩]

তাছাড়া লোকসাহিত্য ও লোক-সংগীত ও শিল্প-সংরক্ষণের ব্যাপারে তাহারা যে অত্যন্ত যত্নশীল এটিও কবি লক্ষ্য করিয়াছেন।

সোভিয়েটে যে নবজাগরণ আসিয়াছে তাহার ফলে জনগণের মধ্যে ব্যাপক শিল্প ও ললিতকলা চর্চা শুরু হইয়াছে তাহাও তাঁহার দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে। তিনি আর একটি পত্রে লিখিলেন :

…"হঠাৎ মনে হতে পারে, এরা বুঝি কেবলই কাজের দিকে ঝোঁক দিয়েছে, গোঁয়ারের মত ললিতকলাকে অবজ্ঞা করে। একেবারেই তা নয়। সম্রাটের আমলের তৈরি বড়ো বড়ো রঙ্গশালায় উচ্চ অঙ্গের নাটক ও অপেরার অভিনয়ে বিলম্ব টিকিট পাওয়াই শক্ত হয়। নাট্যাভিনয়কলায় এদের মতো ওস্তাদ জগতে অল্পই আছে, পূর্বতন কালে আমীর-ওমরাওরাই সে-সমস্ত ভোগ করে এসেছেন—তখনকার দিনে যাদের পায়ে না ছিল জুতো, গায়ে ছিল ময়লা ছেঁড়া কাপড়, আহার ছিল আধপেটা, দেবতা মানুষ সবাইকেই যারা অহোরাত্র ভয় করে বেড়িয়েছে, পরিত্রাণের জন্যে পুরুত-পাণ্ডাকে দিয়েছে ঘুষ, আর মনিবের কাছে ধুলোয় মাথা লুটিয়ে আত্মাবমাননা করেছে তাদের ভিড়ে থিয়েটারে জায়গা পাওয়া যায় না।

"আমি যেদিন অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম সেদিন হচ্ছিল টলস্টয়ের রিসারেক্শান। জিনিসটা জনসাধারণের পক্ষে সহজে উপভোগ্য বলে মনে করা যায় না। কিন্তু শ্রোতারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে শুনছিল। অ্যাংলো-স্যাক্সন চাষী-মজুর শ্রেণীর লোকে এ-জিনিস রাত্রি একটা পর্যন্ত এমন স্তব্ধ শান্ত ভাবে উপভোগ করছে এ-কথা মনে করা যায় না, আমাদের দেশের কথা ছেড়েই দাও।"

[ঐ : পৃঃ. ৩০২-০৩]

তাছাড়া তাঁহার চিত্রপ্রদর্শনীর সময় কিরকম ভিড় হয়—প্রতিদিনই ট্রেটিয়াকভ গ্যালারীতে কি পরিমাণ দর্শকের ভিড় বাড়িয়া চলিয়াছে, কবি এসবের কথাও বিস্তারিত বর্ণনা করেন।

ছয় সোভিয়েট রাশিয়ায় ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের অবসান

পুরোহিততন্ত্র এবং ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনই অক্লান্ত সংগ্রাম করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের জনজীবনে তাহার মূল এতো গভীরে যে, কবি সময় সময় ভয়ানক হতাশ হইয়া পড়িতেন। সোভিয়েট সরকার রাশিয়ার জনগণের ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে যে অসাধারণ সাফল্য-লাভ করিয়াছে তাহাও কবিকে অত্যন্ত মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে। একটি পত্রে তিনি লিখিলেন :

"নিজের দেশের চাষীদের মজুরদের কথা মনে পড়ল। মনে হল আরব্য উপন্যাসের জাদুকরের কীর্তি। বছর দশেক আগেই এরা ঠিক আমাদেরই দেশের জনমজুরদের মতোই নিরক্ষর নিঃসহায় নিরন্ন ছিল, তাদেরই মতো অন্ধসংস্কার এবং

মূঢ় ধার্মিকতা। দুঃখে বিপদে এরা দেবতার দ্বারে মাথা খুঁড়েছে; পরলোকের ভয়ে পাণ্ডাপুরুতদের হাতে এদের বুদ্ধি ছিল বাঁধা, আর ইহলোকের ভয়ে রাজপুরুষ মহাজন ও জমিদারদের হাতে; যারা এদের জুতোপেটা করত তাদের সেই জুতো সাফ করা এদের কাজ ছিল। হাজার বছর থেকে এদের প্রথাপদ্ধতির বদল হয় নি; যানবাহন চরকাঘানি সমস্ত প্রপিতামহের আমলের, হালের হাতিয়ারে হাত লাগাতে বললে বেঁকে বসত। আমাদের দেশের ত্রিশ কোটির পিঠের উপরে যেমন চেপে বসেছে ভূতকালের ভূত, চেপে ধরেছে তাদের দুই চোখ—এদেরও ঠিক তেমনিই ছিল। কটা বছরের মধ্যে এই মূঢ়তার অক্ষমতার অভ্রভেদী পাহাড় নড়িয়ে দিলে যে কী করে, সে-কথা এই হতভাগ্য ভারতবাসীকে যেমন একান্ত বিস্মিত করেছে এমন আর কাকে করবে বলো।"...

[ঐ: পৃঃ. ২৮৮]

সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতা ও বলশেভিক পার্টি সম্পর্কে বাইরে সাম্রাজ্যবাদীরা নানা অপপ্রচার ও কুৎসা রটনা করে;—তাহারা নাস্তিক বলিয়া সকল ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছে, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের উপর পীড়ন ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছে—ইত্যাদি ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদীদের এই অপপ্রচারে যোগ না-দিয়া উল্টা সোভিয়েটের প্রশংসা করিয়াছেন। বস্তুতপক্ষে তিনি সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অভিযানকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। সেই কথাই আর একটি পত্রে লিখিলেন:

"যে পুরাতন ধর্মতন্ত্র এবং পুরাতন রাষ্ট্রতন্ত্র বহু শতাব্দী ধরে এদের বুদ্ধিকে অভিভূত এবং প্রাণশক্তিকে নিঃশেষপ্রায় করে দিয়েছে, এই সোভিয়েট-বিপ্লবীরা তাদের দুটোকেই দিয়েছে নির্মূল করে; এত বড়ো বন্ধনজর্জর জাতিকে এত অল্পকালে এত বড়ো মুক্তি দিয়েছে দেখে মন আনন্দিত হয়। কেননা, যে-ধর্ম মূঢ়তাকে বাহন করে মানুষের চিত্তের স্বাধীনতা নষ্ট করে, কোনো রাজাও তার চেয়ে আমাদের বড়ো শত্রু হতে পারে না—সে রাজা বাইরে থেকে প্রজাদের স্বাধীনতাকে যতই নিগড়বদ্ধ করুক না। এ-পর্যন্ত দেখা গেছে, যে-রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে সে-রাজার সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে রাখে। সে-ধর্ম বিষকন্যার মতো; আলিঙ্গন ক'রে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ ক'রে সে মারে। শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেননা তার মার আরামের মার।

"সোভিয়েটরা রুশসম্রাট-কৃত অপমান এবং আত্মকৃত অপমানের হাত থেকে এই দেশকে বাঁচিয়েছে—অন্য দেশের ধার্মিকেরা ওদের যত নিন্দাই করুক আমি নিন্দা করতে পারব না। ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো। রাশিয়ার বুকের 'পরে ধর্ম ও অত্যাচারী রাজার পাথর চাপা ছিল; দেশের উপর থেকে সেই পাথর নড়ে যাওয়ায় কী প্রকাণ্ড নিষ্কৃতি হয়েছে, এখানে এলে সেটা স্বচক্ষে দেখতে পেতে।"

[ঐ: পৃঃ. ৩০৮]

যে-অর্থে লেনিন বলিয়াছিলেন, 'ধর্ম হইতেছে জনগণের আফিম'—তাহার মূল বক্তব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের একদিক দিয়া খুবই সাদৃশ্য বা মিল আছে। বলা বাহুল্য, লেনিন ও সোভিয়েট কমিউনিস্টদের মত কবি যে কোনো ঐশ্বরিক বা ভগবৎশক্তিতে বিশ্বাস করিতেন না তাহা নহে; পরন্তু তিনি ছিলেন অধ্যাত্মবাদী ও

এক মহান ভাববাদী কবি। কিন্তু ধর্ম যে-অর্থে আচার-সর্বস্ব কুসংস্কার মাত্র,—ধর্ম যে-অর্থে যুগে যুগে রাজতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র ও সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর জঘন্য শোষণের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে জনগণকে বলি দিয়াছে, মানুষের মনকে বন্ধনজর্জর করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করিয়াছেন। কবি ইউরোপের 'রেনেসাঁস-রিফর্মেশন-রেভল্যুশন'-এর চিত্তমুক্তির মর্মবাণীটিকে চিরদিনই স্বাগত জানাইয়াছেন।

সাত: সোভিয়েট রাশিয়ার সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান

ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা-সংঘর্ষ দীর্ঘকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার জন্য কবি যে কী মর্মান্তিক দুঃখ ও বেদনা অনুভব করিতেন এবং এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে তিনি যে সারা জীবনই লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্বখণ্ডেই বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। অল্পকাল পূর্বেই ঢাকার দাঙ্গা-সংঘর্ষের সংবাদে তিনি যে কী পরিমাণ ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়া ইংরেজ সরকারের নিষ্ক্রিয়তার তীব্র নিন্দাবাদ ও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহার কথাও বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় আসিয়া তিনি যখন দেখিলেন, তাহারা পরজাতি-বিদ্বেষ, ধর্ম-বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-সংঘর্ষকে সমূলে উৎপাটিত করিয়াছে তখন তাঁহার আর বিস্ময়ের ও আনন্দের সীমা রহিল না। এই সম্পর্কে একটি পত্রে তিনি লিখিতেছেন:

…"আমাদের ওখানে সাম্প্রদায়িক লড়াই ঘটে বলে একটা অখ্যাতি বিশেষ ঝোঁক দিয়ে রটনা হয়ে থাকে—এখানেও য়িহুদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে খৃস্টান সম্প্রদায়ের লড়াই আমাদের দেশেরই আধুনিক উপসর্গের মতো অতিকুৎসিত অতিবর্বর ভাবেই ঘটত—শিক্ষায় এবং শাসনে একেবারে তার মূল উৎপাটিত হয়েছে।

কিন্তু ঢাকার দাঙ্গার কথা কবি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না, তাই পরক্ষণেই লিখিলেন:

…"দেশের দশা আমার মনের মধ্যে কী রকম তোলপাড় করছে। জালিয়ান-ওয়ালাবাগের উপদ্রবের পর একবার আমার মনে এইরকম অশান্তি জেগেছিল। এবার ঢাকার উপদ্রবের পর আবার সেইরকম দুঃখ পাচ্ছি। সে-ঘটনার উপর সরকারী চুনকামের কাজ হয়েছে, কিন্তু এ রকম সরকারী চুনকামের যে কী মূল্য তা রাষ্ট্র-নীতিবিৎ সবাই জানে। এই রকম ঘটনা যদি সোভিয়েট রাশিয়ায় ঘটত তা হলে কোনো চুনকামেই তার কলঙ্ক ঢাকা পরত না।"… [ঐ: পৃঃ. ২৮৮-৮৯]

যাহাই হোক, সাম্প্রদায়িক বিরোধ-বিদ্বেষ সমাধানে সোভিয়েট রাশিয়ার সাফল্য রবীন্দ্রনাথকে এক নূতন পথের ইঙ্গিত দেয়।

আট: সোভিয়েট রাশিয়ার স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা

বহুকাল হইতেই কবি দেশের রোগজীর্ণ গ্রামবাসীদের কথা ভাবিয়া আসিয়াছেন। শ্রীনিকেতন পল্লী পুনর্গঠন কেন্দ্রের অন্যতম প্রধান কর্মসূচীই ছিল, ম্যালেরিয়া কলেরা বসন্ত প্রভৃতি রোগ-মহামারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা এবং

গ্রামবাসীদের সে-সম্পর্কে সচেতন ও সচেষ্ট করা। রাশিয়া কিভাবে জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগ-মহামারী প্রতিরোধক অভিযানে সাফল্যলাভ করিয়াছে তাহা জানিবার জন্য কবির প্রবল আগ্রহ ও ঔৎসুক্য ছিল। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত ও আকৃষ্ট হন। সেখানে শুধু রোগ-নিরাময়ের ও রোগ-প্রতিরোধক ব্যবস্থা পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করা হয় নাই—শ্রমক্লান্ত ও রুগ্ন শ্রমিক-কৃষকদের বিশ্রাম এবং স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য রাশিয়ার সর্বত্র বড়ো বড়ো উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যনিবাসের ব্যবস্থা করা হয়। এইসব দেখিয়া শুনিয়া কবি বার বার দেশের যক্ষ্মা-ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগজীর্ণ গ্রামবাসীদের অবস্থার তুলনা না-করিয়া পারেন নাই। একটি পত্রে লিখিলেন :

…"শ্রমক্লান্ত ও রুগ্ন শ্রমিকদের শ্রান্তি ও রোগ দূর করবার জন্যে প্রথম থেকেই সোভিয়েটরা দূরে নিকটে নানা স্থানে স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের চেষ্টা করেছে। আগেকার কালের বড়ো বড়ো প্রাসাদ তারা এই কাজে লাগিয়েছে। সে-সব জায়গায় গিয়ে বিশ্রাম এবং আরোগ্যলাভ যেমন একটা লক্ষ্য তেমনি শিক্ষালাভ আর-একটা।…

"এ সম্বন্ধে য়ুরোপের অন্যত্র বা আমেরিকার সঙ্গে তুলনা করা সংগত হবে না; সর্বদাই মনে রাখা দরকার হবে যে, রাশিয়ায় দশ বছর আগে শ্রমিকদের অবস্থা আমাদের মতোই ছিল—তারা শিক্ষা করবে, বিশ্রাম করবে বা আরোগ্য লাভ করবে, সেজন্যে কারো কোনো খেয়াল ছিল না—আজ এরা যে-সমস্ত সুবিধা সহজেই পাচ্ছে তা আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের আশাতীত এবং ধনীদের পক্ষেও সহজ নয়। তা ছাড়া শিক্ষালাভের ধারা সমস্ত দেশ বেয়ে একসঙ্গে কত প্রণালীতে প্রবাহিত তা আমাদের সিবিলসার্বিসে-পাওয়া দেশের লোকের পক্ষে ধারণা করাই কঠিন।

"যেমন শিক্ষার ব্যবস্থা তেমনি স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা। স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সোভিয়েট রাশিয়ায় যে রকম বৈজ্ঞানিক অনুশীলন চলছে তা দেখে য়ুরোপে আমেরিকার পণ্ডিতেরা প্রচুর প্রশংসা করেছেন। শুধু মোটা বেতনের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পুঁথি সৃষ্টি করা নয়, সর্বজনের মধ্যে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের প্রয়োগ যাতে পরিব্যাপ্ত হয়, এমন কি এ দেশের চৌরঙ্গী থেকে যারা বহুদূরে থাকে তারাও যাতে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে অযত্নে বা বিনা চিকিৎসায় মারা না যায় সেদিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি আছে।

"বাংলাদেশে ঘরে ঘরে যক্ষ্মারোগ ছড়িয়ে পড়ছে—রাশিয়া দেখে অবধি এ প্রশ্ন মন থেকে তাড়াতে পারছি নে যে, বাংলা দেশের এই সব অল্পবিত্ত মুমূর্ষুদের জন্যে কটা আরোগ্যাশ্রম আছে। এ প্রশ্ন আমার মনে সম্প্রতি আরও জেগেছে এইজন্যে যে, খৃস্টান ধর্মযাজক ভারতশাসনে অসাধারণ ডিফিকালটিজ্ নিয়ে আমেরিকার লোকের কাছে বিলাপ করছেন।"

কবি ইহার জবাবে লিখিলেন :

"ডিফিকালটিজ্ আছে বই কি। একদিকে সেই ডিফিকালটিজের মূলে আছে ভারতীয়দের অশিক্ষা, অপরদিকে ভারতশাসনের ভূরিব্যয়িতা। সেজন্যে দোষ দেব কাকে। রাশিয়ার অন্নবস্ত্রের সচ্ছলতা আজও হয় নি, রাশিয়াও বহুবিস্তৃত দেশ, সেখানেও বহু বিচিত্র জাতির বাস, সেখানেও অজ্ঞান এবং স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অনাচার

ছিল পর্বতপ্রমাণ ; কিন্তু শিক্ষাও বাধা পাচ্ছে না, স্বাস্থ্যও না। সেইজন্যেই প্রশ্ন না করে থাকা যায় না, ডিফিকাল্‌টিজটা ঠিক কোনখানে।

"যারা খেটে খায় তারা সোভিয়েট স্বাস্থ্যনিবাসে বিনাব্যয়ে থাকতে পারে, তা ছাড়া এই স্বাস্থ্যনিবাসের সঙ্গে সঙ্গে থাকে আরোগ্যালয় (Sanatorium)। সেখানে শুধু চিকিৎসা নয়, পথ্য ও শুশ্রূষার উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। এইসমস্ত ব্যবস্থাই সর্বসাধারণের জন্যে। সেই সর্বসাধারণের মধ্যে এমন সব জাত আছে যারা য়ুরোপীয় নয় এবং য়ুরোপীয় আদর্শ অনুসারে যাদের অসভ্য বলা হয়ে থাকে।"

[ঐ : পৃঃ. ৩১৭-১৮]

তাছাড়া উজবেকিস্তান তুর্কমেনিস্তান প্রভৃতি রাশিয়ার অনুন্নত জাতিগোষ্ঠীর এলাকাগুলিতে কতগুলি হাসপাতাল খোলা হইয়াছে এবং সেখানকার স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে সোভিয়েট সরকারের কী রকম প্রখর দৃষ্টি—এ-সবই কবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে।

নয় : সোভিয়েট রাশিয়ার সুমহান নৈতিক ও মানসিক সম্পদ

পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে কবির প্রধান অভিযোগ ছিল এই যে, বিজ্ঞানের সাহায্যে বৈষয়িক ও বস্তুগত সম্পদে তাহারা যতই উন্নতিলাভ করুক না কেন নৈতিক ও আত্মিক (moral and spiritual) দিকে তাহাদের চূড়ান্ত অবনতি ঘটিয়াছে। কোন কোন সময় ইউরোপ-আমেরিকার অত্যুগ্র লোভ-রিপুর বাসনা, অতিমাত্র বস্তুতন্ত্রপরতাকেই তাহাদের পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতার মূল কারণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং এই কারণেই তিনি তাহাদের অধ্যাত্মচেতনা ও সাধনার উপর গুরুত্ব দিবার আবেদন জানাইয়াছিলেন।

এখানে কিন্তু সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, সোভিয়েটের ঈশ্বর ও ধর্ম-বিশ্বাসহীন জড়বাদী সংস্কৃতির জন্য কবি তাহাদের নিন্দা বা বিরূপ সমালোচনা করেন নাই, অথবা সেখানে গিয়া মার্কসবাদের নিন্দা কিংবা অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন নাই। কিংবা সোভিয়েটের অতিরিক্ত কর্মোন্মাদনার সমালোচনা করিয়া অবসরতত্ত্বের মহিমা (Philosophy of Leisure) প্রচারও করেন নাই। কবি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পড়েন নাই, তবে এইটুকু বুঝিতে তাঁহার অসুবিধা হয় নাই যে, এই ঘোর জড়বাদী রাশিয়াও এক মহান আদর্শবাদে বিশ্বাস করে ; ইহারাও মানুষের এক ধরনের 'অধ্যাত্মসত্তাতে' (Spiritual entity) বিশ্বাস করে, তাহার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তাহারা যাহাই করুক না কেন। আর সোভিয়েট রাশিয়ার এই সুমহান মানবিকতার আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। তাই কবি আমেরিকার পথে জাহাজে বসিয়া লিখিলেন :

…"কিন্তু রাশিয়ার স্মৃতি আজও আমার সমস্ত মন অধিকার করে আছে। তার প্রধান কারণ অন্যান্য যে-সব দেশ ঘুরেছি তারা সমগ্রভাবে মনকে নাড়া দেয় না, তাদের নানা কর্মের উদ্যম আছে আপন আপন মহলে।…কিন্তু এখানে সমস্ত দেশটা এক অভিপ্রায় মনে নিয়ে সমস্ত কর্মবিভাগকে এক স্নায়ুজালে জড়িত করে এক বিরাট দেহ এক বৃহৎ ব্যক্তিস্বরূপ ধারণ করেছে। সব-কিছু মিলে গেছে একটি অখণ্ড

সাধনার মধ্যে।…কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ায় যে কাণ্ড চলছে তার প্রকৃতিই এই —সাধারণের কাজ, সাধারণের চিত্ত, সাধারণের স্বত্ব ব'লে একটা অসাধারণ সত্তা এরা সৃষ্টি করতে লেগে গেছে।

"উপনিষদের একটা কথা আমি এখানে এসে খুব স্পষ্ট করে বুঝেছি—'মা গৃধঃ', লোভ কোরো না। কেন লোভ করবে না। যে-হেতু সমস্ত কিছু এক সত্যের দ্বারা পরিব্যাপ্ত—ব্যক্তিগত লোভেতেই সেই একের উপলব্ধির মধ্যে বাধা আনে। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—সেই একের থেকে যা আসছে তাকেই ভোগ করো। এরা আর্থিক দিক থেকে সেই কথাটা বলছে। সমস্ত মানবসাধারণের মধ্যে এরা একটি অদ্বিতীয় মানবসত্যকেই বড়ো বলে মানে—সেই একের যোগে উৎপন্ন যা-কিছু, এরা বলে, 'তাকেই সকলে মিলে ভোগ করো—'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং'—কারও ধনে লোভ কোরো না! কিন্তু ধনের ব্যক্তিগত বিভাগ থাকলেই ধনের লোভ আপনিই হয়। সেইটিকে ঘুচিয়ে দিয়ে এরা বলতে চায়, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'।

ঐ পত্রেই তিনি আরও বলিলেন :

"য়ুরোপ অন্য সকল দেশেরই সাধনা ব্যক্তির লোভকে, ব্যক্তির ভোগকে নিয়ে। তারই মন্থন-আলোড়ন খুবই প্রচণ্ড, আর পৌরাণিক সমুদ্রমন্থনের মতোই তার থেকে বিষ ও সুধা দুইই উঠছে। কিন্তু সুধার ভাগ কেবল এক দলই পাচ্ছে অধিকাংশ পাচ্ছে না—এই নিয়ে অসুখ-অশান্তির সীমা নেই। সবাই মেনে নিয়েছিল এইটেই অনিবার্য—বলেছিল মানবপ্রকৃতির মধ্যেই লোভ আছে এবং লোভের কাজই হচ্ছে ভোগের মধ্যে অসমান ভাগ করে দেওয়া। অতএব প্রতিযোগিতা চলবে এবং লড়াইয়ের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকা চাই। কিন্তু সোভিয়েটরা যা বলতে চায় তার থেকে বুঝতে হবে মানুষের মধ্যে ঐক্যটাই সত্য, ভাগটাই মায়া, সম্যক চিন্তা সম্যক চেষ্টা দ্বারা সেটাকে যে-মুহূর্তে মানব না সেই মুহূর্তেই স্বপ্নের মতো সে লোপ পাবে।

"রাশিয়ায় সেই না-মানার চেষ্টা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকাণ্ড করে চলেছে। সব-কিছু এই এক চেষ্টার অন্তর্গত হয়ে গেছে। **এইজন্যে রাশিয়ায় এসে একটা বিরাট চিত্তের স্পর্শ পাওয়া গেল।…এরা 'বিশ্বকর্মা'; অতএব এদের বিশ্বমনা হওয়া চাই। অতএব এদের জন্যেই যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়।"** (বড় হরফ—আমার)

[ঐ : পৃঃ. ৩০৪-৫]

'রাশিয়ার চিঠি' ১৩৩৮ সালের বৈশাখ মাসে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। অবশ্য তৎপূর্বে উহা 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিকভাবে (অগ্রহায়ণ ১৩৩৭-বৈশাখ ১৩৩৮) প্রকাশিত হয়। ১৩৩৮ সালে 'পরিচয়' পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যাতেই ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'রাশিয়ার চিঠি'র সমালোচনায় কবির এই আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া মন্তব্য করেন :

…"কিন্তু কী আশ্চর্য সাহস এই ব্যক্তির। সত্তর বৎসর বয়সে কী শেখবার ক্ষমতা! কী বিনয়! কোথায় গেল তাঁর Philosophy of Leisure? কোথায় গেল তাঁর সেই Green-এর idealistic notions of property? কোথায় গেল তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ? কোথায় গেল তাঁর স্বর্গীয় তুলনা—সমাজটা প্রদীপের মতন

ওপরে আলো, নীচে অন্ধকার? কোথায় গেল তাঁর aristocratic isolation? তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে কি সব দিয়ে আসতে হয়? সত্য কথা তা নয় কিন্তু।...দেশের প্রতি এত টান, শিক্ষার জন্য এত ব্যাকুলতা, যারা জমি চাষ করে সেই জনসাধারণের প্রতি এত সমবেদনা, দেশের কল্যাণের জন্য এত ব্যগ্রতা তাঁর অন্য কোন লেখায় আছে কিনা স্মরণ হচ্ছে না।...

..."বিশ্ব ইতিহাসের ভৌগোলিক পর্দা উঠে গিয়েছে। 'দুঃখী আজ সমস্ত মানুষের রঙ্গভূমিতে নিজেকে বিরাট ক'রে দেখতে পাচ্ছে, এইটেই মস্ত কথা।' তাই রাশিয়া জগতের তীর্থভূমি। তাই কবির 'রাশিয়ার চিঠি' এক মস্ত কীর্তি।"...

এখন প্রশ্ন থাকিয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ কি রাশিয়ার শুধু প্রশংসাই করিয়াছেন?—'শুধু আলোর দিকটাই কি দেখিয়াছেন, অন্ধকার দিকটার কি কোন সমালোচনা করেন নাই'।—রাশিয়ার নিন্দনীয় কিছু দেখেন নাই কি?

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার সমালোচনাও করিয়াছেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের কুৎসা প্রচার ও নিন্দাবাদের থেকে সোভিয়েট সম্পর্কে তাঁহার সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের, আর সে-সমালোচনা যথার্থ বন্ধুর নিঃস্বার্থ সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত নির্ভীক এক মহান বিবেকী পুরুষ ছিলেন। তিনি যাহা অন্যায় ও অশুভ বলিয়া মনে করিতেন তৎক্ষণাৎ তাহার সমালোচনা ও প্রতিবাদ করিতেন।

সত্যকথা, রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার 'প্রলেটারিয়েট ডিক্টেরটরশিপ', অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ নীতি—এগুলি সমর্থন করেন নাই। তাছাড়া ব্যাষ্টি ও সমষ্টি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে বলশেভিকদের দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতির সহিত একমত হইতে পারেন নাই। এইজন্যই রাশিয়া হইতে বিদায় লইবার কালে 'ইজ্‌ভেস্তিয়া'র সাংবাদিক যখন তাঁহার রাশিয়া ভ্রমণের ধারণার কথা জানিতে চাহেন তখন কবি রাশিয়ার শিক্ষা-নীতি ও গঠনমূলক কার্যের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন বটে, তবে সেই সঙ্গে রাশিয়ার ডিক্টেটরশিপ ও অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ-নীতির সমালোচনা করিয়া এই সম্পর্কে তাঁহাদের পুনর্বিবেচনা করিবার অনুরোধ জানাইয়া এক দীর্ঘ বিবৃতি দেন (২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩০) উহার অংশবিশেষ এইরূপ :

"But I find here certain contradictions to the great mission which you have undertaken. Certain attitudes of mind are being cultivated which are contrary to your ideal.

"I must ask you : Are you doing your ideal a service by arousing in the minds of those under your training, anger, class hatred and revengefulness against those not sharing your ideal, against those whom you consider to be your enemies? True, you have to fight against obstacles, you have to overcome ignorance and lack of sympathy, even persistently virulent antagonism. But your mission is not restricted to your own nation or own party, it is for the better-

ment of humanity according to your light. But does not humanity include those who do not agree with your aim? Just as you try to help peasants who have other ideas than yours about religion, economics, and social life, not by getting fatally angry with them, but by patiently teaching them and showing them where the evil lurks in secret, should you not have the same mission to those other people who have other ideals than your own? These you may consider to be mistaken ideals, but they have an historical origin and have become inevitable through combination of circumstances. You may consider the men who hold them as misguided. But it should all the more be your mission to try to convert them by pity and love, realizing that they are as much a part of humanity as the peasants whom you serve.

"If you dwell too-much upon the evil elements in your opponents and assume that they are inherent in human nature meriting eternal damnation, you inspire an attitude of mind which with all its content of hatred and revengefulness may some day react against your own ideal and destroy it. You are working in a great cause. Therefore you must be great in your mind, great in your mercy, your understanding and your patience. I feel profound admiration for the greatness of the things you are trying to do, therefore I cannot help expecting for it a motive force of love and an environment of a charitable understanding···

"Before leaving your country let me once again assure you that I am struck with admiration by all that you are doing to free those who once were in slavery, to raise up those who were lowly and oppressed, endeavouring to bring help to those who are utterly helpless all through the world, reminding them that the source of their salvation lies in a proper education and their power to combine their human resources. Therefore, for the sake of humanity I hope that you may never create a vicious force of violence which will go on weaving an interminable chain of violence and cruelty. Already you have inherited much of this legacy from the Tsarist régime. It is the worst legacy you possibly could have. You have tried to destroy many of the other evils of that régime. Why not try to destroy this one also? I have learned much from you, how skilfully you evolve usefulness out of the helpfulness of the weak and ignorant. Your

ideal is great and so I ask you for perfection in serving it, and a broad field of freedom for laying its permanent foundation."

[*Visva-Bharati Quarterly* : 1930-31 : pp. 46-49]

এই দীর্ঘ বিবৃতি থেকে এই কথাটিই খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, সোভিয়েট সরকারের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগনীতি তিনি অনুমোদন না-করিলেও সোভিয়েট রাশিয়ার উপর তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা ও শ্রদ্ধা ভাব সমানভাবে বিদ্যমান ছিল। অন্তত সোভিয়েট কমিউনিস্টদের মহান আদর্শনিষ্ঠার সম্পর্কে তাঁহার মনে কোন সন্দেহ জাগে নাই এবং এই কারণেই অত্যন্ত বিনীতভাবে তাহার মহান আদর্শের 'অসঙ্গতি-পূর্ণ দিকগুলি' সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করিয়া সংশোধন করিয়া লইবার আবেদন জানান।

'উপসংহার' শীর্ষক রাশিয়ার চিঠির সর্বশেষ পত্রে এইসব কথাই তিনি আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। রাশিয়ার একনায়কত্ব বা ডিক্টেটরশিপ সম্পর্কে তাঁহার মত কি, কবি স্বয়ং এই প্রশ্নের জবাবে লিখিয়াছেন :

"ডিক্‌টেটরশিপ একটা মস্ত আপদ, সে-কথা মানি এবং সেই আপদের বহু অত্যাচার রাশিয়ায় আজ ঘটছে সে-কথাও আমি বিশ্বাস করি। এর নঙর্থ দিকটা জবরদস্তির দিক, সেটা পাপ। কিন্তু সদর্থক দিকটা দেখেছি, সেটা হল শিক্ষা, জবরদস্তির একেবারে উলটো।"

কিন্তু রাশিয়ার এই ডিক্টেটরশিপও যে সাময়িক অস্থায়ী ও অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা, এই কথাটি বুঝিতে কবির অসুবিধা হয় নাই। তাই তিনি লিখিলেন :

"রাশিয়াতেও সম্প্রতি নায়কের প্রবল শাসন দেখা গেল। কিন্তু এই শাসন নিজেকে চিরস্থায়ী করবার পন্থা নেয় নি—একদা সে-পন্থা নিয়েছিলেন জারের রাজত্ব, অশিক্ষা ও ধর্মমোহের দ্বারা জনসাধারণের মনকে অভিভূত ক'রে এবং কসাকের কশাঘাতে তাদের পৌরুষকে জীর্ণ করে দিয়ে। বর্তমান আমলে রাশিয়ায় শাসনদণ্ড নিশ্চল আছে বলে মনে করি নে, কিন্তু শিক্ষাপ্রচারের প্রবলতা অসাধারণ। তার কারণ এর মধ্যে ব্যক্তিগত বা দলগত ক্ষমতালিপ্সা বা অর্থলোভ নেই। একটা বিশেষ অর্থনৈতিক মতে সর্বসাধারণকে দীক্ষিত করে জাতি বর্ণ ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকলকেই মানুষ করে তোলবার একটা দুর্নিবার ইচ্ছা আছে।"...

[রবীন্দ্ররচনাবলী : ২০শ খণ্ড : পৃঃ. ৩৪১-৪২]

আপাতদৃষ্টিতে ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটরশিপ-এর সঙ্গে সোভিয়েট কমিউনিস্ট ডিক্টেটরশিপের কিছুটা সাদৃশ্য থাকিলেও কবি ইহাদের মূল আদর্শগত লক্ষ্যে বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি আর একটি পত্রে লিখিতেছেন :

"যাই হোক, মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিকমতো ধরতে পেরেছে তা আমার বোধ হয় না। সে হিসাবে এরা ফ্যাসিস্ট্‌দেরই মতো। এই কারণে সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টির প্রতি পীড়নে এরা কোনো বাধাই মানতে চায় না। ভুলে যায়, ব্যষ্টিকে দুর্বল করে সমষ্টিকে সবল করা যায় না, ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয় তবে সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না।...

"তা ছাড়া, অবাধ ক্ষমতার লোভ মানুষের বুদ্ধিবিকার ঘটায়। একটা সুবিধার

কথা এই যে, যদিও সোভিয়েট মূলনীতি সম্বন্ধে এরা মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অতি নির্দয়ভাবে পীড়ন করতে কুণ্ঠিত হয় নি, তথাপি সাধারণভাবে শিক্ষার দ্বারা, চর্চার দ্বারা, ব্যক্তির আত্মনিহিত শক্তিকে বাড়িয়েই চলেছে—ফ্যাসিস্টদের মতো নিয়তই তাকে পেষণ করে নি। শিক্ষাকে আপন বিশেষ মতের একান্ত অনুবর্তী করে কতকটা গায়ের জোরে কতকটা মোহমন্ত্রের জোরে এক ঝোঁকা করে তুলেছে, তবুও সাধারণের বুদ্ধির চর্চা বন্ধ করে নি। যদিও সোভিয়েট নীতি প্রচার সম্বন্ধে এরা যুক্তির জোরের উপরেও বাহুবলকে খাড়া করে রেখেছে, তবুও যুক্তিকে একেবারে ছাড়ে নি এবং ধর্মমূঢ়তা এবং সমাজ প্রথার অন্ধতা থেকে সাধারণের মনকে মুক্ত রাখবার জন্যে প্রবল চেষ্টা করছে।"

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিতেন, প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানের মধ্যেই মানুষের মনের ও চিত্তের মুক্তি ও স্বাধীনতা। এইদিক থেকে সোভিয়েট রাশিয়া তাহার জনগণের মুক্ত ও স্বাধীন মনের স্থায়ী ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছে। তাই তিনি ঐ পত্রেই আরও লিখিলেন :

"মনকে একদিকে স্বাধীন করে অন্যদিকে জুলুমের বশ করা সহজ নয়। ভয়ের প্রভাব কিছুদিন কাজ করবে, কিন্তু সেই ভীরুতাকে ধিক্‌কার দিয়ে শিক্ষিত মন একদিন আপন চিন্তাস্বাতন্ত্র্যের অধিকার জোরের সঙ্গে দাবি করবেই। মানুষকে এরা দেহের দিকে নিপীড়িত করেছে, মনের দিকে নয়। যারা যথার্থই দৌরাত্ম্য করতে চায় তারা মানুষের মনকে মারে আগে—এরা মনের জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তুলছে। এইখানেই পরিত্রাণের রাস্তা রয়ে গেল।" [ঐ : পৃঃ. ৩২৭-২৮]

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ কখনো কোনদিনও তত্ত্বগত বা বিশেষ কোনো ভাবাদর্শগত (Ideological & theoretical) দিক হইতে কোনো জিনিসের বিচার করিতে চাহিতেন না। এই ব্যাপারে তিনি গান্ধীজীর মত সহজ অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান ও আন্তরিক বিশ্বাস হইতে সব কিছুর বিচার বা মূল্যায়ন করিতে চাহিতেন। অবশ্য এই ব্যাপারে গান্ধীজীর সঙ্গে পার্থক্যও ছিল বেশ কিছুটা। আদর্শগত ব্যাপারে গান্ধীজীর কতকগুলি আন্তরিক বিশ্বাসের ভিত্তিমূল এত দৃঢ় ছিল যে তাহার বিরুদ্ধ কিছুকে তিনি কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিতেন না। এবং এই কারণেই সোভিয়েট রাশিয়ায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে তাঁহার মনে কোনো কৌতূহল ও ঔৎসুক্য ছিল না। গান্ধী-মানসের এই বৈশিষ্ট্যটি জওহরলাল তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া লিখিয়াছেন :

..."তিনি অর্থনৈতিক, সমাজতান্ত্রিক, এমন কি, মার্কসীয় অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন এবং উহা লইয়া অপরের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু আমি অধিকতর স্পষ্টরূপে বুঝিতেছি যে, কোন প্রধান ব্যাপারে মনের সম্মতির বিশেষ কোন মূল্য নাই।...

"দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম দিকে গান্ধীজী এক মহান দীক্ষা গ্রহণ করেন, এই পরিবর্তনে তাঁহার সমগ্র জীবনই রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। ইহার পর হইতেই তাঁহার সমস্ত ভাবের পশ্চাতে এই দৃঢ় স্থিরভূমি রহিয়াছে, যে কারণে তাঁহার মন নূতন কিছু গ্রহণ করিতে পারে না। কেহ তাঁহার নিকট কোন নূতন প্রস্তাব করিলে

তিনি অতিশয় ধৈর্য ও মনোযোগের সহিত তাহা শ্রবণ করেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত সৌজন্যের মধ্যেও লোকে সহজেই বুঝিতে পারে যে, সে বন্ধ দরজায় করাঘাত করিতেছে। তাঁহার ধারণাগুলি এতই বদ্ধমূল যে, অন্যান্য বিষয় তাঁহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়; অন্যান্য গৌণ ব্যাপারের উপর জোর দিলে, বৃহত্তর পরিকল্পনা বিকৃত ও মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। মূল বিষয়টি ঠিক থাকিলেই অন্যান্য বিষয়ের যথাযথ সামঞ্জস্য বিধান হইবে। যদি উপায় অভ্রান্ত হয়, ফলও অভ্রান্ত হইবেই।

"আমার ধারণা ইহাই তাঁহার মনের প্রধান পটভূমিকা। হিংসার সহিত সম্পর্ক আছে বলিয়া তিনি সমাজতন্ত্রবাদকে—বিশেষভাবে মার্কসীয় মতবাদকে—সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন।"··· [আত্মচরিত: পৃ: ৫৫১-৫২]

সদাচার, সুনীতি ও আদর্শগত প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথেরও কতকগুলি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ইহাও সত্য কথা; কিন্তু কবি কখনও তাঁহার যুক্তিবোধ হারাইয়া ফেলিতেন না। রবীন্দ্রনাথ কখনও তাঁহার নিজস্ব ধারণা, বিশ্বাস ও মতকে চূড়ান্ত বলিয়া মনে করিতেন না;—অন্তত জগতের অন্যান্য দেশ ও মনীষীদের নিকট হইতে তাঁহারও কিছু শিখিবার আছে—জানিবার আছে, এই বিশ্বাস তাঁহার প্রবল ছিল। এই কারণে সংস্কারমুক্ত খোলামনে সারাজীবনই তিনি পৃথিবীর দেশে দেশে ঘুরিয়াছেন, যদি কিছু মহৎ যদি কিছু শিক্ষনীয়, যদি কিছু গ্রহণীয় সংগ্রহ করা যায়। এই কারণেই সত্তর বৎসরের মুখে পা দিয়াও রুগ্ন শরীরে তিনি রাশিয়ায় ছুটিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মন যে কতখানি সংস্কারমুক্ত উদার ও প্রগতিশীল ছিল 'রাশিয়ার চিঠি'র প্রতিটি ছত্রে ছত্রেই তাহার প্রমাণ। আর এই কারণেই রাশিয়ার মার্কসীয় অর্থনীতির প্রয়োগ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে নস্যাৎ করিয়া উড়াইয়া দেন নাই। অবশ্য তত্ত্বগত অনুশীলন না করিলেও অত্যন্ত খোলামনে তিনি উহার মূল বক্তব্যটি অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রাশিয়ায় মার্কসীয় অর্থনীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে তিনি লিখিলেন:

"অর্থনৈতিক মতটা সম্পূর্ণ গ্রাহ্য কিনা সে-কথা বলবার সময় আজও আসে নি; কেননা এ-মত এতদিন প্রধানত পুঁথির মধ্যেই টলে টলে বেড়াচ্ছিল, এমন বৃহৎ ক্ষেত্রে এতবড়ো সাহসের সঙ্গে ছাড়া পায় নি। যে প্রবল লোভের কাছে এই মত প্রথম থেকেই সাংঘাতিক বাধা পেত সেই লোভকেই এরা সাংঘাতিকভাবে সরিয়ে দিয়েছে। পরীক্ষার ভিতর দিয়ে পরিবর্তন ঘটতে ঘটতে এ মতের কতটুকু কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা আজ নিশ্চিত কেউ বলতে পারে না। কিন্তু এ-কথাটা নিশ্চিত বলা যেতে পারে যে, রাশিয়ার জনসাধারণ এতকাল পরে যে শিক্ষা নিবারিত ও প্রচুরভাবে পাচ্ছে তাতে করে তাদের মনুষ্যত্ব স্থায়ীভাবে উৎকর্ষ এবং সম্মানলাভ করল।"

তিনি আরও লিখিলেন:

···"বলশেভিক অর্থনীতি সম্বন্ধে আমার মত কী, এ-কথা অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে থাকেন। আমার ভয় এই যে, চিরদিন শাস্ত্রশাসিত পাণ্ডাচালিত দেশ, বিদেশের আমদানি বচনকে একেবারেই বেদবাক্য বলেই মেনে নেবার দিকেই আমাদের মুগ্ধ মনের ঝোঁক। গুরুমন্ত্রের মোহ থেকে সামলিয়ে নিয়ে আমাদের বলার দরকার

যে, প্রয়োগের দ্বারাই মতের বিচার হতে পারে, এখনও পরীক্ষা শেষ হয় নি। যে-কোনো মতবাদ মানুষ-সম্বন্ধীয় তার প্রধান অঙ্গ হচ্ছে মানবপ্রকৃতি। এই মানবপ্রকৃতির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য কী পরিমাণে ঘটবে তার সিদ্ধান্ত হতে সময় লাগে। তত্ত্বটাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করবার পূর্বে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু তবু সে-সম্বন্ধে আলোচনা করা চলে, কেবলমাত্র লজিক নিয়ে বা অঙ্ক কষে নয়—মানবপ্রকৃতিকে সামনে রেখে।"

[রবীন্দ্ররচনাবলী : ২০শ খণ্ড : পৃঃ ৩৪২-৪৫]

সর্বশেষে একটি কথা—একমাত্র জওহরলাল ছাড়া কংগ্রেসের আর কোন নেতাই তখনও পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়ার গঠনমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিছুই লিখেন নাই।

আমেরিকায় শেষবার

৩রা অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ ডাঃ হ্যারি টিম্বার্স ও আরিয়াম সহ ব্রেমেন জাহাজে আমেরিকার পথে যাত্রা করেন। রাশিয়ার কথা কবির সারা মন জুড়িয়া আছে,—সমুদ্রপথে এই ব্রেমেন জাহাজেই 'রাশিয়ার চিঠি'র সাতখানি পত্র লেখেন।

৯ই অক্টোবর সকালে জাহাজ নিউইয়র্ক পৌঁছে। 'কোয়ারেণ্টাইন' কানুনের জন্য বহুক্ষণ জাহাজঘাটায় কেবিনের মধ্যেই তাঁহাকে আটক থাকিতে হয়। গতবার কবির আমেরিকা ভ্রমণের সময় ভ্যাঙ্কুভারে তাঁহার পাসপোর্ট সংক্রান্ত ব্যাপারে মার্কিন ইমিগ্রেসন অফিসারের অসদ্ব্যবহারে আমেরিকা সম্পর্কে কবির যে বিরূপ ধারণা হয় তাহা অপনোদনের জন্যে একদল মার্কিন বুদ্ধিজীবী কবিকে আমেরিকা ভ্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। এবার রবীন্দ্রনাথের বিশেষ সম্বর্ধনার জন্য সেখানে 'টেগোর রিসেপসন্ কমিটি' নামে একটি সমিতি হইয়াছিল। হেনরি মর্গেনথ (Henri Morgenthau) এই কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। অবশ্য তিনি অসুস্থ হওয়ার জন্য তাঁহার স্থলে W. G. Harding কবিকে জাহাজঘাটে অভ্যর্থনা জানাইতে আসিয়াছিলেন। তাছাড়া আমেরিকার 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি'র ডাইরেক্টর Hari. G. Govil, আমেরিকার ফ্রেণ্ডস্ সার্ভিসের পক্ষে Clarence Pickette ও Jasiah Marbel প্রভৃতি কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিও অভ্যর্থনা জানাইতে উপস্থিত হন। এ ছাড়া জাহাজে কবির কেবিনেই একটি বেশ বড় রকমের সাংবাদিক দল তাঁহার চারিপাশে ভিড় করিয়া জমিল। রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে অভিমত, পাশ্চাত্য সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁহার কি ধারণা—ইত্যাদি বহু তাঁহাদের প্রশ্ন। বিশেষ করিয়া রাশিয়া ভ্রমণের ফলে তাঁহার কি ধারণা হইল, ইহাই জানিবার জন্য মার্কিন সাংবাদিকদের অদম্য কৌতূহল। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া কবি এইসব প্রশ্নের একটির পর একটির জবাব দিতে লাগিলেন। রাশিয়ার প্রসঙ্গে তিনি কোন বিরূপ সমালোচনা না করিয়া

তাহাদের জনশিক্ষা বিস্তার ও উন্নয়নমূলক কার্যেরই প্রশংসা করিলেন। এ ক্ষেত্রেও তিনি রাশিয়ার সহিত ভারতের সমস্যার তুলনা করিয়া বলিলেন :

"Ten years ago there was scarcely any difference between the mass of the people in Russia and the lower classes in India. The rapidity with which the education of the masses has progressed in the last ten years in Russia is almost impressive. It is something that for us in India is very hard to understand.

"Education ? Why, only 5 percent of our population are literate ! It is our problem in India to educate the people. Every where education is the fundamental basis for the solution of all evils. Now that I have seen with my own eyes that the effort to solve this problem has been so successful in Russia I know that it will be more successful in India, where the people are so anxious to learn."

[*Newyork Herald Tribune* : 10th October, 1930]

তাঁহার চিন্তার এই সূত্র ধরিয়া সাংবাদিকরা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে কবির অভিমতের কথা বলতে গিয়ে এমন বিকৃতভাবে তাঁহার বক্তব্যটি পরিবেশন করেন, যাহার ফলে উহার অর্থ দাঁড়ায় যেন, কবির মতে ভারতবর্ষ এখনও স্বাধীনতা বা আত্মস্বাতন্ত্রের জন্য উপযুক্ত হইতে পারে নাই। *Newyork Herald Tribune*-এর ঐ বিবরণীতেই আরো লেখা হয় :

"Asked if he considered India ready for home rule, Tagore declared that no country that had been under the rule of a foreign country for centuries could be prepared for home rule without opportunity for more preparation than India had been given."

এ ছাড়া *Newyork Times* প্রভৃতি পত্রিকায় এ বিষয়ে কবির বক্তব্যটি আরও বিকৃতভাবে পরিবেশিত হয়।

ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যখন দেশের জনসাধারণ স্বাধীনতার দাবীতে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে ঠিক সেই মুহূর্তে ধুরন্ধর ইঙ্গ-মার্কিন সাংবাদিকগোষ্ঠী ফলাও করিয়া প্রচার করিয়া দেয় যে,—রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ এখনও স্বাধীনতালাভের যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে নাই। যাহাই হোক, অভ্যর্থনা ইত্যাদির পর জাহাজঘাট হইতে কবি সোজা নিউইয়র্কে এলমহার্স্টদের বাড়িতে (1, 172 Park Avenue) উঠিলেন। পরদিন সকালে *NewyorkTimes*-এ ঐ বিবৃতির বিকৃত ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া যান। সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রতিবাদ এবং ভারতের স্বাধীনতার দাবীর পূর্ণ সমর্থন জানাইয়া *Newyork Times*-এ তাঁহার নাম স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতি পাঠান। উহা ১৩ই অক্টোবর ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিবৃতিটি এই :

To the Editor of *The Newyork Times.*

I cannot allow to remain uncontradicted some misstatements of

my view about the present Indian problem in the report of the interview with me which has appeared in your paper of this morning's issue. Let it definitely be known that according to me it is the opportunity for self-government itself which gives training for self-government, and not foreign subjection, and that an appearance of peace superficially maintained from outside can never lead to real peace, which can only be attained through an inevitable period of suffering and struggle.

Rabindranath Tagore.

October, 10th, 1930. Newyork.

কবি ঐদিনই নিউইয়র্ক হইতে উইলিয়ামসটাউনে (Williamstown) যাত্রা করেন। আমেরিকায় পোঁছিয়াই এমন একটি ব্যাপারের জন্য কবির মন ক্ষুব্ধ ও বিরূপ হইয়া উঠিল। দেশে যখন স্বাধীনতা আন্দোলন চলিতেছে তখন ইঙ্গ-মার্কিন সাংবাদিকদের পরিবেশিত তাঁহার বিবৃতি ও মতামতগুলি বিকৃত হইতে হইতে দেশে কিভাবে প্রচারিত ও কি তাহার প্রতিক্রিয়া হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়েন। মার্কিন সাংবাদিকদের প্রতি তাঁহার মন এতখানি বিরূপ ও সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল যে, তিনি তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে পর্যন্ত অস্বীকার করেন। ক্লারেন্স পিকেট (Clarence Pickett) প্রভৃতি তাঁহার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা অনেক করিয়া বুঝাইয়া শেষ পর্যন্ত কবিকে শান্ত করিলেন। পিকেট লিখিয়াছেন :

"Tagore was rebellious and wholly unwilling to co-operate. I began to discover that, saintly as he was, he was also able to be very positive and vigorous in expressing his disapproval. I tried to explain to him that, since he was hoping to place his cause before the American public, it seemed unwise to completely antagonize both the press and the moving picture industry."

[*For More than Bread* (Newyork, 1953) P-92]

দিন তিনেক পর উইলিয়ামসটাউনে পুনরায় একদল সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে মার্কিন সাংবাদিকদের ভ্রান্তি অপনোদন করিতে গিয়া কবি অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভারতের স্বাধীনতা ও আত্মস্বাতন্ত্র্যের দাবী সমর্থন করিয়া বলেন :

"Therefore as long as we are held under subjection we cannot be said to be ready for home rule. We must first be freed from this subjection and from the artificial conditions to which it gives rise. We should first have the opportunity of governing ourselves if we are ever going to demonstrate our ability in that direction."

[*The Boston Herald* : 14th October, 1930]

ভারতের তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজীর নেতৃত্বের যোগ্যতার সম্পর্কে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইলে কবি বলেন যে, তিনি তাঁহার শিক্ষানীতির সম্পর্কে

বিশেষ কিছু জানেন না এবং ভবিষ্যতে তিনি যে কী কার্যসূচী গ্রহণ করিবেন তাহাও তিনি জানেন না তবে কবির এইটুকু স্থির বিশ্বাস যে, ভারতের নিঃসহায় কৃষক ও অস্পৃশ্যদের সাহায্য ও উন্নতির জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন এবং একমাত্র গান্ধীজীই ইহাদের সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারেন,—যাহা দেশের অপর কেহ তেমনটি পারিবেন না।

আধুনিক যন্ত্রযুগে কবি বিশ্বাস করেন কিনা, এই প্রশ্নের জবাবে তিনি এবার পরিষ্কার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যন্ত্রসভ্যতাকে সমর্থন করেন। তিনি বলেন যন্ত্রের অপরাধ নাই ;—আমাদের মন ও চিত্তের যে যান্ত্রিকতা আজ আসিয়াছে, উহা হইতেই আমাদের মুক্ত হইতে হইবে। অর্থাৎ যন্ত্রের সাহায্যেই আমাদের চিত্তের ও আত্মার মুক্তি দিতে হইবে। তিনি বলিলেন :

"...We should train our minds to humanize the mechanical age. We should avoid the creation of a mechanical attitude of mind. We have nothing to blame machinery for in itself. It is men who are greedy and make use of the truths of science in order to exploit each other for their own selfish purpose. Man thereby commits treason against truth. We should use machinery to free our souls, and not to enslave them."

বলা বাহুল্য, রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হইতে যন্ত্রের যথার্থ ভূমিকা সম্পর্কে তাঁহার আর কোনই সংশয় ছিল না। এই পরিবর্তনটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কবির রাশিয়া ভ্রমণের ধারণা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি এ ক্ষেত্রেও রাশিয়ার জনশিক্ষার অভূতপূর্ব সাফল্যের প্রশংসা করিয়া বলেন :

"I have been deeply impressed by mass education. It is true that they are trying to spread their own ideas of communism. That aspect of their work does not concern me. But I chiefly wanted to see the methods which they use. I cannot judge their communism as a philosophy of life because I don't know enough about it. My interest is scientific interest as to the way they are bringing about the education of the masses who were formerly downtrodden, insulted, and ignorant.

"They have overcome enormous difficulties which, before going to Russia, I felt could never be overcome. They no longer feel humiliated and oppressed, but are becoming intelligent and self-reliant."

[*The Boston Herald* : 14th October, 1930]

আমেরিকায় আসার পর হইতে একদল মার্কিন বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক রাশিয়া সম্পর্কে কবিকে জ্ঞান দিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে রাশিয়া সম্পর্কে তাঁহার ধারণার কোন পরিবর্তন হয় নাই, এটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। বস্তুত সোভিয়েট

রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক কর্মপ্রচেষ্টা তখনও তাঁহার চিত্ত তোলপাড় করিয়া চলিয়াছিল। পরদিন রথীন্দ্রনাথকে তিনি লিখিতেছেন, (১৪ই অক্টোবর) :

"এবার রাশিয়ার অভিজ্ঞতায় আমাকে গভীরভাবে অনেক কথা ভাবিয়েছে। প্রচুর উপকরণের মধ্যে আত্মসম্মানের যে বিঘ্ন আছে সেটা বেশ স্পষ্ট চোখে দেখতে পেয়েছি। সেখান থেকে ফিরে মেণ্ডেলদের ঐশ্বর্যের মধ্যে যখন পৌঁছলুম, একটুও ভালো লাগল না—ব্রেমেন জাহাজের আড়ম্বর এবং অপব্যয় প্রতিদিন মনকে বিমুখ করেচে। ধনের বোঝা কি প্রকাণ্ড এবং কি অনর্থক। জীবনযাত্রার কত জটিলতা কত সহজেই এড়ানো যেতে পারে।" [চিঠিপত্র-২য় : পত্র-৩৮]

কিন্তু বিশ্বভারতীর আর্থিক সমস্যা লইয়া কবির তখন দুঃশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। তিনি তাঁহার বিলাতের বন্ধুদের নিকট এই ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য পূর্বেই আবেদন জানাইয়াছিলেন। কবির এই আবেদনে সাড়া দিয়া A. M. Daniel, S. Margery Fry, Laurence Housman, A. D. Lindsay, John Masefield, Marian E. Parmoor, William Rothenstein, Michael E. Sadlar, C. P. Scott, H. R. L. Sheppard, Edward J. Thompson, Evelyn Underhill, Evelyn Wrench, Francis Younghusband, প্রমুখ তাঁহার বিলাতের বন্ধুরা 'মাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান'-এ বিশ্বভারতীর অর্থসাহায্যের জন্য তাঁহাদের স্বাক্ষরিত একটি আবেদনপত্র প্রচার করেন (*Manchester Guardian* : 10th October, 1930)। এবার তাঁহার আমেরিকা আসার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল, আবেদন ও বক্তৃতাদি করিয়া বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ বা তহবিল সংগ্রহ করা। এণ্ড্রুজ কিছুদিন পূর্বেই আমেরিকায় আসিয়া এ ব্যাপারে চেষ্টা-চরিত্র করিতেছিলেন। ১৩ই অক্টোবর উইলিয়ামসটাউন হইতে বিধুশেখর শাস্ত্রীকে এক পত্রে কবি লিখিতেছেন :

"শাস্ত্রীমশায়, ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে ফিরচি। অন্নপূর্ণার আসন আছে এ দেশে, কিন্তু নন্দী ভৃঙ্গীর শাসনও খুব কঠিন। আপাতত দ্বারীদের তুষ্ট করে বেড়ানো আমার কাজ—মিষ্ট ভাষা আমার একমাত্র সম্বল—বাণীর সাহায্যে লক্ষ্মীর আনুকূল্য প্রত্যাশা করা ছাড়া আমার আর গতি নেই।......

"ভিক্ষা ব্যবসায় দৈববশে অর্থকর হতেও পারে কিন্তু কোনোমতেই স্বাস্থ্যকর নয়। শান্তিনিকেতনের বিপরীত পথেই তার গতিবিধি—শরীর ক্লান্ত, মন পীড়িত কিন্তু ঝুলি হয়েচে কমুলির মতো, কিছুতেই ছোড়তা নেহি। স্পৃহা মরীচিকা যতই মনকে মরুপথে ঘোরায় ততই স্পৃহার প্রকোপ বাড়ে। আক্ষেপ করব না—সব দুঃখ মেনে নিলুম—একদা আপনাদের সহাস্য মুখ দেখব এই প্রত্যাশায়।"

[বিশ্বভারতী পত্রিকা : বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭২ : পৃঃ. ২৮৬]

এবারে আমেরিকায় কবি তাঁহার বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে কেন যে খুব সতর্কতা অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিলেন তা উপরি উক্ত পত্রটি থেকে স্পষ্টই বুঝা যায়। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে কবি আমেরিকায় আসিয়া অবধি যে-সব বিবৃতি দিতে শুরু করিলেন তা দ্বারা মার্কিন ধনকুবেরদের যে মনস্তুষ্টির কারণ ঘটে নাই তা বলাই বাহুল্য মাত্র। ইহার দিন দুই পর কবি নিউ হ্যাভেন-এ যান (১৫ই অক্টোবর)। সেখানে ডীন ল্যাড-এর (Dean Lad)

গৃহে তাঁহারা আতিথ্যগ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯শে অক্টোবর হঠাৎ ডীন ল্যাডের গৃহে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন। ডাক্তার কবিকে পরীক্ষা করিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা গুরুতর আশংকাজনক ;—সম্পূর্ণ দৈহিক ও মানসিক বিশ্রামের প্রয়োজন। কাগজে-কাগজে তারে-বেতারে এই খবর পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হইল। পরদিন নিউইয়র্ক টাইমস্‌-এ 'Tagore Seriously Ill With Heart Disease, Complete Rest Is Ordered at New Haven,'—বড়ো বড়ো হরফে এই শিরোনামা দিয়া কবির গুরুতর অসুস্থতার কথা ফলাও করিয়া ছাপা হয়। উল্লেখযোগ্য, পরদিনই—অর্থাৎ ২০শে অক্টোবরই বোস্টন্‌-এ কবির প্রথম পাবলিক বক্তৃতার ও চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে কবির সমস্ত বক্তৃতার অনুষ্ঠানসূচী বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। বাধ্য হইয়া কবি নিউ হ্যাভেনে ডীন-ল্যাড-এর গৃহে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়া থাকিলেন। চারিদিক হইতে শুভেচ্ছা ও আরোগ্যকামনা করিয়া তারবার্তা আসিতে লাগিল। বিলাতের প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনেল্ড তার করেন, 'Sorry to hear of your illness, Accept my best wishes for your recovery.' কলিকাতাবাসীর পক্ষ হইতে মেয়র সুভাষচন্দ্র বসু তার করিলেন, 'City of Calcutta anxious about your illness. On behalf of the citizens, I wish your speedy recovery and a safe return home. Wire health.'

কবির নিজের কিন্তু ধারণা, অসুখ তাঁহার এমন কিছু গুরুতর নহে। নিউ হ্যাভেনে রোগশয্যায় থেকে ইন্দিরা দেবীকে এক পত্রে তিনি লিখিতেছেন (২৫শে অক্টোবর, ১৯৩০) :

"পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক দর্ভাগা আছে যাদের গতিবিধি খবরের কাগজে (কালির ?) কালীর ছাপ দিতে দিতে চলে তাদের নিরালায় অসুস্থ হবারও জো নেই। অতএব তোদের কাছে চাপা নেই যে আমার শরীর খারাপ। কাছে থাকলে বুঝতে পারতিস্‌ খারাপ হলেও এমনিই কি খারাপ। অর্থাৎ কিছুদিনের মতো চুপচাপ করে পড়ে থাকবার মতো খারাপ তার বেশি নয়।…অতএব নিঃসংশয়ে জানিস্‌ হাওড়া ব্রিজ আরো একবার আমাকে পার হতে হবে।"…

[চিঠিপত্র-৫ম : পত্র-৩৪ : পৃঃ. ৭৬]

সুতরাং ব্যাপারটি খুব সহজ ও স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা যায় না। কবির এই অসুস্থতার অতিরঞ্জিত প্রচারের পশ্চাতে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও একটি গূঢ় অভিসন্ধির সন্দেহ করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন :

…"মোটকথা, এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হইল যাহাতে কবির বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ হইল। অথবা আমাদের কবি যাহাতে বক্তৃতাদি না করিতে পারেন সেইরূপ চাতুর্যপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হইল—অর্থাৎ তিনি খুবই অসুস্থ, ক্লান্ত—সভাসমিতিতে কেহ ডাকিয়ো না।…

"আমেরিকানদের ভয় রবীন্দ্রনাথ পাছে ভারতে গান্ধীবাদ সমর্থন করেন ও সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজতন্ত্রবাদের প্রশংসা করিয়া বক্তৃতাদি করেন! যে মার্কিনরা দেড়শত বৎসর পূর্বে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল, আজ পরাধীন

ভারতকে ব্রিটিশের নাগপাশ ছিন্ন করিবার জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহারা হৃষ্টচিত্তে সে আন্দোলনকে সমর্থন করিতে পারিল না। আর রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র-বাদের যে পরীক্ষা শুরু হইয়াছে তাহা তো আমেরিকার ধনতন্ত্র ধুরন্ধরদের স্বার্থের চরম পরিপন্থী আন্দোলন—রবীন্দ্রনাথ সদ্য রাশিয়া সফর করিয়া আসিয়াছেন —যদি তিনি প্রশংসমান কথা বলেন!"

[রবীন্দ্রজীবনী : তৃতীয় খণ্ড : পৃঃ. ৩৮৭-৮৮]

এখানে উল্লেখযোগ্য, কবি মস্কো ত্যাগের প্রাক্‌কালে 'ইজভেস্তিয়া'র সাংবাদিকের কাছে যে বিবৃতি দেন উহা আমেরিকার পত্র-পত্রিকায় ফলাও করিয়া প্রচার করা হইতেছিল। মার্কিন পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর পত্রিকাগুলি আশা করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় রাশিয়ার বিরূপ সমালোচনাও করিবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে বেশ কিছুটা সতর্ক ছিলেন। তিনি জানিতেন সোভিয়েট রাশিয়ার সমালোচনা ক্ষেত্র আমেরিকায় নহে এবং তাই আমেরিকায় পৌঁছিয়াই তিনি যে কয়টি বিবৃতি দেন তাহাতে রাশিয়ার বিরূপ সমালোচনা হইতে বিরত থাকিয়া শুধুমাত্র তাহার গঠন-মূলক কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন। স্বভাবতই মার্কিন পুঁজিপতি গোষ্ঠী ও তাহাদের বশম্বদ সংবাদপত্রগুলি ইহাতে প্রমাদ গণিল। স্মরণ রাখা দরকার, এই সময় সারা বিশ্ব জুড়িয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের দারুণ মন্দা ও আর্থনীতিক সংকট চলিতেছে এবং আমেরিকার মত সম্পদশালী দেশও এই সঙ্কটের আবর্তে অত্যন্ত বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। সমগ্র পুঁজিবাদী জগতে যখন এমন সংকট চলিতেছে তখন রাশিয়ার অভূতপূর্ব উন্নতির প্রশংসা করিলে তাহাতে পুঁজিবাদী সমাজ অপেক্ষা সমাজতান্ত্রিক সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইবে। এই কারণেই কবির সামান্য অথুস্থতার অজুহাতে তাঁহার বক্তৃতার ব্যবস্থা বানচাল করিয়া দিবার একটা চেষ্টা সেখানে চলিয়াছিল, এমন সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, কবির সেখানে আসার পর দশটিদিন অতিবাহিত হইল অথচ আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁহাকে কোন সম্বর্ধনা সভা বা বক্তৃতা সভায় আহ্বান করা হয় নাই।

এদিকে অসুস্থ অবস্থায় দেশের আন্দোলনের খবরেও কবির মন খুবই চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। উল্লেখযোগ্য আপস ও সন্ধির প্রচেষ্টায় সপ্রু-জয়াকরদের দৌত্য ব্যর্থ হওয়ার পরও আন্দোলন চলিতে থাকে। এইসময় আন্দোলন প্রধানত বিদেশীপণ্য বয়কট ও খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে সীমাবদ্ধ থাকে। বল্লভভাই প্যাটেল ও জওহরলাল নেহরু—উভয়েই তাঁহাদের কারামুক্তির পর খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের সূচনা করেন। গুজরাট ও উত্তরপ্রদেশেই এই আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। বলা বাহুল্য, আন্দোলনকে দমন করার জন্য গভর্নমেণ্ট সর্বপ্রকার নিষ্ঠুর নির্যাতন-নীতি অবলম্বন করে। ২৯শে অক্টোবর জওহরলাল পুনরায় গ্রেপ্তার হন। অপরদিকে বাংলা দেশে বয়কট ও ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের পাশাপাশি বিপ্লবপন্থীদের আন্দোলনও প্রবল হইয়া উঠে। বিশেষত বাংলার বিপ্লবীদের দমন করার জন্য গভর্নমেণ্ট অত্যন্ত হিংস্র ও ভয়াবহ পন্থা অবলম্বন করে। ইহারই প্রত্যুত্তরে বা প্রতিক্রিয়ায় ২৫শে আগস্ট (১৯৩০) ডালহৌসি স্কোয়ারে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বিপ্লবীরা বোমা নিক্ষেপ করেন।

২৯শে আগস্ট বাংলার পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ লোম্যান (Francis. J. Lowman)ও ঢাকার পুলিশ-সুপার মিঃ হড্‌সন্‌ (E. Hodson.) ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে বিপ্লবীদের হাতে গুলিবিদ্ধ হন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এক পত্রে সম্ভবত ইহার কিছু সংবাদ কবি পান। ২৮শে অক্টোবর ল্যান্সডাউন হইতে এক পত্রে তিনি সুধীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন :

"দেখলুম কিছু সংবাদ পাঠিয়েছ, শরীরের এ অবস্থায় পড়তে ভয় করে, পাছে ঢেউয়ের ঘায়ে ভাঙন লাগে।···

···"ব্রিটিশরাজ নিজের বাঁধন নিজের হাতেই ছিঁড়ছে, তাতে আমাদের তরফে বেদনা যথেষ্ট, কিন্তু তার তরফে লোকসান কম নয়। সকলের চেয়ে বড়ো লোকসান এই যে বৃটিশরাজ আপন মান খুয়েছে। ভীষণের দুর্বৃত্ততাকে আমরা ভয় করি, সেই ভয়ের মধ্যেও সম্মান আছে, কিন্তু কাপুরুষের দুর্বৃত্ততাকে আমরা ঘৃণা করি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আজ আমাদের ঘৃণার দ্বারা ধিক্‌কৃত। এই ঘৃণাই আমাদের জোর দেবে, এই ঘৃণার জোরেই আমরা জিতব।

"সম্প্রতি রাশিয়া থেকে এসেছি—দেশের গৌরবের পথ যে কত দুর্গম তা অনেকটা স্পষ্ট করে দেখলুম। যে অসহ্য দুঃখ পেয়েছে সেখানকার সাধকেরা পুলিশের মার তার তুলনায় পুষ্পবৃষ্টি। দেশের ছেলেদের বলো, এখনও অনেক বাকি আছে—তার কিছুই বাদ যাবে না। অতএব তারা যেন এখনই বলতে শুরু না করে যে, বড়ো লাগছে—সে কথা বললেই গুণ্ডার লাঠিকে অর্ঘ্য দেওয়া হয়।

তিনি আরও লিখিলেন :

"দেশে বিদেশে ভারতবর্ষ আজ গৌরব লাভ করেছে কেবলমাত্র মারকে স্বীকার না ক'রে—দুঃখকে উপেক্ষা করবার সাধনা আমরা যেন কিছুতে না ছাড়ি। পশুবল কেবলই চেষ্টা করছে আমাদের পশুকে জাগিয়ে তুলতে, যদি সফল হতে পারে তবেই আমরা হারব। দুঃখ পাচ্ছি সেজন্যে আমরা দুঃখ করব না। এই আমাদের প্রমাণ করবার অবকাশ এসেছে যে, আমরা মানুষ—পশুর নকল করতে গেলেই এই শুভযোগ নষ্ট হবে। শেষ পর্যন্ত আমাদের বলতে হবে, ভয় করি নে। বাংলাদেশের মাঝে মাঝে ধৈর্য নষ্ট হয়, সেটাই আমাদের দুর্বলতা। আমরা যখন নখদন্ত মেলতে যাই তখনই তার দ্বারা নখীদন্তীদের সেলাম করা হয়। উপেক্ষা কোরো, নকল কোরো না। অশ্রুবর্ষণ নৈব নৈব চ।

কবির আক্ষেপ এই :

"আমার সব চেয়ে দুঃখ এই, যৌবনের সম্বল নেই। আমি পড়ে আছি গতিহীন হয়ে পান্থশালায়—যারা পথে চলছে তাদের সঙ্গে চলবার সময় গেছে।"

[রবীন্দ্ররচনাবলী : ২০শ খণ্ড : পৃঃ. ৩২৯-৩০]

ঐদিনই হেমবালা সেনকে আর একটি পত্রে কবি লিখিতেছেন :

···"কিন্তু দেশের দুঃখে আমার এই জীর্ণ হৃৎপিণ্ড ক'দিন টিকবে তাই ভাবি। তবু একথাও ভাবতে হয় বড়ো দাম না দিয়ে বড়ো ফল পাওয়া যায় না—বড়ো দুঃখের ভিতর দিয়েই সকল দেশ সার্থকতায় পৌঁচেছে। আমাদেরও শেষ কড়া পর্যন্ত

গুণে দিতে হবে। বুকের পাঁজর বিছিয়ে দেব ভাগ্যের জয়রথ তার উপর দিয়ে চলবে। সেই অতি দুর্গম পথের চেহারা দেখে এসেচি রাশিয়ায়।...সেই জন্যে মার খেয়ে যখন দুঃখ প্রকাশ করি তখন তাতে লজ্জা বোধহয়। বার বার বলতে হবে, না—কিছু লাগে নি। এমনি করেই মারকে লজ্জা দিতে হয়। রাশিয়ার বিপ্লবের ইতিহাস পড়ে দেখো।" [প্রবাসী : কার্তিক, ১৩৪৮ : পৃঃ. ১১৫-১৬]

রবীন্দ্রনাথ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে কতখানি আন্তরিকভাবে সমর্থন করিতেছিলেন, উপরোক্ত দুটি পত্রে তাহা খুবই স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য তিনি দেশের বিপ্লববাদীদের সশস্ত্র সংগ্রামনীতিকে সমর্থন করেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। বস্তুত তিনি গান্ধীজী প্রবর্তিত অহিংস সত্যাগ্রহ সংগ্রামকেই সমর্থন করিয়াছেন। অবশ্য দেশের মুক্তিসংগ্রামে যে অশেষ দুঃখ-নির্যাতন হাসিমুখে বরণ করিয়া লইতে হইবে এই বিষয়ে তিনি রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণের জন্য বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। বলশেভিক বিপ্লবীদের যে তিনি কতখানি শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন, তাহাও উপরোক্ত দুটি পত্র হইতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

এই ত গেল দেশের কথা, তাছাড়া বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহ-সমস্যার কথাও সর্বদাই মনে হয়। বিশেষত মেয়েদের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা কিছুকাল হইতেই তাঁহার মনে কাজ করিতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন এবারে বিদেশে সংগৃহীত অর্থ এই পরিকল্পনাটিকে কার্যকরী করার জন্য নিয়োজিত করিবেন। হেমবালা সেনকে পত্রে সেই কথাই ব্যক্ত করিয়া লিখিলেন :

..."ভিক্ষার কাজ সমানই চলচে কিন্তু রাজার মত শুয়ে শুয়ে। যাদের কাছ থেকে ভিক্ষা পাবার প্রত্যাশা করি তারাই আসে আমার শয়নালয়ের খাস দরবারে।

"তবু ভিক্ষের কাজ আমার পছন্দসই নয়—এর চেয়ে ডাকাতি ভালো, তাতে পৌরুষ আছে। অতলান্তিক পাড়ি দেবার আগে অনেক দ্বিধা করেছিলুম—শরীরও বিমুখ হয়েছিল মন ততোধিক। ভিতরে ভিতরে কেবল একটিমাত্র তাগিদ ছিল যার তাড়নায় আমাকে মরিয়া করেছিল। মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এই সংকল্প আমাকে রাস্তায় বের করেছে। যদি কিছুমাত্র সিদ্ধিলাভ করি তাহলে দেহের দুঃখ এবং মনের গ্লানি ভুলতে পারব।...

..."কিন্তু ঝুলির কতখানি ভরবে জানি নে। যদি যথেষ্ট দক্ষিণা জোটে তবে আমার দেশের মেয়েদের হাতে আমার শেষ দান দিয়ে যাব বিদ্যাদান। দেশের মেয়েদের আমি বরাবর ভালোবেসেচি, বোধ হয় তাদের কল্যাণেই সরস্বতী আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েচেন।"... [প্রবাসী : কার্তিক, ১৩৪৮ : পৃঃ. ১১৫-১৬]

অবশ্য কবির এই পরিকল্পনা কোনদিন বাস্তবে পরিণত হইতে পারে নাই।

৩রা নভেম্বর তিনি পুনরায় নিউইয়র্কে আসেন। এবারেও তিনি এলমহার্স্টদের আতিথ্য গ্রহণ করেন। এবারে নিউইয়র্কে কবির চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। এ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগ গ্রহণ করেন হরিসিং গোভিল। কবির ধারণা, নিউইয়র্ক-বাসীরা তাঁহার ছবির কদর বুঝিবে এবং হয়ত ছবি বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থসংগ্রহও হইতে পারে। নিউইয়র্কবাসীরা তাঁহার ছবি কতখানি ও কি ধরনের সমাদর

করিয়াছিল তাহা জানা যায় না। তবে সেখানকার সাংবাদিকরা পুনরায় কবিকে ছাঁকিয়া ধরে,—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বিলাতে আসন্ন গোল-টেবিল বৈঠক ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁহার অভিমত কি, এইসব তাহাদের প্রশ্ন। কবি এইভাবে বিক্ষিপ্ত মন্তব্য করিতে রাজী না হইয়া একটি 'প্রেস্-কনফারেন্স' বা সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন। নিউইয়র্ক প্রেস এ্যাসোসিয়েশন্-এর উদ্যোগে এই সম্মেলনের ব্যবস্থা হয়। এই সম্মেলনেই তাহাদের প্রশ্নের ভিত্তিতে কবি তাঁহার লিখিত বিবৃতিটি পাঠ করেন। পরে তিনি উহার কপি 'মডার্ন রিভিউ'-এর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাঠাইয়া দেন। ভারতবর্ষ স্বাধীনতালাভের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে কিনা, ইঙ্গ-মার্কিন সাংবাদিকমহল বার বার তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিয়া উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি ইতিপূর্বেই তাঁহার বিবৃতিতে এ-সম্পর্কে তাঁহার অভিমত পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেন ; এই বিবৃতিতেও তিনি বলিলেন :

"In answer to the question as to whether India is ready for Independence. I must repeat that it is the sense of responsibility which comes with freedom itself that makes a nation fit for self-rule, because this fitness is not an artificial condition imposed from without but a natural process which is inevitably linked up with the creative unfoldment of a nation's life. Judged by an artificial standard hardly any nation is fit for self-government and it would not be fair for any country to claim social and political perfection much less the right to rule and govern the destiny of any other country on the grounds of moral guardianship. As in the individual life so on the national plane our most important concern is to make truth operative, not through coercion, which kills it, but through the vital sanction of an awakened consciousness and this can come only from within."

গান্ধীজী পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রাম তিনি সমর্থন করেন কিনা, এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলিলেন :

"I am proud that my countrymen, to-day under their great leader Mahatma Gandhi, have disdained to imitate the violent methods of the modern military nations in their struggle for freedom, but have made moral integrity and the spirit of sacrifice the directive power of their non-violent movement. By accepting spiritual force as their chief weapon they have already proved their superiority to the primitive mentality of unashamed pillage and man-slaughter which persists in most countries to-day, and I have no doubt that if our countrymen can keep fast to this heroism of non-violence in spite of violent provocation they will have no difficulty in establishing freedom,

which is already theirs in so far as they are true to their central ideal.

তিনি জোর দিয়া বলিলেন :

"I can tell you that the whole world to-day has to recognise the greatness of India's spiritual struggle for liberty. India has proved that human history has come to a stage when moral force has to be acknowledged even by politics."…

আসন্ন গোল-টেবিল বৈঠক সম্পর্কে তাঁহার অভিমত জানিতে চাহিলে কবি বলেন :

…"The real importance of the conference is not in the opportunity it may offer of a co-operation with the British politicians but with the soul force of the whole world. We must know that this conference is going to hold its sittings before the world tribunal whose approbation it is eager to win."

[*Modern Review :* January, 1931 : PP. 119-20]

পূর্ব ঘোষণানুযায়ী ১২ই নভেম্বর লণ্ডনে প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের (First Round Table Conference—12th November, 1930-January, 1931) উদ্বোধন হয়। ব্রিটিশ সাংবাদিক স্লোকমের ও পরে সপ্রু-জয়াকরের মাধ্যমে গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতারা আপসের যে-সব শর্তাদি দেন ব্রিটিশ সরকার তাহা অগ্রাহ্য করেন। ফলে আন্দোলন সমানে চলিতে থাকে। গান্ধী-জওহরলাল প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা প্রায় সকলেই কারাগারে রহিলেন। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে গোল-টেবিল বৈঠকে যোগদানের কোনো প্রশ্নই আসে না। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসকে বাদ দিয়াই দেশের মডারেট নেতা, সাম্প্রদায়িক দল, বড় বড় পুঁজিপতি এবং তাহার একান্ত বশম্বদ ভারতের দেশীয় নৃপতি ও রাজা-মহারাজাদের বৈঠকে আমন্ত্রণ জানায়।

রবীন্দ্রনাথ বিদেশে থাকায় এ সবের খবর বিস্তারিত কিছু জানিতেন না এবং গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতাদের এ সম্পর্কে সঠিক বক্তব্যটি কী, তাহাও জানিতে পারেন নাই। তাঁহার ধারণা হয়, গান্ধীজী রাজনীতিক ফলাফল বা লাভক্ষতির কথা বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় গোল-টেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে অসম্মত হন। অবশ্য ইঙ্গ-মার্কিন প্রচারযন্ত্র হইতে এই রকম প্রচার করা হয়। নিউইয়র্কে সাংবাদিকরা ছাড়াও তাঁহার বিলাতের বন্ধুরা বার বার এই সম্পর্কে তাঁহার অভিমত জানিতে চাহেন। গোল-টেবিল বৈঠকের কয়েকদিন পূর্বে কবি বিলাতের *Spectator* পত্রিকায় তাঁহার স্বাক্ষরিত এক খোলা-চিঠি বা বিবৃতিতে এই সম্পর্ক তাঁহার চিন্তা-ভাবনার কথা খুলিয়া লিখেন। উহা ১৫ই নভেম্বর ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই পত্রে তিনি প্রথমেই বিনয়ের সঙ্গে লিখিয়াছিলেন যে, সঙ্কীর্ণ রাজনীতিক দৃষ্টি-ভঙ্গী হইতে তিনি ইহার বিচার করিতে অসমর্থ তবে তিনি সুনিশ্চিত যে ইহার আর একটি স্বতন্ত্র পরিপ্রেক্ষিত আছে যে-সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা আছে। তাঁহার মতে, এই সম্মেলনে দেশের আশু রাজনীতিক

লাভক্ষতির প্রশ্ন ছাড়াও আরও একটি বৃহত্তর সুযোগের সম্ভাবনা আছে এবং তাহা হইতেছে যে, এই গোল-টেবিল বৈঠকের উপলক্ষ্যেই ভারতের মহান আদর্শ ও নীতিগত সংগ্রামের কথা বিশ্ববাসীকে শুনাইবার জন্য এই কনফারেন্সের মঞ্চকেই যথার্থভাবে কাজে লাগাইবার এক সুযোগ-সম্ভাবনা আসিয়াছে গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতাদের কাছে।—গান্ধীজী এই সুযোগ গ্রহণ করিলে ভালোই করিতেন। তিনি বলিলেন :

…"Mahatma Gandhi may not believe in the success of its obvious purpose, but he must acknowledge that it represents the same moral principal which he himself invokes on behalf of his countrymen in their endeavour after self-government. The real importance of this Conference is not in the opportunity it may offer of a co-operation with the British politicians, but with the soul force of the whole world, We must know that this Conference is going to hold its sittings before the world-tribunal whose approbation it is eager to win.

…"I believe that it would have been worthy of Mahatma Gandhi if he could have accepted unhesitatingly the seat offered to him, even though the conditions were not fully acceptable to himself. To come there without any absolute assurance of political success would all the more enhance the significance of his moral mission.…

…"And now he has had the opportunity to introduce the moral spirit of that movement into a Conference which only he has made compellingly possible, and which only he could have used as a platform wherefrom to send his voice to all those all over the world who truly represent the future history of man, a history that has to be built upon the foundation of numerous immediate failures and futile sufferings.…I feel sad that such an opportunity has been lost for the moment, for India and for all the world, For to-day is the age of co-operation in all departments of life, including politics, the age of the creation of the continent in which all the human islands are to merge their isolation for a grand festival of civilization."

কিন্তু পরক্ষণেই কবি লিখিতেছেন যে, এই পর্যন্ত লিখিয়াই তাঁহার কলম থামিয়া যাইতেছে। তাঁহার সন্দেহ যে, তাঁহার এই অত্যধিক আশাবাদ ও ভাবুকচিত্তের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে হয়ত নগ্ন বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই। সাথে সাথে তাঁহার ঢাকা ও পেশোয়ারে ইংরাজের পৈশাচিক বর্বরতার কথা তাঁহার মনে ভাসিয়া উঠে। যে অসহায় ও দুঃসহ দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে দেশের মানুষ জীবনমরণ পণ করিয়া সংগ্রাম করিতেছে সেখানে এইসব আশাবাদী উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে কবি লজ্জা ও সংকোচ অনুভব

করিতেছেন। অতি অল্প সময়ে অত্যাশ্চর্যভাবে যিনি সারাদেশের মানুষের মনে এই নির্ভীক সংগ্রামপরতাকে উদ্বোধিত করিয়াছেন, সেই মহাত্মা গান্ধীর প্রাজ্ঞোচিত বিচারবুদ্ধির প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আস্থা নিবেদন করিয়া কবি তাঁহার ঐ বিবৃতির উপসংহারে লিখিলেন :

…"A miracle has happend through the magical touch of Mahatma's own indomitable spirit and his courageous faith in human nature. And after this experience of mine I hesitate to doubt his wisdom when he holds himself aloof from the invitation that seems to offer the opportunity for at least the beginning of an endeavour which, through the usual path of diplomacy, with its tortuous bends and sudden pitfalls of reactions, may at last lead us to our goal. Let me believe in his firmness of attitude, and not in my doubts."

[*Spectator* : 15th November, 1930]

এই বিবৃতির পাদটীকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয় যে, এই বিষয়ে কবির সকল বক্তব্যের সঙ্গে তাঁহারা একমত নহেন তবে তাঁহার নির্ভীক স্পষ্টবাদীতাকে তাঁহারা অভিনন্দন জানাইতেছেন এবং সবচেয়ে জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, এই মুহূর্তে ভারতবাসীর আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের জন্য সদিচ্ছা লইয়া সমস্ত বৃটেনবাসীর আগাইয়া আসা কর্তব্য।

গোলটেবিল সম্পর্কে কবির এইসব মন্তব্য ও বিবৃতিতে ভারতবর্ষে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ ও এন্ড্রুজ নাকি গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতাদের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। এই সংবাদে এন্ড্রুজ তৎক্ষণাৎ বাণারসীদাস চতুর্বেদীকে লেখা পত্রে রামানন্দবাবুকে জানাইতে অনুরোধ করেন যে, তিনি বা রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেস নেতাদের কখনও ঐরূপ অনুরোধ করেন নাই। কবি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে আপস মীমাংসার একটি পন্থা অন্বেষণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র এবং দেশে অবাধ পুলিশী সন্ত্রাসরাজ চলাতে তাহাও এখন অসম্ভব বলিয়া তিনি মনে করিতেছেন। (*Modern Review*-November, 1930-P. 592)।

কিছুকাল পরে *Spectator*-এ কবির ঐ খোলাচিঠি পাঠ করিয়া রামানন্দ মডার্ন রিভিউ-তে উহার সমালোচনা করিয়া কবির ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য সত্য ঘটনাটি বিস্তারিত খুলিয়া আলোচনা করেন। তবে গোলটেবিল বৈঠকে কবি যে আত্মিক-শক্তি প্রদর্শনের (soul force) কথা বলিয়াছেন তাহার বাস্তব সুযোগ ও অবকাশ আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। একমাত্র সত্যকারের আত্মিকশক্তিই আত্মশক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করিতে পারে। ভারতবর্ষের তথাকথিত যে-সব প্রতিনিধি সেখানে গিয়াছেন তাহাদের সকলের 'আত্মা' থাকিলেও ভারতের সেই শ্রেষ্ঠ আত্মিকশক্তির জোর নাই। তিনি আরও বলেন যে, বস্তুতপক্ষে এ-সম্মেলনে ভারতবর্ষকে যথার্থ-ভাবে আমন্ত্রণই জানান হয় নাই। কেননা ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের—দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান-সন্ততিদের আমন্ত্রণ করাই হয় নাই। যাঁহারা আজ দেশকে প্রতিনিধিত্ব

করিতে গিয়াছেন তাঁহারা সত্যকারের প্রতিনিধি নহেন—বৃটিশ সরকারের মনোনীত ব্যক্তি মাত্র, ইত্যাদি (*Modern Review* : January, 1931. pp. 119-20)

১০ই নভেম্বর কবি নিউইয়র্ক বেতার কেন্দ্র হইতে বিশ্বভারতীর শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে একটি বেতার-ভাষণ দেন। তাঁহার আশা আমেরিকাবাসী ইহাতে সাড়া দিবেন। কবি নিউইয়র্কে এলম্‌হার্স্টদের গৃহে আশায় আশায় দিন কাটান। অর্থকড়ির ব্যাপারে তখনও পর্যন্ত খুব আশাপ্রদ কিছু দেখিতে পাইলেন না। আমেরিকায় তাঁহার আসার পর হইতে প্রায় দেড় মাসকাল এইভাবে অতিবাহিত হইল। এই দীর্ঘকাল পর্যন্ত আমেরিকার বুদ্ধিজীবী বা নেতৃস্থানীয়দের কিংবা স্টেট্‌ ডিপার্টমেণ্টের পক্ষ হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁহাকে কোন সম্বর্ধনা জানান হয় নাই। শেষ পর্যন্ত লোক দেখানোর মত কবির সম্বর্ধনার উদ্দেশ্যে এক ভোজসভার আয়োজন করা হয়। ২৫শে নভেম্বর সন্ধ্যায় আমেরিকার ইণ্ডিয়ান সোসাইটি ও 'টেগোর রিসেপ্‌সন্‌ কমিটি'র যুক্ত প্রচেষ্টায় হোটেল বাল্‌টি-মোর-এ এই ভোজসভা হয়। প্রায় সাড়ে তিন শত ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাহার মধ্যে হেনরি মার্গেনথ, বিখ্যাত ও নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক সিনক্লেয়ার লিউইস্‌, প্রফেসর কিলপ্যাট্রিক, ডাঃ ফ্রেডারিক রবিন্‌সন্‌, জে. টি, স্যাণ্ডারল্যাণ্ড, মিসেস মার্গারেট স্যাঙ্গার প্রভৃতি আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ভোজের পূর্বে সিনক্লেয়ার লিউইসের সহিত কবির কিছুক্ষণ আলাপ-পরিচয় হয়। ভোজের পর হেনরি মার্গেনথ কবিকে পরিচিত করাইয়া দিলে পর তিনি তাঁহার ভাষণে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনকে সার্থক করিয়া তুলিবার আহ্বান জানান। তবে কবি তাঁহার ভাষণে ইউরোপ ও আমেরিকার শোষণমূলক সভ্যতার সমালোচনা করিতেও ছাড়েন নাই। পরদিন *Newyork Eve Post* বড়ো বড়ো হরফে 'Babbit' Hears Tagore Indict U. S.—Sinclair Lewis At Hindu Poet's Arraignment of Western Civilization—শিরোনামায় এই সম্বর্ধনা-সভার বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করে। কবি বলেন :

"In spite of your wealth and prosperity, you of the Western World are tired ; you are not happy. You have exploited those who are helpless and you have hurt those who are weak."

[*Newyork Eve Post* : 26 November, 1930]

অবশ্য কবি তাঁহার ভাষণে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের উপরই প্রধান গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলিলেন :

"I have come to you to ask for the interchange of the spiritual treasures and cultural co-operation between the East and the West. *My mission here is to be a bridge-builder between India and America !* (Italics—mine)

"The East and the West must come and work together, otherwise the happiness of mankind will not be realized. Wide relationship of

all humanity, its unity, is the basis of my teachings at the world universities I have established in India."

[*Newyork American* : 26 November, '30]

এখানে উল্লেখযোগ্য, কবির এই বক্তৃতায় আমেরিকায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়। কবির এই ভাষণ ও পূর্বাপর বিবৃতিতে মার্কিন ধনকুবের গোষ্ঠীর কাগজগুলি কবির প্রতি রুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্পর্কে অত্যন্ত অশালীন ভাষায় কুৎসা প্রচার করিতে থাকে আর ইহাতে ইংরেজ সাংবাদিকরা খুবই খুশি হইয়া আমোদ অনুভব করিতে থাকে। কেননা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নিন্দা ও গান্ধীজী পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করিয়া কবি আমেরিকায় যে সব বিবৃতি দেন তাহাতে আমেরিকায় প্রতিক্রিয়াশীল ব্রিটিশ সাংবাদিকরা পূর্বেই কবির উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। তাই কিছু মার্কিন পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে কুৎসা প্রচারিত হইতে থাকিলে তাহারা অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া উঠে। বিলাতের বিখ্যাত *Sunday Chronicle*-এর নিউ ইয়র্কস্থিত সংবাদদাতা সেগুলি চয়ন করিয়া উক্ত পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠায়। কিছুদিন পর—"Famous Mystic Gets A Shock : America Gives Him a *Coolly* Reception"—বড়ো বড়ো হরফে এই শিরোনামা দিয়া সেগুলি *Sunday Chronicle*-এ প্রকাশিত হয়। উহাতে লেখা হয় :

"Sir Rabindranath Tagore, the Indian poet and mystic has arrived in New York to tell the Americans what a holy man he is and to denounce British rule in India.

"But he has received a shock. His reception has been cool and hostile.

"This is due partly to the shortage of dollars, but largely also to American sympathy with Britain's efforts to deal with the troubles in India.

"Mr. Randolph Heart's *Newyork American*, a newspaper which has never been accused of pro-British leanings, comments in a leading article on the report of the dinner at Newyork in Tagore's honour, 'attended by 350 supposedly sane Americans, who paid £ 5 a piece to look at and listen to him."

তারপর সাংবাদিক *Newyork American* পত্রিকার মন্তব্যটি উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তাহা এই :

"Tagore, for example, has the colossal nerve to tell us what a terrible thing Western civilization is for the oppressed races of the East,

"His own India is kept from going to complete smash only by the power and the justice of Britain, as he knows. His own people are fed in times of famine by the hated British. His entire land is

preserved from tyranny or anarchy only because Britain has the strength of character and the strength of empire to preserve it.

"Then he comes here and wrings his hands—about oppression."

The Newyorker নামে আর একটি পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে আরও কুৎসিত ও আজগুবি খবর প্রচার করিয়া লেখে :

"In India Tagore spends much of his time in a house built in a tree. It looks something like pagoda, and is quite different from 1,172, Park-Avenue. Tagore goes up into the tree and meditates, often at night. He always takes a cat with him. He pulls the ladder up after him, so he gets complete privacy."

[*Sunday Chronicle* : Manchester : December 28, 1930]

স্মরণ রাখা দরকার, কবি আমেরিকায় থাকাকালীনই মার্কিন পত্র-পত্রিকাগুলি এইসব জঘন্য প্রচারকার্য চালায়। ইহার ফলে কবির কী মানসিক প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু মার্কিন সাংবাদিকদের হাত হইতে কবির পরিত্রাণের উপায় ছিল না। ভোজসভার পরদিনই *Newyork Times*-এর সংবাদদাতা নিউইয়র্কে এলমহার্স্টদের গৃহে কবির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার অভিমত জানিতে চাহেন। তাঁহাদের প্রধান প্রশ্ন, গোল-টেবিল বৈঠকের সাফল্য সম্পর্কে তিনি কোন আশা পোষণ করেন কি না ? জবাবে কবি বলেন :

"It is hard to anticipate the results, for there have been so many conflicting and contradictory statements. One thing is certain, however, the Indian delegates have come fully prepared. Of course, we want a great deal more freedom politically than we have. We want to serve our country, and all depends how much they will give us. If they do not give us what we want, there will be a perpetual struggle, for there is no chance of this revolution, if it can be called a revolution, dying of old age. It will mean terrible suffering for our people. The Hindus and Mahammedans must unite, when they have common responsibilities that they can be accomplished."

[*Newyork Times* : November 27, 1930]

ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করা হইলে কবি বলেন, 'শাসক হিসাবে তারা যে অসাধু তা অবশ্যই আমি বলব। কিন্তু জাতি হিসাবে ব্রিটিশ জাতি বীর্যবান ও মহানুভব। তোমরা যদি আমাদের উপর শাসন করতে তাহলে হয়ত আমাদের পক্ষে তোমরা খুবই খারাপ হতে (Had you been ruling over us you might have been worse.)'

আমেরিকার বুকে বসিয়া নিউইয়র্ক টাইমস-এর মত একটি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকার সাংবাদিকের মুখের সামনে স্পষ্ট করিয়া এমন কথা বলার সাহস রবীন্দ্রনাথ ও

বার্নার্ড শ'র মত দুই-চারিজন মনীষী ছাড়া বোধ হয় বেশি লোকের ছিল না। এইসব কথায় মার্কিন সংবাদপত্রগোষ্ঠী যে রবীন্দ্রনাথের উপর সন্তুষ্ট বা খুশি হয় নাই তা' বলাই বাহুল্য মাত্র।

এই সময় একদিন *The Jewish Standard* নামে আমেরিকার ইহুদীদের একটি পত্রিকার প্রতিনিধি কবির সহিত পার্ক এভিন্যুর বাড়িতে সাক্ষাৎ করেন। সংবাদ প্রতিনিধি 'জায়নবাদ' (Zionism) এবং প্যালেস্টাইনের আরব-ইহুদী বিরোধ সমস্যা সম্পর্কে কবির অভিমত জানিতে চাহেন। জবাবে কবি জায়নবাদ ও প্যালেস্টাইন সমস্যার বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া সমাধানের মূল সূত্রটি নির্দেশ করেন। কয়েকদিন পর এই আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

প্রসঙ্গত প্যালেস্টাইনে আরব-ইহুদী বিরোধের পটভূমিটুকু স্মরণ রাখা দরকার। ইহুদীদের আদি বাসস্থান ছিল প্যালেস্টাইনে। পরে বার বার বিদেশী শত্রুর আক্রমণে তাহারা বাধ্য হইয়া প্যালেস্টাইন ত্যাগ করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু সর্বত্রই তাহাদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতন চলিতে থাকে—বিশেষ করিয়া ইউরোপীয় দেশগুলিতে। শেষে তাহারা পুনরায় তাহাদের ত্যাগ-করিয়া-আসা প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত জন্মভূমির কথা স্মরণ করে। উহাদের মধ্যে একদল আন্দোলন তুলিলেন, তাঁহাদের পবিত্র জেরুজালেমেই তাহাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে—এই প্রতিশ্রুত দেশে পুনরায় তাহারা শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধ জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। এই আন্দোলনকেই বলা হয় 'জায়নবাদ' (Zionism.)

উনিশ শতকের শেষ ভাগ হইতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে ইহুদীরা আস্তে আস্তে প্যালেস্টাইনে আসিতে থাকে। তাহার ফলে প্যালেস্টাইনের আরব, খৃস্টান ও অন্যান্য জাতিগুলি ক্ষুব্ধ ও আশঙ্কিত হইতে থাকে। বলা বাহুল্য, তাহাদের আশঙ্কার মূল কারণ আর্থনীতিক দিক হইতে। স্বভাবতই নবাগত ইহুদীদের সহিত আরবদের বিরোধ-সংঘর্ষ শুরু হয়। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের মাতৃভূমি সৃষ্টির (national home-land) অজুহাতে ব্রিটিশ সৈন্য প্যালেস্টাইন দখল করিয়া বসে। যুদ্ধের পর প্যালেস্টাইন ব্রিটিশের ম্যাণ্ডেট রাজ্যে পরিণত হয়। আসলে ইহুদীদের স্বার্থরক্ষার অজুহাতে প্যালেস্টাইন শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি উপনিবেশে পরিণত হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সর্বত্রই যে কুখ্যাত ভেদ-নীতি (divide and rule policy) অবলম্বন করিয়া তাহাদের শাসন শোষণ কায়েম রাখে, প্যালেস্টাইনে আরব-ইহুদী বিরোধেও তাহারা সেই নীতিই অবলম্বন করে। ফলে, অল্পকালের মধ্যে সেখানে আরব-ইহুদীদের মধ্যে সংঘর্ষ ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯২৯ সালে আগস্ট মাসে প্যালেস্টাইনে একটি ধর্মীয় অধিকার রক্ষার ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করিয়া এই সংঘর্ষ অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ইহুদীরা অবশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপরই বেশি নির্ভর করিতেছিল।

রবীন্দ্রনাথ 'জায়নবাদ' সম্পর্কে অল্পবিস্তর খবর রাখিতেন এবং প্রথমদিকে এই আন্দোলনের আধ্যাত্মিক দিকটি তাঁহাকে কিছুটা আকৃষ্টও করিয়াছিল। ১৯২৪ সালে জাপান হইতে প্রত্যাবর্তনকালে সাংহাই-এ E. S, Kadoorie-র গৃহে ইহুদীদের এক

সম্বর্ধনা সভায় জায়নবাদ-এর আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের দিকটি তিনি সমর্থন করেন। অবশ্য পরবর্তীকালের ঘটনাবলী হইতে জায়নবাদ ও প্যালেস্টাইন সমস্যার প্রকৃতিটি বুঝিতে তাঁহার কষ্ট হয় না যে, ইহার মাঝখানে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ আসিয়া পড়ায় প্যালেস্টাইন সমস্যায় ঘোরতর জটিল সংকটের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি বুঝিতে পারেন ভারতে হিন্দু-মুসলমান বিরোধে ইংরেজের যে ভূমিকা, প্যালেস্টাইনে আরব ইহুদী বিরোধেও তাহার সেই একই ভূমিকা; এবং এই তৃতীয় পক্ষের অস্তিত্বই বিরোধকে যে ঘনীভূত ও জটিল করিয়া তুলিতেছে, একথা তিনি পরিষ্কার বুঝিতে পারেন। তাই তিনি ইহুদীদের সতর্ক করিয়া দিলেন যে, প্যালেস্টাইন বিরোধের নিষ্পত্তি লণ্ডনে বা কোন তৃতীয় পক্ষের সালিশীতে হইবে না,—হইবে প্যালেস্টাইনেই, উভয় সম্প্রদায়ের মিলিত প্রচেষ্টায়। তিনি বলিলেন :

"The Palestine problem cannot be solved in London by any negotiations between the British Government and the Zionist leaders. The success of Zionism depends entirely upon Arab-Jewish co-operation. This can be obtained in Palestine only by means of a direct understanding between the Arabs and the Jews. If the Zionist leadership will insist on separating Jewish political and economic interests in Palestine from those of the Arabs ugly eruption will occur in the Holy Land.

জায়নবাদ ও ইহুদীদের জাতীয় জন্মভূমির (national home-land) দাবির যৌক্তিকতা তিনি সমর্থন করেন কিনা, এই প্রশ্নের জবাবে কবি বলেন :

"I understand Zionism in the same sense as my great friend Einstein. I regard Jewish nationalism as an effort to preserve and enrich Jewish culture and tradition. In to-day's world this program requires a national home. It also implies appropriate physical surroundings as well as favourable political and economic conditions. I realize this. Palestine, however, can provide these only if the Jews will include the Arabs in their political and economic program…"

এই সমস্যার সমাধানকল্পে কবি আরব-ইহুদীদের যুক্ত বা এক সম্মিলিত 'প্যালেস্টাইন কমনওয়েলথ-সরকার' গঠনের পরিকল্পনা দেন। এবং ইহারই ভিত্তিতে উভয় সম্প্রদায়কেই মিলিয়া-মিশিয়া এক নূতন প্যালেস্টাইন গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানান :

"Come to your co-Palestinians in a free spirit and tell them : 'You and we are both old races. We are both stubborn races. You cannot subdue us, and we will not try to change you. But we can both be ourselves, retain our identity and still be united in the political aims of Palestine, the Commonwealth of Jews and Arabs.' I know that you will not be understood at your first approach. Forget the Western

conception of prestige and pride and keep on working with this end in view : A Palestine Commonwealth in which Arabs and Jews will live their own distinct cultural and spiritual lives. Then you will, you must succeed." [*The Jewish Standard* : 28th November, 1930]

প্যালেস্টাইন সমস্যাটি খুবই জটিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কবি যে এই সমস্যার কত গভীরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা উপরোক্ত বিবৃতি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়। উল্লেখযোগ্য, তখনও পর্যন্ত প্যালেস্টাইন সমস্যা সম্পর্কে আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাহাকেও বিশেষ কোনো চিন্তাভাবনা করিতে দেখা যায় না। ইহার দীর্ঘকাল পরে—১৯৩৬ সালেই জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে প্যালেস্টাইন সমস্যা সম্পর্কে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম একটি সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করা হয়। যথাসময়েই আমরা এ আলোচনায় আসিব।

নিউইয়র্কে সম্বর্ধনা সভার পর কবি ওয়াশিংটনে যান। সেখানে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার রোনাল্ড লিন্ডসে কবিকে প্রেসিডেন্ট হুভারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হোয়াইট হাউস-এ লইয়া যান। ২৯শে নভেম্বর কবি পুনরায় নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসেন।

এই সময় আমেরিকার কিছু পত্র-পত্রিকা ভারতের হিন্দু সমাজের বর্ণবিদ্বেষের নিন্দাবাদ ও সমালোচনা করিতেছিল। আসলে তাহাদের আক্রমণের লক্ষ্য,রবীন্দ্রনাথ। তাহাদের ভাবখানা এই যে, দেখ, পাশ্চাত্যের নিন্দা করিবার আগে তোমাদের নিজেদের সমাজ-সভ্যতার দিকে ভালো করিয়া তাকাইয়া দেখ। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ ইহাতে মনে মনে অত্যন্ত উত্যক্ত ও বিরক্তি বোধ করিতেছিলেন। পরদিন 'নিউইয়র্ক হেরল্ড ট্রিবিউন' পত্রিকার জনৈক সংবাদ-প্রতিনিধি কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি তাঁহাকে ভদ্রভাবে বেশ মিষ্টি-মিষ্টি করিয়া দু'চার কথা শুনাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন :

"It amuses me to read in your papers. the talk about untouchables of India. You approach the subject as though it were something unimaginable. Yet in your own country you have the same thing. The Negroes are your untouchables. You treat them in almost the same manner. [*Newyork Herald Tribune* : 1st December, 1930]

ট্রেনে-বাসে নিগ্রোদের জন্য সংরক্ষিত আসনের কথাও তিনি উল্লেখ করিলেন। অর্থাৎ কবি স্পষ্ট করিয়া তাহাদের শুনাইয়া দিলেন, যাহারা নিজ দেশের নিগ্রোদের উপর এত ঘৃণ্য অত্যাচার ও অবমাননা করে তাহারা হিন্দুসমাজের বর্ণ-বিদ্বেষের সমালোচনা করে কোন মুখে।

এই সময় সিনক্লেয়ার লিউইসের সাহিত্যকৃতি ও নোবেল পুরস্কার পাওয়া উপলক্ষ্যে খাস্ আমেরিকাতেই তাঁহার বিরুদ্ধে নানা সমালোচনা চলিতেছিল। তাঁহার *Babbit* ও *Main Street*-এ আমেরিকার পুঁজিবাদী সভ্যতার যে-নগ্ন চিত্রটি পরিস্ফুট হইয়াছিল, মার্কিন পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর পত্র-পত্রিকাগুলি তাহাতে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া অপপ্রচার করিতে থাকে যে, তিনি ঐসব গ্রন্থে মার্কিন সমাজ-সভ্যতার

বিকৃত চিত্র আঁকিয়াছেন। সাংবাদিকটি লিইউসের বিরূদ্ধে এই সমালোচনা সম্পর্কে কবির অভিমত জানিতে চাহিলে তিনি বলেন :

"I do not even want to know whether Lewis presents a true picture of America. What I want to know is he can write well."

এই প্রসঙ্গে তিনি কিপলিং-এর উদাহরণ দিয়া বলিলেন যে, তাঁহার আদর্শ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ; তথাপি তাঁহাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ইহার বিচারকরা তাঁহার বাস্তবানুগ প্রকাশভঙ্গি ও সৃজনশক্তির পরিচয় পাইয়া ভাবিয়াছিলেন যে সেগুলি উৎকৃষ্ট। তাই সাহিত্য বিচারের নিরিখ ও মাপকাঠি সম্পর্কে কবি বলিলেন যে, 'কোন লেখক তোমাকে আঘাত দিতে—এমনকি বিরক্তি উৎপাদন করিতে পারে কিন্তু তাঁহার রচনার মধ্যে যদি কোন সাহিত্যিক গুণ থাকে তাহাকে তোমাকে স্বীকৃতি দিতে হইবে।'

যাহাই হোক, অবশেষে প্রায় দীর্ঘ দুই মাস পরে ১লা ডিসেম্বর নিউইয়র্কের কার্নেগী হলে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার জন্য এক জনসভার আয়োজন হয়। আমেরিকার Discussion Guild ও Indian Society-র মিলিত উদ্যোগে এই জনসভার ব্যবস্থা হয়। প্রায় চারি সহস্র দর্শক সভাগৃহে উপস্থিত ছিলেন এবং সহস্রাধিক লোক স্থানাভাবে ফিরিয়া যান। সভায় M. S. Novik এবং সভানেত্রী Mary E. Wooley কবির পরিচয় উপলক্ষে ক্ষুদ্র ভাষণ দিলে পর কবি তাঁহার ভাষণ দেন।

পাশ্চাত্যের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বাণী, সমস্ত দেশ ও জাতির আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের বাণী তাঁহাদের কৈশোরকালে কিভাবে উদ্বোধিত করিয়াছিল, অত্যন্ত আবেগময়ী ভাষায় কবি তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশগুলি তাহাদের এই মহান বাণীকে প্রাচ্য দেশে বহন করিয়া লইয়া যায় নাই। ভারতের মুক্তি ও স্বাধীনতার দাবীকে তাহারা আজ স্বীকৃতি দিতে সম্মত নয়, পাশ্চাত্য দেশগুলির বিরূদ্ধে কবি এই অভিযোগ আনিয়া বলিলেন :

"Our appeal does not reach you, because you respond only to power. Japan appealed to you and answered because she was able to prove she could make herself as obnoxious as you can."

[*Newyork Times* : 2nd December, 1930]

কবির এই কথায় সভাগৃহে বেশ কিছুটা করতালি ও হাস্যরোল পড়িয়া যায়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রধান প্রধান প্রবণতা ও লক্ষ্যের তুলনামূলক আলোচনা করিতে গিয়া কবি বলেন, আমরা প্রাচ্যবাসীরা ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস করি কিন্তু তোমরা পাশ্চাত্য দেশে শক্তিরই জয়গান কর। মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব তাহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে। একদা আমাদের দেশে মানবিকতার বাণী বহন করিয়া ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সব পুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। নৈতিক অধঃপতন, নৈরাশ্য, দৌর্বল্য ও অজ্ঞানতাজনিত সমস্ত রকম বন্ধন হইতে মুক্তি দিবার জন্য তাঁহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল।

পক্ষান্তরে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার সমস্যা-সংকটের সমালোচনা করিতে গিয়া কবি বলিলেন :

"And what is the harvest of your civilization ? You do not see from the outside. You do not realize what a terrible menace you have become to man. We are afraid of you. And everywhere people are suspicious of each other. All the great countries of the West are preparing for war, for some great work of desolation that will spread poison all over the world. And this poison is within their own selves. They try, and try to find some solution, but they do not succeed, because they have lost their faith in the personality of man.

"They do not believe in the wisdom of the soul. Their minds are filled with mutual suspicion and hatred and anger, and yet they try to invent some machinery which will solve the difficulties. They ask for disarmament, but it cannot be had from the outside. They have efficiency, but that alone does not help. Why ?"...

[*Visva-Bharati Quarterly* : 1930-31, Part III ; pp. 236-40]

পাশ্চাত্য সভ্যতায় এই সংকটের কারণ সম্পর্কে কবি বলেন যে, 'তাহারা শুধু যান্ত্রিকতায় বিশ্বাস করে। মানুষের আত্মিক সত্তা—মানুষের মধ্যে যে দেবত্বশক্তি ও মানবিকতা,—তাহার 'পরে তাহাদের বিশ্বাস নাই। তিনি তাঁহার গানের উল্লেখ করিয়া বলেন, সারাজীবনই তিনি সেই মহান পুরুষ, সেই শ্রেষ্ঠ-মানবের (*Man the great—the Superman*) অন্বেষণ করিয়াছেন ;—কোথায় তাহার দেখা মিলিবে তাহারই সন্ধানে তিনি এতকাল ঘুরিয়াছেন।'

গান্ধীজীর নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কবি আরও বলেন, 'আমরা আমাদের দেশে সেই ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবের আশায় ও অপেক্ষায় ছিলাম। মহাত্মা গান্ধীই সেই মহান ব্যক্তিত্ব। তাঁহার দৈহিক শক্তি নাই, ঐহিক সম্পদও নাই। কিন্তু তাঁহার প্রভাবে দেশের জনগণ আজ সমস্ত রকম অত্যাচার ও পীড়নমূলক শাসনের বন্ধন হইতে মুক্তির সংগ্রামে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজিকার বিশ্বে তিনিই শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন পুরুষ। তাঁহার রাজনীতিক প্রাজ্ঞতার জন্য নহে,—তাঁহার অধ্যাত্মশক্তির প্রভাবেই দেশের মানুষ বিশ্বাস করে এবং এই বিশ্বাসের জন্য তাহারা জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। এটি একটি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যাহারা পদপিষ্ট ও নিষ্পেষিত হইয়াছিল সেই মানুষেরাই আজ বাহির হইয়া আসিয়াছে এবং কাহাকেও আঘাত না করিয়া সমস্ত পীড়নই সহ্য করিতেছে আর এই সহনশীলতার দ্বারাই তাহারা জয়লাভ করিতে চলিয়াছে'। মোটামুটি এই ছিল তাঁহার ভাষণের বক্তব্য বিষয়।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, এইসব বক্তৃতায় ব্যক্তিত্ববাদ, অতি-মানববাদ—এক কথায় কবির অধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদী চিন্তাই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার আজিকার এই সংকট আপাতদৃষ্টিতে আর্থনীতিক ও রাজনীতিক মনে হলেও মূলত উহা পাশ্চাত্যের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংকট এবং এই কারণেই কোন রাজনীতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে ইহার সমাধান হইবে না, কবির বক্তব্যের সারকথা দাঁড়ায় ইহাই।

তাই শেষপর্যন্ত তাঁহাকে অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও অতি-মানবদের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। অতি-মানবরা আসিয়া তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রশক্তির প্রভাবে মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিপ্লব বা পুনরভ্যুত্থান ঘটাইবেন আর তাহা হইলেই আর্থনীতিক-রাজনীতিক ইত্যাদি যাবতীয় সমস্যা-সংকটের স্থায়ী সমাধান হইবে, এই ছিল তাঁহার ইউরোপ-আমেরিকার অধিকাংশ বক্তৃতার সারকথা।

অথচ এটিও লক্ষ্য করিবার বিষয়, সোভিয়েট রাশিয়ায় কবি এই ধরনের কোনো বক্তৃতা বা বিবৃতি দেন নাই। বস্তুতন্ত্রবাদী সোভিয়েটের আর্থনীতিক ও শিক্ষা সাংস্কৃতিক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি দেখিয়া তাঁহার চিন্তা ও মন সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবে সাড়া দিয়াছে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ যুক্তিবাদী, বিজ্ঞাননিষ্ঠ ও সম্পূর্ণ বাস্তববাদীর মত চিন্তা ও কথা বলিয়াছেন। সেখানে তিনি অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিত্ব বা অতি মানবের অন্বেষণ করেন নাই ;—রাশিয়ায় তিনি অতি সাধারণ মানুষের তল্লাস করিয়াছেন। এই অতি সাধারণ মানুষেরাই শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত ও আত্মশক্তিতে বলীয়ান হইয়া এই নয়া-সভ্যতার ভিত্তি রচনা করিতেছে এবং তাইতেই সোভিয়েট দেশকে তিনি মহীয়ান দেখিতে চাহিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই চিন্তাও রবীন্দ্রনাথের নূতন নয়। স্বদেশের সমস্যায় তিনি চিরদিনই জনগণের সচেতন ও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের প্রশ্নটিতে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং এই কারণেই গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁহার মতান্তর ঘটে যে, তিনি দেশের জনগণকে শিক্ষিত ও সচেতনভাবে পরিচালিত না করিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বের সম্মোহনকারী শক্তির প্রভাবে তাহাদের মোহগ্রস্ত ও অন্ধভাবে চালনা করিতেছেন। এ-সব কথা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়ত সংগঠিত রাজনীতিক আন্দোলনের উপর কবির যে একেবারেই আস্থা ছিল না, তাহা নহে। পরন্তু সারাজীবনই তিনি দেশের ও বিশ্বের প্রগতিশীল সংগ্রামী সংস্থার ও আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন।

উল্লেখযোগ্য, এই সময় ইউরোপে যুবকদের বাধ্যতামূলক সৈনিকবৃত্তি ও সামরিক শিক্ষার বিরুদ্ধে (against Conscription and Military training) ভিয়েনাতে 'জয়েন্ট পীস্ কাউন্সিল'-এর নেতৃত্বে একটি আন্দোলন শুরু হয় এবং সেই মর্মে তাঁহারা একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল মনীষীগণ ইহাতে স্বাক্ষর করেন এবং এই স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই ঘোষণাবাণীতে বলা হয় :

"We urge that the time has come when every sincere lover of peace should demand the abolition of military training of youth, and should deny the right of Government to impose conseription.

"Military training is the training of mind and body in the technique of killing. It is education for war. It is the perpetuation of the war mentality. It prevents the development of the will to peace. The older generation commits a grave crime against the younger generation when in schools, universities, official and private organisa-

tions, it educates youth, often under the pretext of physical training. in the science of war, If Goverments fail to recognise the strength of the revolt against war, they must expect the resistance of those for whom loyalty to mankind and conscience is supreme."

[*People's Weekly* : Bloemfontein, S. A. : 24th October, 1930]

বিশপ অব বার্মিংহাম, জন্ ডিউই, আলবার্ট আইনস্টাইন, সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড, টমাস ম্যান, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, এইচ. জি. ওয়েলস্ প্রভৃতি অনেকে এই ঘোষণাবাণীতে সাক্ষর করেন।

কবিকে আরও কয়েকদিন আমেরিকায় থাকিতে হয়। ৭ই ডিসেম্বর 'নিউ হিস্ট্রি সোসাইটি'র উদ্যোগে Ritz-Carlton Hotel-এ কবি জরথুষ্ট্র ও আবদুল বাহা সম্পর্কে একটি ভাষণ দেন (দ্র. *Visva-Bharati Quarterly* : June, 1932)। বক্তৃতামঞ্চে কবির পাশেই হেলেন কেলার ছিলেন। কবির পরিচয় উপলক্ষে তিনি একটি ক্ষুদ্র ভাষণও দেন।

এই সময় আইনস্টাইন আমেরিকায় আসিতেছিলেন। তিনি রেডিওগ্রামে রবীন্দ্রনাথকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া এই তারবার্তাটি পাঠান :

"May Tagore work further with success in the services of our ideals for the union of all nations. Greetings to Tagore"

এবার ক্যালিফোর্নিয়ায় Mount Wilson Observatory হইতে কয়েকটি নক্ষত্রের গবেষণামূলক পর্যবেক্ষণের জন্য তিনি আমেরিকায় আসিতেছিলেন।

১১ই ডিসেম্বর আইনস্টাইন নিউইয়র্কে পৌঁছান। ১৩ই ডিসেম্বর প্রত্যুষে আইনস্টাইন মর্গেনথ-দম্পতি ও জার্মান কন্সাল-জেনারেল Paul Schwarz সহ রবীন্দ্রনাথের সহিত পার্ক এভিন্যুর বাড়িতে সাক্ষাৎ করেন। মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত তাঁহাদের দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়। ঐদিনই রাত্রে নিউ হিস্ট্রি সোসাইটির উদ্যোগে রীজ কার্লটন হোটেলে আইনস্টাইনের বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যায় তিনি তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ একটি ভাষণ দেন। এই বক্তৃতায় তিনি প্যাসিফিস্টদের অসহায় মনোভাব ও নিষ্ক্রিয়তার তীব্র বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করিয়া বলিলেন :

"Pacifist speakers coming to a meeting like this frequently become like sheep talking to other sheep. The wolves are always just outside the door. That is one of the troubles with pacifists, they usually reach only those who believe in their cause.

"Pacifists, as they really are, are people up in the clouds who ignore the things that should really be done to advance their cause. First they should realize that wars come through and because of their inaction. Therefore, the first thing is that these believers should do everything to disentangle themselves from their militaristic obligations, and should get out of the slavery in which they are bound.

Even at the risk of great personal sacrifice they should refuse to do war service."

তিনি বলেন যে, সত্যকারের শান্তিবাদীদের শান্তিপূর্ণ অবস্থায়ও এই শান্তি আন্দোলনকে অত্যন্ত ব্যাপকতর করার চেষ্টা করা উচিত, কেননা তখনই এই আন্দোলন কার্যকরী হওয়ার অধিকতর সুযোগ সম্ভাবনা থাকে। সারা পৃথিবী জুড়িয়া শান্তি আন্দোলনের সেনা-সংগ্রহের জন্য শান্তিবাদীদের সক্রিয় প্রচেষ্টার আহ্বান জানাইয়া পরিশেষে তিনি বলেন যে :

..."And to the timid ones it is necessary to say that if you only got 2 percent of the people the cause of peace would be saved, for that many people would be by far too many to cope with. There would not be jail room enough for them all.

"A second step, and one probably seeming less illegal, as laws are now constituted, would be to work through international societies. These societies should co-operate for international legislation which would put the cause of the pacifist in the right."

[*Newyork Herald Tribune* : 15th December, 1930]

ইহা হইতে যুদ্ধবিরোধী এবং শান্তি আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আইনস্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার পার্থক্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠে। শান্তি আন্দোলন এবং যুদ্ধবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনকে রবীন্দ্রনাথ যে এতখানি সক্রিয় ও সংগ্রামী দৃষ্টিতে দেখেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। আমেরিকার বিখ্যাত *Literary Digest* আইনস্টাইন-রবীন্দ্রনাথের যুগ্ম-আলোকচিত্র প্রকাশ করিয়া উহার পাদটীকায় মন্তব্য করে :

"*Two Famous Friends* : But Dr. Albert Einstien (left) advocates a pacifism more militant than that of Rabindranath Tagore, the Hindu mystic ; he urges the peace-lovers of the world to come down out of the clouds, to organize and co-operate internationally, and refuse to do war service."

[*The Literary Digest* : Newyork : 3rd January, '31]

বক্তৃতার পরদিন আইনস্টাইন কালিফোর্নিয়ার পথে যাত্রা করেন। তাহার তিনদিন পর রবীন্দ্রনাথও ইংলণ্ডের পথে পাড়ি দেন (১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩০)। যাত্রার পূর্বদিন আমেরিকার বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী রুথ ডেনিসের (Ruth St. Denis) সঙ্গে ব্রডওয়ে থিয়েটারে কবি তাঁহার এক নৃত্যকাব্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বিখ্যাত চিন্তাবিদ উইল ডুরাণ্ট্‌ কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া এই অনুষ্ঠানে একটি ক্ষুদ্র ভাষণও দেন।

এই প্রসঙ্গে সর্বশেষে একটি কথা। প্রধানত বিশ্বভারতীর জন্য বক্তৃতা করিয়া অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যেই কবি এবার আমেরিকার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করিবাব বিষয়, আমেরিকানদের মনস্তুষ্টি করিয়া বা মন-ভোলানর মত করিয়া

তিনি কথা বলেন নাই। ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামকে মার্কিন পুঁজিপতি ও প্রতিক্রিয়াশীলগোষ্ঠী মোটেই ভাল চোখে দেখে না, কবি তাহা ভাল করিয়াই জানিতেন আর সোভিয়েত রাশিয়ার প্রসংশা তো তাহারা শুনিতেই পারে না। অথচ এবার আমেরিকা ভ্রমণকালে তিনি তাঁহার অধিকাংশ বিবৃতি ও বক্তৃতাতেই তাহাই করিলেন। সুতরাং মার্কিন পুঁজিপতিগোষ্ঠীর একান্ত বশম্বদ সংবাদপত্রগুলি যে তাঁহার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার ও কুৎসা রটনা করিবে তাহাতে আশ্চর্যের কি! কবি তাহাতে অত্যন্ত আঘাত ও দুঃখ পাইয়াছিলেন, তবে এই দুঃখের মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনার বিষয় ছিল এই যে, জে টি. স্যাণ্ডারল্যাণ্ড, উইল ডুরাণ্ট্ প্রমুখ ভারত-প্রেমিক ও মুষ্টিমেয় মার্কিন বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে তিনি হৃদ্যতাপূর্ণ ভাল ব্যবহার পাইয়াছিলেন।

আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের এই শেষ সফর!

বিলাতে শেষবার

২২শে ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে পৌঁছান। বিলাতে পুনরায় আসার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল, বিশ্বভারতীর জন্য কিছু অর্থসংগ্রহ করা। কিছুকাল পূর্বে তাঁহার বিলাতের বন্ধুরা বিশ্বভারতীর আর্থিক সাহায্যের জন্য 'মাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় একটি আবেদন জানাইয়াছিলেন। কালীমোহন ঘোষও তখন বিলাতে এই চেষ্টাতেই ছিলেন। এ বিষয়ে কবি এবার বিলাতে কতখানি সফল হন তাহা অবশ্য জানা যায় না।

বিলাতে আসার পর তাঁহার একপক্ষ কালেরও উপর এমনিতেই অতিবাহিত হয়। অবশেষে ৮ই জানুয়ারি, ১৯৩১, লণ্ডনে All People's Associatoin-এর উদোগে হাইড্-পার্ক হোটেলে রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানাইবার জন্য এক জনসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় 'বার্নার্ড শ' সহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভার উদ্যোক্তাদের পক্ষ হইতে কবিকে 'International Good will Relation' সম্পর্কে কিছু বলিবার অনুরোধ জানান হয়। *Spectator* পত্রিকার সম্পাদক Evelyn Wrench কবিকে সভায় পরিচিত করিয়া দিলে পর তিনি ভাষণটি পাঠ করেন।

কবি প্রথমেই বিনীতভাবে তাঁহার ভাষণে বলেন যে, বিষয়টি এতই বিতর্কমূলক যে এ-বিষয়ে কিছু বলিতে তিনি ইতস্তত বোধ করিতেছেন। তিনি বলেন, প্রাচ্যবাসী হিসাবে তিনি এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পাশ্চাত্যদেশে আন্তর্জাতিক মনোভাব সৃষ্টি করা খুব কঠিন ব্যাপার। এই পথে এখানে এমন কতকগুলি বাধা আছে যেগুলি উহার বিরোধিতা বা প্রতিকূলতা সৃষ্টি করিতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার ব্যষ্টি বা ব্যক্তিগত জীবনবোধকে অত্যুগ্র করিয়া তোলা হইয়াছে। আর তা'ছাড়াও পাশ্চাত্য দেশে আছে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি—যে-রাজনীতি বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরোধ

সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়া শান্তিকে সুদূরপরাহত করিয়া তুলিয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি জাপানের উগ্র-জাতীয়তাবাদের উল্লেখ করেন। ১৯১৬ সালে জাপান ভ্রমণকালে তাহাদের পর-রাজ্যগ্রাসী জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে তিনি কিরূপ মর্মাহত হন তাহার বিস্তারিত আলোচনা করেন।

পরিশেষে ইউরোপের রাষ্ট্রনায়কদের আক্রমণশীল বা জঙ্গীবাদী রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার নামে লীগ্ অব্ নেশন্‌স্-এ তাহাদের কদর্য ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করিয়া কবি বলেন :

"I am not competent to deal with international relationships between different countries, but, as I have said, your politicians really represent the spirit of aggressiveness which leads towards separateness. I know you are trying to do something to rectify the mischief through the League of Nations, but the nations are not represented by their idealists but only by their politicians. I do not think it is right that the nations should be represented by their politicians in work which has for its object peace all through Europe. *To my mind it is like a band of robbers being asked to organize the police department.*" (*Italics—mine*)

কবির এই কথার তারিফ করিয়া সভাগৃহে করতালি ও প্রবল হাস্যরোল উঠে। উপসংহারে কবি আন্তর্জাতিকতার সাধনায় তাঁহার বিশ্বভারতীর আদর্শ ও লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করিয়া বলেন যে, তাঁহার আবেদনে সাড়া দিয়া আজ সেখানে ফ্রান্স, জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইতালি, নরওয়ে ও ইংলণ্ড, আমেরিকা হইতে প্রখ্যাত মনীষীগণ সেই সাধনায় আপনাদিগকে নিয়োজিত করিয়াছেন। মোটামুটি এই ছিল সেদিনকার কবির ভাষণের মর্মকথা। (দ্র. *Visva-Bharati Quarterly* : Vol. 8, Part-III ; 1930-31, pp. 200-01.)

বক্তৃতার শেষে বার্নার্ড শ' সেদিন রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানাইয়া বলেন :

'You know, I have always been telling my people not to listen to politicians. I have tried to do this is in my writings. But you know what uphill work it is to convince people against their own will.'

লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই বক্তৃতায় কবি পাশ্চাত্য সভ্যতার সমস্যা-সঙ্কটের জন্য জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকেই দায়ী করিয়া উহার নিন্দা করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, লীগ্ অব্ নেশন্‌স্-এ ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক কর্ণধারদের রাজনীতির প্রতি তীব্র ঘৃণা ও অনাস্থা জ্ঞাপন এবং তাহার পরিবর্তে সেখানে তিনি পৃথিবীর আদর্শবাদী ভাবুকদের প্রেরণ করিবার একটি পাল্টা-প্রস্তাব দিয়াছেন। স্মরণ রাখা দরকার, কয়েক মাস পূর্বে জেনিভাতে Prof. Zimmern-এর সহিত লীগ্ অব্ নেশন্‌স্ সম্পর্কে আলোচনাকালে কবি ঠিক অনুরূপ একটি প্রস্তাব রাখেন। এই সব মন্তব্য ও ভাষণে কবির একটি প্রবণতার দিকে ঝোঁক স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, বিশ্বসমস্যায় কোনো রাজনীতিক সমাধানে তাঁহার যেন বড়ো একটা আস্থা বা বিশ্বাস ছিল না। আর

বিশ্বভারতীর ভূমিকা সম্পর্কে তিনি যে অত্যধিক আশাবাদী ও রোমান্টিক চিন্তা-কল্পনা করিতেছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র। রবীন্দ্র-সুহৃদ স্বয়ং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কবির এই ভাষণে বিশ্বভারতী সম্পর্কে তাঁহার এই রোমান্টিক ভাবালুতার বেশ কিছুটা কড়া সমালোচনা করিলেন। তিনি বিশ্বভারতীর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদেশী অধ্যাপকদের সম্পর্কে বলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে অল্প কয়েকজনই স্বজাত্যাভিমানের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিয়াছেন। ভারতীয়দের উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদার চক্ষে দেখিতে না-পারার কারণ তাহার দাসত্ব ও পরাধীনতা। এবং এই দাসত্ব ও পরাধীনতাই তাহার সর্বাঙ্গীন বিকাশের পথে প্রধানতম বাধা। তাই তিনি বলেন যে, ভারতে যে-জাতীয়তাবাদ তাহার রাজনীতিক মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে—উহাকে যে-নামেই অভিহিত করা হউক না কেন—উহার আজ প্রয়োজন আছে। কেন না এই মুক্তি ও স্বাধীনতার পরেই পাশ্চাত্যের সঙ্গে তাহার সত্যকারের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে। তাই তিনি লিখিলেন :

"It would indeed be a blessing to India and the world abroad, if idealists and scholars, entirely free from the racial superiority complex, would come to India not only from England but other civilized independent countries as well. Superman like the poet can extort respect everywhere, and some foreigners may even seek to exploit their acquaintance with him under the cloak of some sort of idealism. But it is only very rare souls from free and independent countries who can truly love and respect the ordinary run of men and women in subject India. Our subject condition hides the fact of our common humanity and even our virtues, talents and attainments from all but the finest spirits hailing from the free West, it is difficult for the common run of free men to respect the common run of those who are in bondage. We whole-heartedly support the poet's condemnation of nationalism of the predatory and selfish type—and of the type which stands up for 'My country, right or wrong !' But passages can, we believe, be quoted from his writing and utterances to show that the nationalism—by whatever name it may be called—which seeks to make India politically free is necessary for sincere mutual friendship and respect between India and the West."

[*The Modern Review* : March, 1931. pp. 367-68]

লণ্ডনে তখন প্রথম গোল-টেবিল বৈঠক চলিতেছে। এই বৈঠকে ১৬ জন দেশীয় রাজন্যবর্গের, ১৬ জন ব্রিটিশ সদস্য এবং ব্রিটিশ ভারতের ৫৭ জন প্রতিনিধি—মোট ৮৯ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। কংগ্রেস যে এই বৈঠকে যোগ দেয় নাই, পূর্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

গোল-টেবিল বৈঠকে আলোচনাকালের প্রথমভাগে ভারতীয় প্রতিনিধিরা পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার ভিত্তিতে একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র (Federal Union Government) গঠনের প্রশ্নে সকলেই মোটামুটি ঐক্যবদ্ধভাবে মত দেন। কিন্তু ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা পার্লামেণ্টারী শাসন প্রবর্তনের বিরোধিতা করেন। অবশ্য দেশীয় রাজন্যবর্গও দুইটি শর্তে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে সম্মতি দেন। প্রথমত ব্রিটিশ ভারতকে অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে, দ্বিতীয়ত কেন্দ্রীয় সরকারকে অবশ্যই কেন্দ্রীয় আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকিতে হইবে। ভূপালের নবাব বলেন, 'We can only federate with a self-governing and federal British India.' মোটামুটি প্রায় সমস্ত সদস্যই এই নীতিতে একমত হন। কিন্তু গোল বাধে ইহার পরেই। ১৫ই জানুয়ারী স্যাঙ্কি-কমিটি (Sankey Committee)-র রিপোর্ট পেশ করার পর যখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির স্বার্থরক্ষা ও নির্বাচক অধিকার রক্ষার প্রশ্ন উঠে তখন মুসলিম সদস্যগণ ও হিন্দু তফশীল সমাজের নেতা আম্বেদকর এক জটিলতার সৃষ্টি করেন। ১৯শে জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী অনির্দিষ্ট-কালের জন্য বৈঠক স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেন। রবীন্দ্রনাথ বিলাত থাকাকালে গোল-টেবিল বৈঠক সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে আর কোনো বিবৃতি দিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। তবে ভারতীয় প্রতিনিধিরা অনেকে কবির সহিত ইংলণ্ডে সাক্ষাৎ করেন। ভারতীয় সদস্যদের মোটামুটি ঐক্যবদ্ধতায় তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন তবে সম্মেলনের সাফল্য সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেন নাই। তাছাড়া কবি যখন বিলাত ত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে রওনা হন তখনও পর্যন্ত ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ দেখা দেয় নাই।

কিন্তু আমেরিকার স্মৃতি মনকে পীড়িত করিয়া তোলে;—দেশে ফেরার কয়েকদিন পূর্বে কবি এক পত্রে লিখেন, (২৯ ডিসেম্বর, ১৯৩০):

"যতদিন য়ুরোপে ছিলুম লাগছিল ভালো। আমেরিকায় গিয়া মনটা যেন চাপা পড়ল, শরীরেও খুব একটা ধাক্কা লেগেছিল। আমেরিকায় বাইরে ব'লে পদার্থটা বড়ো বেশি উগ্র এবং চঞ্চল, কিছুদিন নিরন্তর নাড়া খাওয়ার পরে ভারী একটা বৈরাগ্য আসে।...আমেরিকায় এসে চোখে পড়ল মানুষ কতই অনাবশ্যক ব্যর্থতায় সমাজকে এক-ঝোঁকা করে তুলেছে, আবর্জনাকে ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে সাজিয়েছে, আর তারই পিছনে দিনরাত নিযুক্ত হয়ে আছে, পৃথিবীর বুকের উপর কী অভ্রভেদী বোঝা চাপিয়েছে। এই সমস্ত জবড়জঙ্গের বিষম ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রাণ যখন অস্থির হয়ে ওঠে তখন ভিতরকার মানুষের চিরন্তনের দাবি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সন্ধ্যাবেলায় ধেনুকে গোষ্ঠে ফেরাবার মতো নিজের ছড়িয়ে-পড়া আপনাকে আপনার গভীরের মধ্যে প্রত্যাহরণ করে আনার জন্য ডাক দিচ্ছি।"...

[পথ ও পথের প্রান্তে : পত্র-৫০ : পৃঃ. ১১০]

হাইড পার্ক হোটেলে বক্তৃতার পরদিন (৯ই জানুয়ারী) নার্কাণ্ডা জাহাজে কবি দেশের পথে যাত্রা করেন। ২৫শে জানুয়ারী গভর্নমেণ্ট গান্ধীজী জওহরলাল প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলকেই মুক্তি দেন। কবি জলপথে জাহাজেই এই সংবাদ পান।

দেশে প্রত্যাবর্তন : শ্রীনিকেতন উৎসবে যোগদান

ইউরোপ-আমেরিকা ভ্রমণ শেষ করিয়া কবি দীর্ঘ এগার মাস পরে—৩০শে জানুয়ারী (১৯৩১) প্রাতে বোম্বাই বন্দরে অবতরণ করিলেন। বোম্বাই পেঁছানর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন সাংবাদিক কবিকে ছাঁকিয়া ধরিলেন। তাঁহার পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণের, বিশেষত রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যদেশের কি প্রতিক্রিয়া, গোল-টেবিল বৈঠক সম্পর্কে তাঁহার ব্যক্তিগত কি ধারণা—এইসব সাংবাদিকদের প্রশ্ন। কবি পূর্বেই সাংবাদিকদের এইসব প্রশ্নের জন্য কতকটা প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বোম্বাইয়ের *Times of India*-র প্রতিনিধির নিকট তাঁহার এবারকার বিদেশ ভ্রমণ সম্পর্কে এক দীর্ঘ বিবৃতি দেন। পরদিন উহার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

কবি তাঁহার বিবৃতিতে বলেন, 'ভারতবর্ষ আজ বৃহত্তর পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, আমার সাম্প্রতিক পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণকালে এইটি দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আর তাহা তাহার রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য নহে, পরন্তু তাহার লক্ষবস্তু অর্জনের সংগ্রামে যে-বিশেষ পন্থা অবলম্বন করিয়াছে তাহারই অন্তর্নিহিত নৈতিক আবেদন ও আকর্ষণের জন্য। ভারতবর্ষ তাহার আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া বিপ্লবের ইতিহাসে এক অভিনব নীতি সৃষ্টি করিয়াছে এবং যদি উহার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া চলা যায় তাহা হইলে সভ্যতার ইতিহাসে আমাদের জনগণের উহা সত্যই এক অবদানস্বরূপ হইবে। এই আন্দোলনে যে মহান নৈতিক মনোবল প্রদর্শিত হইতেছে—বিশেষত বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে—তাহাতে ইউরোপ-আমেরিকার এক বৃহৎ সংখ্যক মানুষ বিস্মিত হইয়া উহার গুণগান করিয়াছেন। ইহার আশু ফলাফল যাহাই হউক না কেন, বিশ্বের অপরাপর প্রান্তে ইহা যে সম্ভ্রমপূর্ণ সহানুভূতি জাগাইতে সক্ষম হইয়াছে উহা আমাদের জাতীয় জীবনকে সামাজিক ও আর্থনীতিক কার্যসূচী এবং ঐক্যবন্ধ সমবায় সহযোগিতার পথে পুনর্গঠিত করার কাজে দীর্ঘস্থায়ী উদ্যম ও শক্তিদান করিবে।'

কবি পরিষ্কার স্বীকার করেন যে, তিনি রাজনীতিজ্ঞ নহেন, সেই কারণে সে সম্পর্কে তিনি কোনো মন্তব্য করিতে চাহেন না। কিন্তু এই মহান সংগ্রামের যে নৈতিক তাৎপর্য, উহা বাহির-হইতে-পাওয়া কোনো লাভ অপেক্ষাও তাঁহার কাছে অধিক মূল্যবান মনে হয়—কেননা সে-লাভের সত্যমূল্য যাচাই হইতে এবং তাহাকে আমাদের নিজস্ব করিয়া তুলিতে দীর্ঘ সময় লাগিবে।

বাহির হইতে পাওয়া এই স্বরাজ বা স্বায়ত্বশাসন ক্ষমতার মোহের বিপজ্জনক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়া কবি বলেন :

"In fact, I believe that there is a grave danger in our presuming

that we have attained our object when some machinery of self-government is offered to us with an unwieldy system of brakes between the engine and the wheels. I do not mean to say that we must reject it but only to warn that the organisation, whatever step it may take, cannot atonce rid us of our problem, but will be a problem in itself claiming our training and wisdom, patience and heroic determination. The people, before all else, will have to be made ready for its responsibility, passing through an arduous education for attaining rational mentality and intelligent social adjustments. For freedom grows with the growth of life, it needs opportunity for widening experiences and not a borrowed automation which works according to prescribed rules and turns out standardised commodities."

নূতন কথা নয়—বহুকাল হইতেই কবি এই কথাই বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন ভাষায় বলিয়া আসিতেছেন। কংগ্রেসের সূচনাকাল হইতেই দেশের নেতারা ইংরেজের নিকট হইতে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস্' গোছের কিছু একটা স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা আদায় করিয়া লইবার জন্য তাহাদের সকল শক্তি ও উদ্যমকে নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। কবি বাহির-হইতে-পাওয়া এই ধরনের রাজনীতিক ক্ষমতার কার্যকারিতা সম্পর্কে বিশেষ আস্থা রাখিতেন না। কবির স্থির বিশ্বাস, স্বাধীনতার সংগ্রাম জাতির এক সুদীর্ঘ সাধনার পথ ; দেশ ও জাতিকে স্বাবলম্বী ও আত্মশক্তিতে বলীয়ান করিয়া তোলাই সেই সাধনার পথ। ব্যাপক জনশিক্ষা, ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ এবং আর্থনীতিক পুনর্গঠনের পথে দেশকে স্বাবলম্বী করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি দেশ-নেতাদের কাছে দীর্ঘকাল হইতে আবেদন জানাইয়া আসিতেছিলেন।

যাহাই হউক, ইহার পর 'গোল-টেবিল বৈঠকের' সম্পর্কে কবি তাঁহার বিবৃতিতে বলেন :

"As to Round Table Conference it began amazingly well and it caused us glad surprise when our Indian Princes in a dignified spirit of patriotism joined us whole-heartedly in our cause. Also the representatives of the untouchables spoke nobly and helped us in offering a united front at the Conference, by dispelling a false atmosphere of mutual doubt and diplomacy."

কবি বিলেত পরিত্যাগের পর গোল-টেবিল বৈঠকের আলোচনায় মুসলিম সদস্যগণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা ও নির্বাচক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে স্বতন্ত্র নির্বাচক অধিকার দাবী করিলে এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ডঃ আম্বেদকরও হিন্দু তফশীল শ্রেণীগুলিকে এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসাবে গণ্য করিবার দাবী করেন। ১৯শে জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী অনির্দিষ্টকালের জন্য বৈঠক স্থগিত রাখার কথা

ঘোষণা করেন। কবি ইহার বিস্তারিত সংবাদ না পাইলেও ইহার মূল কথাটি বুঝিতে পারেন যে এই সমস্যার মূলে সেই দীর্ঘদিনের হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা। তাই তিনি বলিলেন :

"The only thing which till the end proved a formidable obstacle was our Hindu-Muslim disagreement. It has made us keenly realise the most difficult of all problems in our political life and for which we feel humiliated before the world.

"Unfortunately India is the only country to-day which has any claim to civilisation in which religious intolerance in its blind fury undermined the very foundation of our national life. It is strange that this evil which has a recent origin should not have been repudiated by our people in their present struggle for freedom which has called forth such a spirit of unflinching self-sacrifice. In all countries where lately people have commenced a new adjustment of their political organisations they have done their best to train their minds against reliogus differences causing communal dissension. In Russia where only a few years ago there were constant fights between Armenians and Mahomedans, between Christians and Jews, all such conflicts have utterly ceased···

[*Times of India*-Bombay : 31st January, 1931]

তিনি আয়ার্লাণ্ড ও কামাল আতাতুর্কের তুরস্কের কথাও উল্লেখ করেন –কি ভাবে ঐ দুটি দেশ তাহাদের উগ্র ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ-বিদ্বেষের অবসান ঘটাইতে সক্ষম হইয়াছে।

কবি আরও বলেন যে, অর্ধ-শতাব্দী পূর্বেও আমাদের দেশে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের কোনো তীব্রতা বা অবনতি দেখা দেয় নাই এবং ইহা হইতে এইটিই প্রমাণিত হয়, আমাদের মধ্যে তৃতীয় এক শাসকশক্তির উপস্থিতিই আজিকার এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। আবার যখন এই দুটি সম্প্রদায় পারস্পরিক স্বার্থ-রক্ষার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব লাভ করিবে তখন সমস্যাটি সুনিশ্চিতভাবে সহজ ও সরল হইয়া উঠিবে—এটি আজ প্রমাণিত হইয়াছে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিতে, যেখানে কদাচ সাম্প্রদায়িক বিরোধ-সংঘর্ষ হয়।

পরিশেষে কবি সোভিয়েট রাশিয়ার জনশিক্ষা-বিস্তার অভিযানে অভূতপূর্ব সাফল্য ও তাহাদের সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

বোম্বাই হইতে কবি সোজা শান্তিনিকেতনে চলিয়া আসেন। শান্তিনিকেতনে তখন শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক উৎসবের তোড়জোড় চলিতেছে। ৬ই ফেব্রুয়ারী কবি যথারীতি শ্রীনিকেতনের উৎসবের উদ্বোধন করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে শ্রীনিকেতনের লক্ষ্য ও সাধনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। কবি প্রথমেই তাঁহার ভাষণে মানবসভ্যতার লক্ষ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিলেন :

"সভ্যতা যাকে বলি তার এক প্রতিশব্দ হচ্ছে ভূমাকে প্রকাশ। মানুষের ভিতরকার যে নিহিতার্থ, যা তার গভীর সত্য, সভ্যতায় তারই আবিষ্কার চলছে।…'

"মানুষের মধ্যে নিত্যপ্রসার্যমান সম্পূর্ণতার যে আকাঙ্ক্ষা তার দুটো দিক, কিন্তু তারা পরস্পরযুক্ত। একটা ব্যক্তিগত পূর্ণতা, আর-একটা সামাজিক, এদের মাঝখানে ভেদ নেই। ব্যক্তিগত উৎকর্ষের ঐকান্তিকতা অসম্ভব। মানবলোকে যাঁরা শ্রেষ্ঠ পদবী পেয়েছেন তাঁদের শক্তি সকলের শক্তির ভিতর দিয়েই ব্যক্ত, তা পরিচ্ছিন্ন নয়। মানুষ যেখানে ব্যক্তিগতভাবে বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের সহযোগিতা যেখানে নিবিড় নয়, সেইখানেই বর্বরতা।…বহুজনের চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ-সহযোগে নিজের চিত্তের উৎকর্ষ, বহুজনের শক্তিকে সংযুক্ত ক'রে নিজের শক্তি, বহুজনের সম্পদ্‌কে সম্মিলিত করার দ্বারা নিজের সম্পদ্ সুপ্রতিষ্ঠ করাই হল সভ্য মানবের লক্ষ্য।"

[পল্লীসেবা-পল্লীপ্রকৃতি : পৃঃ ৫৮]

লক্ষ্য করিবার বিষয়, মানবসমাজে 'ব্যক্তি' ও 'সমষ্টি'র স্থান ও ভূমিকা নির্ণয়ে কবি এখানে যে-কথা বলেন ইতিপূর্বে এতো স্পষ্ট করিয়া কখনও তাহা বলেন নাই। মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত উৎকর্ষে তাঁহার যে আস্থা ও শ্রদ্ধা নাই এবং সমষ্টির উন্নতি ও উৎকর্ষের মধ্যেই ব্যক্তি যখন আপনার উৎকর্ষের সার্থকতা সন্ধান করে, তাহাকেই তিনি সভ্যসমাজের নিদর্শন বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী আছেন। আধুনিক সভ্যনামধারী বড় বড় দেশে এই মানবসম্বন্ধ যেখানে বিকৃত ও অপমানিত সেখানে শ্রেণী-বৈষম্য ও শ্রেণীশোষণ কী তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে কবি তাহার বিস্তারিত বর্ণনা করেন।

তাঁহার ধারণা, ভারতের পল্লীসমাজে একদিন এই মানবসম্পর্ক একরকম করিয়া প্রবাহিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে সেই পল্লীসমাজ আজ ধ্বংসের মুখে। এই ধ্বংসোন্মুখ পল্লীসমাজ ও পল্লীবাসীর সামগ্রিক উন্নয়নে দেশের নেতাদের মোটেই লক্ষ্য নাই, এটিই কবির গভীর আক্ষেপের বিষয়। দেশের তথাকথিত এই শিক্ষিত সমাজের এই অসামাজিক ও উৎকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করিতে গিয়া উদাহরণ স্বরূপ তিনি দেশের শিক্ষাবিধির কথা উল্লেখ করেন। কবির অভিযোগ, আজও সেখানে মাতৃভাষার যোগে শিক্ষাবিস্তারের কথা ভাবিতে গেলে দেশের বুদ্ধিজীবীরা আতঙ্কিত হইয়া উঠেন। তিনি বলিলেন :

"জ্ঞানলাভের ভাগ নিয়ে দেশের অধিকাংশ জনমণ্ডলীর সম্বন্ধে এত বড়ো অনশনের ব্যবস্থা আর-কোনো নবজাগ্রত দেশে নেই—জাপানে নেই, পারস্যে নেই, তুরস্কে নেই, ইজিপ্টে নেই। যেন মাতৃভাষা একটা অপরাধ, যাকে খৃস্টান ধর্মশাস্ত্রে বলে 'আদিম পাপ'। দেশের লোকের পক্ষে মাতৃভাষা-গত শিক্ষার ভিতর দিয়ে জ্ঞানের সর্বাঙ্গসম্পূর্ণতা আমরা কল্পনার বাইরে ফেলে রেখেছি।…

"এই উপলক্ষে এ কথা মনে রাখা দরকার যে, আধুনিক সমস্ত বিদ্যাকে জাপানি ভাষার সম্পূর্ণ আয়ত্তগম্য ক'রে তবে জাপানি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সত্য ও সম্পূর্ণ করে তুলেছে। তার কারণ, শিক্ষা বলতে জাপান সমস্ত দেশের শিক্ষা বুঝেছে—ভদ্রলোক ব'লে এক সংকীর্ণ শ্রেণীর শিক্ষা বোঝেনি। মুখে আমরা যাই

বলি, দেশ বলতে আমরা যা বুঝি সে হচ্ছে ভদ্রলোকের দেশ। জনসাধারণকে আমরা বলি ছোটোলোক; এই সংজ্ঞাটা বহুকাল থেকে আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে।...তারা ভদ্রলোকের ছায়াচর, তাদের প্রকাশ অনুজ্জ্বল। অথচ দেশের অধিকাংশই তারা, সুতরাং দেশের অন্তত বারো আনা অনালোকিত।..."

(বড় হরফ আমার)

কবির এই অভিযোগ প্রধানত দেশের রাজনৈতিক দল ও তার নেতাদের বিরুদ্ধে। মুখে তাঁহারা জনসাধারণের নাম যতই নিন-না কেন আসলে দেশের এই বৃহত্তর জনসাধারণকে শিক্ষিত ও সচেতন করার কাজে তাঁহাদের মারাত্মক ঔদাসীন্য ও অবহেলা। তাই তিনি বলিলেন :

"রাষ্ট্রীয় আলোচনার মত্ত অবস্থায় আমরা মুখে যাই কিছু বলি না কেন, দেশাভিমান যত তারস্বরে প্রকাশ করি-না কেন, আমাদের দেশ প্রকাশহীন হয়ে আছে ব'লেই কর্মের পথ দিয়ে দেশের সেবায় আমাদের এত ঔদাসীন্য। যাদের আমরা ছোটো করে রেখেছি মানবস্বভাবের কৃপণতাবশত তাদের আমরা অবিচার করেই থাকি। তাদের দোহাই দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে অর্থসংগ্রহ করি; কিন্তু তাদের ভাগে পড়ে বাক্য, অর্থটা অবশেষে আমাদের দলের লোকের ভাগ্যেই এসে জোটে। মোটা কথাটা হচ্ছে, দেশের যে অতিক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি বিদ্যা ধন মান, সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ লোকের সঙ্গে পঁচানব্বই পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। আমরা এক দেশে আছি, অথচ আমাদের এক দেশ নয়।" [ঐ : পৃঃ ৬১-৬২]

দেশের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে দেশের বিপুল নিরক্ষর গরীব জনসাধারণের এই বিচ্ছেদ ও ব্যবধান কবিকে চিরদিনই গভীরভাবে পীড়িত করিয়াছে। প্রকৃতভাবে দেশকে জানার এবং দেশের জনগণের সামাজিক, আর্থিক নৃতাত্ত্বিক, শিল্প-সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষিতদের জানার এতটুকু কৌতূহল ও অধ্যবসায় নাই। তাই গভীর দুঃখে আক্ষেপ করিয়া তিনি বলেন :

"কবি বলেছেন, 'নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে'! তিনি এই ভাবেই বলেছিলেন যে, আমরা বিদেশীয় শাসনে আছি। তার চেয়ে সত্যতর গভীরতর ভাবে বলা চলে যে, আমাদের দেশে আমরা পরবাসী,—অর্থাৎ, আমাদের জাতির অধিকাংশের দেশ আমাদের নয়। সে দেশ আমাদের অদৃশ্য, অস্পৃশ্য। যখন দেশকে মা ব'লে আমরা গলা ছেড়ে ডাকি তখন মুখে যাই বলি মনে মনে জানি, সে মা গুটিকয়েক আদুরে ছেলের মা। এই করেই কি আমরা বাঁচব? শুধু ভোট দেবার অধিকার পেয়েই আমাদের চরম পরিত্রাণ?"

উপসংহারে কবি শ্রীনিকেতনের আদর্শ ও সাধনার বাণীকে সার্থক ও সফল করিবার আহ্বান জানাইয়া বলিলেন :

"এই দুঃখেই দেশের লোকের গভীর ঔদাসীন্যের মাঝখানে, সকল লোকের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে, এখানে এই গ্রাম-কয়টির মধ্যে আমরা প্রাণ-উদ্‌বোধনের যজ্ঞ করেছি। যাঁরা কোনো কাজই করেন না তাঁরা অবজ্ঞার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে পারেন এতে কতটুকু কাজই বা হবে। স্বীকার করতেই হবে তেত্রিশ কোটির ভার নেবার যোগ্যতা আমাদের নেই। কিন্তু তাই ব'লে লজ্জা করব না। কর্মক্ষেত্রের

পরিধি নিয়ে গৌরব করতে পারব এ কল্পনাও আমাদের মনে নেই, কিন্তু তার সত্য নিয়ে যেন গৌরব করতে পারি। কখনো আমাদের সাধনায় যেন এ দৈন্য না থাকে যে, পল্লীর লোকের পক্ষে অতি-অল্প-টুকুই যথেষ্ট। ওদের জন্যে উচ্ছিষ্টের ব্যবস্থা করে যেন ওদের অশ্রদ্ধা না করি। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্—পল্লীর কাছে আমাদের আত্মোৎসর্গের যে নৈবেদ্য তার মধ্যে শ্রদ্ধার যেন কোনো অভাব না থাকে।"

[ঐ : পৃঃ ৬৫ ৬৬]

পরদিন উৎসবে গ্রামবাসীদের সম্মেলনে কবি এক ভাষণ দেন। এই ভাষণে তাঁহার সাম্প্রতিক বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার দুটি দিকই আলোচনা করেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা যেখানে মানবের জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারে অতুল সম্পদরাশি অবদান দিয়াছে তিনি তাহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। অপরদিকে তিনি সেখানকার পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইলেন, কিভাবে উহা সামাজিক ও মানবিক সম্পর্ককে পদদলিত করিয়া শ্রমজীবী মানুষকে কলে বা যন্ত্রে পরিণত করিয়াছে। তিনি বলিলেন :

"পশ্চিমদেশ যে-সম্পদ সৃষ্টি করেছে সে অতিবিপুল প্রচণ্ডশক্তিসম্পন্ন যন্ত্রের যোগে। ধনের বাহন হয়েছে যন্ত্র, আবার সেই যন্ত্রের বাহন হয়েছে মানুষ। হাজার হাজার, বহু শতসহস্র।...

..."যন্ত্রযোগে যে-শক্তি প্রবল হয়ে ওঠে তার দ্বারা এমনি করে সমস্ত পৃথিবীকে সে অভিভূত করেছে, বিদেশের এত লোককে তার নিজের দাসত্বে ব্রতী করতে পেরেছে—তার এত অহংকার। আর, সেই সঙ্গে এমন অনেক সুযোগসুবিধা আছে যা বস্তুত মানুষের জীবনযাত্রার পথে অত্যন্ত অনুকূল। সেগুলি ঐশ্বর্যযোগে উদ্ভূত হয়েছে। এগুলিকে চরম লাভ বলে মানুষ সহজেই মনে করে। না মনে ক'রে থাকতে পারে না। এর কাছে সে বিকিয়ে দিয়েছে মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস, সে হল মানবসম্বন্ধ।

"এ-কথা সত্য, একটা প্রকাণ্ড দানবীয় ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ আপনার শক্তিকে অনুভব করে। সেও বহুমূল্য, আমি তাকে অবজ্ঞা করব না। কিন্তু সেই শক্তিবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যদি মানুষী সম্বন্ধ-বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্রে কেবলই সংকীর্ণ হতে থাকে তবে সেই শক্তি শক্তিশেল হয়ে উঠে মানুষকে মারে, মারবার অস্ত্র তৈরি করে, মানুষের সর্বনাশ করবার জন্য ষড়যন্ত্র করে, অনেক মিথ্যায় সৃষ্টি করে, অনেক নিষ্ঠুরতাকে পালন করে, বিষবৃক্ষের বীজ বপন করে সমাজে। এ হতেই হবে। দরদ যখন চলে যায়, মানুষ অধিকাংশ মানুষকে যখন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মতো দেখতে অভ্যস্ত হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষকে যখন দেখে 'তারা আমার কলের চাকা চালিয়ে আমার কাপড় সস্তা করবে, আমার খাবার জুগিয়ে দেবে, আমার ভোগের উপকরণ সুগম করবে'—এইভাবে যখন মানুষকে দেখতে অভ্যস্ত হয় তখন তারা মানুষকে দেখে না, মানুষের মধ্যে কলকে দেখে।"

[রবীন্দ্র-রচনাবলী : ২০শ খণ্ড : পৃঃ-৩৫৩-৫৫]

এই পুঁজিবাদী যন্ত্রসভ্যতা আজ আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলেও আস্তে আস্তে

অনুপ্রবেশ করিতেছে, এ-বিষয়ে তিনি গ্রামবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহাদের সতর্ক করিয়া দিতে চাহিলেন। কিভাবে বীরভূমের ধানকল মালিকরা গরীব সাঁওতাল মজুরদের রক্ত শোষণ করিয়া চলিয়াছে তিনি তাহার এক মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়া বলিলেন :

"এখানে চালের কল আছে। সেই কল-দানবের চাকা সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা। ধনী তাদের কি মানুষ মনে করে। তাদের সুখদুঃখের কি হিসাব আছে। প্রতিদিনের পাওনা গুণে দিয়ে তার কাছে কষে রক্ত শুষে কাজ আদায় করে নিচ্ছে। এতে টাকা হয়, সুখও হয়, অনেক হয়, কিন্তু বিকিয়ে যায় মানুষের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানবত্ব।"...

একদা ভারতের গ্রাম সভ্যতার মধ্যে কি ভাবে একটি সহজ সামাজিক ও মানবিক সম্পর্ক প্রবাহিত ছিল কবি গ্রামবাসীদের সমক্ষে তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বর্ণনা করেন। কালক্রমে গ্রামের সেই সমাজ-সভ্যতা বিধ্বস্ত হইতে বসিয়াছে। আর্থিক ও বৈষয়িক দুর্গতির সাথে সাথে মানসিক পচন ও দুর্নীতি যে আজ গ্রামের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে কবি সে-সম্পর্কেও গ্রামবাসীদের সচেতন করিবার চেষ্টা করেন। গ্রামীণ-জীবন সম্পর্কে তাঁহার বাস্তব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়া কবি বলিলেন :

..."আমি গ্রামে অনেকদিন কাটিয়েছি, কোনোরকম চাটুবাক্য বলতে চাই নে। গ্রামের যে-মূর্তি দেখেছি সে অতি কুৎসিত। পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা বিদ্বেষ ছলনা বঞ্চনা বিচিত্র আকারে প্রকাশ পায়। মিথ্যা মকদ্দমার সাংঘাতিক জালে পরস্পরকে জড়িয়ে মারে। সেখানে দুর্নীতি কতদূর শিকড় গেড়েছে তা চক্ষে দেখেছি। শহরে কতগুলি সুবিধা আছে, গ্রামে তা নেই ; গ্রামের যেটা আপন জিনিস ছিল তাও আজ সে হারিয়েছে।"

পরিশেষে কবি গ্রামের সামগ্রিক জাগরণ ও পুনর্গঠনের কাজে শ্রীনিকেতনের প্রচেষ্টার সাথে সচেষ্ট ও সচেতনভাবে গ্রামবাসীদের সহযোগিতার আহ্বান জানান। আবেগকম্পিত কণ্ঠে কবি বলিলেন :

"মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা নিয়ে আজ এসেছি গ্রামবাসী তোমাদের কাছে। পূর্বে তোমরা সমাজবন্ধনে এক ছিলে, আজ ছিন্নবিছিন্ন হয়ে পরস্পরকে কেবল আঘাত করছ। আর-একবার সম্মিলিত হয়ে তোমাদের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। বাহিরের আনুকূল্যের অপেক্ষা কোরো না। শক্তি তোমাদের মধ্যে আছে জেনেই সেই শক্তির আত্মবিস্মৃতি আমরা ঘোচাতে ইচ্ছা করেছি। কেননা, তোমাদের সেই শক্তির উপর সমস্ত দেশের দাবি আছে। ভিত যতই যাচ্ছে ধ্বংসে উপরের তলায় ফাটল ধরছে—বাইরে থেকে পলস্তারা দিয়ে বেশি দিন তাকে বাঁচিয়ে রাখা চলবে না।

"এসো তোমরা, প্রার্থীভাবে নয়, কৃতীভাবে। আমাদের সহযোগী হও, তাহলেই সার্থক হবে আমাদের এই উদ্যোগ। গ্রামের সামাজিক প্রাণ সুস্থ হয়ে সবল হয়ে উঠুক। গানে গীতে কাব্যে কথায় অনুষ্ঠানে আনন্দে শিক্ষায় দীক্ষায় চিত্ত জাগুক। তোমাদের দৈন্য দুর্বলতা আত্মাবমাননা ভারতবর্ষের বুকের উপর প্রচণ্ড বোঝা হয়ে চেপে রয়েছে। আর-সকল দেশ এগিয়ে চলেছে, আমরা অজ্ঞানে অশিক্ষায় স্থাবর হয়ে

পড়ে আছি। এ-সমস্তই দূর হয়ে যাবে যদি নিজের শক্তিসম্বলকে সমবেত করতে পারি। আমাদের এই শ্রীনিকেতনে জনসাধারণের সেই শক্তিসমবায়ের সাধনা।"

[ঐ : পৃঃ-৩৫৫-৫৭]

বলা বাহুল্য, এই ভাষণে তিনি শ্রীনিকেতনের আদর্শের মূল কথাটি খুব সাধারণ-ভাবেই গ্রামবাসীদের সম্মুখে রাখিলেন। ইতিপূর্বে কবি বহুবার শ্রীনিকেতনের সামাজিক-আর্থনীতিক ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক কার্যসূচীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং শ্রীনিকেতনের বাস্তব কার্যকলাপ ও বিভিন্ন প্রচেষ্টা হইতেও স্থানীয় গ্রামবাসীরা সে-সব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু তবুও এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য না করিয়া পারা যায় না, এবং সেটি হইতেছে—এই দুটি ভাষণে তিনি প্রত্যক্ষভাবে সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে প্রায় কোনো কথাই উল্লেখ করেন নাই। অবশ্য একথা ঠিকই, ইহার কয়েকমাস আগে থেকেই 'রাশিয়ার চিঠি'র পত্রগুচ্ছ 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছিল। কিন্তু সবচেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র যেখানে—সেই শ্রীনিকেতনের উৎসব-প্রাঙ্গণে বিশেষত গ্রামবাসীদের সভায় তিনি রাশিয়ার শিক্ষা-ব্যবস্থা ও তাহার সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের প্রসঙ্গে প্রায় কোনো কথাই বলিলেন না, এটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। এ আলোচনায় আমরা পরে আসিব।

শ্রীনিকেতনের উৎসবের পর কবি কিছুদিন শান্তিনিকেতনেই কাটান। ইহার অল্পকাল পরেই 'বসন্তোৎসব'। এই বসন্তোৎসবের প্রস্তুতিতে এবার 'নবীন' নামে গীতিনাট্য বা ঋতুনাট্যের গানগুলি রচনা করিতেছিলেন। কবির মনে যেন গানের ধারা নামিয়াছে। এই সময় ইন্দিরা দেবীকে এক পত্রে লিখিতেছেন (৭ই মার্চ, ১৯৩১),

"আমি এখন আছি গান নিয়ে—কতকটা ক্ষ্যাপার মতো ভাব। আপাতত ছবির নেশাটাকে ঠেকিয়ে রেখেছি—কবিতার তো কথাই নেই। আমার যেন বধূবাহুল্য ঘটেচে—সব কটিকে একসঙ্গে সামলানো অসম্ভব।"

[চিঠিপত্র-৫ম, পত্র-৩৫ : পৃঃ-৮০]

৪ঠা মার্চ (২০ ফাল্গুন, ১৩৩৭) দোলপূর্ণিমার দিন শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসব। ঐদিন রাত্রে 'নবীন' অভিনীত হয়। কবি স্বয়ং এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। মানসিক গঠন প্রকৃতিতে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি ও শিল্পী,—এটি সব সময়ই আমাদের স্মরণে থাকা দরকার। কবির জীবনদর্শনে আনন্দ ও রসের চর্চার একটা প্রধান ভূমিকা আছে। তিনি কোনোদিনই শিল্প ও ললিতকলা চর্চাকে পৌরুষের বিরোধী বলিয়া মনে করিতেন না ; পরন্তু নিত্য আহার্য ও পানীয় গ্রহণের মতই উহাকে মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া মনে করিতেন। সোভিয়েট রাশিয়ায় বলিষ্ঠ জীবনসংগ্রামে রসের ও ললিতকলা চর্চার বিশিষ্ট মর্যাদার স্থান আছে দেখিয়া কবি অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া সেদিন দেশের তথাকথিত 'বীর-পুরুষদের' শাসাইয়াছিলেন—'অতএব আমি বীরপুরুষদের বলে রাখছি এবং তপস্বীদেরও সাবধান করে দিচ্ছি যে, দেশে যখন ফিরে যাব পুলিশের যষ্টিধারার শ্রাবণবর্ষণেও আমার নাচগান বন্ধ হবে না।'

কবির মধ্যে বাস্তববাদী ও ঘোরতর 'কেজো' মানুষটা সময় সময় অত্যন্ত সচেতন ও সক্রিয় হইয়া উঠে ; আবার পরক্ষণেই তাঁহার কবি-সত্তা ও সৌন্দর্যপিপাসু রসিক

মনটা সব-কিছুকেই নিরাসক্তভাবে ঠেলিয়া সবার উপরে আসন জাঁকাইয়া বসিয়া সোচ্চার হইয়া উঠিতে চায়। কবি তাঁহার এই পরস্পরবিরোধী মানসিক প্রবণতা ও সত্তা সম্পর্কে যে সচেতন ছিলেন না তাহা নহে, তবে সারাজীবনই তিনি উহাদের একটি সুসম সংগতি-সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং উহাকেই জীবনের সাধন-বাণী বলিয়া কৈফিয়ত দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কবি স্বয়ং তাঁহার এই মানসসত্তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা আত্মসমীক্ষা করিয়া এইসময় একটি পত্রে লিখিতেছেন (১১ই মার্চ, ১৯৩১):

"আমি···নানা কিছুকেই নিয়ে আছি—নানাভাবে নানাদিকেই নিজেকে প্রকাশ করতে আমার উৎসুক্য। বাইরে থেকে লোকে মনে ভাবে তাদের মধ্যে অসঙ্গতি আছে, আমি তা অনুভব করিনে। আমি নাকি গাই, আঁকি, ছেলে পড়াই—গাছপালা আকাশ আলোক জলস্থল থেকে আনন্দ কুড়িয়ে বেড়াই।···আমি স্বভাবতই সর্বাস্তি-বাদী—অর্থাৎ আমাকে ডাকে সকলে মিলে—আমি সমগ্রকেই মানি। গাছ যেমন আকাশের আলো থেকে আরম্ভ করে মাটির তলা পর্যন্ত সমস্ত কিছু থেকে ঋতু-পর্যায়ের বিচিত্র প্রেরণা দ্বারা রস ও তেজ গ্রহণ ক'রে তবেই সফল হয়ে ওঠে—আমি মনে করি আমারও ধর্ম তেমনি সমস্তের মধ্যে সহজ সঞ্চরণ করতে সমস্তের ভিতর থেকে আমার আত্মা সত্যের স্পর্শ লাভ ক'রে সার্থক হতে পারবে।"

[প্রবাসী-ভাদ্র ১৩৩৮ : পৃঃ-৬০১-২]

অবশ্য কবি কোনদিনই রসের আধিক্যকে প্রশ্রয় কিংবা সহ্য করিতে পারিতেন না। জ্ঞান, মনীষা এবং শিল্প-সাহিত্য ও ললিতকলা চর্চার মাধ্যমে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের সুস্থ মানস গঠনের দিকে যেমন তাঁহার নজর ছিল, তেমনি তাহাদের বলিষ্ঠ দেহগঠনের জন্য খেলাধুলো ও স্বাস্থ্যচর্চার দিকেও তাঁহার নজর কম ছিল না। কবির নিজের দৈহিক গঠন অত্যন্ত মজবুত ছিল। ছেলেবেলায় তাঁহাকে ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য ছেলেদের সাথে কুস্তিগীর ও পালোয়ানদের কাছে কুস্তি ও রীতিমত শরীরচর্চার অনুশীলন করিতে হইয়াছিল। কিছুকাল পূর্বে কানাডা থেকে ফেরার পথে জাপানে গেলে (১৯২৯) সেখাসে জুজুৎসু ও জুডোর ক্রীড়া-কসরৎ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন। জাপান থেকে ফেরার সময় তাকাগাকি সান্ নামে জাপানের এক প্রখ্যাত জুজুৎসু-বীরকে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের জুজুৎসু শিক্ষা দিবার জন্য আনিবার ব্যবস্থা করিয়া আসেন। উহার কিছুকাল পরেই তাকাগাকি শান্তিনিকেতনে আসেন। কিন্তু কবির এই মহৎ উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা শেষপর্যন্ত কী শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়া যায়, এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনী-কার এক কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :

···"কবির ইচ্ছা ছিল বাংলার ছেলে ও বিশেষভাবে বাংলার মেয়েরা এই আত্ম-রক্ষা বিদ্যাটি আয়ত্ত করে। বাংলাদেশে নারী নির্যাতন ও অপমান নিত্য ঘটনা, দুবৃত্তদের হাত হইতে আত্মরক্ষার এই সহজ অস্ত্রটি বাঙালি আনন্দে গ্রহণ করিবে ইহাই ছিল কবির আশা। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় খুলিলে ছাত্রছাত্রীরা মহোৎসাহে ব্যায়াম অভ্যাসে ব্রতী হইল—কবি প্রায়ই স্বয়ং সেইসব দেখিতে আসেন।···

"তাকাগাকি শান্তিনিকেতনে প্রায় দুই বৎসর থাকেন; তাঁহার বেতন ও আসা-

যাওয়ার খরচ প্রভৃতি ধরিলে প্রায় চৌদ্দ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে এমন-একজনকেও এই বিদ্যা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া লইবার সুযোগ-সুবিধা অবসর দেওয়া হইল না। কর্তৃপক্ষের মনে এ কথার উদয় হইল না যে তাকাগাকি চলিয়া গেলে কে উত্তরসাধক হইবে? অপিসের মনোমোহন ঘোষ নামে এক বলিষ্ঠ যুবক অতিনিষ্ঠার সহিত এই বিদ্যা শিক্ষা করে; কিন্তু অপিসী হীন ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁহাকে এই কাজ ছাড়িয়া যাইতে হয়। তারপর তাকাগাকি চলিয়া গেলে কয়েক বৎসর সিংহসদনের গদিগুলি অবহেলায় অযত্নে নষ্ট হইয়া গেল; সে-সব সরাইয়া একদিন সেখানে হইল স্টেজ ও দর্শকের জন্য আসিল বেঞ্চ। শৌর্যচর্চার স্থানে নৃত্যচর্চার কেন্দ্র হইল। রবীন্দ্রনাথের এতবড় আয়োজনের কোনো সুযোগ কেহ গ্রহণ করিল না। ...কবির জীবনে বহু ব্যর্থতা গিয়াছে—কিন্তু জুজুৎসুর ব্যর্থতার মত এমন দুর্ঘটনা বোধহয় দ্বিতীয়টি ঘটে নাই। কারণ কর্তৃপক্ষ উহা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করি..া দেন যে, আশ্রমবাসীর স্মৃতির মধ্যেও জুজুৎসুর স্থান কোথাও নাই।"

[রবীন্দ্রজীবনী-তৃতীয় খণ্ড : পৃঃ-৩৬২]

বসন্তোৎসবের পর কলিকাতায় 'নবীন' গীতিনাট্যটি মঞ্চস্থ করা এবং সেই সাথে তাকাগাকি ও তাঁহার শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের লইয়া সেখানে জুজুৎসুর ক্রীড়া-কসরৎ দেখাইবার ব্যবস্থা করা হয়।

১৬ই মার্চ (২রা চৈত্র, ১৩৩৭) কলিকাতার 'নিউ এম্পায়ার' প্রেক্ষাগৃহে তাকাগাকি তাঁহার শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থীদের লইয়া জুজুৎসু ও জুডোর ক্রীড়া কৌশল দেখাইলেন। 'সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান'—গানটি দিয়া এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। কিন্তু সেদিন আশানুরূপ দর্শক হয় নাই; অথচ ইহার পর চারদিন ঐ প্রেক্ষাগৃহেই যখন 'নবীন' গীতি-নাটিকাটি অভিনীত হয় তখন দর্শকের ভিড় হইয়াছিল। কবি ইহাতে অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি আশা করিয়াছিলেন, দেশের তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জুজুৎসুর ন্যায় একটি অমোঘ আত্মরক্ষার সংগ্রাম-কৌশল আয়ত্ত করিয়া লইবার জন্য দেশের যুবকরা সকলে অত্যন্ত আগ্রহী হইয়া ভিড় করিয়া আসিবে। কবি ইহার জন্য যে কী পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়াছিলেন পূর্বেই তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। বহু প্রচার, বিজ্ঞাপন এবং বৃত্তি ঘোষণা করিয়াও দেশের যুবকদের মধ্যে হইতে বড় একটা শিক্ষার্থী জুটে নাই অথচ কোচিন প্রভৃতি দূর দেশ হইতেও কয়েকজন শিক্ষার্থী শান্তিনিকেতন আসিয়াছিল। এদিকে তাকাগাকিকে লইয়া কবি এক সমস্যায় পড়েন। দুই বৎসর চুক্তির মেয়াদে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন। জুজুৎসু শিক্ষার এবং তাঁহার ভাতা, মাহিনা ইত্যাদি বাবদ যে অর্থব্যয় হইতেছিল, বিশ্বভারতীর সেই আর্থিক সংকট-মুহূর্তে তাহা আর বেশিদিন যোগান সম্ভবপর ছিল না। তাই কবি কলকাতায় এই ক্রীড়া প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন—এই আশায় যে, রাজনীতিপ্রিয় কলিকাতাবাসী ও পৌরপিতাগণ হয়ত ইহাতে আকৃষ্ট হইবেন। কিন্তু প্রদর্শনীর দিন তাঁহার যে শোচনীয় অভিজ্ঞতা জন্মে তাহাতে তিনি তাকাগাকিকে দেশে রাখার ব্যাপারে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। এই সময় সুভাষচন্দ্রের কথা তাঁহার মনে হয়। তাঁহার বিশ্বাস, সুভাষচন্দ্র ইহার গুরুত্ব ও মূল্য বুঝিবেন এবং তাকাগাকিকে কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীন নিযুক্ত

করিয়া কলিকাতার ছেলে-মেয়েদের জুজুৎসু শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। কবি সুভাষচন্দ্রের সহিত দেখা করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তখন কার্যোপলক্ষে কলিকাতার বাহিরে থাকায় তাঁহার সহিত দেখা হইল না। চৈত্রের শেষভাগে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন।

কিন্তু তাকাগাকির মত গুণী মানুষকে ধরিয়া রাখা বা জুজুৎসু শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে তিনি কিছু করিতে পারিলেন না, এ চিন্তা তাঁহার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে বিঁধিতেছিল। কয়েকদিন পর তাকাগাকিকে কলিকাতায় রাখার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রকে অনুরোধ জানাইয়া কবি এক পত্রে লিখিলেন :

"কল্যাণীয়েষু,

তোমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছিলুম, তুমি তখন দূরে গিয়েছিলে। তুমি জানো বহু অর্থব্যয় করে জাপানের একজন সুবিখ্যাত জুজুৎসুবিদকে আনিয়েছিলুম। দেশে বারে বারে যে দুঃসহ উপদ্রব চলছিল তাই স্মরণ করে আমি এই দুঃসাহসে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম। মনে আশা ছিল দেশের লোক সকৃতজ্ঞচিত্তে আমার দায়িত্ব লাঘব করে এই দুর্লভ সুযোগ গ্রহণ করবে। দুই বৎসরের মেয়াদ আগামী অক্টোবরে পূর্ণ হবে। কোচিন প্রভৃতি দূর দেশ থেকে শিক্ষার্থী এসেচে কিন্তু বাংলা থেকে কাউকে পাইনি। যে ব্যয়ের বোঝা আমার পক্ষে অত্যন্ত গুরুভার তাও সম্পূর্ণ হয়ে এল অথচ আমার উদ্দেশ্য অসমাপ্ত হয়েই রইল। জাপান থেকে এ রকম গুণীকে পাওয়া সহজ হবে না। য়ুরোপে আমেরিকায় জুজুৎসু শিক্ষার অধ্যবসায় কিরকম চলচে তা তুমি নিশ্চয় জানো। আমাদের নিঃসহায় দেশে এর প্রয়োজন যে কত গুরুতর তাও নিশ্চয় তোমার অগোচর নেই। এখন এই লোকটিকে তোমাদের পৌরশিক্ষা বিভাগে নিযুক্ত করবার কোনো সম্ভাবনা হতে পারে কিনা আমাকে জানিয়ো। যদি সম্ভব না হয় তাহলে একে জাপানে ফিরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবো।

আমার নববর্ষের আশীর্বাদ গ্রহণ কোরো। ইতি

৩।৪ বৈশাখ ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

(স্বাঃ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

কবির এই মহৎ প্রচেষ্টার ব্যর্থতার মনোবেদনা যে কী গভীর হইয়াছিল, এই পত্রেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এদিকে সুভাষচন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়াই কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচন লইয়া খুবই ব্যস্ত ছিলেন। তাছাড়া কবির এই পত্র তিনি যথাসময়ে পাইয়াছিলেন কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। যে কোনো কারণেই হউক, সুভাষচন্দ্রের নিকট হইতে কোনো সাড়া বা জবাব না পাইয়া কয়েকদিন পর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কেও তিনি অনুরূপ মর্মে দীর্ঘ এক পত্র দেন (২৫শে এপ্রিল)। উল্লেখযোগ্য, ১৫ই এপ্রিল বিধানচন্দ্র কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। কিন্তু উহাতেও বিশেষ ফল হইল না। শেষ-পর্যন্ত তাকাগাকিকে শান্তিনিকেতন হইতে বিদায় লইতে হয়।

এই সময়ের মধ্যে কবির দু'একটি রাজনীতিক রচনা উল্লেখযোগ্য। তিনি এই

সময় Will Durant-এর বিখ্যাত '*The Case For India*' গ্রন্থের যে সমালোচনা লেখেন উহা 'মডার্ন' রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (*Modern Review*-March, 1931 : pp. 267-8)। এবার আমেরিকা ভ্রমণকালে উইল ডুরাণ্টের সহিত কবির সাক্ষাৎ হয়। তিনি কবিকে তাঁহার ঐ পুস্তকের এক কপি উপহার দিয়া লিখিয়া দেন—You alone are sufficient reason why India should be free। বলাবাহুল্য, ভারত সরকার এই পুস্তকটি ভারতে আসা নিষিদ্ধ করিয়া দেন।

কিন্তু এই সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা 'উপসংহার' শীর্ষক 'রাশিয়ার চিঠি'র সর্বশেষ পত্র-প্রবন্ধটি। এইটি তাঁহার দেশে আসার কিছুকাল পর লেখা। রাশিয়া ভ্রমণের পর কবি তাঁহার বিবৃতি ও চিঠিপত্রে সোভিয়েট রাশিয়ার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করায় তিনি তাঁহার আমেরিকান ও জার্মান বন্ধুদের সমালোচনার পাত্র হন, এই বলিয়া যে, তিনি বলশেভিকদের সম্পর্কে পক্ষপাতিত্ব করিতেছেন। আমেরিকা ইংলণ্ড ভ্রমণের সময় এই সম্পর্কে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়, পূর্বেই তাহা বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। ইহার ফলে সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করার ব্যাপারে কবি বেশ কিছুটা সতর্ক হইয়া যান। হয়ত এই কারণেই শ্রীনিকেতনের উৎসবে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে কোন কথা বলা উচিত বোধ করেন নাই। সোভিয়েট রাশিয়ার বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া সে-সম্পর্কে তাহার বক্তব্য গুছাইয়া লিখিবার কথা তিনি চিন্তা করিতেছিলেন এবং তাহার ফলেই ঐ প্রবন্ধটি লিখিত। এটি প্রধানত তাহার ইঙ্গ-মার্কিন বন্ধুদের উদ্দেশে লেখা তাই প্রথমে এটি ইংরেজীতেই লিখিবার কথা চিন্তা করেন কিন্তু শেষপর্যন্ত বাংলাতেই লেখেন। ১লা বৈশাখ ইন্দিরা দেবীকে এক পত্রে লিখিতেছেন,—"বৈশাখের প্রবাসীতে মদ্রচিত যে সোভিয়েট-নীতি বেরিয়েচে সেটা তোকে তর্জমা করতে বলতে অত্যন্ত করুণা এবং কুণ্ঠা বোধ করছি।"—ইহার দুইদিন পর আর একটি পত্রে তাঁহাকে লিখিলেন (৩রা বৈশাখ, ১৩৩৮) :

"প্রবাসীতে যে চিঠিটা বেরিয়েচে বিশেষ কারণে তার জরুরিত্ব আছে। আমার আমেরিকান ও জার্মান বন্ধুরা আমার বলশেভিক-পক্ষপাত নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেচে। আমার ঠিক মনের ভাবটিকে তাদের অবিলম্বে বোঝানো দরকার। এই চিঠিখানা সেই উদ্দেশ্যেই লিখিত। একবার ভেবেছিলুম ইংরেজিতেই লিখব। কিন্তু অত্যন্ত দায়ে না পড়লে ঐ ভাষায় লিখতে আমার মন সায় দেয় না।"...

[চিঠিপত্র-৫ম, পত্র-৩৭ : পৃঃ-৮২]

ইহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়, কবি কেন এই সময় সোভিয়েট রাশিয়ার সম্পর্কে কোনো বিক্ষিপ্ত মন্তব্য করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেন। এই পত্র-প্রবন্ধটির মূল বক্তব্যগুলি পূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সোভিয়েট রাশিয়ার সম্পর্কে তাঁহার ধারণার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নাই, তবে সেখানকার একনায়কত্ব ও অতিরিক্ত বল-প্রয়োগ-নীতিকে তিনি সমর্থন করিতে পারেন নাই। তাছাড়া সেখানকার ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবলোপ ও যৌথখামার গঠন প্রভৃতি বিষয়ে বলশেভিকদের আর্থনীতিক মতাদর্শ তিনি ভাল মনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার ধারণা হয় বলশেভিকরা

সমস্ত রকম ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ ঘটাইয়া চাষীদের যৌথখামারে যোগদানে বলপ্রয়োগ করিতেছে (যদিও বলশেভিকনীতি ঠিক তাহা ছিল না)। এই কারণেই সোভিয়েটের যৌথখামার ও আর্থনীতিক মতকে তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই এবং তিনি তাঁহার পূর্বেকার সমবায়নীতিতে অটল রহিলেন। তাই ঐ প্রবন্ধের উপসংহার দেশে কৃষি-সমবায় গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানাইয়া তিনি বলিলেন :

"আমাদের দেশে আমাদের পল্লীতে পল্লীতে ধন-উৎপাদন ও পরিচালনার কাজে সমবায়নীতির জয় হোক, এই আমি কামনা করি। কারণ, এই নীতিতে যে সহযোগিতা আছে তাতে সহযোগীদের ইচ্ছাকে চিন্তাকে তিরস্কৃত করা হয় না ব'লে মানবপ্রকৃতিকে স্বীকার করা হয়। সেই প্রকৃতিকে বিরুদ্ধ করে দিয়ে জোর খাটাতে গেলে সে জোর খাটবে না।

"...রাশিয়ায় দেখেছি, গ্রামের সঙ্গে শহরের বৈপরীত্য ঘুচিয়ে দেবার চেষ্টা। এই চেষ্টা যদি ভালো করে সিদ্ধ হয় তাহলে শহরের অস্বাভাবিক অতিবৃদ্ধি নিবারণ হবে। দেশের প্রাণশক্তি চিন্তাশক্তি দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আপন কাজ করতে পারবে।

"আমাদের দেশের গ্রামগুলিও শহরের উচ্ছিষ্ট ও উদ্‌বৃত্ত-ভোজী না হয়ে মনুষ্যত্বের পূর্ণ সম্মান ও সম্পদ ভোগ করুক, এই আমি কামনা করি। একমাত্র সমবায়প্রণালীর দ্বারাই গ্রাম আপন সর্বাঙ্গীণ শক্তিকে নিমজ্জনদশা থেকে উদ্ধার করতে পারবে, এই আমার বিশ্বাস। আক্ষেপের বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে সমবায় প্রণালী কেবল টাকা ধার দেওয়ার মধ্যেই ম্লান হয়ে আছে, মহাজনী গ্রাম্যতাকেই কিঞ্চিত শোধিত আকারে বহন করছে, সম্মিলিত চেষ্টায় জীবিকা উৎপাদন ও ভোগের কাজে সে লাগল না।"

তাছাড়া ব্রিটিশের আমলাতান্ত্রিক শাসনযন্ত্র এবং দীর্ঘ পরাধীনতা-সঞ্জাত আমাদের জাতীয় চরিত্রের অবনতিও যে সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ, তাহাও তিনি যথোচিত গুরুত্ব সহকারে নির্দেশ করিতে ভুলিলেন না। কিন্তু ইহা ছাড়াও মুক্তি ও সমাধানের অন্য কোন সহজ রাস্তা নাই। তাই যত কঠিন কাজই হোক এই সমবায়নীতির সার্থক প্রয়োগ করিবার জন্য দেশকে সর্বতোভাবে চেষ্টা করিবার আহ্বান জানাইয়া কবি উপসংহারে বলিলেন :

..."যতই দুঃসাধ্য হোক, আর কোনো রাস্তা নেই, পরস্পরের শক্তিকে মনকে সম্মিলিত করবার উপলক্ষ্য সৃষ্টি করে প্রকৃতিকে শোধন করে নিতে হবে। সমবায়-প্রণালীতে ঋণ দিয়ে নয়, একত্র কর্ম করিয়ে পল্লীবাসীর চিত্তকে ঐক্যপ্রবণ করে তুলে তবে আমরা পল্লীকে বাঁচাতে পারব।"

[রবীন্দ্র-রচনাবলী-২০শ খণ্ড : পৃঃ-৩৪৭ ৪৯]

প্রশ্ন হইবে, সোভিয়েটের যৌথ-খামারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কৃষি বা পল্লী-সমবায়ের পার্থক্য কোথায় ? কবির বক্তব্য অনুসরণ করিলে মোটামুটি এই কথাটিই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, বলশেভিকদের বলপ্রয়োগনীতির পরিবর্তে চাষীদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতা ও ঐক্যচেতনা এবং সমবায়ের মাধ্যমে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা-স্বত্ব নিয়ন্ত্রিত করার কথাই তিনি চিন্তা করিতেছিলেন।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভূমিকা বা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কবি '*Wealth and Welfare*' প্রবন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছিলেন, পূর্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি। তারপর মস্কোতে যৌথ-খামারের কৃষক প্রতিনিধিদের সহিত আলাপ-আলোচনার পর কবির ধারণা হয় যে, বলপ্রয়োগের দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির একেবারে বিলোপ সাধন করিতে গেলে উহা মানবপ্রকৃতির মূলেই আঘাত করিবে। তাই তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করিবার কথাই বলিলেন। তিনি বলিলেন :

…"নিজের সম্পত্তির প্রতি নিজের মমতা, ওটা তর্কের বিষয় নয়, ওটা আমাদের সংস্কারগত। নিজেকে আমরা প্রকাশ করতে চাই, সম্পত্তি সেই প্রকাশের একটা উপায়।

"তার চেয়ে বড়ো উপায় যাদের হাতে আছে তারা মহৎ, তারা সম্পত্তিকে গ্রাহ্য করে না। সমস্ত খুইয়ে দিতে তাদের বাধা নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে আপন সম্পত্তি তার আপন ব্যক্তিস্বরূপের ভাষা—সেটা হারালে সে যেন বোবা হয়ে যায়। সম্পত্তি যদি কেবল আপন জীবিকার জন্যে হত, আত্মপ্রকাশের জন্যে না হত, তাহলে যুক্তির দ্বারা বোঝানো সহজ হত যে, ওটা ত্যাগের দ্বারাই জীবিকার উন্নতি হতে পারে।…

"এর একটা মাঝামাঝি সমাধান ছাড়া উপায় আছে বলে মনে করি নে; অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। সেই সীমার বাইরেকার উদ্‌বৃত্ত অংশ সর্বসাধারণের জন্যে ছাপিয়ে যাওয়া চাই। তাহলেই সম্পত্তির মমত্ব লুব্ধতায় প্রতারণায় বা নিষ্ঠুরতায় গিয়ে পৌঁছয় না।

"সোভিয়েটরা এই সমস্যাকে সমাধান করতে গিয়ে তাকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। সেজন্যে জবরদস্তির সীমা নেই। এ-কথা বলা চলে না যে, মানুষের স্বাতন্ত্র্য থাকবে না; কিন্তু বলা চলে যে, স্বার্থপরতা থাকবে না। অর্থাৎ নিজের জন্যে কিছু নিজস্ব না হলে নয়, কিন্তু বাকি সমস্তই পরের জন্যে হওয়া চাই। আত্ম এবং পর উভয়কেই স্বীকার করে তবেই সমাধান সম্ভব। কোনো একটা'কে বাদ দিতে গেলেই মানবচরিত্রের সঙ্গে লড়াই বেধে যায়।…" [ঐ : পৃঃ-২৯২-৯৩]

এখন প্রশ্ন হইবে, 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি' বলতে কবি কী বুঝাইতে চাহিয়াছেন—তাহার সংজ্ঞাই বা কী দাঁড়াইবে? আধুনিক যন্ত্রশিল্প, কুটিরশিল্প ও কৃষিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিন্যাস-প্রকৃতি ও ভূমিকাটিই বা (role & feature of private ownership in Land and Industry) কী? আর সমাজের কয়জনের হাতেই বা ঐ-সব সম্পত্তি আছে এবং যাহাদের আছে তাহাদের কোন-কোন শ্রেণীর হাতে কী-পরিমাণে আছে? বলা বাহুল্য, আধুনিক বৈজ্ঞানিক অর্থনীতির বা পোলিটিকেল ইকনমির এই সব সূক্ষ্ম জটিল তত্ত্বের সঙ্গে কবির তেমন পরিচয় ছিল বলিয়া মনে হয় না।

তবুও প্রশ্ন থাকিয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ কি চাষীকে জমির স্বত্ব দিবার পক্ষে ছিলেন? তিনি অবশ্য নীতিগতভাবে চাষীকে জমির স্বত্ব দিবার পক্ষে মত প্রকাশ করিলেও তাঁহার ধারণা হয় যে, ঋণগ্রস্ত চাষীকে সে-স্বত্ব দিলে এবং ব্যক্তিগতভাবে চাষ-আবাদ করিতে দিলে সে-জমি জোতদার-মহাজন শ্রেণীর হাতে গিয়া পড়িবে।

তাই তিনি সমবায়নীতিতে চাষীদের কৃষিসমবায় গঠনের নির্দেশ দেন। এ সম্পর্কে কবি 'রাশিয়ার চিঠি'র একটি পত্রে লিখিতেছেন :

..."চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে, এই ছিল আমার অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে দুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে—**জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর ; দ্বিতীয়ত, সমবায়নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না।** মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আল-বাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসীতে জল আনা একই কথা। (বড় হরফ আমার)

"কিন্তু এই দুটো পন্থাই দুরূহ। প্রথমত চাষীকে জমির স্বত্ব দিলেই সে-স্বত্ব পরমুহূর্তেই মহাজনের হাতে গিয়ে পড়বে, তার দুঃখভার বাড়বে বই কমবে না। কৃষিক্ষেত্র একত্রীকরণের কথা আমি নিজে একদিন চাষীদের ডেকে আলোচনা করেছিলুম।...তারা তখনই সমস্ত মেনে নিলে। কিন্তু বললে, আমরা নির্বোধ, এত বড়ো ব্যাপার করে তুলতে পারব কী করে।"... [ঐ : পৃঃ-২৮৪-৮৫]

স্পষ্টই বুঝা যায়, জমিদার হিসাবে সে যুগের দেশের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার (Land Tenure system) সম্পর্কে তাঁহার ধারণা থাকিলেও পরিষ্কার বৈজ্ঞানিক আর্থ-নীতিক চেতনা ি ল না। 'রায়তের কথা'য় এবং অন্যত্র বহুবার তিনি জমিদার-জোতদার-মহাজন শ্রেণীর অমানুষিক শোষণের কথা বলিয়াছেন। অথচ সমবায়-জোত গঠনের পথে ইহারাই যে প্রধানতম বাধা, এ-কথা তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ব্রিটিশের হাত থেকে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এবং সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার বিলোপের পর গণতান্ত্রিক ভূমি-সংস্কার প্রবর্তন—প্রভৃতির গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যগুলি কবি ঠিক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট যৌথ-খামারগুলি কিভাবে আস্তে আস্তে গড়িয়া উঠিতে থাকে, সংক্ষেপে তাহা বলা দরকার। ১৯১৭ সালে 'নভেম্বর বিপ্লব' বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর বলশেভিকরা কৃষিতে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবসান ঘটাইয়া সর্বাত্মক ভূমিসংস্কার আইন বলবৎ [*Decree on Land*] করে। এই আইনের ফলে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার চিরতরে অবসান ঘটে এবং উহা রাষ্ট্রের বা জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। তাছাড়া এই আইনের বলে রাষ্ট্রের কাছ থেকে বিনা পয়সায় ব্যবহারের জন্য চাষীরা ১৫০,০০০,০০০ 'ডেসিয়াটিন' জমি (অর্থাৎ ৪০০,০০০,০০০ একরেরও বেশি) পায়। এই সব জমি ছিল জারের বংশধর, জমিদার ও সামন্ত-ভূস্বামী এবং চার্চ-সংঘারামগুলির। উপরন্তু চাষীরা জমিদার ও সামন্তপ্রভুদের বাৎসরিক প্রায় ৫০০,০০০,০০০ স্বর্ণ-রুবল যে-খাজনা দিত, তাহা হইতেও তাহাদের মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু রাশিয়ার 'কুলাক' শ্রেণী বা ধনী চাষীদের হাতেও প্রচুর-জমি-জমা ছিল। ১৯১৮ সালের জুন মাসে গ্রামের গরীবদের স্বার্থে একটি আইন প্রণয়ন হয়, যাহার ফলে প্রায় ৫০,০০০,০০০ 'হেক্টর' (১ হেক্টর=প্রায় ২½ একর) জমি সেখানকার গরীব ও ছোটো চাষীর হাতে আসে। কিন্তু তবুও কুলাকদের হাতে প্রচুর জমি থাকিয়া যায়। ১৯২৩ সালে লেনিন কৃষিতে সমবায়-প্রথা প্রবর্তনের নির্দেশ দিলেন পূর্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি। প্রথমে রাষ্ট্রীয় আদর্শ খামারে ট্রাক্টর ও আধুনিক

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ করিয়া চাষীদের সমবায় বা যৌথখামার গড়িবার প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝান হয়। তারপর আস্তে আস্তে রাশিয়ার যৌথ-খামারগুলি গড়িয়া উঠিতে থাকে। ১৯২৮ সালে যৌথখামারগুলির অধীনে প্রায় ১,৩৯০,০০০ হেক্টর জমি আসে; ১৯২৯ সালে আসে প্রায় ৪,২৬০,০০০ হেক্টর জমি। এই বছরই 'Solid Collectivization' নীতি গ্রহণ করা হয়। ইহার ফলে কুলাক শ্রেণীর সমস্ত জমি যৌথখামারের অধীনে চলিয়া আসে। ১৯৩০ সালে যৌথখামারের অধীনে প্রায় ১৫,০০০,০০০ হেক্টর জমিতে চাষ-আবাদ হয়। সেখানকার শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বৈজ্ঞানিক ও উন্নততর পদ্ধতিতে চাষ-আবাদের জন্য যৌথখামার-গুলিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতেছিল। এই রকম এক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ভ্রমণে যান।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। বলশেভিকরা জার, সামন্ত-ভূস্বামী, চার্চ-সংঘারাম এবং কুলাকদের জমিগুলি ভূমিহীন ও গরীব চাষীদের মধ্যে বণ্টন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু যৌথখামারে যোগ দেওয়ার জন্য ঐ সব গরীব চাষীদের উপর ঠিক জোর বা বলপ্রয়োগের নীতি গ্রহণ করেন নাই। বরঞ্চ আস্তে আস্তে বুঝাইয়া চাষীদের যৌথখামারের উৎকৃষ্ট উৎপাদন প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, যদিও সে-নির্দেশ সর্বত্র সমানভাবে পালন করা হয় নাই। এই প্রসঙ্গে স্ট্যালিনের জীবদ্দশায় রচিত বলশেভিক পার্টির ইতিহাসে বলা হইয়াছিল :

"Having received a number of alarming signals of distortions of the Party line that might jeopardize collectivization, the Central Committee of the Party immediately proceeded to remedy the situation, to set the Party workers the task of rectifying the mistakes as quickly as possible. On March 2, 1939, by decision of the Central Committee, Comrade Stalin's article, *'Dizzy With Success'*, was published. This article was a warning to all who had been so carried away by the success of collectivization as to commit gross mistakes and depart from the Party line, to all who were trying to coerce the peasants to join the collective farms. The article laid the utmost emphasis on the principle that the formation of collective farms must be voluntary, and on the necessity of making allowances for the diversity of conditions in the various districts of the U.S.S.R. when determining the pace and methods of collectivization. Comrade Stalin reiterated that the chief of the collective-farm movement was the agricultural artel, in which only the principal means of production, chiefly those used in grain growing, are collectivized, *while household land, dwellings, part of the dairy cattle, small livestock, poultry etc. are not collectivized.* (Italics—mine)

[*History of the Communist Party of the Soviet Union* : Moscow. 1951. P. 472-73]

যতদূর জানা যায়, এখনও পর্যন্ত সেখানে যৌথখামারের চাষীদের শেষোক্ত ঐ-সব 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি' (ও-দেশের পরিভাষায় তাকে বলা হয় 'personal property') রক্ষা করা হইতেছে। কল-কারখানা-খনি-বাগিচা, জমি-জমা ইত্যাদি উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপায়গুলিকেই সেখানে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত করা হইয়াছে। সোভিয়েট রাষ্ট্র যৌথজোতকে জমির নিশ্চয়তা দিয়াছে, বিনা পয়সায় ব্যবহারের জন্য দিয়াছে মৌরুশী পাট্টা। যে সমস্ত কৃষক সংঘবদ্ধ হইয়া যৌথজোত গঠন করে তাহাদের যৌথজোত সম্পত্তির ষোল আনা মালিক তাহারাই। তাছাড়া নিজের উপরি অর্থনীতি চালাইয়া যাইবার জন্য একটি যৌথজোত পরিবার যৌথজোত থেকে বসতবাটি ছাড়াও একখণ্ড জমি পায়। রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েট ইউনিয়নে সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত এইসব বিধি-ব্যবস্থার কথা বিস্তারিত জানিতে পারেন নাই বলিয়াই মনে হয়। এই প্রসঙ্গে সর্বশেষে একটি কথা, শুধু রবীন্দ্রনাথই নহেন—কৃষিতে সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থার অবলোপ ও গণতান্ত্রিক ভূমি-সংস্কারের দাবীতে তখনও পর্যন্ত কংগ্রেস নেতাদের একটি কথাও বলিতে দেখা যায় না। করাচীতে তখন কংগ্রেসের ঐতিহাসিক অধিবেশন চলিতেছে। 'সমাজতন্ত্রবাদী জওহরলাল'ই করাচী কংগ্রেসে মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাবটির রচনা ও পেশ করেন। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার, ঐ-প্রস্তাবে চাষীদের খাজনা ও ভূমিরাজস্ব কমানর (ক্ষেত্রবিশেষে মকুবের) প্রতিশ্রুতি থাকিলেও জমিদারী প্রথা ও সামন্ত-তান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থার অবলোপ ও গণতান্ত্রিক ভূমি-সংস্কারের ব্যাপারে পরিষ্কার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কিছু বলা হয় নাই।

দিল্লী-চুক্তি ও করাচী কংগ্রেস

ইতিমধ্যে ভারতের রাজনীতিক পরিস্থিতির দ্রুত ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড যেদিন গোল-টেবিল বৈঠক আলোচনা স্থগিত রাখিয়া ভাষণ দেন, ঐ দিনই বড়লাট আরউইন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার ভাষণে কংগ্রেসকে সহযোগিতার জন্য পরোক্ষে আবেদন জানান। অল্পকাল পরেই—২৬শে জানুয়ারি, গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতারা মুক্তি পান। স্যার তেজবাহাদুর ও জয়াকর প্রমুখ মডারেট নেতারা বিলেত হইতে স্বদেশ যাত্রার পূর্বেই গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতাদের এক তারবার্তায় আবেদন জানান যে, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ-আলোচনার পূর্বেই কংগ্রেস যেন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না-করে। বস্তুত সেই সময় এলাহাবাদে 'স্বরাজভবনে' কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক অধিবেশনে সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মতিলাল নেহেরু তখন মৃত্যুশয্যায়।

৬ই ফেব্রুয়ারী মতিলাল নেহেরুর মৃত্যু হয়। ঐ দিনই শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও সপ্রু-জয়াকর-রা ভারতে পৌঁছিয়াই কংগ্রেস নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এলাহাবাদের পথে যাত্রা করেন। এলাহাবাদে পৌঁছিয়াই তাঁহারা ইংরেজ সরকারের সঙ্গে একটা আপস-আলোচনায় আসিবার জন্য গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতাদের সহিত আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। তাঁহারা গান্ধীজীকে বড়লাটের নিকট পত্র লিখিয়া সাক্ষাৎ-প্রার্থনা ও খোলাখুলি সব জিনিস আলোচনার জন্য অনুরোধ জানান। গান্ধীজী তাহাতে সম্মত হইয়া বড়লাটকে অনুরূপ মর্মে একটি পত্র দেন (১৪ই ফেব্রুয়ারী)। বড়লাট এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া গান্ধীজীকে সাক্ষাৎ-আলোচনার জন্য দিল্লীতে আহ্বান জানান।

১৭ই ফেব্রুয়ারী গান্ধী-আরউইন আপস আলোচনা শুরু হয়। কয়েকদিন পরেই গান্ধীজী জওহরলাল প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের দিল্লীতে আহ্বান করেন। আলোচনা মাঝপথে বন্ধ হয়—কিছুদিন পর পুনর্বার শুরু হয়। বিলাতের ধুরন্ধর নেতা চার্চিলের কাছে এই দৃশ্য কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল। ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া তিনি মন্তব্য করিয়া বসিলেন :

"It is alarming and also nauseating, to see Mr Gandhi, a seditious Middle Temple lawyer, now posing as a fakir of a type well known in the East, striding half-naked up the steps of the Viceregal palace, while he is still organizing and conducting a defiant campaign of civil disobedience, to parley on equal terms with the representative of the King Emperor."

যাহাই হোক, এই আলোচনায় গান্ধীজী রাজবন্দীদের মুক্তি, সমস্ত দমনমূলক ব্যবস্থার অবসান, পুলিশের অত্যাচারের উপযুক্ত তদন্তকরণ, এবং তাঁহার 'স্বাধীনতার সারাংশের' মূল কয়েকটি দাবী মানিয়া লইবার জন্য চাপ দিতেছিলেন। আন্দোলন প্রত্যাহার বা স্থগিত রাখার প্রশ্নে আলোচনার বেশ কিছুটা সময় অতি-বাহিত হয়। গান্ধীজী প্রথমেই স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, আইন অমান্য আন্দোলন চূড়ান্তভাবে বন্ধ বা প্রত্যাহার করা যাইতে পারে না। কেননা, জনসাধারণের হাতে ইহাই একমাত্র অস্ত্র ;—বড়জোর ইহা 'স্থগিত রাখা' (Suspend) যাইতে পারে। বড়লাট আরউইন এই শব্দটিতে আপত্তি প্রকাশ করিলেন। শেষ পর্যন্ত 'আপাতত প্রত্যাহার' বা discontinued শব্দটি গৃহীত হয়। ৪ঠা মার্চ মধ্য-রাত্রে গান্ধীজী বড়লাট ভবন হইতে ফিরিয়া ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সম্মুখে আপসের প্রস্তাবগুলি রাখিলেন। জওহরলাল ও বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ কয়েকজন নেতা প্রথমে নানাভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করিলেও শেষপর্যন্ত উহা মানিয়া লইতে সম্মত হন। ৫ই মার্চ মধ্যাহ্নে বড়লাট ভবনে ঐতিহাসিক 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি' (বা 'দিল্লী-চুক্তি') স্বাক্ষরিত হয়।

এই চুক্তির ফলে কংগ্রেসের পক্ষে গান্ধীজী যাহাতে সম্মতি দেন সংক্ষেপে তাহা এই :

(১) আইন অমান্য আন্দোলন আপাতত স্থগিত রাখা হইল

(২) শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত প্রশ্নে, গভর্নমেণ্টের সম্মতিক্রমে, ভবিষ্যৎ আলোচনার সীমা এইভাবে নির্দিষ্ট হইবে যে, গোল-টেবিল বৈঠকে ভারতের নিয়মতান্ত্রিক গভর্নমেণ্টের যে খসড়া আলোচিত হইয়াছে, তাহাই পুনরায় বিচার করা হইবে। প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় যুক্তরাষ্ট্র একটি অপরিহার্য অংশ হইবে ভারতের দায়িত্ব, সংরক্ষিত বিষয় ও রক্ষাকবচগুলি ভারতের স্বার্থের দিক হইতে নিরূপণ করা হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যথা,—দেশরক্ষা, বৈদেশিক ব্যাপার, সংখ্যালঘিষ্ঠদের অবস্থা, ভারতের ঋণ এবং পূর্ব প্রতিশ্রুতি পূরণ।

(৩) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে-সব পুলিশী অত্যাচার হইয়াছে তাহার প্রকাশ্য তদন্তাদির জন্য চাপ দেওয়া।

পক্ষান্তরে গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে যে-সব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তাহাতে আপৎকালীন সমস্ত দমনমূলক অর্ডিন্যান্স বা আদেশের প্রত্যাহার, কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ বা নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট বন্দীদের মুক্তিদান এবং মাদকদ্রব্য ও বিদেশীপণ্য বর্জন আন্দোলনে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং-এর অধিকার অনুমোদন করা হয়। তাছাড়া সমুদ্রতীরবর্তী জনসাধারণকে নিজেদের প্রয়োজন বা ব্যবহারের জন্য লবণ তৈয়ারি করার অনুমতি দেওয়া হয়।

বলা বাহুল্য, দিল্লী-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে দেশের বিভিন্ন বামপন্থী গোষ্ঠী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হন। চুক্তির দুই নম্বর ধারার সহিত লাহোর কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার সিদ্ধান্তের কোনই সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য নাই। তাঁহারা ভাবিতেছিলেন, ইহারই জন্য কি দেশ এত দুঃখ, এত অত্যাচার-লাঞ্ছনা ভোগ করিল। সুভাষচন্দ্র তখনও কারাগারে। মতিলাল নেহরু গত হইয়াছেন। সুতরাং আপস-চুক্তিতে স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য হইতে সরিয়া না-আসিতে গান্ধীজীর উপর যিনি চাপ দিতে পারিতেন, তিনি জওহরলাল নেহরু। কিন্তু তাঁহার সেই নেতৃসুলভ কঠোর ব্যক্তিত্ব ছিল না। বস্তুত জওহরলালের মধ্যে তখন একটা তীব্র মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। বিবেকের দিক হইতে চুক্তির ঐ শর্তকে তিনি কিছুতেই মানিয়া লইতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু আন্দোলনের সামগ্রিক পরিস্থিতি ও জাতীয় নেতৃত্বের ঐক্য-শৃঙ্খলার কথা বিবেচনা করিয়া শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর বিরোধিতা না-করিয়া চুক্তি অনুমোদন করেন। চুক্তির পরও তীব্র মানসিক অশান্তিতে তিনি ভুগিতেছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন :

"গান্ধীজী পরোক্ষভাবে আমার মানসিক চাঞ্চল্যের কথা জানিতে পারিলেন। পরদিন প্রভাতে প্রাতর্ভ্রমণে যাইবার সময় আমাকেও সঙ্গে যাইতে বলিলেন, আমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল আলোচনা হইল। তিনি আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, কোন গুরুতর বিষয় অথবা মূলনীতি প্রত্যাহার করা হয় নাই। তিনি সন্ধির দুই নম্বরের ধারাটিকে 'ভারতের স্বার্থ' এই কথাটির উপর জোর দিয়া এমনভাবে ব্যাখ্যা করিলেন যে, উহার সহিত আমাদের স্বাধীনতার দাবীর ঐক্যই রহিয়াছে। এই ব্যাখ্যা আমার নিকট কষ্টকল্পনা বলিয়া মনে হইল, তাঁহার যুক্তিতর্ক আমি মানিয়া লইতে পারিলাম না, তবে তাঁহার কথায় আমার মন অনেকটা শান্ত হইল।...

"দুই-এক দিন আমি সন্দেহ-দোলায় দুলিতে লাগিলাম, কি করিব বুঝিয়া

উঠিতে পারিলাম না। ঐ সন্ধির বিরুদ্ধতা করা অথবা উহা বন্ধ করার প্রশ্ন তখন আর উঠিতে পারে না। আমি বড় জোর কল্পনার দিক হইতে উহার সহিত সংশ্রব না রাখিতে পারি, কিন্তু বাস্তব ঘটনারূপে উহা আমাকে মানিয়া লইতে হইবেই। ইহাতে আমার ব্যক্তিগত অহমিকা চরিতার্থ হইতে পারে। কিন্তু বৃহত্তর সমস্যার তাহাতে কি সাহায্য হইবে? অতএব ইহাকে সৌজন্যের সহিত মানিয়া লইয়া গান্ধীজীর মতই অনুকূল ব্যাখ্যা করাই ভাল নহে কি? সন্ধির পরেই সংবাদপত্রের জন্য তিনি যে বিবৃতি দিলেন, তাহাতে ঐ ব্যাখ্যার উপর জোর দিয়া বলিলেন যে, আমরা স্বাধীনতার দাবী একটুও বর্জন করি নাই। যাহাতে তখন এবং ভবিষ্যতে কোন ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব না হয়, এজন্য তিনি লর্ড আরউইনের নিকট গিয়া বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বলিয়া আসিলেন। গান্ধীজী তাঁহাকে বলিলেন, যদি কংগ্রেস গোল-টেবিল বৈঠকে কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করে, তাহা হইলে এই ভিত্তির উপরই দাবী উপস্থিত করা যাইবে। লর্ড আরউইন অবশ্য এই দাবী স্বীকার করিয়া লইতে পারেন না, তবে ইহা দাবী করিবার অধিকার কংগ্রেসের আছে, তিনি ইহা স্বীকার করিলেন।

"মানসিক দ্বন্দ্ব ও বেদনা সত্ত্বেও আমি ঐ সন্ধি অঙ্গীকার করিয়া উহার অনুকূলে কার্য করিবার সঙ্কল্প করিলাম। কোন মধ্যপথ আমি খুঁজিয়া পাইলাম না।"

[আত্মচরিত : পৃঃ. ২৭৮-৭৯]

ইহা হইতে তাঁহার সেই সময়কার মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়।

দিল্লী-চুক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবী এবং বামপন্থীদের অন্যতম প্রধান অভিযোগ এই যে, ইহার ফলে শুধু সত্যাগ্রহী বন্দীরাই মুক্তি পাইয়াছেন। বিপ্লবপন্থী আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত অজস্র সাজাপ্রাপ্ত, অন্তরীণাবদ্ধ এবং বিচারাধীন বন্দী আছেন। তাছাড়া ভগৎ সিং-শুকদেব-দের ফাঁসির দণ্ডাদেশ মকুব এবং মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারেও কোন প্রতিশ্রুতি সরকার পক্ষ হইতে পাওয়া যায় নাই,—পরন্তু সরকার পূর্ববৎ তাঁহাদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত রহিয়াছেন। দিল্লী-চুক্তির কয়েকদিন পর সুভাষচন্দ্র মুক্তি পাইয়াই সোজা বোম্বাই গিয়া এই সব বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে গভর্নমেণ্টকে চাপ দিবার জন্য গান্ধীজীকে অনুরোধ জানান।

উহার দিন কয়েক পরেই সংবাদ প্রকাশিত হয়, গভর্নমেণ্ট ভগৎ সিং-দের ফাঁসির দণ্ডাদেশ মকুবের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই সংবাদে সমস্ত দেশ স্তম্ভিত হইয়া গেল। এই সময় সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে অনুরোধ জানান যে, ভগৎ সিং-দের ফাঁসি মকুবের প্রশ্নে, দিল্লী-চুক্তি বাতিল ঘোষণা করিয়া গভর্নমেণ্টের উপর চাপ সৃষ্টি করিতে হইবে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই করা হয় নাই।

উহার মাত্র কয়েকদিন পরেই করাচী-কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হইবার কথা। নেতারা বিভিন্ন প্রদেশ হইতে করাচীর পথে যাত্রা করিয়াছেন। অকস্মাৎ ২৪শে মার্চ প্রভাতী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ভগৎ সিং, শুকদেও ও রাজগুরুকে পূর্বরাত্রে লাহোর জেলে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে।

এই সংবাদে সারা দেশ প্রচণ্ড ক্রোধে ও আক্রোশে ফাটিয়া পড়িতে চাহিল। ২৪শে

মার্চ 'ভগৎ সিং শোকদিবস' প্রতিপালিত হয়। লাহোর বোম্বাই মাদ্রাজ এবং কলিকাতায় বিক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ জনতার সহিত পুলিশের সংঘর্ষ হয়। ফলে প্রায় দেড়শত জন নিহত ও প্রায় সহস্রাধিক আহত এবং গ্রেপ্তার হন। আবার এই শোকদিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষেই কানপুর, বেনারস প্রভৃতি শহরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাও বাধিয়া যায়।

গান্ধীজী করাচী পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গে নওজোয়ান ভারত সঙ্ঘের উদ্যোগে বিরাট এক জনতা তাঁহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া ভগৎ সিং-দের ফাঁসির জন্য তাঁহাকে দায়ী করেন। ২৬শে মার্চ নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন শুরু হয় কংগ্রেস মণ্ডপে। ঐ দিন গান্ধীজী তাঁহার ভাষণের শুরুতেই ভগৎ সিং প্রমুখ শহীদদের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াও বলেন যে, তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ থাকিলে তিনি তাঁহাদের এই কথাই বলিতেন যে, তাঁহারা ব্যর্থ ও ভুল পথেই ছুটিয়াছিলেন; হিংসাত্মক আন্দোলনের পথে দেশকে মুক্ত করা যাইবে না। তিনি তারপর বিপ্লবপন্থীদের উদ্দেশে বলেন যে, হিংসাত্মক নীতি অনুসরণ করিলে দেশের বিশাল জনগণ কখনই এমন গৌরবময় ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারিত না;—আর তাহা অহিংস সত্যাগ্রহ নীতি অবলম্বনের জন্যই সম্ভবপর হইয়াছে। গভর্নমেণ্টের আচরণ ও দমন-নীতি প্রচণ্ড প্ররোচনামূলক হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁহাদের মনে-প্রাণে অহিংস নীতি গ্রহণ করিবার আহ্বান জানান।

কিন্তু করাচী-কংগ্রেসের সূচনা-মুহূর্তে ভয়ানক উত্তেজনাকর আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। তরুণ ও যুবক প্রতিনিধিরা প্রায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। নেতারা শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, দিল্লী-চুক্তির প্রশ্নে বুঝিবা ঝড় উঠে। করাচী কংগ্রেসের এই সংকট-মুহূর্তে সুভাষচন্দ্রের অত্যন্ত- বিচক্ষণ নেতৃত্বের জন্য বামপন্থীদের এই বিদ্রোহী মনোভাব প্রশমিত হইয়াছিল। ২৭শে মার্চ করাচীতে নিঃ ভাঃ নওজওয়ান ভারত সভার সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে তিনি দেশের মুক্তি ও সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের লক্ষ্য ও পরিপ্রেক্ষিতটি রাখিয়া বলিলেন:

"To summarize what I have said, I want a Socialist Republic in India. The message I have to give is one of complete, all-round, undiluted freedom. Until the radical or revolutionary elements are stirred up we cannot get freedom, and we cannot stir up the revolutionary elements among us except by inspiring them with a new message which comes from the heart and goes straight to the heart.

"The fundamental weakness in the Congress policy and programme is that there is a great deal of vagueness and mental reservation in the minds of the leaders. Their programme is based not on radicalism but on adjustments—adjustments between landlord and the tenant, between the capitalist and the wage-earner, between the so-called upper classes and the so-called depressed classes, between men and women."

তিনি দেশের সাংগঠনিক প্রস্তুতির জন্য একটি কর্মসূচী পেশ করিতে গিয়া বলিলেন :

"I do not believe that the Congress programme can win freedom for India. The programme by which I believe freedom can be achieved is :

(1) Organization of peasants and workers on a socialistic programme.

(2) Organization of youth into Volunteer Corps under strict discipline.

(3) Abolition of the caste system and the eradication of social and religious superstitions of all kinds.

(4) Organization of women's associations for getting our womenfolk to accept the gospel and work out the new programme.

(5) Intensive programme for boycott of Br tish goods.

(6) Creation of new literature for propagating the new cult and programme."

দিল্লী-চুক্তির সমালোচনা করিয়াও তিনি বলিলেন যে, এখন উহা লইয়া সমালোচনা বা তর্ক-বিতর্ক করিয়া কোন লাভ হইবে না। বিশেষত জাতির এই সংকটমুহূর্তে কংগ্রেস নেতৃত্ব দ্বিধাবিভক্ত হইলে উহাতে ইংরেজেরই সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। তাই তিনি তাঁহার উপরোক্ত সাংগঠনিক কার্যসূচীতে দেশের তরুণ ও নওজোয়ানদের অগ্রসর হইবার আহ্বান জানাইয়া বলিলেন :

…"Consequently the best course for us will be to do some positive work which will strengthen the nation and the nation's demand. For this purpose I have outlined my programme which the more radical sections among our countrymen will do well to adopt and carry out. This will avoid unnecessary conflict with the Congress leaders at a time when such conflict may tend to weaken the people and strengthen the Government. Above all, let us have restraint and self-control even when we have to criticise others. We shall lose nothing by being courteous and restrained, and we may ga n much."

[*Selected Speeches of Subhas Chandra Bose* : P. 62-63]

২৯শে মার্চ, করাচী-কংগ্রেস অধিবেশনের শুরু হয়। এবারে সভাপতিত্ব করেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। কংগ্রেসে দিল্লী-চুক্তি ও গোল-টেবিল বৈঠকে অংশ গ্রহণ সম্পর্কেই প্রধানত আলোচনা চলে। এই সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রধান প্রস্তাবে বলা হয় :

"The Congress, having considered the provisional settlement between the Working Committee and the Government of India,

endorses it, and desires to make it clear that the Congress goal of Purna Swaraj (Complete Independence) remains intact. In the event of the way being otherwise open to the Congress to be represented at any Conference with the representatives of the British Government, the Congress delegation will work for this objective and, in particular, so as to give the Nation *control over the Defence forces,* External Affairs, finance, fiscal and economic policy, and to have a scrutiny, by an impartial Tribunal, of the financial transactions of the British Government in India and to examine and assess the obligations to be undertaken by India or England, and the right of either party to end the partnership at will and to make India free to accept such adjustments as may be demonstrably necessary in its interests.

"The Congress appoints and authorises Mahatma Gandhi to represent it at the Conference with the addition of such other delegates as the Working Committee may appoint to act under his leadership."

[*The History of the Congress :* Vol. I : P. 459]

যমনাদাস মেটা প্রস্তাবের বিরোধিতা ও আপত্তি জানাইয়া বলিলেন যে, উহাতে লাহোর কংগ্রেসের মূল সিদ্ধান্তটিই খর্বিত হইয়াছে। খান্ আব্দুল গফ্ফর খান্ নিজেকে গান্ধীজীর একান্ত অনুগামী সৈনিক বলিয়া ঘোষণা করিয়া প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য প্রকাশ্য অধিবেশনে জওহরলাল প্রস্তাবটির ভাষা ও রচনা-রীতির জন্য পেশ করিতে প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত হন, পরে অবশ্য রাজী হইয়া তাঁহার নিজস্ব বক্তব্য ব্যাখ্যা করিয়া ভাষণ দেন।

করাচী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র সত্যসত্যই এক প্রাজ্ঞোচিত সংযম ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। দিল্লী-চুক্তির সমালোচনা করিয়া তিনি বামপন্থীদের বক্তব্য পেশ করেন কিন্তু বৃহত্তর জাতীয়-ঐক্যের স্বার্থে কংগ্রেসে মূল প্রস্তাব গ্রহণে কোনো বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে চাহিলেন না। এই সম্পর্কে তিনি তাঁহার '*The Indian Struggle* গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া করাচী কংগ্রেসে তাঁহাদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন। [দ্রঃ *The Indian Struggle* : P. 206]

তাছাড়া করাচী কংগ্রেসে স্বাধীন ভারতের গঠনতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার ও অর্থনৈতিক কার্যসূচী সম্পর্কেও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উহার মাস খানেক পূর্বে জওহরলাল গান্ধীজীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া এই বিষয়ে প্রস্তাবের একটি খসড়া প্রণয়ন করেন। পরে গান্ধীজী উহা সংশোধন-পরিমার্জন করিলে পর তিনি উহা কার্যকরী সমিতিতে পেশ করেন। এই সম্পর্কে জওহরলাল লিখিয়াছেন :

..."প্রস্তাবে আমি অধিকতর উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলাম, কেননা, ইহার

বিষয়গুলিতে আমার সম্মতি ছিল, দ্বিতীয়ত ইহাতে কংগ্রেস এক অভিনব নীতি ও উদ্দেশ্য স্বীকার করিল। এতদিন কংগ্রেস খাঁটি জাতীয়তাবাদের আদর্শেই চলিয়াছে, কুটীরশিল্প ও স্বদেশীর উৎসাহ প্রদান ছাড়া অন্যান্য অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিকে পরিহার করিয়াই চলিয়াছে। করাচী প্রস্তাবে কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক পথে প্রথম পদার্পণ করিয়া একটু অগ্রসর হইল—প্রধান প্রধান ব্যবসায় ও লোকহিতকর ব্যবসায়গুলি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা, ধনীদের ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া গরীবদের ট্যাক্সের বোঝা লাঘব ইত্যাদি। অবশ্য ইহা মোটেই সোস্যালিজম নহে, যে কোন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রও এই সকল ব্যবস্থা সহজেই গ্রহণ করিতে পারে।"

[আত্মচরিত : পৃঃ. ২৮৫]

২রা এপ্রিল নব-নির্বাচিত ওয়ার্কিং কমিটির সভা হয়। এই সভায় স্থির হয়, গোল-টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের পক্ষে গান্ধীজী একাই প্রতিনিধিত্ব করিতে যাইবেন।

সত্তর বৎসর পূর্তি জন্মোৎসব

কবি বিলেত থেকে ফেরার কয়েক মাসের মধ্যেই দেশের রাজনীতিক পরিস্থিতির যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতে থাকে সে-সম্পর্কে তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে কোন মন্তব্য করিতে আমরা দেখি না। গোল-টেবিল বৈঠক ও ভারতের ভাবী শাসনসংস্কার সম্পর্কে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নেতাদের সহিত দর-কষাকষি করাই এই রাজনীতির মূল কথা। যদিও তিনি গোল-টেবিল বৈঠকে গান্ধীজীর যোগদানের পক্ষে মত প্রকাশ করেন তবু এই ধরনের রাজনীতিতে যে কবির কোন দিনই বিশেষ কোন মোহ বা আকর্ষণ ছিল না, তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি।

কলিকাতা থেকে ফিরিয়া কবি শান্তিনিকেতনেই আছেন। শান্তিনিকেতনে এবার ২৫শে বৈশাখ কবির সত্তর বৎসর পূর্তি-উৎসব উপলক্ষে উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে।

তাছাড়া কবির সত্তর বৎসর পূর্তি-উৎসব উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে এই সময় একটি আন্তর্জাতিক কমিটি গঠিত হয়। এই উৎসবের একটি অঙ্গ হিসাবে তাঁহারা Golden Book of Tagore প্রকাশ করিয়া কবিকে উপহার দিবার আয়োজন করিতে থাকেন। এই উপলক্ষে ঐ সমিতির পক্ষ হইতে পৃথিবীর নানা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে জয়ন্তী উৎসবে যোগদানের আহ্বান ও বাণী পাঠাইবার আবেদন জানাইয়া পত্র দেওয়া হয়। এই আবেদনপত্রটি ছিল এই :

২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩১

রবীন্দ্র-জন্মজয়ন্তী উৎসব ১৯৩১

Golden Book of Tagore

আগামী ৮ই মে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সত্তর বছর পূর্ণ হবে। এই উপলক্ষটি যদি সারা পৃথিবীতে তাঁর যত বন্ধু আছেন, যাঁদের জীবন তাঁর নিজের জীবনের দ্বারা

উজ্জ্বল সমৃদ্ধ মহনীয় হয়ে উঠেছে তাঁদের তাঁর কাছে সমবেত করে তবে খুবই ভাল হয়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে মন, আলো ও সুষমার সজীব প্রতীক—এক মহান মুক্ত বিহঙ্গ যা ঝড়ের বুকে ডানা মেলে ওড়ে—বাঁধভাঙা আবেগসমুদ্রের ঊর্ধ্বে উত্থিত সেই অনন্তের সঙ্গীত, এরিয়েলের স্বর্ণবীণায় যা ধ্বনিত। কিন্তু তাঁর শিল্প কখনো মানুষের দুঃখকষ্ট ও সংগ্রামের প্রতি উদাসীন থাকেনি। **রবীন্দ্রনাথ হলেন 'মহান প্রহরী'। দুর্যোগের মুহূর্তে তিনি হলেন তাঁর জাতি ও সারা জগতের মুক্ত দৃষ্টি নির্ভীক রক্ষী।** (বড় হরফ আমার)

"তাঁর রাগিণী যাঁদের মনে প্রত্যয়, আশা ও সৌন্দর্যকে লালিত করেছে সেই হাজার হাজার মানুষের হয়ে আমরা কবি, পণ্ডিত ও তাঁর অন্যান্য বন্ধুদের তাঁর সত্তর বছর পূর্তির দিনে এগিয়ে এসে তাঁকে তাঁদের মানসকুসুমের অর্ঘ্য উপহার দেবার আমন্ত্রণ জানাই। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসাবে প্রত্যেকে নিজের বাগানের একটি বৃন্ত—কবিতা, প্রবন্ধ, গ্রন্থপরিচ্ছেদ, গবেষণার অংশ, ছবি, চিন্তা ইত্যাদি—নিবেদন করতে পারেন।

"কারণ আমরা যা হয়েছি, যা সৃষ্টি করেছি তার মূলশাখাপল্লব কাব্য ও প্রেমের সেই মহান সুরধ্বনীতে সিক্ত।"

এই আবেদনের নীচে জগদীশচন্দ্র বসু, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, রোমাঁ রোলাঁ, আলবার্ট আইনস্টাইন ও কস্‌তিস্‌ পালামাস-এর স্বাক্ষর ছিল।

[দ্র. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ : পৃঃ, ১৩৬-৩৭]

কিন্তু জীবনের সায়াহ্নে আসিয়া বাঁশিতে তাঁহার যেন এক বিষণ্ণ বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত হয়। ২৩শে বৈশাখ 'জন্মদিন' ["পরিশোধ"] কবিতায় লিখিলেন :

'বিশ্বের প্রাঙ্গণে আজি ছুটি হ'ক মোর,
ছিন্ন করি দাও কর্মডোর।"

আবার তাহার পরদিনই 'পান্থ' নামক কবিতায় লিখিলেন :

"শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই,
আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই।
আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি
এ পারের খেয়ার ঘাটায়।...
রাখিতে চাহি না কিছু, আঁকড়িয়া চাহি না রহিতে,
ভাসিয়া চলিতে চাই সবার সহিতে
বিরহমিলনগ্রন্থি খুলিয়া খুলিয়া,
তরণীর পালখানি পলাতকা বাতাসে তুলিয়া।"

উৎসবের দিন দুই/তিন পূর্বে হইতেই সাংবাদিকরা বাণীর জন্য কবির নিকট যাতায়াত করিতে থাকে। ইহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কবি এসোসিয়েটেড্‌ প্রেসের মারফত একটি বাণী দেন। উহার মর্মার্থ ছিল এই :

"আধুনিক যুগের সভ্যতার ভিত্তি পরস্পরসাপেক্ষ সামাজিক এবং আর্থনীতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ; এই সভ্যতা বিভিন্ন জাতির পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে

সংহতর নবীন আদর্শ উপস্থিত করিয়াছে। যে সব জাতি পরস্পরের সংশ্রব বর্জন করিয়া আদিম জাতিসুলভ মনোবৃত্তির সহিত বিরোধমূলক আত্মপ্রাধান্যের ভাব লইয়া থাকিতে চায়, তাহারা আমাদের বর্তমান সভ্যতার মূলনীতিকে ব্যাহত করিয়া নিজেরাও দুর্গতিগ্রস্ত হইবে, অপরেরও দুঃখকষ্টের কারণ সৃষ্টি করিবে। মানব-সমাজকে যুগধর্মের অনুযায়ী নিজকে সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইবে এবং অস্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শোষণের জন্য বর্তমানে আমাদের যে দুঃখকষ্ট দেখা দিয়াছে, যাহাতে তৎসমুদয়ের লাঘব হইতে পারে, সেজন্য পরস্পরের মধ্যে মৈত্রীপূর্ণ সহযোগিতার প্রচেষ্টা গড়িয়া তুলিতে হইবে। আধুনিক সভ্যতায় বিভিন্ন জাতির পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। তাহার প্রথম ফল এই হইয়াছে যে, সুগঠিত যান্ত্রিক শক্তি এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবহারবাদের সাহায্যে প্রবলতর জাতিসমূহের পক্ষে দুর্বলকে শোষণ করিবার সুযোগ বর্ধিত হইয়াছে। শক্তিমান জাতিসমূহের লোভোৎপাদন করিয়া দুর্বলতায় জাতিনিচয় সমগ্র মানবসমাজের আতঙ্ক স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার ফলে ঐ সব দুর্বল জাতিগুলিকে বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত রাষ্ট্রীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার অনিষ্টকর মনোবৃত্তি গঠন করিতে হইতেছে। এবং ঐ মনোবৃত্তি জগতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে কৃষ্টিগত বিরোধের ভাব তীব্র করিয়া তুলিতেছে।

"যাহা হউক বিশ্বমানব সমাজের এই সব অব্যবস্থা এবং পরস্পরের মধ্যে এই সব সন্দেহ-সংশয়ের ভাব ক্ষণিক, মানবজগতে নবীন মৈত্রী সর্বত্র যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, এমন লক্ষণ সমূহ দেখা যাইতেছে। ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্তমানে যে প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে ভারত নিশ্চয়ই ঐ সত্যকে উপেক্ষা করিবে না। ভারতের স্বাধীনতা নিশ্চয়ই সমস্ত মানব জগতের স্বাধীনতার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত থাকিবে এবং তাহাতে জগতের বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের কল্যাণই সংসাধিত হইবে এবং বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্র তাহাদের সত্যের পূর্ণাভিব্যক্তির সুযোগ লাভ করিবে।"

[দ্র. -*Visva Bharati Quarterly* : Vol. 8, Part III ; 1930-31 : p. 293]

Amrita Bazar Patrika-এর জনৈক সাংবাদিক উৎসবের পূর্বদিন কবির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার অভিমত জানিতে চাহেন। তাছাড়াও অন্যান্য সাংবাদিকরা বাণীর জন্য ঘুরাফিরা করিতেছিলেন। কবি তাঁহাদের বিনয়ের সহিত বলেন, 'বাণী প্রদানে আমার বিশ্বাস নাই, উহা প্রদান করিবার মত যোগ্যতা কিংবা অধিকারও আমার নাই। যদি কেহ আমাকে কোন বিশেষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, আমি তৎসম্বন্ধে আমার নিজের মত প্রদান করিতে পারি।...

কবি বলেন, 'রাজনীতি আমার ক্ষেত্র নহে। বড় বড় রাজনীতিক প্রশ্নের সমাধান করাও আমার কর্তব্য নয়। আমি শুধু ইহাই জানি যে, আমি একজন ভারতবাসী, সেই হিসাবে ভারতমাতার প্রতি ভাবপ্রবণতাপূর্ণ অর্ঘ্য সাজাইলেই আমার কর্তব্য শেষ হয় না। আমার দেশবাসিগণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার জন্য আমার যথাশক্তি চেষ্টা করাই কর্তব্য। আপনি ইহাকে বাণী বলিতে চাহেন বলুন—কিন্তু বাণী কথাটিকে আমি ঘৃণা করি। আমার দেশবাসীর প্রতি আমার বাণী এই :

ভাবোচ্ছ্বাসে তোমাদের সকল শক্তি নষ্ট হইতে দিও না, তাহাকে কার্যে পরিণত কর। **'বন্দে মাতরম্' যথেষ্ট হইয়াছে, এখন 'বন্দে মাতরম্' স্থানে 'বন্দে ভ্রাতরম্' বল।** জাতীয় পতাকা উড়াইয়া কিংবা তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ তূলা চরকায় কাটিয়া তোমরা স্বরাজ পাইবে না, জনসাধারণের জন্য গঠনমূলক কার্যের দ্বারা এবং তোমাদের দেশবাসীকে কার্যত সেবা করিয়াই তুমি উহা অর্জন করিতে সক্ষম হইবে।'

হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান সম্পর্কে কবির অভিমত জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, 'যতদিন পর্যন্ত হিন্দু কিংবা মুসলমানের মধ্যে কোন একটি সম্প্রদায় অথবা উভয় সম্প্রদায় দীর্ঘ ভ্রাতৃবিরোধী সংগ্রামে সম্পূর্ণ ক্লান্ত হইয়া না পড়িবে, কিংবা শিক্ষার ফলে তাহাদের মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধিত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত আমি ঐ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের কোন লক্ষণ দেখি না।'

মহাত্মা গান্ধী হিন্দুদিগকে মুসলমানদের নিকট সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন, তিনি উহা সমর্থন করেন কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে কবি কিছুকাল ইতস্তত করেন, পরে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, 'যদি আন্তরিকভাবে কোন জিনিস অন্যায় বলিয়াই বুঝা যায়, আপস-নিষ্পত্তির খাতিরে তাহা মানিয়া লওয়াতে স্থায়ী শান্তি ঘটিতে পারে বলিয়া আমি মনে করি না। ব্যক্তির অথবা সম্প্রদায়ের অসঙ্গত দাবী মানিয়া লওয়া কিংবা ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে অনুচিত সুবিধা দান করা আমি স্বভাবেই ভ্রান্ত নীতি বলিয়া মনে করিয়া থাকি। উহাতে শুধু ক্ষুধাই বৃদ্ধি পাইবে এবং আরও অধিক পাইবার জন্য দাবী বাড়িবে। শেষটাতে আমরা দেখিতে পাইব যে, আমাদের অবস্থার একটুও পরিবর্তন ঘটে নাই, অথবা অবস্থা আরও খারাপ হইয়া উঠিয়াছে। লক্ষ্ণৌ চুক্তি করিয়া ভুল করা হইয়াছিল। ঐরূপভাবে তাড়াতাড়ি পাড়ি দিয়া কোন ভাল ফল লাভ করা যায় না।'

লর্ড স্যাঙ্কির (Lord Sankey) সভাপতিত্বে 'ফেডারেল্ স্ট্রাক্চার সাব্কমিটি' ভারতের শাসন সংস্কারের যে মুসাবিদা প্রণয়ন করিয়াছেন এবং ইংরেজরা শাসনতন্ত্রে তাহাদের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য যে সব রক্ষা-কবচ দাবী করিতেছিল, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে কবি মৃদু হাস্য করিয়া বলেন,—'না, ঐ সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে পারিব না, আমি কোন সংবাদপত্র পাঠ করি না। কিন্তু সময় সময় আমার যুবক বন্ধুগণ প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকেন এবং বাধ্য হইয়া ঐগুলির সম্বন্ধে আমার মত প্রকাশ করিতে হয়। আপনি যে কমিটির কথা বলিলেন, সেই কমিটির রিপোর্ট যত্নসহকারে পাঠ করিবার সময় আমি পাই, কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কল্পনাটি আমি ঠিক বলিয়াই মনে করি। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যের বাস্তবিক কোন সুদৃঢ় বন্ধনের অভাবে ঐ যুক্তরাষ্ট্রের গাঁথুনি অত্যন্ত শিথিল হইবে বলিয়াই আমি মনে করি। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্র-গভর্নমেন্টের হাতে খুব কম প্রয়োজনীয় অধিকারই থাকিবে, এবং ভারতীয় সামন্ত-রাজ্যসমূহের প্রজাগণও ব্রিটিশ প্রজাদের সহিত একই মৌলিক অধিকারের অধিকারী হইবে।'

ইংরেজদের নির্দেশিত রক্ষা কবচগুলি স্বীকার করিয়া লইয়া তিনি তাহার দেশ-

বাসীকে নূতন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিতে পরামর্শ দান করেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে কবি বলেন :

—'আমি বিস্তৃতভাবে ঐ বিষয়টির অনুধাবন করি নাই। কিন্তু আমার মনে হয়, সাধারণতঃ ইংরেজদের স্বার্থসংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই ঐ সব রক্ষাকবচ পরিকল্পিত হইয়াছে।'—ফ্রী প্রেস্

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৬শে বৈশাখ, ১৩৩৮ : ৯ই মে, ১৯৩১]

৯ই মে বিলাতের *Spectator* পত্রিকায় বর্ণ-সমস্যা সম্পর্কে কবির একটি খোলা-চিঠি প্রকাশিত হয়। মনে হয়, পত্রিকা-সম্পাদক কবির জন্মদিবস উপলক্ষে তাঁহার নিকট একটি বাণীর জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। চিঠিটি ১৭ই এপ্রিল শান্তিনিকেতন হইতে লেখা।

এই খোলা-চিঠিতে কবি ইংরেজ জাতির বর্ণ-বিদ্বেষ ও সংকীর্ণ মনোবৃত্তির তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি অবশ্য আমেরিকানদেরও সমালোচনা করিতে ছাড়েন নাই। তাঁহার বক্তব্য, ভিন্ন বর্ণের ও ভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদের লোক দেখিলেই কিংবা তাহাদের মুখে অশুদ্ধ ইংরেজী শুনিলে ইংরেজদের মনে তীব্র উত্তেজনার সঞ্চার হয়।

উপসংহারে কবি লিখিলেন :

"The stubborn insularity of the Englishman has helped him in the beginning of his career of conquest. He naturally failed to identify himself even in a slight degree with the Indian people when he ruled from a supercilious distance. This proud detachment has no doubt helped him in ruling a foreign race with a vigorous efficiency. But such an imperfect relationship in human affairs maintained by force cannot last long. At last the time inevitably comes when history has to be made great upon a positive basis of co-operation, and not merely upon the negative basis of law and order. It is not the race which can rule that has the historical fitness to survive, but the race which understands, which has the sympathetic imagination—in other words, the moral power of adaptability. After all, in the long run it will come true that the meek shall inherit the earth. Colour prejudice shows the lack of the power of social adaptation. Our own history began with it, and though India desperately tried some kind of mechanical race adjustment, she has failed in giving birth to a living political organism owing to this abnormal caste consciousness that obstructs the stream of human sympathy and spirit of mutual co-operation. This is the reason why, in spite of the fact that India has produced a series of great minds, she has not produced a great organic history ; and it has yet to be seen if such a history is in the

making in which two peoples of different colours can have a perfect bond of life from across the sea." [*The Spectator* : 9th May, 1931]

কিছুদিন পূর্বে 'আমেরিকান ফ্রেণ্ডস্ সার্ভিস কমিটি'র অনুরোধে কবি একটি বাণী পাঠান (দ্র. *The Wayfarer*)। এই বাণীতে কবি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন এবং সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ের আবেদন জানাইয়া বলেন :

"The opening of the Suez Canel has freed the path of commerce between the two great geographical divisions of the world. My appeal is to open up the channel for the commerce of culture between the Western continents and my own country, India which represents the East, for through such freedom of communication will be fulfilled a most important mission of education. Mountains and seas cannot obstruct the fact that deep in our beings we need you and you need us, for we are kin."

[*Great Thoughts* : London : April, 1931 : P. 3]

এই সময় আমেরিকায় American Tagore Association নামে সমিতি গঠিত হয় (৬ই মে, ১৯৩১)। ডাঃ হ্যারি টিম্বার্স এই সমিতির অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। কবি তাঁহারই অনুরোধে এই সমিতির উদ্দেশেও একটি বাণী পাঠান।

২৫শে বৈশাখ শান্তিনিকেতনে এক অনাড়ম্বর ও বৈদিক গাম্ভীর্যময় অনুষ্ঠানে কবির জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ঐ দিনের অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্রের জন্য কবি দুই ছত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন :

"গগনে গগনে নব নব দেশে রবি
নব প্রাতে জাগে নূতন জীবন লভি।"

এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য চীন হইতে ডাক্তার লিও ও শিল্পী মিঃ কো শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা কবির জন্মোৎসব উপলক্ষে চীনের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে কিছু উপহার প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠানে কবি সংক্ষেপে তাঁহার জীবনের মূল আদর্শটি ব্যাখ্যা করিয়া বলেন :

[দ্র. প্রবাসী-১৩৩৮ : জ্যৈষ্ঠ-ক্রোড়পত্র]

"নানা কাজ করেচি—মুখ্য ও গৌণভাবে নানা জনের মাঝখানে আপনাকে উপস্থিত করেচি। সে সমস্ত আমার সম্পূর্ণ অন্তরের পরিচয় দিয়েচে কিনা জানি না। কিন্তু একটা পরিচয় এই—আমি দার্শনিক নই, গুরু নই, নেতা নই, আমি কিছু নই, এক দিন যা বলেচি—আমি চাই না নব-বঙ্গের নবযুগের নেতা হতে। সেটা আমার অন্তর থেকে সত্য বলেছিলাম। সেটা আমার কর্ম নয়। বিধাতা আমাকে যে কাজে প্রবর্তিত করেচেন, সেটা আমি জেনেচি বুঝতে পেরেচি।··· বিচিত্রের বিচিত্র লীলাকে অন্তরের ভিতর গ্রহণ করে তাঁর উৎসবে যোগ দিয়ে কিছু যেন দিতে পারি—এই জন্য আমাদের আহ্বান। কাউকে কোন পথে প্রবর্তিত করে, কোন কঠিন স্থানে নিয়ে যাব, সে আমাদের কাজ নয়, সে জানি না।···

"আমাকে অনেকে অনেক রকম ক'রে ব'লে থাকেন, বর্ণনা ক'রে থাকেন। তত্ত্বজ্ঞানী বলেন, কেহ বা স্কুল মাস্টারের পদে বসান, কেবল ছোটদের নয়, বড়দেরও শিক্ষা দেওয়ার ভার দেন। আমি তা এড়িয়ে এসেচি। আমি বরাবর সকলকে বলি—আমাকে ভুল যেন না-বুঝেন। আমি কোন রূপ কাউকে চালনা করতে অধিকারী নই। আমি বলতে এসেছি ব'লে যাব, বাঁশি দিয়েচেন বাজিয়ে যাব। আমার কাজ প্রদোষের কথা ও প্রভাতের কথা বলা। শৈশবে আলো অন্ধকারের মিলন আমাকে যেমন মুগ্ধ করেছিল, সেদিনের কথা মনে পড়চে, আলো অন্ধকারের শুভ মিলন যে বালককে স্পর্শ করেছিল, প্রভাতের তরঙ্গে সে উদ্বেলিত হয়ে উঠেচে, সে বাণী আমার কানে পৌঁছিয়েচে, আমাকে বিচলিত করেচে। ভাল ক'রে বোঝাতে পেরেচি কি না পেরেচি, বলতে পেরেচি কি না পেরেচি—জানি না। বিশ্বের লীলাচঞ্চলতার যে স্পর্শ বালকের চিত্তকে তখন চঞ্চল করেচে, আজ পর্যন্ত সে চলেচে।...

"আজ ৭০ বৎসর বয়স হলো। হয়ত অনেক বন্ধু অনুশোচনা করেন, আমি তাঁদের সকল কাজে যোগ দেই না। যিনি লীলা করেন, তাঁর সমস্ত ফরমাসে গাম্ভীর্য থাকে না। সমুদ্রের তরঙ্গে, চপল বসন্তের হিল্লোলে, পুষ্পের পল্লবে, অরণ্যে অরণ্যে তিনি চঞ্চল। আমি তার চেয়ে গম্ভীর হব কি ক'রে! সে চঞ্চলতার ভিতর গানের সুরে তিনি আমায় ডেকেচেন। সে কাজে আমি এসেচি, এ কথা বলবার দিন এসেচে। এই ৭০ বৎসর বয়স ধরে নিজেকে পরীক্ষা ক'রে দেখেচি—নানা দিকে, নানা কর্মে, নানা ভাবে। আজকে সংশয় নাই, আমি সেই চঞ্চলের লীলার সহচর।..."

পরিশেষে কবি বলেন, "বন্ধুরা হয়ত প্রত্যাশা করেন—উচ্চ মঞ্চে চড়ে এক ঘণ্টা কিছু বলব। পৃথিবীর ধুলো মাটিতে যে ফুল ফুটেচে, শস্য জন্মেচে, মাটি থেকে যে রস নিয়েচে—তাদের ভালবেসেচি। মাটি কর্ষণ করতে করতে যারা দুঃখ পেয়েচে তাদের জন্য আমি বেদনা অনুভব করেচি। উচ্চ মঞ্চ আমার জন্য নয়—এ কথা বারংবার জানাচ্চি। সকলের বেদনার রূপকে প্রকাশ করা আমার কাজ। আমি কবি, আর কিছু নয়। এ কথা আমি কবিতায় বলেচি, ছন্দে লিখেচি '..."

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৮ বৈশাখ, ১৩৩৮ : ১১ই মে, ১৯৩১]

এই সময় দিলীপকুমার রায়কে একটি পত্রে কবি লিখিতেছেন :

"বয়স সত্তর হলো—আমার পরিচয়ের কোঠায় অনুমানের জায়গা প্রায় বাকি নেই।...এইটুকু নিঃসন্দেহে পাওয়া গেল যে, আমি কবি। কিন্তু শুধু কবি বললেও সংজ্ঞাটা অসম্পূর্ণ থাকে। কবির প্রেরণা কিসের এবং তার সাধনার শেষ ঠিকানাটা কোন্‌খানে এরও একটা পরিষ্কার জবাব চাই। সে-ও আমি জানি। আমার সব অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। বার বার ডেকেছি দেবতাকে, বার বার সাড়া দিয়েছেন মানুষ, রূপে এবং অরূপে, ভোগে এবং ত্যাগে। এই মানুষ ব্যক্তিতে এবং সেই মানুষ অব্যক্তে।

"বহুকাল আগে 'কড়ি ও কোমল'-এর একটি কবিতায় লিখেছিলুম—'মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' তার মানে হচ্চে এই, মানুষ যেখানে অমর সেখানেই বাঁচতে চাই। সেই জন্যেই মোটামোটা নামওয়ালা ছোট ছোট গণ্ডীগুলোর মধ্যে

আমি মানুষের সাধনা করতে পারি নে। স্বাজাত্যের খুঁটি গাড়ি ক'রে নিখিল মানবকে ঠেকিয়ে রাখা আমার দ্বারা হয়ে উঠল না, কেন না অমরতা তাঁরই মধ্যে যে-মানব সর্বলোকে। আমরা রাহুগ্রস্ত হয়ে মরি যেখানে নিজের দিকে তাকিয়ে তাঁর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াই।" [অনামী : পৃঃ. ৩৪৬]

সত্তর বৎসর বয়সে কবির এই আত্মসমীক্ষা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। অবশ্য এই কথাই বিভিন্নভাবে ও ভাষায় বহুবার ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আরও কথা থাকিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের এই 'মানুষের সাধনায়' মানুষকে বিমূর্ত-ভাবেই কল্পনা করা হয় নাই। উল্লেখযোগ্য, কবির এই জন্মদিনেই 'রাশিয়ার চিঠি' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'রাশিয়ার চিঠি'তে লেখকের যে আত্ম-স্বরূপ ও পরিচয় উদ্ঘাটিত হইয়াছে, সে কোনো 'সুদূরের-পিয়াসি উদাসী কবি-প্রকৃতি' নয় ;—ঘোর বাস্তববাদী ও ক্ষুব্ধ অশান্ত এক কর্মযোগী মহাপুরুষের নিদারুণ মর্মযন্ত্রণা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহার প্রতিটি পত্রে বা চিঠিতে। কবি রবীন্দ্রনাথের সেই কর্মযোগী সাধকের রূপ আমরা দেখিয়াছি স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনায় ও প্রচেষ্টায়, দেখিয়াছি শিলাইদহে, পতিসরে, কালিগ্রামে—দেখিয়াছি শ্রীনিকেতনের পল্লীপুনর্গঠন কেন্দ্রে। আরও একটি কথা। কবি মানুষের জয়গান গাহিয়াছেন,—বিশ্বমানবের মিলন ক্ষুধায় অস্থির হইয়া পৃথিবীর দেশে দেশে ঘুরিয়াছেন, ইহাও সত্য। কিন্তু কবি তো শুধু মিলনের মধুর গানই রচনা করেন নাই। জগতের যত কিছু অন্যায় অবিচার এবং পীড়ন-লুণ্ঠন-যুদ্ধ-হানাহানির বিরুদ্ধে এই 'উদাসী' কবির লেখনী ও কণ্ঠ হইতে বজ্রনির্ঘোষে অভিসম্পাত ধ্বনিত হইয়াছে ;—সেখানে রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনই আপোষহীন এক অক্লান্ত যোদ্ধা। আর যখনই কবি রবীন্দ্রনাথ অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর রুদ্র ও অগ্নিমূর্তি ধারণ করিয়াছেন, তখনই তিনি সব চেয়ে সুন্দর—সব চেয়ে দীপ্তিমান হইয়া উঠিয়াছেন।

আসলে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বহু পরস্পর-বিরোধী সত্তা ও প্রবণতার এক বিচিত্র সমাবেশ ঘটিয়াছিল আর কবি সে সম্পর্কে মোটামুটি সচেতন ছিলেন। তাই এক এক সময় প্রবল মাথা ঝাঁকুনি দিয়া বলিতেন—'আমি অন্য কিছু নই—আমি কবি।' এসব কথা আমরা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

এই সময় পারস্যরাজের নিকট হইতে কবির পারস্য ভ্রমণের নিমন্ত্রণ আসে। জন্মোৎসবের কিছুদিন পরেই তাঁহার পারস্য যাবার কথা হয় (২০শে মে, ১৯৩১)। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য ডাক্তারের নির্দেশে তখনকার মত পারস্য-যাত্রা স্থগিত রাখিতে হয়। কিছুদিন পর রথীন্দ্রনাথ পিতাকে সঙ্গে লইয়া দার্জিলিঙ-এ যান।

দার্জিলিঙ-এ কবি প্রায় মাসখানেক থাকেন। এখানে থাকিতেই তিনি বক্সা বন্দীশিবিরের বন্দীদের পক্ষ হইতে একটি অভিনন্দনপত্র পান। দেউলী, হিজলী ও বক্সা দুর্গে তখন সহস্রাধিক বাংলার যুবকদের বিনাবিচারে অন্তরীণ করিয়া রাখা হইয়াছিল। দিল্লী-চুক্তির ফলে ইহারা মুক্তি পান নাই, পূর্বেই তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। বক্সা দুর্গে বন্দীরা রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব করিয়া কবির উদ্দেশে এক অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। উহার প্রথমাংশটি এই :

"ওগো কবি,
আমরা তোমায় করি গো নমস্কার

"সুদূর অতীতের যে পুণ্যপ্রভাতক্ষণে তোমার আবির্ভাব, আজ বাংলার সীমান্তে নির্বাসনে বসিয়া আমরা বন্দীদল তোমার সেই জন্মক্ষণটিকে বন্দনা করি। আর স্মরণ করি, বিরাট মহাকালকে যিনি সেই ক্ষণটির দ্বারপথ উন্মুক্ত করিয়া এই দেশের মাটির পানে তোমাকে অঙ্গুলি ইঙ্গিতে পথ দেখাইয়াছেন।" ইত্যাদি

* * *

এই অভিনন্দনপত্র পাইয়া কবি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। তিনি দার্জিলিঙ হইতে বক্সা-বন্দীদের প্রত্যভিনন্দন জানাইয়া নিম্নলিখিত কবিতাটি পাঠাইয়া দিলেন : (১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ : দ্র. পরিশেষ) :

"নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সংগীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হতে
উন্মুখর ঊর্ধ্বস্রোতে
বন্দী বারি উচ্চারিল আলোকের কি অভিনন্দন ॥

মৃত্তিকার ভিত্তি ভেদি' অঙ্কুর আকাশে দিল আনি'
স্বসমুত্থ শক্তিবলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী।
মহাক্ষণে রুদ্রাণীর
কী বর লভিল বীর,
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্য নরের রাজধানী ॥

অমৃতের পুত্র মোরা' কাহারা শুনালো বিশ্বময়!
আত্মবিসর্জন করি' আত্মারে কে জানিল অক্ষয়!
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে
বন্দীর শৃঙ্খলছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয় ॥

[প্রবাসী : আষাঢ় ১৩৩৮ : পৃঃ ৪২৩-২৪]

কবি দার্জিলিঙ-এ থাকা কালে একদিন কবি নজরুল ইসলাম একদল কবি ও সাহিত্যিক সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। কবি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা জানান এবং নানাবিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন।

উল্লেখযোগ্য, এই সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'ম্যাট্রিকুলেশন সিলেবাস' হইতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা অবশ্য-পাঠ্য হিসাবে না-রাখিবার কথা চিন্তা করিতেছিল। রবীন্দ্রনাথ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া একটি আবেদন-বাণী পাঠান। তিনি লিখিয়াছিলেন :

"'Those who have to study Bengali must know Sanskrit for the sake of thoroughly understanding it and also for mastering its best

instrument of expression. It will be disastrous if students, whose mother tongue is Bengali, are allowed to neglect it."

[*The Hindu :* 3rd June, 1931]

জ্যৈষ্ঠের শেষে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। ১লা আষাঢ় ইন্দিরা দেবীকে শান্তিনিকেতন হইতে এক পত্রে লিখিলেন,—'বিশ্বকবি আপাতত ভূলোকেই স্থির হয়ে বসল, নিজের নাম সার্থক করবার জন্য দ্যুলোকে উধাও হবার সংকল্প তার নেই।...

[চিঠিপত্র : ৫ম খণ্ড, পত্র-৪১ : পৃঃ. ৮৫-৬]

সাম্প্রদায়িকতা : হিন্দু-মুসলমান সমস্যা

দিল্লী-চুক্তি ও করাচী কংগ্রেসের পর প্রথমদিকে জনসাধারণ ও কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে বেশ কিছুটা উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দেয়। আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত ছিল বটে তবে দেশের বিভিন্ন স্থানে উৎসাহী ছাত্র, যুবক ও তরুণেরা স্বদেশী-প্রচার এবং বিদেশী পণ্য বয়কট ও মাদকদ্রব্য বর্জনের শান্তিপূর্ণ পিকেটিং আন্দোলন শুরু করিয়া দেয়। ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের ইহা সহ্য হইবার কথা নয়। সুতরাং অচিরেই তাহাদের উপর পুলিশের লাঠি ও গুলিবর্ষণ এবং ব্যাপক হারে গ্রেপ্তারী চলিতে লাগিল।

লর্ড আরউইনের কার্যকাল শেষ হইয়া যাওয়ায় ১৮ই এপ্রিল (১৯৩১) তিনি দিল্লী ত্যাগ করিয়া যান। তাঁহার জায়গায় লর্ড উইলিংডন্ বড়লাট হইয়া আসিলেন। লর্ড উইলিংডন্ একজন অভিজ্ঞ ও ঝানু ব্যুরোক্র্যাট্। কথার মারপ্যাঁচে তিনি বুঝাইয়া দিলেন, লর্ড আরাউইন গান্ধীজী ও কংগ্রেসকে কী কী মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহা তাঁহার জানিবার কথা নয়। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেণ্টের আমলা-তন্ত্র ও পুলিশবাহিনী অত্যন্ত কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে। ফলে সারা দেশে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং-এর উপর নিষ্ঠুর আক্রমণ শুরু হইয়া যায়। বোম্বাই, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশে যে-সব এলাকায় ব্যাপক খাজনা ও কর বন্ধ আন্দোলন হইয়াছিল, সেখানকার প্রাদেশিক সরকারগুলি দিল্লী-চুক্তির কথা বিস্মৃত হইয়া বলপূর্বক রাজস্ব ও খাজনা আদায় করিতে লাগিল এবং অনাদায়ে ব্যাপক হারে কৃষকদের জমি হইতে উচ্ছেদ করা শুরু হইল। তাছাড়া বন্দীমুক্তির প্রশ্নেও গভর্নমেণ্ট কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। বিপ্লবাত্মক ও হিংসাত্মক আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত বন্দীরা কোথাও মুক্তি পাইলেন না। লর্ড আরউইন শোলাপুর মার্শাল-ল বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন কিন্তু তাহা কার্যকরী করা হয় নাই। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 'লাল কোর্তা' দলের উপরও আক্রমণ চলে। গান্ধীজী ও জওহরলালের উপর সেখানে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। বাংলা দেশে দমননীতি সব থেকে প্রবল হইয়া উঠে। প্রায় সহস্রাধিক বাংলার যুবকদের বিভিন্ন শিবিরে বিনা-বিচারে অন্তরীণ করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহাদের মুক্তি দেওয়া তো দূরের কথা উপরন্তু

বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সেখানে শত শত যুবককে গ্রেপ্তার করা হইতে লাগিল। এক কথায়, দেশের চতুর্দিক হইতে অভিযোগ আসিতে লাগিল যে স্থানীয় সরকারী কর্মচারীরা দিল্লী-চুক্তি ভঙ্গ করিতেছেন। এই সব সংবাদে গান্ধীজী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হইয়া উঠেন।

এদিকে দেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যাও অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিতে থাকে। করাচী কংগ্রেসের সময় কানপুর, বেণারস প্রভৃতি স্থানে ভয়াবহ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধিয়া যায়, পূর্বেই তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

করাচী কংগ্রেসের পর গান্ধীজী ব্যক্তিগতভাবে ও প্রকাশ্য বিবৃতিতে বলিতে থাকেন, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা বা সাম্প্রদায়িক সমস্যার একটা মীমাংসা ও সমাধান করিতে না পারিলে তিনি গোল-টেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে যাইবেন না। এই সব বিবৃতির ফলে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম সাম্প্রদায়িক নেতারা উৎসাহিত হইয়া তাঁহাদের পূর্বেকার দাবীগুলি মানিয়া লইবার জন্য দৃঢ় অনমনীয় মনোভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অপরদিকে 'ন্যাশনালিস্ট মুসলীম' কথিত একদল মুসলমান বুদ্ধিজীবী—যাঁহারা জাতীয় আন্দোলনে সমর্থন এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছিলেন, তাঁহারা জাতীয়তাবাদী মুসলিম কনফারেন্সরূপে আপনাদিগকে সংঘবদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান মতপার্থক্য দাঁড়ায় নির্বাচন-সংক্রান্ত প্রশ্নে: জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতারা যৌথ-নির্বাচনের পক্ষপাতী; পক্ষান্তরে মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলন পৃথক নির্বাচন-প্রথার দাবী জানায়।

এপ্রিলের প্রথমভাগেই দিল্লীতে মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে পৃথক নির্বাচন-প্রথা এবং জিন্নার চৌদ্দ-দফা দাবী সম্বলিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। গান্ধীজী দিল্লীতে এই সম্মেলনের নেতাদের সহিত আপস আলোচনার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহা ব্যর্থ হয়। সৌকত আলি গান্ধীজীর হাতে জিন্নার চৌদ্দ-দফা দাবী সম্বলিত প্রস্তাবটি দিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন: "These were formulated at the Muslim Conference on the 1st of January, 1929. Later on the Muslim League accepted them *in toto* and they began to be called Jinnah's fourteen points. We stand by them to-day."

জিন্নার চৌদ্দ-দফা দাবীর কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। অপরদিকে প্রায় একই সময়ে লক্ষ্ণৌ-এ স্যার আলি ইমামের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের এক সম্মেলনে যৌথ-নির্বাচন-প্রথার সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির সারমর্ম এই: 'শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার সহিত মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে একটি ঘোষণা সন্নিবদ্ধ থাকিবে; কৃষ্টি, ভাষা, ব্যক্তিগত বিধান প্রভৃতি সংরক্ষণ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দান করিতে হইবে; ভারতীয় শাসনতন্ত্রের কাঠামো হইবে যুক্তরাষ্ট্রিক এবং 'রেসিডিউয়ারী' ক্ষমতা যোগদানকারী ইউনিটগুলির হাতে অর্পণ করিতে হইবে; সরকারী চাকুরীর যথাযোগ্য অংশ হইতে যাহাতে কোন সম্প্রদায় বঞ্চিত না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া 'পাবলিক সার্ভিস কমিশন' নিম্নতম যোগ্যতার ভিত্তিতে লোক নির্বাচন করিবেন; সিন্ধুকে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিতে হইবে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানেও

একই শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করিতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্রে ও প্রদেশসমূহে প্রতিনিধি প্রেরণের প্রথা ও পরিমাণ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা এই যে, প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রেরই সর্বজনীন ভোটাধিকার, যৌথ-নির্বাচন-প্রথা, মোট জনসংখ্যার শতকরা ত্রিশ-ভাগের কম লোকসমষ্টি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র আসন সংরক্ষণ এবং প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত আসনের জন্যও তাহাদের প্রতিযোগিতা করিবার অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।' ইত্যাদি

এই সব দাবীতে ন্যাশনালিস্ট বা জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতারা অত্যন্ত দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করেন। ডাঃ আন্সারী প্রমুখ জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতারা গান্ধীজীকে একথা পরিষ্কার জানাইয়া দিলেন যে, কংগ্রেস স্বতন্ত্র বা পৃথক নির্বাচন-প্রথার শর্তে সাম্প্রদায়িক মুসলিম নেতাদের সহিত আপস করিলেও তাঁহারা উহার বিরোধিতা করিবেন।

১১ই জুন বোম্বাইয়ে ওয়ার্কিং কমিটির এক অধিবেশনে গান্ধীজী প্রস্তাব করিলেন যে, বিভিন্ন দলের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান ও বুঝাপড়া হইলেই তবে তিনি গোল-টেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে যাইবেন। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি দৃঢ়তার সহিত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তিনি সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই বলিয়া লণ্ডনে যাইবেন না ইহা হইতে পারে না,—তাঁহার সেখানে গিয়া যোগদান করা উচিত। ইহার পর মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলন ও জাতীয়তাবাদী মুসলিম সম্মেলনের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা আপস-মীমাংসার জন্য সিমলাতে উভয় দলের এক মিলিত সম্মেলন হয় (২২শে জুন, ১৯৩১); কিন্তু শেষ পর্যন্ত উহাও ব্যর্থ হয়।

দেশের সাম্প্রতিক হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা-হাঙ্গামায় এবং সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করিয়া রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। এই সময় গোল-টেবিল বৈঠকে ভারতের ভাবী রাষ্ট্রিক গঠনতন্ত্র প্রণয়নের পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার পর্যালোচনা করিয়া তিনি 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধটি (প্রবাসী: শ্রাবণ, ১৩৩৮) রচনা করেন।

হিন্দু-মুসলমান বা সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের প্রশ্নে তিনি দেশের রাজনীতিক নেতাদের সঙ্গে কখনও একমত হইতে পারেন নাই, এখনও পারিলেন না। পূর্বাপর প্রবন্ধের ন্যায় এই প্রবন্ধেও তিনি সাম্প্রদায়িক সমস্যার মূল কারণগুলি লইয়া আলোচনা করেন। তাঁহার প্রধান বক্তব্য এই যে, সমাজে, ধর্মে, ভাষায়, আচারে ও প্রথায় ভারতবর্ষে বিভেদ ও দ্বন্দ্ব-বিরোধের অন্ত নাই। এটি একটি নগ্ন বাস্তব সত্য। এই অবস্থা যেমন চলিতেছে তেমনি চলিবে কেবল রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে আপস-মীমাংসার একটা ঐক্যমত সৃষ্টি করিলেই চলিবে,—কবির মতে, ইহাতে কখনও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে তিনি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের রাজনীতিক সাধনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্রবিপ্লবের অন্যতম লক্ষ্যই ছিল ধর্মীয় কুসংস্কারের অবসান ঘটাইয়া রাষ্ট্রনীতিতে ধর্মের প্রাধান্য ও আধিপত্যের বিলোপ ঘটান। এই প্রসঙ্গে তিনি ফরাসী-বিপ্লব প্রভৃতির উদাহরণ দিয়া বলিলেন:

"ইতিহাসে বারে বারে দেখা গেছে, যখন কোনো মহাজাতি নবজীবনের প্রেরণায় রাষ্ট্রবিপ্লব প্রবর্তন করেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার ধর্মবিদ্বেষ। দেড় শত বৎসর পূর্বকার ফরাসি-বিপ্লবে তার দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। সোভিয়েট রাশিয়া প্রচলিত ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর। সম্প্রতি স্পেনেও এই ধর্মহননের আগুন উদ্দীপ্ত। মেক্সিকোয় বিদ্রোহ বারে বারে রোমক চার্চকে আঘাত করতে উদ্যত"। [কালান্তর : পৃঃ ৩২৫]

কবির বক্তব্য এই, যে ধর্মান্ধতা ও ধর্মীয় কুসংস্কার আমাদের জাতীয়-ঐক্য এবং মানবিক সম্পর্ককে দূষিত ও বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে দেশের রাজনৈতিক দলগুলি যথোচিত সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন না। বলা বাহুল্য, ইহার দ্বারা কবি ইউরোপের 'রিফর্মেশন' ও রেভল্যুশনে'র শিক্ষা ও বিশেষ তাৎপর্যটি বুঝাইতে চাহিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়, পূর্বাপর বহু প্রবন্ধেও কবি সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের জন্য ধর্ম-সংস্কার ও শিক্ষা-সংস্কার আন্দোলনের উপরই প্রধান গুরুত্ব দিয়াছেন।

অবশ্য তাহার অর্থ এই নয় যে, কবি এক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক আপস-মীমাংসার পথগুলি একেবারে উপেক্ষা করিলেন। গোল-টেবিল বৈঠকে 'ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটি' প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া তিনি বলিলেন :

"কথা হয়েছে, ভারতবর্ষে একরাষ্ট্রশাসন না হয়ে যুক্তরাষ্ট্রশাসননীতির প্রবর্তন হওয়া চাই।...আমাদের রাষ্ট্রসমস্যার এ একটা কেজো রকমের নিষ্পত্তি বলে ধরে নেওয়া যাক। কিন্তু তবু একটা কঠিন গ্রন্থি রয়ে গেল, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ ও বিরোধ। এই বিচ্ছেদটা নানা কারণে আন্তরিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরে থেকে রাষ্ট্রনৈতিক প্রলেপ দিয়ে এর ফাটল নিবারণ করা চলবে না; কোনো কারণে একটু তাপ বেড়ে উঠলেই আবার ফাটল ধরবে।

"যেখানে নিজেদের মধ্যে সত্যকার ভেদ সেখানেই রাষ্ট্রিক ক্ষমতার হিস্যা নিয়ে স্বতন্ত্র কোঠায় স্বতন্ত্র হিসাব চলতে থাকে। সেখানে রাষ্ট্রিক সম্পদে সকলেরই অখণ্ড স্বার্থের কথাটা স্বভাবতই মনে থাকে না। এমন দুর্গ্রহে একই গাড়িকে দুটো ঘোড়া দুদিকে টানবার মুশকিল বাধায়। এখন থেকেই অধিকারের ভাগ-বখরা নিয়ে হট্টগোল জেগেছে। রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়বুদ্ধির যোগে গোল-টেবিল পেরিয়েও এই গোল উত্তরোত্তর বাড়বে বৈ কমবে এমন আশা আছে কি?"...

গোল-টেবিল বৈঠকে যোগদানে যাত্রার পূর্বে গান্ধীজী যে মুসলিম নেতাদের সহিত আপস-মীমাংসার চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সম্পর্কে কবি বলিলেন :

"এক দল মুসলমান সম্মিলিত নির্বাচনের বিরুদ্ধে, তাঁরা স্বতন্ত্র নির্বাচনরীতি দাবি করেন এবং তাঁদের পক্ষের ওজন ভারি করবার জন্যে নানা বিশেষ সুযোগের বাটখারা বাড়িয়ে নিতে চান। যদি মুসলমানদের সবাই বা অধিকাংশ একমত হয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচনরীতির দাবি করেন, এবং নিজেদের পক্ষের ওজন বাড়িয়ে নিতে চান, তা হলে এমনতরো দাবি মেনে নিয়েও আপস করতে মহাত্মাজি রাজি আছেন বলে বোধ হল। তা যদি হয়, তাঁর প্রস্তাব মাথা পেতে নেওয়াই ভালো। কেননা,

ভারতবর্ষের তরফে রাষ্ট্রিক যে অধিকার আমাদের জয় করে নিতে হবে তার সুস্পষ্ট মূর্তি এবং সাধনার প্রণালী সমগ্রভাবে তাঁরই মনে আছে। এ পর্যন্ত একমাত্র তিনিই সমস্ত ব্যাপারটাকে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে প্রবল বাধার বিরুদ্ধে অগ্রসর করে এনেছেন।…তবু, এক জনের বা এক দলের ব্যক্তিগত সহিষ্ণুতার প্রতি নির্ভর করে এ কথা ভুললে চলবে না যে, অধিকার-পরিবেষণে কোনো এক পক্ষের প্রতি যদি পক্ষপাত করা হয় তবে সাধারণ মানবপ্রকৃতিতে সেই অবিচার সইবে না, এই নিয়ে একটা অশান্তি নিয়তই মারমুখো হয়ে থেকে যাবে। বস্তুত এটা পরস্পরের বিবাদ মেটাবার পন্থা নয়।…ঠিক জানি না, কী ভাবে মহাত্মাজি এ সম্বন্ধে চিন্তা করছেন। হয়তো গোল-টেবিল-বৈঠকে আমাদের সম্মিলিত দাবির জোর অক্ষুণ্ণ রাখাই আপাতত সব চেয়ে গুরুতর প্রয়োজন বলে তাঁর মনে হতে পারে। দুই পক্ষই আপন আপন জিদে সমান অটল হয়ে বসলে কাজ এগোবে না, এ কথা সত্য। এ ক্ষেত্রে এক পক্ষে ত্যাগ স্বীকার করে মিটমাট হয়ে গেলে উপস্থিত রক্ষা হয়। একেই বলে ডিপ্লোম্যাসি।… রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে ইংরেজের সুবুদ্ধি বিখ্যাত; ইংরেজ সবখানির দিকে তাকিয়ে অনেকখানি সহ্য করতে পারে। এই বুদ্ধির প্রয়োজন যে আমাদের নেই, এ কথা গোঁয়ারের কথা; আখেরে গোঁয়ারের হার হয়ে থাকে। রাষ্ট্রিক অধিকার সম্বন্ধে একগুঁয়েভাবে দর-কষাকষি নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে মন-কষাকষিতে অত্যন্ত বেশি দূরে এগোতে দেওয়া শত্রুপক্ষের আনন্দবর্ধনের প্রধান উপায়।" [ঐ : পৃঃ. ৩২৮-৩০]

কিন্তু 'এহ বাহ্য'। বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের স্বার্থেই কবি সমস্ত সম্প্রদায় ও দলগুলিকে কিছু কিছু স্বার্থ ত্যাগ করিয়া একটি আপস-মীমাংসায় আসিবার কথাটা প্রাজ্ঞোচিত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন। এমন কি গান্ধীজী যে শর্ত-সাপেক্ষে মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচন-প্রথা মানিয়া লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, কবি তাহাকেও সমর্থন করিতে রাজী হইলেন। কিন্তু তবুও কবির কাছে এইসব রাজনীতিক নীতি-কৌশলও গৌণ কথা। তিনি বলিলেন :

"আমার বক্তব্য এই যে, উপস্থিত কাজ-উদ্ধারের খাতিরে আপাতত নিজের দাবি খাটো করেও একটা মিটমাট করা সম্ভব হয় তো হোক, কিন্তু তবু আসল কথাটা বাকি রইল। পলিটিক্‌সের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে যেটুকু তালি-দেওয়া মিল হতে পারে সে মিলে আমাদের চিরকালের প্রয়োজন টিঁকবে না। এমন-কি পলিটিক্‌সেও এ তালিটুকু বরাবর অটুট থাকবে এমন আশা নেই, ঐ ফাঁকির জোড়টার কাছে বারে বারেই টান পড়বে। যেখানে গোড়ায় বিচ্ছেদ সেখানে আগায় জল ঢেলে গাছকে চিরদিন তাজা রাখা অসম্ভব। আমাদের মিলতে হবে সেই গোড়ায়, নইলে কিছুতে কল্যাণ নেই।"

তাই তিনি বলিলেন :

"ধর্মমত ও সমাজরীতির সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানে শুধু প্রভেদ নয়, বিরুদ্ধতা আছে, এ কথা মানতেই হবে। অতএব আমাদের সাধনার বিষয় হচ্ছে, তৎসত্ত্বেও ভালো রকম করে মেলা চাই। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ আমাদের না হলে নয়। কিন্তু এর একান্ত আবশ্যকতার কথা আমাদের সমস্ত হৃদয়-মন দিয়ে আজও ভাবতে আরম্ভ করি নি।…

"নানা উপলক্ষ্যে এবং বিনা উপলক্ষ্যে সর্বদা আমাদের পরস্পরের সঙ্গ ও সাক্ষাৎ-আলাপ চাই। যদি আমরা পাশাপাশি চলি, কাছাকাছি আসি, তা হলেই দেখতে পাব, মানুষ বলেই মানুষকে আপন বলে মনে করা সহজ। যাদের সঙ্গে মেলামেশা নেই তাদের সম্বন্ধেই মত প্রভৃতির অনৈক্য অত্যন্ত কড়া হয়ে ওঠে, বড়ো হয়ে দেখা দেয়।..."
[ঐ : পৃঃ. ৩৩০-৩২]

অর্থাৎ এক কথায় বলিতে গেলে, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে তিনি সামাজিক কুসংস্কারের গণ্ডী ভাঙিয়া ঘনিষ্ঠ মেলামেশার দ্বারা পারস্পরিক আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করিবার আহ্বান জানাইলেন।

প্রশ্ন থাকিয়া যায়, শুধু আন্তরিকভাবে মেলামেশা করিলেই কি হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে? তাছাড়া এই প্রবন্ধে আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কবি এখানে হিন্দু-মুসলমানের আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহাদির দ্বারা সামাজিক ও রক্তের সম্পর্ক স্থাপনের প্রশ্নে কোন কথা বলেন নাই। ইতিপূর্বে দু'একটি ক্ষেত্রে সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের আলোচনা প্রসঙ্গে কবি এই সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কবি ভালো করিয়াই জানিতেন, এদেশে ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারগুলি লোকের মনে এত দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়া আছে যে, এই সময় এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে প্রচণ্ড বাধা ও হাঙ্গামা বাধিয়া যাইতে পারে। প্রায় আট বৎসর পূর্বে 'সমস্যা' প্রবন্ধে এ-সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া কবি সেদিন বলিয়াছিলেন :

..."সুইজরল্যাণ্ডে ভেদ যতগুলোই থাক্, ভেদবুদ্ধি তো নেই। সেখানে পরস্পরের মধ্যে রক্তবিমিশ্রণে কোনো বাধা নেই—ধর্মে বা আচারে বা সংস্কারে। এখানে সে বাধা এত প্রচণ্ড যে, অসবর্ণ বিবাহের আইনগত বিঘ্ন দূর করবার প্রস্তাব হবা মাত্র হিন্দুসমাজপতি উদ্বেগে ঘর্মাক্তকলেবর হয়ে হরতাল করবার ভয় দেখিয়েছিলেন। **সকলের চেয়ে গভীর আত্মীয়তার ধারা নাড়ীতে বয়, মুখের কথায় বয় না।** যারা নিজেদের এক মহাজাত ব'লে কল্পনা করেন তাঁদের মধ্যে সেই নাড়ীর মিলনের পথ ধর্মের শাসনে চিরদিনের জন্যে যদি অবরুদ্ধ থাকে তা হলে তাঁদের মিলন কখনোই প্রাণের মিলন হবে না, সুতরাং সকলে এক হয়ে প্রাণ দেওয়া তাঁদের পক্ষে সহজ হতে পারবে না। তাঁদের প্রাণ যে এক প্রাণ নয়।..." (বড় হরফ আমার)
[সমস্যা : কালান্তর : পৃঃ. ২২৭]

কবির বিশ্বাস, জনশিক্ষার অবাধ ও ব্যাপক বিস্তারের দ্বারা ধীরে ধীরে লোকের এই কুসংস্কারগুলি দূর করা সম্ভব হইবে; অবশ্য তাহার জন্য সচেতন ও সক্রিয় সমাজ-সংস্কার আন্দোলনও চায়। ইহারই জন্য তিনি ব্যাপক জনশিক্ষা ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করিবার জন্য দেশের নেতা ও রাজনৈতিক দলগুলির কাছে বার বার আবেদন জানাইতেছিলেন। সে-পথ যত কঠিন ও সময়-সাপেক্ষই হউক না কেন, ইহা ছাড়া এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান নাই, ইহাই ছিল কবির স্থির বিশ্বাস।

দেশের একদল রাজনীতিবিদ বলিতেছিলেন, ইংরেজ চলিয়া গেলে এবং দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পাইলেই সহজেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। কবি

কিন্তু এই তত্ত্বে কখনই বিশ্বাস করিতেন না এবং বার বার উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে ঐ তত্ত্বের বিপজ্জনক তাৎপর্যটি আলোচনা করিয়া তিনি বলেন :

"ধরে নেওয়া গেল গোল-বৈঠকের পরে দেশের শাসনভার আমরাই পাব। কিন্তু, দেশটাকে হাত-ফেরাফেরি করবার মাঝখানে একটা সুদীর্ঘ সন্ধিক্ষণ আছে। সিভিল-সার্ভিসের মেয়াদ কিছুকাল টিকে থাকতে বাধ্য। কিন্তু, সেইদিনকার সিভিল-সার্ভিস হবে ঘা-খাওয়া নেকড়ে বাঘের মতো। মন তার গরম হয়ে থাকবার কথা। সেই সময়টুকুর মধ্যে দেশের লোক এবং বিদেশের লোকের কাছে কথাটা দেগে দেগে দেওয়া তার পক্ষে দরকার হবে যে, ব্রিটিশরাজের পাহারা আলগা হবা-মাত্রই অরাজকতার কালসাপ নানা গর্ত থেকে বেরিয়ে চারি দিকেই ফণা তুলে আছে, তাই আমরা স্বদেশের দায়িত্বভার নিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আমাদের আপন লোকদেরকে দিয়েও এ কথা কবুল করিয়ে নেবার ইচ্ছা তার স্বভাবতই হবে যে, আগেকার আমলে অবস্থা ছিল ভালো। সেই যুগান্তরের সময়ে যে যে গুহায় আমাদের আত্মীয়বিদ্বেষের মারগুলো লুকিয়ে আছে সেই সেই খানে খুব করেই খোঁচা খাবে। সেইটি আমাদের বিষম পরীক্ষার সময়। সে পরীক্ষা সমস্ত পৃথিবীর কাছে। এখন থেকে সর্বপ্রকারে প্রস্তুত থাকতে হবে যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টির সামনে মূঢ়তায় বর্বরতায় আমাদের নূতন ইতিহাসের মুখে কালী না পড়ে।"

[হিন্দু-মুসলমান : কালান্তর : পৃঃ. ৩৩৫-৩৬]

কবির এই সতর্কবাণীর নিষ্ঠুর সত্যতা পরবর্তীকালে—বিশেষ করিয়া ১৯৪৬-৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বমুহূর্তে এবং পরবর্তীকাল আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছি। যে নৃশংস ও উদ্দাম সাম্প্রদায়িক বর্বরতা আজও ক্ষণে ক্ষণে ভারতের ইতিহাসকে মসীলিপ্ত করিয়া তুলিতেছে সেই মুহূর্তে চিন্তাশীল ভারতবাসী রবীন্দ্রনাথের কথা পুনর্বার চিন্তা না করিয়া পারিবেন না।

এদিকে দেশের পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোরাল ও সঙ্কটজনক হইয়া উঠিতে থাকে। সরকারী আমলাতন্ত্রের কার্যকলাপে ও প্রবল প্ররোচনার মুখে দিল্লী-চুক্তি ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হয়। গুজরাট ও উত্তর-প্রদেশের কৃষকদের দাবী-দাওয়াগুলির বিবেচনার কথাও উপেক্ষিত হইতে থাকে। বন্দীমুক্তির ব্যাপারেও গভর্নমেণ্ট পূর্ববৎ কঠোর মনোভাব অবলম্বন করিয়া থাকিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং বাংলাদেশে পুলিশী দমননীতি সমানে চলিতে থাকে। এই সব ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। ১১ই ও ১৩ই আগস্ট তিনি বড়লাটকে পর পর দুটি টেলিগ্রামে জানাইয়া দিলেন যে, ঐ সব ব্যাপারে একটা সন্তোষজনক মীমাংসা না হইলে তিনি গোল-টেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে যাইতে পারেন না। ইহার পর সিমলাতে বড়লাটের সঙ্গে তাঁহার দুইবার আপস-আলোচনা হয়। অবশেষে আগস্টের শেষভাগে (২৭শে) গভর্নমেণ্টের সঙ্গে মোটামুটি একটা বোঝাপড়া হয়। ২৯শে আগস্ট (১৯৩১) গান্ধীজী S. S. Rajputana জাহাজে গোল-টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য বিলাত যাত্রা করেন। সঙ্গে চলিলেন, মহাদেব দেশাই, দেবদাস গান্ধী, পিয়ারীলাল, সরোজিনী নাইডু ও মীরা বেন্। গান্ধীজী ডাঃ আন্সারীকে সঙ্গে

লইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু অধিকাংশ মুসলিম প্রতিনিধির আপত্তির অজুহাত দেখাইয়া গভর্নমেণ্ট এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন।

এদিকে বাংলাদেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিতে থাকে। পুলিশী নির্যাতন ও দলন-নীতির প্রতিক্রিয়ায় বিপ্লববাদীদের ক্রিয়াকলাপ উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে। অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর কয়েকটি রাজনীতিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জে. পেডি নিহত হন (৭ই এপ্রিল)। ৭ই জুলাই দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হয় এবং তাহার কয়েকদিন পরেই আলিপুরের জেলা ও সেসন জজ মিঃ গারলিক্ বিপ্লবীদের হাতে নিহত (২৭শে জুলাই) হন। গান্ধীজীর বিলাত-যাত্রার পরদিনই চট্টগ্রামের কুখ্যাত পুলিশ-ইনস্পেক্টর খানবাহাদুর আহ্‌সানুল্লা বিপ্লবীদের গুলিতে প্রাণ হারান (রবিবার-৩০শে আগস্ট)। এই ঘটনার পর ঐ দিনই রাত্রে চট্টগ্রামে হিন্দুদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু হয়। সরকার ও পুলিশ ইহাকে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বলিয়া রাষ্ট্র করিলেন। এক শ্রেণীর কুখ্যাত গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক প্রকাশ্য দিবালোকে এবং পুলিশেরই চোখের সম্মুখে হিন্দুদের আক্রমণ করিয়া খুন-জখম এবং ঘর-বাড়ি দোকান-পাট লুট করিতে লাগিল। অথচ পুলিশ প্রায় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়া এই সব দেখিতেছিল। ইহাতে আর কাহারও বুঝিতে বাকি থাকিল না যে, কাহার উস্কানিতে এইভাবে দাঙ্গা চলিতে পারে। কলিকাতাবাসীর পক্ষে জে. এম. সেনগুপ্তের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি চট্টগ্রাম যাত্রা করেন (৬ই সেপ্টেম্বর)।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। চট্টগ্রামের দাঙ্গার সংবাদে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। কিছুদিন পূর্বে পূর্ববঙ্গে এক ভয়াবহ বন্যা-প্লাবন হইয়া যায়। সাহায্যের জন্য বন্যা-পীড়িত এলাকাগুলি হইতে করুণ আর্তনাদ উঠে। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ এই আবেদনে সাড়া না-দিয়া পারেন না। এই সময় তিনি 'শিশুতীর্থ' কবিতাটি গীতি-নাট্যের উপযোগী করিয়া রচনা করিতেছিলেন। উদ্দেশ্য,—কলিকাতায় উহা অভিনয় করিয়া বন্যা-পীড়িতদের জন্য সাহায্য সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন।

উল্লেখযোগ্য, এই সময় বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের উদ্যোগে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উদ্‌যাপনের আয়োজন চলিতে থাকে। এই উৎসব উপলক্ষে তাঁহারা বিশ্বভারতীর সাহায্যের জন্য কবিকে কিছু অর্থসংগ্রহ করিয়া দেবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সংবাদে রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে এই মর্মে এক পত্রে (২৯শে আগস্ট) অনুরোধ করিলেন যে, ঐ বাবদ সংগৃহীত সমস্ত অর্থ তিনি বন্যাপীড়িতদের সাহায্যে দিবেন, ইহা যেন জানাইয়া দেওয়া হয়। পত্রটি এই :

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

শরৎ, শুনেছি তোমরা আমার অর্ঘ্যরূপে কিছু টাকা সংগ্রহের সংকল্প করেচ। দেশে এখন দারুণ দুর্দিন, এ সময়ে কোনো ব্যাপারের জন্যে অর্থের দাবী করা বিহিত হবে না। যদি আমার হাতে কিছু দিতে চাও

তবে সেটার লক্ষ্য হবে দুর্গতদের দুঃখ হরণ। আমিও স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টা করচি—কলকাতায় এই উদ্দেশ্যে একটা কিছু পালাগানের কথা চলচে—এই উপায়ে কিছু কুড়োনো যাবে আশা করি। তোমরা জয়ন্তী উপলক্ষ্যে অল্প স্বল্প যা কিছু একত্র করতে পারবে আমার হাতে দিলে এই পুণ্যকর্মে আমার সহায়তা করা হবে। নিজের শক্তিতে কিছু করতে পারি এই বন্যাতে সে উপায় রাখিনি। ইতি ১২ই ভাদ্র ১৩৩৮

তোমাদের

(স্বাঃ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই সময় সুভাষচন্দ্র ও ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির (বি. পি. সি. পি.) উদ্যোগে একটি 'বন্যা রিলিফ কমিটি' গঠিত হয়।

এই সময় এই রিলিফ কমিটি লইয়া আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত সুভাষচন্দ্রের কিছুটা মনোমালিন্য ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথও পরোক্ষে এই গোলমালে কিছুটা জড়িত হইয়া পড়িতেছিলেন। বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনীতিক পটভূমিটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার।

ইহার ৩।৪ বৎসর আগে থেকেই বাংলা কংগ্রেসের বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে মতভেদ চলিয়া আসিতেছিল ; ফলে সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এক দলের নেতা সুভাষচন্দ্র, অপর দলের নেতা জে. এম. সেনগুপ্ত। এই দুই দল প্রধানত A. I. C. C. ও B. P. C. C.-তে এবং কর্পোরেশনে নেতৃত্ব ও প্রাধান্য-লাভের জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করিয়া এক ভয়াবহ আত্মকলহে লিপ্ত হন। ওয়ার্কিং কমিটি সালিশ ও আপস-মীমাংসার জন্য কয়েকবারই চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। অবশেষে উভয়পক্ষ সালিশ নিয়োগের প্রস্তাবে সম্মত হইলে ওয়ার্কিং কমিটি এম. এস. আণেকে বাংলাদেশে পাঠান। ১৬ জুলাই (১৯৩১) এই বিরোধের শুনানী ও তদন্ত শুরু হয়। কিছুদিন পর—আগষ্টের প্রথমভাগেই পূর্ববঙ্গে ঐ ভয়াবহ বন্যা-প্লাবন হইয়া যায়। সুভাষচন্দ্র কালবিলম্ব না করিয়া (৮ই আগস্ট ১৯৩১) বি. পি. সি. সি-র পক্ষ হইতে 'ফ্লাড্ রিলিফ কমিটি' গঠনে উদ্যোগী হন। ইহার সভাপতি ও সম্পাদকের নাম যথাক্রমে ঘোষিত হয়—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। সম্ভবত আচার্য রায়কে যথাসময়ে ইহা জানাইয়া তাঁহার সম্মতি গ্রহণ করা হয় নাই। এদিকে কয়েকদিন পর সতীশ দাশগুপ্ত প্রমুখ খাদি-পন্থীরা "বঙ্গীয় সংকট ত্রাণ সমিতি" নামে অপর একটি রিলিফ কমিটি গঠন করিয়া আচার্য রায়কে উহার সভাপতি করেন (১৪ই আগস্ট)। আচার্য রায় এই কমিটির পক্ষেই পত্রপত্রিকায় বিবৃতি দিয়া সাহায্যের জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন জানাইতে থাকেন। এদিকে এ. আই. সি. সি-র অধিবেশন হইতে ফিরিয়া জে. এম. সেনগুপ্ত আচার্য রায়ের "বঙ্গীয় সংকট ত্রাণ সমিতি"তে সাহায্য করিবার আবেদন জানাইলেন (১৮ই আগস্ট)। সুভাষচন্দ্র ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া পরদিনই আচার্য রায়কে একটি চিঠি লিখেন। চিঠিতে সুভাষচন্দ্রের ভাষা খুব সংযত ছিল না। তাহাতে আচার্য রায়ও অত্যন্ত বেদনা ও আঘাত পান। তাছাড়া "লিবার্টি" পত্রিকায়ও উহা ছাপা হয় এবং তাহাতে আচার্য রায়ের সম্পর্কে কটু সমালোচনা করা

হইয়াছিল। আচার্য রায় জবাবে তাঁহার মনোবেদনা ব্যক্ত করিয়া সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশে দীর্ঘ এক খোলা চিঠি প্রকাশ করেন (২১শে আগস্ট, ১৯৩১)। উহার অংশ-বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হইল :

"আমি প্রার্থনা করি, সেই দিন আসুক, যখন তুমি আমার সকল শুভ চেষ্টার সহিত যুক্ত হইয়া কার্য করিবে—কিন্তু আজিকার দিনে তোমার দিক হইতে আমি সে সম্ভাবনাও তো কোনপ্রকারেই দেখিতে পাইতেছি না।...

"আমি রিলিফের কাজ সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ডাঃ নীরেন্দ্র দত্ত, ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেন প্রভৃতির মত লোক লইয়া চালাই। কি কাজ আমার দ্বারা হইয়াছে বা হইতেছে তাহা বাংলাদেশ জানে।

"খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিও তোমার পত্রে আক্ষেপ আছে।...

"তুমি একদিকে আমাকে তোমাদের রিলিফের প্রেসিডেণ্ট হওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছ, আবার সঙ্গে সঙ্গে ১৯২২ সালের রিলিফের (বেঙ্গল রিলিফ কমিটির—লেখক) টাকা আমার দ্বারা অপব্যয়িত হইয়াছে একথাও বলিতেছ। একই সাথে একবার গালি দেওয়া, আর একবার স্তুতি করায় মনে হয়, তুমি ধমক দিয়া কাজ আদায় করিতে চাও।

"আমি তোমাদের কমিটির সভাপতি না-হওয়ায় তুমি ক্ষুব্ধ হইয়াছ—আমি একবারে দলভুক্ত হওয়ার চরমে গিয়াছি বলিয়াছ। তুমি আমার উপর কলঙ্ক লেপন করিবার কাজে ব্রতী হইয়াছ, তুমি আমার সৃষ্ট একটি অত্যন্ত প্রিয় সংস্থার সততা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছ। আমি খাদি প্রতিষ্ঠানের কথা বলিতেছি। তোমার যাহা খুসী করিয়া যাও, আমি তোমার সহিত বাদানুবাদে নামিব না। তোমার আরোপিত কলঙ্কের হাত হইতে আমার আত্মরক্ষার আবশ্যক নাই। আর যদি কয়েক বৎসর বাঁচি তো আমি আশা করি, দেশবাসী আমাকে সহ্য করিবেন, আমাকে মাতৃভূমির সেবার সুযোগ দিবেন। ঈশ্বর পরম কারুণিক! তোমার বয়স কাঁচা আছে। ঈশ্বর তোমাকে বুঝিয়া চলিবার মত সুবুদ্ধি দিন।

শুভার্থী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ৬ই ভাদ্র ১৩৩৮ : ২৩শে আগস্ট, ১৯৩১]

সংবাদপত্রে এ সবই প্রকাশিত হইল। বন্যাপীড়িতদের সাহায্য লইয়া এমন একটা বিশ্রী আত্মকলহে সকলেই কিছুটা বিরক্ত ও অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন।

যাহাই হোক, ইহার পর সুভাষচন্দ্র বি. পি. সি. সি. ফ্লাড রিলিফ কমিটির সভাপতিত্ব গ্রহণের জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানান। রবীন্দ্রনাথ সংবাদপত্র যোগে সুভাষচন্দ্র-আচার্য রায়ের বাদানুবাদ সবই জানিতে পারেন। এসব জানিয়াও তিনি সুভাষচন্দ্রের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। কবি ফ্লাড্ রিলিফ কমিটির সভাপতিত্ব করিতে সম্মতি জানাইয়া সুভাষচন্দ্রের নিকট লিখিলেন। সেই সাথে দেশবাসীর উদ্দেশে সাহায্যের আবেদন জানাইয়া কবিতার আকারে কয়েক ছত্র লিখিয়া সুভাষচন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া দিলেন (৪ঠা সেপ্টেম্বর)। ৬ই সেপ্টেম্বর সুভাষচন্দ্র উহা *Liberty* পত্রে প্রকাশ করেন :

Dr. Rabindranath Tagore, who has kindly consented to become

the President of the Bengal Congress Flood and Famine Relief Committee has addressed the following appeal to the people.

অন্নহারা গৃহহারা চায় ঊর্ধ্বপানে
ডাকে ভগবানে।
যে দেশে সে ভগবান মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে
সাড়া দেন বীর্যরূপে দয়ারূপে দুঃখে, কষ্টে, ভয়ে
সে দেশের দৈন্য হবে ক্ষয়
হবে তার জয়।

১৮ই ভাদ্র
১৩৩৮ (স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

The following is the English version of the above :

The famished, the homeless
raise their hands towards heaven
and utter the name of God
Their call will never be in vain
in the land where God's response
comes through the heart of man
in heroic service and love.

Santiniketan.
Sept.4-1931

কিন্তু ইতোমধ্যেই বিশ্বভারতীর পক্ষে স্বতন্ত্র একটি বন্যা-সাহায্য তহবিল খোলা হয় এবং রবীন্দ্রনাথ তাহার সভাপতি হন। কবি বুঝিতে পারেন, ইহার পর সাহায্য আসিতে থাকিলে তাহা লইয়া জটিলতার সৃষ্টি হইবার আশঙ্কা থাকিবে। কবি পরদিনই এক প্রেস-বিবৃতিতে জানাইয়া দিলেন যে, যাঁহারা বিশ্বভারতী সাহায্য তহবিলে সাহায্য পাঠাইতে ইচ্ছুক একমাত্র তাঁহারাই যেন তাঁহার নামে পাঠান। কবির বিবৃতিটি ছিল এই :

"ক্যাপ্টেন এন. এন. দত্ত (ডাঃ নরেন্দ্রনাথ দত্ত) যে সাহায্য সমিতির অনারারী সেক্রেটারী ঐ সাহায্য সমিতির প্রেসিডেণ্ট পদে আমার নাম থাকায় অনেক ভুল ধারণার উদ্ভব হইতে পারে মনে করিয়া আমি ঐ সমিতির সহিত আমার প্রকৃত সংশ্রব সম্পর্কে এই বিবৃতি প্রকাশ করা আবশ্যক বলিয়া বোধ করিলাম। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, রিলিফ কার্যের সহিত আমার প্রকৃত সংশ্রব সম্পর্কে আমি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নিকট ইতঃপূর্বেই বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছি।

"জনসাধারণ ভালভাবেই জানেন, কংগ্রেস, কংগ্রেস সংশ্লিষ্ট কোন দল বা অপর কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত আমার কোন সংশ্রব নাই। বর্তমানে আমি কেবল উত্তর ও পূর্ববঙ্গের বিপন্নদের সাহায্যদান কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট। ক্যাপ্টেন দত্তের উক্ত কমিটি ছাড়া অন্য কোন কমিটিও যদি আমাকে তাহাদের কমিটিতে গ্রহণ করিতে চাহিতেন, আমি সানন্দে সে-সম্বন্ধে বিবেচনা করিতাম। কিন্তু এক্ষণে

বিশ্বভারতীর ছাত্র ও অধ্যাপকগণ যখন নিজেরাই সাহায্যদান কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন, তখন আমি অন্য কোন সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা আবশ্যক বলিয়া মনে করি না।

"আমার নিকট যে টাকা পাঠান হইবে ঐ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, বিশ্বভারতীর মারফত যাঁহারা সাহায্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদের প্রেরিত টাকাও যখন আমার নিকটই আসিবে তখন অন্য কোন কমিটির মারফত সাহায্যদানের জন্য প্রেরিত টাকা আমাদের নিকট আসিলে এক গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা। কাজেই জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আমার নিকট যে সকল টাকা আসিবে উহা বিশ্বভারতীর সাহায্য-সমিতির জন্য প্রেরিত বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে এবং অন্য কোন সমিতির আয়-ব্যয়ের জন্য আমি দায়ী নহি।"

[আনন্দবাজার : ২০শে ভাদ্র ১৩৩৮ : ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১]

এই সম্পর্কে পাছে কোন ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এই জন্য কবি পূর্বেই আচার্য রায়কে চিঠিতে পরিষ্কার করিয়া সব কথা লিখিয়াছিলেন। এই বিবৃতিদানের সাথে সাথেই সুভাষচন্দ্রকেও ব্যক্তিগতভাবে এক পত্রে তাঁহার অবস্থাটা খুলিয়া লিখিলেন। কবির পত্রটি ছিল এই :

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু — Visva Bharati
কল্যাণীয়েষু, — Santiniketan, Bengal

আমি তোমাকে জানিয়েছিলুম কেবল নাম দিয়ে মাত্র আমি খালাস। টাকাকড়ির কোনো দায়িত্ব আমার নয়। বন্যা সম্বন্ধে যতগুলি কর্মসংঘ গঠিত হয়েছে নামের দ্বারা আমি সকলের সঙ্গেই যুক্ত হতে পারি কিন্তু কেবল বিশ্বভারতীর সঙ্গেই আমার কর্মের সম্বন্ধ। এইজন্যে তোমাদের গ্রহণযোগ্য টাকা আমার কাছে পাঠানো সঙ্গত হবে না। দেখা গেল লোকের এ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হয়েছে তাই আমাকে লিখতে হোলো।

ইতি ১৯ ভাদ্র ১৩৩৮
শুভাকাঙ্ক্ষী
(স্বাঃ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই সম্পর্কে ডঃ অমিয় চক্রবর্তীও কবির অবস্থাটা ব্যাখ্যা করিয়া *Liberty* পত্রিকায় (১১ই সেপ্টেম্বর) একটি বিবৃতি দেন।

কিন্তু চট্টগ্রামে দাঙ্গার ভয়াবহ সংবাদে কবি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ৫ই সেপ্টেম্বর (১৯শে ভাদ্র, ১৩৩৮) তিনি শান্তিনিকেতন হইতে 'ফ্রী-প্রেসের' মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই এই ভয়াবহ ভ্রাতৃ-হত্যার পাপকার্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য এক মর্মস্পর্শী আবেদন জানাইলেন এবং এই মহান প্রচেষ্টায় বিশেষভাবে তিনি প্রগতিশীল ও বিবেকী মুসলমান নেতাদের সক্রিয় সহযোগিতার আবেদন জানাইলেন। বিবৃতিটি এই :

"বাংলার বিভিন্ন স্থানে পর পর যে সকল নৃশংস অত্যাচার-উৎপীড়ন অনুষ্ঠিত হইতেছে, উহা কেবল যে আমাদিগকে দুঃখিতই করিয়াছে তাহা নহে, অসহনীয় লজ্জার বোঝাও আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছে। ইহা অতীব দুঃখের বিষয় যে

ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা ছিল এই সকল অত্যাচার-উৎপীড়নে তাহা ক্ষুণ্ন হইয়াছে। বার বার অনায়াসে গ্রামের পর গ্রামে সহরের পর সহরে এই সকল নৃশংসতার অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ সরকারের নৈতিক মর্যাদা অতিমাত্রায় আহত হইয়াছে।

"কিন্তু আমাদের নিজেদের মধ্যেরই কোন দল বিশেষকে যখন আমরা আমাদেরই মধ্যে বিদ্বেষের আগুন উস্কাইয়া তুলিতে ও আমাদের জাতীয় ইতিহাসকে চিরদিনের মত কলঙ্কিত করিতে দেখি, তখন লজ্জায় সঙ্কোচে আমরা নির্বাক হইয়া পড়ি। এতৎসম্পর্কে আমি সমবেত চেষ্টা দ্বারা নির্জদিগকে রক্ষা করিবার কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, বলিতে ইহাই বুঝাইতে চাই যে, একটি কার্যতৎপর নীতি-সঙ্ঘ গঠন করিয়া আমাদের দেশের সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণকে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। উত্তেজনা-অন্ধ আত্মঘাতী দল এই সকল নৃশংস অত্যাচার-উৎপীড়ন দ্বারা আমাদের দেশের সকল সম্প্রদায়েরই অত্যাচারী ও অত্যাচারিত সকলেরই সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকে, শান্তি ও সভ্যতার ভিত্তিমূল বিধ্বস্ত করিয়া থাকে।

"বহুদূরে অবস্থিত এক দ্বীপের অধিবাসীর পক্ষে চিরকালের জন্য ভারতের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা রাখা সম্ভবপর হইবে না, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান একই দেশমাতৃকার সন্তান। চিরকাল পাশাপাশি বাস করিয়া এক সম্মিলিত রাজতন্ত্র গড়িয়া তুলিব, জয়-পরাজয়ের সমান অংশ সমভাবে বাঁটিয়া লইব। এই নিদারুণ সঙ্কট মুহূর্তে আমাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। সমস্ত সাধু মুসলমানগণকে তাঁহাদের মহান ধর্মের নামে, তাহাদের কৃষ্টি ও সভ্যতার নামে ও বিপন্ন মানব-সমাজের নামে আমি আমাদের সহিত সহযোগিতা করিয়া, যে পাপ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া আমাদিগকে উন্নতির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় ডুবাইয়া দিয়া সমগ্র জগতের চক্ষে আমাদিগকে হীন ও উপহাসাস্পদ প্রতিপন্ন করিয়া ফেলিবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে, উহার উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান হইতে অনুরোধ করিতেছি।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা · ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ : ২০শে ভাদ্র, ১৩৩৮]

চট্টগ্রামের দাঙ্গার ফলে স্বভাবতই হিন্দুদের মধ্যেও ভয়ানক উত্তেজনা দেখা দেয়। হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতারাও সক্রিয় হইয়া উঠিলেন। কবির আশঙ্কা, ইহার প্রতিক্রিয়ায় কলিকাতায় ও অন্যত্র দাঙ্গা প্রসারলাভ করিবে। ঐ বিবৃতির পরদিনই জনৈকা মহিলাকে লেখা এক পত্রে কবি তাঁহার মানসিক উদ্বেগ ও আশঙ্কার উল্লেখ করিয়া সমস্যাটির বিস্তারিত আলোচনা করিলেন (২০শে ভাদ্র)। উহার অংশ-বিশেষ এই :

"এতদিন বন্যাপ্লাবনের দুঃখ দেশের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল ; তার উপরে চট্টগ্রামের বিবরণটা সাইক্লোনের মত এসে তার সমস্ত বাসাটা যেন নাড়িয়ে দিয়েচে।

"আমাদের আপন লোক যখন নির্মম হয়, তখন কোথাও কোন সান্ত্বনা দেখিনে। এর পিছনে আর কোনো দুর্গ্রহের যদি দৃষ্টি থাকে, তবে তা নিয়ে আক্ষেপ ক'রে কোনো লাভ নেই। বলতে হবে—'এহ বাহ্য'। সকলের চেয়ে আমাদের সাংঘাতিক ক্ষতি এই যে, হিন্দুরা পাছে সমস্ত মুসলমান সমাজের প্রতি বিরুদ্ধ হয়ে ওঠে। এ

কথা বলাই বাহুল্য, আমার অভিজ্ঞতা থেকে এ আমি নিশ্চিত জানি মোটের উপরে ভাল মত পরিচয়ের অভাব থেকেই আমাদের পরস্পর আত্মীয়তার ব্যাঘাত ঘটে। কোনো জাতের এক দল মাত্র যখন অপরাধ করে, তখন সেই জাতের সকলের উপরেই কলঙ্ক লাগে এটা অনিবার্য—কিন্তু এ রকম ব্যাপক অবিচার কঠিন দুঃখেও আপন লোকের করা চলবে না।

"দেশের দিক দিয়ে মুসলমান আমাদের একান্ত আপন, এ কথা কোনো-উৎপাতেই অস্বীকৃত হ'তে পারে না।...মুসলমান প্রজার অন্ন এতকাল ভোগ করছি। তাদের অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি, তারা ভালবাসার যোগ্য। আজ যদি তারা হঠাৎ আমাকে আঘাত করতে আসে, তা হ'লে পরমদুঃখে আমাকে এই কথাই ভাবতে হবে, কোনো আকস্মিক উত্তেজনায় তাদের মতিভ্রম ঘটেচে—এটা কখনোই তাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি নয়। দুর্দিনে এমন ক'রে যদি আমি ভাবতে পারি, তা হলেই এই ক্ষণকালের চিত্ত-বিকার দূর হতে পারবে। আমিও যদি রাগে অধীর হয়ে তাদেরই অস্ত্র কেড়ে তাদের উপর চালাই, তা হলেই এ বিকার চিরদিনের মত স্থায়ী হবে—শেষকালে আসবে বিনাশ।

"মুসলমান যদি কোনোরকম প্রবর্তনায় হিন্দুকে নিপীড়ন করতে কুণ্ঠিত না হয়, তা হ'লে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এ শেল বাইরের নয়, এ মর্মস্থানের বিস্ফোটক —এ নিয়ে রাগারাগি লড়াই করতে গেলে ক্ষত বেড়ে উঠ্‌তে থাকবে। বুদ্ধি স্থির রেখে এর মূলগত চিকিৎসায় লাগা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। বিলম্ব হলেও সে-ই একমাত্র পন্থা।" [প্রবাসী : আশ্বিন ১৩৩৮ : পৃঃ. ৮৫৫-৫৬]

স্মরণ রাখা দরকার, দাঙ্গা-নিবারণের জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গীতে গান্ধীজী হিন্দু-মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়েরই নেতাদের নিকট বার বার আবেদন জানাইতেছিলেন। ১লা এপ্রিল করাচীতে জমায়েৎ-উল-উলেমার বার্ষিক সম্মেলনে পুনরায় সেই আবেদন জানাইয়া তিনি বলিলেন :

"I appeal to you, learned theologians of Islam, to use your good offices and eradicate the poison of communalism from the Musalmans and teach them the doctrine of mutual goodwill and toleration. I will make a similar appeal to the Hindus not to return blow for blow but treat Musalmans as their brethren even if the Musalmans are in the wrong." [*Mahatma* : Vol. III. : P. 91]

এখানে উল্লেখযোগ্য, কানপুরে যে হরতাল পালন উপলক্ষে সারা উত্তরপ্রদেশের ভয়াবহ দাঙ্গা বাধিয়া যায়, সেই ঘটনায় হিন্দুরাই প্রথম গণ্ডগোল বাধায়। কিন্তু কাহারা প্রথম আক্রমণ করিয়াছে, কাহারা প্রকৃত দোষী—গান্ধীজী এসব কোন প্রশ্নকেই আমল দিলেন না। অনুরূপভাবে চট্টগ্রামের দাঙ্গার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ ঐ সব প্রশ্নের মধ্যেই না গিয়া উভয় সম্প্রদায়কেই দাঙ্গা দমনের জন্য আবেদন জানাইলেন। কিন্তু চট্টগ্রামে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটিয়াছিল বাহিরের লোক তখনও পর্যন্ত সঠিকভাবে উহার কোন বিবরণ বা সংবাদ পান নাই।

ইহার কয়েকদিন পরই জে. এম. সেনগুপ্ত প্রমুখ 'চট্টগ্রাম তদন্ত কমিটির' নেতারা

চট্টগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঘোষণা করেন যে, সাম্প্রদায়িকতা নহে—সরকারী প্রতিহিংসাই ঐ নৃশংস ঘটনার জন্য মূলত দায়ী। ১৩ই সেপ্টেম্বর (২৭শে ভাদ্র, ১৩৩৮) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সভাপতিত্বে কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট জনসভায় চট্টগ্রাম তদন্ত কমিটির নেতারা প্রকৃত ঘটনার বিবরণ দিয়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। এই সভায় জে. এম. সেনগুপ্ত তাঁহার ভাষণে বলেন যে, সাম্প্রদায়িক বিরোধ এই নৃশংস কাণ্ডের মূল কারণ নহে। এই উক্তি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিয়া তিনি বলেন যে, রবিবার ৩০শে আগস্ট, (অর্থাৎ ঘটনার দিন) রাত্রিতে একজন মুসলমানও এই লোমহর্ষণ কাণ্ডে হস্তক্ষেপ করে নাই। ঐ রাত্রিতে বেসরকারী ইউরোপীয়ান, সরকারী ইংরেজ কর্মচারী ও পুলিশ কর্মচারীর দল গৃহের পর গৃহ আক্রমণ করিয়া দ্রব্যাদি ও ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্র ভাঙিয়া চুরমার করে এবং নির্যাতন করে। সোম, মঙ্গল ও বুধবারে যে সমস্ত গ্রাম বিধ্বস্ত হইয়াছে সে-সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া সেনগুপ্ত বলেন যে, ইউরোপীয় পুলিশ কর্মচারীগণের নেতৃত্বে গুর্খারা গৃহের পর গৃহ আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করে ও মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিয়া ঐ সমস্ত বিধ্বস্ত গৃহ লুঠ করিবার পরামর্শ দেয়, কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই প্রশংসার বিষয় যে, একজন মুসলমানকেও উক্ত ধ্বংসকার্যে যোগদান করিতে কেহ দেখে নাই।

সেনগুপ্ত চট্টগ্রামের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ আনিয়া বলেন :

"এই বিরাট সভাস্থলে কলিকাতার নাগরিকদের মধ্যে দাঁড়াইয়া আমি যে চট্টগ্রামের জিলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কেম্-এর বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ উত্থাপন করিতেছি, তাহার বিরুদ্ধে তাঁহার যদি কিছু বলিবার থাকে, তবে তিনি আমাকে অবিলম্বে আদালতে হাজির করিতে পারেন, আমি তজ্জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আমি চট্টগ্রামের উক্ত নৃশংস কাণ্ডের জন্য তাঁহাকেই সম্পূর্ণ দায়ী করিতেছি। আমি উক্ত কার্যের জন্য তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিন্দা করিয়া বলিতেছি যে, তিনি চট্টগ্রামের জিলা ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া চট্টগ্রাম সংক্রান্ত ব্যাপারে ঔদাসীন্যের চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়াছেন এবং তাঁহার কার্যকলাপ দেখিয়া এই অনুমান করিতে হয় যে তিনিই চট্টগ্রাম সহরের নিরপরাধ নাগরিকদের গৃহ, দোকান প্রভৃতি লুণ্ঠনের জন্য দায়ী।

"আমি আমার বাক্যের পুনরুক্তি করিয়া বলিতেছি যে, মিঃ কেম্-এর যদি এতটুকু সাহস থাকে এবং যদি তিনি তাঁহার স্বীয় সাধুতা ও সরলতার পরিচয় দিতে চাহেন, তবে অবিলম্বে আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিয়া আমার বর্ণনা যে ভুল তাহা প্রমাণ করুন। এই রূপ নৃশংস কাণ্ডের জন্য মিঃ কেম্ ও কতকগুলি বে-সরকারী ইউরোপীয়ান এবং পুলিশ কর্মচারীকে সম্পূর্ণ দায়ী করিতেছি।...

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৯ ভাদ্র, ১৩৩৮ : ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১]

অবশ্য ইহাতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা কিছুটা হ্রাস পায় এবং ক্ষতি যাহা তাহা ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ এ সবই শুনিয়া খুবই বিচলিত হন। পরদিন তিনি গীতোৎসবের

উদ্বৃত্ত টাকা হইতে চট্টগ্রামের বিপন্ন হিন্দুদের এক হাজার টাকা পাঠাইবার নির্দেশ দেন (দ্র. ফ্রী প্রেস-আনন্দবাজার পত্রিকা : ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১)। তাছাড়া চট্টগ্রামে দুর্গত হিন্দুদের সাহায্যের জন্য জে. এম. সেনগুপ্ত আবেদন জানাইয়াছিলেন ;—রবীন্দ্রনাথ, আচার্য রায়, উর্মিলা দেবী প্রভৃতি অনেকেই এক যুক্তবিবৃতিতে উহার সমর্থনে সাহায্যের আবেদন জানান (দ্র. *Advance* : ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১)।

'গীতোৎসব' সম্পর্কে এখানে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা দরকার।

কিছুকাল পূর্বে কবি 'শিশুতীর্থ' গদ্যকবিতাটি রচনা করেন।

দেশের সাম্প্রদায়িক বিরোধ-সংঘর্ষে কবির হৃদয় অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস, হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি ও মিথ্যা কপটাচারে সারা বিশ্বের আবহাওয়া যেন বিষাক্ত ও কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে। সমাধানের মত পথ ও আদর্শ লইয়া জগতে তর্ক-বিতর্ক ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অন্ত নাই। মানুষের আস্থা যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে ; তাই চতুর্দিকে অবিশ্বাস, সন্দেহ, হতাশা ও নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। কবি ভাবিতেছেন, এই অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে কোথাও কি কোনো আলো দেখা যায় ?—কোথায় আলো, পথ কোথায়, কে পথ দেখাইবে ? মনের মধ্যে এই সব প্রশ্নের কোন সঠিক জবাব তিনি খুঁজিয়া পান নাই। কিন্তু মনুষ্যত্বের পরে কবির ছিল অবিচল আস্থা। তাঁহার স্থির বিশ্বাস, মানুষ নিশ্চয়ই একদিন সমস্ত সন্দেহ ও অবিশ্বাসের তর্কজাল ছিন্ন করিয়া এইসব সমস্যার সমাধান করিবে এবং সে মানুষেরা ঘরে ঘরে শিশুরূপে জন্মলাভ করিতেছে ;—মানুষ তাকাইয়া আছে শিশুর দিকে। কবির মনের এই গভীর উদ্বেলতা ও চিন্তা-ভাবনা হইতেই 'শিশুতীর্থ' গদ্যকবিতাটির উৎপত্তি।

উল্লেখযোগ্য, প্রায় এক বৎসর পূর্বে জার্মানিতে থাকাকালে কবি *The Child* নামে ইংরেজীতে যে কবিতাটি লেখেন উহার মূল ভাবটি এখন পরিমার্জিত রূপ লয় 'শিশুতীর্থ' কবিতাটির মধ্যে। কবিতাটি প্রথমে 'সনাতনম্ এনম্ আহুর্ উতাদ্যস্যাৎ পুনর্নবঃ' শিরোনামে 'বিচিত্রা'য় (ভাদ্র, ১৩৩৮) প্রকাশিত হয় ; পরে কবিতাটি আরও পরিমার্জিত রূপে 'শিশুতীর্থ' নামে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহার মূল ভাবার্থটি কবি স্বয়ং একদিন শান্তিনিকেতনে মন্দিরে একটি ভাষণে ব্যাখ্যা করেন। উহা 'তীর্থযাত্রী' নামে 'বিচিত্রা'য় (আশ্বিন, ১৩৩৮) প্রকাশিত হয়। কবির স্বয়ংকৃত এই ব্যাখ্যাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই কারণে উহার অংশ-বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হইল :

"পশু যে-যুগে একদা জন্মায়, চিরকাল সেই যুগেই সে থাকে। লক্ষ বৎসর ধরে বাঘ বাঘই আছে। মানুষ যুগে যুগে নব নব জন্মের ভিতর দিয়ে আপন আবরণ মোচন করতে করতে চলে। অতীতের খাঁচায় শিকল দিয়ে সে বাঁধা থাকে না। তার অভিসার নব জন্মের অভিমুখে।

"পশুশাবক পিতৃধর্মের পুনরাবৃত্তি করতে আসে। পিতাই দেখা দেয় বারে বারে। মানুষের শিশু আসে **পুত্রকে** আবিষ্কার করতে। যে-পুত্র পিতাকে পূর্ণতা দেয়।...

"মানুষ সংবাদ বহন ক'রে আনে নিজর অন্তরে। সৃষ্টির সংবাদ বা প্রলয়ের সংবাদ, যুগান্তের বা যুগান্তরের সংবাদ।...

"সংসারে যখন শান্তি নেই, দৈন্য মরু বালুকায় অন্নের ক্ষেত লুপ্ত করেচে, অজ্ঞানের স্তূপাকার নিরর্থকতায় আলোকের পথ অবরুদ্ধ, তখন উপরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করি, হে নবজাত, হে নবজীবনের দূত কোথায় তুমি? মাতার বেদনার ভিতর দিয়ে তুমি কি এসেচ, হে আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষ, 'তমসঃ পরস্তাৎ'?

"যারা তখন মন্ত্রতন্ত্র জপ তপ আচার অনুষ্ঠানের কথা ভাবে, যারা মনে করে, যন্ত্রযোগে এবং হিসাবীলোকের ষড়যন্ত্র দ্বারা অকল্যাণের প্রতিরোধ করবে, তারা মানুষকে চেনে নি। পশুর জগতে দুঃখ দুর্ভিক্ষ বাইরের দুর্যোগে, মানুষের সংসারে অকল্যাণ অন্তরের দুর্গতিতে। মানুষকে নূতন করে জন্মাতে হবে তবেই তার শোধন হবে। মানুষ দ্বিজ, ব্যর্থ জন্মের বিকার থেকে পরিত্রাণের জন্যে নূতন জন্মের সংস্কার তার চাই।

"যাঁরা মহান পুরুষ তাঁরা আপন জন্মে সমস্ত মানুষের জন্যে নবজন্ম এনেচেন। তাঁরা মানুষকে দান করেচেন অমর জীবনের অর্ঘ্য।

* * * *

"মৃত্যোর্মামৃতং গময়' এই মন্ত্রকে মানবের মাঝে দাঁড়িয়ে যে মন্ত্রদ্রষ্টা উচ্চারণ করলেন অবিশ্বাসী তাঁকে বিদ্রূপ করেচে, অন্ধ তাঁকে মেরেচে, কিন্তু মৃত্যুর দ্বারাই তিনি মৃত্যুকে জয় করেচেন। দুঃখের দ্বারা তিনি সত্যকে প্রমাণ করেচেন।

"সেই মৃত্যুঞ্জয় যাঁরা, কোন্‌দিকে তাঁরা মানুষকে পথ দেখালেন? পুরাতন পদ্ধতির দিকে নয়, নূতন ব্যবস্থার দিকে নয়, নবজন্মের দিকে।

"আদিমকাল থেকে মানবসংসারে যাত্রীরা চলেচে সার্থকতার তীর্থ খুঁজে। নানা দেশে নানা কালে। সে-তীর্থ কুবেরের ভাণ্ডারে নয়, ইন্দ্রলোকে নয়, বৈকুণ্ঠে নয়, সে-তীর্থ সেইখানে পুরাতন মানব যেখানে নূতন হয়ে জন্মলাভ করেচেন, যিনি ঘোর দুর্দিনে দুঃসহ দুঃখের মধ্যে মানুষকে এই আশ্বাস জানিয়েচেন, সম্ভবামি যুগে যুগে। ক্লান্ত আসচে পীড়িত আসচে ক্ষুধাতুর আসচে দীর্ঘ রাত্রি কাটিয়ে দীর্ঘ পথ বেয়ে নগ্ন শিশুর কাছে; প্রশ্ন করলে, 'তুমি এসেচ'? মাতা বললেন,—'তুমি আমার ধন'—সকলে বললে, 'জয় হোক নবজাতকের'।"

[বিচিত্রা : আশ্বিন ১৩৩৮ : পৃঃ. ২৮৫-৮৬]

কবি 'শিশুতীর্থ' কবিতাটি ঘষিয়া মাজিয়া নৃত্যাভিনয়ের উপযোগী করিয়া তুলেন এবং উহার সহিত সংগীত ও আবৃত্তির সংযোগে তিনি একটি মনোরম 'গীতোৎসব'-এর পরিকল্পনা করেন। বন্যাত্রাণ তহবিলে সংগ্রহের জন্যই কবি কলিকাতায় এই গীতোৎসবের ব্যবস্থা করেন। ১৪ ও ১৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় ম্যাডান থিয়েটার ও প্যালেস অব ভ্যারাইটিস্‌ নাট্যমঞ্চে গীতোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উহার পর ইউনিভার্সিটি ইন্সিটিউটেও পর পর দুইদিন (১৭, ১৮ সেপ্টেঃ) উহা অভিনীত হয়।

২০শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে

রবীন্দ্রনাথকে 'কবি সার্বভৌম' উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। এই দিনকার অনুষ্ঠানে কবি তাঁহার ক্ষুদ্র ভাষণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত সংস্কৃত সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন :

"বাংলাকে বাংলা বলে স্বীকার ক'রেও এ কথা মানতে হবে যে সংস্কৃতের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। সংস্কৃত ভাষায় ভারতীয় চিত্তের আভিজাত্য, যে তপস্যা আছে, বাংলাভাষায় তাকে যদি গ্রহণ না করি তবে আমাদের সাহিত্যে ক্ষীণপ্রাণ ও ঐশ্বর্যভ্রষ্ট হবে।" [বিচিত্রা : কার্তিক ১৩৩৮ : পৃঃ ৪৪২]

কিছুদিন পূর্বে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিকুলেশন পাঠ্যতালিকা হইতে সংস্কৃত ভাষাকে অবশ্যপাঠ্য হিসাবে তুলিয়া দিতে চাহিলে কবি উহার প্রতিবাদে যে বিবৃতি দেন, এই প্রসঙ্গে উহা স্মরণ রাখা দরকার। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি কবির অগাধ শ্রদ্ধা ও অত্যন্ত উচ্চ ধারণা ছিল। অতি অল্পবয়স হইতে তাঁহার পিতৃদেব ও পারিবারিক শিক্ষার প্রভাবে তিনি বৈদিক মন্ত্রাদি ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের গভীরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই কারণেই বিশ্বভারতীর সূচনা কাল হইতেই তিনি সেখানে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা-চর্চার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়া আসিতেছিলেন।

চট্টগ্রাম ও হিজলী হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে

১২ই সেপ্টেম্বর (১৯৩১) গান্ধীজী গোল-টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য লণ্ডনে পৌঁছিলেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর 'ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটি'র অধিবেশনে তিনি প্রথম যোগদান করেন। সকলের দৃষ্টি তখন গোল-টেবিল বৈঠকের আলোচনার দিকে নিবদ্ধ।

২৭শে অক্টোবর (পূর্ণ গোল-টেবিল বৈঠকের পূর্বেই) বিলাতের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক মন্ত্রিত্বের পতন হয় এবং তাহার স্থলে 'ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট' অধিষ্ঠিত হয়। ম্যাকডোনাল্ড পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হইলেন বটে তবে এই গভর্নমেণ্টে প্রতিক্রিয়াশীল টোরী ও কনজারভেটিভদেরই প্রাধান্য থাকে।

এদিকে চট্টগ্রামের দাঙ্গা ও বন্যাত্রাণ সাহায্য সংগ্রহের ব্যাপারে বাংলা দেশের নেতারা যখন সকলেই ব্যস্ত এমন সময় অকস্মাৎ একদিন হিজলী বন্দীশালায় বন্দীদের উপর নৃশংস গুলিবর্ষণের খবর আসিল (১৬ই সেপ্টেম্বর)। ঘটনার পূর্বে কতকগুলি কারা-অধিকার ও নিয়মশৃঙ্খলার প্রশ্নে রাজবন্দীদের সঙ্গে সশস্ত্র কারারক্ষীদের তীব্র বচসা ও বাদানুবাদ হয়। ইহার পর রাত্রিকালে কারারক্ষীরা ওয়ার্ডে ঢুকিয়া অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া রাজবন্দীদের উপর প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ করে এবং শেষে রাইফেলের কুঁদা দিয়া আহত বন্দীদের উপর বেদম প্রহার চালায়। ইহার ফলে সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন নামে দুইজন রাজবন্দী নিহত এবং প্রায় ২০ জন ভয়ঙ্করভাবে আহত হন।

এই সংবাদে কলিকাতায় ও বাংলা দেশের সর্বত্র প্রচণ্ড উত্তেজনা ও বিক্ষোভ দেখা দেয়।

কলিকাতায় এই সংবাদ পৌঁছানর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জে. এম. সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র ও অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জী প্রমুখ নেতৃস্থানীয়রা হিজলী যাত্রা করেন। প্রাথমিক তদন্তাদির পর—পরদিন ১৮ই সেপ্টেম্বর, অপরাহ্ণে তাঁহারা স্পেশাল ট্রেনযোগে সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন-এর শব লইয়া হাওড়ায় পৌঁছিলেন। স্টেশনে অপেক্ষমান বিশাল জনসমুদ্র মুহুর্মুহু গর্জন করিয়া বিক্ষোভ প্রকাশ করিতেছিল। তারপর সেই বিশাল জনতা মিছিল করিয়া কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে গিয়া শব সৎকার করেন।

এই ঘটনার পর অন্তত একটা সুফল হইল। বাংলাদেশে সেনগুপ্ত-সুভাষের দীর্ঘকালব্যাপী যে দলীয় কোন্দল চলিতেছিল হিজলীর ঘটনার পর তাহার অবসান হয়। ঐ-দিনই রাত্রে সুভাষচন্দ্র বি. পি. সি. সি. হইতে পদত্যাগ করিয়া এক তীব্র আবেগময়ী ভাষায় বিবৃতি দেন। এই বিবৃতিতে তিনি কংগ্রেস কর্মীদের সকল বিভেদ অনৈক্য ভুলিয়া গিয়া বাংলাদেশে এক ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেস গঠনের আবেদন জানাইয়া বলেন :

"আমি খড়্গপুর হইতে অবর্ণনীয় বেদনা লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। আমাদের বন্ধুগণকে জেলের মধ্যে কুকুর-বিড়ালের মত গুলী করিয়া মারিবে আর আমরা তখনই বিবাদ বিসম্বাদে রত থাকিব! সকল বিভেদ ভুলিয়া আজ আমাদিগকে পরস্পরের সহিত পরস্পরকে মিলিত হইতে হইবে—শত্রুর বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।"...

পরদিন কলিকাতায় মনুমেন্টের পাদদেশে এক বিশাল জনসভায় বাংলা কংগ্রেসের উভয় দলের নেতারা ঐক্যবদ্ধভাবে হিজলীর গুলিচালনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করিলেন। সে এক দৃশ্য! একই মঞ্চে সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্র যখন পাশাপাশি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সমবেত বিশাল জনতা বিপুল আবেগ-উচ্ছ্বাসে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিলেন। আবেগরুদ্ধকণ্ঠে সুভাষচন্দ্র বলিলেন :

"বহুদিন পর বাংলার কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ আজই একই উদ্দেশ্য লইয়া একই মঞ্চে সমবেত হইয়াছেন। বাংলা বিভেদ অনৈক্যের কুফল আজ মর্মে মর্মে অনুভব করিতে পারিয়াছে। আশা করি, আজ আত্মোৎসর্গীদের এই মহান আত্মত্যাগের উপর ভিত্তি করিয়া বাংলার বিরাট ঐক্য-সৌধ গড়িয়া উঠিবে।...

[দ্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা : ৩রা আশ্বিন ১৩৩৮ : ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১]

রবীন্দ্রনাথ তখন কলিকাতায়। হিজলীর সংবাদে তিনি যে কী পরিমাণ ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হন তাহা সহজেই অনুমেয়। ঐ সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গীতোৎসব বন্ধ করিবার নির্দেশ দেন। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কী ভাবে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রকাশ করা যায় কবি তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। জে. এম. সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতারা বিক্ষোভ সভার প্রস্তাব লইয়া কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কবি সানন্দে তাহাতে সম্মতি দেন। স্থির হয়, কয়েকদিন পর—২৬শে সেপ্টেম্বর এই বিক্ষোভসভায় কবি স্বয়ং সভাপতিত্ব করিবেন।

তদনুসারে ২৬শে সেপ্টেম্বর, অপরাহ্ণে কলিকাতা টাউন হলে এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার উদ্দেশ্যে এক জনসভার আহ্বান করা হয়। নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই টাউন হলে এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকায় এমন প্রচণ্ড ভিড় ও জনসমাগম হয় যে, সভার উদ্যোক্তারা শেষ পর্যন্ত স্থান পরিবর্তন করিয়া মনুমেণ্টের পাদদেশে সভা করা স্থির করেন। এই সংবাদে মুহূর্তের মধ্যেই সেই বিশাল জনসমুদ্র বিভিন্ন ধ্বনিতে গর্জন করিতে করিতে মনুমেণ্টের দিকে ধাবিত হইল। কিন্তু সেখানেও এত বিশাল জনসমাবেশ হয় যে, উদ্যোক্তাদের মনুমেণ্টের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুটি জমায়েত বা সভা সংগঠিত করিতে হয়। সকলেই কবিকে দেখিতে—কবি কি বলেন শুনিবার জন্য অদম্য আগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। কবি মনুমেণ্টের উত্তর দিকের জমায়েতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ভাষণ পাঠ করেন। আগেরদিন হইতেই কবির শরীর অসুস্থ ছিল, এই কারণে তাঁহার জন্য একটি ইন্‌ভ্যালিড্ চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু সারাক্ষণ দাঁড়াইয়া তীব্র আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে কবি তাঁহার ভাষণ পাঠ করেন। ভাষণটি এই :

"প্রথমেই বলে রাখা ভালো, আমি রাষ্ট্রনেতা নই, আমার কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্রিক আন্দোলনের বাইরে। কর্তৃপক্ষদের কৃত কোনো অন্যায় বা ত্রুটি নিয়ে সেটাকে আমাদের রাষ্ট্রিক খাতায় জমা করতে আমি বিশেষ আনন্দ পাই নে। এই-যে হিজলীর গুলি চালানো ব্যাপারটি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব নিয়ে যা-কিছু আমার বলবার সে কেবল অবমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে।

"এতবড়ো জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তিজনক, কিন্তু যখন ডাক পড়ল থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষকনামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতক নিষ্ঠুরতাদ্বারা চিরদিনের মতো নীরব করে দিয়েছে।

"যখন দেখা যায় জনমতকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে এত অনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার সম্ভবপর হয় তখন ধরে নিতেই হবে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত হয়েছে এবং এখন থেকে আমাদের ভাগ্যে দুর্দাম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশঙ্কা ঘটল। যেখানে নির্বিবেচক অপমান ও অপঘাতে পীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে এত সহজ, অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের ও অন্যায়-প্রতিকারের আশা এত বাধাগ্রস্ত, সেখানে প্রজারক্ষার দায়িত্ব যাদের 'পরে সেই-সব শাসনকর্তা এবং তাদেরই আত্মীয়-কুটুম্বদের শ্রেয়োবুদ্ধি কলুষিত হবেই এবং সেখানে ভদ্রজাতীয় রাষ্ট্রবিধির ভিত্তি জীর্ণ না হয়ে থাকতে পারে না।

"এই সভায় আমার আগমনের কারণ আর কিছু নয়, আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই বলে সতর্ক করতে চাই যে, বিদেশীরাজ যত পরাক্রমশালী হোক-না কেন আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। এই আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা ন্যায়পরতায়, ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়। প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করানো রাজার পক্ষে কঠিন না হতে পারে, কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে তখন

তাকে নিরস্ত করতে পারে কোন্ শক্তি। এ কথা ভুললে চলবে না যে, প্রজার অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের 'পরেই অবশেষে বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

"আমি আজ উগ্র উত্তেজনাবাক্য সাজিয়ে সাজিয়ে নিজের হৃদয়াবেগের ব্যর্থ আড়ম্বর করতে চাইনে এবং এই সভার বক্তাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁরা যেন এই কথা মনে রাখেন যে, ঘটনাটা স্বতই আপন কলঙ্কলাঞ্ছিত নিন্দার পতাকা যে উচ্চে ধরে আছে তত ঊর্ধ্বে আমাদের ধিক্কারবাক্য পূর্ণবেগে পৌঁছুতেই পারবে না। এ কথাও মনে রাখতেই হবে যে, আমরা নিজের চিত্তে সেই গম্ভীর শান্তি যেন রক্ষা করি যাতে করে পাপের মূলগত প্রতিকারের কথা চিন্তা করবার স্থৈর্য আমাদের থাকে এবং আমাদের নির্যাতিত ভ্রাতাদের কঠোর কঠিন দুঃখ স্বীকারের প্রত্যুত্তরে আমারও কঠিনতর দুঃখ ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে পারি।

"উপসংহারে শোকতপ্ত পরিবারদের নিকট আমাদের আন্তরিক বেদনা নিবেদন করি এবং সেই সঙ্গে এ কথাও জানাই যে, মর্মভেদী দুর্যোগের একদা সম্পূর্ণ অবসান হলেও দেশবাসী সকলের ব্যথিক স্মৃতি দেহমুক্ত আত্মার বেদীমূলে পূর্ণশিখায় উজ্জ্বল দীপ্তি দান করবে।" [কালান্তর : পৃঃ ৩৮০-৮১]

ভাষণ দানের পরই কবি শারীরিক অসুস্থতার জন্য সভাস্থল ত্যাগ করিয়া যান।

চারিদিকে এই উত্তেজনা ও বিক্ষোভ প্রকাশ চলিতে থাকিলে গভর্নমেণ্ট আর জনমতকে একেবারে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ইহার অনতিকাল পরেই বাংলা সরকার বিচার বিভাগের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের লইয়া গুলিচালনার বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন (৩রা অক্টোঃ ১৯৩১)। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সত্যেন্দ্রনাথ মল্লিক এবং রাজসাহী বিভাগের কমিশনার জে. জে. ড্রামণ্ডকে লইয়া এই তদন্ত-কমিটি গঠিত হয়।

কলিকাতা ময়দানে ভাষণ দানের কয়েকদিন পরই কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। শান্তিনিকেতনে তখন গান্ধীজীর ৬২-তম জন্মদিবস পালনের উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছিল। ২রা অক্টোবর শান্তিনিকেতন হইতে কবি বিলাতে গান্ধীজীর নিকট এক তারবার্তায় তাঁহার জন্মদিবস উপলক্ষে নিম্নলিখিত শুভেচ্ছা-বাণীটি পাঠান :

"আপনার শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে আমরা আপনাকে সম্মিলিতভাবে আমাদের সশ্রদ্ধ ভালবাসার অর্ঘ নিবেদন করিতেছি।"

তাছাড়া কবি গান্ধীজীর জন্মদিবস উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশ্য 'ফ্রী প্রেসে'র মারফত নিম্নলিখিত বাণীটি প্রেরণ করেন (বোলপুর-২রা অক্টোবর) :

"আমাদের দেশের উপর সবচেয়ে বড় শত্রু প্রভুত্ব করিতেছে, তাহা হইতেছে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার, জাতিভেদের গোঁড়ামি ও ধর্মের অন্ধতা। সমুদ্রপারের যে প্রভুত্ব বিদেশীদের মধ্য দিয়া আমাদের উপর শাসন করিতেছে, এই সমস্ত অজ্ঞতা ও সংস্কারের বিদ্বেষ তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী কঠোরতর। এই সমস্ত অমঙ্গলের যতদিন মূলোচ্ছেদ না হইবে, ততদিন আমরা ভোটের অধিকার ও সুবিধালাভের

প্রত্যাশায় যতই বিবাদ করি না কেন, প্রকৃত স্বাধীনতা আমরা কিছুতেই পাইব না। মহাত্মা গান্ধী আমাদিগকে এক নবতর জীবনের শক্তি এবং স্বাধীনতালাভের এক দৃঢ়তর সংকল্পের সাহস দিয়াছেন—আজ সেই গান্ধীজীর জন্মতিথিতে আমাদিগকে এই কথাগুলিই স্মরণ রাখিতে হইবে। অবশ্য আমরা অনুভব করিতেছি যে মহাত্মাজি তাঁহার ব্যক্তিগত নৈতিক জীবনের প্রচণ্ড শক্তি দ্বারা সমগ্র দেশের মধ্যে যে আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ঔদাসীন্য ও আত্মবিস্মৃতির পথ হইতে দুর্জয় সংকল্পের পথে টানিয়া আনিয়াছেন, তাহা একান্তভাবে তাঁহারই সৃষ্ট আন্দোলন; তথাপি আমরা আশা করিতেছি যে, সমগ্র জাতির নিদ্রিত মনের এই জাগরণের ফলে ভারতকে সমস্ত সামাজিক দুর্গতি হইতে উদ্ধারের জন্য সাহায্য করিবে এবং ভারতের পূর্ণতালাভের পথে যে বাধা আছে তাহা দূর হইয়া যাইবে।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ১৬ই আশ্বিন ১৩৩৮ : ৩রা অক্টোবর, ১৯৩১]

ঐদিনই শান্তিনিকেতন মন্দিরে আয়োজিত উৎসব-সভায় কবি তাঁহার ভাষণে বলেন :

…"কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনসিদ্ধির মূল্য আরোপ করে তাঁকে আমরা দেখব না, যে দৃঢ়শক্তির বলে তিনি আজ সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রবল ভাবে সচেতন করেছেন সেই শক্তির মহিমাকে আমরা উপলব্ধি করব। প্রচণ্ড এই শক্তি সমস্ত দেশের বুকজোড়া জড়ত্বের জগদ্দল পাথরকে আজ নাড়িয়ে দিয়েছে; কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের যেন রূপান্তর জন্মান্তর ঘটে গেল। ইনি আসবার পূর্বে দেশ ভয়ে আচ্ছন্ন, সংকোচে অভিভূত ছিল; কেবল ছিল অন্যের অনুগ্রহের জন্য আবদার আবেদন, মজ্জায় মজ্জায় আপনার 'পরে আস্থাহীনতার দৈন্য।

…"এই আমাদের আত্মকৃত পরাভব থেকে মুক্তি দিলেন মহাত্মাজি; নববীর্যের অনুভূতির বন্যাধারা ভারতবর্ষে প্রবাহিত করলেন। এখন শাসনকর্তারা উদ্যত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে রফানিষ্পত্তি করতে; কেননা তাঁদের পরশাসনতন্ত্রের গভীরতর ভিত্তি টলেছে, যে ভিত্তি আমাদের বীর্যহীনতায়। আমরা অনায়াসে আজ জগৎ-সমাজে আমাদের স্থান দাবি করছি।

"তাই আজ আমাদের জানতে হবে, যে মানুষ বিলেতে গিয়ে রাউণ্ড্ টেবিল কন্‌ফারেন্সে তর্কযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন, যিনি খদ্দর চরকা প্রচার করেন, যিনি প্রচলিত চিকিৎসাশাস্ত্রে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে বিশ্বাস করেন বা করেন না—এই-সব মতামত ও কর্মপ্রণালীর মধ্যে যেন এই মহাপুরুষকে সীমাবদ্ধ করে না দেখি। সাময়িক যে-সব ব্যাপারে তিনি জড়িত তাতে তাঁর ত্রুটিও ঘটতে পারে, তা নিয়ে তর্কও চলতে পারে—কিন্তু এহ বাহ্য। তিনি নিজে বারংবার স্বীকার করেছেন, তাঁর ভ্রান্তি হয়েছে; কালের পরিবর্তনে তাঁকে মত বদলাতে হয়েছে। কিন্তু এই-যে অবিচলিত নিষ্ঠা যা তাঁর সমস্ত জীবনকে অচলপ্রতিষ্ঠ করে তুলেছে, এই-যে অপরাজেয় সংকল্পশক্তি, এ তার সহজাত, কর্ণের সহজাত কবচের মতো—এই শক্তির প্রকাশ মানুষের ইতিহাসে চিরস্থায়ী সম্পদ। প্রয়োজনের সংসারে নিত্য-পরিবর্তনের ধারা বয়ে চলেছে; কিন্তু সকল প্রয়োজনকে অতিক্রম করে যে মহাজীবনের

মহিমা আজ আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হল তাকেই যেন আমরা শ্রদ্ধা করতে শিখি।"
[মহাত্মা গান্ধী : পৃঃ-৩১-৩৪]

রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর কোন্ মূর্তিকে বেশী শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি দিতেন তাহা এই ভাষণের মধ্যে অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গান্ধীজীর *Hind Swaraj*-এর জীবনদর্শন কিংবা তাঁর আর্থনীতিক মতকে কবি কোনদিনই সমর্থন করেন নাই ;—এখনও করলেন না।

স্মরণ রাখা দরকার, এই সময় (১৯২৯-৩৩) জগদ্ব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা ও ভয়াবহ সঙ্কট চলিতেছে। তাহারই অনিবার্য প্রতিক্রিয়া অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে দেখা দেয়। ইহার প্রথম চোট্ পড়ে কৃষি-অর্থনীতিতে ও পল্লীবাসীর উপর। কৃষিপণ্যের দর হু-হু করিয়া পড়িয়া গেল। গ্রামের বেকারেরা সহরে ও শিল্পাঞ্চলে চাপ সৃষ্টি করিতে লাগিল। অপরদিকে ভারতের চা, পাটকল, বস্ত্রশিল্প, কয়লা ও অন্যান্য খনিজ-শিল্পেও সঙ্কট দেখা দেয়। ফলে বহু শিল্প-শ্রমিকেরা বেকার হইয়া পড়ে। তাছাড়া শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বেকারের সংখ্যাও বহুগুণ বাড়িয়া যায়। অবশ্য এই পরিস্থিতিতে বোম্বাই আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্প মালিকেরা কিছুটা সুযোগ করিয়া লইতে সক্ষম হয়। নানা কারণে তাহারা ভারতের বস্ত্রশিল্পে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সংগঠিত ও সমৃদ্ধ হইয়াছিল। অসহযোগ আন্দোলন কালে (১৯২১-২৩) এবং বিশেষতঃ আইন-অমান্য আন্দোলনে বিদেশী পণ্য বয়কট আন্দোলনের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া এই সঙ্কটকালেও তাহারা বেশ কিছুটা গুছাইয়া লইয়াছিল। কিন্তু পুঁজিপতিদের 'স্বদেশপ্রেম' তাহাদের ব্যক্তিগত মুনাফার স্বার্থেই। যখন তাহারা দেখিল দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বদেশী কয়লা অপেক্ষাও সস্তাদরে কয়লা পাওয়া যায়, তখন হইতে তাহারা দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে কয়লা কিনিতে লাগিল। ফলে বাংলা বিহারের কয়লা খনিতে ইহার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আঘাত পড়ে। অপরদিকে বাংলা দেশে যে-কয়টি কাপড়ের কল বা বস্ত্রশিল্প ছিল তাহাদেরও বোম্বাই-আমেদাবাদের বস্ত্রের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কিছুকাল হইতে 'বাঙালীর শিল্প' 'বাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্য' গড়িয়া তুলিবার আন্দোলন চালাইতেছিলেন। এই সঙ্কটকালে তিনি বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতার হাত হইতে বাংলার বস্ত্রমিলগুলিকে রক্ষা করিবার আন্দোলন শুরু করেন। এই সময় তিনি রবীন্দ্রনাথকে এই আন্দোলনের সম্পর্কে কিছু লিখিবার অনুরোধ জানান। কবি এই উপলক্ষেই এই সময় 'বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত' প্রবন্ধটি (প্রবাসী-কার্তিক ১৩৩৮) রচনা করেন। কবি তাঁহার প্রবন্ধের শুরুতেই এই আন্দোলনে সমর্থন জানাইয়া বলিলেন :

"বাংলাদেশের কাপড়ের কারখানা সম্বন্ধে যে-প্রশ্ন এসেছে তার উত্তরে একটি মাত্র বলবার কথা আছে, এগুলিকে বাঁচাতে হবে। আকাশ থেকে বৃষ্টি এসে আমাদের ফসলের খেত দিয়েছে ডুবিয়ে, তার জন্যে আমরা ভিক্ষা করতে ফিরছি—কার কাছে। সেই খেতটুকু ছাড়া যার অন্নের আর-কোনো উপায় নেই ; তারই কাছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে সাংঘাতিক প্লাবন, অক্ষমতার প্লাবন, ধনহীনতার প্লাবন।..."

"আজকের দিনের পৃথিবীতে যারা সক্ষম তারা যন্ত্রশক্তিতে শক্তিমান। যন্ত্রের দ্বারা তারা আপন অঙ্গের বহুবিস্তার ঘটিয়েছে, তাই তারা জয়ী।..."

"দশে মিলে অন্ন উৎপাদন করবার যে যান্ত্রিক প্রণালী তাকে আয়ত্ত করতে না পারলে যন্ত্ররাজদের কনুইয়ের ধাক্কা খেয়ে বাসা ছেড়ে মরতে হবে। মরতেই বসেছি। বাহিরের লোক অন্নের ক্ষেত্রের থেকে ঠেলে ঠেলে বাঙালিকে কেবলি কোণ-ঠ্যাসা করছে।..." [পল্লীপ্রকৃতি : পৃঃ ১৪৮]

কবি বলেন, একদিন বাঙালী শুধু কৃষিজীবী ও মসীজীবীই ছিল না। একদা বাংলার সমৃদ্ধ কুটিরশিল্প কিভাবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের আমদানীকৃত যন্ত্র-শিল্পের আঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তিনি তাহার আলোচনা করিয়া বলেন যে, বাংলা দেশকে বাঁচিতে হইলে তাহাকে এই যন্ত্রশিল্প গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি বলিলেন, —"আজ এই কলের যুগে কলই সেই পথ। অর্থাৎ প্রকৃতির গুপ্ত ভাণ্ডারে যে শক্তি পুঞ্জিত তাকে আত্মসাৎ করতে পারলে তবেই এ যুগে আমরা টিঁকতে পারব।"

গান্ধীজীর 'হিন্দ স্বরাজ' ও চরকা আর্থনীতিক-দর্শন তখনও দেশের বেশকিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবীদের অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। স্মরণ রাখা দরকার, অসহযোগ-আন্দোলনের সময় হইতে রবীন্দ্রনাথ এক নাগাড়ে এই মতবাদের সমালোচনা করিয়া পশ্চিমের যন্ত্রশিল্পকে গ্রহণ করিবার জন্য আবেদন জানাইয়া আসিতেছিলেন। সেদিন বাংলাদেশে স্বয়ং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রই এই চরকা আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাহার যোগ্য উত্তর দিয়াছিলেন 'চরকা' প্রবন্ধে। এসব কথা পূর্বখণ্ডেই বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। অবশ্য সেদিন কবি যন্ত্রশিল্পকে নীতিগতভাবে সমর্থন করিলেও সে-সম্পর্কে তাঁহার মনে কিছু সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড দেখিয়া আসিবার পর যন্ত্রশিল্প সম্পর্কে তাঁহার পূর্বেকার দ্বন্দ্ব-সংশয় দূর হইয়া যায়। তাই সোভিয়েট রাশিয়া অনুসৃত সমাজ-তান্ত্রিক শিল্পের (অর্থাৎ শিল্পে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা) উল্লেখ করিয়া তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দেশে যন্ত্রশিল্প প্রবর্তনের নির্দেশ দিলেন। তিনি বলিলেন :

"এ কথা মানি—যন্ত্রের বিপদ আছে। দেবাসুরে সমুদ্রমন্থনের মতো সে বিষও উদ্গার করে। পশ্চিম-মহাদেশের কল-তলাতেও দুর্ভিক্ষ আজ গুঁড়ি মেরে আসছে। তা ছাড়া, অসৌন্দর্য, অশান্তি, অসুখ, কারখানার অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যেরই সামিল হয়ে উঠল। কিন্তু এজন্য প্রকৃতিদত্ত শক্তিসম্পদকে দোষ দেব না, দোষ দেব মানুষের রিপুকে। খেজুরগাছ, তালগাছ বিধাতার দান; তাড়িখানা মানুষের সৃষ্টি। তালগাছকে মারলেই নেশার মূল মরে না। **যন্ত্রের বিষদাঁত যদি কোথাও থাকে, তবে সে আছে আমাদের লোভের মধ্যে। রাশিয়া এই বিষদাঁতটাকে সজোরে ওপড়াতে লেগেছে, কিন্তু সেইসঙ্গে যন্ত্রকে সুদ্ধ টান মারে নি। উল্টো, যন্ত্রের সুযোগকে সর্বজনের পক্ষে সম্পূর্ণ সুগম করে দিয়ে লোভের কারণটাকে সে ঘুচিয়ে দিতে চায়।**
(বড় হরফ আমার)

..."তাই আজ রাশিয়া ধনোৎপাদনের যন্ত্রটাকে যখন সর্বজনীন করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত, তখন যন্ত্র যন্ত্রী ও কর্মী আনাতে হচ্ছে যন্ত্রদক্ষ কারবারী দেশ থেকে। তাতে

বিস্তর ব্যয় ও বাধা। রাশিয়ার অনভ্যস্ত হাত দুটো এবং তার মন না চলে দ্রুত-গতিতে, না চলে নিপুণভাবে।" [ঐ : পৃঃ. ১৪৯-৫০]

বাংলা দেশের আর্থিক বিপর্যয়ের কারণ উল্লেখ করিতে গিয়া কবি বলিলেন যে, ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বাংলাদেশেই ইংরাজী শিক্ষার পাঠ লইয়া ইউরোপের জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল বটে কিন্তু ইউরোপের যন্ত্রবিদ্যা আয়ত্ব করিতে মনস্থ করে সর্বশেষে এবং সেই কারণেই তাহার আজ এত দুর্গতি। তিনি বলিলেন :

..."আমরা য়ুরোপের বৃহস্পতি গুরুর কাছ থেকে প্রথম হাতে খড়ি নিয়েছি, কিন্তু য়ুরোপের শুক্রাচার্য জানেন কী করে মার বাঁচানো যায়—সেই বিদ্যার জোরেই দৈত্যেরা স্বর্গ দখল করে নিয়েছিল। শুক্রাচার্যের কাছে পাঠ নিতে আমরা অবজ্ঞা করেছি—সে হল হাতিয়ার-বিদ্যার পাঠ। এইজন্যে পদে পদে হেরেছি, আমাদের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়ল।

"বোম্বাই প্রদেশে এ কথা বললে ক্ষতি হয় না যে, 'চরখা ধরো'। সেখানে লক্ষ লক্ষ কলের চরখা পশ্চাতে থেকে তার অভাব পূরণ করছে। বিদেশী কলের কাপড়ের বন্যার বাঁধ বাঁধতে পেরেছে ঐ কলের চরখায়। নইলে একটিমাত্র উপায় ছিল নাগা-সন্ন্যাসী সাজা। বাংলাদেশে হাতের চরখাই যদি আমাদের একমাত্র সহায় হয় তা হলে তার জরিমানা দিতে হবে বোম্বাইয়ের কলের চরখায় পায়ে। তাতে বাংলার দৈন্যও বাড়বে, অক্ষমতাও বাড়বে। বৃহস্পতি গুরুর কাছে যে বিদ্যা লাভ করেছি—তাকে পূর্ণতা দিতে হবে শুক্রাচার্যের কাছে দীক্ষা নিয়ে। যন্ত্রকে নিন্দা করে যদি নির্বাসনে পাঠাতে হয়, তা হলে যে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে সেই নিন্দা রটাই তাকে সুদ্ধ বিসর্জন দিয়ে হাতে-লেখা পুঁথির চলন করতে হবে।"... [ঐ : পৃঃ. ১৫১-৫২]

লক্ষ্য করিবার বিষয়, ইতিপূর্বে কবি এতখানি দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট ভাষায় আধুনিক শিল্পায়নের (বা mordern industrialisation) জন্য নির্দেশ দেন নাই। দ্বিতীয়ত এখানে আর একটি বিষয়ে তিনি পরিষ্কার বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন যে, বাংলাদেশে যথোপযুক্ত শিল্পায়ন না করিয়া বাংলাকে শুধু চরখা কাটিতে বলিলে তাহার পরিণামে বাংলার রক্তে বোম্বাই মিলমালিকরা আরও স্ফীত হইয়া উঠিবে। কেননা বিদেশী পণ্য বয়কট ও স্বদেশী পণ্য ব্যবহার আন্দোলনের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহারাই অধিকতর লাভবান হয়। আইন-অমান্য আন্দোলনের অর্থনৈতিক দিকটির পর্যালোচনা করিতে গিয়া টেণ্ডুলকর লিখিতেছেন :

"By the autumn of 1930 imports of cotton piecegoods had went down to between a third and a fourth of what they were in the same months of the previous year. The cigarettes had fallen in value to a sixth of the old figure. Sixteen British-owned mills in Bombay had been closed down. On the other hand, the Indian-owned mills which had given the pledge were working double shifts. About 113 mills signed declaration, to which they agreed, to eliminate competition of mill cloth with khaddar by refraining from producing cloth of counts below eighteen. So great was the rush for khaddar that all stocks

were depleted, though the production all over rose by 70 per cent, from 63 lakhs of yards to 113 lakhs of yards. The total number of khadi stores at the end of 1930 was 600, as against 384 in 1929. The production activities of the All-India Spinners' Association covered during the year some 6,494 villages and found employment for 1,39,969 spinners, 11,426 weavers and 1,006 carders."

[*Mahatma* : Vol. III : P. 44]

এই পর্যালোচনা ও সমীক্ষাতে মোটামুটিভাবে কবির বক্তব্যের সমর্থনেই যুক্তি পাওয়া যায়। বোম্বাই মিল মালিকেরা কংগ্রেস নেতাদের নিকট প্রতিশ্রুত শর্তেও যেভাবে স্ফীত ও সুসংগঠিত হইবার সুযোগ পায় উহা বোম্বাই খাদিশিল্পের পক্ষে না-হইলেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বস্ত্র-শিল্পের পক্ষে ভবিষ্যৎ-বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে যদি না অন্যান্য প্রদেশেও যথোপযুক্ত শিল্পায়ন হয়—বিশেষত বস্ত্রশিল্পের। কবির এই আশঙ্কার আরও কারণ আছে। তিনি বিশ্বাস করিতেন, আজ যাহারা স্বাদেশিকতার আবেগে খাদি পরিধান করিতেছে তাহা সাময়িক ; এই আবেগ স্বাভাবিক কারণেই কমিয়া গেলে পর আখেরে বোম্বাইয়ের মিলগুলিরই একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, যাহার ফলে বাংলার মত প্রদেশগুলির আর্থিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে। এই কারণেই বাংলার আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবেই কবি বাংলার শিল্পায়নের উপর গুরুত্ব দিতেছিলেন। তাই কবি বাংলাদেশের 'বঙ্গলক্ষ্মী' ও 'মোহিনী মিল' প্রভৃতি কাপড়কলগুলিকে রক্ষা করিবার আহ্বান জানাইয়া বলিলেন :

"এদের যেমন করে হোক রক্ষা করতে হবে—বাঙালির উপর এই দায় রয়েছে।...

"বাংলার মিল থেকে যে কাপড় উৎপন্ন হচ্ছে, যথাসম্ভব একান্তভাবে সেই কাপড়ই বাঙালি ব্যবহার করবে ব'লে পণ করে। একে প্রাদেশিকতা বলে না, এ আত্মরক্ষা। উপবাসক্লিষ্ট বাঙালির অন্নপ্রবাহ যদি অন্য প্রদেশের অভিমুখে অনায়াসে বইতে থাকে এবং সেইজন্য বাঙালির দুর্বলতা যদি বাড়তে থাকে, তবে মোটের উপর তাতে সমস্ত ভারতেরই ক্ষতি। আমরা সুস্থ সমর্থ হয়ে দেহরক্ষা করতে যদি পারি তবেই আমাদের শক্তির সম্পূর্ণ চালনা সম্ভব হতে পারে। সেই শক্তি নিরশনক্ষীণতায় অবমর্দিত হলে তাতে, শুধু ভারতকে কেন, পৃথিবীকেই বঞ্চিত করা হবে।"

তিনি আরও বলিলেন :

"বাঙালির ঔদাসীন্যকে ধাক্কা দিয়ে দূর করা চাই। আমাদের কোন কারখানায় কিরকম সামগ্রী উৎপন্ন হচ্ছে বার বার সেটা আমাদের সামনে আনতে হবে। কলকাতা ও অন্যান্য প্রাদেশিক নগরীর মিউনিসিপ্যালিটির কর্তব্য হবে প্রদর্শনীর সাহায্যে বাংলার সমস্ত উৎপন্নদ্রব্যের সংবাদ নিয়ত প্রচার করা এবং বাঙালি যুবকদের মনে সেই উৎসাহ জাগানো যাতে বিশেষ করে তারা বাঙালির হাতের ও কলের জিনিস ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়।"

[ঐ : পৃঃ. ১৫২-৫৩]

প্রশ্ন হইবে, কবির এই চিন্তায় সত্যই কি প্রাদেশিকতার গন্ধ নাই। একেবারেই ছিল না এমন কথা বলা যায় না অবশ্য উহার জন্য কবির বলিবার ভঙ্গীই অধিক

দায়ী। কিন্তু এই প্রশ্ন উঠিবার আগে একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষে সুস্থ ও সুসম শিল্পায়ন হয় নাই। বিদেশী পুঁজির কথা বাদ দিলে সেদিনকার ভারতবর্ষে বিশেষ কয়েকটি প্রদেশে বিশেষ কয়েকটি জাতি-সম্প্রদায়ের হাতে দেশীয় পুঁজি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্তৃত্ব আসিয়া যায়। একথা সত্য, বাংলাদেশে তাহার পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলি অপেক্ষা কল-কারখানা আপেক্ষিক-ভাবে কিছুটা বেশি হইলেও তাহা তাহার প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। আসল কথা, ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষে সত্যকার শিল্পায়ন হয় নাই; কেননা ঔপনিবেশিক শোষণের জন্য তাহাকে কৃষি-নির্ভর করিয়া রাখাই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-নীতির মূলকথা। সুতরাং দেশের প্রতিটি প্রদেশেই শিল্পায়নের পর্যাপ্ত সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। সুতরাং এক্ষেত্রে বাংলার আর্থনীতিক পুনর্গঠনের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে শিল্পায়নের প্রস্তাব দেন, প্রকৃতপক্ষে তাহাতে ঠিক প্রাদেশিকতার সংকীর্ণতা ছিল না। তাছাড়া এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলার কথাই বলেন নাই—সারা ভারতবর্ষ জুড়িয়াই তিনি শিল্পায়নের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানাইতেছিলেন। অবশ্য সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে সুসম ও সুপরিকল্পিত শিল্পায়ন হওয়া দরকার, একথা স্পষ্টভাবে তিনি বলিতে পারিলেন না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথ শুধু বস্ত্রশিল্প বা নির্বিচারে কল-কারখানা প্রবর্তনের কথাই বলেন নাই। তিনি বাংলার হস্তচালিত-তাঁত ও কুটির শিল্পগুলিকে রক্ষা করার জন্য সমান গুরুত্ব দিতেছিলেন। কারু-শিল্পের দিক হইতে এবং দেশের অর্থনৈতিক বিচারে ইহাদের যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এ বিষয়ে কবি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। কিন্তু বাংলার তাঁতিরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিদেশ হইতে আমদানীকৃত সুতা ব্যবহার করিতেছিলেন। চটকদার পাড় ও শাড়ির জন্য তাঁহারা বিদেশী নকল রেশম সুতাও ব্যবহার করিতেছিলেন। খাদিপন্থীরা ইহা সমর্থন বা অনুমোদন করিতে পারেন নাই। যেহেতু বাংলার তাঁতিরা বিদেশী সুতা ব্যবহার করে এবং সেই কারণেই তাঁতবস্ত্র স্বদেশী বস্ত্র নয়—কবি খাদি-পন্থীদের এই অজুহাত খণ্ডন করিতে গিয়া বোম্বাই মিল-মালিকদের নজির দিয়া বলিলেন :

…"বোম্বাইয়ের যে-সমস্ত কারখানা দক্ষিণ-আফ্রিকার কয়লায় কল চালিয়ে কাপড় বিক্রি করছে, তাদের কাপড় কেনায় যদি আমাদের দেশাত্মবোধে বাধা না লাগে, তবে আমাদের বাংলাদেশের তাঁতিদের কেন নির্মম হয়ে মারি। বাঙালি দক্ষিণ-আফ্রিকার কোনো উপকরণ ব্যবহার করে না, করে বিলিতি সুতো। তারা বিলেতের আমদানি কোনো কল চালিয়ে কাপড় বোনে না, নিজেদের হাতের শ্রম ও কৌশল তাদের প্রধান অবলম্বন, আর যে তাঁতে বোনে সেও দিশি তাঁত। এখন যদি তুলনায় হিসাব করে দেখা যায়, আমাদের তাঁতের কাপড়ের ও বোম্বাই মিলের কাপড়ের কতটা অংশ বিদেশী, তাহলে কী প্রমাণ হবে। তাছাড়া কেবলই কি পণ্যের হিসাবটাই বড়ো হবে, শিল্পের দাম তার তুলনায় তুচ্ছ? সেটাকে আমরা মূঢ়ের মতো বধ করতে বসেছি। অথচ যে যন্ত্রের বাড়ি তাকে মারলুম সেটা কি আমাদেরই যন্ত্র। সেই

যন্ত্রের চেয়ে বাংলাদেশের বহু যুগের শিক্ষাপ্রাপ্ত গরিবের হাত দুখানা কি অকিঞ্চিৎকর। আমি জোর করেই বলব, পুজোর বাজারে আমাকে যদি কিনতে হয় তবে আমি নিশ্চয়ই বোম্বাইয়ের বিলিতি যন্ত্রের কাপড় ছেড়ে ঢাকার দিশি তাঁতের কাপড় অসংকোচে এবং গৌরবের সঙ্গেই কিনব। সেই কাপড়ের সুতোয় বাংলাদেশের বহু যুগের প্রেম এবং আপন কৃতিত্ব গাঁথা হয়ে আছে।"

উপসংহারে তিনি গান্ধীবাদী খাদি প্রচারকদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন :

"এ কথা বলা বাহুল্য বাংলা তাঁতে স্বদেশী মিলের বা চরখার সুতো ব্যবহার করেও তাকে বাজারে চলন-যোগ্য দামে বিক্রি করা যদি সম্ভবপর হয়, তবে তার চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না। স্বদেশী চরখার উৎপাদনশক্তি যখন সেই অবস্থায় পেঁছবে তখন তাঁতিকে অনুনয়-বিনয় করতেই হবে না; কিন্তু যদি না পেঁছয়, তবে বাঙালি তাঁতিকে ও বাংলার শিল্পকে বিলিতি লোহযন্ত্র ও বিদেশী কয়লার বেদীতে বলিদান করব না।" [ঐ : পৃঃ ১৫৩-৫৪]

এই প্রবন্ধের উপলক্ষ্য যাহাই হোক না কেন, অর্থনৈতিক চিন্তার দিক হইতে বলা যায় যে, ইহার মধ্যে কবির সামঞ্জস্যপূর্ণ ও পরিণত চিন্তার লক্ষণই সূচিত হইয়াছে। কবি ইতিপূর্বে কৃষির উন্নতি ও পল্লী-উন্নয়ন বিষয়ে বহুবার অজস্র কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এখানে শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি যন্ত্র-শিল্প ও কুটির-শিল্প—উভয়ের উপরই সমান গুরুত্ব দিলেন। যন্ত্র-শিল্প ও কুটির-শিল্পের পারস্পরিক সম্পর্ক কি হইবে, উভয় শিল্পের রক্ষা ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্প্রসারণের জন্য কি কি বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে সে আলোচনার ক্ষেত্র এই প্রবন্ধ নয়। কবি শ্রীনিকেতনে আপনার এলাকায় এইসবের বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতেছিলেন। তাহাড়া রবীন্দ্রনাথ এইসব বিষয়ে আপনার এক্তিয়ারের সীমা ছাড়াইয়া কথা বলিতেন না। তিনি প্রধানত চিন্তা ও আদর্শগত প্রশ্নেই কথা বলিতেন। উহার বাস্তব প্রয়োগ অথবা দেশগঠনের জন্য ব্যক্তি-বিশেষের খামখেয়ালী চিন্তাকে মোটেই প্রশ্রয় দিতেন না এবং এ জন্য তিনি দেশের বিশেষজ্ঞদের লইয়া পরিকল্পনা কমিটি গঠনের উপরই জোর দিতেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় চরকা বিতর্কের সূচনাতেই তিনি এই পরিকল্পনা কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত দিয়া বলিয়াছিলেন :

…"স্বরাজ গড়ে তোলবার তত্ত্ব বহুবিস্তৃত, তার প্রণালী দুঃসাধ্য এবং কালসাধ্য, তাতে যেমন আকাঙ্ক্ষা এবং হৃদয়াবেগ তেমনি তথ্যানুসন্ধান এবং বিচারবুদ্ধি চাই। তাতে যাঁরা অর্থশাস্ত্রবিৎ তাঁদের ভাবতে হবে, যন্ত্রতত্ত্ববিৎ তাঁদের খাটতে হবে, শিক্ষা-তত্ত্ববিৎ রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ সকলকেই ধ্যানে এবং কর্মে লাগতে হবে। অর্থাৎ দেশের অন্তঃকরণকে সকল দিক থেকে পূর্ণ উদ্যমে জাগতে হবে।"…

[সত্যের আহ্বান : কালান্তর : পৃঃ ২০৭]

কিন্তু তবুও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা থাকিয়া যায়। সেটি হইতেছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ বয়কট আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যটি সঠিকভাবে কোন দিনই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। স্বদেশী আন্দোলনের এবং পরবর্তীকালে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ও যেমন তিনি বয়কট আন্দোলনকে সমর্থন করেন নাই; এখনও তেমনি তিনি করিলেন না। তিনি স্বদেশী শিল্পের রক্ষা ও প্রসারের আন্দোলনের

আহ্বান জানাইলেন অথচ কিভাবে তাহা বাস্তবায়িত করা যায় তাহা সুস্পষ্ট নির্দেশ দিতে পারিলেন না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই যে স্বদেশী শিল্পায়নের পথে প্রধানতম বাধা এবং বয়কট আন্দোলনই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিকে মারাত্মক আঘাত হানিয়াছে যাহার ফলে স্বদেশী শিল্পের প্রসার ঘটিয়াছে—এসব কথা তিনি যথাযথ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

প্রসঙ্গত বস্ত্রশিল্পের পরিসংখ্যানের দিকে তাকাইলে তৎকালীন অবস্থার একটি চিত্র পাওয়া যাইবে। *Textile Recorder* (April-May 1931) এর মতে—১৯১৩ খৃঃ-এ ল্যাঙ্কাসায়ার হইতে ভারতে কাপড় আমদানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল—৩,০৫৭,৩০৫,৬০০ গজ। মহাযুদ্ধের অবসানে অসহযোগ-আন্দোলনের সময় ১৯২২ সালে বিলেতী কাপড়ের আমদানীর পরিমাণ দাঁড়ায়—১,৩০৭,৬৪৪,১০০ গজ। তাহার পর হইতে ১৯২৯ পর্যন্ত গড়পড়তা প্রতি বৎসর ১,৪১৬,২১৬,০০০ গজ কাপড় আমদানী হইয়াছিল। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথমভাগেই সেই সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৭৭৪,০৭৯,৫০০ গজ। যুদ্ধপূর্বকালের অর্থাৎ ১৯১৩ সালের তুলনায় এই সময়কার পরিমাণ দাঁড়ায় এক-চতুর্থাংশ মাত্র। অর্থাৎ ১৯১৩ এবং ১৯৩০-এর মধ্যে ভারতে বাৎসরিক আমদানী হ্রাস পায়, ১৫,৭৪০ লক্ষ গজ। উল্লেখযোগ্য, ঐ সময়ে জাপান হইতে আমদানী কাপড়ের পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে, ৩১৪০ লক্ষ গজ। ভারতে যত বিদেশী বস্ত্র আমদানী হইত, তাহার শতকরা ৭২·৬ ভাগ আসিত ইংলণ্ড হইতে; ১৯৩০-এ মাত্র ২১·২ ভাগ আসিয়াছে।

পক্ষান্তরে ভারতীয় কলগুলিতে ১৯১৩ হইতে ১৯৩০-এ ১৫,৭৪০ লক্ষ গজ কাপড় বেশী তৈয়ারি হইয়াছে। মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতের নিজস্ব বস্ত্রের দ্বারা ২৭·২ ভাগ পূরণ হইত; কিন্তু ১৯৩১-এ ঐ পরিমাণ ৭০ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। জাপানও পূর্বে ভারতে ১৩·৩ ভাগ বস্ত্র আমদানী করিত, কিন্তু বিদেশী বস্ত্রের উপর রক্ষণশুল্ক স্থাপিত হওয়ায় ঐ সংখ্যা নামিয়া ৯·৫ ভাগে দাঁড়াইয়াছে।

ল্যাঙ্কাসায়ারের ভারতীয় বাণিজ্যের লোকসান হিসাব করিলে মোটামুটি বলা যায়, ২ লক্ষ ২৭ হাজার তাঁত এবং ১ কোটি ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার সুতা কাটিবার টাকু বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

উল্লেখযোগ্য, ১৯৩০ সালে ভারতবর্ষ তাহার প্রয়োজনের মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ কাপড় বিদেশ হইতে আমদানী করিয়াছে। বলা বাহুল্য, তা অবশ্যই বয়কট আন্দোলনের ফল। এরই ফলে ১৯৩০ সালে ইংলণ্ড হইতে ১০০ কোটি গজ কম কাপড় ভারতে আসিয়াছে। ল্যাঙ্কাসায়ারের কলওয়ালারা যে আর্তনাদ করিয়া ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কাঁপাইয়া তুলিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

তারপর বিদেশী কার্পাস সুতা আমদানীর হিসাবে দেখা যায় ১৯২৯-৩০ সালে ৪৪০ লক্ষ পাউণ্ড সুতা আসিয়াছিল। পর বৎসর আসিয়াছে—২৯০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ শতকরা ৩৪ ভাগ আমদানী হ্রাস পাইয়াছে। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এই—ইংলণ্ড হইতে ২০০ লক্ষ পাউণ্ডের পরিবর্তে আসিয়াছে ১০০ লক্ষ পাউণ্ড আর জাপান হইতে ১১০ লক্ষ পাউণ্ডের পরিবর্তে আসিয়াছে ৭০ লক্ষ

পাউণ্ড। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, এইসব বিদেশী সূতায় মাদ্রাজ ও বাংলায় তাঁতির শাড়ি ও ধুতি তৈয়ারি এবং বোম্বাইয়ে কলে বিদেশী সূতায় কিছু কিছু 'দেশী কাপড়' তৈয়ারি হইতেছিল। ১৯৩০ সালেও বাংলায় প্রচুর বিদেশী সূতা আসিয়াছে। এই বিদেশী সূতা কোন কোন কাপড়ের কলে এবং তাঁতিরা ব্যবহার করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ নেতারা ইহাতে দোষের কিছু দেখেন নাই। বলা বাহুল্য তা বাস্তব ব্যবহারিক কারণেই। মনে হয়, এই কারণেই বিদেশী সূতা বয়কট আন্দোলনের সম্পর্কে স্পষ্ট কোন কথা তাঁহারা বলেন নাই।

যাহাই হোক, এইসব পরিসংখ্যানের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, জাতির স্বদেশী পণ্য অনুরাগ বৃদ্ধি এবং আমদানী বিদেশী বস্ত্রে রক্ষণশুল্ক প্রবর্তিত হওয়ায় ভারতের বস্ত্রশিল্প কিছুটা স্বয়ম্ভর হইয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছিল। আর মূলত তা স্বাধীনতা আন্দোলন—বিশেষত বয়কট আন্দোলনের ফলেই। কিন্তু বোম্বাই আমেদাবাদের বস্ত্র ব্যবসায়ীরাই এই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে—পূর্বেই তা উল্লেখ করিয়াছি। অচিরেই বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা ইহার সুদূরপ্রসারী পরিণামের কথা চিন্তা করিয়া আশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। এই সময়ই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও নলিনীরঞ্জন প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা বাংলার শিল্পগঠনের আন্দোলনে অত্যন্ত সক্রিয় হইয়া উঠিলেন। বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকাগুলিও এই দাবীতে সোচ্চার হইয়া উঠিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকা ঐ-সব তথ্যাদির উদ্ধৃতি দিয়া লিখিলেন. (৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ : ১৯ মে, ১৯৩১):

"কিন্তু বাংলাদেশ এই অবস্থার বিশেষ সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। বাংলাদেশে বাৎসরিক ১৫ কোটি টাকার কাপড়ের দরকার হয়। বঙ্গলক্ষ্মী, মোহিনী, ঢাকেশ্বরী, কেশোরাম প্রভৃতি মিলে মোট বাৎসরিক এক কোটি টাকার কাপড় উৎপন্ন হয় কিনা সন্দেহ! বাংলাদেশে আরও কয়েকটি নূতন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে। অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ও ধনীরা এ-বিষয়ে তৎপর না হইলে বাংলাকে বহুল পরিমাণে বোম্বাই, আমেদাবাদ অথবা জাপান এবং ল্যাঙ্কাসায়ারের কুক্ষিগত হইয়া থাকিতে হইবে।"

যাহাই হোক, রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানাইলেও 'বয়কট' আন্দোলনকে সমর্থন করিলেন না।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই সময় সোভিয়েট রাশিয়ার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের (ভকস্-এর) পক্ষে অধ্যাপক পেত্রভ সোভিয়েট রাশিয়ার সাফল্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার অভিজ্ঞতা বা ধারণা ব্যক্ত করিবার অনুরোধ জানাইয়া একটি তারবার্তা পাঠান। কবি উহার জবাবে অধ্যাপক পেত্রভকে তারবার্তায় জানান :

"Your success is due to turning the tide of wealth from the individual to collective humanity.

Our obstacles are social and political insanity, bigotry and illiteracy."

[প্রবাসী : অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ : পৃঃ. ৩০২]

শান্তিনিকেতনে অসুস্থ শরীরেও কবিকে এইসব নানা বিষয়ে কথা বলিতে হয়,

তাছাড়াও নানা ধরনের অনুরোধ-উপরোধও রক্ষা করিতে হয়। উল্লেখযোগ্য, এই সময়ই কবির 'বন-বাণী' কাব্যগ্রন্থ ও 'গীতবিতান' প্রকাশিত হয়।

অক্টোবরের মাঝামাঝি নাগাদ রথীন্দ্রনাথ পিতাকে লইয়া দার্জিলিঙে গেলেন। কিন্তু সেখানে গিয়াও কবির শান্তি নাই। দেশের রাজনীতিক পরিস্থিতি তখন অত্যন্ত উত্তপ্ত ও সংকটজনক। ২৮শে অক্টোবর ঢাকার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডুর্নো এবং পরদিনই কলিকাতায় ক্লাইভ স্ট্রীটে ইউরোপীয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ ভিলিয়ার্স বিপ্লবীদের হাতে গুলীবিদ্ধ হন। এই ঘটনার পরই কলিকাতায় ও ঢাকায় বহু যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়—বিশেষত ঢাকায় পুলিশের অত্যাচার ও পীড়ন অবর্ণনীয় হইয়া উঠে। এই সময়ই হিজলী গুলিচালনা সম্পর্কে বিচার-বিভাগীয় তদন্ত-কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় (৩০শে অক্টোবর)। উহার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'কারারক্ষীদের দোষ অনেক বেশি' এবং গুলিচালনা অত্যন্ত অযৌক্তিক হইয়াছিল বলিয়া মন্তব্য করা হয়। ফলে পূর্ব প্রচারিত সরকারি প্রেস-নোট একেবারে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এই রিপোর্টের এক জায়গায় বলা হয়:

"আমাদের মতে সিপাহীরা যে বন্দীনিবাসের উপর বেপরোয়াভাবে গুলী চালাইয়া (২৯ বার গুলী ছোঁড়া হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে) দুইজন রাজ-বন্দীকে এবং অপর কয়েকজনকে জখম করিয়াছিল, তাহার কোন প্রকার সংগত কারণ ছিল না। বন্দীনিবাসের দালানের ভিতর প্রবেশ করিয়া কয়েকজন সিপাহী যে অপরাপর কয়েকজন রাজবন্দীকে নানাভাবে জখম করিয়াছিল, তাহারও কোন সংগত কারণ ছিল না।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ১৩ই কার্তিক ১৩৩৮ : ৩০শে অক্টোবর, ১৯৩১]

ইহার ফলে 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' প্রভৃতি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলি অত্যন্ত বেকায়দায় পড়িল। তদন্ত-কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকা ব্যাপারটিকে লঘু ও মোলায়েম করিবার জন্য খুনী কারারক্ষীদের প্রতি মানবতা ও সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিবার জন্য লিখে। রবীন্দ্রনাথের কাছে এই ভণ্ডামী অসহ্য। তিনি দার্জিলিং হইতে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার ঐ নির্লজ্জ ওকালতীর স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া একটি বিবৃতি বা খোলা চিঠি পত্র-পত্রিকায় পাঠাইয়া দেন (২রা নভেম্বর)। কিন্তু স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকা কবির এই বিবৃতি তো প্রকাশই করিল না উপরন্তু উহার সম্পাদক আলফ্রেড এইচ. ওয়াট্‌সন্‌ কবির বিবৃতিটি অমল হোমকে ফেরত দিয়া অত্যন্ত অশালীন ভাষায় মন্তব্য করেন, (৩রা নভেম্বর, ১৯৩১):

"I must definitely refuse to publish from Dr. Rabindranath Tagore or any body else a letter which accuses men of murder who have never been tried on that account. I return the letter to you."

[*Calcutta Municipal Gazette* : 13th Sept., 1941 : pp. XI-XIi]

অবশ্য কবির এই খোলা-চিঠি ৪ঠা নভেম্বর কলিকাতার 'আনন্দবাজার' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়। কবি এটির বাংলা তর্জমা পরে 'প্রবাসী'তে পাঠাইয়া দেন। উহার অংশ-বিশেষ এখানে উদ্ধৃত হইল:

"হিজলী কারার যে রক্ষীরা সেখানকার দু জন রাজবন্দীকে খুন করেছে তাদের

প্রতি কোনো একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র খৃস্টোপদিষ্ট মানবপ্রেমের পুনঃপুনঃ ঘোষণা করেছেন। অপরাধীদের প্রতি দরদের কারণ এই যে, লেখকের মতে, নানা উৎপাতে তাদের স্নায়ুতন্ত্রের 'পরে এত বেশি অসহ্য চাড়া লাগে যে, বিচারবুদ্ধিসংগত স্থৈর্য তাদের কাছে প্রত্যাশাই করা যায় না। এই-সব অত্যন্ত চড়া-নাড়ী-ওয়ালা ব্যক্তিরা স্বাধীনতা ও অক্ষুণ্ণ আত্মসম্মান ভোগ করে থাকে ; এদের বাসা আরামের, আহারবিহার স্বাস্থ্যকর ; এরাই একদা রাত্রির অন্ধকারে নরঘাতক অভিযানে সকলে মিলে চড়াও হয়ে আক্রমণ করলে সেই-সব হতভাগ্যদেরকে যারা বর্বরতম প্রণালীর বন্ধনদশায় অনির্দিষ্টকালব্যাপী অনিশ্চিত ভাগ্যের প্রতীক্ষায় নিজেদের স্নায়ুকে প্রতিনিয়ত পীড়িত করছে। সম্পাদক তার সকরুণ প্যারাগ্রাফের স্নিগ্ধ প্রলেপ প্রয়োগ ক'রে সেই হত্যাকারীদের পীড়িত চিত্তে সান্ত্বনা সঞ্চার করেছেন।

"অধিকাংশ অপরাধেরই মূলে আছে স্নায়বিক অভিভূতি এবং লোভ ক্লেশ ক্রোধের এত দুর্দম উত্তেজনা যে তাতে সামাজিক দায়িত্ব ও কৃতকার্যের পরিণাম সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দেয়। অথচ এরকম অপরাধ স্নায়ুপীড়া বা মানসিক বিকার থেকে উদ্‌ভূত হলেও আইন তার সমর্থন করে না ; করে না বলেই মানুষ আত্মসংযমের জোরে অপরাধের ঝোঁক সামলিয়ে নিতে পারে। কিন্তু, করুণার পীযূষকে যদি বিশেষ যত্নে কেবল সরকারি হত্যাকারীদের ভাগেই পৃথক করে জোগান দেওয়া হয় এবং যারা প্রথম হতেই অন্তরে নিঃশাস্তির আশা পোষণ করছে, যারা বিধিব্যবস্থার রক্ষকরূপে নিযুক্ত হয়েও বিধিব্যবস্থাকে স্পর্ধিত আস্ফালনের সঙ্গে ছারখার করে দিল, যদি সুকুমার স্নায়ুতন্ত্রের দোহাই দিয়ে তাদেরই জন্যে একটা স্বতন্ত্র আদর্শের বিচার-পদ্ধতি মঞ্জুর হতে পারে, তবে সভ্যজগতের সর্বত্র ন্যায়বিচারের যে মূলতত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে তাকে অপমানিত করা হবে এবং সর্বসাধারণের মনে এর যে ফল ফলবে তা অজস্র রাজদ্রোহ-প্রচারের দ্বারাও সম্ভব হবে না।

"পক্ষান্তরে এ কথা মুহূর্তের জন্যেও আশা করি নে যে, আমাদের দেশে রাষ্ট্রনৈতিক যে-সব গোঁড়ার দল যথারীতি-প্রতিষ্ঠিত আদালতের বিচারে দোষী প্রমাণিত হবে তারা যেন ন্যায়দণ্ড থেকে নিষ্কৃতি পায়—এমন-কি, যদিও বা চোখের সামনে রোমহর্ষক দৃশ্যে ও কাপুরুষ অত্যাচারীদের বিনা শাস্তিতে পরিত্রাণে তাদের স্নায়ুপীড়ার চরমতা ঘটে থাকে। বিধর্ষিত আত্মীয়স্বজন ও নিজেদের লাঞ্ছিত মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে যদি তারা কোনো কঠোর দায়িত্ব কল্পনা করে নেয়, তবে সেই সঙ্গে একথাও যেন মনে স্থির রাখে যে, সেই দায়িত্বের পুরো মূল্য তাদের দিতেই হবে।…

"তথাপি বে-আইনি অপরাধকে অপরাধ বলেই মানতে হবে এবং তার ন্যায়সংগত পরিণাম যেন অনিবার্য হয় এইটেই বাঞ্ছনীয়। অথচ এ কথাও ইতিহাসবিখ্যাত যে, যাদের হাতে সৈন্যবল ও রাজপ্রতাপ অথবা যারা এই শক্তির প্রশ্রয়ে পালিত তারা বিচার এড়িয়ে এবং বলপূর্বক সাধারণের কণ্ঠরোধ ক'রে ব্যাপকভাবে এবং গোপন প্রণালীতে দুর্বৃত্ততার চূড়ান্ত সীমায় যেতে কুণ্ঠিত হয় নি। কিন্তু মানুষের সৌভাগ্যক্রমে এরূপ নীতি শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারে না।

"পরিশেষে আমি বিশেষভাবে গবর্মেণ্টকে এবং সেই সঙ্গে আমার দেশবাসিগণকে

অনুরোধ করি যে ; অন্তহীন চক্রপথে হিংসা বা প্রতিহিংসার যুগল তাণ্ডবনৃত্য এখনি শান্ত হোক। ক্রোধ ও বিরক্তি-প্রকাশকে বাধামুক্ত করে দেওয়া সাধারণ মানব-প্রকৃতির পক্ষে স্বাভাবিক সন্দেহ নেই, কিন্তু এটা শাসক শাসয়িতা কারও পক্ষেই সুবিজ্ঞতার লক্ষণ নয়।" [কালান্তর : পৃঃ. ৩৮২-৮৪]

এই সময় নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় (৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩১)। সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের পক্ষে কবির নিকট একটি বাণীর জন্য অনুরোধ আসে। কবি ঐ সম্মেলনেয় মুসলমান ছাত্রদের উদ্দেশে একটি বাণী পাঠান :

[দ্রঃ *Modern Review* : Nov. 1931 : P. 536]

দেশের তরুণ ও যুবকদের 'পরে কবি গভীর আস্থা ও আশা ভরসা পোষণ করিতেন ; জাতি-বর্ণ-সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ-বিষ ইহাদের তরুণ সুকুমার মনে প্রবেশ করিতে পারে না। যে ভ্রাতৃঘাতী আত্মকলহের বিষবাষ্প সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া দূষিত করিয়া তুলিয়াছে, একমাত্র দেশের তরুণ যুবকেরাই তাহাকে নির্মূল করিতে পারে। এই কথাই কবি তাঁহার বাণীতে লিখিয়া মুসলিম ছাত্রদের উদ্দেশে আহ্বান জানাইলেন :

"আমাদের দেশে অন্ধকার রাত্রি। মানুষের মন চাপা পড়েচে। তাই অবুদ্ধি, দুর্বুদ্ধি, ভেদবুদ্ধিতে সমস্ত জাতি পীড়িত। আশ্রয়ের আশায় অল্পমাত্র যা-কিছু গ'ড়ে তুলি তা নিজেরই মাথার উপরে ভেঙে ভেঙে পড়ে। আমাদের শুভ-চেষ্টাও খণ্ড খণ্ড হ'য়ে দেশকে আহত করচে। আত্মীয়কে আঘাত করার আত্মাঘাত যে কি সর্বনেশে সে কথা বুঝেও বুঝিনে। যে-শিক্ষা লাভ করচি ভাগ্যদোষে সেই শিক্ষাই বিকৃত হ'য়ে আমাদের ভ্রাতৃবিদ্বেষের অস্ত্র জোগাচ্চে।

"এই যে পাপ দেশের বুকের উপর চেপে তা'র নিঃশ্বাস রোধ ক'রতে প্রবৃত্ত, এ পাপ প্রাচীন যুগের, এই অন্ধ বার্ধক্য যাবার সময় হ'ল। তার প্রধান লক্ষণ এই যে, সে আজ নিদারুণ দুর্যোগ ঘটিয়ে নিজেরই চিতানল জ্বালিয়েচে। এই উপলক্ষে আমরা যতই দুঃখ পাই মেনে নিতে সম্মত আছি, কিন্তু আমাদের পরম বেদনায় এই পাপ হয়ে যাক্ নিঃশেষে ভস্মস্যাৎ। বহু যুগের পুঞ্জীকৃত অপরাধ যখন আপন প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন করে তখন তা'র দুঃখ অতি কঠোর,—এই দুঃখের দ্বারাই অপরাধ আপন বীভৎসতার পরিচয় দিয়ে উদাসীন চিত্তকে জাগিয়ে তোলে। একান্ত মনে কামনা করি এই দুঃসহ পরিচয়কাল যেন এখনি শেষ হয়, দেশ যেন আত্মকৃত অপঘাতে না মরে, বিশ্বজগতের কাছে বার বার যেন উপহসিত না হই।

"আজ অন্ধ অমারাত্রির অবসান হোক্ তরুণদের নবজীবনের মধ্যে। আচারভেদ, স্বার্থভেদ, মতভেদ, ধর্মভেদের সমস্ত ব্যবধানকে বীরতেজে উত্তীর্ণ হ'য়ে তারা ভ্রাতৃ-প্রেমের আহ্বানে নবযুগের অভ্যর্থনায় সকলে মিলিত হোক্। যে দুর্বল সে-ই ক্ষমা করতে পারে না, তারুণ্যের বলিষ্ঠ ঔদার্য সকল প্রকার কলহের দীনতাকে নিরস্ত ক'রে দিক্, সকলে হাতে হাত মিলিয়ে দেশের সার্বজনীন কল্যাণকে অটল ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করি।" [প্রবাসী : কার্তিক ১৩৩৮ : পৃঃ. ১]

কবির এই আবেদন-বাণীতে কিছুটা সুফল হইয়াছিল। নিঃ বঃ মুসলমান ছাত্র সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ হবিবুর রহমান এবং রাজসাহী কলেজের

অধ্যাপক আবু হেনা যে বক্তৃতা করেন এই প্রসঙ্গে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা জাতীয়তাবাদের আদর্শ স্মরণ করাইয়া দিয়া ছাত্রদের বলেন যে, তাঁহারা বাঙালী এবং বাংলা তাহাদের মাতৃভাষা। আরব বা তুরস্কের দিকে তাকাইয়া কিংবা উর্দুকে মাতৃভাষায় পরিণত করিবার ভুল স্বপ্ন দেখিয়া আমাদের কোন লাভ হইবে না। তাঁহারা উভয়েই এই আশা প্রকাশ করেন যে, নব্য বাংলায় যে তরুণ মুসলমান সমাজের উদ্ভব হইতেছে তাঁহারা জাতীয়তাবাদের আদর্শ গ্রহণ করিয়া হিন্দুদের সহিত সম্মিলিতভাবে স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করিবে।

[দ্র. আনন্দবাজার পত্রিকা : ১৯শে আশ্বিন, ১৩৩৮ : ৬ই অক্টোবর, ১৯৩১]

এই সময় বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের উদ্যোগে সারনাথে মূলগন্ধকুটি বিহার পুন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্বোধন উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হইতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা সম্মিলিত হন।

বুদ্ধের জীবন ও বাণী রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কবি দার্জিলিঙে আসার কয়েকদিন পরই এই উপলক্ষে 'বুদ্ধদেবের প্রতি' কবিতাটি রচনা করেন (২৪শে অক্টোবর, ১৯৩১)। কবিতাটির প্রথম স্তবকটি এই :

"ওই নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।
সেই নামে আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
দান করো তুমি।
বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হ'ক, মুক্ত হ'ক মোহ-আবরণ—
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি।"

[বুদ্ধদেব : পৃঃ. ৬৯]

তাছাড়া উহার উদ্বোধন উপলক্ষে কবি ১১ই নভেম্বর দার্জিলিঙ' হইতে ইংরেজীতেও একটি বাণী পাঠান। কবির আন্তরিক বিশ্বাস, সারা বিশ্ব জুড়িয়া যখন জাতিতে জাতিতে বিরোধ-সংঘর্ষ, হিংসা, দ্বেষ, লোভ, ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিষবাষ্প উদ্গীরিত হইতেছে সেই মুহূর্তে বুদ্ধের অহিংসা, মৈত্রী ও অমেয় প্রেমের বাণী মানুষকে নূতন করিয়া স্মরণ করিবার—নূতন করিয়া বাঁচিবার সন্ধান ও প্রেরণা দিবে। তাই তিনি তাঁহার বাণীতে লিখিলেন :

"The spiritual illumination of India, which ages ago shed its radiance over the continent of Asia, raised its memorial on the sacred spot near Benares where Lord Buddha had proclimed to his disciples his message of love's supreme fulfilment. Though this monument representing the final hope of liberation for all peoples was buried under dust and forgotten in India, the voice of her greatest son still waits in the heart of silent centuries for a new awakenment to hearken to his call.

"Today when in spite of a physical closeness of all nations a universal moral alienation between races has become a fateful menace to all humanity, let us, in this threatening gloom of a militant savagery, before the widening jaws of an organized greed, still rejoice in the fact that the reopening of the ancient monastery of Sarnath is being celebrated by pilgrims from the West and the East.

"Numerous are the triumphal towers built to perpetuate the memories of injuries and indignities inflicted by one murdering race upon another, but let us once for all, for the sake of humanity restore to its full significance this great memorial of a generous past to remind us of an ancient meeting of nations in India for the exchange of love, for the establishment of spiritual comradeship among races separated by distance and historical traditions, for the offering of the treasure of immortal wisdom left to the world by the Blessed One to whom we dedicate our united homage."

[*Modern Review* : December, 1931 : P. 720-21]

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবিকতা ও আন্তর্জাতিকতার আদর্শে বুদ্ধ, যীশু, অশোক, চৈতন্য প্রমুখ মহান মানবপ্রেমিকদের জীবনাদর্শ ও বাণীর প্রভাবই অধিক। কবি ইঁহাদের প্রচারিত কোন আচার ও ধর্মকেও গ্রহণ করেন নাই;—'ধর্ম'কে বাদ দিয়া তাঁহাদের মহান জীবনাদর্শ ও আধ্যাত্মিক মানবতাবাদটুকু আধুনিক চিন্তার আলোকে পরিশোধিত আকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য একথাও সত্য, বিশ্বসমস্যার সমাধানের প্রশ্নে কবি ঠিক বৈজ্ঞানিক রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গীতেও চিন্তা করিতে পারিতেন না।

কবি দার্জিলিঙ হইতে শান্তিনিকেতনে ফেরার পর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মৃত্যুর (১৭ই নভেম্বর, ১৯৩১) সংবাদ পান। ৬ই ডিসেম্বর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ভবনে তাঁহার শ্রাদ্ধসভা হয়। কবি অবশ্য এই সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তিনি হরপ্রসাদের স্মৃতির উদ্দেশে তাঁহার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া একটি পত্র (১৫ অগ্রঃ, ১৩৩৮ : ১লা ডিসেম্বর, ১৯৩১) দিয়াছিলেন (দ্র. আনন্দবাজার : ২১ অগ্রঃ, ১৩৩৮ : ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩১)।

শান্তিনিকেতনে পৌষ-উৎসবের পর কবি কলিকাতায় যান। এই সময় বাংলাদেশের কবি, সাহিত্যিক ও তাঁহার গুণগ্রাহীরা মিলিয়া কলিকাতায় রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করেন। ২৫শে ডিসেম্বর কলিকাতা টাউন হলে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই উৎসবের উদ্বোধন হয়। ২৭শে ডিসেম্বর হয় কবি-সম্বর্ধনা। ঐ সভায় মেয়র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি কবিকে অভিনন্দন জানাইয়া ভাষণ দেন। উল্লেখযোগ্য, এই সময়ই *The Golden Book of Tagore* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। কবির সপ্ততিতম জন্মবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে তাঁহার

সম্পর্কে দেশের ও বিদেশের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মনীষীদের রচনা ও প্রশস্তি-বাণীগুলি এই গ্রন্থে সংকলিত হয়। ঐ সভায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কবিকে ঐ গ্রন্থ উপহার দেন। এই সংকলন-গ্রন্থে সেদিন জওহরলাল রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছিলেন :

"...I wish to pay may deep homage to one who has been as a beacon light to all of us, ever pointing to the finer and nobler aspects of life and never allowing us to fall into the ruts which kill individuals as well as nations. Nationalism, specially when it urges us to fight for freedom, is noble and life-giving. But often it becomes a narrow creed, and limits, and encompases its votaries and makes them forget the many-sidedness of life. But Rabindranath Tagore has given to our nationalism the outlook of internationalism and has enriched it with art and music and the magic of his words, so that it has become the full-blooded emblem of India's awakened spirit."

[*The Golden Book of Tagore* : P. 183]

উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চিন্তা সম্পর্কে সেদিন এমন বিশদ ও স্বচ্ছ বিশ্লেষণ অন্তত এদেশে বড় একটা দেখা যায় নাই।

ইহার পর প্রায় এক সপ্তাহকালব্যাপী কলিকাতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। কবিকে উহার কয়েকটিতেই উপস্থিত থাকিতে হয়।

পুনরায় সংগ্রাম ও সংঘর্ষ

এদিকে বিলেতে দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকের ব্যর্থতার খবর আসিয়া পড়ে। গান্ধীজী প্রথম থেকেই নীতিগত প্রশ্নে করাচী-কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে অটল থাকিবার চেষ্টা করেন। তিনি সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কেন্দ্রে ও প্রদেশে আশু পূর্ণদায়িত্বশীল গভর্নমেণ্ট গঠনের দাবী করেন, যাহার হাতে অর্থ, সেনাবাহিনী, প্রতিরক্ষা ও বহির্বিষয়ক ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে। তিনি আরও দাবী করেন যে, এই রকম গভর্নমেণ্টে 'বিশেষ স্বার্থরক্ষা' বা 'safeguard'-এর প্রয়োজন নাই সুতরাং গভর্নর-জেনারেলের হাতে বিশেষ অধিকার দেওয়ারও প্রয়োজন হইবে না। তাছাড়াও তিনি ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সুপ্রিম কোর্টের দাবী করেন—যাহার উপর প্রিভি-কাউন্সিলে আপীলের কোনো ক্ষমতা থাকিবে না।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড ও ধুরন্ধর ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা আলোচনার ধারাকেই এইভাবে চলিতে দিলেন না। তাঁহারা প্রথম থেকেই সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার প্রশ্নে এক জটিলতা সৃষ্টির চেষ্টা করেন। উল্লেখযোগ্য,

গোল-টেবিল বৈঠকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যাবতীয় সমস্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা ও আপস-মীমাংসা করার জন্য 'সংখ্যালঘু কমিটি' (Minorities Committee) নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু প্রায় পাঁচ সপ্তাহব্যাপী আলোচনার পরও এই কমিটি ঐ সব প্রশ্নে কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিতে পারিলেন না। ডাঃ আম্বেদকর অনুন্নত ও নির্যাতিত হিন্দু শ্রেণীগুলির জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবী করিলেন। কেবল শিখ প্রতিনিধিরা ছাড়া অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্ত প্রতিনিধি আম্বেদকরকে সমর্থন করেন। ইঁহারা সম্মিলিতভাবে আগা খাঁর নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রীর নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। তাহাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের জন্যই প্রধান গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

১৩ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার ভাষণে এই চুক্তিকে আশীর্বাদ করিলেন এবং সেই সঙ্গে নির্যাতিত হিন্দুদের জন্য ডাঃ আম্বেদকরের দাবীকেও সমর্থন করিলেন। এক কথায় পিছন হইতে ব্রিটিশ কূটনীতিবিদরা সমানে প্রতিক্রিয়াশীল দল ও নেতাদের উস্কানি ও মদৎ দিতে লাগিলেন, সম্মেলন যাহাতে অচল ও ব্যর্থ হইয়া যায়।

গান্ধীজীর পক্ষে এই কদর্য ও হীন চক্রান্ত অসহ্য হইয়া উঠে। তিনি বিশেষভাবে ডাঃ আম্বেদকরের দাবীতে তীব্র আপত্তি জ্ঞাপন করিয়া ঐদিন তাঁহার ভাষণে বলিলেন :

'I can understand the claims advanced by other minorities, but the claims advanced on behalf of the untouchables is to me the unkindest cut of all. It means the perpetual bar sinister. I would not sell the vital interests of the untouchables for the sake of winning the freedom of India.···We do not want on our register and on our census untouchables, classified as a seperate class. The Sikhs may remain as such in perpetuity, so may the Muslims, so may the Europeans. Will untouchables remain untouchables in perpetuity? ···I want to say with all the emphasis that I can command, that if I was the only person to resist this thing, I would resist it with my life."

[*Mahatma* : Vol. III : P. 128]

সুতরাং দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পর্কিত সমস্যা ও অন্যান্য বহু সমস্যাই অমীমাংসিত থাকিয়া গেল। এইরকম পরিস্থিতির মধ্যে—১লা ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করিলেন। গান্ধীজী কয়েকদিন পর ভগ্নমনোরথে ও শূন্যহস্তে দেশের পথে যাত্রা করেন। গান্ধীজীর আপসপন্থী রাজনীতি এইভাবে বার বার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে—পরোক্ষে যাহা প্রতিক্রিয়াশীলদের হাত শক্তিশালী করিয়াছে।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের রাজনীতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনক হইয়া উঠিতে

থাকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একদিকে যেমন গোল-টেবিল বৈঠক ব্যর্থ করিয়া দিতে সচেষ্ট ছিল, অপরদিকে ভারতবর্ষে তাহার অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার মোকাবিলা করিবার জন্য সমস্ত রকমের প্রস্তুতি করিতেছিল। বলা বাহুল্য, এই প্রস্তুতি তাহার চিরকালের বীভৎস পাশবিক দমননীতি। বিশেষত, বাংলাদেশে এই দমননীতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। হিজলি, চট্টগ্রাম ও ঢাকার ঘটনার জন্য দোষী সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ তো দূরের কথা, পরন্তু বিপ্লবীদের দমনের নামে সারা বাংলাদেশে এক পুলিশি সন্ত্রাসরাজ চালু করা হয়। নভেম্বর মাসে চট্টগ্রামের উপর মার্শাল'ল ধরনের একটি অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। ইহার ফলে প্রায় সারা চট্টগ্রামেই সান্ধ্য আইন জারি হয় এবং পিটুনী ট্যাক্স আদায় করা হয় ৫০টি গ্রামে। কেবলমাত্র সন্দেহের বলে বহুশত যুবককে সপ্তাহকালব্যাপী অন্তরীণাবদ্ধ করা হয়। যুবকদের সর্বদাই পরিচয়পত্র বহনের আদেশ—এমনকি তাহাদের সাইকেলে চড়াও নিষিদ্ধ করা হয়। তাছাড়া সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য গ্রামে গ্রামে সৈন্যবাহিনীকে কুচকাওজ করিয়া ফিরিবার ব্যবস্থা করা হয়। ঢাকা ও মেদিনীপুরেও প্রায় অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ফলে বিপ্লবপন্থীদের ক্রিয়াকলাপও প্রবল হইয়া দেখা দেয়।

অপরদিকে সুরাট ও যুক্তপ্রদেশে কৃষকদের উপর আইনী ও বেআইনী জুলুম-অত্যাচার প্রবল হইয়া উঠে। আংশিক খাজনা দেওয়া সত্ত্বেও কৃষকদের উপর হাজার হাজার উচ্ছেদের মামলা দায়ের করা হয় এবং তাহাদের গরু বাছুর ও ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক অথবা নীলামে বিক্রয় করা হয়। ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠে। যুক্তপ্রদেশে কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব করিতেছিলেন জহরলাল ও তাসাদ্দুক শেরোয়ানী প্রমুখ নেতারা; সুতরাং তাঁহাদের উপর কয়েকটি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। গান্ধীজী দেশে পৌঁছানর কয়েকদিন পূর্বেই জওহরলাল ও শেরোয়ানী বোম্বাইয়ের পথে ট্রেনে গ্রেপ্তার হইলেন (২৬শে ডিসেম্বর)। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও 'লালকোর্তা' দলের উপর আক্রমণ শুরু হয়। উহার দুইদিন পূর্বেই খান্ আব্দুল গফ্ফর খাঁ ও ডাঃ খান্ সাহেব গ্রেপ্তার হন।

২৮শে ডিসেম্বর গান্ধীজী বোম্বাইয়ে পদার্পণ করিয়াই ওয়ার্কিং কমিটির অবশিষ্ট নেতাদের সহিত সমস্ত পরিস্থিতিটি লইয়া আলোচনা করেন। ঐদিনই সন্ধ্যায় বোম্বাইয়ের আজাদ ময়দানে এক বিশাল জনসভায় গান্ধীজী ঘোষণা করেন:

"I take it, that these are Christmas gifts from Lord Willingdon, our Christian Viceroy. Even if there is a single ray of hope, I will preserve and not abandon negotiations. But if I don't succeed, I will invite you to join me in the struggle which will be a fight to a finish···I would not flinch from sacrificing even a million lives for India's liberty. I told this to the English people in England."

[*Mahatma* : Vol. III : P. 152]

পরদিনই গান্ধীজী বড়লাটকে অর্ডিন্যান্স ও দমননীতি প্রত্যাহার এবং সাক্ষাৎ আলোচনার জন্য অনুরোধ জানাইয়া একটি তার পাঠান। দুই দিন পর জবাবে

বড়লাট সরকারী ব্যবস্থা সমর্থন করিয়া আলোচনা করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। ১লা জানুয়ারী (১৯৩২) ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ইহাতে তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়া এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, বড়লাট সন্তোষজনক মীমাংসায় আসিতে না চাহিলে পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা হইবে। গান্ধীজী পুনরায় আপস-মীমাংসার শেষ চেষ্টা হিসাবে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত জানাইয়া বড়লাটকে তার করেন। কিন্তু এই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। ২রা জানুয়ারী বড়লাট হুমকী দিয়া জানাইয়া দিলেন যে, কংগ্রেস পুনরায় সংগ্রাম শুরু করিলে তাহাদের সমুচিত ফলভোগ করিতে হইবে। ঐ-দিনই বোম্বাইয়ের কল্যাণ স্টেশনে সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হইলেন (১৯১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনে)।

অচিরেই সমস্ত তর্ক ও আলোচনার অবসান হইল। ৪ঠা জানুয়ারী অতিপ্রত্যুষে গান্ধীজী ও বল্লভভাই প্যাটেল গ্রেপ্তার হইলেন। গ্রেপ্তারের পূর্বদিন রাত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্রে লেখেন (বোম্বাই, ৩রা জানুয়ারী, ১৯৩২):

Dear Gurudev,

I am just stretching my tired limbs on the mattress and as I try to steal a wink of sleep I think of you. I want you to give your best to the sacrificial fire that is being lighted. With love,

Sd/-M. K. Gandhi.

গান্ধীজীর সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই রবীন্দ্রনাথকে এই পত্র পাঠাইয়া দিয়া জানান যে, গ্রেপ্তারের কয়েক মুহূর্ত পরেই গান্ধীজী পত্রে স্বাক্ষর করেন।

৪ঠা জানুয়ারী 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টস'-এর উদ্যোগে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের সংবাদে কবি এই অনুষ্ঠান বাতিল করিয়া দেন। গান্ধীজীর পত্র এবং তাঁহার গ্রেপ্তারের সংবাদে রবীন্দ্রনাথের মনের অবস্থা কি হইয়াছিল তাহা অনুমান করা শক্ত নহে। কীভাবে মনের এই অবস্থা ব্যক্ত করা যায় তাহা তিনি খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। ৪ঠা জানুয়ারী কবি ইহার প্রতিবাদে 'ফ্রী প্রেসের' মাধ্যমে ইংরেজীতে নিম্নলিখিত বিবৃতিটি দেন; পরদিন উহা সমস্ত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৫ই জানুয়ারী 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় কবির এই বিবৃতির মর্মানুবাদ প্রকাশিত হয়:

"সরকারের সহিত কোনওরূপ মীমাংসার সুযোগলাভের পূর্বেই মহাত্মাজী বন্দী হইয়াছেন এবং এই ঘটনা হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, যে-সহযোগীযুগলের সহায়তায় ভারতের ইতিহাস গড়িয়া উঠিবে—তাহাদের মধ্যে অন্যতর সহযোগী অর্থাৎ জনসাধারণকে অপর সহযোগী শাসকগণ স্বচ্ছন্দে দম্ভভরে উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারেন—তাঁহাদের ইহাই বিশ্বাস।

"যাহা হউক, সত্য যাহা, তাহা স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে। কাজেই আজ জগতের সম্মুখে নিঃসংশয়রূপে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে যে, জাতিগঠনে আমাদের প্রয়োজন, আমাদের অপর সহযোগী অপেক্ষা অনেক বেশী; যেহেতু

তাঁহারা ভারতবর্ষের জীবনে কেবল একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র কিন্তু আজ যদি আমরা স্থৈর্য হারাই এবং রাজনৈতিক উন্মত্ততায় অন্ধ এবং আত্মঘাতী আবেগে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ি, তাহা হইলে জাতীয় জীবনের এক মহাসুযোগ হারাইয়া ফেলিব। আজিকার নৈরাশ্যই আমাদিগকে গভীরতর ধীরতার সহিত শক্তি এবং সেই তীব্র সংকল্প—যাহা বালকোচিত উত্তেজনায় আপনার শক্তিকে নিঃশেষ এবং কর্মের পথে আপনার বাধা সৃষ্টি না করিয়া নীরবে আপনার নিষ্ঠার বলে সিদ্ধিকে করায়ত্ত করে—সেই সংকল্প দান করুক।

"নিজ স্বজনগণের সম্বন্ধে আমাদের পুঞ্জীকৃত কুসংস্কার দূর করিবার এবং যাঁহারা দেশসেবায় আমাদের সহযোগিতার আহ্বান অসৌজন্যের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহাদিগকেও আজ ভ্রাতৃবোধে পুনরায় গ্রহণ করিতে প্রাণপণে প্রয়াস করিবার শুভমুহূর্ত উপস্থিত হইয়াছে।

"জাতির প্রত্যেক স্তরের বন্ধুকে কর্মের পথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় অবশ্য আমরা আজ আহ্বান করিব। আজিকার মত বিপদ জাতির জীবনে সচরাচর আসে না; কিন্তু যখন আসে, তখন জাতির সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত হয় এবং স্বাধীনতাকে গড়িয়া তুলিবার পথের বাধাবিঘ্ন বিরল হইয়া আসে।

"আজিকার বিধিবিধাতার আদিম যুগোচিত অবৈধ আচরণ নিশ্চিত মুক্তির সহায়ক সেই তীব্র প্রেমের প্রেরণা যেন নির্দয়ভাবে আমাদিগকে দান করে—প্রেমকে শঙ্কাবিমূঢ় শাসকশক্তি সন্দেহের রক্ষাপ্রাচীরের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া কোনও দিন জয় করিতে পারিবে না। আপনার দৈহিক বল যাহাদের মানবতাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, সেই দৈহিক বল অপেক্ষা আমাদের নৈতিক বল উন্নতর, তাহা সপ্রমাণ করিবার গুরুতর দায়িত্ব আমাদের—একথা যেন আজ আমরা না ভুলি।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ২০শে পৌষ, ১৩৩৮ : ৫ই জানুয়ারী, ১৯৩২]

বলা বাহুল্য, কবি কোনদিনই প্রতিহিংসা ও অন্ধ ক্রোধোন্মত্ত আন্দোলনকে সমর্থন করেন নাই;—এক্ষেত্রেও করিলেন না। গান্ধী ও জওহরলাল প্রমুখ নেতাদের গ্রেপ্তারের পরিণাম কী হইতে পারে, কবি তাহা ভালোভাবেই জানিতেন। এই কারণেই তিনি দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিতে চাহিলেন, ইংরেজের এই উস্কানি ও প্ররোচনার ফাঁদে যেন আমরা পা না দিই। এদিকে ক্রমাগত দেশের নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তারের সংবাদ আসিতে লাগিল। বল্লভভাই প্যাটেলের গ্রেপ্তারের পর রাজেন্দ্রপ্রসাদ কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি হন। ৪ঠা জানুয়ারী তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। উহার পর ডাঃ আন্সারী সভাপতি মনোনীত হইলে তিনিও গ্রেপ্তার হন। মোটকথা জানুয়ারীর ১০ তারিখের মধ্যে সারা দেশব্যাপী কংগ্রেসের ছোটো-বড়ো বহু নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পোরা হইল।

এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্থির হইয়া বসিয়া থাকা সম্ভব হইল না। তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া তিনি বিলেতে প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ডকে নিম্নলিখিত তার-বার্তাটি পাঠাইলেন, (১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩২):

"The sensational policy of indiscriminate repression being followed by Indian Government starting with imprisonment of

Mahatmaji is most unfortunate in causing permanent alienation of our people from yours making it extremely difficult for us to co-operate with your representatives for peaceful political adjustment."

তাছাড়াও ইংলণ্ডবাসীদের এই পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য তিনি পূর্বোক্ত বিবৃতিটি '*Spectator*' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া দিয়া সেই সঙ্গে পত্রিকা সম্পাদককে উদ্দেশ করিয়া লিখিলেন :

"Sir,—The behaviour of the panic-stricken Government has startled the nation and has compelled me to come out with the following message to my own people who have been provoked to intense indignation suppressed by force."

[দ্র. *Modern Review* : Feb. 1932 : P. 226]

এইভাবে দেশের সমূহ বিপদকালে কবি বারবার সম্মুখে আগাইয়া আসিয়াছেন। দেশের ছোটো-বড় সমস্ত নেতাই যখন কারাগারে—ইংরেজের পৈশাচিক দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা কথা বলিবার জন্য যখন দেশে একান্তই লোকের অভাব ঘটিয়াছে, তখনই কবির কণ্ঠ হইতে উচ্চগ্রামে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে গান্ধীজী হইতে শুরু করিয়া দেশের সকলেই নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, দেশের চরম দুর্দিনে অন্তত একজন মহাপুরুষ তাঁহাদের পক্ষ লইয়া আগাইয়া আসিবেন এবং তিনি রবীন্দ্রনাথ। এই কারণেই দেশের বিপ্লবীদেরও তিনি অতিপ্রিয় ছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এই সময় হিজলী বন্দী-শিবিরের বন্দীদের পক্ষ হইতে কবি একটি অভিনন্দনপত্র পান। ১৬ই পৌষ হিজলীতে রাজবন্দীরা 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উৎসব পালন করেন এবং তাহাতে কবিকে নিম্নলিখিত অভিনন্দনপত্রটি পাঠাইবার সিদ্ধান্ত হয়। ১০ই জানুয়ারী সেখানকার রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উৎসব কমিটির পক্ষ হইতে সম্পাদক শ্রীসুধীর কিশোর বসু অভিনন্দনপত্রটি কবিকে পাঠাইয়া একটি পত্র দেন। অভিনন্দনপত্রটি ছিল এই :

"বাংলার একতারায় বিশ্ববাণীর ঝঙ্কার তুলিয়াছ তুমি, হে বাউল কবি, তোমার জন্মদিনে আজ তোমাকে প্রণাম করি।

"সঙ্কীর্ণ-স্বার্থ-সঙ্কুচিত দ্বন্দ্বপর বিশ্বসমাজকে মৈত্রী, করুণা ও কল্যাণের মন্ত্র দান করিয়াছ তুমি, হে বিশ্বকবি, তোমার জন্মদিনে আজ তোমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

"বন্ধন-বিমূঢ় অবমানিতের মর্মবেদনাকে ভাষা দান করিয়াছ তুমি, হে দরদী, তোমার জন্মদিনে আজ তোমার কল্যাণ কামনা করি।

"বিশ্বদেবতার চরণে গীতাঞ্জলি দান করিয়া বিশ্বের বরমাল্য লাভ করিয়াছ তুমি, হে গুণি, তোমার জন্মদিনে আজ তোমাকে অভিনন্দিত করি।

এই শ্রদ্ধাঞ্জলি তুমি গ্রহণ কর। ইতি

১৬ই পৌষ, ১৩৩৮ রাজবন্দীগণ।"

রাজবন্দীদের এই অভিনন্দনপত্র পাইয়া কবির হৃদয় গভীর দুঃখে ও ভাবাবেগে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। তিনি উহার জবাবে হিজলী-বন্দীদের একটি পত্রে লিখিলেন (২২শে জানুয়ারী):

ওঁ

"কল্যাণীয়েষু,

কারান্ধকার থেকে উচ্ছ্বসিত তোমাদের অভিনন্দন আমার মনকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেচে। কিছুতে যাকে বন্ধ করতে পারে না সেই মুক্তি তোমাদের অন্তরের মধ্যে অবারিত হোক্, এই আমি কামনা করি। ইতি

সমব্যথিত

২২শে জানুয়ারি, ১৯৩২ স্বাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[প্রবাসী : ফাল্গুন ১৩৩৮ : পৃঃ, ৬১৩]

কারান্ধকারে অন্তরীণাবদ্ধ বাংলাদেশের শত শত বিপ্লবী তরুণ-যুবকদের কথা স্মরণ করিয়াই কবি এই সময় গভীর দুঃখেই সুবিখ্যাত 'প্রশ্ন' কবিতাটি রচনা করেন:

"আমি-যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে
আমি-যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি-যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।"

[রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১৫'শ খণ্ড : পৃঃ ১৯৭]

স্মরণ রাখা দরকার, বাংলাদেশে তখন পুলিসী-দমননীতির তাণ্ডবনৃত্য শুরু হইয়া গিয়াছে। বাংলাদেশের বিপ্লবীরা ইহার সহিত মোকাবিলা করার জন্য জীবন-পণ করিয়া রুখিয়া দাঁড়াইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ নীতিগতভাবে কোনদিনই বিপ্লবপন্থী-দের সন্ত্রাসবাদী নীতি সমর্থন করেন নাই। কিন্তু দেশের এই মুক্তিপাগল বীর সন্তানদের যে তিনি কী পরিমাণ স্নেহ করিতেন—কতখানি গভীর আন্তরিক দরদ দিয়া তিনি তাহাদের জন্য অনুভব করিতেন, এই কবিতাই তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

২০শে জানুয়ারী জে. এম. সেনগুপ্ত ইউরোপ হইতে বোম্বাইয়ে জাহাজঘাটে অবতরণ করার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় (১৮১৮ সালের ৩নং রেগুঃ-এ)। এই সংবাদে কবি অত্যন্ত মর্মাহত হন। এই প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান তথ্য এখানে

উল্লেখযোগ্য। গত জুন মাসে (১৯৩১) হল্যাণ্ডে আন্তর্জাতিক পি. ই. এন. সম্মেলনে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি মানবিক ব্যবহার করিবার জন্য পৃথিবীর সমস্ত দেশের গভর্নমেণ্টের কাছে একটি আবেদন জানাইবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিছুকাল পরে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষী শিল্পী-সাহিত্যিকগণ এই আবেদন-বাণীতে স্বাক্ষর দান করেন। উল্লেখযোগ্য, ভারতবর্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথ এই ঘোষণা-বাণীতে স্বাক্ষর দান করেন। উহা যথাযথভাবে এখানে উদ্ধৃত করা হইল :

"From time to time the conscience of the world is stirred and shocked by revelations of the ill-treatment in this, that or the other country of people imprisoned on political or religious grounds. We submit that, in such cases, Governments are specially bound to see that humanity is not violated in the treatment of such prisoners.

"We further urge Governments to remember that nothing so provokes the ill will of the world at large against a given country as knowledge that political or religious prisoners are ill-treated, and that such ill-treatment is in these days bound, sooner or later, to become matter of common knowledge."

[*Glassgow Herald* : 28th December, 1931]

এই আবেদন-বাণীতে বিশ্বের তৎকালীন যেসব মনীষী ও শিল্পী-সাহিত্যিক স্বাক্ষরদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম এখানে উদ্ধৃত করা হইল :

Gertrude Atherton, Edward Arlington Robinson (America), Maurice Maeterlinck (Belgium), G. K. Chesterton, John Galsworthy, John Masefield, Gilbert Murray, George Bernard Shaw, H. G. Wells (England), Romain Rolland, Paul Valery, Georges Duhamel, Jules Romains, André Maurois (France) Gerhardt Hauptmann, Thomas Mann (Germany), Jo, van Ammers-Kuller (Holland), Gunnar Gunnarson (Iceland), Rabindranath Tagore (India) ; Benedetto Croce (Italy) ; Ivan Mestrovie (Jugoslavia) ; Johan Bojer, Knut Hamsud, Sigrid Undest (Norway) ; Ferdynand Goetel (Poland) ; R, B. Cunninghame Graham, Lady Margaret Sackville (Scotland) and Selma Lagerlof (Sweden).

হিজলী-বন্দীদের পত্র লেখার দিন তিনেক পর কলিকাতার ছাত্রসমাজের একটি প্রতিনিধিদল কবির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের করণীয় বিষয় সম্পর্কে একটি বাণী চাহেন (২৫শে জানুয়ারী)। ঐ-দিন কবি ছাত্রসমাজের উদ্দেশে যে বাণীটি দেন তাহা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা গেল, কবির মূল বিবৃতিটির মোট ৪৪টি শব্দ বাদ দেওয়া হইয়াছে। বলাবাহুল্য, গভর্নমেণ্টের সেন্সর-বিভাগ আপত্তিকর অজুহাতে ঐ শব্দগুলি ছাঁটিয়া ফেলিবার নির্দেশ দেয়। কবি পূর্বে যে প্রেস-বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহাই অন্য ভাষায় ছাত্রদের

উদ্দেশে বাণীতে বলেন (দ্র. *Modern Reveiw* : February, 1932 : P. 230)। বাণীটি ছিল এই :

"আমাদের ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে আমাদের ছাত্রেরা আমার নিকট হইতে একটি বাণী দাবী করিতে আসিয়াছে। আমি সেই বাণী পূর্বেই প্রদান করিয়াছি, শুধু তাহারই পুনরাবৃত্তি করিব। বর্তমান মুহূর্তে গভর্নমেণ্ট যে নীতি অবলম্বন করা উচিত বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা নিদারুণ দুঃখাবহ। আমাদের দেশের সেবার জন্য আমাদিগকে এরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে—যাহা গঠনমূলক, যে পন্থা স্থায়ী ও মূলগত। ঐরূপ সেবা এবং আত্মশুদ্ধির অধিকার হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবার ক্ষমতা কোন শক্তিরই নাই। নৈরাশ্য আমাদিগকে যেন শক্তির সেই অপরিমেয় প্রশান্তি দান করে, যাহা ব্যর্থ ভাবপ্রবণতা এবং আত্মক্ষয়কারী ধ্বংসমূলক প্রচেষ্টায় নিজের সম্বলকে অপচিত না করিয়া অভীষ্টসিদ্ধির জন্য নীরব সাধনায় প্রবৃত্ত থাকে।"—ফ্রি প্রেস।

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ১২ই মাঘ, ১৩৩৮ : ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩২]

কবি এই সময় কলিকাতার সন্নিকটে খড়দহে কিছুদিন থাকেন। পরে, ফেব্রুয়ারীর প্রথমভাগেই শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। ৬ই ফেব্রুয়ারী, শ্রীনিকেতনের সম্বাৎসরিক উৎসবের উদ্বোধন হয়। এই দিন কবি তাঁহার ভাষণে 'দেশের কাজ' নামক প্রবন্ধটি (প্রবাসী-চৈত্র ১৩৩৮) পাঠ করেন। এই ভাষণে তিনি বলিলেন :

"আমরা পরবাসী। দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না। যতক্ষণ দেশকে না জানি, যতক্ষণ তাকে নিজের শক্তিতে জয় না করি, ততক্ষণ সে দেশ আপনার নয়। ...বাইরের সহায়তার দ্বারা নিজের সত্য বস্তু কখনোই পাওয়া যায় না। আমার দেশ আর কেউ আমাকে দিতে পারবে না। নিজের সমস্ত ধন-মন-প্রাণ দিয়ে দেশকে যখনই আপন বলে জানতে পারব তখনই দেশ আমার স্বদেশ হবে। পরবাসী স্বদেশে যে ফিরেছি তার লক্ষণ এই যে, দেশের প্রাণকে নিজের প্রাণ ব'লেই জানি। পাশেই প্রত্যক্ষ মরছে দেশের লোক রোগে উপবাসে, আর আমি পরের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে মঞ্চের উপর চ'ড়ে দেশাত্মবোধের বাগ্‌বিস্তার করছি, এত বড়ো অবাস্তব অপদার্থতা আর কিছু হতেই পারে না।"

সেই বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক-মন্দার যুগে ইংলণ্ডবাসী তাহাদের আভ্যন্তরীণ সংকট নিবারণের জন্য কিভাবে আত্মশক্তিতে নির্ভর করিয়া তাহার স্বদেশজাত পণ্য ব্যবহারের জন্য দৃঢ়পণ করিয়া স্বদেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছে, কবি তাহার নজির দিয়া দেশবাসীকে তাহার স্বদেশীপণ্য ব্যবহার ও স্বদেশী-শিল্প গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানাইয়া বলিলেন :

..."আজ দেশের প্রাণান্তিক দৈন্যের দিনে একটা বড়ো বিষয়ে ওদের অনুবর্তন করতে হবে—কোমর বেঁধে বলতে চাই, কিছু সুবিধার ক্ষতি, কিছু আরামের ব্যাঘাত হলেও নিজের দ্রব্য নিজে ব্যবহার করব। আমাদের অতি ক্ষুদ্র সম্বল যথাসাধ্য রক্ষা করতে হবেই। বিদেশে প্রভূত পরিমাণ অর্থ চলে যাচ্ছে, সব তার ঠেকাবার শক্তি আমাদের হাতে নেই, কিন্তু একান্ত চেষ্টায় যতটা রক্ষা করা সম্ভব তাতে যদি শৈথিল্য করি তবে সে অপরাধের ক্ষমা নেই।

"দেশের উৎপাদিত পদার্থ আমরা নিজে ব্যবহার করব। এই ব্রত সকলকে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে আপন ক'রে উপলব্ধি করবার এ একটি প্রকৃষ্ট সাধনা।"...

[দেশের কাজ : পল্লীপ্রকৃতি : পৃঃ. ৭৬-৭৮]

দেশে তখন পূর্ণবেগে আইন-অমান্য আন্দোলন চলিতেছে। বিদেশী পণ্য বয়কট করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র যুবকেরা দোকানে দোকানে পিকেটিং আন্দোলন শুরু করিয়া দেয়। লক্ষ্য করিবার বিষয়, রবীন্দ্রনাথ এবারেও ঠিক প্রত্যক্ষভাবে বয়কট আন্দোলনের কথা উল্লেখ না-করিয়া স্বদেশী পণ্য ব্যবহার ও স্বদেশী শিল্প গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানাইলেন।

কিন্তু সেদিন দেশের লোকের স্বদেশীশিল্প ও শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক কার্যপদ্ধতি অপেক্ষা ব্রিটিশপণ্য ও সমস্ত কিছু ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান বয়কট-আন্দোলনের দিকেই ঝোঁক ছিল বেশি। কেননা উহা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই আঘাত করিবে,—ব্রিটিশ শাসনের অবসানই তখন একমাত্র আশু লক্ষ্য। বাংলাদেশের নাড়ী ও মন তখন অত্যন্ত চড়াসুরে বাধা। ৫ই ফেব্রুয়ারী শরৎ বসু গ্রেপ্তার হইলেন ঝরিয়ায়, ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনে। কবি যেদিন শ্রীনিকেতন উৎসব প্রাঙ্গণে এই ভাষণ পাঠ করিতেছেন, ঐদিনই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব সভায় বীণা দাস বাংলার তদানীন্তন গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাক্‌সনকে গুলি করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। উহার মাস-দেড়েক পূর্বে (১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৩১) শান্তি ও সুনীতি নামে দুইজন স্কুলের ছাত্রী কুমিল্লার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট সি. জি. বি. স্টিভেন্সকে গুলি করিয়া হত্যা করেন। বাংলার মেয়েরাও সেদিন বিপ্লবী-আন্দোলনে আগাইয়া আসেন। ব্রিটিশ শাসনের অবসান না-ঘটান পর্যন্ত বিপ্লবীদের চোখে ঘুম নাই।

এই সময় পারস্যরাজের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথকে পারস্য-ভ্রমণের জন্য পুনরায় আমন্ত্রণ জানান হয়। স্থির হয়, কবি এরোপ্লেনে পারস্য যাইবেন। অবশ্য এই জন্য একদিন কলিকাতায় ডাচ্-এরোপ্লেনে চড়িয়া আধঘণ্টা ঘুরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন এরোপ্লেনে-ভ্রমণ তাঁহার সহ্য হইবে কিনা (২১শে ফেব্রুয়ারী)। ইহার কয়েকদিন পরই তিনি 'পক্ষীমানব' কবিতাটি রচনা করেন (২৮শে ফেব্রুয়ারী)। বসন্তোৎসবের কয়েকদিন পূর্বেই তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন।

সারা দেশের বুকে গভর্নমেণ্টের নির্যাতনের ঝড় বহিতেছে। ১৯৩২-এর জানুয়ারী হইতে মার্চের মধ্যে সারা দেশে কম করিয়া ১৭টি অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। কংগ্রেস দল এবং তৎসংশ্লিষ্ট সমস্ত সংগঠনগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া উহার অফিস বা কার্যালয়গুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তাছাড়া পূর্বেই সভা-সমিতি-মিছিল করা নিষিদ্ধ এবং সংবাদপত্র ও প্রেসের কণ্ঠরোধ করা হয়। কিন্তু তবুও ইংরেজের পক্ষে জাগ্রত ও বিক্ষুব্ধ ভারতের কণ্ঠরোধ করা সম্ভবপর হয় নাই। জনতা তখন নেতৃত্বহীন। কিন্তু তবুও দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে নিত্য নব-প্রাণ সংগ্রহ করিয়া প্রসারিত হইতে থাকে। সমস্ত সরকারী নিষেধাজ্ঞা ও নির্যাতনকে উপেক্ষা করিয়া সভা-সমিতিতে জাতীয়-পতাকাকে অভিবাদন করিয়া জনতা ব্রিটিশ শাসনের নিপাত জানাইতে থাকেন। তাছাড়া ব্রিটিশ পণ্য এবং

ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক-ইনস্যুরেন্স বয়কট আন্দোলন, মাদকদ্রব্য বর্জন আন্দোলন, বে-আইনী লবণ-প্রস্তুত, খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন—এই সবই পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকে। সরকারী আমলাতন্ত্র ও পুলিশ-বাহিনী নিদারুণ আক্রোশে ক্রমাগত দেশের বিদ্রোহী জনতার উপর নৃশংস আক্রমণ চালায়। লাঠি, গুলি, গ্রেপ্তার, জেল, পাইকারী জরিমানা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, বেত্রাঘাত ও পৈশাচিক দৈহিক নির্যাতন—গভর্নমেণ্ট কিছুতেই দেশবাসীকে 'শায়েস্তা' করিতে পারিলেন না।

এই পরিস্থিতির মধ্যে এই সময় বিলেতের কোয়েকারদের 'Friends' Society'-র পক্ষে Percy Bertlett-এর নেতৃত্বে তিন জনের একটি 'সদিচ্ছা মিশন' ভারতে প্রেরণ করা হয়। ব্রিটেন ও ভারতের সাম্প্রতিক এই তীব্র তিক্ততার সম্পর্কের অবসান ঘটাইবার জন্য কোন সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করা যায় কিনা এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা গভর্নমেণ্ট ও ভারতের নেতৃস্থানীয়দের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে আসেন। বিলেতের কোয়কারদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দীর্ঘকাল যাবৎ। স্বভাবতই তাঁহারা শান্তিনিকেতনে আসিয়া কবির সহিত এ-ব্যাপারে আলোচনা করেন। আলোচনার শেষে কবি একটি বিবৃতি বা আবেদন-বাণীতে তাঁহার ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করিয়া এই ব্যাপারে তাঁহাদের গান্ধীজীর সহিত আলোচনা করিবার পরামর্শ দেন. (২২শে মার্চ, ১৯৩১) কবির আবেদনটি এখানে যথাযথভাবে উদ্ধৃত করা হইল :

"From the depths of the present atmosphere of suffering, the cry has come for the inauguration of a new age of faith and reconciliation, for a fellowship of understanding between races and nations alienated by cruel politics and diplomacy. We in India are ready for a fundamental change in our affairs which will bring harmony and understanding into our relationships with those who have inevitably been brought near to us. We are waiting for a gesture of goodwill from both sides, spontaneous and generous in its faith in humanity, which will create a future of moral fedaration, of constructive works of public goods, of the inner harmony of peace between the peoples of India and England.

"The visit of our friends from England has confirmed the immediate possibility of such an intimate fellowship and truth in our mutual relationship, and I feel called upon to appeal to all who have the welfare of humanity at heart to come forward at this critical hour and courageously take upon themselves the task of fulfilling the moral responsibility which is before us of building upon the bare foundation of faith, of acceptance of truth in a spirit of generous, mutual forgiveness.

"The memory of the past, however painful it may have been for us all, should never obscure the vision of the perfect, of the future

which it is for us jointly to create. Indeed, our experience of the futility of suspicion and hostility must inspire us with a profounder belief in the truth of the simple fellowship of hearts, in the mighty power of creative understanding between individuals as well as Nations inspired by a common urge of love."

[*Modern Review* : June, 1932 : P. 720]

গান্ধীজী তখন যারবেদা কারাগারে রাজবন্দী। কবির পরামর্শ অনুযায়ী কোয়েকার প্রতিনিধি দলটি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলে গভর্নমেণ্ট তাহাতে অনুমতি দেন নাই। তবে গভর্নমেণ্ট আশ্বাস দেন যে, তাঁহাদের বক্তব্য বিষয় লিখিয়া দিলে তাহা গান্ধীজীর কাছে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইবে। তখন তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের আবেদনটিসহ গান্ধীজীকে একটি পত্রে তাঁহাদের বক্তব্য বিষয় লিখিয়া কর্তৃপক্ষের হাতে জমা দেন। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত উহার কোন সাড়া-শব্দ বা জবাব পাওয়া যায় নাই। ইহাতে বিলেতের কোয়েকার সম্প্রদায় খুবই অসন্তুষ্ট ও অস্বস্তি বোধ করিতে থাকেন। কিছুদিন পর ইয়র্কের আর্চবিশপ, মাস্টার অব বেলিওল (Master of Balliol), প্রফেসার গিলবার্ট ম্যারে ও স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজ্-ব্যান্ড প্রমুখ চারজন কোয়েকার নেতা রবীন্দ্রনাথের আবেদনটিকে অভিনন্দন জানাইয়া উহার বহুল প্রচারের জন্য বিলাতের '*Times*' পত্রিকায় একটি চিঠি দেন। ঐগুলি ১৬ই মে *Times* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

বস্তুত, দীর্ঘকাল পরে ঐ পত্র দুটি গান্ধীজীর হাতে আসে। পত্র পাওয়ার দু-একদিনের মধ্যেই গান্ধীজী উহার জবাবে কোয়েকার প্রতিনিধিদলকে যে-পত্র দেন, উহা ২২শে জুন *Times* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গান্ধীজীর পত্রটি এখানে যথাযথ উদ্ধৃত করা হইল :

Yeravada Central Prison
May 4, 1932

Dear Friend,

I received your letter only last Saturday, together with the poet's draft appeal. I do not know that you expect me to say anything now. But this I can say, that I should yield to no one in my desire for conciliation and peace. You may therefore depend on my doing nothing that will prevent them. Consistently with national honour, I would do everything that would promote conciliation and peace. More I may not say from behind the prison wall.

I am glad you and the other friends were able to visit India and hope that you were none the worse for its climate.—Yours sincerely,

Percy Bartlett Esq. Sd/ M. K. Gandhi

স্মরণ রাখা দরকার, এবারে গ্রেপ্তারের পূর্বেই গান্ধীজী বড়লাটকে অত্যন্ত বিনীতভাবে জাতীয় সম্মানজনক শর্তে আপস-আলোচনার জন্য আবেদন জানাইয়াছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সে-আবেদনকে পদদলিত করিয়াই কংগ্রেস ও আন্দোলনকারীদের নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবার জন্য নির্যাতনের স্টীমরোলার চালাইয়া দেয়। এই হীন ও অবমাননাকর পরিস্থিতিতে গান্ধীজী ও কংগ্রেসের পক্ষে আপসের প্রস্তাব উত্থাপন করার প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

তাছাড়া ইতিমধ্যেই ম্যাকডোনাল্ডের 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা'র পরিকল্পনার আভাস-ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গান্ধীজী নীতিগত দিক হইতে পূর্বেই গভর্নমেণ্টকে এ ব্যাপারে সতর্ক করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন। ১১ই মার্চ যারবেদা কারাগার হইতে তিনি স্যর স্যামুয়েল হোরকে এক পত্রে পরিষ্কার জানাইয়া দিলেন যে, অনুন্নত হিন্দুদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা করা হইলে তিনি তাহার প্রতিবাদে আমরণ অনশনব্রত পালন করিবেন। তাছাড়া তিনি আরও জানাইয়া দিলেন যে, গভর্নমেণ্টের এই নৃশংস ও সন্ত্রাসকারী দমননীতির অবসান না হইলে তাঁহাকে অনশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

উহার জবাবে প্রায় মাসখানেক পরে—১৩ই এপ্রিল, স্যর স্যামুয়েল হোর গান্ধীজীকে এক পত্রে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁহার বক্তব্য ও মতামত ঐ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বেই বিবেচনা করা হইবে। আর দমননীতির ব্যাপারে তিনি পরিষ্কার জানাইয়া দিলেন যে, দেশে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গভর্নমেণ্ট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে বাধ্য।

পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ

১১ই এপ্রিল অতি প্রত্যূষে কবি দমদম বিমানক্ষেত্র হইতে ডাচ্-বিমানে পারস্য যাত্রা করেন। এ যাত্রায় তাঁহার সঙ্গে চলিলেন প্রতিমা দেবী, অমিয় চক্রবর্তী ও কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। কেদারনাথ ইহার কয়েকদিন পূর্বেই জাহাজে রওনা হইয়া যান। তাছাড়া বোম্বাই হইতে কবির পারসী বন্ধু দিনশা ইরাণী লিখিয়া জানান যে, পারস্যের বুশেয়ার বন্দরে তিনিও তাঁহাদের সঙ্গ লইবেন।

যাত্রার ঐদিনই অপরাহ্ণে তাঁহাদের বিমান যোধপুরে পৌঁছায়। সেখানে রাত্রিযাপনের পর পরদিন প্রাতে যাত্রা করিয়া মধ্যাহ্ন নাগাদ তাঁহারা করাচী পৌঁছান। সেখান হইতে অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহারা জাস্ক বিমানক্ষেত্রে অবতরণ করেন। বুশেয়ার হইতে পারস্যের গভর্নর পূর্বেই বেতারে দূরলিপিযোগে কবিকে অভ্যর্থনা জানাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। পরদিন কবি প্রাতে সাড়ে আটটা নাগাদ বুশেয়ারে পৌঁছান। বিমানক্ষেত্রে কবিকে বিরাট অভ্যর্থনা জানান হয়। স্বয়ং বুশেয়ারের গভর্নর তাঁহাদের আতিথ্যভার গ্রহণ করেন;—যত্ন আপ্যায়নের সীমা নাই। এখানে তাঁহাদের দুইদিন থাকিতে হয়। বুশেয়ারের জনসাধারণ ও

গভর্নরের পক্ষ হইতে এক সম্বর্ধনা সভায় কবিকে একটি অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়।

১৬ই এপ্রিল, বুশেয়ার হইতে তাঁহারা মোটরে শিরাজের পথে যাত্রা করেন। কিন্তু শিরাজের পথ দীর্ঘ। পথিমধ্যে খাজরুনের গভর্নরের প্রাসাদে তাঁহাদের বিশ্রাম ও রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা হয়। পরদিন দ্বিপ্রহরে কবি সদলবলে শিরাজে পৌঁছান। শিরাজের গভর্নর মহাসমারোহে কবিকে অভ্যর্থনা জানাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত হন। শিরাজের সাহিত্যিক ও পৌরজনের পক্ষ হইতে এই সম্বর্ধনা সভার ব্যবস্থা করা হয়। এই সভায় রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে যে-অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করা হয়, তাহার মর্মটি ছিল এই :

"শিরাজ শহর দুটি চিরজীবী মানুষের গৌরবে গৌরবান্বিত। তাঁদের চিত্তের পরিমণ্ডল তোমার চিত্তের কাছাকাছি। যে উৎস থেকে তোমার বাণী উৎসারিত সেই উৎসধারাতেই এখানকার দুই কবিজীবনের পুষ্পকানন অভিষিক্ত। যে সাদির দেহ এখানকার একটি পবিত্র ভূখণ্ডতলে বহু শতাব্দীকাল চির-বিশ্রামে শয়ান তাঁর আত্মা আজ এই মুহূর্তে এই কাননের আকাশে ঊর্ধ্বে উত্থিত, এবং এখন কবি হাফেজের পরিতৃপ্ত হাস্য তাঁর স্বদেশবাসীর আনন্দের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।"

জবাবে কবি ইংরেজীতে তাহার ক্ষুদ্র ভাষণে বলেন :

"যথোচিতভাবে আপনাদের সৌজন্যের প্রতিযোগিতা করি এমন সম্ভাবনা নেই। কারণ, আপনারা যে ভাষায় আমাকে সম্ভাষণ করলেন সে আপনাদের নিজের, আমার এই ভাষা ধার-করা। জমার খাতায় আমার তরফে একটিমাত্র অংক উঠল, সে হচ্ছে এই যে, সশরীরে এখানে উপস্থিত। বঙ্গাধিপতি একদা কবি হাফেজকে বাংলায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি যেতে পারেন নি। বাংলার কবি পারস্যাধিপের নিমন্ত্রণ পেলে, সে নিমন্ত্রণ রক্ষাও করলে এবং পারস্যকে তার প্রীতি ও শুভকামনা প্রত্যক্ষ জানিয়ে কৃতার্থ হল।" [পারস্য-যাত্রী : পৃঃ. ৩৮-৩৯]

ঐদিন শিরাজের গভর্নরের প্রাসাদভবনে তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা হয়। পরদিন শিরাজের শহরতলির একটি বাগানবাড়িতে কবির থাকিবার ব্যবস্থা হয়। ঐদিন অপরাহ্ণে সাদির সমাধিপ্রাঙ্গণে কবিকে সম্বর্ধনা জানান হয়। এই সভায় কবি তাঁহার ভাষণে বলেন :

..."কবিরা বসন্ত ঋতুর প্রতীক। তারা আপন দেশ আপন কালের মধ্যে থেকে সর্বদেশ সর্বকালকে আমন্ত্রণ করে।

"আমার পিতা ছিলেন হাফেজের অনুরাগী ভক্ত। তাঁর মুখ থেকে হাফেজের কবিতার আবৃত্তি ও তার অনুবাদ অনেক শুনেছি। সেই কবিতার মাধুর্য দিয়ে পারস্যের হৃদয় আমার হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল।

"আজ পারস্যের রাজা আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন, সেই সঙ্গে সেই কবিদের আমন্ত্রণও মিলিত। আমি তাঁদের উদ্দেশে আমার সকৃতজ্ঞ অভিবাদন অর্পণ করতে চাই যাঁদের কাব্যসুধা জীবনান্তকাল পর্যন্ত আমার পিতাকে এত সান্ত্বনা এত আনন্দ দিয়েছে।" [ঐ : পৃঃ. ১০৯]

পরদিন প্রাতে পারস্যের অমর কবি হাফেজের সমাধিমন্দির পরিদর্শন করেন।

২২শে এপ্রিল তাঁহারা ইস্পাহানের পথে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে কবি পার্সিপোলিসে দরিয়ুসের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ পরিদর্শন করেন। পরদিন মধ্যাহ্নে তাঁহারা ইস্পাহানে পৌঁছান। এখানেও কবি ও সঙ্গীদের থাকার জন্য একটি বাগানবাড়ির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

পরদিন প্রাতে ইস্পাহানের মিউনিসিপ্যালিটি মিলিটারী বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ ও বণিক সভা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে একে একে কবিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ইস্পাহানের ময়দানে বিচিত্র কারুকার্য করা মসজিদগুলি দেখার পর কবির মনে যে প্রতিক্রিয়া হয় সে-সম্পর্কে তিনি তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিয়াছিলেন :

"এদের কৈফিয়ৎ এই যে, এরা যে ধর্মের বাহন এখনো সে টিঁকে আছে। কিন্তু আজকের দিনে কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্ম ধর্মের বিশুদ্ধ প্রাণতত্ত্ব নিয়ে টিঁকে নেই। যে-সমস্ত ইঁটকাঠ নিয়ে সেই-সব সম্প্রদায়কে কালে কালে ঠেকো দিয়ে দিয়ে খাড়া করে রাখা হয়েছে তারা সম্পূর্ণ অন্য কালের আচার বিচার প্রথা বিশ্বাস জনশ্রুতি। তাদের অনুষ্ঠান, তাদের অনুশাসন এক কালের ইতিহাসকে অন্য কালের উপর চাপা দিয়ে তাকে পিছিয়ে রাখে।

"সাম্প্রদায়িক ধর্ম জিনিসটাই সাবেক কালের জিনিস। পুরাকালের কোনো-একটা বাঁধা মত ও অনুষ্ঠানকে সকল কালেই সকলে মিলে মানতে হবে, এই হচ্ছে সম্প্রদায়ের শাসন। বস্তুত এতকাল রাজশক্তি ও পৌরোহিতশক্তি জুড়ি মিলিয়ে চলেছে। উভয়েই জনসাধারণের আত্মশাসনভার, চিন্তার ভার, পূজার ভার, তাদের স্বাধীন শক্তি থেকে হরণ করে অন্যত্র এক জায়গায় সংহত করে রেখেছে। ব্যক্তিবিশেষ যদি নিজের চিত্তশক্তির প্রবর্তনায় স্বাতন্ত্র্যের চেষ্টা করে তবে সেটাকে বিদ্রোহের কোঠায় ফেলে তাকে প্রাণান্তকর কঠোরতার সঙ্গে শাসন করে এসেছে। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি ক্রমে এক কেন্দ্রের হাত থেকে সাধারণের পরিধিতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে, অথচ চিরকালের মতো বাঁধা মতের ধর্মসম্প্রদায় আজকের দিনে সকলেরই চিত্তকে এক শাসনের দ্বারা, ভয়ের দ্বারা, লোভের দ্বারা, মোহের দ্বারা অভিভূত করে স্থাবর করে দেবে—এ আর চলবে না। এই কারণে এই রকম সাম্প্রদায়িক ধর্মের যা-কিছু প্রতীক তাকে আজ জোর করে রক্ষা করতে গেলে মানুষ নিজের মনের জোর খোওয়াবে ; বয়স উত্তীর্ণ হলেও যে ছেলে মায়ের কোল আঁকড়ে মেয়েলি স্বভাব নিয়ে থাকে তারই মতো অপদার্থ হয়ে থাকবে।"

তিনি আরও লিখিয়াছেন :

"প্রাচীন কীর্তি টিঁকে থাকবে না, এমন কথা বলি নে। থাক্—কিন্তু সে কেবল স্মৃতির বাহনরূপে, ব্যবহারের ক্ষেত্ররূপে নয়। যেমন আছে স্ক্যাণ্ডিনেবীয় সাগা—তাকে কাব্য বলে স্বীকার করব, ধর্মগ্রন্থ বলে ব্যবহার করব না। যেমন আছে প্যারাডাইস লস্ট—তাকে ভোগ করবার জন্যে, মানবার জন্যে নয়।"...

[ঐ : পৃঃ. ৬৪-৬৫]

২৭শে এপ্রিল ইস্পাহানের মিউনিসিপ্যালিটির অভিনন্দনের উত্তরে কবি তাঁহার ভাষণের উপসংহারে বলেন :

"India's poet has come to Iran with this burden of a joyous song. I sing to the new humanity, today, of the dawn which has appeared in the horizon, and touched the Orient with a golden promise. Through your great King a glorious renewal of your country's life has begun. There is in the atmosphere the stir of joyous activity. I see in your faces the hopes of a magnanimous future. I welcome this renascence in Iran, and I carry in my heart the coviction that it will spread all over Asia. Humanity, in the West and the East, suffers acutely from a pessimism born of spiritual apathy. We must break through it and offer once again to the whole world the message of the East, the message of freedom and love which comprehends the welfare of all races and peoples". [ঐ : পৃঃ. ১৩৫-৩৬]

২৯শে এপ্রিল অপরাহ্ণে কবি ইরাণের রাজধানী তেহেরাণে পৌঁছান। তেহেরাণে পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার পৌরজন, শিক্ষাবিদ্‌ ও বণিক সভার পক্ষে কবিকে অভ্যর্থনা জানান হয়। সেই সময় ইরাকের রাজা ফয়জল তেহেরাণে আসিয়াছিলেন। তিনি কবির নিকট দূতযোগে সাক্ষাতের অনুরোধ জানান। কবি যথোচিত বিনয়-সহকারে জানাইলেন যে দেশে ফেরার পথে তিনি বোগ্‌দাদে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

২রা মে ইরাণের রাজা রেজা শা পহ্লবীর সঙ্গে রাজপ্রাসাদে কবির সাক্ষাৎকার হয়। কবি রাজাকে রেশমের আবরণে বাঁধাই করা তাঁহার নিজের কতকগুলি পুস্তক উপহার দেন। সেই সঙ্গে তাঁহার স্বরচিত একটি চিত্রপটের পরপৃষ্ঠায় একটি বাংলা কবিতা ও তাহার ইংরেজী তর্জমা স্বহস্তে লিখিয়া দেন। এই সাক্ষাৎকারের পর রেজা শা'র সম্পর্কে তাঁহার যে ধারণা হয় সে-সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছিলেন :

"আজ পারস্যরাজের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হল। প্রাসাদের বৃহৎ কার্পেট-পাতা ঘরে আসবাব আড়ম্বর নেই বললেই হয়। রাজার গায়ে খাকিরঙের সৈনিক-পরিচ্ছদ। অতি অল্পদিনমাত্র হল অতি দ্রুতহস্তে পারস্য-রাজত্বকে দুর্গতির তলা হতে উদ্ধার করে ইনি তার হৃদয় অধিকার করে বসে আছেন। এমন অবস্থায় মানুষ আপন সদ্যপ্রতিষ্ঠিত গৌরবকে অতিমাত্র সমারোহ-দ্বারা ঘোষণা করবার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু ইনি আপন রাজমহিমাকে অতি সহজেই ধারণ করে আছেন। খুব সহজ মহত্ত্বের মানুষ ; এঁর মুখের গড়নে প্রবল দৃঢ়তা, চোখের দৃষ্টিতে প্রসন্ন ঔদার্য। সিংহাসনে না ছিল তাঁর বংশগত অধিকার, না ছিল আভিজাত্যের দাবি ; তবু যেমনি তিনি রাজাসনে বসলেন অমনি প্রজার হৃদয়ে তাঁর স্থান অবিলম্বে স্বীকৃত হল। দশ বছর মাত্র তিনি রাজা হয়েছেন, কিন্তু সিংহাসনের চারি দিকে আশঙ্কা উদ্‌বেগের দুর্গম বেড়া সতর্কতায় কণ্টকিত হয়ে ওঠে নি। সেদিন অমিয় দেখে

এসেছেন নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে, রাজা স্বয়ং পথে দাঁড়িয়ে বিনা আড়ম্বরে পরিদর্শনে নিযুক্ত।"
[ঐ : পৃঃ. ৭৭-৭৮]

পরদিন—৩রা মে তেহেরাণে কয়েকজন শিক্ষাবিদের সঙ্গে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে শিক্ষার আদর্শ ও নীতি সম্পর্কে কবির দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়। আলোচনা কালে কবি প্রধানত আন্তর্জাতিকতার আদর্শপ্রণোদিত তাঁহার বিশ্বভারতীর শিক্ষা-নীতির উপরই জোর দেন। তিনি বলিলেন :

…"To me the most important issue seems to be the task of widening the mental horizon of the students, of imparting to their studies the background of internationalism which will enable them to realize the true character of our interlinked humanity and the deeper unities of our civilizations in the West and the East.…

"I rejoice to hear that you share with me a deep faith in cultural federation between different peoples and races. In India we have offered hospitality to various indigenous and foreign cultures and attempted to evolve our own civilization by assimilating influences from far and wide."…

তিনি তাঁহার শিক্ষাদর্শের আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন :

"My dream is to offer to our students a continental background of mind, a background in which have been coordinated the experiences of ages, the intellectual and spiritual experiments made in Asia for a long generations.

"Europe has evolved a continental culture which is like a common coffer to which the different peoples of Europe contribute their best gifts. Owing to this collaboration Europe has become great. She has successfully exploited the rich potentialities of her peoples and come to the forefront in the march of life. Asia too must reorganise her continental life and vitalize her scattered cultures by recognising their affinities and expressing them in literature, arts, science and civic life. Barriers of national segregation must be broken through, superstitions of religions and social imcompatibility must be relentlessly fought against. In a daring quest of all that lies deepest in our common humanity Asia must unite and hold out her hands to the West in friendly co-operation."
[ঐ : পৃঃ. ১৫৪-৫৫]

৫ই মে তেহেরাণের নাগরিকদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানান হয়। এই সভায় কবি ইংরেজীতে তাঁহার ভাষণে যাহা বলেন, তাহার সার কথাটি বিচিত্রায় তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখেন। উহার অংশ-বিশেষ এখানে উদ্ধৃত হইল :

"প্রকৃতির শক্তিভাণ্ডারের দ্বার য়ুরোপ উদ্ঘাটন করে প্রাণযাত্রাকে নানা দিক

থেকে ঐশ্বর্যশালী করে তুলেছে। এই শক্তির প্রভাবে আজকের দিনে তারা দিগ্বিজয়ী। আমরা প্রাচ্যজাতিরা বস্তুজগতে এই শক্তিসাধনায় শৈথিল্য করেছি, তার ফলে আমাদের দুর্বলতা সমাজের সকল বিভাগেই ব্যাপ্ত। এই সাধনার দীক্ষা য়ুরোপের কাছ থেকে আমাদের নিতান্তই নেওয়া চাই।

"কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে রাখতে হবে যে, কেবলমাত্র বস্তুগত ঐশ্বর্যে মানুষের পরিত্রাণ নেই, তার প্রমাণ আজ য়ুরোপে মারমূর্তি নিয়ে দেখা দিল। পরস্পর ঈর্ষা-বিদ্বেষে এবং বিজ্ঞানবাহিনী হিংস্রতার বিভীষিকায় য়ুরোপীয় সভ্যতায় আজ ভূমিকম্প লেগেছে। য়ুরোপ দেবতার অস্ত্র পেয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে দেবতার চিত্ত পায় নি। এই রকম দুর্যোগেই 'বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্র আসি অস্ত্রীকেই বধে'। দেখা যাচ্ছে, য়ুরোপ নিজের মৃত্যুশেল আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক নৈপুণ্যের সঙ্গে তৈরি ক'রে তুলছে।

"এসিয়াকে আজ ভার নিতে হবে মানুষের মধ্যে এই দেবত্বকে সম্পূর্ণ করে তুলতে, কর্মশক্তিকে ও ধর্মশক্তিকে এক করে দিয়ে।

"পারস্যে আজ নূতন করে জাতিরচনার কাজ আরম্ভ হয়েছে। আমার সৌভাগ্য এই যে, এই নবসৃষ্টির যুগে অতিথিরূপে আমি পারস্যে উপস্থিত, আমি আশা ক'রে এসেছি এখানে সৃষ্টির যে সংকল্পন দেখব তার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পূর্ণ মিলনের রূপ আছে।...

"'এ কথা বলা বাহুল্য যে, এসিয়ার প্রত্যেক দেশ আপন শক্তি প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুসারে আপন ঐতিহাসিক সমস্যা স্বয়ং সমাধান করবে, কিন্তু আপন উন্নতির পথে তারা প্রত্যেকে যে প্রদীপ নিয়ে চলবে তার আলোক পরস্পর সম্মিলিত হয়ে জ্ঞানজ্যোতির সমবায় সাধন করবে।...তাই আজ আমি এই কামনা ঘোষণা করি যে, আমাদের মধ্যে সাধনার মিলন ঘটুক। এবং সেই মিলনে প্রাচ্য মহাদেশ মহতী শক্তিতে জেগে উঠুক—তার সাহিত্য, তার কলা, তার নূতন নিরাময় সমাজনীতি, তার অন্ধসংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ ধর্মবুদ্ধি, তার আত্মশক্তিতে অবসাদহীন শ্রদ্ধা।"

[ঐ : পৃঃ. ১১২-১৪]

ঐদিন জনসভার পরে তেহেরাণের এক সঙ্গীতগুণীর বাড়িতে কবির সম্মানের উদ্দেশে একটি সঙ্গীতের জলসা হয়। জলসার পূর্বেই কবি সঙ্গীত, শিল্প ও ললিত কলার ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিমের ভাবধারা ও আঙ্গিকের মিলন-মিশ্রণের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাইয়া বলিলেন :

..."এসিয়ার প্রায় সকল দেশেই আজ পাশ্চাত্য ভাবের সঙ্গে প্রাচ্য ভাবের মিশ্রণ চলছে। এই মিশ্রণে নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা। এই মিলনের প্রথম অবস্থায় দুই ধারার রঙের তফাতটা থেকে যায়, অনুকরণের জোরটা মরে না। কিন্তু আন্তরিক মিলন ক্রমে ঘটে, যদি সে মিলনে প্রাণশক্তি থাকে ; কলমের গাছের মতো নূতনে পুরাতনে ভেদ লুপ্ত হয়ে ফলের মধ্যে রসের বিশিষ্টতা জন্মে। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে এটা ঘটেছে, সংগীতেও কেন ঘটবে না বুঝি নে। যে চিত্তের মধ্যে দিয়ে এই মিলন সম্ভবপর হয় আমরা সেই চিত্তের অপেক্ষা করছি, য়ুরোপীয় সাহিত্যচর্চা প্রাচ্য শিক্ষিতসমাজে যে পরিমাণে অনেক দিন ধরে অনেকের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে য়ুরোপীয় সংগীতচর্চাও যদি তেমনি হত তা হলে নিঃসন্দেহই প্রাচ্য সংগীতে

রসপ্রকাশের একটি নূতন শক্তিসঞ্চার হত। য়ুরোপের আধুনিক চিত্রকলায় প্রাচ্য চিত্রকলার প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছে এ তো দেখা গেছে ; এতে তার আত্মতা পরাভূত হয় না, বিচিত্রতর প্রবলতর হয়।" [ঐ : পৃঃ. ৮০-৮১]

৬ই মে (৮ই মে ?) তেহেরাণে মহাসমারোহে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব পালন করা হয়। সকাল হইতে বন্ধুবান্ধব ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ফুল, মালা ও অভিনন্দনপত্র আসিতে থাকে। এইদিন উৎসব অনুষ্ঠানের শেষে কবি ইরাণের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া একটি কবিতা পাঠ করেন। কবিতাটির প্রথম স্তবকটি এই :

"ইরাণ, তোমার যত বুলবুল
তোমার কাননে বসন্ত ফুল
বিদেশী কবির জন্মদিনেরে মানি
শুনালো তাহারে অভিনন্দনবাণী।"

ইতিমধ্যে একদিন ইরাণের 'মজলিশে'র (বিধানসভার) জনৈক সদস্যের সঙ্গে ইরাণের ভাষা সাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ে কবির দীর্ঘ আলোচনা হয়। আলোচনাকালে 'দম্ভিত' বা সদস্যটি মার্কিন সভ্যতার গুণগান করিয়া বলেন যে, তাঁহার মতে মার্কিন সংস্কৃতির পুরোপুরিই বা ষোল আনাই এখন পারস্যের আত্মস্থ করিয়া লওয়া উচিত। জবাবে কবি ধীর ও বিনীতভাবে মার্কিন সংস্কৃতির সংকট ও ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া সদস্যাটির চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর ভুল ভাঙিবার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন :

"The time has come when we must think deeply about human civilization.···

"When you speak of hundred per cent Americanization you must remember that America herself is faced today with an imminent crisis and has yet to achieve a stability which will prove the soundness of her social and political machinery.

"···The whole Western civilization is undergoing a severe trial. The reckless mechanization of life which has gone on in the West is already having a drastic reaction.

পাশ্চাত্য সভ্যতার অসঙ্গতি ও একান্ত বস্তুতন্ত্রপরতার স্বরূপটি বিশ্লেষণ করিয়া কবি সদস্যটিকে আরও বলেন :

"Why then do you emphasize upon American modes of life and how can you isolate and specify a particular country when you want the healthy contact of science, which is neither American nor Western but universal in its truth? I am not condemning America in particular but only pointing out that when you say you want to imitate a particular country or people you can only copy things and external facts, you cannot assimilate truths which lie at the founda-

tion of our human character. If any nation or a people have been successful in giving shape to ideals which are of perennial value, what we have to learn from them is their capacity to absorb and establish these ideals; we must not merely copy the results that others have produced. That is my point—I am not against absorbing truths which are of universal value; as a matter of fact, it is our human birthright to claim such truths as our own. But I am against borrowing ready-made models or emphasizing upon the need of imitating isolated external facts which are particular to a particular race or a nation.''… [ঐ : পৃঃ. ১৬২-৬৪]

ইতিমধ্যে ইরাক ভ্রমণের জন্য রাজা ফয়জলের নিকট হইতে কবির আমন্ত্রণ আসে। তেহেরাণ হইতে কবি মোটরে ইরাকের রাজধানী বোগদাদের পথে যাত্রা করেন। হামাদান, বেহিস্তুন, কাসরিশিরিন হইয়া তাঁহারা কানিকিন-এ ট্রেনে বোগদাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। বোগদাদ স্টেশনে ট্রেন পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গে ইরাকের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে কবিকে বিপুল অভ্যর্থনা জানান হয়। টাইগ্রিস নদীর ধারে একটি হোটেলে কবি ও তাঁহার সঙ্গীদের থাকিবার ব্যবস্থা হয়।

বোগদাদে থাকাকালে একদিন সেখানকার কবি ও সাহিত্যিকদের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানান হয়। সকলের বক্তৃতা ও অভিনন্দন পাঠ শেষ হইলে কবি এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ও জাতি-ধর্মের মিলন-ঐক্যের আহ্বান জানাইয়া একটি ভাষণ দেন। তিনি বলেন :

"ইতিহাস মানুষের প্রতি বিশেষ সদয় হয় নি। প্রবল জাতির লোলুপতা দুর্বল জাতিকে অসংখ্য বন্ধনে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে; অন্যায়ক্ষুধাপরিতৃপ্তির জন্য দুর্বল জাতিকে শোষণ করতে তারা কুণ্ঠিত নয়। তাই আজ মনুষ্যত্ব পরস্পরের প্রতি সন্দেহে দুঃখে যন্ত্রণাজর্জরিত। অসমাঞ্জস্যের গ্লানি আমাদের জীবনকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়েছে। পরস্পরের এই অস্বাভাবিক সম্বন্ধের বেদনা থেকে মনুষ্যত্বকে উদ্ধার করা, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির জীবনযাত্রাকে উচ্চতর সুরে বেঁধে তোলা—সে তো আমাদেরই কাজ—আমরা, যারা সাহিত্যের মন্দিরে আমাদের জীবন উৎসর্গ করেছি। আমরা যে দেশেরই সন্তান হই না কেন, আমাদের জীবনের এই এক উদ্দেশ্য। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন ও মৈত্রী-স্থাপনের এই সম্মিলিত চেষ্টার মধ্য দিয়ে আমাদের মনুষ্যত্বের পাকা ভিত গাঁথতে হবে। মানবজাতিকে আত্মঘাতী সংগ্রাম ও উন্মত্ত কুসংস্কারের বর্বরতা থেকে রক্ষা করবে এই মিলনের উপনিবেশ। নূতন যুগের সূচনা করব আমরা—শুভবুদ্ধির যুগ, সহযোগিতার যুগ, যার মধ্যে ভাবের পরস্পর আদানপ্রদানের দ্বারা মনুষ্যত্বের বিপুল ঐশ্বর্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।"

উল্লেখযোগ্য এই সময় বোম্বাইয়ে হিন্দু-মুসলমানের এক ভয়াবহ দাঙ্গা বাধিয়া যায়। এই সংবাদে রবীন্দ্রনাথের মানসিক প্রতিক্রিয়া কি হইয়াছিল, অনুমান করা শক্ত নহে। কবির স্থির বিশ্বাস, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সমস্যার সমাধানে আরব দেশগুলি এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে।

কেননা, ঐশ্লামিক জগতে আরব দেশগুলির এক বিশেষ সম্ভ্রমপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাছাড়া কবি আরও মনে করিতেন যে, ধর্মের গোঁড়ামী ও অন্ধ কুসংস্কারের হাত হইতে এশিয়ার জনগণকে মুক্তি দিবার ঐতিহাসিক দায়িত্ব আজ শিল্পী ও সাহিত্যিক-দের স্কন্ধে বর্তাইয়াছে। তাই কবি আরব জগৎ ও সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ডের সাহিত্যিক-দের সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করিবার আকুল আহ্বান জানাইয়া বলিলেন :

"বন্ধুগণ, প্রাণের মধ্যে এই অদম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আজ আমি আপনাদের মাঝ-খানে এসেছি। আমার প্রাণের এই গোপন কথাটি আজ আপনাদের বলি, যে গোপন উদ্দেশ্য গভীরতম অন্তরে পোষণ ক'রে আজ আপনাদের দেশে বেড়াতে এসেছি। আমার আহ্বান এই—আসুন আমরা পরস্পর মিলিত হয়ে ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ববিদ্বেষেয় মূল ছিন্ন করে দিই, মানুষে মানুষে সহজ বিশ্বাসের নিত্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করি। ইতিহাসের গৌরবের যুগে আপনাদের আরবসভ্যতা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতের অর্ধেকেরও বেশি জায়গা জুড়ে প্রাধান্যলাভ করেছিল ; আজও ভারতবর্ষের মুসলমান অধিবাসীদের আশ্রয় ক'রে আমাদের দেশের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে আরবসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত আছে। আজ আরবসাগর পার হয়ে আসুক আপনাদের বাণী বিশ্বজনীন আদর্শ নিয়ে ; আপনাদের পুরোহিতরা আসুন তাঁদের বিশ্বাসের আলো নিয়ে ; জাতিভেদ সম্প্রদায়ভেদ ও ধর্মভেদ প্রেমের মধ্যে অতিক্রম ক'রে, সকল শ্রেণীর মানুষকে আজ সখ্যের সহযোগিতায় মিলিয়ে দিন তাঁরা।

"মানুষের মধ্যে যা-কিছু পবিত্র ও শাশ্বত তারই নামে আজ আমি আপনাদের কাছে আমার প্রার্থনা জানাই, আপনাদের মহানুভব ধর্মপ্রতিষ্ঠাতার নামে আজ আমি আপনাদের অনুরোধ করি—মানুষে মানুষে প্রীতির আদর্শ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহারগত পার্থক্য নির্বিবাদে সহ্য করার আদর্শ, সহযোগিতার উপর সভ্য জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করবার আদর্শ, প্রতিবেশীর প্রতি ভ্রাতৃভাবের আদর্শ আজ আপনারা সকলের সম্মুখে প্রচার করুন। আমাদের ধর্মসমূহ আজ হিংস্র ভ্রাতৃহত্যার বর্বরতায় কলুষিত, তারই বিষে ভারতের জাতীয় চেতনা জর্জরিত স্বাধীনতার দিকে ভারতের অভিযান আজ বাধাপ্রাপ্ত। তাই আমার প্রার্থনা, তমসাচ্ছন্ন কুবুদ্ধি-জনিত সমস্ত কুসংস্কার ও মোহ অতিক্রম ক'রে আজ আপনাদের কবিদের, আপনাদের চিন্তা-বীরদের বাণী আমার দুর্ভাগা দেশে প্রেরণ করুন—তাকে দেখিয়ে দিন কল্যাণের পথ, দেখিয়ে দিন নৈতিক বিনষ্টি থেকে মুক্তিলাভের পথ।" [ঐ : পৃঃ. ১২৭-২৯]

ইহার পর রাজা ফয়জল একদিন রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার বাগানবাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ করেন। রাজার ভাই ও ইরাকের প্রধানমন্ত্রীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দোভাষীর মাধ্যমেই তাঁহাদের আলাপ-আলোচনা হয়। কথাপ্রসঙ্গে রাজা ফয়জল ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই দ্বন্দ্ব-বিরোধ সাময়িক ; অবস্থা স্বাভাবিক হইয়া আসিলে পুনরায় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সমস্যাটির এত সরল সমাধান দেখিতে পাইতেছিলেন না। তুরস্ক, ইজিপ্ট ও পারস্যের নব-জাগরণের সঙ্গে ভারতের অবস্থার তুলনা করিয়া তিনি যেন এক এক সময় হতাশ হইয়া পড়েন, এই কথাই রাজা ফয়জলকে বলেন।

এই আলাপ-আলোচনার পর রাজা ফয়জল সম্পর্কে কবির যে ধারণা হয় সে-সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছিলেন :

"এই বাগানের ধারে চায়ের টেবিলে সহজ বাক্যালাপের মধ্যে সেদিনের ছবি মনে আনা দুরূহ, যেদিন এই রাজা পথশূন্য মরুভূমির মধ্যে বেদুয়িনদের বহু উপজাতিকে আপন নেতৃত্বের অধীনে এক করে নিয়ে জার্মানি ও তুরস্কের সম্মিলিত অভিযানকে পদে পদে উদ্‌ভ্রান্ত করে বিধ্বস্ত করেছিলেন। মৃত্যুর মূল্যে কিনেছিলেন জীবনের গৌরব। কঠিন ভীষণ সেই রণপ্রাঙ্গণ, জয়ে পরাজয়ে নিত্য সংশয়িত দুঃসাধ্য সেই অধ্যাবসায়। সেই অক্লান্ত রণরঙ্গের অধিনায়ককে দেখলেম।...কর্নেল লরেন্স্‌ বলেছেন, আরবের মহৎ লোকদের মধ্যে মহম্মদ ও সালাদিনের নীচেই রাজা ফয়জলের স্থান। এই মহত্ত্বের সরলমূর্তি দেখেছি তাঁর সহজ আতিথ্যে এবং তাঁকে অভিবাদন করেছি। বর্তমান এসিয়ায় যাঁরা প্রবল শক্তিতে নূতন যুগের প্রবর্তন করেছেন তাঁদের দুজনকেই দেখলুম অল্পকালের ব্যবধানে। দুজনেরই মধ্যে স্বভাবের একটি মিল দেখা গেল—উভয়েই আড়ম্বরহীন স্বচ্ছ সরলতার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশমান।" [ঐ : পৃঃ. ৯৮-৯৯]

বলা বাহুল্য, রাজা ফয়জল ও আধুনিক ইরাকের ইতিহাস সম্পর্কে কবি সঠিক ও সত্য খবর পান নাই এবং সেখানে বিট্রিশ সাম্রাজ্যবাদের নেপথ্য ভূমিকাটিও তিনি সঠিক অনুধাবন করিতে পারেন নাই।

মহাযুদ্ধের পর লীগ অব নেশন্‌স্‌-এর নির্দেশে প্যালেস্টাইন ও ইরাকের উপর ইংরেজদের এবং সিরিয়ার উপর ফরাসীদের 'ম্যাণ্ডেটরী' প্রভুত্বের ক্ষমতা দেওয়া হয়। কিন্তু মহাযুদ্ধের পর সমগ্র আরব জগতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। তাহার ফলে স্বভাবতই ইঙ্গ-ফরাসী ম্যাণ্ডেটরী-প্রভুত্বের অবসানের দাবীতে সেখানে চতুর্দিকে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এই সময় ইংরেজরা মক্কার শরীফ হুসেন এবং তাঁহার পুত্রদের দাবার ঘুঁটি করিয়া আরব দেশগুলিতে কূট চাল চালিতে থাকে। ইংরেজরা প্রথমে হুসেনের পুত্র ফয়জলকে সিরিয়ার রাজা করিবার চেষ্টা করে কিন্তু ফরাসীদের প্রচণ্ড বিরোধিতায় শেষপর্যন্ত ফয়জল সিরিয়া হইতে বিতাড়িত হন। তারপর ইংরেজরা ফয়জলকে ইরাকের সিংহাসনে বসাইয়া দেন।—বস্তুত ফয়জল হইলেন ইংরেজদের হাতে ক্রীড়নক মাত্র। ইংরেজদের এই কূট কৌশলের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া জওহরলাল লিখেতেছেন, (৩রা জুন, ১৯৩৩) :

..."শরীফ হুসেনের পরিবারটি কিন্তু অকস্মাৎ একেবারে রাজকীয় মহিমায় মণ্ডিত হয়ে উঠল—তার পিছনে অবশ্য ছিল ব্রিটেনের শক্তির ঠেলা। হুসেন নিজে হেজাজের রাজা হলেন; এক ছেলে ফয়জল হলেন সিরিয়ার রাজা; আরেক ছেলে আবদুল্লাকে ব্রিটিশরা ট্রান্স-জর্ডন বলে যে নূতন একটি ছোটো রাজ্য তৈরি হয়েছে তার রাজা বানিয়ে দিল। এঁদের এই মহিমা অবশ্য বেশিদিন টিকল না। ফরাসীরা ফয়জলকে সিরিয়া থেকে তাড়িয়ে দিল; ইবনে সৌদের ওয়াহাবি সেনার অভিযানের মুখে হুসেনের রাজাগিরি হাওয়া হয়ে উবে গেল। ফয়জল আবার বেকার হয়ে পড়েছেন দেখে ব্রিটিশরা আবার তাঁকে একটা হিল্লে করে দিল, ইরাকের রাজার

চাকরিটা। ফয়জল এখনও ইরাকের রাজা, ব্রিটিশের অনুগ্রহেই অবশ্য আজও তিনি সেখানে রাজত্ব করছেন।" [বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ : পৃঃ ৭২৮]

ইরাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া জওহরলাল আরও লিখিয়াছেন :

"১৯৩০ সনের জুন মাসে ব্রিটেন এবং ইরাকের মধ্যে নূতন করে একটা মৈত্রী-সূচক সন্ধি হল। এবারেও দেশের আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক সমস্ত ব্যাপারেই ইরাকের পূর্ণ স্বাধীনতা ব্রিটেন স্বীকার করে নিল। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই আবার এমন কতকগুলো রক্ষাকবচ আর ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা করা হল যে সে স্বাধীনতা কার্যত পরিণত হল একটি ঘোমটা-ঢাকা রক্ষণাধীন রাষ্ট্রে। ইরাকের মধ্য দিয়ে গেছে ভারতের আসবার পথ ; সন্ধিপত্রের ভাষায় এটা ব্রিটেনের 'অত্যাবশ্যক যান-বাহন ব্যবস্থা'। এই পথকে নিরাপদ রাখতে হবে, অতএব ইরাক ব্রিটেনকে বিমানঘাঁটি তৈরি করবার জন্য কতকগুলো জায়গা দিয়ে দিচ্ছে। মসুল ও অন্যান্য স্থানে ব্রিটেন তার সেনাও বসিয়ে রেখেছে। সৈন্যদের সামরিক শিক্ষা দেবার জন্য ইরাক ব্রিটিশ শিক্ষক রাখতে পারবে ; ইরাকের সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে পরামর্শ-দাতা হিসাবে থাকবেন ব্রিটিশ সেনানীরা। অস্ত্রশস্ত্র গোলাগুলি এরোপ্লেন ইত্যাদি যা দরকার ইরাককে ব্রিটেনের কাছ থেকেই কিনতে হবে। যুদ্ধ বাধলে তখন দেশের মধ্যে ব্রিটেনকে সমস্ত রকমের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে দিতে হবে।

"এইসব ব্যবস্থা তো আছেই ; এ ছাড়াও দেশের বহু উচ্চ পদ ব্রিটিশ কর্মচারীরা দখল করে বসে আছে বলে দেখা যায়। অতএব এই 'স্বাধীন' দেশটি কার্যত পরিণত হয়েছে ইংলণ্ডের একটি রক্ষণাধীন অঞ্চলে। এই ব্যবস্থা পাকা করে নেওয়া হয়েছে ১৯৩০ সনের মৈত্রীসূচক সন্ধিতে, মেয়াদ পুরো পঁচিশটি বছর ধরে চলবে।

"১৯২৫ সনে নূতন শাসনতন্ত্র চালু করা হল, তারপর থেকেই নূতন পার্লামেণ্ট কাজ শুরু করল। কিন্তু প্রজারা তখনও মোটেই সন্তুষ্ট নয়। বাইরের দিকের অঞ্চলগুলোতে মাঝে মাঝেই বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে লাগল। বিশেষ করে এটা ঘটল কুর্দদের এলাকায়। সেখানে তারা বরাবর বিদ্রোহ করছিল। ব্রিটিশ বিমান-বাহিনী সে বিদ্রোহ দমন করল অতি সুষ্ঠু উপায়ে, বোমা ফেলে এবং গ্রামের পর গ্রাম আস্ত আস্ত উড়িয়ে দিয়ে। ১৯৩০ সনের সন্ধির পরে কথা উঠল, এবার তো ব্রিটিশের আশ্রয়ে ইরাককে লীগ অব নেশনসের সভ্য করে নিতে হয়। কিন্তু দেশে তখন শান্তি নেই, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিশৃঙ্খলা চলেছে। সেটা কারও পক্ষেই প্রশংসার কথা নয়—না ম্যাণ্ডেটের ক্ষমতা যার হাতে দেওয়া হয়েছে সেই ব্রিটেনের পক্ষে ; না দেশে তখন রাজা ফয়জলের যে সরকার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তার পক্ষে। দেশে এইসব বিদ্রোহ চলেছে, এর থেকেই তো স্পষ্ট প্রমাণ হয়, দেশের লোকদের ঘাড়ে ব্রিটিশরা যে সরকারটি বসিয়ে দিয়েছে তার কাজকর্মে প্রজারা সন্তুষ্ট নয়। এখন এইসব কথা যদি আবার লীগ অব নেশনসের কানে গিয়ে ওঠে, সে তো ভয়ানক অন্যায় ব্যাপার হবে। অতএব তখন বলপ্রয়োগ আর ত্রাসসৃষ্টি করে এইসব বিশৃঙ্খলা থামিয়ে দেবার একটা খুব বিশেষ রকমের চেষ্টা করা হল। ব্রিটিশ বিমানবাহিনীকে এই কাজের জন্য নিয়োগ করা হল।"... [ঐ : পৃঃ ৭৩৪-৩৫]

তারপর ব্রিটিশ বোমারু বিমানবাহিনী কী নৃশংসভাবে বিদ্রোহী এলাকাগুলির উপর বোমাবর্ষণ করিয়া সবকিছু বিধ্বস্ত করিতে থাকে, জওহরলাল তাহার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথের পারস্যভ্রমণের প্রায় এক বৎসর পরে জওহরলাল তাঁহার কন্যার উদ্দেশে পত্রাকারে এই গ্রন্থ লিখিতেছিলেন। কিন্তু যে বৈজ্ঞানিক রাজনীতিক ও ইতিহাসচেতনা জওহরলালের ছিল, রবীন্দ্রনাথের তাহা ছিল না, এ'কথা বলাই বাহুল্যমাত্র।

ইরাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পৈশাচিক ভূমিকাটি কবি যে একেবারেই দেখিতে পান নাই, তাহা নহে। তিনি পূর্বেই সংবাদ পান যে ইরাকে ব্রিটিশ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় তখনও বিদ্রোহ চলিতেছিল এবং এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য ব্রিটিশ বিমানবাহিনী বিদ্রোহী এলাকাগুলিতে তখনও প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করিতেছিল। এই সংবাদে তাঁহার মনে যে কী গভীর প্রতিক্রিয়া হয় তা' তাঁহার 'পারস্য-যাত্রী' ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই জানা যায়। তিনি লিখিতেছেন :

"বোগদাদে ব্রিটিশদের আকাশফৌজ আছে। সেই ফৌজের খ্রীস্টান ধর্মযাজক আমাকে খবর দিলেন, এখানকার কোন্ শেখদের গ্রামে তাঁরা প্রতিদিন বোমাবর্ষণ করছেন। সেখানে আবালবৃদ্ধবনিতা যারা মরছে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঊর্ধ্বলোক থেকে মার খাচ্ছে ; এই সাম্রাজ্যনীতি ব্যক্তিবিশেষের সত্তাকে অস্পষ্ট করে দেয় ব'লেই তাদের মারা এত সহজ। খ্রীস্ট এই-সব মানুষকেও পিতার সন্তান বলে স্বীকার করেছেন, কিন্তু খ্রীস্টান ধর্মযাজকের কাছে সেই পিতা এবং তাঁর সন্তান হয়েছে অবাস্তব ; তাঁদের সাম্রাজ্যতত্ত্বের উড়ো জাহাজ থেকে চেনা গেল না তাদের ; সেইজন্যে সাম্রাজ্য জুড়ে আজ মার পড়ছে সেই খ্রীস্টেরই বুকে। তা ছাড়া উড়ো জাহাজ থেকে এই-সব মরুচারীদের মারা যায় এত অত্যন্ত সহজে, ফিরে মার খাওয়ার আশঙ্কা এতই কম যে, মারের বাস্তবতা তাতেও ক্ষীণ হয়ে আসে। যাদের অতি নিরাপদে মারা সম্ভব মারওয়ালাদের কাছে তারা যথেষ্ট প্রতীয়মান নয়। এইকারণে পাশ্চাত্য হননবিদ্যা যারা জানে না তাদের মানবসত্তা আজ পশ্চিমের অস্ত্রীদের কাছে ক্রমশই অত্যন্ত ঝাপসা হয়ে আসছে।"

কবি আরও লিখিলেন :

"ইরাক বায়ুফৌজের ধর্মযাজক তাঁদের বায়ু-অভিযানের তরফ থেকে আমার কাছে বাণী চাইলেন, আমি যে বাণী পাঠালুম সেইটে এইখানে প্রকাশ করা যাক :

From the beginning of our days man has imagined the seat of divinity in the upper air from which comes light and blows the breath of life for all creatures on this earth. The peace of its dawn, the splendour of its sunset, the voice of eternity in its starry silence have inspired countless generations of men with an ineffable presence of the infinite urging their minds away from the sordid interests of daily life. Man has accepted this dust-laden earth for his dwelling place, for the enacting of the drama of his tangled life ever waiting for a call of perfection from the boundless depth of purity surround-

ing him in a translucent atmosphere. If in an evil moment man's cruel history should spread its black wings to invade that realm of divine dreams with its cannibalistic greed and fratricidal ferocity then God's curse will certainly descend upon us for that hideous desecration and the last curtain will be rung down upon the world of Man for whom God feels ashamed." [পরস্য-যাত্রী : পৃঃ. ১১-১২]

কিন্তু ফয়জল-সরকারের সঙ্গে ব্রিটিশদের সম্পর্ক কী এটি কবি ঠিক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং রাজা ফয়জলের যথার্থ চরিত্ররূপও তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত হয় নাই।

অথচ তিনি যখন পারস্য বা আধুনিক ইরাণের রাজনীতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়াছেন তখন মোটামুটি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই তাহা করিয়াছেন। একদা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন ও জার-শাসিত রাশিয়া আপসে কিভাবে পারস্যকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছিল এবং বলশেভিক বিপ্লবের পর কসাক সেনাপতি রেজা খাঁ কিভাবে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় ক্ষমতা দখল করিয়া পারস্যকে বিদেশী প্রভাবমুক্ত করিয়াছিল, কবি তাঁহার 'পারস্য-যাত্রী' গ্রন্থে তাহার বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ইরাণের স্বাধীন সরকার সম্পর্কে সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতিতে যে-মহান আদর্শ পরিব্যক্ত হয়, তাহা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাই তাহার উল্লেখ করিয়া কবি সেদিন লিখিয়াছিলেন :

..."সোভিয়েট রাশিয়ার নূতন রাজদূত রট্‌স্টাইন এসে এই লেখাপড়া করে দিলেন যে, এতকাল সাম্রাজিক রাশিয়া পারস্যের বিরুদ্ধে যে দলননীতি প্রবর্তন করিয়াছিল সোভিয়েট গবর্মেণ্ট্‌ তা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করতে প্রস্তুত। পারস্যের যে-কোনো স্বত্ব রাশিয়ার কবলে গিয়েছিল সমস্তই তাঁরা ফিরিয়ে দিচ্ছেন; রাশিয়ার কাছে পারস্যের যে ঋণ ছিল তার থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হল এবং রাশিয়া পারস্যে যে-সমস্ত পথ বন্দর প্রভৃতি স্বয়ং নির্মাণ করেছিল কোনো মূল্য দাবি না করে সে-সমস্তের স্বত্বই পারস্যকে অর্পণ করা হল।" [ঐ : পৃঃ. ৩৬]

এশিয়া-আফ্রিকার বুকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ভূমিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে সচেতন ছিলেন না তাহা নহে, পরন্তু এই সময় থেকে তিনি সে-সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ হইয়া উঠেন। এই কারণেই এশিরার নবজাগরণ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনকে তিনি আন্তরিকভাবে আহ্বান জানাইতেছিলেন। এই কারণেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আক্রমণের বিরুদ্ধে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ও জাতির সংহতি ও ঐক্যচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য বার বার তিনি তাহাদের উদ্দেশে আকুল আবেদন জানাইতেছিলেন। ইরাণ ও ইরাক ভ্রমণকালে তাঁহার অধিকাংশ বক্তৃতা ও বিবৃতিতে এবং 'পারস্য-যাত্রী' গ্রন্থে তাঁর চিন্তার এই মূল সুরটির ধ্বনিত হইয়াছে।

যুদ্ধোত্তর যুগে সারা এশিয়া জুড়িয়া যে নবজাগরণ ও মুক্তি-চেতনার জোয়ার আসে কবি তাহাকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানাইয়া লিখিলেন :

"ইতিমধ্যে দেখা যায় এসিয়ার নাড়ি হয়েছে চঞ্চল। তার কারণ, য়ুরোপের চাপটা তার বাইরে থাকলেও তার মনের উপর থেকে সেটা সরে গেছে। একদিন মার খেতে খেতেও য়ুরোপকে সে সর্বতোভাবে আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে ধরে নিয়েছিল। আজ এসিয়ার এক প্রান্ত হতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত কোথাও তার মনে আর শ্রদ্ধা নেই। য়ুরোপের হিংস্রশক্তি যদিও আজ বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে, তৎসত্ত্বেও এসিয়ার মন থেকে আজ সেই ভয় ঘুচে গেছে যার সঙ্গে সম্ভ্রম মিশ্রিত ছিল। য়ুরোপের কাছে অগৌরব স্বীকার করা তার পক্ষে আজ অসম্ভব, কেননা য়ুরোপের গৌরব তার মনে আজ অতি ক্ষীণ।...

"আমরা আজ মানুষের ইতিহাসে যুগান্তরের সময়ে জন্মেছি। য়ুরোপের রঙ্গভূমিতে হয়তো বা পঞ্চম অঙ্কের দিকে পটপরিবর্তন হচ্ছে। এসিয়ার নবজাগরণের লক্ষণ এক দিগন্ত হতে আর-এক দিগন্তে ক্রমশই ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। মানবলোকের উদয়গিরি-শিখরে এই নবপ্রভাতের দৃশ্য দেখবার জিনিস বটে—এই মুক্তির দৃশ্য। মুক্তি কেবল বাইরের বন্ধন থেকে নয়, সুপ্তির বন্ধন থেকে, আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসের বন্ধন থেকে।

"**আমি এই কথা বলি, এসিয়া যদি সম্পূর্ণ না জাগতে পারে তা হলে য়ুরোপের পরিত্রাণ নেই। এসিয়ার দুর্বলতার মধ্যেই য়ুরোপের মৃত্যুবাণ। এই এসিয়ার ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে যত তার চোখ রাঙারাঙি, তার মিথ্যা কলঙ্কিত কূট কৌশলের গুপ্তচরবৃত্তি।** ক্রমে বেড়ে উঠছে সমরসজ্জার ভার, পণ্যের হাট বহুবিস্তৃত করে অবশেষে আজ অগাধ ধনসমুদ্রের মধ্যে দুঃসহ করে তুলছে তার দারিদ্র্যতৃষ্ণা।" (বড় হরফ আমার) [ঐ : পৃঃ ১৮-১৯]

এশিয়ার এই নব-জাগরণ ও মুক্তি আন্দোলন প্রত্যক্ষ করার জন্যই তিনি চীন, জাপান, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে (ইন্দোনেশিয়া) এবং সর্বশেষে এই বৃদ্ধ বয়সে পারস্য ও ইরাকে ছুটিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কবির এই এশিয়া-চেতনা প্রাচ্যামী নহে,—কোনো সংকীর্ণ ভাবাবেগও নহে। বস্তুত সারাজীবনই তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আদান প্রদান ও মিলনের কথাই প্রচার করিয়াছেন। পাশ্চাত্যদেশের যেসব প্রবৃত্তি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন ক্ষমাহীন সংগ্রাম করিয়াছেন, সে হইতেছে তাহাদের অত্যুগ্র জাতীয়তাবাদ, বর্ণ-বিদ্বেষ, পরজাতি-বিদ্বেষ, পররাজ্য লুণ্ঠন ও ঘৃণ্য উপনিবেশবাদ। পাশ্চাত্য দেশের এইসব ঘৃণ্য প্রবৃত্তি নবজাগ্রত জাপানের আচরণ ও কার্যকলাপে প্রকাশ পাইতে দেখিয়া তিনি নিদারুণ মর্মাহত হইয়াছিলেন এবং বার বার তাহার জন্য জাপানকে কঠোর তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। তিনি লিখিলেন :

"নূতন যুগের মানুষের নবজাগ্রত চৈতন্যকে অভ্যর্থনা করবার ইচ্ছায় একদিন পূর্ব-এসিয়ায় বেরিয়ে পড়েছিলুম। তখন এসিয়ার প্রাচ্যতম আকাশে জাপানের জয়পতাকা উড়েছে, লঘু করে দিয়েছে এসিয়ার অবসাদচ্ছায়াকে। আনন্দ পেলুম, মনে ভয়ও হল। দেখলুম জাপান য়ুরোপের অস্ত্র আয়ত্ত করে এক দিকে নিরাপদ হয়েছে, তেমনি অন্য দিকে গভীরতর আপদের কারণ ঘটল। তার রক্তে প্রবেশ করেছে য়ুরোপের মারী, যাকে বলে ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্‌, সে নিজের চারি দিকে মথিত করে

তুলেছে বিদ্বেষ।…এমন দিন আসবেই যখন আজ যে দুর্বল তারই কাছে কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব গ'নে দিতে হবে। কী করে মিলতে হয় জাপান তা শিখল না, কী করে মারতে হয় য়ুরোপের কাছ থেকে সেই শিক্ষাতেই সে হাত পাকিয়ে নিলে।…

[ঐ : পৃঃ ১৯]

এই প্রসঙ্গে তিনি আধুনিক তুরস্কের জনক, কামাল পাশার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। একদিকে কামালের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি-যুদ্ধে অসীম সাহসিকতা ও বীর্যবত্তা, অপরদিকে খিলাফৎ ও তুরস্কের মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁহার নির্ভিক বলিষ্ঠ অভিযান,—কামাল-চরিত্রের এ দুটি দিকই কবিকে সমভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। 'পারস্য-যাত্রী' গ্রন্থে তিনি উহা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

তাছাড়া শুধু তুরস্কেই নয়,—যে আরব জগৎ তখনও পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব করিতেছিল, সেইখানেই সমস্ত মধ্যযুগীয় ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়াছে। তুরস্ক, পারস্য ও আরবদেশের এই জাগরণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করাই ছিল তাঁহার এবারের বিদেশভ্রমণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। কবির আন্তরিক বিশ্বাস, আরবদেশ ও মধ্যপ্রাচ্যের এই নবজাগরণের ঢেউ ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজেও আসিয়া লাগিবে এবং তাহার ফলে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান বিরোধের সমস্যাটিও ক্রমশ সহজ হইয়া আসিবে। তাই কবি ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানে সক্রিয় সহযোগিতা করার জন্য ইরাণ ও ইরাকের সাহিত্যিক ও চিন্তাশীলদের নিকট বারংবার আবেদন জানাইতেছিলেন।

কবি তাঁহার পারস্য-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও ধারণা সম্পর্কে 'বিচিত্রা'-তে ধারাবাহিক-ভাবে লিখিয়াছিলেন (১৩৩৯ শ্রাবণ—১৩৪০ বৈশাখ)। উহা প্রথমে 'জাপানে-পারস্যে' গ্রন্থে এবং বর্তমানে 'পারস্য-যাত্রী' গ্রন্থে (তৎসংশ্লিষ্ট বহু মূল্যবান তথ্যাদিসহ) প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে সে-সবের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

৩১শে মে কবি বোগদাদ হইতে করাচীর পথে যাত্রা করেন। বোগদাদ হইতে বিদায় লইবার পূর্বে একদিন সেখানকার বেদুয়িন দলপতি তাঁহার তাঁবুতে মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণ করেন। বেদুয়িন পল্লীতে এই ভোজসভার বিবরণ কবি সবিস্তারে লিখিয়াছেন। আরবের এই দুর্ধর্ষ মরুচর উপজাতিটিকে যে তিনি কি পরিমাণ ভালবাসিতেন—কতখানি আন্তরিক দরদ দিয়া তাহাদের জন্য তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, তা তাঁহার 'পারস্য-যাত্রী' পাঠ করিলেই জানা যায়।

কবি লিখিয়াছিলেন :

"এরা মরুর সন্তান, কঠিন এই জাত, জীবন মৃত্যুর দ্বন্দ্ব নিয়ে এদের নিত্য ব্যবহার। এরা কারো কাছে প্রশ্রয়ের প্রত্যাশা রাখে না, কেননা পৃথিবী এদের প্রশ্রয় দেয় নি। জীববিজ্ঞানে প্রকৃতিকর্তৃক বাছাইয়ের কথা বলে ; জীবনের সমস্যা সুকঠোর ক'রে দিয়ে এদেরই মাঝে যথার্থ কড়া বাছাই হয়ে গেছে, দুর্বলেরা বাদ প'ড়ে যারা নিতান্ত টিকে গেল এরা সেই জাত। মরণ এদের বাজিয়ে নিয়েছে। এদের যে এক-একটি দল তারা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, এদের মাতৃভূমির কোলের পরিসর ছোটো ; নিত্য

বিপদে বেষ্টিত জীবনের স্বল্প দান এরা সকলে মিলে ভাগ ক'রে ভোগ করে। এক বড়ো থালে এদের সকলের অন্ন, তার মধ্যে শৌখিন রুচির স্থান নেই; তারা পরস্পরের মোটা রুটি অংশ করে নিয়েছে, পরস্পরের জন্যে প্রাণ দেবার দাবি এই এক রুটি ভাঙার মধ্যেই। বাংলাদেশের নদীবাহুবেষ্টিত সন্তান আমি, এদের মাঝখানে বসে খাচ্ছিলুম আর ভাবছিলুম—সম্পূর্ণ আলাদা ছাঁচে তৈরি মানুষ আমরা উভয়ে। তবুও মনুষ্যত্বের গভীরতর বাণীর যে ভাষা সে ভাষায় আমাদের সকলেরই মন সায় দেয়।...একদিন কবিতায় লিখেছি 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন'।—আজ আমার হৃদয় বেদুয়িন হৃদয়ের অত্যন্ত কাছে এসেছে, যথার্থই আমি তাদের সঙ্গে এক অন্ন খেয়েছি অন্তরের মধ্যে।" [পারস্য-যাত্রী : পৃঃ ১০৪-১০৫]

দেশে প্রত্যাবর্তনের পরে

৩১শে মে (১৯৩২), কবি পারস্য ভ্রমণান্তে ডাচ্ বিমানযোগে করাচীতে পৌঁছান। ঐদিনই করাচীর পৌরবাসীর পক্ষে কবির উদ্দেশে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। ঐ সভায় ভারতীয় সাংবাদিকদের কাছে আলোচনাকালে কবি তাঁহার পারস্য-ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। এদিকে বোম্বাইয়ে তখনও হিন্দু-মুসলমানের ভয়াবহ দাঙ্গা চলিতেছে। এই দাঙ্গায় প্রায় ১৫০ জন নিহত ও প্রায় ১২৫৭ জন আহত হয়। মাঝখানে কয়েকদিন বন্ধ ছিল —২৯-শে মে পুনরায় দাঙ্গা শুরু হয়। এই নিদারুণ দুঃখজনক ঘটনাটিতে কবির মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। এই প্রসঙ্গে সাংবাদিক সভায় তিনি বলেন যে, এমন জাতীয় অবমাননাকর ঘটনা কখনই ইরাণে বা ইরাকে এখন ঘটিতে পারে না। তিনি বলিলেন :

"It is very humiliating to us that such things should be possible in this country. People in the countries which I have just visited ask, 'What is the matter with these people? Why do they fight among themselves?' They cannot imagine what is at the back of it. They say it cannot be a difference of creeds and they are quite as sorry as ourselves."

তিনি আরও বলিলেন :

"It is not something inherent in the Muslim mentality that is the cause of this trouble but something wrong in our own country. What I have seen of other centres of Mahomedan culture has given me very great hopes that things will change also in India and we shall not have to suffer from communal, fratricidal riots. That is what I hope from what I have seen in other parts of the Islamic world."

এই প্রসঙ্গে তিনি বিশেষভাবে সেখানকার জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিক অভ্যর্থনার ও আতিথেয়তার উল্লেখ করেন। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন তাঁহার এই ভ্রমণের ফলে পারস্য ও আরব দেশগুলির সঙ্গে ভারতের মৈত্রী ও মানবিক সম্পর্ক স্থাপিত হইবে কিনা। কবি তাহার জবাবে বলেন :

"I hope so and I look forward to it, and if my visit should be instrumental in bringing about better relations, I should be very happy."

পরদিন কবি কলিকাতায় আসিয়া পেঁছিলেন (১লা জুন)। এখানেও তিনি সাংবাদিকদের কাছে তাঁহার পারস্য-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেন।

পারস্য হইতে ফিরিয়া কবি কিছুদিন খড়দহে কাটান। এই সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুবার্ষিক উদযাপন উপলক্ষে উদ্যোক্তাদের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথের নিকট একটি বাণীর জন্য অনুরোধ আসে। তিনি তাঁহার বাণীতে পারস্য ও আরবদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সমগ্র প্রাচ্যে আজ নূতন ইতিহাস সৃষ্টি হইতেছে এবং তাহা এশিয়ার নবজাগরণের ইতিহাস। তিনি বলেন, সর্বত্রই মহান নেতাদের আবির্ভাব হইতেছে যাঁহারা তাহাদের জনগণ ও জাতিকে তাহাদের জন্মগত ন্যায়সঙ্গত অধিকার সম্পর্কে সচেতন করিয়া সকল প্রকার দাসত্বের বন্ধন ছিন্ন করিবার মুক্তি-সংগ্রামে পরিচালিত করিতেছেন। [দ্র. পারস্য-যাত্রী : পৃঃ, ১৬৬-৬৮]

পারস্য-ভ্রমণ উপলক্ষে কবি প্রায় দেড়মাসকাল দেশের বাহিরে ছিলেন। ইতিমধ্যে দেশের রাজনীতিক পরিস্থিতি গুরুতর সঙ্কটজনক হইয়া উঠে। আন্দোলনকে দমন ক রার জন্য গভর্নমেণ্টের দমননীতি ক্রমশই ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই দমননীতি ও সমস্ত নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করিয়া দিল্লীতে কংগ্রেসের ৪৭-শৎ অধিবেশন আহ্বান করা হয় (২৩শে এপ্রিল)। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য পূর্বেই সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু দিল্লীযাত্রাকালে পথিমধ্যে তাঁহাকে এবং প্রায় তিন শতাধিক প্রতিনিধিকে গ্রেপ্তার করা হয়। বেআইনী ঘোষণা করা সত্ত্বেও দিল্লীর চাঁদনীচকে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আমেদাবাদের রণছোড়দাস অমৃতলাল সভাপতিত্ব করেন এবং প্রায় পাঁচশতাধিক কংগ্রেস প্রতিনিধি ইহাতে যোগদান করেন। পূর্ণস্বাধীনতার সঙ্কল্প এবং আইন অমান্য আন্দোলন চালাইবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি পূর্বেই যে-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কংগ্রেসে তাহার পূর্ণ সমর্থন করা হয় এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করা হয়। প্রকাশ্য অধিবেশনের দিন পুলিশ লাঠি চালাইয়া জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়া প্রায় আট শতাধিক কংগ্রেস প্রতিনিধিকে গ্রেপ্তার করে। প্রাদেশিক, জেলা ও আঞ্চলিক সম্মেলনগুলিতে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত পাঠ করা হয় এবং পুলিশও যথারীতি লাঠি, গুলি, গ্রেপ্তার ও অন্যান্য দমননীতি চালাইতে থাকে। ১লা মে, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মুক্তি পান।

জানুয়ারী মাস হইতে এপ্রিল পর্যন্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে যেসব ধর-পাকড় জেল ইত্যাদি হয়, সে-সম্পর্কে পণ্ডিত মালব্য জেলে যাইবার পূর্বে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া দীর্ঘ এক বিবৃতি দেন। এই বিবৃতির এক জায়গায় বলা হয় :

"আমার সংগৃহীত বিবরণ হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, জানুয়ারী হইতে ২০শে এপ্রিল পর্যন্ত ভারতে মোট ৬৬,৬৪৬ জন লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে এবং উহার মধ্যে ৫,৩২৫ জন মহিলা। অনেক অল্পবয়স্ক বালকও উহার মধ্যে আছে। তাহা ছাড়া ভারতের পল্লীগ্রামসমূহে এমন বহু ধরপাকড় হইয়াছে, যাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই। এই সব বিবেচনা করিলে আমার মনে হয় যে, এই পর্যন্ত ভারতে ৮০ হাজারের উপর লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। এই পর্যন্ত ৩৭২ জন বিশিষ্ট সম্পাদক, উকীল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, অধ্যাপক ও ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার অপমানজনক শর্ত দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। উহার মধ্যে অনেকেই এইসব শর্ত অমান্য করিয়া দীর্ঘদিনের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে পতাকা উত্তোলনের জন্য ৪৯৬ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং অনেক স্থানে জাতীয় পতাকা ছিন্নভিন্ন করা হইয়াছে। পিকেটিংয়ের জন্যও এই পর্যন্ত ২৪৯৬ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এইসব ধরপাকড়ের ফলে ভারতের সমস্ত জেল ভর্তি হইয়া গিয়াছে এবং কর্তৃপক্ষ এজন্য বহু নূতন জেল স্থাপন করিয়াছেন ও অনেক সাধারণ কয়েদীকে মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই ছাড়িয়া দিয়াছেন।

"...এই সময় পর্যন্ত ভারতের নানাস্থানে জনতার উপর ৩২৫ বার লাঠিচালান এবং ২৯ বার গুলী চালান হইয়াছে। লাঠিচালনার ফলে অনেক লোক আহত হইয়াছে। এই পর্যন্ত ৬৩৩ স্থানে খানাতল্লাস ও অনেক লোকের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। অনেক স্থানেই পুলিশ দণ্ডিত ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিয়া জরিমানা আদায় করিয়াছে। একজনের ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইয়াছিল।...এই পর্যন্ত ১৬৩টি সংবাদপত্র ও ছাপাখানা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।" [আনন্দবাজার পত্রিকা : ১৫ই বৈশাখ, ১৩৩৯ : ২৮ এপ্রিল, ১৯৩২]

ভারতের এই পরিস্থিতিতে বিদেশে বিবেকী বুদ্ধিজীবীর মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য ও উদ্বেগ দেখা দেয়। রোমাঁ রোলাঁ, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, জে. টি. স্যাণ্ডারল্যাণ্ড, মিস্ মুরিয়েল লিস্টার প্রমুখ ভারতবন্ধু ব্রিটিশের এই দমননীতির প্রতিবাদ করেন। এই সময় রোলাঁ ভারতবর্ষের এই আন্দোলন সম্পর্কে তাঁহার জনৈক ইংরেজ বন্ধুকে লিখিলেন :

"In the eyes of thousands of men, today, who consider the maintenance of the present form of society—imperialists and capitalist—intolerable, and who are determined to change it, the magnificent experiment in India of satyagraha is the only chance offered to the world of bringing about this social transformation without appeal to violence. If it fails—if it is ruined by the violence of the British Empire, pitting itself against India's civil disobidence—there will be no other issue for human evolution but violence ; and it will be the British Empire itself which has decided it···*it is either Gandhi or Lenin.* In any case justice will be done."

[Mahatma : Vol. III, P. 158]

তাছাড়া কিছুকাল হইতেই বিলেতের কোয়েকার ও ভারতবন্ধু-সমাজ ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মধ্যে একটি সম্মানজনক মীমাংসার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইঁহাদের এই প্রচেষ্টার জবাবে গান্ধীজী ৪ঠা মে কারাগার হইতে যে পত্র দেন উহা ২২শে জুন লণ্ডন 'টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, পূর্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি। কিছুদিন পর কেম্‌ব্রিজ হইতে I. J. Pitt. '*Indian Social Reformer*-এর সম্পাদকের উদ্দেশে এক খোলাচিঠি লিখেন (১৪ই জুলাই, ১৯৩২)। উহাতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাইবার জন্য অনুরোধ জানান।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। তিনি উহার জবাবে (২০শে জুলাই) ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের এই নির্যাতননীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া একটি বিবৃতি (*Liberty* : 24th July, '32) দেন। উহার মর্মার্থ ছিল এই :

"ভারতের রাজনীতিক পরিস্থিতি দ্রুত গতিতে মধ্যযুগীয় বর্বরতার দিকে চলিয়াছে। পীড়ন ও প্রতিহিংসার বিরামবিহীন চক্রের আবর্তনক্রমে সন্দেহ এবং শত্রুতার দ্বারা পৌরজীবন ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছে। ঘটনার গতি যদি এইভাবে চলে, তাহা হইলে বিভিন্ন দলের মধ্যে বিচ্ছেদ পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিবে; কোনরূপ রাজনীতিক চাতুর্যই ঐরূপ বিরোধ-বিচ্ছেদকে জোড়াতালি দিয়া শাসনতন্ত্রকে কার্যকর করিতে সক্ষম হইবে না। দুঃখকষ্ট যতই তীব্র হউক না, সব সহ্য করা যায়। কালক্রমে লোকে ঐগুলি বিস্মৃতও হইয়া থাকে, কিন্তু উৎকট নৈতিক পাপাচারপ্রসূত যেসব আঘাত, সেগুলি সহজে আরোগ্য হয় না। জগতের আর্থনীতিক সংকটের জন্য যে আর্থিক কষ্ট দেখা গিয়াছে, সহিষ্ণুতার সহিত তাহা গ্রহণ করা সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু অন্যায়ের উৎকট আঘাত মানবের মৈত্রীর বন্ধন চিরদিনের জন্য ভঙ্গ করিয়া দেয়। বিশ্বমানবের ইতিহাসের দিকে তাকাইয়া কিছুতেই ঐগুলি ঘটিতে দেওয়া, বরদাস্ত করা উচিত নহে। ভারতের শাসক এবং শাসিতের মধ্যে নৈতিক অবস্থার ভীষণ দুঃখকষ্টের দৃশ্য শুধু যে ক্রমেই অধিকতর বেদনাকর এবং কষ্টদায়ক হইয়া উঠিতেছে এমন নহে, আমাদের মহাদেশ যে পিছু হটিয়া আদিম যুগের বর্বরতার গর্ভে নিমজ্জিত হইতে বসিয়াছে, উহাতে তাহারই পূর্বাভাস সূচিত হইতেছে।

"যাঁহারা এদেশের ভাগ্যনিয়ামক, এদেশের অধিবাসী এবং যাহাদের ভাগ্য আমাদের সহিত বিজড়িত হইয়াছে, তাঁহারা মৈত্রীর দূরদর্শিতাপূর্ণ বিজ্ঞজনোচিত পথে সাহসের সহিত সম্মিলিত হউন। আমাদের দেশ যাহাতে শান্তিপূর্ণ পথে সামাজিক এবং আর্থিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে সেজন্য একটি উপযুক্ত শাসনতন্ত্র নির্ধারণকল্পে ঐক্যবদ্ধ ভারতের ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া নিজেদের বিরোধ বিচ্ছেদ তাঁহারা বিস্মৃত হউন। ন্যায় এবং সহিষ্ণুতার ভিত্তির উপর পরস্পরের মধ্যে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করিবার সময় আসিয়াছে। বর্তমান ভারতের রাজনীতিক উচ্ছৃংখলতা বিদূরিত করিয়া সভ্যতার আবহাওয়া প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত বহুসংখ্যক চিন্তাশীল ব্যক্তি যে চূড়ান্ত চেষ্টা করিতে প্রস্তুত আছেন, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।"—ফ্রী প্রেস।

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ৭ই শ্রাবণ, ১৩৩৯ : ২৩শে জুলাই, ১৯৩২]

তাছাড়া কবি বিলেতে এন্ড্রুজকেও এ-বিষয়ে এক পত্র লিখেন। 'ইণ্ডিয়া লীগে'র উদ্যোগে সমবেত এক জনসভায় এন্ড্রুজ কবির ঐ পত্রের নিম্নলিখিত অংশটি পাঠ করেন :

"আমাদের অবস্থা পশুবৎ। আপনার দেশের লোকের খাতিরে আমি ভরসা করি যে, এখনও এমন ইংরেজ আছেন যাঁহারা এই লজ্জাজনক অবস্থা উপলব্ধি করিতে সমর্থ।" [ঐ]

উল্লেখযোগ্য ইহার কয়েকদিন পূর্বেই স্যামুয়েল হোরের এক ঘোষণার পর ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনার জন্য বোম্বাইয়ে গোল-টেবিল বৈঠকের পরামর্শ কমিটির বৈঠক শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতে সপ্রু-জয়াকর প্রমুখ নেতারা এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে অসম্মত হন। তাছাড়া স্যর স্যামুয়েল হোর এক বিবৃতি প্রসঙ্গে এমন কয়েকটি জাতীয় অবমাননাকর উক্তি করেন যাহার প্রতিবাদে সারা দেশে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। প্রতিবাদে পণ্ডিত মালব্য ২৪শে জুলাই ভারতব্যাপী প্রতিবাদ সভার আবেদন জানান।

এই সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' পদে রবীন্দ্রনাথকে নিয়োগ করার প্রস্তাব হয়। কবি তাহাতে সম্মত হন। ৫ই আগস্ট কবি কলিকাতায় আসিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে তাঁহাকে হাওড়া স্টেশনে মাল্যদান ও বিশেষ সংবর্ধনা জানান হয়। পরদিন ৬ই আগস্ট বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিশেষ কনভোকেশন বা সমাবর্তন উৎসব সভায় কবিকে সংবর্ধনা জানান হয়। কবি কলিকাতায় উত্তেজনার কথা সবই শুনিলেন কিন্তু নূতন করিয়া আর কোন বিবৃতি দেন নাই—সম্ভবত উহার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

এই সময় কবির ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে নানা সমস্যা ও অশান্তি দেখা দেয়। কবির দৌহিত্র অর্থাৎ কন্যা মীরাদেবীর একমাত্র পুত্র নীতীন্দ্র এই সময় জার্মানীতে গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং কিছুদিন পর সেখানে তাহার মৃত্যু হয়। ৭ই আগস্ট (২২শে শ্রাবণ) কবি এই দুঃসংবাদ পান। তাছাড়া এই সময় কবির খুবই অর্থসংকট দেখা দেয়। এইসব নানাকারণে মানসিক অশান্তি তাঁহার কম ছিল না বটে তবে বাহিরে তাহার কোন অভিব্যক্তি ছিল না। অবশ্য ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের কোনো ক্ষতিই তাঁহার মনে কোনো দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রাখিতে পারিত না।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, কবি এই সময় বাংলাকাব্যে এক সম্পূর্ণ অভিনব ছন্দরীতি ও রচনাশৈলীর প্রবর্তন করেন। এইগুলিকেই রবীন্দ্রনাথের গদ্যকাব্য বলা হয়। এইকালের অধিকাংশ গদ্য কবিতাগুলিই 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে ; বাকী কয়েকটি স্থান পাইয়াছে 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থে। পারস্য-যাত্রার পূর্বেই 'মানী' 'অগ্রদূত' 'শান্ত' ও 'প্রণাম' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা রচিত হয়। এইগুলি তৎকালীন রাজনীতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত এবং পরে 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থে স্থান পায়।

'পুনশ্চ' ১৩৩৯-এর আশ্বিনের প্রথমভাগেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ইহার অধিকাংশ কবিতাই আমাদের বিষয় ও আলোচনার এক্তিয়ার বহির্ভূত। তবে ইহার

মধ্যে 'বাঁশি' (২৫শে আষাঢ়) ও 'উন্নতি' (২৬শে আষাঢ়) কবিতা দুটি আমাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যে দেখা দেয়। এই কবিতা দুটির কাব্যগত স্বতন্ত্র মূল্য আছে কিন্তু তাছাড়াও ইহাতে কবির বাস্তব সমাজ-চেতনারও অভিব্যক্তি দেখা যায়। এই কবিতা দুটির মধ্যে সেই বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের যুগে বাংলার নিম্নমধ্যবিত্ত কেরানী-জীবনের দুঃসহ জীবনযন্ত্রণার তীব্র আর্তি শুনা যায়। 'বাঁশি' কবিতাটি সকলেরই সুপরিচিত সুতরাং এখানে তাহার উল্লেখ প্রয়োজন করে না। 'উন্নতি' কবিতাটির মধ্যেও কবি উত্তমপুরুষের জবানীতে মধ্যবিত্ত কেরানীজীবনের এক ব্যর্থ জীবন-সংগ্রামের চিত্র আঁকিয়াছেন।

সচরাচর আর দশজন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরা তাহাদের আদর্শবাদী পিতা ও অভিভাবকদের নিকট সর্বদাই যেমন বড়ো হওয়ার নীতিকথা শুনিয়া থাকে, আলোচ্য কবিতাটির এই কেরানীটিও সেইভাবে ছেলেবেলায় তাহার পিতার নিকট নীতিকথা ও হিতোপদেশ শুনিতে অভ্যস্ত হয়। আর ছেলেটি সে সব নীতিকথা শুনাইয়া তাহার বাগানের একটি কুলের চারাগাছকে উন্নতির জন্য শাসন করিত। শিশুগুরুর বেত্রাঘাতে ও শাসনে কুলের চারাটির উন্নতির কোন লক্ষণই দেখা যাইত না। এইভাবে তাহার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। তারপর বয়স হইলে সে যথারীতি আর দশজন মধ্যবিত্ত ছেলেদের মত কেরানীগিরির চাকরিতেও বহাল হইল বটে কিন্তু চাকরিতে তাহার উন্নতির তেমন কিছু লক্ষণ দেখা গেল না।

"বাবার মৃত্যুর পরে সেক্রেটারিয়েটে
উন্নতির ভিত্তি ফাঁদা গেল।
বহু কষ্টে বহু ঋণ করে
বোনের দিয়েছি বিয়ে।
নিজের বিবাহ প্রায় টার্মিনসে এল
আগামী ফাল্গুনের নবমী তিথিতে।
নববসন্তের হাওয়া ভিতরে বাইরে
বইতে আরম্ভ হল যেই—
এমন সময়ে, রিডাক্শান।
পোকাখাওয়া কাঁচা ফল
বাইরেতে দিব্য টুপটুপে,
ঝুপ করে খসে পড়ে
বাতাসের এক দমকায়
আমার সে দশা।
বসন্তের আয়োজনে যে একটু ত্রুটি হল
সে কেবল আমারি কপালে।
আপিসের লক্ষ্মী ফিরালেন মুখ,
ঘরের লক্ষ্মীও
স্বর্ণকমলের খোঁজে অন্যত্র হলেন নিরুদ্দেশ।
সার্টিফিকেটের তাড়া হাতে,

শুকনো মুখ,
চোখ গেছে বসে,
তুবড়ে গিয়েছে পেট
জুতোটার তলা ছেঁড়া,
দেহের বর্ণের সঙ্গে চাদরের
ঘুচে গেছে বর্ণভেদ,
ঘুরে মরি বড়োলোকদের দ্বারে।
এমন সময় চিঠি এল
ভজু মহাজন
দেনায় দিয়েছে ক্রোক ভিটেবাড়িখানা।

বাড়ি গিয়ে উপরের ঘরে
জানলা খুলতে সেটা ডালে ঠেকে গেল।
রাগ হল মনে—
ঠেলাঠেলি করে দেখি,
আরে আরে ছাত্র যে আমার।
শেষকালে বড়োই তো হল,
উন্নতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিলে
ভজু মল্লিকেরি মতো আমার দুয়ারে দিয়ে হানা।"
[রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১৬'শ খণ্ড : পৃঃ. ৮৯-৯১]

এই দুটি কবিতাতেই বাংলার মধ্যবিত্ত কেরানীসমাজের বিড়ম্বিত জীবনের প্রতি যত সুতীব্র 'আইরনী', শ্লেষ ও আত্ম-পরিহাসই প্রকাশ পাক না কেন, উহা অপেক্ষাও আছে মধ্যবিত্ত সমাজের জন্য কবির গভীর আন্তরিক দরদ ও সহানুভূতি। এবং এই কারণেই এই দুটি কবিতাই তিনি উত্তমপুরুষের জবানীতেই লিখিয়াছেন। মধ্যবিত্ত কেরানীজীবনের এতখানি বাস্তব নগ্নচিত্র তাঁহার আর কোন কবিতাতে প্রকাশ পাইয়াছে কিনা সন্দেহ। সওদাগরী অফিসের ২৫ টাকা মাহিনার কেরানীদের যে দুঃসহ দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবনের চিত্র আঁকিয়াছেন কবি 'বাঁশি' কবিতার মধ্যে সমকালীন বাংলাকাব্যে তাহার তুলনা বিরল।

"কিনু গোয়ালার গলি।
দোতলা বাড়ির
লোহার গরাদে-দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধারেই।
লোনা-ধরা দেওয়ালেতে মাঝে মাঝে ধসে গেছে বালি,
মাঝে মাঝে স্যাঁতা-পড়া দাগ।
মার্কিন থানের মার্কা একখানা ছবি
সিদ্ধিদাতা গণেশের
দরজার 'পরে আঁটা।

আমি ছাড়া ঘরে থাকে আরেকটা জীব
এক ভাড়াতেই,
সেটা টিকটিকি।
তফাত আমার সঙ্গে এই শুধু,
নেই তার অন্নের অভাব।

বেতন পঁচিশ টাকা,
সদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি।
খেতে পাই দত্তদের বাড়ি
ছেলেকে পড়িয়ে।
শেয়ালদা ইস্টিশনে যাই
সন্ধ্যেটা কাটিয়ে আসি,
আলো জ্বালাবার দায় বাঁচে।
এঞ্জিনের ধস ধস
বাঁশির আওয়াজ,
যাত্রীর ব্যস্ততা,
কুলি-হাঁকাহাকি।
সাড়ে দশ বেজে যায়,
তার পরে ঘরে এসে নিরালা নিঃঝুম অন্ধকার।

*   *   *   *

বর্ষা ঘন ঘোর।
ট্রামের খরচা বাড়ে,
মাঝে মাঝে মাইনেও কাটা যায়।
গলিটার কোণে কোণে
জমে ওঠে পচে ওঠে
আমের খোসা ও আঁঠি, কাঁঠালের ভূতি,
মাছের কানকা,
মরা বেড়ালের ছানা,
ছাই পাঁশ আরো কত কী যে!
ছাতার অবস্থাখানা জরিমানা-দেওয়া
মাইনের মতো,
বহু ছিদ্র তার।
আপিসের সাজ
গোপীকান্ত গোঁসাইয়ের মনটা যেমন,
সর্বদাই রসসিক্ত থাকে।
বাদলের কালো ছায়া

স্যাঁতসেঁতে ঘরটাতে ঢ্বকে
কলে-পড়া জন্তুর মতন
মূর্ছায় অসাড়।
দিনরাত মনে হয়, কোন্ আধমরা
জগতের সঙ্গে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছি।"

[ঐ : পৃঃ. ৮৪-৮৬]

অহরহ যাহারা এই দুঃসহ দারিদ্র্য-যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছে, বিবাহের প্রস্তাব আসিলে তাহারা আতঙ্কে পিছাইয়া যাইতে চায়। কিন্তু তবুও এ-মানুষের জীবনে বসন্ত আসে। তবুও তাহারা একটি সুখী শান্তি-নীড় রচনার স্বপ্ন দেখে। গোধূলির অন্তরাগের রঙিন মুহূর্তে অকস্মাৎ হরিপদ কেরানীরাও সব কিছু ভুলিয়া ভয়ঙ্কর রোমাণ্টিক হইয়া উঠিতে পারে, যেখানে 'আকবর বাদশার সঙ্গে হরিপদ কেরানীর কোনো ভেদ নেই।'

আমস্টার্ডাম শান্তি-সম্মেলন ও ভারতবর্ষ

ইহার কিছুকাল পরে কবি 'মানবপুত্র' কবিতাটি রচনা (শ্রাবণ, ১৩৩৯) করেন। এই সময় এন্ড্রুজের '*What I owe to Christ*' গ্রন্থটি পাঠ করিয়া কবি উহার একটি সমালোচনা লিখেন (দ্র. *Visva Bharati News* : March, 1933 : P. 81)। রবীন্দ্রজীবনী-কারের ধারণা, এই গ্রন্থটি পাঠ করিবার পর কবির মনে ঐ কবিতাটির ভাবোদয় হয়। কিন্তু বোগ্দাদে ব্রিটিশ বোমারুবাহিনীর পক্ষে সেখানকার ধর্মযাজক কবির নিকট বাণী চাওয়ার ফলে তাঁহার মনে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়, এই প্রসঙ্গে সেটিও আমাদের স্মরণ রাখা দরকার। সেদিন কবি লিখিয়াছিলেন :

…"সেখানে আবালবৃদ্ধবনিতা যারা মরছে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঊর্ধ্বলোক থেকে মার খাচ্ছে ; এই সাম্রাজ্যনীতি ব্যক্তিবিশেষের সত্তাকে অস্পষ্ট করে দেয় ব'লেই তাদের মারা এত সহজ। খ্রীস্ট এই-সব মানুষকেও পিতার সন্তান বলে স্বীকার করেছেন, কিন্তু খ্রীস্টান ধর্মযাজকের কাছে সেই পিতা এবং তাঁর সন্তান হয়েছে অবাস্তব ; তাঁদের সাম্রাজ্যতত্ত্বের উড়ো জাহাজ থেকে চেনা গেল না তাদের ; সেইজন্যে সাম্রাজ্য জুড়ে আজ মার পড়ছে সেই খ্রীস্টেরই বুকে।"…

[পারস্য-যাত্রী : পৃঃ. ১১]

'মানবপুত্র' কবিতাটিতে তিনি এই কথাই গদ্যকাব্যের ছন্দে লিখিলেন :

"আজ তিনি একবার নেমে এলেন নিত্যধাম থেকে মর্তধামে।
চেয়ে দেখলেন,
সেকালেও মানুষ ক্ষতবিক্ষত হত যে-সমস্ত পাপের মারে,—
যে উদ্ধত শেল ও শল্য, যে চতুর ছোরা ও ছুরি,
যে ক্রূর কুটিল তলোয়ারের আঘাতে,

বিদ্যুদ্বেগে আজ তাদের ফলায় শান দেওয়া হচ্ছে
হিসহিস শব্দে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে
বড়ো বড়ো মসীধূমকেতন কারখানাঘরে।
কিন্তু দারুণতম যে মৃত্যুবাণ নূতন তৈরি হল,
ঝকঝক করে উঠল নরঘাতকের হাতে,
পূজারি তাতে লাগিয়েছে তাঁরই নামের ছাপ
তীক্ষ্ণ নখে আঁচড় দিয়ে।
খৃস্ট বুকে হাত চেপে ধরলেন,—
বুঝলেন শেষ হয় নি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন মৃত্যুর মুহূর্ত,
নূতন শূল তৈরি হচ্ছে বিজ্ঞানশালায়,
বিঁধছে তাঁর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে।
সেদিন তাঁকে মেরেছিল যারা
ধর্মমন্দিরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে,
তারাই আজ নূতন জন্ম নিল দলে দলে,
তারাই আজ ধর্মমন্দিরের বেদির সামনে থেকে
পূজামন্ত্রের সুরে ডাকছে ঘাতক সৈন্যকে,
বলছে, "মারো মারো"।
মানবপুত্র যন্ত্রণায় বলে উঠলেন ঊর্ধ্বে চেয়ে,
"হে ঈশ্বর, হে মানুষের ঈশ্বর,
কেন আমাকে ত্যাগ করলে।"

[রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১৬'শ খন্ড : পৃঃ. ১২৪]

এই সময় থেকেই বিশ্ব-পরিস্থিতি ক্রমশই ঘোরাল হইয়া উঠিতে থাকে। ১৯৩১ সালে, ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলি যখন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে চূড়ান্ত রকমে বিপর্যস্ত সেই সময় জাপান তাহার বিপুল সেনাবাহিনীর সাহায্যে মাঞ্চুরিয়া অভিযান করে। কিছুদিন পরে,—১৯৩২ সালের জানুয়ারীর শেষ ভাগে (২৮ জানুয়ারী) জাপানীরা আবার সাংহাই ও চাপেই অঞ্চলে আক্রমণ করিয়া প্রচন্ড বোমাবর্ষণ করিতে থাকে। বস্তুত লীগ অব নেশন্স্ প্রথমে এই ব্যাপারটিকে জরুরী বলিয়াই স্বীকার করিতে চাহিলেন না ; পরে অবশ্য মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক কমিশন নিযুক্ত করেন। ব্রিটেন কিন্তু তলে-তলে জাপানকে সমর্থনই করিতেছিল। আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এই যে, যে সময় জাপানীরা মাঞ্চুরিয়া ও সাংহাই অঞ্চলে প্রচন্ড বোমাবর্ষণ করিতেছিল ঠিক সেই সময়ই জেনিভাতে বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন চলিতেছিল। দিনের পর দিন মাসের পর মাস এই অধিবেশন চলে। উল্লেখযোগ্য, এই অধিবেশনেই সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিনিধি লিট্ভিনভ্ বিশ্বের সমস্ত দেশের সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব আনেন। কিন্তু একমাত্র তুরস্ক ব্যতীত অপর কোনো রাষ্ট্রই তাঁহাকে সমর্থন করিলেন না। শেষপর্যন্ত ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের ষড়যন্ত্রে এই প্রস্তাব বানচাল হইয়া যায়। বলাবাহুল্য, ইতিমধ্যে বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অস্ত্র ও

সমরোপকরণ নির্মাণের প্রতিযোগিতা বিন্দুমাত্রও হ্রাস পায় নাই কিংবা ইরাক ও আফগান সীমান্তে ব্রিটিশ বম্বিং বন্ধ হয় নাই।

উল্লেখযোগ্য, কয়েকমাস পূর্বে লিঁয় শহরে যুদ্ধবিরোধীদের এক সম্মেলনে (১-৪ঠা আগস্ট, ১৯৩১) অধ্যাপক আইনস্টাইন নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর সমস্ত দেশের শান্তিকামী মানুষকে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিবার আবেদন জানাইয়া বলেন :

"I appeal to all men and women, whether they be eminent or humble, to declare before the World Disarmament Conference meets at Geneva in February, that they will refuse to give any further assistance to war or the preparation of war. I ask them to tell their governments this in writing, and to register their decision by informing me that they have done so.

"I shall expect to have thousands of responses to this appeal. They should be addressed to me at the headquarters of the *War Registers' International,* 11, Abbey Road, Enfield, Middlesex, England. To enable this great effort to be carried through effectively, I have authorized the establishment of the '*Einstein War Registers' International Fund*'. Contributions to this fund should be sent to the treasurer of the W. R. I. 11, Abbey Road, Enfield, Middlesex, England." [*Modern Review* : October, 1931 : P. 482]

রবীন্দ্রনাথ এই আবেদনের জবাবে আইনস্টাইনের নিকট সরাসরি কোন বাণী পাঠাইয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে নিরস্ত্রীকরণের সম্মেলন শুরু হইলে তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের জেনারেল সেক্রেটারীর নিকট নিম্নলিখিত বাণীটি পাঠান। উহা ডঃ কালিদাস নাগ সম্পাদিত '*India and the World*' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় :

"জাতীয়তার সীমালঙ্ঘী মানবতার আত্মা অবশেষে রাষ্ট্রসঙ্ঘের দেহে আশ্রয় লইয়াছে। যদিও ভারতবর্ষের মত দেশে আমরা তাহার আদর্শকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কার্যত অগ্রসর করিতে পারিব না, তথাপি উচ্চকণ্ঠে আমাদের এই আশা ঘোষণা করতে চাই যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ নানাজাতির মধ্যে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও বর্তমান যুগে যে সমস্ত জাতি মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে, তাহাদের মনোভাবের মধ্যে যাহা দোষণীয় আছে, তাহা অপসারিত করিয়া জগতে শান্তি স্থাপন করুক!" —ফ্রী প্রেস

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ৫ই ফাল্গুন, ১৩৩৮ : ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২]

এই সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও 'প্রবাসী' ও '*Modern Review*' পত্রিকায় এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়া নিরস্ত্রীকরণের ও শান্তির সপক্ষে দেশের জনমত সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। নিরস্ত্রীকরণের সম্মেলনের প্রথম দফা আলোচনার ব্যর্থতার বিবরণ দিয়া রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ইংল্যাণ্ড-আমেরিকা প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া 'প্রবাসী'তে লিখিলেন :

"সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীভবনের প্রস্তাব জেনিভার কন্‌ফারেন্সে হইয়াছিল। খ্রীস্টীয়

ধর্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত ইউরোপের অন্য সব দেশের লোক রুশিয়ার বলশেভিক-দের ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিক বলিয়া অবজ্ঞা করে, আপনাদের ধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রীস্টকে প্রিন্স অব পীস্ অর্থাৎ শান্তিরাজ বলিয়া অভিহিত করে। কিন্তু সকল জাতির নিরস্ত্রীভবনের এবং তদ্বারা সকলের যুদ্ধবল সমীকরণের প্রস্তাব খ্রীস্টীয় বলিয়া অভিহিত কোন জাতির প্রতিনিধির দ্বারা উপস্থাপিত হয় নাই—উপস্থাপিত হইয়াছিল ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিক বলিয়া অবজ্ঞাত সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতিনিধি লিটভিনফের দ্বারা। তিনি প্রস্তাব করেন, যে কনফারেন্সের কার্যের ভিত্তি সকল জাতির সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ নীতির উপর স্থাপিত হউক। তিনি তাঁহার প্রস্তাবের সপক্ষে যুক্তি দেখান তাহা এই, যে, যুদ্ধ হইতে নিরাপত্তা কেবলমাত্র অস্ত্রাদি যুদ্ধসজ্জা সম্পূর্ণ রহিত করিলে লব্ধ হইতে পারে, এবং সকল জাতি নিরাপদ হইতে পারে যদি সকলের নিরস্ত্র অবস্থার সাম্য জন্মে অর্থাৎ যদি সকলের যুদ্ধসজ্জা কমাইয়া শূন্যে পরিণত করা হয়। লিটভিনফ্ বক্তৃতা শেষ করিয়া বসিবার পর সভাপতি সকল প্রতিনিধির মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন—যেন কে অতঃপর কিছু বলিবেন তাহার প্রতীক্ষায়। তখন তুরস্কের (কোন খ্রীস্টীয় জাতি নহে) প্রতিনিধি টিউফিক্ দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'আমি এই প্রস্তাবের পক্ষে, যদি ইহার মানে সাম্য হয়।' তাহার পর পারস্যের প্রতিনিধি বলিলেন, 'এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে আমি সুখী হইব।' অতঃপর জার্মানীর প্রতিনিধি বলিলেন, 'আমার সহানুভূতি আছে।'…তারপর মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য বৈঠক দু-ঘণ্টা স্থগিত রহিল। আহারের পর সকলে ফিরিয়া আসিলে ভোট লওয়া হইল। কেবলমাত্র দুইজন প্রতিনিধি সকল জাতির নিরস্ত্রীভবনের মত দিলেন। তাঁহারা নিরীশ্বর (Godless) রুশিয়ার লিটভিনফ্ এবং 'অকথ্য তুর্ক' (The unspeakable Turk) প্রতিনিধি টিউফিক্।

"আমেরিকার 'ইউনিটি' কাগজের জেনেভাস্থ সংবাদদাতা বলেন, নিরস্ত্রীকরণ ব্যর্থ হওয়ার জন্য প্রধানত ইংরেজীভাষী আমেরিকা, বৃটেন এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা, কানাডা ও অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশ দায়ী। কারণ কনফারেন্সের দুটি জাতি, বৃহত্তম সাম্রাজ্য দুটি, শান্তির সপক্ষে খবরের কাগজ গির্জার উপদেশ ও বক্তৃতাদি দ্বারা প্রচারকার্য চালাইবার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা—এই সমস্তই ইংরেজীভাষী জাতিদের। কন্ফারেন্সের ব্যর্থতার জন্য দায়ী ইহাদের পর ফ্রান্স জাপান পোল্যান্ড প্রভৃতি। ইউনিটির সংবাদদাতা সিড্নী স্ট্রং নিজের দেশ আমেরিকাকে বাদ দেন নাই, দোষীদের সকলের নামের আগে আমেরিকার নাম বসাইয়াছেন।"

[প্রবাসী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯ : পৃঃ. ২৯২]

ইহার অল্পকাল পরই, রোমাঁ রোলাঁ, অ্যাঁরি বারবুস, আইনস্টাইন প্রমুখ ইউরোপের চিন্তানায়করা যুদ্ধের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিবার আবেদন জানাইয়া আমস্টার্ডামে এক মহা শান্তিসম্মেলন আহ্বান করেন। উল্লেখযোগ্য, এই সময় রোলাঁ যুদ্ধের সতর্কবাণী এবং উহার প্রতিরোধে সক্রিয়ভাবে আগাইয়া আসার জন্য পৃথিবীর সকল দেশের শান্তিকামী দল, গোষ্ঠী, সঙ্ঘ ও মানুষের কাছে অত্যন্ত আবেগময়ী ভাষায় এক আবেদন জানান (১লা জুন, ১৯৩২)। রোলাঁ ভারতবর্ষে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এই আবেদনটি বহুল প্রচারের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

রামানন্দ 'মডার্ন রিভিউ'য়ে এই সম্মেলনের গুরুত্ব বর্ণনা করিয়া রোলাঁর আবেদনটির ইংরেজী তর্জমা প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হইল :

"War is coming, coming from all the quarters. It menaces all nations. It may burst upon us tomorrow. If it sets on fire one corner of the world, it can no longer be localized. In a few weeks, perhaps days, it will devour up everything. It will be the nameless thing, the destroyer of the entire civilization. Civilization as a whole, the entire world, is in peril.

"We give the alarm. Awake ! We appeal to all nations, to all parties, to all men and to all women, who are right-minded. There is no question here of the interests of a particular nation, class or party. Everything is at stake. Deliverance can only come from the hands of all. Let everybody be up and doing. We must put a stop to the discussion which rend us. Let us all unite against the common enemy. Attack war ! Let us put a stop to it.

"We are inviting you to a great congress which will be a powerful demonstration of all parties against war. We are inviting all parties, from whatever point of the social horizon they may emanate, —Communists, Socialists, Syndicalists, Anarchists, republicans of all shades, free thinkers and Christians, men of no party, all associations of pacifists and war resisters, conscientious objectors, men in individual capacity, in France and as well as in other lands, who are determined to prevent war by every means···There is not a day to lose." [*Modern Review* : August, 1932 : P. 230]

তাছাড়া ১লা আগস্ট (১৯৩২) সারা বিশ্বব্যাপী 'আন্তর্জাতিক যুদ্ধ-বিরোধী দিবস' উদ্‌যাপনের আবেদন জানান হয়।

ভারতবর্ষে অবশ্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এই আবেদনে সাড়া দিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে কোন সিদ্ধান্ত বা কার্যসূচী গ্রহণ করা হয় নাই। এখানে উল্লেখযোগ্য, ভারতের তৎকালীন কমিউনিস্টদের উদ্যোগে আগুয়ান শ্রমিক শ্রেণীই এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। স্মরণ রাখা দরকার, তখনও মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা চলিতেছে ;— ভারতের অধিকাংশ কমিউনিস্ট কর্মী ও নেতা তখন এই মামলার বিচারাধীন আসামী। ১লা আগস্ট 'ওয়ার্কার্স পার্টি অব ইণ্ডিয়া'র উদ্যোগে মেটিয়াবরুজের কারবালা ময়দানে কলিকাতা মজুরদের সহস্রাধিক প্রতিনিধির এক জনসভায় 'আন্তর্জাতিক যুদ্ধ-বিরোধী দিবস' উদযাপিত করা হয়। ওয়ার্কার্স পার্টি অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক আবদুল হালিম সভাপতিত্ব করেন। সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ বিভিন্ন কমিউনিস্ট নেতা বক্তৃতা করিবার পর সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় :

"কলিকাতা মজুরদের এই সভা আজ আন্তর্জাতিক 'যুদ্ধ-বিরোধী দিবসে' পৃথিবীর সমস্ত মজুরের সহিত একতা জ্ঞাপন করিতেছে ও পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী ও ধনবাদীদের নূতন যুদ্ধায়োজনের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। এই সভার মতে যুদ্ধের ফলে শুধু ধনবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদেরই লাভ হয় এবং সেই জন্য একদেশের মজুররা অন্যদেশের মজুর ভাইদের হত্যা করিয়া কখনই ঘরের ধনবাদীদের সাহায্য করিবে না।" [আনন্দবাজার পত্রিকা : ১৯শে শ্রাবণ, ১৩৩৯ : ৪ঠা আগস্ট, ১৯৩২]

ভারতে সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে কলিকাতার শ্রমিক শ্রেণীর এই ভূমিকা নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ইহার প্রায় মাসখানেক পরে—আমস্টার্ডামে 'আন্তর্জাতিক যুদ্ধ-বিরোধী কংগ্রেস' অনুষ্ঠিত হয় (২৭-২৮শে আগস্ট, ১৯৩২)। প্রথমে সুইজারল্যাণ্ডে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু 'কমিউনিস্ট রাশিয়া' হইতে প্রতিনিধি আসিবার কথা শুনিয়া সুইস্ গভর্নমেন্ট এই সম্মেলনের অনুমতি দেন নাই। ফরাসী সরকারও এই একই কারণে অনুমতি দেন নাই। শেষ পর্যন্ত আমস্টার্ডামে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু হল্যাণ্ড বা ডাচ্ সরকার ম্যাক্সিম গোর্কী, কার্ল রাডেক এবং ছয়জন রাশিয়ান এবং তাছাড়াও আরো কিছু প্রতিনিধিকে হল্যাণ্ড প্রবেশের অনুমতি ভিসা দেন নাই। রোমাঁ রোলাঁও উদ্বোধনের দিন সম্মেলনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। শেষ পর্যন্ত আঁরি বারবুসের সভাপতিত্বে ২৭শে আগস্ট এই সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়। উদ্বোধনের সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত প্রায় দুই সহস্রাধিক প্রতিনিধি সমস্বরে 'আন্তর্জাতিক সংগীত' গাহিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, বিঠলভাই প্যাটেল ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। বিঠলভাই তখন ইউরোপেই ছিলেন। তিনি সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, এই কংগ্রেসে তাঁহার যোগদানের উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ হইতে মুক্ত করা। কারণ, যুদ্ধ-বিরোধী কংগ্রেসের ও ভারতীয় জনসাধারণের উদ্দেশ্য প্রায় একই এবং এই কংগ্রেস যে ইস্তাহার জারি করিয়াছেন তাহার অধিকাংশ মত ও প্রস্তাবই তিনি সমর্থন করেন'। (রয়টার)

যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলন সংগঠিত ও পরিচালনার জন্য এই কংগ্রেস হইতে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং তাহার প্রধান কেন্দ্র হয় প্যারিস।

[দ্র. আনন্দবাজার পত্রিকা : ১৫ই ভাদ্র, ১৩৩৯ : ৩১শে আগস্ট, ১৯৩২]

আমস্টার্ডাম শান্তি সম্মেলন সম্পর্কে রোলাঁ পরে অন্যত্র লিখিয়াছিলেন :

…"সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে তাহাদের সকলেরই ঐক্যকে একটা স্থায়ী রূপ দেওয়াই ছিল এই মহাসম্মেলনের লক্ষ্য। যুদ্ধ, ফ্যাসিজম ও প্রতিক্রিয়া অভিন্ন, কারণ সোশিয়ালিস্ট ও কমিউনিস্ট গঠনকার্যে একমাত্র প্রয়োজন শান্তির। বাঁচিবার জন্য, জয়ী হইবার জন্য এই শান্তি তাহার চাই-ই। সোবিয়েৎ ইউনিয়ন এ-কথা ভালো-ভাবেই প্রমাণ করিয়াছে।

"'বিমুগ্ধ আত্মার' এই পরিকল্পনাটিকে আমি 'যুদ্ধ-বিরোধী' সমস্ত দলের বিশ্বসম্মেলনের সম্মুখে পেশ করিলাম। ১৯৩২ সালের ২৭শে ও ২৮শে আগস্ট তারিখে আমস্টার্ডমে এই সম্মেলন হয়। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতাদের ও

সমাজতন্ত্রের জাতীয় দলগুলির গোপন ধ্বংসমূলক ষড়যন্ত্রসত্ত্বেও এই বিরাট সম্মেলনের কি বিপুল প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল তাহা আজ সুবিদিত। ...আমস্টার্ডম্ সম্মেলনের গৌরব বারবুসের নামের সহিত জড়িত। সমস্ত দেহ মন দিয়া তিনি ইহার সাফল্যের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সম্মেলনই প্রথম সুদৃঢ় কেন্দ্র যাহাকে ঘিরিয়া যুদ্ধ ও ফ্যাসিজম-বিরোধী শক্তিগুলির সুস্থ প্রভাব ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল।"
[শিল্পীর নবজন্ম : পৃঃ. ৮১-৮২]

রবীন্দ্রনাথ এই সম্মেলনে কোন বাণী দিয়াছিলেন কিনা আজও পর্যন্ত তাহা জানা যায় না। তবে এইটুকু জানা যায়, তিনি ইহা সমর্থন করিয়াছিলেন এবং সাংগঠনিক কমিটিতে তাঁহার নাম ছিল। কয়েক বৎসর পরে আঁরি বারবুসের মৃত্যুসংবাদ দিয়া রামানন্দ মডার্ন রিভিউ-তে যে আলোচনা করেন তাহাতে এই তথ্যটি জানা যায় না। স্মরণ রাখা দরকার, এই সময় নীতীন্দ্রের অসুস্থতার কারণে কবি অত্যন্ত বিপর্যস্ত ছিলেন এবং রোলাঁ সে-খবর জানিতেন। সম্ভবত কবির এই মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা করিয়াই রোলাঁ তাঁহাকে এসম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুরোধ বা পত্র দেন নাই। নীতীন্দ্রের মৃত্যুর পর রোলাঁ ভিলেনুভ থেকে রবীন্দ্রনাথকে সান্ত্বনা জানাইয়া একটি পত্র দেন (২৪শে আগস্ট, ১৯৩২),— আমস্টার্ডাম সম্মেলনের মাত্র তিনদিন পূর্বে। রোলাঁ সে-পত্রে ঐসব প্রসঙ্গে কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই ; তাহা একান্তই বন্ধুর সমবেদনাপত্র মাত্র [দ্র. *Rolland and Tagore* : Letter No. XIX]

এইসময় জেনিভাতে, 'The Save the Children International Union,' নামে একটি সঙ্ঘ বিশ্ব-শিশুরক্ষা আন্দোলনে তৎপর হইয়া উঠেন। এই সঙ্ঘের ব্রিটিশ সংস্থা 'The Save the Children Fund'-এর পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের নিকটে একটি বাণী প্রার্থনা করা হয়। কবি এই আন্দোলনে তাঁহার পূর্ণ আন্তরিক সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া যে-বাণীটি দেন, উহা এইসময় *'The World's Children'* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (সেপ্টেম্বর, ১৯৩২)। উহা নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত করা হইল :

"I am glad to identify myself with the objects of the Save the Children International Union, which seems to me to be the most vital and profoundly significant movement in modern Europe. The rich success that has already been achieved by this Union, in spite of partial response from the public, inadequate means, and inclement political circumstances, only confirms its unchallengable truth and urges us to join hands, fearlessly, with this movement for the protection of humanity."

"War and hostility, incipient and unashamed, still poison the atmosphere of the modern age—the age, externally, of unbridled greed, competition, and tribal hatred. The one promising sign, however, is the emergence in every country to-day of idealists who unswervingly

keep to their indwelling humanity and uphold the banner of fellowship and amity in the face of adversity and persecution

"The Save the Children International Union is to me a most precious manifestation of this idealism and it is a direct answer to the merciless spirit or organised militarism which wreaks havoc and ruin on the face of our fair earth.

"I appeal to all men of faith and love to respond to the noble idealism of this Union by offering all possible help to establish it on a permanent basis." [*The World's Children* : September, 1932]

এই ধরনের আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ বা সংস্থার—বিশেষত ইউরোপের বিবেকী বুদ্ধিজীবীদের 'পরে কবির প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল। এই কারণেই যুদ্ধ-বিরোধী এবং শান্তি আন্দোলনে যখনই তাঁহাদের পক্ষ থেকে কোন আহ্বান আসিয়াছে কবি তখনই তাহাতে সাড়া দিয়াছেন। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বা লীগ অব নেশনস্-এর উপর তাঁহার বিশেষ একটা আস্থা ছিল না, সত্য কথা; কিন্তু তবুও আনুষ্ঠানিকভাবে ইহাদের প্রতি শুভেচ্ছামূলক বাণী পাঠাইতে কবি দ্বিধা করেন নাই।

কালের যাত্রা

১৩৩৯ সালে ভাদ্রের শেষভাগে কবি 'কালের যাত্রা' নামে একটি গদ্য-নাটক রচনা করেন। প্রায় নয় বৎসর পূর্বে 'রথযাত্রা' নামে যে ক্ষুদ্র নাটকটি রচনা করেন উহাই এখন সম্পূর্ণ পরিমার্জন করিয়া গদ্যছন্দের আকারে 'রথের রশি' নাম দিয়া লিখিলেন। 'রথের রশি' ও 'কবির দীক্ষা' একত্রে 'কালের যাত্রা' গ্রন্থে ভাদ্রের শেষে প্রকাশিত হয়।

৩১শে ভাদ্র সর্বজনপ্রিয় সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৫৭-তম জন্মদিবস উপলক্ষে কবি 'কালের যাত্রা' গ্রন্থটি তাঁহাকে উৎসর্গ করেন। এই উপলক্ষে তিনি একটি পত্রে শরৎচন্দ্রকে লিখিলেন :

"তোমার জন্মদিন উপলক্ষে 'কালের যাত্রা'-নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি, আমার এ-দান তোমার অযোগ্য হয় নি। বিষয়টি এই—রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে, মহাকালের রথ অচল। মানব-সমাজের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি, কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধবন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল

তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে; তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।

"কালের রথযাত্রার বাধা দূরে করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক, এই আশীর্বাদ-সহ তোমার দীর্ঘজীবন কামনা করি।"

[রবীন্দ্র-রচনাবলী : ২২শ খণ্ড : পৃঃ. ৫১০]

কবির এই পত্রেই নাটকটির মর্মার্থ স্পষ্টই ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কালের যাত্রা রূপক ও প্রতীকধর্মী নাটক। 'কালের যাত্রা' ও 'রথের রশি'—এ দুটি নামকরণের মধ্যেই বিশেষ তাৎপর্যগত অর্থ আছে। 'মহাকালের রথ' যে মানব-সভ্যতার ইতিহাসের রথ, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। এই ইতিহাসের রথ আজ অনিবার্যভাবে সর্বহারা ও শ্রমিক-রাজত্বের দিকেই ধাবিত হইয়াছে, এই রূপকনাট্যে কবি তাহা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। আগামী যুগ যে সর্বহারা-শ্রমিক রাজত্বের যুগ,—বিশেষত সোভিয়েট রাশিয়া ও ইউরোপের গণ-আন্দোলন প্রত্যক্ষ করিয়া আসার পর কবি এ কথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলিবার জোর পাইলেন। বলা বাহুল্য 'কালের যাত্রা' নাটকটি দেশের ভাবীযুগের কর্ণধার—সেই নীচের তলার মানুষদের উদ্দেশেই লিখিত। এই কারণেই উহার পাত্র-পাত্রী, বিষয়বস্তু, উপকরণ, প্রতীক, আঙ্গিক, ভাব-ভাষা—সবই তাহাদের বুঝিবার উপযোগী করিয়া প্রচলিত যাত্রার ঢঙে লেখা। কিন্তু তবুও নাটকটির একটি সর্বজনীন আবেদন আছে।

এই নাটকে যে অচলায়তন ও গতিহীন সমাজব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে, বস্তুত তাহার দ্বারা আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রযন্ত্রকেই বুঝান হইয়াছে। নাটকে আধুনিক রাষ্ট্রতন্ত্রের বর্ণনা করিতে গিয়া একটি সৈনিকের মুখে কবি বলিয়াছেন,—"এ কালের রাজত্বে রাজা থাকেন সামনে, পিছনে থাকে বেনে। যাকে বলে অর্ধ-বেনে-রাজেশ্বর মূর্তি।" ব্রিটেনের Constitutional monarchy-র এত ভালো বর্ণনা বুঝি আর হয় না।

মন্ত্রীর মুখে কবি যে-যুগান্তকারী বিপ্লবের বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও লক্ষ্য করিবার মত। মন্ত্রী বলেন,—"নীচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়, বরাবর যা প্রচ্ছন্ন তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তর।" এই যুগান্তকারী বিপ্লবের ডাক আজ পৃথিবীর দেশে দেশে শোষিত জনগণের কাছে পৌঁছিয়াছে। এই বিপ্লবের দলপতির মুখে কবি বলিলেন :

"আমরা এলেম বাবার রথ চালাতে।
এতদিন আমরা পড়তেম রথের চাকার তলায়,
দ'লে গিয়ে ধুলোয় যেতুম চ্যাপটা হয়ে।...
এবার তিনি ডাক দিয়েছেন তাঁর রশি ধরতে।"

পুরোহিত জিজ্ঞাসা করে, 'জানলে কী করে'। জবাবে দলপতি বললে :

"কেমন করে জানা গেল সে তো কেউ জানে না।
ভোরবেলায় উঠেই সবাই বললে সবাইকে,
ডাক দিয়েছেন বাবা। কথাটা ছড়িয়ে গেল পাড়ায় পাড়ায়,

পেরিয়ে গেল মাঠ, পেরিয়ে গেল নদী,
পাহাড় ডিঙিয়ে গেল খবর,
ডাক দিয়েছেন বাবা।"

দলপতি দৃঢ়কণ্ঠে আরও বলে :

"আমরাই তো জোগাই অন্ন, তাই তোমরা বাঁচ—
আমরাই বুনি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জারক্ষা।"

[ঐ : পৃঃ. ১৩৫-৩৭]

লক্ষ্য করিবার বিষয়, এখানে কবি নিরক্ষর জনগণকে অসহায় অকারী বা Passive ভূমিকায় দেখান নাই; শোষিত জনগণকে তিনি এখানে সম্পূর্ণ সচেতন, সক্রিয় ও বলিষ্ঠ সংগ্রামী নেতৃত্বের ভূমিকায় দাঁড় করাইয়াছেন। কবির আর কোনো নাটকেই শোষিত জনগণকে এতখানি সচেতন ও সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায় না।

সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণের পর কবি সেখানকার গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেও সেখানকার শ্রমিক একনায়কত্ব ও 'অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ-নীতি'কে তিনি ঠিক আন্তরিকভাবে সমর্থন করিতে পারেন নাই। এই কারণেই এখানে তিনি শ্রমিক রাজত্ব সমর্থন করিলেও তাহাদের অন্ধ শ্রেণী-স্বার্থসচেতনতা সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করিয়া দিতে চাহিলেন।

"পুরোহিত— তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান—
ওরাই কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে।

কবি— পারবে না হয়তো।
একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই।
দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে—
জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের।
তখন এঁরাই হবেন বলরামের চেলা—
হলধরের মাতলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।"

পুরোহিত আরও জিজ্ঞাসা করে কবিকে—'রথ তারা চালাবে কিসের জোরে'। জবাব দেয় কবি—

"গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে।
আমরা মানি ছন্দ, জানি একঝোঁকা হলেই তাল কাটে।
মরে মানুষ সেই অসুন্দরের হাতে
চালচলন যার একপাশে বাঁকা;
কুম্ভকর্ণের মতো গড়ন যার বেমানান,
যার ভোজন কুৎসিত,
যার ওজন অপরিমিত।
আমরা মানি সুন্দরকে। তোমরা মানো কঠোরকে—
অস্ত্রের কঠোরকে, শাস্ত্রের কঠোরকে।
বাইরে ঠেলা-মারার উপর বিশ্বাস,
অন্তরের তালমানের উপর নয়।"

এখানে আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কোনো বক্তৃতায় বা রাজনীতিক প্রবন্ধে রাষ্ট্রনৈতিক বিদ্রোহ-বিপ্লবকে সুস্পষ্ট সমর্থন জানাইতে পারেন নাই। অথচ তাঁহার কিছু কবিতা ও নাটকে এই বিপ্লবের সুস্পষ্ট সমর্থন পাওয়া যায় ;—'কালের যাত্রা'তেও করিলেন। সৈনিক যখন কবিকে বিপ্লবের আগুনের ভয় দেখায় তখন কবি বলেন,

"যুগাবসানে লাগেই তো আগুন।
যা ছাই হবার তাই ছাই হয়,
যা টিঁকে যায় তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নবযুগের।

সৈনিক—তুমি কী করবে কবি।

কবি—আমি তাল রেখে রেখে গান গাব।

সৈনিক—কী হবে তার ফল ?

কবি—যারা টানছে রথ, তারা পা ফেলবে তালে তালে।
পা যখন হয় বেতালা
তখন ক্ষুদে ক্ষুদে খালখন্দগুলো মারমূর্তি ধরে।
মাতালের কাছে রাজপথও হয়ে ওঠে বন্ধুর।"

এখানে তিনি সর্বহারা বিপ্লবকে শুধু সমর্থন করিলেন না, (অবশ্য মার্কসবাদী অর্থে নয়)—এই বিপ্লবে কবি ও শিল্পীদের যে বিশেষ সক্রিয় ও উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত তিনি তাহারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন।

মানুষে মানুষে যে মানবিক সম্পর্ক—তাহাকেই আন্তরিকভাবে গ্রহণ ও রক্ষা করিবার আহ্বান জানাইয়া উপসংহারে তিনি কবির মুখে বলিলেন,

"এই বেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন—
রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলো না ;
রাস্তাটাকে ভক্তিরসে দিয়ো না কাদা করে।
আজকের মতো বলো সবাই মিলে—
যারা এতদিন মরে ছিল তারা উঠুক বেঁচে,
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে, তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।"

[ঐ : পৃঃ ১৪২-৪৫]

প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই নাটকের রূপক, প্রতীক নির্বাচনে ও সংলাপে কেমন যেন একটা 'সেকেলে' ভাব আছে। কিন্তু 'এহ বাহ্য'। সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে, কবি আজিকার যুগের প্রধান নায়ক, সেই শ্রমিক ও নির্যাতিত শ্রেণীর হাতেই 'মহাকালের রথে'র রশি তুলিয়া দিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও পুণা-চুক্তি

১৯৩২ সালের মধ্যভাগে আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রাবল্য কিছুটা হ্রাস পাইলেও তখনও দেশের বিভিন্ন স্থানে কোন-না-কোন ভাবে আন্দোলন চলিতে থাকে। অবশ্য বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই পরন্তু এই সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পরপর আরও কয়েকটি রাজনীতিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। এমন সময় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটনাস্রোত ও আন্দোলনের মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়া যায়।

১৭ই আগস্ট (১৯৩২) র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা'র (Communal Award) খসড়া বিলটি প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য, ম্যাকডোনাল্ডের এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা মিঃ জিন্নার চৌদ্দ-দফা শর্তাবলীকে প্রায় পুরাপুরি অবলম্বন করিয়াই রচিত হয়। অবশ্য এই পরিকল্পনার পরিধি প্রধানত প্রাদেশিক আইনসভা সমূহের নির্বাচক অধিকার ও প্রতিনিধি প্রেরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ম্যাকডোনাল্ডের এই সিদ্ধান্তের ফলে মুসলমান, ইউরোপীয় ও শিখ সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র বা পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার দেওয়া হয়। মারাঠীদের জন্যও বোম্বাই প্রদেশে সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্রে কিছু আসন সংরক্ষিত করা হয়। কিন্তু সব চেয়ে মারাত্মক কূটকৌশল প্রয়োগ করা হয় হিন্দুসমাজের অনুন্নত শ্রেণীগুলির ব্যাপারে। এই ঘোষণাবলে হিন্দুসমাজের নির্যাতিত ও অনুন্নত শ্রেণীগুলিকে একটি স্বতন্ত্র সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসাবে গণ্য করা হয় এবং স্বতন্ত্র নির্বাচনের ভিত্তিতে তাহাদের জন্য কিছু আসন নির্ধারিত করা হয়। তাছাড়াও সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীতেও তাহাদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়। খৃস্টান ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া শ্রমিক ও মহিলাদের জন্য কিছু আসন এবং শিল্প-ব্যবসায়, খনি, চা-কর ও জমিদার প্রভৃতি শ্রেণীর জন্যও স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর ভিত্তিতে কিছু আসন সংরক্ষিত হয়।

গান্ধীজী ঠিক এই আশঙ্কা করিয়াই প্রায় পাঁচ মাস পূর্বে স্যামুয়েল হোরকে এক পত্রে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে, অনুন্নত হিন্দুদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা করা হইলে তিনি আমরণ অনশনব্রত গ্রহণ করিবেন। ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রকাশিত হওয়ার পরদিনই (১৮ই আগস্ট) গান্ধীজী যারবেদা কারাগার হইতে প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ডকে এক পত্রে তাঁহার পূর্ব সিদ্ধান্তের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া লিখিলেন যে, তাঁহার ঐ দাবী মানিয়া না লইলে তিনি আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর হইতে আমরণ অনশন ('a perpetual fast unto death') শুরু করিবেন। তিনি লিখিলেন :

"I have read the British Government's decision on the representation of minorities and have slept over it. In pursuance of my letter

to Sir Samuel Hoare and my declaration at the meeting of the Minorities Committee of the Round Table Conference on the 13th November, 1931, at St. James's Palace, I have to resist your decision with my life. The only way I can do so is by declaring a perpetual fast unto death from food of any kind save water with or without salt and soda. This fast will cease if, during its progress, the British Government of its own motion or under pressure of the public opinion, revise their decision and withdraw their scheme of communal electorates for the Depressed Classes, whose representatives should be elected by the general electorate under the common franchise no matter how wide it is.

"The fast will come into operation in the ordinary course from the noon of 20th September next, unless the said decision is meanwhile revised in the manner suggested above."

[*Mahatma* : Vol. III : P. 161]

গান্ধীজী তাঁহার এই পত্র তাড়াতাড়ি প্রকাশ করিবারও অনুরোধ জানাইলেন। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়, অনুন্নত হিন্দুদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের বিষয়টি ছাড়া গান্ধীজী সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার আর কোন বিষয়ের সমালোচনা বা বিরোধিতা করিলেন না।

এদিকে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রায় সর্বত্রই দারুণ বিক্ষোভ ও আলোড়ন পড়িয়া যায়। ১৮ই আগস্ট এলাহাবাদ হইতে স্যার চিন্তামণি (C. Y. Chintamani) সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত জানিতে চাহিয়া তার করিলেন :

"সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আপনার মতামত সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ জানাইলে বাধিত হইব।"

১৯শে আগস্ট কবি শান্তিনিকেতন থেকে উহার জবাবে লিখিলেন :

"অবস্থা যেরূপ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আমাদের শাসকবর্গের সুদৃঢ় মনোভাব এবং আমাদের নৈরাশ্যজনক দৈন্যের কথা জানিয়া কোনরূপ অভিযোগ উপস্থিত করিতেও আমি ঘৃণা বোধ করি। পরিমাণের কথা চিন্তা না করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে যাহারা আমাদের দেশের অধিবাসীদের মধ্যে ভেদ-বৈষম্য চিরস্থায়ী করিতে চায়, তাহাদের নিকট আমরা ন্যায্য ব্যবহারও আশা করিতে পারি না। কিন্তু ঐরূপ বৈষম্য তো তাহাদের পক্ষেও কল্যাণকর হইতে পারে না।

"আমাদের কোন প্রকার যুক্তিতর্কই যখন কার্যকরী হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন ব্যক্তিগতভাবে আমি নীরব থাকাই সঙ্গত মনে করি। তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপনে আপনার বিশ্বাস আছে বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু আমার সে বিশ্বাস নাই। আমার ধারণা এই যে, উপায় অবলম্বনের যেটুকু স্বাধীনতা আমাদের এখনও আছে, তদনুসারে বর্তমান

পরিস্থিতির যথাশক্তি সদ্ব্যবহার করাই আমাদের সম্প্রদায়ের কর্তব্য। রাজনীতি ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ নেতৃবৃন্দই এখন সেই উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন, যাহা দ্বারা বিভিন্ন সম্প্রদায় সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিশেষ সুবিধা ও বৈষম্যমূলক ভেদনীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে। আমি মনে করি, বর্তমানের এই ভেদনীতি মানবতার সাধারণ ভিত্তিভূমিকে সমূলে বিনষ্ট করিবে।"—ফ্রী প্রেস

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ৬ই ভাদ্র, ১৩৩৯ : ২২শে আগস্ট, ১৯৩২]

ইহার কয়েকদিন পরে, 'ফ্রী প্রেসের' প্রতিনিধির অনুরোধে কবি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আরও একটি বাণী দেন (শান্তিনিকেতন, ২৫শে আগস্ট)। উহার মর্মার্থ ছিল এই :

"আর একবার আমি গভর্নমেণ্ট কর্তৃক ঘোষিত সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমাদের কিরূপ মনোভাব হওয়া উচিত, তাহা বিবৃত করিতে চাই। ধীরভাবে বিবেচনা করিলে আমাদের বুঝা উচিত, প্রকৃত সমস্যাগুলি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিবার আর একটি উপলক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। এই নির্ধারণ আমাদের দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষভাব জাগ্রত করিয়া আসন্ন শাসন-সংস্কার হইতে আমাদের মনোযোগ অন্যদিকে সরাইয়া লইবে।

"এই অবস্থায় দেশবাসীর প্রতি আমার উপদেশ এই যে, প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করিয়া সম্মিলিতভাবে নূতন ব্যবস্থাগুলি বিবেচনা করিবার নিমিত্ত তাহাদের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করা উচিত। সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা করার ভার আমাদের হাতেই রহিয়াছে। অযৌক্তিক সাম্প্রদায়িক ভেদবাদ ও শ্রেণী বৈষম্যের বিরুদ্ধে অধুনা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে নূতন বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেদের মধ্যে একটা নিষ্পত্তি করিয়া লওয়াই আমাদের কর্তব্য; এতদ্দ্বারা আমাদের জাতীয় আত্ম-বিকাশের পথের অন্যতম প্রধান বিঘ্ন দূর হইবে। ভাববিলাসে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া আমাদের উচিত নহে। নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ এবং ভাবী পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হইয়া অদূর-ভবিষ্যতে যে সকল বিষয় আমাদের নিকট উপস্থিত করা হইবে, তাহার সম্মুখীন হওয়া আবশ্যক।"—ফ্রী প্রেস

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ১০ই ভাদ্র, ১৩৩৯ : ২৬শে আগস্ট, ১৯৩২]

লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই বিবৃতিতে কবি সামগ্রিকভাবেই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পশ্চাতে ব্রিটিশ দুরভিসন্ধির সমালোচনা করিলেন। অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন-প্রথা ও আসন সংরক্ষণ যে তিনি সমর্থন করিলেন না তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। ইহার দ্বারা দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ বিদ্বেষ জাগাইয়া তোলাই যে ব্রিটিশের সুপরিকল্পিত দুরভিসন্ধি মাত্র, এটা বুঝিতে কবির অসুবিধা হয় নাই।

এদিকে গান্ধীজী কারাগারে প্রধানমন্ত্রীর জবাবের আশায় আশায় দিন কাটান। দীর্ঘ তিন সপ্তাহ পরে—৮ই সেপ্টেম্বর, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গান্ধীজীর পত্রের জবাব দেন। উহাতে তাঁহাকে পরিষ্কার জানাইয়া দেওয়া হয় যে, গভর্নমেণ্টের সিদ্ধান্ত এখন আর পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। ৯ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজী পুনরায় তাঁহার

বক্তব্য ব্যাখ্যা করিয়া প্রধানমন্ত্রীকে এক পত্র দেন। কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হয়। দেশের লোক কিন্তু ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারে নাই। গান্ধীজী তাঁহার পত্রগুলি প্রকাশের জন্য বার বার অনুরোধ জানান। অবশেষে ১২ই সেপ্টেম্বর, সিমলা থেকে গান্ধী-হোর-ম্যাকডোনাল্ড পত্রবিনিময় প্রকাশ করা হয়।

সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে এক দারুণ চাঞ্চল্য ও আলোড়ন উপস্থিত হয়। গান্ধীজীর জীবন রক্ষা করিতেই হইবে,—সকলের মুখে এই কথা। সমগ্র হিন্দুসমাজের এক সম্মেলন আহ্বান করার কথা হয়। তফশীল সম্প্রদায়ের নেতা এম. সি. রাজা ১৩ই সেপ্টেম্বর এক প্রকাশ্য বিবৃতিতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার তীব্র নিন্দাবাদ ও প্রতিবাদ জানাইলেন। স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু অবিলম্বে গান্ধীজী মুক্তির দাবী করিলেন। এলাহাবাদ, কলিকাতা, দিল্লী প্রভৃতি দেশের বড় বড় শহর ও নগরে অনুন্নত হিন্দুদের জন্য দেবমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করা শুরু হয়। ১৯শে সেপ্টেম্বর দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা ও মিছিল করিয়া অনুন্নত হিন্দুদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন-প্রথা প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়। ঐদিনই পণ্ডিত মালব্যের নেতৃত্বে বোম্বাইয়ে প্রায় শতাধিক নেতৃস্থানীয় হিন্দু নেতার এক সম্মেলন হয়। সপ্রু, জয়াকর, রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, এম. সি. রাজা, আম্বেদকর, আণে ও ডাঃ মুঞ্জে প্রমুখ নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে দুইটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, প্রথমত, যে করিয়াই হউক গান্ধীজীর জীবন রক্ষা করিতে হইবে, দ্বিতীয়ত, অবিলম্বে অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক দূর করিতেই হইবে।

এদিকে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর আমরণ অনশনপণের সংবাদে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। ১৯শে সেপ্টেম্বর গান্ধীজীর মহান সঙ্কল্পের সাফল্য ও শুভেচ্ছা কামনা করিয়া তিনি নিম্নলিখিত তারবার্তাটি পাঠান :

"It is worth sacrificing precious life for the sake of India's unity and her social integrity. Though we cannot anticipate what effect it may have upon our rulers, who may not understand its immense importance for our people, we feel certain that the supreme appeal of such a self-offering to the conscience of our own countrymen will not be in vain. I fervently hope that we will not callously allow such a national tragedy to reach its extreme length. Our sorrowing hearts will follow your sublime penance with reverences and love."

কিন্তু কবির এই তারাবার্তা যথাসময়ে গান্ধীজীর হাতে পৌঁছায় নাই। ২০শে সেপ্টেম্বর, অতি প্রত্যুষে, তাঁহার ঐতিহাসিক অনশনব্রত শুরু করিবার পূর্বেই গান্ধীজী কবির আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত তারবার্তাটি পাঠান :

"This is early morning, three o'clock of Tuesday. I enter the fiery gate at noon. If you can bless the effort, I want it. You have been to me a true friend, because you have been a candid friend,

often speaking your thoughts aloud. If your heart approves of the action, I want your blessing. It will sustain me. I hope I have made myself clear. My love".

মধ্যাহ্নে ১২টার পর গান্ধীজীর অনশন শুরু হয় এবং উহার কিছুক্ষণ পরই তিনি কবির তারবার্তাটি পান। ঐদিনই অপরাহ্ণ তিনটা নাগাদ উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া তিনি পুনরায় কবিকে এই তারবার্তাটি পাঠান :

"Gurudev, Santiniketan, I have always experienced God's mercy. Very early this morning I wrote seeking your blessing if you could approve of my action. And behold, I have it in abundance in your message just received. Thank you. Gandhi."

গান্ধীজীর অনশন উপলক্ষে ২০শে সেপ্টেম্বর দিবসটিতে সারা দেশব্যাপী অনশন ও প্রার্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। শান্তিনিকেতনেও ঐদিন অনশন ও প্রার্থনা সভা হয়। মন্দিরে এই প্রার্থনা সভায় কবি স্বয়ং এই অনশন দিবস উদ্‌যাপনের তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করিয়া এক দীর্ঘ ভাষণ দেন। এই ভাষণের শুরুতেই কবি বলেন :

"সূর্যের পূর্ণগ্রাসের লগ্নে অন্ধকার যেমন ক্রমে ক্রমে দিনকে আচ্ছন্ন করে তেমনি আজ মৃত্যুর ছায়া সমস্ত দেশকে আবৃত করছে। এমন সর্বদেশব্যাপী উৎকণ্ঠা ভারতের ইতিহাসে ঘটে নি, পরম শোকে এই আমাদের মহৎ-সান্ত্বনা। দেশের আপামর সাধারণকে আজকের দিনের বেদনা স্পর্শ করেছে। যিনি সুদীর্ঘকাল দুঃখের তপস্যার মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশকে যথার্থ ভাবে, গভীর ভাবে, আপন করে নিয়েছেন, সেই মহাত্মা আজ আমাদের সকলের হয়ে মৃত্যুব্রত গ্রহণ করলেন।"

কবি স্পষ্টই অনুভব করেন, গান্ধীজীর প্রতি অন্ধ অনুরক্তি ও আবেগের বশেই যেন দেশের বেশির ভাগ লোক আজ এই অনশন দিবস উদ্‌যাপন করিতেছেন। বস্তুত গান্ধীজীর এই অনশনের আসল উদ্দেশ্য ও তাহার গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যটি কম লোকই অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন। এবং এই কারণেই গান্ধীজীর অনশন ও সংগ্রামের মূল তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলিলেন :

…"আজ দেশনেতারা স্থির করেছেন যে দেশের লোকেরা উপবাস করবে। আমি বলি, এতে দোষ নেই, কিন্তু ভয় হয় : মহাত্মাজি যে প্রাণপণ মূল্যের বিনিময়ে সত্যকে লাভ করবার চেষ্টা করছেন তার তুলনায় আমাদের কৃত্য নিতান্ত লঘু এবং বাহ্যিক হয়ে পাছে লজ্জা বাড়িয়ে তোলে। হৃদয়ের আবেগকে কোনো একটা অস্থায়ী দিনের সামান্য দুঃখের লক্ষণে ক্ষীণ রেখায় চিহ্নিত করে কর্তব্য মিটিয়ে দেবার মতো দুর্ঘটনা যেন না ঘটে।

"আমরা উপবাসের অনুষ্ঠান করব, কেননা মহাত্মাজি উপবাস করতে বসেছেন —এ দুটোকে কোনো অংশেই যেন একত্রে তুলনা করবার মূঢ়তা কারও মনে না আসে। এ দুটো একেবারেই এক জিনিস নয়। তাঁর উপবাস, সে তো অনুষ্ঠান নয়, সে একটি বাণী, চরম ভাষার বাণী।…

"আজ তিনি কী বলেছেন সেটা চিন্তা করে দেখো। পৃথিবীময় মানব-ইতিহাসের আরম্ভকাল থেকে দেখি এক দল মানুষ আর এক দলকে নীচে ফেলে তার উপর দাঁড়িয়ে নিজের উন্নতি প্রচার করে। আপন দলের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে অন্য দলের দাসত্বের উপরে। মানুষ দীর্ঘ কাল ধরে এই কাজ করে এসেছে। কিন্তু তবু বলব এটা অমানুষিক। তাই দাসনির্ভরতার ভিত্তির উপরে মানুষের ঐশ্বর্য স্থায়ী হতে পারে না। এতে কেবল যে দাসদের দুর্গতি হয় তা নয়, প্রভুদেরও এতে বিনাশ ঘটায়। যাদের আমরা অপমানিত করে পায়ের তলায় ফেলি তারাই আমাদের সম্মুখপথে পদক্ষেপের বাধা। তারা গুরুভারে আমাদের নীচের দিকে টেনে রাখে। যাদের আমরা হীন করি তারা ক্রমশই আমাদের হেয় করে। মানুষ-খেগো সভ্যতা রোগে জীর্ণ হবে, মরবে। মানুষের দেবতার এই বিধান। ভারতবর্ষে মানুষোচিত সম্মান থেকে যাদের আমরা বঞ্চিত করেছি তাদের অগৌরবে আমরা সমস্ত ভারতবর্ষের অগৌরব ঘটিয়েছি।

"আজ ভারতে কত সহস্র লোক কারাগারে রুদ্ধ, বন্দী।…তেমনি আমরাও অসম্মানের বেড়ার মধ্যে বন্দী করে রেখেছি সমাজের বৃহৎ এক দলকে। তাদের হীনতার ভার বহন করে আমরা এগোতে পারছি নে। বন্দীদশা শুধু তো কারাপ্রাচীরের মধ্যে নয়। মানুষের অধিকার-সংক্ষেপ করাই তো বন্ধন।… ভারতবর্ষে সেই সামাজিক কারাগারকে আমরা খণ্ডে খণ্ডে বড়ো করেছি।…

…"আজ ভারতে মুক্তিসাধনার তাপস যাঁরা তাঁদের সাধনা বাধা পেল তাদেরই কাছ থেকে যাদের আমরা অকিঞ্চিৎকর করে রেখেছি। যারা ছোটো হয়ে ছিল তারাই আজ বড়োকে করেছে অকৃতার্থ। তুচ্ছ বলে যাদের আমরা মেরেছি তারাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মার মারছে।"

এই প্রসঙ্গে তিনি ইউরোপের শ্রেণী-সংঘর্ষের তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন :

"যেখানেই এক দলের অসম্মানের উপর আর-এক দলের সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় সেইখানেই ভারসামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে বিপদ ঘটে। এর থেকেই বোঝা যায়, সাম্যই মানুষের মূলগত ধর্ম। য়ুরোপে এক রাষ্ট্রজাতির মধ্যে অন্য ভেদ যদি বা না থাকে, শ্রেণীভেদ আছে। শ্রেণীভেদে সম্মান ও সম্পদের পরিবেশন সমান হয় না। সেখানে তাই ধনিকের সঙ্গে কর্মিকের অবস্থা যতই অসমান হয়ে উঠছে ততই সমাজ টলমল করছে। এই অসাম্যের ভারে সেখানকার সমাজব্যবস্থা প্রত্যহই পীড়িত হচ্ছে। যদি সহজে সাম্য স্থাপন হয় তবেই রক্ষা, নইলে নিষ্কৃতি নেই। মানুষ যেখানেই মানুষকে পীড়িত করবে সেখানেই তার সমগ্র মনুষ্যত্ব আহত হবেই; সেই আঘাত মৃত্যুর দিকেই নিয়ে যায়।"

তিনি আরো বলিলেন :

"সমাজের মধ্যেকার এই অসাম্য, এই অসম্মানের দিকে, মহাত্মাজি অনেক দিন থেকে আমাদের লক্ষ নির্দেশ করেছেন। তবুও তেমন একান্ত চেষ্টায় এই দিকে আমাদের সংস্কারকার্য প্রবর্তিত হয় নি।…সেই প্রশ্রয়প্রাপ্ত পাপের বিরুদ্ধে আজ মহাত্মা চরম যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই রণক্ষেত্রে তাঁর দেহের অবসান ঘটতেও পারে। কিন্তু সেই লড়াইয়ের ভার তিনি আমাদের প্রত্যেককে

দান করে যাবেন।…এত বড়ো-আহ্বানের পরেও যারা একদিন উপবাস ক'রে তার পর দিন হতে উদাসীন থাকবে, তারা দুঃখ থেকে যাবে দুঃখে, দুর্ভিক্ষ থেকে দুর্ভিক্ষে। সামান্য কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা সত্যসাধনার অবমাননা যেন না করি।'

[৪ঠা আশ্বিন : মহাত্মা গান্ধী : পৃঃ. ৩৬-৪২]

গান্ধীজীও জনতার এই সাময়িক আবেগ-উচ্ছ্বাস সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাই ঐদিনই অপরাহ্নে তাঁহার অনশনশয্যা হইতে সাংবাদিকদের নিকট এক বিবৃতিতে তিনি পরিষ্কার তাঁহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন :

"What I want, and what I am living for, and what I should delight in dying for, is the eradication of untouchability root and branch. I want, therefore, a living pact whose life-giving effect should be felt not in the distant tomorrow but today, and therefore, that pact should be sealed by an all-India demonstration of the 'touchables' and 'untouchables' meeting together, not by way of a theatrical show, but in real brotherly embrace …Therefore, for me the abolition of separate electorates would be but the beginning of the end, and I would warn all those leaders assembled at Bombay and others against coming to any hasty decision.

তিনি তাঁহার অনশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া আরও বলিলেন :

…"My fast I want to throw in the scales of justice and if it wakes up the Caste Hindus from their slumber, and if they are roused to a sense of duty, it will have served its purpose. Whereas, if out of blind affection for me, they would somehow or other come to a rough and ready agreement so as to secure the abrogation and then go off to sleep, they will commit a grievous blunder and will have made my life a misery. For, while the abrogation of the separate electorates would result in my breaking the fast, it would be a living death for me if the vital pact for which I am striving is not arrived at."…

[*Mahatma* : Vol. III : P. 168]

এই দুটি ভাষণের মধ্যে 'অস্পৃশ্য ও অনুন্নত'দের সমস্যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর সাদৃশ্যটি লক্ষ্য করিবার মত ; অবশ্য তাহাদের পার্থক্যটিও কম লক্ষণীয় নয়। হিন্দুসমাজের এবং রাজনীতিক স্বার্থের দিক হইতে চিন্তা করিয়াই গান্ধীজী প্রথমে অনুন্নত হিন্দুদের জন্য স্বতন্ত্র-নির্বাচনপ্রথা প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়াছিলেন কিন্তু এখন উহাও তাঁহার কাছে গৌণ বিষয়। অনশনের পূর্বমুহূর্তে তিনি তাঁহার ধর্মবিশ্বাস ও মানবপ্রেমের দিক হইতেই অস্পৃশ্যতার চিরতরে অবসান ঘটাইবার দাবী জানাইলেন। বলা বাহুল্য, গান্ধীজীর এই আন্দোলন মূলত ধর্মসংস্কার ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে রূপ নেয়। কিন্তু

রবীন্দ্রনাথ নির্যাতিতদের সমস্যাটিকে শোষক ও শোষিতদের অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রামের দিক হইতেই বিচার করিতেছিলেন, তাঁহার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী হইতে।

স্মরণ রাখা দরকার, ইহার মাত্র ৪।৫ দিন পূর্বে তিনি 'কালের যাত্রা' নাটকটি রচনা সম্পূর্ণ করেন। নির্যাতিত হিন্দুদের সমস্যায় রবীন্দ্রনাথ ধর্মীয় ও সামাজিক অস্পৃশ্যতার সাথে আর্থনীতিক ও রাজনীতিক নিপীড়নগুলিও একসাথে যুক্ত করিয়া দেখিতেন। এমনকি 'হরিজন' এবং 'অস্পৃশ্য' ও 'অস্পৃশ্যতা' শব্দ দুটি গান্ধীজী যেমন পুনঃপুন ব্যবহার করিতেন রবীন্দ্রনাথ পারতপক্ষে তাহা করিতে চাহিতেন না। যাহাই হোক, এই আলোচনায় আমরা পরে আসিব।

পরদিন শান্তিনিকেতনে পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের লোকেদের একটি সভায় কবি গান্ধীজীর মহান ব্রত ও সংগ্রামের কথাটি খুব সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। [দ্র. মহাত্মাজির পুণ্যব্রত : মহাত্মা গান্ধী : পৃঃ. ৮৫-৫৩]

পরদিন,—২২শে সেপ্টেম্বর, কবি শান্তিনিকেতন হইতে এসোসিয়েটেড্ প্রেসের মারফত অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য দেশবাসীর উদ্দেশে এক আবেদন জানান। এই আবেদনে তিনি বলেন :

"I appeal to my countrymen that they must not delay a moment effectively to prove that they are in earnest to eradicate from their neighbourhood untouchability in all its ramifications. The movement should be universal and immediate, its expressions clear and indubitable. All manner of humiliation and disabilities from which any class in India suffers should be removed by heroic efforts and self-sacrific. Whoever of us fails in this time of grave crisis to try his utmost to avert the calamity facing India would be held responsible for one of the saddest tragedies that could happen to us and to the world," [*Liberty* : 24th September, 1932]

২১শে সেপ্টেম্বর প্রাতে সপ্রু, জয়াকর, রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, দেবদাস গান্ধী, জি. ডি. বিড়লা প্রমুখ নেতারা যারবেদা জেলে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপস-আলোচনা শুরু করেন। ডাঃ আম্বেদকর ও এম. সি. রাজা প্রমুখ অনুন্নত শ্রেণীর নেতারাও ইহাতে যোগ দেন। দীর্ঘ চারদিন আলাপ-আলোচনার পর একটি আপস-চুক্তি রচিত হয়। ইহাই ঐতিহাসিক 'পুণা-চুক্তি' (Poona Pact) নামে খ্যাত হয়। ইহার ফলে অনুন্নত হিন্দুদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী পরিত্যক্ত হয় এবং সমগ্র হিন্দুসম্প্রদায়ের জন্য যুক্তনির্বাচন-প্রথার ব্যবস্থা হয়। অবশ্য ইহার ফলে অনুন্নত বা তফশীল শ্রেণীগুলির জন্য বহু আসন ছাড়িয়ে দিতে হয়। ম্যাক্‌ডোনাল্ডের মূল প্রস্তাবে প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে তফশীল সম্প্রদায়ের জন্য ৭১টি আসন নির্দিষ্ট করা হয় ; পুণা-চুক্তির ফলে এখন তাহারা সেখানে ১৪৮টি আসন লাভ করিল। আর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায়ও সাধারণ আসন হইতে তাহাদের জন্য শতকরা ১৮ ভাগ আসন নির্দিষ্ট করা হইল। ২৫শে সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ে পণ্ডিত মালব্যের সভাপতিত্বে হিন্দু নেতাদের সম্মেলনে পুণা-চুক্তি

অনুমোদিত হয়। অনুরূপভাবে অনুন্নত শ্রেণীর নেতারাও উহা অনুমোদন করিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে বিলেতে প্রধানমন্ত্রীর নিকট এক জরুরী তারাবার্তায় পুণা-চুক্তি অনুমোদন করার জন্য অনুরোধ জানান হয়। কেননা ম্যাক্‌ডোনাল্ডের খসড়া বিলে বলা হইয়াছিল যে হিন্দুসম্প্রদায়ের বিভিন্ন শ্রেণীর নেতারা যদি আপসে কোন ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন তাহা হইলে গভর্নমেন্ট তাহা অনুমোদন করিবার কথা বিবেচনা করিবেন।

এদিকে অনশনের তৃতীয় দিন হইতেই গান্ধীজীর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটিতে থাকে। এই সংবাদে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও আশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তাছাড়া এই জটিল রাজনীতিক পরিস্থিতির কিভাবে নিরসন হইবে তাহাও ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। কবি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। ২৩শে সেপ্টেম্বর গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার সম্মতি প্রার্থনা করিয়া অমিয় চক্রবর্তীকে দিয়া মহাদেব দেশাইকে তার করাইলেন। কিন্তু তাহাতেও কবি স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পর তিনি নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া পুনরায় মহাদেব দেশাইকে তার করিলেন। এই তারটি ছিল এইরূপ :

"I try my hardest to keep my faith firm in ultimate victory of truth as expressed in a great life to be sacrificed for its cause but my heart bleeds to think what it would cost our country and I struggle with all my power to convince myself that India can (not) afford it in her present time to crisis. It is needless to tell you how anxious I am to know the details of Mahatmaji's condition."

এই তারবার্তা পাইবার সঙ্গে-সঙ্গে ঐদিনই গান্ধীজী জবাবে কবির নিকট নিম্নলিখিত তারবার্তা পাঠান :

"Have read your loving message to Mahadev also Amiyas'. You have put fresh heart in me. Do indeed come if your health permits. Mahadev will send you daily wires. Talks about settlement still proceeding. Love."…

পরদিন, ২৪শে সেপ্টেম্বর, শান্তিনিকেতন হইতে কবি সুরেন্দ্রনাথ কর ও অমিয় চক্রবর্তীকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতা হইয়া পুণা যাত্রা করেন। কবি স্বয়ং তাঁহার এই যাত্রার বিবরণ লিখিয়াছিলেন (পুণা ভ্রমণ-বিচিত্রা : অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯)। উহার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হইল :

"আশানৈরাশ্যে আন্দোলিত হয়ে ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর প্রাতে আমরা কল্যাণ স্টেশনে পৌঁছলেম। সেখানে শ্রীমতী বাসন্তী ও শ্রীমতী ঊর্মিলার সঙ্গে দেখা হল।…কালবিলম্ব না করে আমাদের ভাবী গৃহস্বামিনীর প্রেরিত মোটরগাড়িতে চড়ে পুণার পথে চললেম।

…"অবশেষে শ্রীযুক্ত বিঠলভাই থ্যাকারসে মহাশয়ের প্রাসাদে গাড়ি থামল।… গৃহে প্রবেশ করেই বুঝেছিলেম, গভীর একটি আশঙ্কায় হাওয়া ভারাক্রান্ত।…প্রশ্ন

করে জানলেম, মহাত্মাজির শরীরের অবস্থা সংকটাপন্ন। বিলেত হতে তখনও খবর আসে নি। প্রধানমন্ত্রীর নিকট আমি একটি জরুরী তার পাঠিয়ে দিলেম।

"দরকার ছিল না পাঠাবার। শীঘ্রই জনরব কানে এল, বিলেত থেকে সম্মতি এসেছে। কিন্তু জনরব সত্য কি না তার প্রমাণ পাওয়া গেল বহু ঘণ্টা পরে।"

তারপর যারবেদা জেলে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাতের বর্ণনা দিয়া কবি লিখিয়াছেন :

"লোহার দরজা একটার পর একটা খুলল, আবার বন্ধ হয়ে গেল।···বাঁ দিকে সিঁড়ি উঠে, দরজা পেরিয়ে, দেয়াল-ঘেরা একটি অঙ্গনে প্রবেশ করলেম।···অঙ্গনে একটি ছোটো আমগাছের ঘনছায়ায় মহাত্মাজি শয্যাশায়ী।

"মহাত্মাজি আমাকে দুই হাতে বুকের কাছে টেনে নিলেন, অনেকক্ষণ রাখলেন। বললেন, কত আনন্দ হল।

···"তখন বেলা দেড়টা। বিলেতের খবর ভারতময় রাষ্ট্র হয়ে গেছে; রাজনৈতিকের দল তখন সিমলায় দলিল নিয়ে প্রকাশ্য সভায় আলোচনা করছিলেন, পরে শুনলেম। খবরের কাগজওয়ালারাও জেনেছে। কেবল যাঁর প্রাণের ধারা প্রতি মুহূর্তে শীর্ণ হয়ে মৃত্যুসীমায় সংলগ্নপ্রায় তাঁর প্রাণসংকট-মোচনের যথেষ্ট সত্বরতা নেই।···

"মহাত্মাজির স্বভাবতই শীর্ণ শরীর শীর্ণতম, কণ্ঠস্বর প্রায় শোনা যায় না।··· অথচ চিত্তশক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নি। চিন্তার ধারা প্রবহমান, চৈতন্য অপরিশ্রান্ত। প্রায়োপবেশনের পূর্ব হতেই কত দুরূহ ভাবনা, কত জটিল আলোচনায় তাঁকে নিয়ত ব্যাপৃত হতে হয়েছে।···উপবাসকালে নানান দলের প্রবল দাবি তাঁর অবস্থার প্রতি মমতা করে নি, তা সকলেই জানেন। কিন্তু মানসিক জীর্ণতার কোনো চিহ্নই তো নেই।···

"মহাদেব বললেন, আমার জন্যে মহাত্মাজি একান্ত মনে অপেক্ষা করছিলেন। আমার উপস্থিতি দ্বারা রাষ্ট্রিক সমস্যার মীমাংসা-সাধনে সাহায্য করতে পারি এমন অভিজ্ঞতা আমার নেই। তাঁকে যে তৃপ্তি দিতে পেরেছি এই আমার আনন্দ।···

"অবশেষে জেলের কর্তৃপক্ষ গভর্নমেন্টের ছাপ-মারা মোড়ক হাতে উপস্থিত হলেন।··মহাত্মাজি গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে পড়তে লাগলেন।···পড়া শেষ করে বন্ধুদের ডাকলেন। শুনলেম, তিনি তাঁদের আলোচনা করে দেখতে বললেন। এবং নিজের তরফ থেকে জানালেন, কাগজটা ডাক্তার আম্বেদকরকে দেখানো দরকার; তাঁর সমর্থন পেলে তবেই তিনি নিশ্চিন্ত হবেন।

"বন্ধুরা এক পাশে দাঁড়িয়ে চিঠিখানি পড়লেন। আমাকেও দেখালেন।···পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর 'পরে ভার দেওয়া হল চিঠিখানির বক্তব্য বিশ্লেষণ করে মহাত্মাজিকে শোনাবেন। তাঁর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় মহাত্মাজির মনে আর কোনো সংশয় রইল না। প্রায়োপবেশনের ব্রত উদ্‌যাপন হল।···

"চতুর্দিকে জেলের কম্বল বিছিয়ে সকলে বসলেন। লেবুর রস প্রস্তুত করলেন শ্রীমতী কমলা নেহরু। Inspector General of Prisons···অনুরোধ করলেন, রস

যেন মহাত্মাজিকে দেন শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ নিজের হাতে। মহাদেব বললেন 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো' গীতাঞ্জলির এই গানটি মহাত্মাজির প্রিয়। সুর ভুলে গিয়েছিলেম। তখনকার মতো সুর দিয়ে গাইতে হল। পণ্ডিত শ্যামশাস্ত্রী বেদ পাঠ করলেন। তারপর মহাত্মাজি শ্রীমতী কস্তুরীবাঈয়ের হাত হতে ধীরে ধীরে লেবুর রস পান করলেন।…

"রাত্রে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু প্রমুখ পুনার সমবেত বিশিষ্ট নেতারা এসে আমাকে ধরলেন, পরদিন মহাত্মাজির বার্ষিকী উৎসবসভায় আমাকে সভাপতি হতে হবে; মালব্যজিও বোম্বাই হতে আসবেন। মালব্যজিকেই সভাপতি করে আমি সামান্য দু-চার কথা লিখে পড়ব, এই প্রস্তাব করলেম।

…"বিকালে শিবাজিমন্দির-নামক বৃহৎ মুক্ত অঙ্গনে বিরাট জনসভা। অতি কষ্টে ভিতরে প্রবেশ করলেম।…মালব্যজি উপক্রমণিকায় সুন্দর করে বোঝালেন তাঁর বিশুদ্ধ হিন্দি ভাষায় যে, অস্পৃশ্যবিচার হিন্দুশাস্ত্রসঙ্গত নয়।…আমার কণ্ঠ ক্ষীণ, সাধ্য নেই এত বড়ো সভায় আমার বক্তব্য শ্রুতিগোচর করতে পারি। মুখে মুখে দু-চারটি কথা বললেম, পরে রচনা পাঠ করবার ভার নিলেন পণ্ডিতজির পুত্র গোবিন্দ মালব্য।… [মহাত্মা গান্ধী : পৃঃ. ৫৫-৬২]

কবির এই ভাষণ প্রায় সমস্ত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উহার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হইল :

"On this day rejoicing over our reconciliation with the Depressed Classes of India we still suffer from a bitter sense of disappointment for not being able to realise the confidence of our Mohammedan brethren which is absolutely necessary for the fulfilment of our national life. We assure them that the great fight which has recently been taken up by our country against iniquitous custom of untouchability has not made us forget the greater ordeal of purification through which India must pass in order to bring together two great neighbours, the Hindus and the Mohammedans, in a perfect spirit of trust and co-operation. Both communities must be united in a bond of comradeship and stand side by side in the arduous venture of India's freedom, which to be real must come from within the heart of our common humanity and be built on the basis of uncompromising honesty and love.

"I heartily endorse the statement which Mahatmaji sent to the Press and appeal to our countrymen that they must never pause till the evils of disparity and discord are completely rooted out from the soil of India.

"Let us today take upon ourselves, all men and women of India, this great task which lies before us, and dare to meet the challenge

which it has sent from one end of our country to the other."—A. P.
[*Daily News* : 28th September, 1932]

পরদিন প্রাতে কবি গান্ধীজীর পাশে বসিয়া বহুক্ষণ কাটান। উহার দুই একদিন পরই (৩০শে সেপ্টেম্বর) তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ২৫শে সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ে হিন্দু নেতাদের সম্মেলনে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, উহা স্বয়ং গান্ধীজী কর্তৃক রচিত হয়। উহাতে বলা হয় :

"This conference resolves that henceforth, amongst Hindus, no one shall be regarded as an untouchable by reason of his birth, and those who have been so regarded hitherto, will have the same right as other Hindus in regard to the use of public wells, public schools, public roads and other public institutions. This right will have statutory recognition at the first opportunity and shall be one of the earliest acts of the swaraj parliament, if it shall not have received such recognition before to secure, by every legitimate and peaceful means, an early removal of all social disabilities now imposed by custom upon the so-called untouchables classes, including the bar in respect of admission to temples." [*Mahatma* : Vol. III : P. 174]

তাছাড়া গান্ধীজীর অনশনভঙ্গকালীন আবেদনেও সারা দেশে এক আশ্চর্য সাড়া ও জাগরণ দেখা দেয়। ২৭শে সেপ্টেম্বর হইতে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত সারা দেশব্যাপী অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সপ্তাহ পালন করা হয়। বড় বড় শহর ও নগরে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যদের একত্রে ভোজন-উৎসব এবং দেবমন্দিরের দ্বার আপামর জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার আন্দোলন শুরু হয়। সারা দেশব্যাপী অস্পৃশ্যতা উচ্ছেদ অভিযান সংগঠন ও পরিচালনা করার জন্য এই সময় নিখিল ভারত অস্পৃশ্যতা নিরোধ সমিতি গঠিত (All India Anti-untouchability League) হয়। উহার অল্প কয়েকদিন পরেই, ১৫ই নভেম্বর "বঙ্গীয় প্রাদেশিক হরিজন সেবক সমিতি" গঠিত হয়।

শান্তিনিকেতন আশ্রমবাসীরাও এই আবেদনে সাড়া দেন। স্বয়ং কবি এই সংস্কার আন্দোলনে আগ্রহী হন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার লিখিতেছেন :

"...তখন আশ্রমের সমাজসংস্কারের জন্য একটা উৎসাহ দেখা দিয়াছিল। অভয়-আশ্রমের প্রাক্তনকর্মী এখন রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপ্রকাশন দপ্তরের সহিত যুক্ত সুধীরচন্দ্র করের নেতৃত্বে 'সংস্কার সমিতি' স্থাপিত হয়। বিশ্বভারতী হইতে রবীন্দ্রনাথ যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন, তাহাতে এই সমিতির উদ্দেশ্য বিবৃত হয় :

(১) কাহাকেও আমরা সামাজিকভাবে হীন মনে করিব না, অস্পৃশ্য করিয়া রাখিব না। সকল জাতিকেই জল-চল করিয়া লইতে হইবে।

(২) সাধারণ মন্দির, পূজার স্থান ও জলাশয় সকলের জন্য উন্মুক্ত হইবে।

(৩) বিদ্যালয়, তীর্থক্ষেত্র, সভাসমিতি প্রভৃতিতে কোথাও কাহারও আসিবার কোনো বাধা থাকিবে না।

(৪) কাহারও জাতি লক্ষ্য করিয়া আত্মসম্মানে আঘাত দিবার অন্যায় ব্যবস্থা সমাজে থাকিবে না।

"রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল, 'বিনা দক্ষিণায় শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে দুর্গতদের ছেলে রাখিয়া অন্যান্য ছাত্রদের সহিত সমভাবে শিক্ষা দিয়া তাহাদের মধ্যে হইতেই ভাবীকর্মী ও কেন্দ্র পরিচালক তৈরি করা।' এই ইস্তাহারে কবি সহি দেন ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯ (১লা ডিসেম্বর)। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কবি মহাত্মাজি ও অনুন্নত জাতি সম্বন্ধে যে পুস্তিকা উৎসর্গ করেন, তাহার উপস্বত্ব এই 'সংস্কার-সমিতি'কে প্রদত্ত হইয়াছিল।"

[রবীন্দ্রজীবনী : তৃতীয় খণ্ড : পৃঃ. ৪৫১-৫২]

লক্ষ্য করিবার বিষয় কবি এই সংগঠনের 'হরিজন সেবক সমিতি' নাম না-দিয়া 'সংস্কার সমিতি' রাখিলেন।

মোট কথা, সারা দেশের চিন্তা-ভাবনা তখন অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলন ও গান্ধীজীকে কেন্দ্র করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। লাহোর কংগ্রেস হইতে ১৯৩২-এর আইন-অমান্য আন্দোলন পর্যন্ত কংগ্রেস ও দেশবাসীর সম্মুখে যে রাজনীতিক পরিপ্রেক্ষিত ছিল, গান্ধীজীর অনশন ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলনে সহসা কোথায় যেন তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও স্বাধীনতার লক্ষ্য,—সবই এখন গান্ধীজীর কাছে ঠিক গৌণ-চিন্তা না-হইলেও এইসব প্রশ্নে তিনি এখন আর তেমন গুরুত্ব দিতে চাহিলেন না। গান্ধীজীর এই ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন প্রতিক্রিয়াশীল ছিল কিনা সে বিতর্কে না-গিয়াও এখানে শুধুমাত্র এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, গান্ধীজী ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার সহিত রাজনীতির ওড়ন-পাড়ন দিয়া সমগ্র দেশের রাজনীতিতে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করিতে চাহিলেন যাহা আধুনিক প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা ও আন্দোলনের পরিপন্থী ছিল,—অন্তত এই ছিল তৎকালীন বামপন্থী মহলের বক্তব্য। গান্ধীজীর এই আকস্মিক পরিবর্তনে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র প্রমুখ কংগ্রেসের বামপন্থী নেতারা প্রথমে খুবই ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে জওহরলাল তাঁহার আত্মচরিতে লিখিতেছেন :

"...সহসা নানাবিধ চিন্তায় আমার মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, মনের মধ্যে নানা সম্ভাবনা ও অনিশ্চিত আশঙ্কা ভাসিয়া উঠিল এবং আমি সম্পূর্ণরূপে স্থৈর্য হারাইলাম। দুইদিন আমি অন্ধকারের মধ্যে কোন আলোক দেখিতে পাইলাম না।...

"নির্বাচনের মত একটা সামান্য বিষয় লইয়া তিনি (গান্ধীজী) চরম আত্মোৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার উপর আমার বিরক্তিও হইল। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিণাম কি হইবে? অন্তত সাময়িকভাবেও বৃহত্তর সমস্যাগুলি কি চাপা পড়িয়া যাইবে না? যদি তাঁহার আশু উদ্দেশ্য সফল হয় যদি অনুন্নত শ্রেণীদের যুক্ত নির্বাচনের অধিকার স্বীকৃত হয় তাহা হইলে তাহার

প্রতিক্রিয়ার ফলে কি অনেকেই, কিছু সাফল্য লাভ করিয়াছি, অতএব এখন আর কিছু করিবার প্রয়োজন নাই, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া পড়িবে না? তাঁহার এই কার্যের ফলে কি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা এবং গভর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রসূত শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনাগুলি স্বীকার ও গ্রহণ করা হইবে না? ইহার সহিত অসহযোগ ও নিরুপদ্রব প্রতিরোধের কি সঙ্গতি আছে? এত ত্যাগ স্বীকার করিয়া এত সাহসিক প্রচেষ্টার পর আমাদের আন্দোলন কি বিশীর্ণ হইয়া অবশেষে তুচ্ছ ব্যাপারে পর্যবসিত হইবে?

"তাঁহার রাজনৈতিক ব্যাপারে ধর্ম ও ভাবপ্রবণতার অবতারণা এবং এই সম্পর্কে প্রায়ই ঈশ্বরের আদেশ উল্লেখে আমার তাঁহার উপর অত্যন্ত রাগ হইল। এমন কি তিনি এমন কথাও বলিলেন যে, ঈশ্বর তাঁহার উপবাসের দিন পর্যন্ত নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কি ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করিতেছেন!...

"যিনি এই বিপর্যয়ের কারণ তাঁহার প্রতি প্রেম ও অসহায় ক্রোধে চিন্তার পর চিন্তায় আমি আচ্ছন্ন হইয়া উঠিলাম, আমার মস্তিষ্ক বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। কি করিব ভাবিয়া পাইলাম না, আমার মেজাজ বিগড়াইয়া গেল, সকলের উপর রূঢ় হইয়া উঠিলাম, সর্বোপরি নিজের উপরই বেশী রাগ হইতে লাগিল।"

[আত্মচরিত : পৃঃ. ৩৯৫-৯৬]

অবশ্য জওহরলালের এই মানসিক প্রতিক্রিয়াও খুব সাময়িক। অনতিকাল পরে সারা দেশব্যাপী হিন্দুদের মধ্যে সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের যে বিপুল উৎসাহ ও উন্মাদনা, যে তীব্র তর্ক-বিতর্ক ও দ্বন্দ্ব-বিরোধের সৃষ্টি হয় তাহার ফলে জওহরলাল প্রমুখ বামপন্থী কংগ্রেস নেতারাও এই আন্দোলনের বিশেষ তাৎপর্যটি উপলব্ধি করিতে পারেন। তাঁহার এই মানসিক ভাবান্তরের কথা বর্ণনা করিয়া জওহরলাল আরও লিখিলেন :

"তারপর দেশব্যাপী বিরাট আলোড়নের সংবাদ আসিল, সমস্ত হিন্দুসমাজ যেন যাদুমন্ত্রে জাগিয়া উঠিল, মনে হইতে লাগিল যেন অস্পৃশ্যতার অন্তিমকাল উপস্থিত। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এরোড়া (বা যারবেদা) জেলে উপবিষ্ট এই ক্ষীণ মানুষটি কি আশ্চর্য যাদুকর, কি নিপুণভাবে সূত্র আকর্ষণ করিয়া তিনি জনগণচিত্ত অভিভূত করিতেছেন।"

[ঐ : পৃঃ. ৩৯৬]

পরবর্তীকালে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও 'পুণা-চুক্তি'র সমালোচনা করিয়াছেন বটে তবে গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনের বিরোধিতা করেন নাই পরন্তু ইহাতে তাঁহারা কতকটা মৌন সমর্থন জানাইয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্র ক্ষেত্রবিশেষে এই আন্দোলনের বিশেষ তাৎপর্যগত অবদানটি স্বীকার করেন কিন্তু তাঁহার প্রধান অভিযোগ ছিল এই যে, এই আন্দোলনের উপর গান্ধীজী অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া দেশের মূল রাজনীতিক লক্ষ্যকে লঘু ও পাশ কাটাইয়া যাইতেছেন, যাহার ফলে জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তির অবকাশ থাকিয়া যাইবে। বলাবাহুল্য, এ শুধু সুভাষচন্দ্রের নহে, মোটামুটি এই ছিল অন্যান্য বামপন্থী দল ও গোষ্ঠীর বক্তব্য বা অভিযোগ। অবশ্য ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে তখনও পর্যন্ত ইঁহাদের তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বা প্রভাব ছিল না। বস্তুতপক্ষে গান্ধীজীই

তখন ঘটনাস্রোতকে দৃঢ়হস্তে পরিচালিত করিতেছিলেন। ইহার সম্মুখে বামপন্থীদের অসহায়ভাবে নীরবে দাঁড়াইয়া দেখা ছাড়া তেমন কিছু করিবারও ছিল না।

হরিজন আন্দোলনের সূচনা

গান্ধীজী যখন অনুন্নত হিন্দুদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের বিরুদ্ধে আমরণ অনশনের সংকল্প ঘোষণা করেন সেই সময় গভর্নমেণ্ট একটির পর একটি অর্ডিনান্স ও আইন জারি করিয়া দেশের আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে দৃঢ়সংকল্প হন। অবশ্য আইন অমান্য আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হইয়া আসিলেও সেই সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবীদের ক্রিয়াকলাপ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। ১৯৩২-এর ৪ঠা জানুয়ারী বড়লাট যে চারিটি অর্ডিনান্স জারি করেন, উহাদের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই জুন মাসে তিনি 'Special Powers Ordinance 1932' নামে অপর একটি অর্ডিনান্স জারি করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, বাংলাদেশের বিপ্লব-আন্দোলনকে দমন করার জন্য ১৯৩১ সালের নভেম্বর মাসেই বাংলা সরকার, 'Bengal Emergency Powers Ordinance' নামে একটি অর্ডিনান্স জারি করিয়াছিলেন। উহা ১৯৩২ সালের মে মাসের শেষভাগেই পুনর্বার জারি করা হয় এবং জুলাই মাসে উহাতে আরও কয়েকটি ধারা সংযোজন করা হয়।

কিন্তু এতসব অর্ডিনান্স জারি করিয়াও বাংলাদেশের বিপ্লবীদের দমন করা সম্ভবপর হয় নাই। ইতিমধ্যে বিপ্লবীদের দ্বারা পর পর কয়েকটি রাজনীতিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য, ৩০শে এপ্রিল মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডগলাস এবং ১৯শে জুলাই কুমিল্লা শহরে ত্রিপুরার পুলিস কমিশনার মিঃ এলিসন্ বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন। বিপ্লবীরা ৫ই আগস্ট 'স্টেট্সম্যান' সম্পাদক অ্যালফ্রেড্ ওয়াট্সন্ এবং ২২শে আগস্ট ঢাকার পুলিশ সুপার মিঃ গ্রাসবিকে হত্যা করার চেষ্টা করেন। এছাড়াও আরও কয়েকজনের উপর বিপ্লবীরা প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করেন। ইহার পর গভর্নমেণ্ট চরমতম দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১লা সেপ্টেম্বর বাংলা সরকার 'Bengal Criminal Law Amendment Act 1932' এবং ৬ই সেপ্টেম্বর 'Bengal Suppression of Terrorist Outrages Act 1932' নামে আর একটি আইন পাশ করিয়া সারা দেশের বুকে প্রচণ্ড বিভীষিকা ও সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু করিয়া দেয়। বিপ্লবী অধ্যুষিত এলাকায় গ্রামে গ্রামে সৈন্যবাহিনী টহল দিয়া ফিরিতে লাগিল। পাইকারী জরিমানা, গ্রেপ্তার, খানাতল্লাস, লুটপাট, মারপিট, মেয়েদের শ্লীলতাহানি—কোন কিছুই বাকি রহিল না। কারাগার ও বন্দীনিবাসগুলিতে বন্দী বিপ্লবীদের আর জায়গা হইল না। তখন হাজার হাজার বাংলার যুবকদের স্বগ্রামে অথবা দূর-দূর জেলায় অন্তরীণাবদ্ধ করিয়া রাখা শুরু হয়। তাছাড়া এই সময়ই পুনরায় দলে দলে বিপ্লবীদের আন্দামান

দ্বীপে নির্বাসিত করা শুরু হয়। এক কথায় গোটা বাংলা দেশটাই যেন একটা কয়েদখানায় পরিণত হইল।

এই পৈশাচিক নির্যাতন ও দমননীতির ফলে আন্দোলন সাময়িকভাবে কিছুটা স্তিমিত হইয়া পড়ে। অবশ্য ইংরেজ গভর্নমেণ্টও ইহার দ্বারা বিশেষ কিছু সুবিধা করিয়া লইতে পারে নাই পরন্তু ইহার ফলে ইংরেজের বিরুদ্ধে সারা দেশে তীব্র ক্রোধ, ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। স্মরণ রাখা দরকার, দেশের এই রকম পরিস্থিতিতেই গান্ধীজী অনশন ও অস্পৃশ্যতা উচ্ছেদ আন্দোলন শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ সবই দেখিতেছিলেন ও শুনিতেছিলেন কিন্তু প্রতিকারের কোনো উপায় খুঁজিয়া পাইতে-ছিলেন না। কবি যখন পুণায় গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান সেই সময় বিলেতের 'ভারত মিলন সমিতি'র (India Conciliation Group) সভাপতি মঃ কার্ল হীদ্ (Carl Heath) কবিকে একটি তার করেন। এই তারবার্তায় তিনি কবিকে ভারতের পরিস্থিতি জানাইবার জন্য এবং ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে আপস ও শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা সম্পর্কে তাঁহার মতামত জ্ঞাপন করার জন্য অনুরোধ জানান। কবি অবশ্য সেই মুহূর্তেই উহার জবাব দেন নাই সম্ভবত বিরক্তি ও ঘৃণাভরেই তাহা দেন নাই। দেশের কোন কোন মহল থেকে এই আপস ও সহযোগিতার প্রস্তাবের কথা গান্ধীজীকে বলা হইতে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতি ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলেন :

"No one would be more delighted than I would be to endorse any worthy suggestion for co-operation by the Congress with the Government and with the Round Table Conference. I would only emphasize and underline the adjective worthy. In spite of my repeated declarations it is not generally recognized that, by instinct, I am a co-operator."

[*Mahatma* : Vol. III : P. 178]

কিন্তু এই আপস-আলোচনার সম্ভাবনার ক্ষীণ রেখাটুকুও যেন মিলাইয়া গেল। সকলেই আশা করিয়াছিলেন, ইহার পর গভর্নমেণ্ট অন্ততপক্ষে গান্ধীজীকে মুক্তি দিবেন। কিন্তু তাহা তো দূরের কথা, পরন্তু অনশনকালে গান্ধীজীকে কারাগারে যে-সব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল ২৯শে সেপ্টেম্বর সে-সবই প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয়।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনের পথে যাত্রা করিয়াছেন। শান্তিনিকেতনে পৌঁছানর কয়েকদিন পর তিনি ইংরেজ গভর্নমেণ্টের এই কঠিন অনমনীয় মনোভাব লক্ষ্য করিয়া কার্ল হীদ্-এর প্রশ্নের জবাবে এক দীর্ঘ খোলা চিঠি লিখেন (১৫ই অক্টোবর, ১৯৩২)। ১৭ই অক্টোবর উহা দেশে প্রায় সমস্ত দৈনিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উহার মর্মার্থ ছিল এই :

"প্রিয় বন্ধু,

আপনার তারে জানিতে পারিলাম যে ভারত ইংলণ্ডের সম্পর্কের যাহাতে আমূল পরিবর্তন হয় তজ্জন্য আপনার দেশের সকলেই আগ্রহান্বিত। এই সংবাদে আমি

আশান্বিত হইয়াছি। আমার মনে হয়, আমাদের দেশবাসীর সহিত সরল সহযোগিতা স্থাপনের পক্ষে ভারত গভর্নমেণ্টের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত।

মহাত্মার তপস্যার ফলে ভারতের আকাশ, ভারতের বাতাস পূত-পবিত্র হইয়াছে। কোন সম্প্রদায় বিশেষের জন্য তিনি অনশন পণ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার আত্মোৎসর্গের পণ হইয়াছিল নির্যাতিত মানবতার জন্য।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতের আহ্বানে সাড়া দিবার সুযোগ গভর্নমেণ্টের নিকট অগণিতবার উপস্থিত হইয়াছিল। গোল-টেবিল বৈঠক হইতে প্রত্যাবর্তনের পর মহাত্মাজি বড়লাটের সহিত আলাপ-আলোচনার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন— তখনও একটা সুযোগ গিয়াছে। কিন্তু মহাত্মাজির কথায় কর্ণপাত না করিয়া সরাসরি তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করা হইল। তদবধি গভর্নমেন্ট খোলাখুলিভাবে দমননীতি পরিগ্রহ করিয়াছেন। নিপীড়নের দোর্দণ্ড প্রতাপে গভর্নমেণ্টের মর্যাদা লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর চক্ষে আজ কলঙ্ক কালিমালিপ্ত। ভুলের পর ভুল করিয়া গভর্নমেণ্ট ভারতকে আসন্ন সংগ্রামের অবস্থায় টানিয়া নামাইতে সক্ষম হইয়াছে। ভারতের সংগ্রামের অবস্থা আজ বর্তমানে বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ প্রণালীর চক্ষেও হেয় বোধ হইবে না।

কোন ব্যক্তি বিশেষের বিপ্লবাত্মক কার্য কেহই সমর্থন করেন না। তবু স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এইরূপ ঘটনা গভর্নমেণ্টের কার্যেরই ফলস্বরূপ। বিপ্লবীদের উচ্ছেদ সাধনের নিমিত্ত এখন বাংলার গ্রামে গ্রামে সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে। বলা হয় যে, পশুশক্তি প্রয়োগে আমাদের দেশবাসীকে 'নৈতিক শিক্ষা' দেওয়া হইবে। ঢাকা, মেদিনীপুর, হিজলী ও চট্টগ্রামে গভর্নমেণ্ট অনুসৃত নীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। গভর্নমেণ্টের নব প্রবর্তিত নীতিতে যে ত্রাসের সঞ্চার হইবে, তাহা হইবে দেশব্যাপী বিপ্লববাদ প্রসারেরই অনুকূল।

ব্যাপার অধিক দূর গড়াইবার পূর্বে যদি নীতি পরিবর্তনের গভর্নমেণ্টের ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা ও ভারত গভর্নমেণ্টকে দুইটি বিষয়ের সম্মুখীন হইতে হইবে—

(১) দেশবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক দেশ হইতে অপর দেশকে কখনও শাসন করিতে পারে না। পশুশক্তি যত নির্মম ও বিজ্ঞানপ্রসূত তীব্রতা লইয়াই আসুক না কেন, বলপ্রয়োগে আর কখনও ভারতকে শাসন করা যাইবে না। ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে পরস্পরের অর্থনীতি ও কৃষ্টির সম্পর্ক অব্যাহত রাখিতেই হইবে। কিন্তু মৈত্রী ও বিশ্বাস দ্বারাই তাহা রক্ষা করা সম্ভব। আমার দেশবাসীগণ সহযোগিতার জন্য সতত প্রস্তুত। কিন্তু সাম্য ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় তাহাদের দাবীর অধিকার স্বীকারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গভর্নমেণ্টকে তাহাদের বিশ্বাস পুনরায় অর্জন করিতে হইবে।

(২) আজ দেশে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত, ইংরেজ ও আমাদের মধ্যে যে অবিশ্বাসের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা প্রতিরোধ করিবার একটি মাত্র উপায় বিদ্যমান। মহাত্মাজির নেতৃত্বে কংগ্রেসই তাহা রোধ করিতে সক্ষম। তবু সহস্র সহস্র বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীকে অপরাধীর ন্যায় কারাগৃহে অবরুদ্ধ রাখা হইয়াছে। জনসাধারণের

স্বার্থরক্ষায় প্রাণপাত চেষ্টা এবং মহাত্মাজির প্রতি অনুরাগই তাঁহাদের একমাত্র অপরাধ। কংগ্রেসকে অবৈধ ঘোষণা করা হইয়াছে, উহার অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে, আর যাহারা কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, গোপনে ও নির্দয়ভাবে তাহাদের নিপীড়ন করা হইয়াছে। ইহাতে কংগ্রেসের প্রতি জনসাধারণের নৈতিক আকর্ষণ বিন্দুমাত্রও শিথিল হয় নাই এবং কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানও কোনক্রমে দুর্বল হইয়া পড়ে নাই। কিন্তু গভর্নমেণ্ট স্বেচ্ছায় নিজেদের এবং আমার দেশবাসীদের কংগ্রেসের সেবা হইতে বঞ্চিত করিয়া, দেশের রত্নতুল্য পুরুষ এবং নারীদের কর্মক্ষমতাকে সমাধির অতল তলে সমাজিত করিয়াছেন। গভর্নমেণ্ট ভুল করিয়া যে বিপদ আহ্বান করিতেছেন, ইহাতে শুধু দেশবাসীর মনে এখনও যে অধিকারটুকু বর্তমান রহিয়াছে তাহাই চিরতরে হারাইবেন না পরন্তু ইহার পরিণতি হইবে বিপ্লব আন্দোলনে এবং নিরীহ মানবের উপর উহার ফল হইবে অতীব শোচনীয়।

কূটনীতির আবরণে আবৃত রাখিয়া মিথ্যা শুভেচ্ছা প্রতিষেধক এবং চালবাজীতে ভুলিয়া রাখিবার দিন বহুকাল চলিয়া গিয়াছে। দুর্বল দমননীতি ও ভয় প্রদর্শনের পথ প্রত্যাহার করিয়া গভর্নমেণ্টকে **অনতিবিলম্বে ভারতকে স্বাধীনতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে! বিবেচনাহীন গভর্নমেণ্টের পুঞ্জীভূত নিবুদ্ধিতা দূরে সরাইয়া সরলভাবে শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পূর্বে চাই মহাত্মা গান্ধীর ও কংগ্রেস সদস্যদের মুক্তি আর চাই বিনাশর্তে অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার।** শাসনকার্যে অক্ষমতার প্রকৃষ্ট নিদর্শনই এই অর্ডিন্যান্স। (বড় হরফ আমার)

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ব্রিটেনের অধিবাসীদের ভারতের প্রকৃত অবস্থা জানাইতে ভারত মিলন সমিতি আপ্রাণ চেষ্টা-করিবেন। স্বাধীনতালাভে আমাদের দেশবাসীর জন্মগত অধিকার রহিয়াছে এবং ইচ্ছানুসারে জগতের যে কোন দেশ যে কোন জাতির সহিত রাষ্ট্রীয় বন্ধনে বদ্ধ হইতে তাহাদের স্বাধীনতা বর্তমান। স্বতঃসিদ্ধরূপে ইংলণ্ডের অধিবাসীদের নিকট তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সমিতিকে নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধভাবে কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে। আমি জানি আপনার দেশবাসীর নিকট এই বীরত্বের আশা করা দুরাশা নয়।

মানবহৃদয়ের চিরন্তন দাবী যদি গভর্নমেণ্ট ভয়শূন্যচিত্তে স্বীকার করেন তাহা হইলেই ভারতে প্রকৃত শান্তি স্থাপন সম্ভব। জগতের সমক্ষে মহাত্মাজি তাঁহার ইচ্ছার সততা প্রমাণিত করিয়াছেন; গভর্নমেণ্ট ইহার প্রত্যুত্তর দিবেন কি?"—ফ্রী প্রেস।

[বঙ্গবাণী : ৩১শে আশ্বিন, ১৩৩৯ : ১৭ই অক্টোবর, ১৯৩২]

লক্ষ্য করিবার বিষয়, সন্ধি ও আপসের জন্য গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতারা গভর্নমেন্টকে যে-সব শর্তাদি দিয়াছিলেন বস্তুত উহার সার কথাটিই কবির এই খোলাচিঠিতে ব্যক্ত হইয়া উঠে।

ইতিমধ্যে মালব্য-সপ্রু-জয়াকর প্রমুখ নেতারা সকলেই গান্ধীজীর আশু মুক্তির দাবী জানান। মৌলানা সৌকত আলিও বড়লাটের নিকট গান্ধীজীর মুক্তি ও সর্বসাধারণের কল্যাণে শান্তি সংস্থাপনের জন্য আবেদন জানান। জবাবে বড়লাট জানাইয়া দিলেন যে, গান্ধীজী যতক্ষণ পর্যন্ত আইন-অমান্য আন্দোলনের সহিত সংস্রব ত্যাগ না-করিতেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার মুক্তি দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠিতে

পারে না। এদিকে গান্ধীজী স্বয়ং কারাগারের অভ্যন্তর হইতে অস্পৃশ্যতা উচ্ছেদ আন্দোলন চালাইবার সুযোগ-সুবিধা প্রার্থনা করিয়া গভর্নমেন্টের নিকট চিঠিপত্র লিখিতেছিলেন। অবশেষে নভেম্বর মাস হইতে কর্তৃপক্ষ গান্ধীজীকে সেইসব সুযোগ অনুমোদন করিলেন। ইহার পর গান্ধীজী কারাগার হইতে পর পর কয়েকটি বিবৃতি দেন। উল্লেখযোগ্য, হিন্দুসমাজের গোঁড়া ও রক্ষণশীল গোষ্ঠীগুলি এই সময় গান্ধীজীর অনশন ও অস্পৃশ্যতা নিরোধ আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করিতেছিলেন। গান্ধীজী তাঁহার এই বিবৃতিগুলিতে রক্ষণশীল হিন্দুদের এই সমালোচনার যুক্তি খণ্ডন করিয়া অস্পৃশ্যতার উচ্ছেদের পক্ষে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। বলাবাহুল্য, গান্ধীজী তাঁহার নিজস্ব বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই হিন্দুশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

গান্ধীজী এই সময় প্রধানত অস্পৃশ্যদের মন্দির প্রবেশাধিকারের জন্যই আন্দোলন তুলিতে চাহিলেন। কিন্তু গোল বাধিল কেরালার অন্তর্গত গুরুভায়ুর মন্দিরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশাধিকার লইয়া। কেলাপ্পান নামক গান্ধীজীর জনৈক অনুগামীই ছিলেন এই আন্দোলনের নেতা। এই মন্দিরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশের দাবীতে তিনি আমরণ অনশন পণ করেন। (২২শে সেপ্টেম্বর) অবশেষে গান্ধীজীর অনুরোধেই ২রা অক্টোবর হইতে তিন মাসের জন্য তিনি অনশন সংকল্প স্থগিত রাখেন। আম্বেদকর প্রমুখ অনুন্নত শ্রেণীর নেতারা কিন্তু মন্দির প্রবেশ আন্দোলনে মোটেই গুরুত্ব দিতে চাহিলেন না। পক্ষান্তরে গান্ধীজী মন্দির প্রবেশাধিকার আন্দোলনেই প্রধান গুরুত্ব দিলেন। এমন কি গুরুভায়ুর মন্দির প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত গোলমাল যথাসময়ে মিটিয়া না গেলে তিনিও জানুয়ারির শুরুতে কেলাপ্পানের সহিত পুনর্বার অনশন শুরু করিবেন, এমন কথাও ঘোষণা করেন। তিনি বলিলেন :

…"I can understand Dr. Ambedkar's comparative indifference, but I am not thinking of the few cultured men belonging to the Depressed Classes. I am thinking of the uncultured dumb many. After all, the temples play a most important part in the life of the masses, and I, who have been trying all my life to identify myself with the illiterate and downtrodden, cannot be satisfied until all temples are open to the outcastes of Hindu humanity.…

"The Guruvayur temple has come in my way by accident. But there is something more than the life of a comrade or my personal honour involved in this question. Every one recognizes that the Depressed Classes question has to be solved now or never."…

[*Mahatma* : Vol. III, P. 183]

তিনি পূর্বেই তাঁহার বিবৃতিতে সতর্ক করিয়া দিয়া ঘোষণা করেন :

…"It was at my urgent request that Kelappan suspended his fast for three months, a fast that had wellnigh brought him to death's

door. I would be in honour bound to fast with him, if on or before the 1st January next the temple is not opened to the 'untouchables' precisely on the same terms as the 'touchables' and if it becomes necessary for Kelappan to resume his fast." [*Ibid :* P. 180]

কিন্তু এই গোলমাল সহজে মিটিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। কালিকটের রাজা জামোরিন স্বয়ং আইনগত ত্রুটির অজুহাত দিয়া রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের পক্ষ গ্রহণ করিয়া এই আন্দোলনের বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। এই সংবাদে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। ১৬ই নভেম্বর (১৯৩২), তিনি শান্তিনিকেতন হইতে কালিকটের রাজা জামোরিনকে এক পত্র দেন। এই পত্রে তিনি তাঁহাকে গুরুভায়ুর মন্দিরে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার মানিয়া লইবার অনুরোধ জানাইলেন। এই পত্রের অংশ-বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হইল :

"The attention of millions, both in our country and abroad are drawn to the Guruvayur temple and to yourself. Your duty, I submit, is clear and unequivocal. Before the end of December, and if possible earlier, you must earn the gratitude and respect of the world by removing the temple restrictions which hinder the entrance of the Depressed Classes to the place of worship in Guruvayur. Whatever legal and other steps must at once be taken to make this possible, you yourself are best fitted to initiate. Mr. Kelappan's and Mahatma Gandhi's life must be saved. Everlasting shame and ignominy will be our deserved fate if we fail on this occasion to win the cause of truth, to uphold all that is pure and just in the great religious traditions of our country. The temple of Guruvayur has become a test case, and the degree of success we achieve there in our struggle for righteousness and equity, will be the measure of the judgement of the whole world upon us. We must not, we cannot, fail to establish our spiritual integrity before the tribunal of world-conscience. I solemnly request you, at this fateful hour, not to give up your responsibility to lead us to victory. You must respond to the insistent call of humanity to open this temple of Guruvayur to members of the humblest castes of our community."

[*The Bombay Chronicle* : 9th Dec., 1932]

উল্লেখযোগ্য, এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেই এই সময় তিনি 'শুচি' কবিতাটি (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ ; দ্র. পুনশ্চ) রচনা করেন।

২রা ডিসেম্বর দেশের অন্যতম প্রবীণ নেতা এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য শান্তিনিকেতনে আসেন। শান্তিনিকেতনে আম্রকুঞ্জে তাঁহাকে সংবর্ধনা জানানো হয় এবং স্বয়ং কবিই তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানান।

ঐদিনই কবি এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সংহতি স্থাপনের আবেদন জানাইয়া একটি বিবৃতি দেন। উল্লেখযোগ্য প্রায় এক বৎসর পূর্বে হিন্দুমহাসভার একটি সিদ্ধান্তে এশিয়ার বিভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতির সংহতির ও ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে একটি সম্মেলন আহ্বান করার প্রস্তাব করা হয়। কবি উহার সমর্থনেই এই বিবৃতিটি প্রদান করেন (২রা ডিসেম্বর, ১৯৩২)। উহার অংশ-বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হইল :

"Sings of a great renewal of India's nationhood are, however, apparent today, emancipating our peoples from the age-long enslavement of superstition and sectarianism, bred by our cultural isolation and the gradual impoverishment of our national resources. The time has arrived for us now once more to vindicate India's cultural magnanimity which, breaking through the fetters of communalism and rejecting a narrow ideal of self-sufficiency, will once more make India dare to trust to her instinct of faith and fellowship and to harmonize her deepest truths of humanity with those of other peoples and nations in the light of the modern age.

"I welcome, therefore, the scheme proposed by the Hindu Mahasabha of holding a Conference in India where representatives from the different civilizations of Asia can meet to 'revive the feeling of their fundamental unity and mutual relationship.' I also support the idea of *sending a cultural deputation from India to foreign countries*." (*Italics—mine*)

[*The Modern Review* : Dec. 1933 : P. 661]

লক্ষ্য করিবার বিষয়, কবি তখনই এশিয়ার বিভিন্ন দেশে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য, কবির এই প্রস্তাব সেদিন ঠিকভাবে দেশনেতারা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করার জন্যই দেশের মানুষ সেদিন অধীর ও অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। দেশ স্বাধীন হইবার মুখে ১৯৪৭ সালেই দিল্লীতে Asian Relations Conference অনুষ্ঠিত হয় (১৮ই মে)। তাহার পর হইতেই এশিয়ার ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভারতের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হইতেছে।

পণ্ডিত মালব্যকে বিদায় দেবার দিন দুই পর কবি কলিকাতায় আসেন। উল্লেখযোগ্য, কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' পদে নিয়োগ করেন। স্থির হয়, কবিকে অধ্যাপনা করিতে হইবে না, শুধু তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি ভাষণ দিবেন। তদনুযায়ী কবি তাঁহার প্রথম ভাষণদান উপলক্ষ্যই এই সময় কলিকাতায় আসেন।

এইদিন তিনি 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' নামক লিখিত ভাষণটি পাঠ করেন। এই ভাষণে তিনি নালন্দা, বিক্রমশিলা, তক্ষশিলা প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়-

গুলির বৈশিষ্ট্যটি বর্ণনা করিয়া দেখান যে, ভারতীয় চিত্তের আন্তরিক প্রেরণায় ও স্বভাবের অনিবার্য আবেগে তাহাদের উদ্ভব হইয়াছিল। তিনি আরও বিশ্লেষণ করিয়া দেখান যে. 'আপন সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যার প্রতি সর্বজনের উদার শ্রদ্ধা প্রভূত ত্যাগ-স্বীকারে অকুণ্ঠিত সেই অকৃত্রিম শ্রদ্ধাই ছিল স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ প্রাণ-উৎস।' কিন্তু কবি সেই প্রাচীনকালের আদর্শে ফিরিয়া যাইবার কথা বলেন নাই। ইউরোপের আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যে-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে নিয়তই নব নব উদ্ভাবনের দ্বারা মানবের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া চলিয়াছে, উহাকেই সজীব ও সচেষ্টভাবে গ্রহণ এবং বিতরণ করার উপরই তিনি প্রধান গুরুত্ব দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আধুনিক ইউরোপের ও দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একটি তুলনামূলক আলোচনা করিয়া দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শোচনীয় চিন্তাদৈন্য ও গতানুগতিক যান্ত্রিক মনোবৃত্তির সমালোচনা করেন। তিনি বলেন :

"আধুনিককালে জীবনযাত্রা সকল দিকেই জটিল। নূতন নূতন নানা সমস্যার আলোড়নে মানুষের মন সর্বদাই উৎক্ষুব্ধ। নিয়ত তার নানা প্রশ্নের নানা উত্তর, তার নানা বেদনার নানা প্রকাশ সমাজে তরঙ্গিত, সাহিত্যে বিচিত্র ভঙ্গীতে আবর্তিত। ...পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাহিরের এই চিত্তমথনের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের শিক্ষার এই দুই ধারা সেখানে গঙ্গাযমুনার মতো মেলে।...

"এ সংবাদ বোধ হয় সকলেই জানেন যে, বর্তমান কালের সঙ্গে পদক্ষেপ মিলিয়ে চলবার জন্যে ইংলণ্ডের য়ুনিভার্সিটিগুলিতে সম্প্রতি বিশেষভাবে আধুনিক শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা প্রবৃত্ত। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধের পরে অক্‌স্‌ফোর্ডে দর্শন, রাষ্ট্রতত্ত্ব, অর্থনীতির আধুনিক ধারার চর্চা স্বীকার করা হয়েছে। চারিদিকে কী ঘটছে, সমাজ কোন্‌দিকে চলেছে, সেইটে যারা ভালো ক'রে জানতে চায় তাদের সাহায্য করবার জন্যে য়ুনিভার্সিটির এই উদ্যোগ।

"আমাদের দেশে বিদেশ-থেকে-পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দেশের মনের এ রকম সম্মিলন ঘটতে পারেনি। তা ছাড়া য়ুরোপীয় বিদ্যাও এখানে বদ্ধজলের মতো, তার চলৎ-রূপ আমরা দেখতে পাইনে। যে সকল প্রবীণ মত আসন্ন পরিবর্তনের মুখে আমাদের সম্মুখে তা'রা স্থির থাকে ধ্রুবসিদ্ধান্তরূপে। সনাতনত্বমুগ্ধ আমাদের মন তাদের ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করে থাকে। য়ুরোপীয় বিদ্যাকে আমরা স্থাবরভাবে পাই এবং তার থেকে বাক্য চয়ন ক'রে আবৃত্তি করাকেই আধুনিকরীতির বৈদগ্ধ্য ব'লে জানি, এই কারণে তার সম্বন্ধে নূতন চিন্তার সাহস আমাদের থাকে না। দেশের জনসাধারণের সমস্ত দুরূহ প্রশ্ন, গুরুতর প্রয়োজন, কঠোর বেদনা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন। এখানে দূরের বিদ্যাকে আমরা আয়ত্ত করি, জড় পদার্থের মতো বিশ্লেষণের দ্বারা, সমগ্র উপলব্ধির দ্বারা নয়। আমরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাক্য মুখস্থ করি এবং সেই টুক্‌রো-করা মুখস্থবিদ্যার পরীক্ষা দিয়ে নিষ্কৃতি পাই।"... [বিশ্ববিদ্যালেয়ের রূপ-শিক্ষা : পৃঃ. ২২৭-২৯]

তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও এক শ্রেণীর ইংরাজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর মানসিক দৈন্যেরও তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি স্যর আশুতোষের

দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানান। তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার যথার্থ মর্যাদা ও পঠন-পাঠনের সূচনা করিয়া যান। তাই কবি বলিলেন :

"অনেক দিন থেকে ইংরেজি বিদ্যার খাঁচা স্থাবরভাবে আমাদের দেশে রাজবাড়ির দেউড়িতে রক্ষিত ছিল। এর দরজা খুলে দিয়ে দেশের চিত্তশক্তির জন্য যে নীড় নির্মাণ করতে হবে সর্বপ্রথমে আশুতোষ সে কথা বুঝেছিলেন। প্রবল বলে এই জড়ত্বকে বিচলিত করার সাহস তাঁর ছিল। সনাতনপন্থীদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরাচরিত প্রথার মধ্যে বাংলাকে স্থান দেবার প্রস্তাব প্রথমে তাঁর মনে উঠেছিল ভীরু এবং লোভীদের নানা তর্কের বিরুদ্ধে। বাংলাভাষা আজও সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার ভাষা হবার মতো পাকা হয়ে ওঠেনি সে কথা সত্য। কিন্তু আশুতোষ জানতেন, যে, না হবার কারণ তার নিজের শক্তিদৈন্যের মধ্যে নেই, সে আছে তার অবস্থা-দৈন্যের মধ্যে। তাকে শ্রদ্ধা ক'রে, সাহস ক'রে, শিক্ষার আসন দিলে তবেই সে আপন আসনের উপযুক্ত হয়ে উঠবে। আর তা যদি একান্তই অসম্ভব ব'লে গণ্য করি, তবে বিশ্ববিদ্যালয় চিরদিনই বিলেতের আমদানি টবের গাছ হয়ে থাকবে, সে টব মূল্যবান হতে পারে, অলঙ্কৃত হতে পারে, কিন্তু গাছকে সে চিরদিন পৃথক ক'রে রাখবে ভারতবর্ষের মাটি থেকে,"... [ঐ : পৃঃ. ২৩২]

উপসংহারে কবি তাঁহাকে ঐ সম্মানিত অধ্যাপক পদে নির্বাচন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাইয়া অত্যন্ত বিনীতভাবে ঐ কার্যে তাঁহার অক্ষমতার কথা জ্ঞাপন করিয়া বলেন :

"আজ আমার শেষ বয়সে আমার কাছ থেকে কোনো রীতিমতো কর্মপদ্ধতির প্রত্যাশা করা ধর্মবিরুদ্ধ, তাতে প্রত্যবায় আছে। আমার ক্লান্ত জীবনের সায়াহ্নকালে আমাকে বাংলা অধ্যাপকের সুলভ সংস্করণরূপে চালাতে গেলে তাতে কাজেরও ক্ষতি হবে, আমার পক্ষে সেটা স্বাস্থ্যকর হবে না। আমি এই জানি যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বঙ্গবাণী-বীণাপাণির মন্দিরদ্বারে বরণ ক'রে নেবার ভার আমার 'পরে। সেই কথা মনে রেখে আমি তাকে অভিনন্দিত করি।"...

[ঐ : পৃঃ. ২৩৪]

কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া এক মুহূর্তও বিশ্রাম পাইলেন না। ব্যক্তিগতভাবে দেখা-সাক্ষাৎ ও নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিবার আহ্বান আসিতে থাকে।

এই সময় 'প্রবর্তক সঙ্ঘে'র নেতা মতিলাল রায় অস্পৃশ্যতাবর্জন আন্দোলনে অগ্রণী হইয়া চন্দননগরে বাংলাদেশের হিন্দুসম্প্রদায়ের নেতাদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন (১১ই ডিসেম্বর, ১৯৩২)। এই উদ্দেশ্যে তিনি গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া বাণী চাহিয়া পাঠান। ৮ই ডিসেম্বর, কবি কলিকাতা হইতে এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া মতিলাল রায়কে যে বাণীটি পাঠান সেটি এখানে উদ্ধৃত করা হইল :

"প্রবাদ আছে, 'কথায় চিঁড়ে ভেজে না'। তেমনি কথার কৌশলে অসম্মান অপ্রমাণ হয় না। কুকুরকে স্পর্শ করি, মানুষের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলি। বিড়াল ইঁদুর খায়, উচ্ছিষ্ট খেয়ে আসে, খেয়ে আচমন করে না, তদবস্থায় ব্রাহ্মণীর ক্রোলে এসে

বস্‌লে গৃহকর্মে অশুচি হয় না। মাছ নানা মলিন দ্রব্য খেয়ে থাকে, সেই মাছকে উদরস্থ করেন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, তাতে দেহে দোষস্পর্শ হয় না। মেথরের বৃত্তিতে যে মলিনতা, সে মলিনতা প্রতিক্ষণ আমাদের প্রত্যেকের দেহে। মা করে থাকেন মেথরের কাজ, তার দ্বারা তাঁর প্রতি ভক্তির সঞ্চার হয়। পঙ্কের মধ্যে নেমে মেছুনী মাছ ধরে, তাই বলে সকল অবস্থাতেই সে পঙ্কিল, এমন কথা বলা চলে না। পঙ্ক যেই সে ধৌত ক'রে আসে, অমনি অন্যের সঙ্গে তার পার্থক্য নেই। যাকে আমরা হীনবৃত্তি বলি, সে আমাদের প্রয়োজনে, ব্যক্তিগত আবশ্যকতা অনুসারে সেই সকল কাজ আমাদের প্রত্যেকেরই করা উচিত ছিল, আমাদের হয়ে যারা সেই দায় গ্রহণ করে, তাদের ঘৃণা করার মত ঘৃণ্যতা আর নেই। উচ্চবর্ণের মানুষ যেসব দুষ্কৃতি করে থাকে, তার দ্বারা তাদের চরিত্র কলুষিত হলেও দেবমন্দিরে তাদের অবাধ প্রবেশ এবং যদি ধনী হয় ও পদস্থ হয়, তবে তাদের সঙ্গ ও প্রসাদ আমরা আগ্রহের সহিত কামনা করি। দেহের কলুষ জলে ধুয়ে যায়, মনের কলুষ কোন বাহ্য স্নানে দূর হয় মনে করা মূঢ়তা। এই রকমের কলুষিত স্পর্শ আমাদের ঘরে বাইরে। দেহের কলুষকেই সমাজে প্রাধান্য দেওয়া সঙ্গত যদি মনে করা হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি, মলিন রোগে রক্তদূষিত ব্রাহ্মণকে কি সমাজ থেকে ও মন্দির থেকে নির্বাসিত করবার বিধি আছে? যদি থাকে, সে বিধি কি পালিত হয়? তারা তো চরিত্রের মলিনতা আপন দূষিত দেহেই বহন ক'রে থাকে। দেহ বা চরিত্র যার কলুষিত, ঘৃণা ক'রে সেই সকল ব্যক্তিবিশেষকে দূরে বর্জন করলে দোষ দিতে পারিনে, কিন্তু কোন সমগ্র জাতকে অবজ্ঞা করবার স্পর্ধা দেবতা ক্ষমা করেন না, ভারতবর্ষকেও তিনি ক্ষমা করেন নি। জন্মগত অধিকারকে যদি আমরা স্বীকার করি, তবে ইংরেজ যদি মনে করে, জন্মগত শ্রেষ্ঠতাবশতই ভারতশাসনে তাদের শাশ্বত অধিকার এবং জন্মগত নিকৃষ্টতাবশতই তাদের দাসত্ব নতশিরে চিরদিন আমাদের স্বীকার্য, তবে এ সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাকাই আমাদের শ্রেয়ঃ হয়। কোন জাতির হীনতা জন্মগত ও নিত্য, এ কথা মনে করাকে আমি অমার্জনীয় অধর্ম জ্ঞান করি। খৃস্টান-শাস্ত্রে চির-নরকবাসের কল্পনা যেমন গর্হিত, কোন জাতিকে সমাজে চির-নারকী ক'রে রাখাও তেমনি নিষ্ঠুর অন্যায়।" [প্রবর্তক : পৌষ, ১৩৩৯]

১১ই ডিসেম্বর (২৫শে অগ্রহায়ণ) কলিকাতা টাউন হলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সত্তর বর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁহাকে সংবর্ধনা জানানো হয়। রবীন্দ্রনাথ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। আচার্য রায়কে সংবর্ধনা জানাইয়া কবি বলেন:

"আমরা দুজনে সহযাত্রী। কালের তরীতে আমরা প্রায় এক ঘাটে এসে পৌঁচেছি। কর্মের ব্রতেও বিধাতা আমাদের কিছু মিল ঘটিয়েছেন।...

"আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই, যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তার ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন—কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেন নি, নিজেকে দিয়েছেন যে দানের প্রভাবে ছাত্র নিজেকেই পেয়েছে।"...

[প্রবাসী : পৌষ, ১৩৩৯ ; পৃঃ. ৪৫১-৫২]

পৌষ-উৎসবের পূর্বেই কবি কলিকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন। ইতিমধ্যে দেশের রাজনীতিক পরিস্থিতির কোনও উন্নতি ঘটে নাই। ব্রিটিশ

গভর্নমেণ্ট একদিকে যেমন প্রচণ্ড দমননীতি চালাইতে থাকে অপরদিকে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের আলোচনার জন্য বিলেতে তৃতীয় গোল-টেবিল বৈঠকের আহ্বান জানায়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান ও জাতীয় ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে পণ্ডিত মালব্য এলাহাবাদে একটি সর্বদলীয় 'ইউনিটি কন্‌ফারেন্সের' আহ্বান জানান (৩রা নভেম্বর, ১৯৩২)। এই সম্মেলনে ৬৩ জন হিন্দু, ১১ জন শিখ, ৩৯ জন মুসলমান এবং ৮ জন ভারতীয় খৃস্টান প্রতিনিধি যোগদান করেন। আপসে নিষ্পত্তির জন্য ১০ জন সদস্যকে লইয়া একটি কমিটিও গঠিত হয়। দিনের পর দিন সম্মেলনের আলোচনা চলিতে থাকে। ইহার কয়েকদিন পরেই বিলেতে তৃতীয় গোল-টেবিল বৈঠক শুরু হয় (১৭ই নভেম্বর-২৪শে ডিসেম্বর)। বলাবাহুল্য, কংগ্রেসকে এই বৈঠকে আহ্বান করা হয় নাই। তাছাড়া শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, স্যর ফিরোজ শেঠ্‌না, চিন্তামনি ও স্যর তেজবাহাদুর প্রমুখ লিবারেল নেতারা—যাঁহারা ইতিপূর্বে গোল-টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন—তাঁহাদেরও প্রথমে আমন্ত্রণ জানান হয় নাই,—এমনকি জিন্নাকেও না। এদিকে এলাহাবাদে ইউনিটি কন্‌ফারেন্সে দীর্ঘ আলোচনার পর নেতারা যখন একটা আপস-রফায় আসিবার উপক্রম করিয়াছেন ঠিক সেই সময় গোল-টেবিল বৈঠকের শেষে স্যর স্যামুয়েল হোর্ এমন একটি ঘোষণা করেন যাহার ফলে নেতাদের মধ্যে দারুণ হতাশা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত ইউনিটি কন্‌ফারেন্স ব্যর্থ হইয়া যায়। স্যর স্যামুয়েল হোরের ঘোষণায়, কেন্দ্রীয় পরিষদে মোট ব্রিটিশ ভারতীয় আসনের শতকরা ৩৩⅓ ভাগ মুসলমানদের দেওয়ার এবং সিন্ধু ও উড়িষ্যাকে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করার কথা বলা হয়।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য গোল-টেবিল বৈঠক আলোচনা কিংবা 'ইউনিটি কনফারেন্স' ধরনের কোন রাজনীতিক আপস-ঐক্য আলোচনার সম্পর্কে বড় একটা আশীবাদী ছিলেন না। এই কারণেই হয়ত সে-সম্পর্কে তিনি কোন মন্তব্য করেন নাই। ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে কবি মানুষের সত্যকার ঐক্যচেতনার আহ্বান জানাইয়া তাঁহার ভাষণে বলেন :

"আজ অনুভব করচি নূতন যুগের আরম্ভ হয়েছে। আমাদের দেশের পুরাতন ইতিহাস যদি আলোচনা করি তা হলে দেখতে পাই যে, এক-একটি নূতন নূতন যুগ এসেচে বৃহতের দিকে, মিলনের দিকে নিয়ে যাবার জন্য, সমস্ত ভেদ দূর করবার দ্বার উদ্ঘাটন ক'রে দিতে। সকল সভ্যতার আরম্ভেই সেই ঐক্যবুদ্ধি। মানুষ একলা থাকতে পারে না। তার সত্যই এই, যে, সকলের যোগে সে বড়ো হয়, সকলের সঙ্গে মিলতে পারলেই তার সার্থকতা ; এই হোলো মানুষের ধর্ম।...

"আমাদের যদি আজ শুভবুদ্ধি এসে থাকে তবে সকলকেই আমরা সম্মিলিত করবার সাধনা করব। আজ ভাববার সময় এল। মানুষের স্পর্শে অশুচিতার আরোপ ক'রে অবশেষে সেই স্পর্শে দেবতারও শুচিতানাশ কল্পনা করি। এ বুদ্ধি হারাই যে, তাতে দেবতার স্বভাবকে নিন্দা করা হয়। তখন আমরা সম্প্রদায়ের মন্দিরে অর্ঘ্য আনি, বিশ্বনাথের মন্দিরের বিশ্বদ্বার রুদ্ধ ক'রে দিয়ে তার অবমাননা করি। মানুষকে লাঞ্ছিত ক'রে হীন ক'রে রেখে পুণ্য বলি কাকে !...

"আশা করি, দুর্গতির রাত্রি-অবসানে দুর্গতির শেষ সীমা আজ পেরোবার সময়

এল। আজ নবীন যুগ এসেচে। আর্যে-অনার্যে একদা যেমন মিলন ঘটেছিল, শ্রীরামচন্দ্র যেমন চণ্ডালকে বুকে বেঁধেছিলেন, সেই যুগ আজ সমাগত। আজও যদি আমাদের মধ্যে প্রেম না আসে, কঠিন কঠোর নিষ্ঠুর অবজ্ঞা মানুষের থেকে মানুষকে দূর করে রাখে, তবে বাঁচব কী করে! রাউন্ড্ টেবিলে গিয়ে, ভোটের সংখ্যা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে? পশুর প্রতি আমরা যে ব্যবহার করি মানুষকে যদি তার চেয়েও অধম স্থান দিই, তবে সেই অধমতা কি আমাদের সমস্ত সমাজেরই বুকের উপর চেপে বসবে না?

উপসংহারে তিনি বলেন:

"মানুষকে মানুষ বলে দেখতে না পারার মতো এত বড়ো সর্বনেশে অন্ধতা আর নেই। এই বন্ধন এই অন্ধতা নিয়ে কোনো মুক্তিই আমরা পাব না। যে-মোহে আবৃত হয়ে মানুষের সত্য রূপ দেখতে পেলুম না, সেই অপ্রেমের অবজ্ঞার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাক, যা যথার্থভাবে পবিত্র তাকে যেন সত্য করে গ্রহণ করতে পারি।"

[নবযুগ—প্রবাসী : মাঘ, ১৩৩৯ : পৃঃ. ৫২৫-২৭]

২৫শে ডিসেম্বর খৃস্টজন্মোৎসবের দিন কবি শান্তিনিকেতন মন্দিরে তাঁহার ভাষণে বলেন:

"আমাদের জীবনে তার বড়দিন দৈবাৎ আসে, কিন্তু ক্রুসে বিদ্ধ তাঁর মৃত্যু সে তো আসে দিনের পর দিন।...লোভ আজ নিদারুণ, দুর্বলের অন্নগ্রাস আজ লুণ্ঠিত, প্রবলের সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যুশূলবিদ্ধ সেই কারুণিকের জয়ধ্বনি করচে, অভ্যস্ত বচন আবৃত্তি ক'রে। তবে কিসের উৎসব আজ?...আজও তিনি মানুষের ইতিহাসে প্রতিমুহূর্তে ক্রুসে বিদ্ধ হচ্ছেন।" [প্রবাসী : মাঘ, ১৩৩৯ : পৃঃ. ৪৬৫-৬৬]

পৌষ-উৎসবের কয়েকদিন পরই কবি পুনরায় কলিকাতা আসেন। এই সময় স্যর ড্যানিয়েল হ্যামিলটন কবিকে তাঁহার গোসাবা আদর্শ কৃষি-উপনিবেশ পরিদর্শন করিবার আমন্ত্রণ জানান। বাংলাদেশে কৃষি-সমবায় আন্দোলনে তাঁহার অবদান কম নহে, একথা আজ প্রায় সকলেরই জানা আছে। স্মরণ রাখা দরকার, কয়েক বৎসর পূর্বে (১৯২৮) শ্রীনিকেতনে বঙ্গীয় সমবায় সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। স্যর হ্যামিলটনের নেতৃত্বে কৃষি-সমবায় কি রকম সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষভাবে জানিবার জন্য কবির অদম্য আগ্রহ ও ঔৎসুক্য ছিল। ২৯শে ডিসেম্বর কবি গোসাবা পরিদর্শনে যান। সেখানে দুই দিন থাকিয়া গোসাবা কৃষিকেন্দ্রটির যাবতীয় প্রচেষ্টা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁটিয়া দেখিবার চেষ্টা করেন। পরদিন বিদায় লইবার কালে কবি এক বিবৃতি-বাণীতে বলেন:

"Although I am weak in health and somewhat tired after the journey by train and boat, I am very pleased to come here since I am keenly interested in all work connected with rural uplift. As some of you perhaps know, I am myself trying to solve the rural problems around my institution and am fully aware of how difficult these problems are.

"My friend Sir Daniel Hamilton comes from a country which is

far away, but he has the best interest of the people at heart and it is by this that he has made our people his own. This is the surest way of achieving unity between the East and the West.

"Sir Daniel has dedicated himself to the welfare of his ryots. I hope that you also will respond to his call and make his effort a complete success.

"All over this country we see poverty disease and destruction. A real effort is being made here to solve these problems through co-operative organization. If you succeed, you will set an example for the whole of India, because if we can solve these problems in one place, by our concentrated effort, others will come forward to follow the example and it will spread throughout the country."

[*Amrita Bazar Patrika* : January 2, 1933]

গোসাবা হইতে ফিরিবার পথে,—৩১শে ডিসেম্বর, কবি বিড়লাদের 'কেশরাম কটন্ মিল'টি পরিদর্শন করেন। সেখানকার মিল কর্তৃপক্ষ ও প্রায় বার হাজার শ্রমিক-কর্মচারী কবিকে বিপুল অভ্যর্থনা জানান। কবি কারখানার স্পিনিং ও উইভিং বিভাগ এবং শ্রমিকদের হাসপাতাল-প্রসূতিসদন ইত্যাদি পরিদর্শন করেন।

জানুয়ারির (১৯৩৩) প্রথমভাগেই কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন। তার দিন কয়েক পরেই পারস্য সরকারের পক্ষ হইতে অধ্যাপক পুর-এ-দাউদ্ বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনার জন্য আসেন। স্মরণ রাখা দরকার, কবির পারস্য ভ্রমণ-কালেই পারস্য সরকার ভারত-পারস্য সাংস্কৃতিক সম্পর্ক পুনস্থাপনের উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতীতে পারস্য-সংস্কৃতি শিক্ষার জন্য একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টির প্রস্তাব দেন (১৪ই মে, ১৯৩২)। কবি তৎক্ষণাৎ সানন্দে সে-প্রস্তাবে তাঁহার সম্মতি জানান। তদনুসারে পারস্যের শিক্ষা-মন্ত্রণা-বিভাগ অধ্যাপক পুর-এ-দাউদকে শান্তিনিকেতনে প্রেরণ করেন। ৯ই জানুয়ারি (১৯৩৩), শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক পুর-এ-দাউদকে এক সংবর্ধনা-সভায় সাদর আহ্বান জানাইয়া কবি বলিলেন :

"হে পারস্য সভ্যতার বার্তাবহ, আমরা আপনাকে শান্তিনিকেতন তথা ভারতের পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করি। ভারতবর্ষের শিল্পকলা, সাহিত্য, দর্শনের ভিতর দিয়া আপনাদের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ। ভাষা ও ব্যবধানের দূরত্ব সত্ত্বেও এশিয়ার আত্মপ্রকাশের দিন আপনাদের সহিত একসূত্রে ভারত তাহার চিন্তাধারা ও আত্মানুভূতির সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিয়াছিল।

"বহু শতাব্দীর বিস্মৃতির অতল গর্ভে ডুবিয়া গিয়া ভারত ও ইরানের বন্ধুত্ব লোপ পাইতে বসিয়াছিল, কিন্তু এসিয়ার এই নব জাগরণে আমাদের সেই পূর্ব সম্বন্ধ ফিরিয়া আসিয়াছে।

"আপনি এসিয়ার নব-জাগরণের বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন। বহুদিন পূর্বে যে সত্যের আলো ইরান ও ভারত জ্বালিয়াছিল, তাহা আবার আমাদিগকে

প্রজ্বলিত করিতে হইবে। কিছু পূর্বে আমরা যে স্তোত্রটি পাঠ করিয়াছিলাম, উহা ঐ ভাবেরই দ্যোতক। আমাদের অন্তর আবার একীভূত হইবে এবং আত্মজ্ঞানের সন্ধানে এসিয়ার আকাশ বাতাসকে আলোড়িত করিবে।"

ইরানরাজকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার পর কবি তাঁহার ভাষণের উপসংহারে বলেন :

"এসিয়ার লুপ্ত গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমরা এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। ইরান ও ভারতের সমচেষ্টায় মানবসভ্যতা রচনায় আজ এসিয়াকে তাঁহার নিজস্ব সম্পদ দিতে হইবে। সেই স্মরণীয় মুহূর্তকে স্মরণ করিয়া আমাদের ইরান বন্ধুকে অভিনন্দিত করিতে আজ আমরা গর্বানুভব করিতেছি।"

এই মানপত্রের প্রত্যভিভাষণে অধ্যাপক পুর-এ-দাউদ্ তাঁহার ভাষণের উপসংহারে বলেন :

"আমি মনে করি যে, অনেকেই আমার ন্যায় ভারত সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করিবেন, ভারত আমাদের প্রতিবেশী, ভারতবাসীদের রক্ত আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে। আমরা এক বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবি করি। আমাদের পরস্পরের অবহেলার দরুন বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল। আমাদের প্রাচীন প্রীতি ও মৈত্রীভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে। ঘটনাচক্রে আমরা অপরিচিত হইয়া গিয়াছি। আজ আমাদের বহুদিনের ঘুম ভাঙিয়া আবার মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে।...

"কবিগুরুর পারস্যভ্রমণ ভারতের প্রতি পারস্যবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আমার প্রিয় জন্মভূমি যেমন আপনাদিগকে তাহাদের সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানদান করিবার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে অবগত হইবার জন্যও আগ্রহান্বিত।

"আমি পুনরায় বলিতেছি যে, ইরান সভ্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্যই এখানে আমি আসি নাই, ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানানুসন্ধানের জন্য এখানে আসিয়াছি এবং ইহার দ্বারা বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচারের সহায়তা করিতে চেষ্টিত হইয়াছি।" [আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৮শে পৌষ, ১৩৩৯ : ১২ই জানুয়ারী, ১৯৩৩]

অধ্যাপক পুর-এ-দাউদের আগমনে শান্তিনিকেতনে তথা ভারতে আন্তর্জাতিক শিক্ষা-সাংস্কৃতিক মিলন ও আদানপ্রদানের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা,—এই সময় বার্নার্ড শ' সস্ত্রীক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করিয়া বোম্বাই বন্দরে পৌঁছান। এই সংবাদ পাইয়া কবি তাঁহাকে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে সাদর আহ্বান এবং শান্তিনিকেতন পরিভ্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়া (১০ই জানুয়ারি) নিম্নলিখিত তারবার্তাটি প্রেরণ করেন :

"Welcome to India. Our cordial invitation to Santiniketan. Shall feel deeply happy if you come. Warmest regards you both."

এই তারবার্তা পাওয়ার পর ঐদিনই বার্নার্ড শ' কবিকে জানান যে, এই যাত্রায় তিনি ভারতবর্ষ পরিভ্রমণের কোনো পরিকল্পনা করিয়া আসেন নাই এবং এই কারণে তাঁহার আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিতেছেন না বলিয়া দুঃখপ্রকাশ করেন। বার্নার্ড শ'র পত্রটি ছিল এই :

"Unfortunately I am not really visiting India, but the ship in which I am going round the world to get a little rest and do a little work has to put in at Bombay and Colombo to replenish her tanks and on such occasions I step ashore for a few hours and wonder about the streets and into such temples as are open to European untouchables.

"The organiser of the tour urge me to see India by spending five days and night in a crowded railway carriage and being let out for a few minutes occasionally to lunch at an hotel and see the Taj Mahal, but I am too old a traveller to be taken by such baits and too old a man (76½) to endure such hardships without expiring. My only regret is that I shall be unable to visit you. My consolation is that the present situation in India won't bear being talked about. I understand it only too well." [*Madras Mail :* January 19, 1933]

বোম্বাইয়ে থাকাকালে বার্নার্ড শ ভারতবর্ষের রাজনীতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যে একেবারে মন্তব্য করেন নাই, তাহা নহে।

সাংবাদিকরা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন :

"ভারতের সমস্যা ভারতবাসীদিগকেই সমাধান করিতে হইবে, বিদেশীরা করিবে না। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সহিত যদি আপনাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ফ্রান্স, জার্মানী, স্কাণ্ডেনেভিয়া বা আমেরিকা পরোপকারের মহদুদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ আপনাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবে, এরূপ প্রত্যাশা মাত্রই করিবেন না। তাঁহারা আপনাদের সাহায্যার্থ একটি অঙ্গুলিও উত্তোলন করিবেন না।"

গান্ধীজী সম্পর্কে শ' বলেন :

"আমি ভারতবর্ষের সকলকে জানি না। তবে কিনা আমি মনে করি যে, তিনি সর্বাপেক্ষা অকপট লোক, কিন্তু সকলেই কিছু আর গান্ধী নহে। বহুযুগ পরে একটা গান্ধীর আবির্ভাব হয়। আপনাদের পক্ষে তাঁহাকে বুঝিতে পারা খুবই কষ্টকর। আপনারা দেখিতেছেন যে, তিনি আপনাদের প্রতি এত বিরক্ত হইয়া পড়েন যে, তিনি সর্বদাই উপবাসে মরার ভয় দেখান। আমার সহিত যদি তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তবে আমি বলিব, এ সমস্ত ছাড়ান দিন, এ সব আপনার কাজ নহে। পৃথিবীটা যে তাঁহার মত নহে, সে কথা বুঝিতে তাঁহার অনেক দিন লাগে। মহাত্মা গান্ধীর মত লোক যে বর্তমান যুগেও আছেন, তাহা জানিতে পারা একটা আনন্দের কথা।"

নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বিদ্রূপ ও রহস্য করিয়া বলেন :

"অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ একেবারে বাজে কথা। যদি সমস্ত জাতিকে অস্ত্রহীন করা যায়, তাহা হইলে তাহারা হাতে হাতে লড়াই করিবে। যদি আর একটা যুদ্ধ হয় তবে ভালই হইবে। পঞ্চাশ কোটি লোককে অনায়াসে বলি দেওয়া যায়। লোকে মানুষ

মারিতেই ভালবাসে। যে অপরকে হত্যা করে লোকে তাহার প্রশংসা করে। মহাত্মা গান্ধী যদি ৬০ লক্ষ লোককে হত্যা করিতে পারেন তাহা হইলে লোকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিবে।"—এ. পি.

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৬শে পৌষ, ১৩৩৯ : ১০ই জানুয়ারী, ১৯৩৩]

বলাবাহুল্য, যুদ্ধের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন কিংবা শান্তি-আন্দোলনের উপর বার্নার্ড শ'র বড় একটা আস্থা ছিল না।

মানুষের ধর্ম

১৯৩৩ সালের জানুয়ারির মধ্যভাগেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কমলা বক্তৃতা' উপলক্ষে কবিকে পুনরায় কলিকাতা আসিতে হয়। কয়েকমাস পূর্বেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কবিকে এই বক্তৃতার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন। পূজা অবকাশের সময় থেকেই কবি বক্তৃতাগুলি রচনা শুরু করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল, 'মানুষের ধর্ম'। জানুয়ারির ১৬, ১৮ ও ২০শে তারিখে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে এই বক্তৃতামালা বা প্রবন্ধগুলি পাঠ করেন। ইহার অল্পকাল পরেই বক্তৃতাগুলি 'মানুষের ধর্ম' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'মানব সত্য' নামে শান্তিনিকেতনে কথিত আর একটি বক্তৃতাও এই গ্রন্থের শেষে সংযোজিত হইয়াছে।

'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা আমাদের বিষয়ের এক্তিয়ার বহির্ভূত। তবুও ইহার মূল কথাটি আমাদের অবশ্যই আলোচনা করিতে হইবে। কেননা রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিক চিন্তার উৎসগুলি তাঁহার দার্শনিক প্রত্যয়ের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে।

অধুনাকালে 'দার্শনিক' অর্থে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি রবীন্দ্রনাথ তেমন কোন দার্শনিক ছিলেন কিনা,—তিনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নূতন কোন দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন কিনা, তাহা আলোচনা ও বিতর্কের বিষয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও বলা যায়, কবির নিজস্ব দার্শনিক প্রত্যয় ও মত ছিল। কবি অবশ্য বহুবার বলিয়াছেন, তিনি দার্শনিক কিংবা তত্ত্বজ্ঞানী নহেন, তিনি কবি।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ প্রথমত অধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদী কবি ছিলেন। ঊনিশ শতকের বাংলার এবং তাঁহার পিতার ও পারিবারিক অধ্যাত্মসাধনার পরিবেশেই তাঁহার কবি মানসের জন্ম ও বিকাশ। পরবর্তীকালে আধুনিক বিজ্ঞান ও আধুনিক পাশ্চাত্য-দর্শনের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার মানসিক গঠন ও ধাতুগত বৈশিষ্ট্যে উহা তাঁহাকে বিশেষ আকর্ষণ করিলেও বিজ্ঞানকে পুরোপুরি গ্রহণ বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করিতে পারেন নাই। বাল্যের শিক্ষা ও পারিবারিক ঔপনিষদিক অধ্যাত্মসাধনার প্রভাব তাঁহার মনে এতখানি দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, শেষ বয়স পর্যন্তও তিনি উহার প্রভাব সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে বা প্রাচীনের বন্ধন সম্পূর্ণ ছিন্ন করিতে পারেন নাই। এই কারণেই আধুনিক

বস্তুবাদী দর্শনকে বাদ দিয়াই আধুনিক বিজ্ঞানকে গ্রহণ করার দিকেই তাঁহার ঝোঁকটা ছিল বেশি।

অর্থাৎ কবিমানসে এ বিষয়ে স্ববিরোধিতা থাকিলেও অন্তরে অন্তরে কোথায় যেন তিনি ভাববাদী ও অধ্যাত্মবাদীই রহিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং দর্শনের যে-সব মৌল-প্রশ্ন,—অর্থাৎ বস্তু ও গতি (Matter & Motion), সত্তা ও পরমসত্তা, অহং, পরাহং ও 'সোহহং' (Ego & Super-ego), মননশক্তি ও চিন্তা-চেতনা এবং মানব-সভ্যতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—এই সব কিছুকেই তিনি ভাববাদী ও অধ্যাত্মদর্শনের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিবেন, ইহা খুবই স্বাভাবিক। এই কারণেই ঐসব প্রশ্নে আধুনিক বৈজ্ঞানিক দর্শনসম্মত ব্যাখ্যা কবির নিকট আশা করা বৃথা। অবশ্য পাশ্চাত্য-দর্শনের যুক্তিবাদ এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও তত্ত্বগুলির সম্পর্কে তাঁহার প্রবল আগ্রহ-আকর্ষণ ছিল। বিজ্ঞান যেখানে বস্তুজগৎ বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য-উদ্ঘাটনে নিয়োজিত,—এবং বিশেষত যন্ত্র ও কারিগরী-বিজ্ঞান যেখানে মানুষের সুখ-সুবিধা ও পার্থিব সম্পদ আহরণে এবং মানব কল্যাণে নিয়োজিত, উহাকেও তিনি বারংবার সাদর আহ্বান জানাইয়াছেন, এ কথাও সত্য; কিন্তু এসব সত্ত্বেও তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক দর্শন-চেতনা কিংবা বৈজ্ঞানিক মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী (Scientific attitude and outlook) অর্জন করিতে পারেন নাই। বস্তুতপক্ষে তিনি তাঁহার প্রিয় ও সযত্ন লালিত আধ্যাত্মিক প্রত্যয়গুলি এবং বেদ-উপনিষদোক্ত ঋষিবাক্যগুলির যথার্থতা প্রতিপন্ন করার জন্যই উহার সমর্থনে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহার অপূর্ব ভাষার ব্যঞ্জনা ও রচনাশৈলীর সাহায্যে। বিজ্ঞানের এমন সাহিত্যিকী ও কাব্যধর্মী ব্যাখ্যা অন্তত এদেশে আর কাহারও পক্ষে সম্ভব হইয়াছে বলিয়া জানা নাই। কিন্তু এই প্রচেষ্টার মূলে আছে—কবিমানসের মূল দুটি পরস্পরবিরোধী সত্তা ও প্রবণতার সমন্বয়-সাধনের প্রয়াস। যথাস্থানে আমরা এ আলোচনায় আসিব।

'মানুষের ধর্ম' বক্তৃতামালায় কবি প্রধানত মানুষের মৌল সত্তা এবং তাহার বিশেষ গুণাবলী ও প্রবণতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভাবে, ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে, দেশীয় ও বিশ্বজনীন ভাবে মানুষ আসলে কি—তাহার অভিব্যক্তির শক্তিই বা কি এবং কোনদিকে তাহা অগ্রসর হইতেছে, তাহাই তাঁহার প্রধান আলোচ্য-বিষয়। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের ভূমিকাতেই কবি তার মানুষের দ্বৈত বা দ্বৈধ সত্তার ব্যাখ্যা করিয়া বলেন :

"মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেইখানে আপন ব্যক্তিগত জীবনযাত্রানির্বাহে তার জ্ঞান, তার কর্ম, রচনাশক্তি একান্ত ব্যাপৃত। সেখানে সে জীবরূপে বাঁচতে চায়।

"কিন্তু, মানুষের আর-একটা দিক আছে যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবনযাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু সেই অমরতা।…সেখানে জ্ঞান উপস্থিত-প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়, কর্ম স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন সেই জীবনে বাঁচতে চায়।

"স্বার্থ আমাদের যে-সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীবপ্রকৃতিতে; যা আমাদের ত্যাগের দিকে তপস্যার দিকে নিয়ে যায়, তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।

"কোন্ মানুষের ধর্ম। এতে কার পাই পরিচয়। এ তো সাধারণ মানুষের ধর্ম নয়, তাহলে এর জন্যে সাধনা করতে হত না।

"আমাদের অন্তরে কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জানানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব।···সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম ক'রে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মানুষের উপলব্ধি সর্বত্র সমান নয় ও অনেক স্থলে বিকৃত ব'লেই সব মানুষ আজও মানুষ হয় নি। কিন্তু, তাঁর আকর্ষণ নিয়ত মানুষের অন্তর থেকে কাজ করছে বলেই আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশায় ও প্রয়াসে মানুষ কোথাও সীমাকে স্বীকার করছে না।"···

[মানুষের ধর্ম : পৃঃ. ১-২]

এখানে কবি 'সর্বজনীন সর্বকালীন মানব'-এর যে উল্লেখ করিয়াছেন—তাহার অর্থ এই নয় যে, মানুষের আদিম জান্তবযুগের ইতিহাসকে তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। পরন্তু বিজ্ঞানের এভল্যুশন বা ক্রমবিকাশতত্ত্বের তিনি নিজস্ব আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ক্রমবিকাশধারায় এক বিশেষ পর্যায়ে মানুষের মননশক্তি ও চেতনা বিকাশের সাথে সাথে অর্থাৎ 'অধ্যাত্ম-উপলব্ধির' সূচনা কাল হইতে কি ভাবে মানুষ জীবজগৎ হইতে আপনাকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের মহিমায় উপলব্ধি করিয়া উন্নীত ও সংস্কৃত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, সে-সম্পর্কে কবি এই গ্রন্থে অত্যন্ত মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :

"অভিব্যক্তি চলছিল প্রধানত প্রাণীদের দেহকে নিয়ে, মানুষ এসে সেই প্রক্রিয়ার সমস্ত ঝোঁক পড়ল মনের দিকে। পূর্বের থেকে মস্ত একটা পার্থক্য দেখা গেল। দেহে দেহে জীব স্বতন্ত্র; পৃথকভাবে আপন দেহরক্ষায় প্রবৃত্ত, তা নিয়ে প্রবল প্রতিযোগিতা। মনে মনে সে আপন মিল পায় এবং মিল চায়, মিল না পেলে সে অকৃতার্থ। তার সফলতা সহযোগিতায়। বুঝতে পারে, বহুর মধ্যে সে এক; জানে, তার নিজের মনের জানাকে বিশ্বমানব যাচাই করে, প্রমাণিত করে, তবে তার মূল্য। দেখতে পায়, জ্ঞানে কর্মে ভাবে যতই সকলের সঙ্গে সে যুক্ত হয় ততই সে সত্য হয়। যোগের এই পূর্ণতা নিয়েই মানুষের সভ্যতা।···এই সর্বজনীন মনকে উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ করে উপলব্ধি করাতেই মানুষের অভিব্যক্তির উৎকর্ষ। মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসীমাকে পেরিয়ে বৃহৎমানুষ হয়ে উঠছে, তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎমানুষের সাধনা। এই বৃহৎমানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশের নানা সমাজের নানা জাত, অন্তরে আছে এক মানব।"

[ঐ : পৃঃ. ১-২]

মানুষের এই দ্বৈধ সত্তার সহজ ব্যাখ্যা করিয়া কবি বলিলেন :

"মানুষ আছে তার দুই ভাবকে নিয়ে, একটা তার জীবভাব, আর-একটা বিশ্বভাব। জীব আছে আপন উপস্থিতকে আঁকড়ে, জীব চলছে আশু প্রয়োজনের কেন্দ্র

প্রদক্ষিণ করে। মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে-সত্তা সে আছে আদর্শকে নিয়ে। এই আদর্শ অন্নের মতো নয়, বস্ত্রের মতো নয়। এ আদর্শ একটা আন্তরিক আহ্বান, এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ। কোন্‌দিকে নির্দেশ। যেদিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যেদিকে তার পূর্ণতা, যেদিকে ব্যক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেছে, যেদিকে বিশ্বমানব।"…

এই প্রসঙ্গে কবি শারীর-বিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত সুন্দর উপমা দিয়াছেন :

"মানবদেহে বহুকোটি জীবকোষ ; তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জন্ম, স্বতন্ত্র মরণ। অনুবীক্ষণযোগে জানা যায়, তাদের প্রত্যেকের চারিদিকে ফাঁক। এক দিকে এই জীবকোষগুলি আপন আপন পৃথক জীবনে জীবিত, আর-এক দিকে তাদের মধ্যে একটি গভীর নির্দেশ আছে, প্রেরণা আছে, একটি ঐক্যতত্ত্ব আছে, সেটি অগোচর পদার্থ ; সেই প্রেরণা সমগ্র দেহর দিকে, সেই ঐক্য সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত। মনে করা যেতে পারে, সেই সমগ্র দেহের উপলব্ধি অসংখ্য জীবকোষের অগম্য, অথচ সেই দেহের পরমরহস্যময় আহ্বান তাদের প্রত্যেকের কাছে দাবি করছে তাদের আত্মনিবেদন।…

"মানুষের দেহের জীবকোষগুলির যদি আত্মবোধ থাকত তাহলে একদিকে তারা ক্ষুদ্রভাবে আপনাদেরকে স্বতন্ত্র জানত, আবার বৃহৎভাবে নিজেদেরকে জানত সমগ্র দেহে। কিন্তু জানত অনুভবে, কল্পনায় ; সমগ্র দেহকে প্রত্যক্ষত ও সম্পূর্ণত জানা সম্ভব হত না।…আরও একটা প্রত্যক্ষাতীত পদার্থ রয়েছে যা সর্বদেহব্যাপী কল্যাণ, যাকে বলি স্বাস্থ্য, যাকে বিশ্লেষণ করা যায় না। তা ছাড়াও সমগ্র জীবনরক্ষার গভীরতর চেষ্টা প্রত্যেক জীবকোষের আছে, যে-চেষ্টা রোগের অবস্থায় সর্বদেহের শত্রুহননে নিজেদের আত্মহানিও ঘটায়, দেশপ্রেমিক যেমন করে দেশের জন্যে প্রাণ দেয়। এই চেষ্টার রহস্য অনুসরণ করলেই বোঝা যেতে পারে, এই ক্ষুদ্র দেহগুলির চরম লক্ষ্য অর্থাৎ পরম ধর্ম এমন কিছুকে আশ্রয় করে যাকে বলব তাদের বিশ্বদেহ।"

[ঐ : পৃঃ. ২-৫]

এইভাবে কবি তাঁহার বক্তব্যবিষয়কে পরিষ্কার ব্যাখ্যা করার জন্য একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও উপমা দিয়াছেন, অপরদিকে বেদ-উপনিষদাদি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ হইতে অজস্র মন্ত্র ও শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়াছেন।

মনুষ্যত্বের 'পরে কবির ছিল অবিচল আস্থা। শুধু তাহাই নয়, মানুষকে তিনি বিরাট মহিমান্বিত ভূমিকায় স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন। মানুষকে তিনি কখনও ক্ষুদ্র, দুর্বল ও অসহায়রূপে দেখেন নাই পরন্তু মানুষের অসীম আত্মিকশক্তিতে তিনি বিশ্বাস করিতেন আর এই বিশ্বাসের পশ্চাতে তাঁহার মনে যে দৃঢ় প্রত্যয়টি ছিল তাহা হইল যে, মানুষ একটি অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন জীব। কেন মানুষেরই অধ্যাত্মবোধ জন্মিল—অন্যান্য জীবজন্তুর কেন তাহা জন্মিল না, এসব প্রশ্ন লইয়া তিনি মাথা ঘামান নাই। তিনি দেখান, মানুষের জৈব সত্তা আছে বটে কিন্তু মানুষ তাহার এই জৈব সত্তায় সন্তুষ্ট নয়,—পরন্তু তাহাকে ঘৃণা ও অস্বীকার করিতে চায়। সে যে তাহার জীবসত্তা থেকেও মহান, শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর এই কথাটিই মানুষের সভ্যতার অনন্ত সাধনার প্রতিশ্রুতি। মানুষের এই অনন্ত সাধনার স্বরূপটি ব্যাখ্যা করিয়া কবি বলিলেন :

…"মানুষের যে-কাজটাকে লীলা বলা যায় অর্থাৎ যা তার কোনো দরকারের আমলে আসে না, কথায় কথায় সেইটেই হয়ে ওঠে মুখ্য, ছাড়িয়ে যায় তার প্রাণযাত্রাকে। সেইটের দ্বারাই তার শ্রেষ্ঠতার পরিচয়। অবকাশের ভূমিকায় মানুষ সর্বত্রই আপন অমরাবতী রচনায় ব্যস্ত, সেখানে তার আকাশ-কুসুমের কুঞ্জবন। এইসব কাজে সে এত গৌরব বোধ করে যে চাষের খেতে তার অবজ্ঞা।…বলা বাহুল্য, দূরতম তারায় মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন, সেই তারার যে-আলোকরশ্মি চার-পাঁচ হাজার এবং ততোধিক বৎসর ধরে ব্যোম-বিহারী গৃহত্যাগী, তারই দৌড় মাপতে তার দিন যায়, তার রাত কাটে।…

"দেহের দিক থেকে মানুষ যেমন ঊর্ধ্বশিরে নিজেকে টেনে তুলেছে খণ্ডভূমির থেকে বিশ্বভূমির দিকে, নিজের জানাশোনাকেও তেমনি স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে জৈবিক প্রয়োজন থেকে, ব্যক্তিগত অভিরুচির থেকে। জ্ঞানের এই সম্মানে মানুষের বৈষয়িক লাভ হোক বা না হোক, আনন্দ লাভ হল।…"

অন্যান্য অধ্যাত্মবাদীর মত কবির বিশ্বাস ছিল, মানুষের জীবন ও অস্তিত্বের মধ্যে এক গভীর রহস্য আছে। যেন 'সৃষ্টিকর্তা'র নির্দেশে মানুষ পৃথিবীতে আসিয়াছে সেই অপূর্ব গভীর রহস্যটি উদ্ঘাটন করিতে। এই তাহার পূর্বনির্দিষ্ট মহান ভূমিকা :

…"কিন্তু মানুষ কী করে হবে মানুষের মতো তাই নিয়ে বর্বরদশা থেকে সভ্য অবস্থা পর্যন্ত তার চিন্তা ও প্রয়াসের অন্ত নেই। সে বুঝেছে, সে সহজ নয়, তার মধ্যে একটা রহস্য আছে, এই রহস্যের আবরণ উদ্ঘাটিত হতে হতে তবে সে আপনাকে চিনবে। শত শত শতাব্দী ধরে চলেছে তার প্রয়াস। কত ধর্মতন্ত্র, কত অনুষ্ঠানের পত্তন হল ; সহজ প্রবৃত্তির প্রতিবাদ করে নিজেকে সে স্বীকার করাতে চায় যে, বাইরে সে যা ভিতরে ভিতরে তার চেয়ে সে বড়ো। এমন কোনো সত্তার স্বরূপকে সে মনের মধ্যে গ্রহণ করবার চেষ্টা করছে, আদর্শরূপে যিনি তার চেয়ে বড়ো অথচ তার সঙ্গে চিরসম্বন্ধযুক্ত। এমনি করে বড়ো ভূমিকায় নিজের সত্যকে স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে তার অহেতুক আগ্রহ।…

"মানুষের দায় মহামানবের দায়, কোথাও তার সীমা নেই। অন্তহীন সাধনার ক্ষেত্রে তার বাস। জন্তুদের বাস ভূমণ্ডলে, মানুষের বাস সেইখানে যাকে সে বলে তার দেশ। দেশ কেবল ভৌমিক নয়, দেশ মানসিক। মানুষে মানুষে মিলিয়ে এই দেশ জ্ঞানে জ্ঞানে, কর্মে কর্মে।…যে তপস্বীরা অন্তহীন ভবিষ্যতে বাস করতেন, ভবিষ্যতে যাঁদের আনন্দ, যাঁদের আশা, যাঁদের গৌরব, মানুষের সভ্যতা তাঁদেরই রচনা। তাঁদেরই স্মরণ করে মানুষ আপনাকে জেনেছে অমৃতের সন্তান ; বুঝেছে যে তার দৃষ্টি, তার সৃষ্টি, তার চরিত্র মৃত্যুকে পেরিয়ে।…তাঁদের চিন্তা, তাঁদের কর্ম, জাতিবর্ণ-নির্বিচারে সমস্ত মানুষের। সবাই তাঁদের সম্পদের উত্তরাধিকারী। তাঁরাই প্রমাণ করেন, সব মানুষকে নিয়ে, সব মানুষকে অতিক্রম ক'রে, সীমাবদ্ধ কালকে পার হয়ে এক-মানুষ বিরাজিত। সেই মানুষকেই প্রকাশ করতে হবে, শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হবে বলেই মানুষের বাস দেশে। অর্থাৎ, এমন জায়গায় যেখানে প্রত্যেক মানুষের বিস্তার খণ্ড খণ্ড দেশকালপাত্র ছাড়িয়ে—যেখানে মানুষের

বিদ্যা, মানুষের সাধনা সত্য হয় সকল কালের সকল মানুষকে নিয়ে।"

[ঐ : পৃঃ ৮-১২]

মানুষের এই মহান আত্মস্বরূপ উপলব্ধির অনন্ত যাত্রাপথটির সম্পর্কে কবি তাঁহার অনবদ্য ভাব ও ভাষায় বর্ণনা করিয়া বলিলেন :

..."পূর্ণ পুরুষের অধিকাংশ এখনও আছে অব্যক্ত। তাঁকেই ব্যক্ত করবার প্রত্যাশা নিয়ত চলেছে ভবিষ্যতের দিকে। **পূর্ণপুরুষ আগন্তুক। তাঁর রথ ধাবমান; কিন্তু তিনি এখনও এসে পৌঁছন নি।** বরযাত্রীরা আসছে, যুগের পর যুগ অপেক্ষা করছে, বরের বাজনা আসছে দূর থেকে। তাঁকে এগিয়ে নিয়ে আসবার জন্যে দূতেরা চলেছে দুর্গম পথে। এই যে অনিশ্চিত আগামীর দিকে মানুষের এত প্রাণপণ আগ্রহ—এই যে অনিশ্চিতের মধ্যে, অনাগতের মধ্যে, তার চিরনিশ্চিতের সন্ধান অক্লান্ত—তারই সংকটসংকুল পথে মানুষ বার বার বাধা পেয়ে ব্যর্থ হয়েও যাত্রা বন্ধ করতে পারলে না। এই অধ্যবসায়কে বলা যেতে পারত পাগলামি, কিন্তু মানুষ তাকেই বলেছে মহত্ত্ব।..."

প্রশ্ন হবে, পূর্ণপুরুষ আগন্তুক কে; বরযাত্রীরাই বা কাহারা? মরমীয়া বৈষ্ণব লীলাবাদের সঙ্গে ইহার পার্থক্য কোথায় এবং কতটুকু।

আর একটি জায়গায় তিনি বলিলেন :

..."মানুষের সত্তায় দ্বৈধ আছে। তার যে-সত্তা জীবসীমার মধ্যে, সেখানে যেটুকু আবশ্যক সেইটুকুতেই তার সুখ। কিন্তু অন্তরে অন্তরে জীবমানব বিশ্বমানবে প্রসারিত। সেই দিকে সে সুখ চায় না, সে সুখের বেশি চায়, সে ভূমাকে চায়। তাই সকল জীবের মধ্যে মানুষই কেবল অমিতাচারী। তাকে পেতে হবে অমিত, তাকে দিতে হবে অমিত, কেননা তার মধ্যে আছে অমিতমানব। সেই অমিতমানব সুখের কাঙাল নয়, দুঃখভীরু নয়। সেই অমিতমানব আরামের দ্বার ভেঙে কেবলই মানুষকে বের করে নিয়ে চলেছে কঠোর অধ্যবসায়ে। আমাদের ভিতরকার ছোটো মানুষটি তা নিয়ে বিদ্রূপ ক'রে থাকে; বলে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। ...বিশ্বের মানুষটি ঘরের মানুষকে পাঠিয়ে দেন বুনো মোষটাকে দাবিয়ে রাখতে, এমন কি, ঘরের খাওয়া যথেষ্ট না জুটলেও।"

[ঐ : পৃঃ ১৭-১৮]

জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ ও মরমীয়াদের প্রেমমার্গ,—ইহাদের কোনটির প্রভাব কবিমানসে বেশি ছিল,—কোনটির প্রতি তাঁহার বেশি আকর্ষণ ছিল, কিংবা তাঁহার 'বিশ্বদেবতা' ও 'জীবন-দেবতা'র চিন্তার মধ্যে কোন অসংগতি ছিল কিনা, তাহার আলোচনার স্থান অন্যত্র। এখানে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কবি সমগ্র বিশ্বব্যাপী এক অখণ্ড নিখিল মানবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস মানুষ তাহার এই মহান আত্মস্বরূপকে উপলব্ধি করিয়া যুগ যুগ ধরিয়া আপনাকে সংস্কৃত ও ব্যক্ত করার সাধনা করিতেছে। জ্ঞানে, প্রেমে, ভালোবাসায় ও কর্মে মানুষ তাহাকে উপলব্ধি করিয়া তাহাকে মহীয়ান করিয়া তুলিবার জন্যই অশ্রান্ত যাত্রা করিয়াছে। তিনি বলিলেন :

..."মানুষ অশ্রান্ত যাত্রা করেছে অন্নবস্ত্রের জন্যে নয়, আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে মানবলোকে মহামানবের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে, আপনার জটিল বাধার থেকে

আপনার অন্তরতম সত্যকে উদ্ধার করবার জন্যে ; সেই সত্য যা তার পুঞ্জিত দ্রব্যভারের চেয়ে বড়ো, তার সমস্ত কৃতকর্মের চেয়ে বড়ো, তার সমস্ত প্রথা-মত-বিশ্বাসের চেয়ে বড়ো, যার মৃত্যু নেই, যার ক্ষয় নেই।···মানুষ আপন চৈতন্যকে প্রসারিত করছে আপন অসীমের দিকে, জ্ঞানে প্রেমে কর্মে বৃহত্তর ঐক্যকে আয়ত্ত করতে চলেছে, আপনার সকল মহৎ কীর্তিতে তাঁর নিকটতর সামীপ্য পাবার জন্যে ব্যগ্র বাহু বাড়িয়েছে যাঁকে তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।”··· [ঐ : পৃঃ. ৫৩]

'মানুষের ধর্ম” বক্তৃতামালায় কবি মানুষের আধ্যাত্মিক স্বরূপ ও শক্তি সম্পর্কে অত্যধিক গুরুত্ব (over-emphasis) দিয়াছেন সত্য কথা, কিন্তু অন্যত্র মানুষের বাস্তব প্রয়োজনের জগৎকে (material necessities) তিনি মোটেই অস্বীকার করেন নাই। বিশেষত পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও যন্ত্রসভ্যতা যেখানে অনায়াসে প্রকৃতিকে কামধেনুর মত দোহন করিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণে মানুষের ভোগ্যপণ্য ও সভ্যতার উপকরণরাজি সৃষ্ট করিতেছে, মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে তিনি অস্বীকার কিংবা লঘু করিয়া দেখেন নাই। একথা তিনি 'শিক্ষার মিলন' ও তাঁহার অন্যান্য প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। সবচেয়ে বড় কথা এই, মানুষের আত্মিক ও সর্বাত্মক বিকাশের ক্ষেত্রে বাস্তব জগতে যে সমস্ত সামাজিক আর্থনীতিক ও রাজনীতিক বাধা ও বিরোধ—এককথায় জাগতিক যে-সব সমস্যা উহাকে তিনি মোটেই উপেক্ষা কিংবা এড়াইয়া যান নাই। মানুষের এই আধ্যাত্মিক সাধন-সংগ্রাম বলিতে তিনি নির্বিরোধ কোন আধ্যাত্মিক তুরীয়তার কথা ভাবিতেন না পরন্তু উহার দ্বারা তিনি মানুষের সর্বাত্মক সাধন-সংগ্রামের কথাই বুঝাইতেন। 'মানুষের ধর্ম” গ্রন্থেও তিনি উহার উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। তিনি বলিলেন :

“অথর্ববেদে শুধু কেবল সত্য ও ঋতের কথা নেই, আছে রাষ্ট্রের কথাও। জনসংঘের শ্রেষ্ঠ রূপ প্রকাশ করবার জন্যে তার রাষ্ট্র।···রাষ্ট্রের প্রশস্ত ভূমি না পেলে জনসমূহ পৌরুষবর্জিত হয়ে থাকে। আপনার মধ্যে যে-ভূমাকে প্রমাণ করবার দায়িত্ব মানুষের সমস্ত জাতি বৃহৎ জীবনযাত্রায় তার থেকে বঞ্চিত হলে ইতিহাসে ধিক্‌কৃত হয়।···ইতিহাসের সেই ধিক্‌কার বহুকালের সুপ্তিমগ্ন এসিয়া-মহাদেশের বক্ষে দিয়েছে আজ আঘাত ; সকল দিকেই শুনছি জনগণের অন্তর্যামী মহান পুরুষ তামসিকতার বন্দীশালায় শৃঙ্খলে দিয়েছেন ঝংকার, তাঁর প্রকাশের তপোদীপ্তি জ্বলে উঠেছে তমসঃ পরস্তাৎ। রব উঠেছে, শৃণ্বন্তু বিশ্বে—শোনো, বিশ্বজন, তাঁর আহ্বান শোনো, যে-আহ্বানে ভয় যায় ছুটে, স্বার্থ হয় লজ্জিত, মৃত্যুঞ্জয় শঙ্খধ্বনি ক'রে ওঠেন মৃত্যুদুঃখবন্ধুর অমৃতের পথে।

“ভূমা থেকে উৎশিষ্ট যে-শ্রেষ্ঠতার কথা অথর্ববেদ বলেছেন সে কোনো একটিমাত্র বিশেষ সিদ্ধিতে নয়। মানুষের সকল তপস্যাই তার মধ্যে, মানুষের বীর্যং লক্ষ্মীর্বলং সমস্ত তার অন্তর্গত। মনুষ্যত্বের বহুধা বৈচিত্র্যকে একটিমাত্র বিন্দুতে সংহত ক'রে নিশ্চল করলে হয়তো তার আত্মভোলা একটা আনন্দ আছে। কিন্তু ততঃ কিম্, কী হবে সে আনন্দে। সে আনন্দকে বলব না শ্রেয়, বলব না চরম সত্য। সমস্ত মানবসংসারে যতক্ষণ দুঃখ আছে, অভাব আছে, অপমান আছে, ততক্ষণ কোনো

একটিমাত্র মানুষ নিষ্কৃতি পেতে পারে না। একটিমাত্র প্রদীপ অন্ধকারে একটুমাত্র ছিদ্র করলে তাতে রাত্রির ক্ষয় হয় না, সমস্ত অন্ধকারের অপসারণে রাত্রির অবসান।... (বড় হরফ আমার)

"সোহহম্ মন্ত্র মুখে আউড়িয়ে তুমি দুরাশা কর কর্ম থেকে ছুটি নিতে। সমস্ত পৃথিবী রইল পড়ে, তুমি একা যাবে দায় এড়িয়ে! যে-ভীরু চোখ বুজে মনে করে 'পালিয়েছি' সে কি সত্যই পালিয়েছে। সোহহম্ সমস্ত মানুষের সম্মিলিত অভিব্যক্তির মন্ত্র, কেবল একজনের না।"... [ঐ : পৃঃ. ৬৮-৭০]

মনের এই গভীর দার্শনিক প্রত্যয়বোধ হইতে তিনি রাজনীতিক ক্ষেত্রে বারংবার আন্তর্জাতিকতার আদর্শকে সর্বোচ্চে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দেহে বর্ণে আকারে প্রকৃতিতে আহারে পরিচ্ছদে, জাতি-ধর্মে ও সামাজিকতায় দেশে দেশে মানুষের মধ্যে বহু বৈচিত্র্য ও পার্থক্য থাকিলেও প্রজাতি হিসাবে সমগ্র মানুষ যে একই এবং সমস্ত মানুষ যে সেই 'একই মহামানবের সমুদ্রে মিলিত হইবার জন্য ধাবিত হইয়াছে', এই কথাই তিনি সারা জীবন ধরিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই কারণেই মানুষের বিভেদপন্থী আত্মঘাতী যত চিন্তা ও প্রবণতা—বর্ণ-বিদ্বেষ, পরজাতি-বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, উপনিবেশবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে সারা জীবনই তিনি কঠোর নিন্দা ও ভর্ৎসনা জানাইয়াছেন। অপরদিকে শান্তি, প্রেম, মৈত্রী ও সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ঐক্য ও মিলনের আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি শুধু বিশ্বমানবের মিলন-ঐক্যের কথাই বলেন নাই; মানুষকে সচেতনভাবে তাহার 'মহান আত্মস্বরূপ'কে অভিব্যক্তি দিবার সাধনায় চরম দুঃখ ও ত্যাগের ব্রত গ্রহণের আহ্বান জানাইয়াছেন।

সব চেয়ে বড় কথা এই, 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে কবি মানুষের অপরাজেয় সংগ্রামী সত্তার ও আত্মিক শক্তির উচ্ছ্বসিত জয়গান করিয়াছেন। আত্মার পরাজয় নাই, ক্ষয় নাই, বিনাশ নাই, মৃত্যু নাই—ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার এই মহান বাণীকে স্মরণ করাইয়া দিয়া তিনি জগতের যত অন্যায়, অকল্যাণ ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ব্রত গ্রহণ করিবার আহ্বান জানাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবাদ ক্লীবের নির্বিরোধ ভাববিলাস নয়,—সংগ্রাম-বিমুখ-পলায়নপরতা নয়,—তা' বলিষ্ঠ সংগ্রামশীল জীবন-দর্শন। 'মানুষের ধর্ম' মানুষের অপরাজেয় সংগ্রামী সত্তার বলিষ্ঠ জীবনবেদ। কবি লিখিয়াছিলেন :

"মৃত্যুরে না করি শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব অভিসারে
তারি কাছে জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছে যারে
জন্ম জন্ম ধরি।
কে সে। জানি না কে। চিনি নাই তারে।
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর-পানে,
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে

তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে,
সংকট-আবর্ত-মাঝে দিয়েছে সে সর্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি, মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতে মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,
সর্বপ্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জেবলেছে সে হোমহুতাশন।”

এই ছিল রবীন্দ্রনাথের সংগ্রামনীতির আদর্শ।

হরিজন আন্দোলন : গান্ধীজীর পুনর্বার অনশন

এদিকে গভর্নমেণ্টের প্রবল দমননীতির চাপে আন্দোলন ক্রমেই স্তিমিত হইয়া আসিতেছিল বটে কিন্তু আন্দোলন একেবারে শেষ হইয়া যায় নাই। ২৬শে জানুয়ারি (১৯৩৩) স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ও জনতার মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ঐদিন কলিকাতায় প্রায় ৩০০ শত এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে বহুলোক গ্রেপ্তার হইলেন। জনতা নেতৃত্বহীন কেননা দেশের প্রায় সমস্ত নেতা ও কর্মীরাই তখন কারাগারে। গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে বিশেষ কোন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না এবং নীতিগতভাবেও তিনি কারাগার হইতে এই সম্পর্কে কিছু বলিতে বা করিতে অস্বীকার করেন। তাছাড়া কারাগার থেকে এই সময় তিনি অস্পৃশ্যদের মন্দির প্রবেশ ও 'হরিজন আন্দোলন' চালাইবার সংকল্প গ্রহণ করেন।

কিছুদিন পূর্বে গুরুভায়ুর মন্দির প্রবেশ আন্দোলন উপলক্ষে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়, পূর্বেই তাহার কথা উল্লেখ করিয়াছি। মাদ্রাজ ও সমগ্র দক্ষিণ ভারতের রক্ষণশীল বর্ণহিন্দুসমাজ এ ব্যাপারে যে কী পরিমাণ গোঁড়া ধর্মান্ধ ছিলেন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা তাহা কল্পনাও করিতে পারিবেন না। কেবল প্রথা-নিয়ম নহে, মাদ্রাজ দেবোত্তর আইনের ৪০ ধারায় উল্লিখিত ছিল এবং সাধারণ আইন মতেও, হিন্দুমন্দিরগুলির অছি বা পরিচালকগণ, তথাকথিত অস্পৃশ্যদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিতে পারিতেন না ;—এমন কি মন্দিরের উপাসনাকারীদের অধিকাংশের সম্মতিতেও না। যদি কোন মন্দিরের উপাসনাকারীদের শতকরা নব্বুইজনও অস্পৃশ্যতা বর্জনের পক্ষে তথাকথিত অবর্ণ ও অস্পৃশ্যদের মন্দির প্রবেশ করিতে দেন, তাহা হইলে প্রচলিত নিয়মে যে কোন বর্ণহিন্দু ঐ অবর্ণের বিরুদ্ধে মন্দির অপবিত্র করার অভিযোগ আদালতে উপস্থিত করিতে এবং মন্দিরের অছি ও পরিচালকদের দণ্ডিত করিতে পারিতেন। এই কারণেই গুরুভায়ুর মন্দির সর্বজাতির জন্য উন্মুক্ত করার সপক্ষে অধিকাংশের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও আইনগত বাধা থাকার জন্য কালিকটের রাজা জামোরিন, অধিকাংশের সম্মতি

মানিয়া লইতে অসম্মত হন ;—অন্তত এই ছিল তাঁহার অজুহাত। উল্লেখযোগ্য, এই সব আইনগত বাধা দূর করিবার জন্যই ডাঃ সুব্বা রাও মাদ্রাজ বিধানসভায় একটি বিল উত্থাপন করেন। তাছাড়া শ্রীরঙ্গ আয়ারও কেন্দ্রীয় পরিষদে একটি বিল উত্থাপন করেন। এ সম্পর্কে দেশে খুব আন্দোলন চলিতে থাকে। ৮ই জানুয়ারী বড়লাট সুব্বা রাওয়ের বিলটি উত্থাপনে এই মর্মে আপত্তি জানাইলেন যে, বিলটি নিখিল ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কিত বিষয় কাজেই প্রাদেশিকতার ভিত্তিতে উহার বিচার করা চলে না। বড়লাট অবশ্য রঙ্গ আয়ারের বিলটি উত্থাপনের অনুমতি দেন। ইহার পর মাদ্রাজ কাউন্সিলে উত্থাপিত সুব্বা রাওয়ের মন্দির প্রবেশ বিলটি সংশোধিত আকারে রঙ্গ আয়ার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করিলে বড়লাট তাহাতে অনুমতি দেন এবং উহা জনমত সংগ্রহের জন্য প্রচারের ব্যবস্থা হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কমলা বক্তৃতা'র পর কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন। উহার কিছুদিন পরেই শ্রীনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রধান অতিথিরূপে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৩) তিনি শ্রীনিকেতনের শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। পরদিন সকালে শ্রীনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠান হয় (৬ই ফেব্রুয়ারী)। এই দিন কবি তাঁহার ভাষণে শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা ও কার্যের পূর্ব-ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বলেন :

"সেদিন প্রথম ক্ষীণশক্তি শূন্য ভরসা নিয়ে এই কাজে নামলেম তখন স্বদেশবাসীরা আমাকে সাহায্য করতে এলেন না। তাঁদের কাছে শুধু নিন্দার তীব্র বাক্য পেয়েছিলাম। সমস্ত নিন্দাকে মাথা পেতে নিয়ে একলাই দিনের পর দিন আমরা সব কিছু দিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করবার চেষ্টা করেছিলাম। তখন কাউকে আমার পাশে পাই নি, কেবল কালীমোহন তাঁর রুগ্ন শরীর নিয়ে, অন্তরে গভীর প্রেরণা ও সেবার উদ্যোগ নিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। যা' দীন নিঃসহায়ভাবে, দেশের নিন্দা অপবাদ বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়ে, ক্ষীণ দুর্বল হাতে আরম্ভ করেছিলাম তা' বাইরের দিক দিয়ে না হলেও অন্তরের দিক দিয়ে প্রাণ সঞ্চার করেছে—এই আমার আনন্দ। এখানে যাঁরা কর্মীরূপে আছেন তাঁরা তপস্বী, পল্লীর সেবা করা তাঁদের জীবনের সাধনা। আজ আমার আহ্বানের দিন এসেছে, গর্বের সঙ্গে আপনাদের বলব, যাঁরা বাইরে থেকে এসেছেন তাঁদের বলব, যে সত্য এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, শিশু হয়ে ছিল আজ তা প্রকাশিত হয়েছে, বড়র আকার ধারণ করেছে। আজ এর দাবী মেটাতে হবে, একে রক্ষা করতে হবে যদি দেশের প্রতি আপনাদের মমতা থাকে।

"লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে এসেছে, আজ এই রাষ্ট্রনৈতিক গোলোযোগের দিনে তুমি কি দিলে, তুমি কি করলে। এর উত্তর মুখে দেবো না, উত্তর একদিন আপনা থেকেই ফুলেফলে প্রকাশিত হবে। আমি যখন নিন্দিত হয়েছিলেম তখনও উত্তর দিই নি, জানি কথার উত্তর প্রকৃত উত্তর নয়, তাতে শুধু কথা কাটাকাটিই বাড়ে। আমার কাজই আমার উত্তর।

"আমার এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমি চেয়েছিলেম গ্রামবাসীদের শিক্ষাদানের

দ্বারা বুঝিয়ে দিতে—কোথায় তাদের কি প্রয়োজন, কি দাবী। যেদিন ওরা বুঝতে পারবে নিজেদের দায়িত্ব সেই দিনই শুরু হবে দেশের প্রকৃত কাজ। আজকের দিনে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, হিন্দুমুসলমান নমঃশূদ্র ব্রাহ্মণের মিলনগ্রন্থিকে দৃঢ় করা, সত্য করে তোলা। আজ যাঁরা বাইরে থেকে এই অনুষ্ঠানের উৎসবে যোগ দিয়েছেন তাঁরা দেখুন বড় দুঃখের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এই অনুষ্ঠান জাগ্রত হয়ে উঠেছে।...

"আমাদের দেশের জনকয়েক সাহিত্যিক লিখে জানিয়েছিলেন যে, আমি দেশের এই দুর্দিনে ভাববিলাসে মগ্ন, কেবল কবিত্বই করি। অনেকে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিত্ব নিয়েই মেতে আছেন। একথা শুধু বাংলাদেশ আমায় বলেছে, সমুদ্র-পারের লোকেরা নয়। আমার দেশবাসীরা মনে করেন—কর্ম করেন তাঁরাই, যাঁরা ভোটযুদ্ধ ও ভোটগণনায় ব্যস্ত। এই অভিযোগের প্রতিবাদ রয়েছে, আমার এই কর্মক্ষেত্র। দুঃখের সঙ্গে জানাতে হোলো যে, আমি শিক্ষিত সমাজের কাছ থেকে কিছুই পেলাম না, কিন্তু আমার সান্ত্বনা শুধু এই এবং এই বিশ্বাস নিয়েই আজ আমি আমার কাজে এতদূর অগ্রসর হতে পেরেছি যে, গ্রামবাসীরা আমাকে পরমাত্মীয় করে নিয়েছে। তাদের অন্তরের ভালবাসা ও উপকার আমি পেয়ে এসেছি। আজ আমি নির্ভয়ে বিনা দ্বিধায় বলতে পারব যে, এই অনুষ্ঠানের বিনাশ নেই, এ প্রতিদিন শাখা-প্রশাখায় ফুলেপল্লবে বিস্তারলাভ করবে। আমার এই সৃষ্টিকার্যের প্রধান সম্পদ আমার চারিপাশের গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধা। আমার বিশ্বাস যে, আমি আমার মৃত্যুর পূর্বে দেখে যেতে পারব যে, আমার কাজ আপনাতে আপনি বিকশিত হয়ে উঠেছে। ৩৩ কোটির জন্য ভাবতে পারি নি, ভাববার মত শক্তিসামর্থ্য ছিল না। এই প্রান্তরের প্রান্তরে সংকীর্ণ সীমায় যে আলো জ্বলেছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সে একদিন না একদিন সমগ্র দেশকে আলো দান করবে।

"যে প্রদীপ এখানে জ্বলেছে তাকে উৎসর্গ করলেম দেশের জন্য। আমি শুধু চাই আমার অন্তরের বন্ধু গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধা, সহযোগিতা, যাদের মুখে বাণী নেই, যাদের ভিতরে আলো জ্বলে নি। তারা নিঃসংকোচে নির্বিঘ্নে, তাদের যা কিছু আহুতি দেবার জন্য নিয়ে আসুক এই যজ্ঞক্ষেত্রে এবং তাই নির্বাণহীন নির্মল আলো হয়ে চিরকাল জ্বলবে।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৬শে মাঘ, ১৩৩৯ : ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩]

ঐদিন অপরাহ্নে শ্রীনিকেতন মেলা-প্রাঙ্গণে অস্পৃশ্যতা বর্জনের দাবীতে এক বিরাট শাস্ত্রজ্ঞ জনসভা হয়। সভায় চতুষ্পার্শ্বস্থ বহু গ্রামের অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরাও অংশ গ্রহণ করেন। এই সভায় সাতকড়িপতি রায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বহু শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করেন, অস্পৃশ্যতা কখনই হিন্দুশাস্ত্রসম্মত নহে। আলোচনার মাঝখানে হঠাৎ কবি আসিয়া উপস্থিত হন। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়া কবি অত্যন্ত সহজ ও মর্মস্পর্শী ভাষায় হিন্দুসমাজের এই কুসংস্কারের সমালোচনা করিয়া বলেন :

"আমার লজ্জা বোধ হয় যে, মানুষকে মানুষ ভালবাসবে এই সহজ কথাটি এত শাস্ত্র প্রমাণ ও তর্ক দিয়ে আমাদের এই দুর্ভাগা দেশকে এখনও বলতে হয়। হাজার হাজার বৎসর ধরে এদের পেছনে ফেলে রেখেছি, সব দেশকে অন্ধকারে মগ্ন করে

রেখেছি আমরা শিক্ষিতেরা। আজ কি তাদের এত ক'রে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বলতে হবে? যারা যুগে-যুগে অপমানিত হয়ে এসেছে তাদের কাছে আজ আমার শেষ অনুরোধ যে, **তারা উঠে দাঁড়াক, তারা জোর গলায় বলুক যে, আমরা অপমানিত—আমরা মানুষ, মানুষের অধিকার দাবী করবার দিন আজ এসেছে।**

(বড় হরফ আমার)

"হাজার হাজার লোকের শক্তি একত্র যদি হোতো, তবে দেশের এ দুর্ভাগ্য আজ ঘটত না। আজ আমরা তাদের অপমানিত করে রেখেছি, সেই দুর্বলতাই সব দেশকে মারছে। আমরা যখন ভারত সরকারের কাছে আমাদের অধিকার দাবী করব, তখন দেখলেম আমাদের মধ্যে মিল নেই। অনেক বিলম্ব হয়েছে; আজ মিলতেই হবে, নতুবা এ দেশের আর কোনো মুক্তির পথ নেই, একে চিরকাল বিদেশীর পদানত হয়ে থাকতে হবে। মানবের অপমানে বিধাতার অপমান করেছি, সেইজন্য পৃথিবীর লোক আজ আমাদের অপমান করতে সাহস পেয়েছে। আমরা যদি একবার হাতে হাত ধরে বলতে পারতেম, আমরা মিলেছি, তা' হ'লে এত অবজ্ঞা, এত পীড়ন আমাদের পেতে হোতো না বাইরে থেকে। আমরাই আমাদের অপমান করেছি, আমাদের সমাজের এই অন্ধ কুসংস্কার দেশের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে আছে। বিদেশীদের দোষ দিই বৃথা। যে অস্ত্র আজ আমাদের মারছে, সে আমাদের দেশের অন্তরের মোহান্ধতা, বিদেশীর অস্ত্র নয়। মানুষকে দূরে যত ফেলব তত শক্তি যাবে। আজ আমাদের শক্তি চাই। পিছে পড়ে থাকলে চলবে না। পৃথিবীর অন্য সব দেশ আজ মাথা তুলে তাদের বিজয়গর্ব প্রকাশ করছে। শুধু ভারতবর্ষ চাপা পড়ে আছে, দেশের লোককে দিতে পারি নি, সেই মূঢ়তাই আমাদের চেপে রেখেছে। একত্র হৃদয় দিয়ে দাঁড়াতে পারলে এ দুর্ভাগ্য হোতো না। আজ অবনত কারা? আমরা কি উন্নত? এই শিক্ষিত সমাজ আমরা? বিদেশীর লাথি ঝাঁটা কঠোরভাবে আমাদের উপর পড়ছে, ওদের কাছে আমরা অবনত। তাই সকলের সঙ্গে আমরা সমান অনুন্নত, সমান দুঃখ অপমান আমরা পেয়ে এসেছি। আজ সময় এসেছে, যে অপমান দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত, সেই অপমানকে ঝেড়ে ফেলে পরস্পরকে ভাই বলে বুকে তুলে নিতে হবে।"

উপসংহারে কবি বলিলেন :

"আজ আমরা ওদের মন্দির প্রবেশ করবার অধিকার দিই নি, কিন্তু আকাশের তলায় যে মন্দির, চন্দ্র সূর্য যে মন্দিরে আলো জেলেছে—তারায় তারায় যে মন্দিরের প্রদীপ জ্বলে, সেই মন্দিরে সকলকে এক করে নিতে হবে। আমরা যাদের অপমান করেছি বিশ্ব-মন্দিরের পূজারী তারাই। আমরা মনে করি, পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা মন্দিরে তাদের না-প্রবেশ করতে দিলে আমাদের সম্মান বজায় রইল। সে মন্দির মন্দির, না সে কারাগার? যারা ঘণ্টা নেড়ে আচার অনুষ্ঠান মেনে পূজা করছে, ভগবানের মন্দির থেকে নির্বাসিত তারাই। যারা আকাশের সূর্যের দিকে তাকিয়ে বিশ্বদেবতার চরণে প্রণাম জানাতে পেরেছে তারাই আজ যথার্থ পূজারী, তারাই স্পৃশ্য।

"আজ সময় এসেছে মিলবার। ভগবানের আকাশের দিকে চেয়ে পরস্পর

পরস্পরকে বুকে তুলে নিতে হবে। পুরানো শাস্ত্র ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবার দিন চলে গেছে। জগন্নাথদেব আজ তোমাদের সহায়. তোমরা তাঁর উদ্দেশে তোমাদের প্রণাম জানিয়ে সকলকে এক করে নাও।”

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ৩রা ফাল্গুন, ১৩৩৯ : ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩]

কবির বক্তৃতার পর অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, রঙ্গ আয়ারের মন্দির প্রবেশ বিল, অনুন্নতগণের সেবা এবং তাহাদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার ও সদাচার প্রবর্তন এবং পুণা-চুক্তির সমর্থন করিয়া কতকগুলি প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে সেগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উল্লেখযোগ্য, 'মন্দির প্রবেশ বিল'টি আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সভায় উত্থাপন করিয়া একটি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দেন।

শ্রীনিকেতন উৎসব চুকিয়া যাইবার কয়েকদিন পরই 'শান্তিনিকেতন ওয়াটার ওয়ার্কস্'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয় (১১ই ফেব্রুয়ারী)। তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী স্যর বিজয়প্রসাদ সিংহ-রায় ইহার উদ্বোধন করেন। মন্ত্রীকে দিয়া এই উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সম্ভবত সরকারী সাহায্যলাভের প্রত্যাশায় করা হইয়াছিল বলিয়া রবীন্দ্র-জীবনীকার অনুমান করেন।

এই সময়ই গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনের আদর্শ ও তত্ত্বগত প্রচারের উদ্দেশ্যে *'Harijan'* পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন (১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩)। এর কয়েকদিন পূর্বে তিনি ঐ পত্রিকায় কিছু লিখিবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানাইয়া-ছিলেন। জবাবে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'মেথর' কবিতাটির ইংরেজী তর্জমা করিয়া পাঠান। উহা *Harijan*-এর প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়।

গান্ধীজীর এই 'মন্দির প্রবেশ' আন্দোলনের বিরুদ্ধে গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দু নেতারা তীব্র সমালোচনা করিতে লাগিলেন। উহাদের একটি প্রতিনিধি দল বড়লাটের সঙ্গে দেখা করিয়া এই আন্দোলনের, বিশেষ করিয়া রঙ্গ আয়ারের মন্দির প্রবেশ বিলের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানাইলেন। এমন কি পণ্ডিত মালব্যও মন্দির প্রবেশ সমর্থন করিলেও রঙ্গ আয়ারের বিলটি সমর্থন করিলেন না। গান্ধীজী কিন্তু অটল রহিলেন। বহু বিদেশীও এই ব্যাপারে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার বক্তব্য বুঝিবার চেষ্টা করেন। এই সময় আমেরিকান মেথডিস্ট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি অধ্যাপক বয়েড্ টাকার এই মন্দির-প্রবেশ আন্দোলনের সমালোচনা করিয়া লিখলেন :

“Great religious truths which the prophets of religion have apprehended and proclaimed have always been lost when their disciples have tried to localize them in the priestcraft and in the temples. And therefore, I can see no advantage in gaining permission for the Harijans to enter the temples. I think that they must learn the independence of all priests and temples.”

বলাবাহুল্য, গান্ধীজী অধ্যাপক টাকারের এই দৃষ্টিভঙ্গী কখনই মানিয়া লইতে পারেন না। তিনি জনসাধারণের অকৃত্রিম ধর্মবিশ্বাসের উপর অসীম গুরুত্ব দিতেন এবং মানুষের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে মন্দির-মসজিদ-এর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এবং এই কারণেই মন্দির বা দেবালয়ের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখার দাবী জানাইতেছিলেন। তিনি অধ্যাপক টাকারের ঐ উক্তির সমালোচনায় *Harijan*-এ এক জায়গায় লিখিলেন :

…"Though I do not visit temples, there are millions whose faith is sustained through these temples, churches and mosques. They are not blind followers of a superstition, nor are they fanatics…

"That temples and temple worship are in need of radical reform must be admitted. But all reform without the temple entry will be to tamper with the disease. I am aware that the American friend's objection is not based upon the corruption of impurity of temples. His objection is much more radical. He does not believe in them at all. I have endeavoured to show that his position is untenable in the light of facts which can be verified from everyday experience. To reject the necessity of temples is to reject the necessity of God, religion and earthly existence." [*Muhatma* : Vol. III ; P. 194-95]

অধ্যাপক টাকার (Boyd G. Tucker) বেশ কিছুকাল বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। কিছুকাল পূর্বে গান্ধীজী যারবেদা কারাগারে অনশন শুরু করিলে কবি অধ্যাপক টাকারকে গান্ধীজীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। যাহাই হোক, অধ্যাপক টাকারকে লিখিত গান্ধীজীর ঐ পত্র পাঠ করিয়া কবি এই সম্পর্কে তাঁহার মতামত জ্ঞাপন করিয়া গান্ধীজীকে একটি পত্র দেন। কবির এই পত্রটির বাংলা তর্জমা পরে বাংলা 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উহার অংশ-বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হইল :

প্রিয় মহাত্মাজি,

ইট-চূণের ঘরের ভিতর দেবতাকে কাহারও স্বার্থের জন্য পুরিয়া রাখা হইবে, ইহা আমি আদৌ পছন্দ করি না, সে কথা বলা বাহুল্য। আমি ত এ কথা খুব বিশ্বাস করি যে, অকপট (অশিক্ষিত) লোকের পক্ষে ফাঁকা জায়গায়, যেখানে কোনও হাতে গড়া বাধা খাড়া করা হয় নাই, সেখানে বসিয়া ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করা সম্ভব।…

মন্দিরে উপাসনা বিষয়ে ধর্ম আচরণের পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। সেই সকল পদ্ধতি নৈতিক দিক হইতে খারাপ হইতে পারে, হানিকর হইতে পারে, কিন্তু সে পদ্ধতিগুলি অস্বীকার করার জো নাই বলিয়া পদ্ধতিগুলি বদলাইবার অথবা তাহাদের ধাচ প্রশস্ত করাইবার কথাই আসিয়া পড়ে। কি ভাবে ইহা করা হইবে তাহা লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে। ট্রাস্টির দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে দেখা যাইবে যে, তাহারা একটি সম্পত্তি জ্ঞান করিয়াই আচার নিয়ম রক্ষা করিতেছে। তাহারা এই জন্যই মন্দিরে বিগ্রহ উপাসনার অধিকার একটি বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ অধিকার বলিয়া গণ্য করে। তাহারা কেবল খৃস্টান ও মুসলমানদিগকেই ঐ প্রকার উপাসনা

করিতে যে দেয় না তাহা নয়, তাহাদের নিজের সম্প্রদায়ের লোককেও দেয় না। মন্দির বিশেষ ও বিগ্রহ বিশেষ যেন তাহাদেরই সম্পত্তি। তাহারা উহাকে লোহার সিন্ধুকে বন্ধ করিয়া রাখে। ধর্ম-সম্বন্ধীয় চিরাচরিত প্রথা অনুসারে তাহারা চলে, এই প্রথাই তাহাদিগকে ঐ ভাবে আচরণ করায়—স্বাধীনতা দেয়—ঐভাবে চলিতেই হইবে, এমনই নির্দেশ দেয়। যখন এই প্রকার দুর্নীতি-সম্মত প্রথার বিরুদ্ধে সংস্কারক দাঁড়ান, তখন তিনি ত আর জুলুম করিতে পারেন না, তাহাকে অন্য অন্যায় আচারের সহিত লড়িতে হইলে যেমন করিতে হয়, এ ক্ষেত্রেও তেমনি তাঁহাকে নৈতিক শক্তির বলেই উহা পরিবর্তন করিতে হয়। এই প্রকার লড়াই করা আবশ্যক। শ্রীযুক্ত টাকার এই বিষয়টা করেন নাই বলিয়া আমার মনে হয়।

শান্তিনিকেতনের উপাসনা গৃহ সকল ধর্মের সকল লোকের জন্যই উন্মুক্ত। এই উপাসনা মন্দির যেমন সকলের জন্যই খোলা, তেমনি এখানকার সরল উপাসনা পদ্ধতিতেও এমন কিছু নাই যাহা অপর ধর্মকে বাদ দেয়, আমাদের উপাসনা গাছের তলায়ও চলিতে পারে। এই প্রকার প্রাকৃতিক আবেষ্টনে উপাসনার সত্যতা ও পবিত্রতা না কমিয়া বরং আরো বাড়ে। ঋতুর ও আবহাওয়ার গতিকেই বাহিরে উপসনায় বাধা হয়, নচেৎ আমি ত মনে করি যে, প্রার্থনা ও ঈশ্বরের সহিত যোগযুক্ত হওয়ার জন্য আলাদা করিয়া মন্দির রাখার আবশ্যকই নাই।

আমি 'হরিজনে' প্রকাশের জন্য একটি কবিতা পাঠাইয়াছি। ইহা আমার অল্পদিন পূর্বেই লেখা একটি বাংলা কবিতার অনুবাদ। উহা 'হরিজন' এর আদর্শ ও মর্মের সহিত এক ভাবাপন্ন বলিয়া আমি মনে করি। আমি অতিশয় আনন্দ ও আগ্রহের সহিত 'হরিজন' পত্রিকা পড়িয়া থাকি। আপনার মহা উপবাসের ফলে যে ভারতের দলিত মানুষগুলি জাগিয়া উঠিতেছে ইহা অপেক্ষা ভারতের অধিক আশার কথা আর কি হইতে পারে।

প্রেমপূর্ণ শ্রদ্ধাবনত

আপনার একান্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঈশ্বর-চিন্তা ও ধর্মসাধনার পন্থা সম্পর্কে গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বেশ কিছুটা মতপার্থক্য ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কবি পরোক্ষভাবে মন্দির প্রবেশ আন্দোলনকে সমর্থন জানাইলেন। লক্ষণীয়, আচার-প্রথা ও সংস্কারগত ধর্মকে কবি কোনদিনই সমর্থন করেন নাই অথচ এ ক্ষেত্রে তিনি মন্দির-প্রবেশ আন্দোলনকে পরোক্ষ সমর্থন করিলেন। তাহার একটি প্রধান কারণ এই যে, এই আন্দোলনকে তিনি ব্রাহ্মণ ও পুরোহিততন্ত্রের ঘোরতর ধর্মীয় অন্যায় ও দুর্নীতিপরায়ণতার বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজের নির্যাতিত শ্রেণীগুলির একটি অতীব ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম হিসাবেই দেখিতেছিলেন। তাছাড়া এই আন্দোলনে তাহাদের মধ্যে তিনি একটি সামাজিক চেতনা ও নবজাগরণের প্রথম সূচনাও দেখিতেছিলেন। তাই এই পত্রে

উপাসনার পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহার স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াও তিনি নির্যাতিত হিন্দু-শ্রেণীর একটি অত্যন্ত মৌলিক ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার হিসাবেই মন্দির-প্রবেশ আন্দোলনকে সমর্থন জানাইলেন।

উল্লেখযোগ্য, মনের এই ভাব হইতেই তিনি এই সময় অল্পকালের ব্যবধানে 'মুক্তি' (১৪ই মাঘ, ১৩৩৯), 'প্রেমের সোনা' (মাঘ) ও 'স্নান সমাপন' (১৫ই ফাল্গুন) নামে তিনটি কবিতা রচনা করেন। এই কবিতাগুলি পরে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে 'শুচি', 'প্রেমের সোনা' ও 'স্নান সমাপন' কবিতা তিনটির মধ্যে একটি অখণ্ড যোগসূত্র আছে। বস্তুত এই কবিতাগুলি একই আখ্যানের তিনটি অংশ মাত্র। দক্ষিণ-ভারতের গুরু রামানন্দ কিভাবে দেবালয়ের বাহিরে অচ্ছুতসমাজের মধ্যে তাঁহার ইষ্টদেবতা নরনারায়ণকে আবিষ্কার করিলেন,—কিভাবে তাঁহার অধ্যাত্মচেতনার উন্মেষ ঘটিল তাহাই উক্ত কবিতাত্রয়ের মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে। কবি স্বয়ং 'মানুষের ধর্ম' বক্তৃতায় ইহার মর্মকথাটি ব্যাখ্যা করিয়া বলেন :

"একদিন ব্রাহ্মণ রামানন্দ তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে চলে গিয়ে আলিঙ্গন করলেন নাভা চণ্ডালকে, মুসলমান জোলা কবীরকে, রবিদাস চামারকে। সেদিনকার সমাজ তাঁকে জাতিচ্যুত করলে। কিন্তু তিনি একলাই সেদিন সকলের চেয়ে বড়ো জাতিতে উঠেছিলেন যে-জাতি নিখিল মানুষের। সেদিন ব্রাহ্মণমণ্ডলীর ধিক্‌কারের মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে রামানন্দই বলেছিলেন সোহহম্‌। সেই সত্যের শক্তিতেই তিনি পার হয়ে গিয়েছিলেন সেই ক্ষুদ্র সংস্কারগত ঘৃণাকে যা নিষ্ঠুর হয়ে মানুষে মানুষে ভেদ ঘটিয়ে সমাজস্থিতির নামে সমাজধর্মের মূলে আঘাত করে।"

[মানুষের ধর্ম : পৃঃ. ৬৩]

'স্নান সমাপন'-এর শেষে এই কথাই তিনি গুরু রামানন্দের মুখে বলেন :

> "ভাজন লুটিয়ে পড়ে গুরুকে প্রণাম করলে সাবধানে।
> গুরু তাকে বুকে নিলেন তুলে।
> ভাজন ব্যস্ত হয়ে উঠল,
> 'কী করলেন প্রভু,
> অধমের ঘরে মলিনের গ্লানি লাগল পুণ্যদেহে।'
> রামানন্দ বললেন :
> 'স্নানে গেলেম তোমার পাড়া দূরে রেখে,
> তাই যিনি সবাইকে দেন ধৌত করে
> তাঁর সঙ্গে মনের মিল হল না।
> এতক্ষণে তোমার দেহে আমার দেহে
> বইল সে বিশ্বপাবনধারা।
> ভগবান সূর্যকে আজ প্রণাম করতে গিয়ে প্রণাম বেধে গেল,
> বললেম, হে দেব, তোমার মধ্যে যে জ্যোতি আমার মধ্যেও তিনি
> তবু আজ দেখা হল না কেন।

এতক্ষণে মিলল তাঁর দর্শন
তোমার ললাটে আর আমার ললাটে।
মন্দির আর হবে না যেতে'।"

[রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১৬শ খণ্ড, পৃঃ. ১১১]

কিন্তু মন্দির-প্রবেশ আন্দোলন ও অস্পৃশ্যতা নিবারণ আন্দোলনের মধ্যেই কবির দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন, ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন শিক্ষা-সংস্কার আন্দোলনের ব্যতিরেকে কখনই সফল ও সার্থক হইতে পারে না। এই কারণেই তিনি বারংবার অবাধ জনশিক্ষা প্রসারের উপর গুরুত্ব দিয়াছেন। এই কথাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার পরবর্তী বক্তৃতায় স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করিলেন।

উল্লেখযোগ্য, ইহার কিছুদিন পরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক'রূপে তাঁহাকে আর একটি বক্তৃতা দিতে হয় (২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩)। এবারে তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল, 'শিক্ষার বিকিরণ'।

কবি বিশ্বাস করিতেন, দেশের প্রাচীন শিক্ষা ও সমাজ-ব্যবস্থায় জনসাধারণকে উপেক্ষা করা হয় নাই। সে-যুগে জনশিক্ষার প্রতি সমাজের সতর্ক দৃষ্টি ছিল এবং নানাভাবে শিক্ষাকে সব স্তরে ব্যাপ্ত করিয়া দিবার জন্য সে-যুগের উপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থাও ছিল। ঐতিহাসিক অবশ্য এ-কথায় তর্ক তুলিবেন। যাহাই হোক, কবির বক্তব্য এই : ইংরেজ শাসিত ভারতে শিক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণকে প্রায় সম্পূর্ণই উপেক্ষা করা হইয়াছে। মুষ্টিমেয় শহরবাসী ইংরেজীশিক্ষিত সমাজের সঙ্গে এখন দেশের বৃহত্তর গ্রামীণ জনসাধারণের একটা বিরাট ব্যবধান ও পার্থক্যের প্রাচীর সৃষ্টি হইয়াছে যাহার ফলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের মধ্যে বস্তুত স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য সম্পর্কের উদ্ভব হইয়াছে। তিনি বলিলেন :

"এ কালে যাকে আমরা এডুকেশন বলি তার আরম্ভ শহরে। তার পিছনে ব্যবসা ও চাকরি চলেছে আনুষঙ্গিক হয়ে। এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেল-কামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন-যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়িটাই যেন সত্য, আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব।

"শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে; তারাই হল এন্‌লাইটেন্‌ড্‌, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণগ্রহণ।...সেই দিন থেকে জলকষ্ট বলো, পথকষ্ট বলো, রোগ বলো, অজ্ঞান বলো, জমে উঠল কাংস্যবাদ্যমন্দ্রিত নাট্যমঞ্চের নেপথ্যে নিরানন্দ নিরালোক গ্রামে গ্রামে। নগরী হল সুজলা, সুফলা, টানাপাখাশীতলা; সেইখানেই মাথা তুললে আরোগ্যনিকেতন, শিক্ষার প্রাসাদ। দেশের বুকে এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে এত বড়ো বিচ্ছেদের ছুরি আর-কোনোদিন চালানো হয় নি, সে কথা মনে রাখতে হবে। একে আধুনিকের লক্ষণ বলে নিন্দা করলে চলবে না। কেননা. কোনো সভ্য দেশেরই অবস্থা এরকম নয়।...জাপানে পাশ্চাত্য বিদ্যার সংস্রব ভারতবর্ষের চেয়ে অল্প কালের, কিন্তু সেখানে সেটা তালিদেওয়া ছেঁড়াকাঁথা নয়।

সেখানে পরিব্যাপ্ত বিদ্যার প্রভাবে সমস্ত দেশের মনে চিন্তা করবার শক্তি অবিচ্ছিন্ন সঞ্চারিত।...

..."কিন্তু আমাদের দেশে প্রবাসিনী আধুনিকী বিদ্যা তেমন নয়। তার আছে বিশিষ্ট রূপ, সাধারণ রূপ নেই। সেইজন্যে ইংরেজি শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা পেয়েছেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্বসাধারণের সঙ্গে। দেশে সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।"

[শিক্ষার বিকিরণ-শিক্ষা : পৃঃ. ২৩৮-৪২]

এইজন্য কবি দেশে সর্বপ্রথম অবাধ জনশিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচী গ্রহণের আহ্বান জানাইলেন। এবং এই কাজে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে, ইহাই কবির বিশ্বাস। তাছাড়া ইহার প্রারম্ভিক সূচনা হিসাবে কবি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট একটি ন্যূনতম কর্মসূচী গ্রহণের প্রস্তাব দিয়া বলিলেন :

"মস্তিষ্কের সঙ্গে স্নায়ুজালের অবিচ্ছিন্ন যোগ সমস্ত দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই মস্তিষ্কের স্থান নিয়ে স্নায়ুতন্ত্র প্রেরণ করতে হবে দেশের সর্বদেহে। প্রশ্ন এই, কেমন ক'রে করা যেতে পারে? তার উত্তরে আমার প্রস্তাব এই যে, একটা পরীক্ষার বেড়াজাল দেশ জুড়ে পাতা হোক্। এমন সহজ ও ব্যাপক ভাবে তার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ইস্কুল-কলেজের বাইরে থেকেও দেশে পরীক্ষা-পাঠ্য বইগুলি স্বেচ্ছায় আয়ত্ত করবার উৎসাহ জন্মে। অন্তঃপুরের মেয়েরা কিংবা পুরুষদের যারা নানা বাধায় বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না তারা অবকাশকালে নিজের চেষ্টায় অশিক্ষার লজ্জা নিবারণ করছে, এইটি দেখবার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় জেলায় জেলায় পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে।"...

কিন্তু জনশিক্ষা প্রসারের পথে প্রধানতম বাধা—ভাষার বাধা। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে কখনও দেশে ব্যাপক জনশিক্ষার প্রসার হইতে পারে না এবং কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই তাহা সম্ভব—এই কথাই কবি সারাজীবন ধরিয়া বলিয়া আসিয়াছেন। এই ভাষণেও তিনি উহার পুনরুক্তি করিয়া বলিলেন :

..."যে-সব শিক্ষনীয় বিষয় জানা থাকলে আত্মসম্মান রক্ষা হয় তার জন্যে অগত্যা যদি ইংরেজি ভাষারই দ্বারস্থ হতে হয় তবে সেই অকিঞ্চনতায় মাতৃ-ভাষাকে চিরদিন অপমানিত করে রাখা হবে। বাঙালি যারা বাংলাভাষাই জানে শিক্ষিত সমাজে তারা কি চিরদিন অন্ত্যজ শ্রেণীতেই গণ্য হয়ে থাকবে?...

..."বস্তুত আধুনিক শিক্ষা ইংরেজি ভাষাবাহিনী বলেই আমাদের মনের প্রবেশ-পথে তার অনেকখানি মারা যায়। ইংরেজি খানার টেবিলে আহারের জটিল পদ্ধতি যার অভ্যস্ত নয় এমন বাঙালির ছেলে বিলেতে পাড়ি দেবার পথে পি. এন্ড ও. কোম্পানির ডিনার কামরায় যখন খেতে বসে তখন ভোজ্য ও রসনার মাঝপথে কাঁটা ছুরির দৌত্য তার পক্ষে বাধাগ্রস্ত ব'লেই ভরপুর ভোজের মাঝখানেও ক্ষুধিত জঠরের দাবি সম্পূর্ণ মিটতে চায় না। আমাদের শিক্ষার ভোজেও সেই দশা; আছে সবই, অথচ মাঝপথে অনেকখানি অপচয় হয়ে যায়।...আমার বিষয়টা সর্বসাধারণের শিক্ষা নিয়ে। শিক্ষার জলের কল চালানোর কথা নয়, পাইপ যেখানে পৌঁছয় না সেখানে

পানীয়ের ব্যবস্থার কথা। মাতৃভাষায় সেই ব্যবস্থা যদি গোষ্পদের চেয়ে প্রশস্ত না হয় তবে এই বিদ্যাহারা দেশের মরুবাসী মনের উপায় হবে কী?"

উপসংহারে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইয়া বলেন :

"বাংলা যার ভাষা সেই আমার তৃষিত মাতৃভূমির হয়ে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন জানাচ্ছি : তোমার অভ্রভেদী শিখর চূড়া বেষ্টন করে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক ফলে শস্যে, সুন্দর হোক পুষ্পে পল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্‌বেল ধারা বাঙালিচিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্ত পথে বান ডাকিয়ে বয়ে যাক, দুই কূল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দধ্বনি।" [শিক্ষা : পৃঃ. ২৪৬-৪৮]

উল্লেখযোগ্য, এই বক্তৃতার কয়েকদিন পূর্বে রামমোহন রায় মৃত্যু-বার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির উদ্বোধনী সভায়ও কবিকে একটি ভাষণ দিতে হয় (দ্র. ভারতপথিক রামমোহন : পৃঃ. ১৩৭-৪২)। তিনি উহার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। রামমোহনের ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে কবি বলেন (১৮ই ফেব্রুয়ারী) :

"Rammohan was the only person in his time, in the whole world of man, to realize completely the significance of the Modern Age. He knew that the ideal of human civilization does not lie in the isolation of independence, but in the brotherhood of inter-dependence of individuals as well as of nations in all spheres of thought and activity." [দ্র. *Modern Review* : March, 1933]

আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ওই সময় সুভাষচন্দ্র চিকিৎসার জন্য ইউরোপ যাবার অনুমতি পাইলে তিনি (সম্ভবত তাঁহার কোন আত্মীয়ের মারফত) রবীন্দ্রনাথের নিকট তাঁহার একটি বিদেশে পরিচয়পত্র লিখিয়া দিবার অনুরোধ জানান। উল্লেখযোগ্য, দীর্ঘদিন থেকে সুভাষচন্দ্র অসুস্থ অবস্থায় লক্ষ্ণৌ-এর সন্নিকট বলরামপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেখানে বিশেষজ্ঞরা অসুখের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ইউরোপে চিকিৎসা করাইবার সুপারিশ করিলে গভর্নমেণ্ট নিজ ব্যয়ে তাঁহাকে সেখানে যাবার অনুমতি দেন। যাহাই হোক, কবি সুভাষচন্দ্রের জন্য একটি ক্ষুদ্র পরিচয়পত্র লিখিয়া দেন (১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩)। এই পত্র সুভাষচন্দ্রের মনঃপুত হয় নাই বলিয়া তিনি এটি ব্যবহার করেন নাই। একথা পরে তিনি স্বয়ং কবিকে লিখিয়াছিলেন। যথাস্থানে উহা আলোচিত হইবে। ২৩শে ফেব্রুয়ারী সুভাষচন্দ্র ইউরোপ যাত্রা করেন।

এই সময় কবি কলিকাতায় 'শাপমোচন' গীতিনাট্যটি নূতন করিয়া মঞ্চস্থ করিবার কথা চিন্তা করিতেছিলেন। ইহারই প্রস্তুতির জন্য তিনি মার্চ মাসের ৭।৮ তারিখ নাগাদ শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া যান।

ইহার কিছুদিন পরেই গোল-টেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতশাসন সংক্রান্ত 'হোয়াইট পেপার' (White Paper) প্রকাশ করেন (১৭ই মার্চ, ১৯৩৩)। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতবর্ষে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। প্রায় সমস্ত দল ও গোষ্ঠী ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি ও প্রতিবাদ জানাইলেন।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস নেতারা কলিকাতায় কংগ্রেসের ৪৮তম অধিবেশন আহ্বান করেন (৩১শে মার্চ)। কংগ্রেসে যোগদানের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রদেশ ও অঞ্চল থেকে প্রায় দুই সহস্রাধিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। স্বয়ং পণ্ডিত মালব্য ইহার সভাপতিত্ব করিবেন এবং জওহরলালের মাতা স্বরূপরাণী নেহরু কংগ্রেসে যোগদান করিবেন, এইরূপ স্থির হয়। বলা বাহুল্য, গভর্নমেন্ট দিল্লী-কংগ্রেসের ন্যায় এবারেও কলিকাতা কংগ্রেস-অধিবেশন বেআইনী ঘোষণা করিলেন। কলিকাতা পৌঁছিবার পূর্বেই পুলিশ পণ্ডিত মালব্য, স্বরূপরাণী নেহরু, এম. এস. আণে ও ডাঃ সৈয়দ মামুদ প্রমুখ অধিকাংশ নেতাদের গ্রেপ্তার করিয়া আসানসোল, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলে আটক করিয়া রাখে। এ ছাড়াও প্রায় সহস্রাধিক কংগ্রেস প্রতিনিধি গ্রেপ্তার হইলেন। এসব সত্ত্বেও প্রায় এগার শতাধিক প্রতিনিধি নির্ধারিত সময়ে কলিকাতা এসপ্লানেডে সভাস্থলে উপস্থিত হইতে সক্ষম হন। মালব্যজীর গ্রেপ্তারের পর শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা সভাপতিত্ব করেন। পুলিশের অবিশ্রান্ত লাঠিবর্ষণের মধ্যেই কংগ্রেস-অধিবেশন চলিতে থাকে এবং ইহার মধ্যে খুবই দ্রুত ও সংক্ষেপে ৭টি সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। উল্লেখযোগ্য,—পূর্ণ-স্বাধীনতার লক্ষ্য ও সংকল্প এবং আইন অমান্য আন্দোলন চালাইয়া যাইবার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। তাছাড়া কংগ্রেসে 'হোয়াইট পেপার'কে বর্জন করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া বলা হয় :

"The Congress is confident that the public will not be duped by the scheme outlined in the recently published White Paper which is inimical to the vital interests of India and is devised to perpetuate foreign domination in this country".

[*The History of the Congress* : Vol. I, P. 557]

কংগ্রেসে সিদ্ধান্তগুলি কোনরকমে গৃহীত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ শ্রীমতী সেনগুপ্তা ও অন্যান্য বহুশত প্রতিনিধিকে গ্রেপ্তার করে। অবশ্য কংগ্রেস-অধিবেশন শেষ হইয়া যাইবার দিন তিনেক পরই তাঁহাদের অধিকাংশকেই মুক্তি দেওয়া হয়। ৩রা এপ্রিল পণ্ডিত মালব্যকেও মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি পাওয়ার পরই তিনি কলিকাতায় যান এবং কংগ্রেস মণ্ডপে পুলিসের বর্বরোচিত আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া উপযুক্ত তদন্তের দাবী জানান।

রবীন্দ্রনাথ তখন কলিকাতায়। ২৯শে ও ৩০শে মার্চ নিউ এম্পায়ার প্রেক্ষাগৃহে 'শাপমোচন' অভিনীত হয়। অভিনয়ের পরদিনই কবি প্রশান্ত মহলানবিশের বরাহনগর বাড়িতে চলিয়া যান। ঐদিনই কলিকাতায় কংগ্রেস মণ্ডপে পুলিসের দক্ষযজ্ঞভঙ্গ-তাণ্ডব নৃত্য হয়। কিন্তু এ সম্পর্কে কবিকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে কোন মন্তব্য কিংবা প্রতিবাদ করিতে দেখি না। হয়ত তিনি ভাবিয়াছিলেন, আন্দোলন ও সংগ্রাম করিতে হইলে এইসব অত্যাচার-নির্যাতনকে অনিবার্য ও স্বাভাবিক বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। তবে ইহার কয়েকদিন পরেই পণ্ডিত মালব্য বরাহনগরে গিয়া কবির সহিত সাক্ষাৎ করেন (৫ই এপ্রিল)। উল্লেখযোগ্য, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ও অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল থেকে বেশ কিছুকাল থেকেই বিদেশে ভারতের বিরুদ্ধে

নানা কুৎসা ও অপপ্রচার চালানো হইতেছিল। কিছুকাল পূর্বে বিলেতে বিঠলভাই প্যাটেল ইহার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাইয়া একটি বিবৃতি দেন। তিনি মালব্যজীকে কবির সহিত দেখা করিয়া ইহার প্রতিবাদে কিছু লিখিবার ও করিবার অনুরোধ জানাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। সেই উদ্দেশ্যেই মালব্যজী কবির সহিত সাক্ষাৎ-আলোচনা করেন।

বলাবাহুল্য, এ সব ব্যাপারে কবি কখনও নীরব থাকিতে পারেন নাই; পরের দিন কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া যান। ৭ই এপ্রিল মালব্যজী শান্তিনিকেতনে গিয়া পুনরায় কবির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। পরদিন মালব্যজী কাশী যাত্রা করেন। তাঁহাদের আলোচনার কোন নোট বা বিবরণ পাওয়া যায় না, তবে ইহার কয়েকদিন পরই এ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেসের মাধ্যমে কবি এইসব ভারত-বিরোধী অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া এক বিবৃতি দেন (১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৩)। কবির এই বিবৃতির মর্ম ছিল এই:

"প্রতীচ্যে ভারতবিদ্বেষ প্রচারের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রচারকার্যের আবশ্যকতা সম্বন্ধে মিঃ ভি. জে. প্যাটেল সম্প্রতি লণ্ডনে যাহা বলিয়াছেন, উহার সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত। আমাদের আহত মনোবৃত্তি প্রদর্শন দ্বারা উক্ত প্রচারকার্য করা হইবে না; ভারতের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যথার্থ সংবাদ প্রকাশ দ্বারা উহা করিতে হইবে। বিদেশে ভারতের সম্বন্ধে বিকৃত সংবাদ প্রচার করা হয় এবং অনেক স্থলে প্রকৃত সংবাদ প্রকাশিত হয় না; আমাদের আর সময়ক্ষেপ না করিয়া ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া কর্তব্য। বিদেশে মহাত্মা গান্ধীর বিরাট খ্যাতির প্রতি কর্দম নিক্ষেপ করা হয়, তাঁহাকে ছোট করিবার চেষ্টা করা হয় এবং ভারতে কোটি কোটি অধিবাসীর উপর তাঁহার প্রভাব অস্বীকার করা হয়। মহাত্মাজির সহিত আমার মতভেদ বর্তমান—ইহা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করা হয়। এবং আমাদের ঐ কল্পিত বিরোধ দ্বারা স্বার্থ সাধন করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি অল্পদিন পূর্বের দুটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

সংবাদপত্রের মিথ্যা সংবাদ:

"ট্রিবিউন-ডি-জেনেভা" পত্রে আমার সহিত পরলোকগত মিঃ লণ্ড্রেসের (Mr. Londres) কথোপকথনের এক কাল্পনিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে আমার বিরুদ্ধে অসঙ্গত ভাষা ব্যবহার করিয়া মহাত্মাজির সুনাম নষ্ট এবং তদ্দ্বারা আমার চরিত্রের অবমাননা করিবার চেষ্টা হইয়াছে। মিঃ লণ্ড্রেসের মৃত্যুর পর প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহ বহুকাল যাবত এই কাল্পনিক কথোপকথনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহাকে যখন আর এই সংবাদের সত্যাসত্য সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইবে না, তখন তাঁহার বন্ধুগণ এই সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। অপর ঘটনা সম্পর্কে কনিগসবার্গ হইতে প্রসিদ্ধ ভারততত্ত্বজ্ঞ মিঃ গ্লাসনাপ (Mr. Glasnapp) আমাকে এক চিঠি লেখেন। উহাতে তিনি লুসিয়ানো ম্যাগ্রিনি (Mr. Luciano Magrini) নামক জনৈক ইটালীয়ান গ্রন্থকার প্রণীত 'ভারত' নামক এক পুস্তকে প্রকাশিত মহাত্মাজি এবং আমার সম্পর্কে অবমাননাকর উক্তির প্রতিবাদ করিবার অধিকার প্রার্থনা করেন। উক্ত পুস্তকে প্রকাশ যে, আমি গ্রন্থকারের উক্তি

সমর্থন করি। আমি কখনও উক্ত গ্রন্থকার কিংবা তাঁহার পুস্তকের নাম শুনি নাই। আমার বন্ধুগণ এই সমস্ত মিথ্যা সংবাদ আমার গোচরীভূত করায় আমি ইহাদের প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

"দক্ষিণ আমেরিকায় ভ্রমণের সময় আমি অল্প কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আর্জেণ্টাইনের কোনও প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে উহার পাঠকদের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া ভারতের দারুণ অবমাননাকর সংবাদ প্রকাশিত হইতে দেখি। উহাতে কলিকাতায় বাঙালী বালিকা বিক্রয়ের এক বাজারের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়। উহার কয়েকদিন পর পার্শীদের 'নীরব ভবন'-এর (Tower of Silence) এক ফটো প্রকাশিত হয়। উহার নীচে লিখিত হয় যে, এই সমস্ত ভবনে হিন্দুগণ তাহাদের ধর্মে অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের মৃতদেহ চিল ও শকুনীদের জন্য রাখিয়া দেয়। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এই প্রথা নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন। আমার ঐ দেশে গমনের সমসময়েই এই সমস্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়। আমি তথায় ভারতের প্রতিনিধিরূপে অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলাম।"

পরি শেষে বিদেশে ভারতের স্বতন্ত্র ও নিজস্ব প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব দিয়া কবি বলেন :

"ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি অর্থচুরি হওয়া অপেক্ষা সুনাম নষ্ট হওয়াকে অধিকতর শোচনীয় ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত কম শোচনীয় ঘটনা ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু অধিকতর শোচনীয় ঘটনা যথাসময়ে নিবারণ করা কর্তব্য। আমরা ভুলিয়া যাই যে, বর্তমানে সমস্ত দেশের রাজনীতি বিশ্বরাজনীতির দ্বারা পুষ্ঠপোষিত। কোনও দেশের গভর্নমেণ্ট যত শক্তিশালীই হউক না কেন, ইহা বৃহত্তর মানবজাতির নৈতিক সমর্থন ব্যতীত চলিতে পারে না। এইজন্য রাজনীতিজ্ঞগণ মিথ্যারূপ সার দ্বারা পৃথিবীর জনমত উৎপাদনকে (to cultivate world opinion often with the manure of lies.) তাঁহাদের কূট রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারকার্যের পিছনে কাহারা রহিয়াছে তাহা আমরা জানি না। কিন্তু ইহা সুন্দররূপে পরিচালিত এবং উহার পিছনে যথেষ্ট অর্থবল আছে ইহা সুস্পষ্ট।

"এইরূপ অনিষ্টকর প্রচারকার্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইলে কেবল বক্তৃতা কিংবা মধ্যে মধ্যে প্রতিভাবান ব্যক্তিদের বিদেশ গমনের দ্বারা স্থায়ী ফল হইতে পারে না। বর্তমানে প্রতীচ্যে সংবাদ-প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। তথা হইতে ভারতের জনমত এবং তাহার সিদ্ধান্ত ও আবেদন বিদেশে প্রচারিত হইবে।"—এ.পি.

[বঙ্গবাণী : ২রা বৈশাখ, ১৩৪০ : ১৫ই এপ্রিল, ১৯৩৩]

এই সময় তিনি অত্যন্ত এক দুরূহ ও শ্রমসাধ্য কাজে প্রবৃত্ত হন। বাংলাভাষার সমৃদ্ধিসাধনের জন্য তিনি এই সময় বাংলা পরিভাষা প্রণয়ন ও সংকলনের কাজে হাত দেন। উল্লেখযোগ্য, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তিনি এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়া কিছু কাজ করিয়াছিলেন। এবারে তিনি এবিষয়ে আরও কিছুটা কাজ করিবার পরিকল্পনা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তাহা জানান। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কবিকে এই কাজে সহায়তা করার জন্য অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্যকে নিয়োগ

করেন। এই কাজের প্রারম্ভিক সূচনা বেশ ভালই হইয়াছিল বটে কিন্তু নানা কারণে শেষপর্যন্ত কবির এই আরব্ধব্রত সম্পন্ন হয় নাই। বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য তাঁহার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ইহাই একটি অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এখানে আর একটি মূল্যবান তথ্যের উল্লেখ করা দরকার। এই সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কবিকে একটি পত্রে ইউরোপের নরনারীর সম্পর্কের জটিলতার ও অন্যান্য সমস্যার উল্লেখ করিয়া কয়েকটি প্রশ্ন তুলেন। উহার জবাবে কবি যাহা লিখেন তাহা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য (২১শে এপ্রিল, ১৯৩৩):

"য়ুরোপে যে তোলপাড় চলছে সে স্বভাবের নিয়মে, বহু লোককে নিয়ে—কেবল বই পড়া কয়েকজন চষমাপরা লেখক-পাঠকের সৌখীন বিচার নিয়ে নয়। ভীষণ তাদের আগ্রহ, রুশিয়ার দিকে তাকালেই তা দেখা যায়। এই আগ্রহ সম্ভবপর হ'ত না যদি নূতন অবস্থায় মানুষের কাছে একান্তভাবে ধরা না পড়ে থাকে যে, যে-সব বাঁধন একদা ছিল স্থিতির অনুকূলে, আজ তাতে স্থিতির সহায়তা আর করছে না কেবল তা বন্ধনরূপেই আছে।…

"আজ যুগান্তরের দিনে আমরা বইপড়া পণ্ডিতরা অপেক্ষাকৃত দূরে আছি। জিনিষটাকে কেউ বা দেখছি বন্ধমুক্ত প্রবৃত্তির দিক থেকে, কেউ বা অন্ধদৃষ্টি সনাতনের মোহের থেকে। আমার মন বলছে, নিশ্চিত জানিনে মানুষ কী করে আপন অপরিহার্য সমস্যার সমাধান করে—পাশ্চাত্যে সমূল সমাধানের যে প্রচণ্ড উদ্যম চলেছে সেটা শাস্ত্রিক নয়, সাহিত্যিক নয়, সেটা সামাজিক জীবনমৃত্যুর একান্ত প্রয়োজনঘটিত। যদি পরজন্ম থাকে, তবে পৌত্র হয়ে জন্মিয়ে তখন ফলাফল দেখে বিচার করব।" [প্রবাসী : ফাল্গুন, ১৩৪১ ; পৃঃ ৬২০-২৪].

কবির মন যে কতখানি সংস্কারমুক্ত ছিল ইহা হইতে তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। যুদ্ধোত্তর ইউরোপে মানুষের জীবনে দিকে দিকে যে-সব সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়—ইউরোপ তাহার সমাধানে যে-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যবস্থা অবলম্বন করে, কবি সম্পূর্ণ খোলা মনেই সেগুলি অনুধাবন ও বিচার করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

এদিকে 'হরিজন' পত্রিকা প্রকাশ হওয়ায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুসমাজের প্রতিক্রিয়াশীল ও সনাতনী নেতারাও খুব সক্রিয় হইয়া উঠিলেন। গান্ধীজীর বক্তব্যের বিকৃত উদ্ধৃতি ও অপব্যাখ্যা করিয়া তাঁহারা হরিজন আন্দোলনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শুরু করেন। তাছাড়া 'যারবেদা প্যাক্ট' বা 'পুণা-চুক্তির' বিরুদ্ধেও বিভিন্ন মহল থেকে তীব্র সমালোচনা চলিতে থাকে। গান্ধীজী কিন্তু অটল রহিলেন। তিনি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ৩০শে এপ্রিল 'নিঃ ভাঃ অস্পৃশ্যতা বর্জন দিবস' পালনের আবেদন জানান।

এই সময় অকস্মাৎ ২৯শে এপ্রিল, অতি প্রত্যুষে গান্ধীজী পুনর্বার তাঁহার অনশন শুরু করার কথা লিখিয়া সাথীদের জানাইলেন।—পূর্বদিন গভীর রাত্রে তাঁহার অন্তরস্থিত সেই রহস্যময় পুরুষই নাকি তাঁহাকে এবার অনশনের জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। পরদিন এক বিবৃতিতে তিনি ঘোষণা করেন যে, আগামী ৮ই মে হইতে

২১ দিনের জন্য তিনি অনশন শুরু করিবেন। তিনি অবশ্য একথাও ঘোষণা করেন যে, এই অনশন কাহারও বিরুদ্ধে নয়, তাঁহার নিজের অন্তরশুদ্ধির জন্যই তিনি অনশন শুরু করিতেছেন।

"As I look back upon the immediate past, many are the causes, too sacred to mention, that must have precipitated the fast. But they are all connected with the Harijan cause.…But it is particularly against myself. It is a heart prayer for purification of self and associates, for greater vigilance and watchfulness."…

[*Mahatma* : Vol. III, pp. 198-99]

রবীন্দ্রনাথ তখন দার্জিলিঙের পথে কলিকাতায় আসিয়াছেন। গান্ধীজীর অনশনের সংকল্পে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কবি অবশ্য অনশনে বিশ্বাস করিতেন না। ২রা মে তিনি 'ফ্রী প্রেসের' প্রতিনিধির মারফতে নিম্নলিখিত মর্মে এক বিবৃতি দেন :

"মহাত্মাজি পুনরায় উপবাস করিবার সংকল্প করিয়াছেন, ইহা অবগত হইয়া আমি গভীর মর্মবেদনা অনুভব করিতেছি। তাঁহার ন্যায় এমন একটা মহাপ্রাণ, এরূপ শর্তবিহীন আত্মবিলোপের মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিবে, একথা আমি ভাবিতেই পারি না। মহাত্মাজি যদি এই নিদারুণ সংকল্প পরিত্যাগ না-করেন, তাহা হইলে আমার দেশ এবং সমগ্র মানবজাতির পক্ষে একটা বিষম বিপদ ঘটিবে। আমি এখনও আশা করিতেছি যে, এই চরমপন্থা অবলম্বনে মহাত্মাজিকে বিরত করা যাইবে। মৃত্যুর দ্বারা তিনি তাহাদিগকেই অনাথ করিয়া যাইবেন, যাহাদের কল্যাণের জন্য তিনি এই অনশন-ব্রতের সংকল্প করিয়াছেন। আমরা জানি যে, মহাত্মার জীবন সত্যের সেবায়ই উৎসর্গীকৃত। বিশ্বজগৎকে পাপমুক্ত করিতে হইলে জীবনের দ্বারা তিনি যতটা কাজ করিতে পারিবেন, মৃত্যুর দ্বারা কখনও ততটা সম্পন্ন হইবে না।"—ফ্রী প্রেস [আনন্দবাজার পত্রিকা : ২০ বৈশাখ, ১৩৪০ : ৩রা মে, ১৯৩৩]

দেশের চারিদিক থেকে উদ্বেগ ও আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া গান্ধীজীকে তাঁহার এই সংকল্প সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ আসিতে থাকে। কিন্তু গান্ধীজী তাঁহার সংকল্পে অটল।

৮ই মে দ্বিপ্রহরে যারবেদা কারাগারের আম্রকুঞ্জে গান্ধীজী অনশন শুরু করেন। ঐদিন দেশের সর্বত্রই প্রার্থনা সভা করিয়া গান্ধীজীর দীর্ঘজীবন কামনা করা হয়। অকস্মাৎ ঐদিনই রাত্রে প্রায় সাড়ে নয়টায় গভর্নমেণ্ট গান্ধীজীকে মুক্তি দেন। সেখান থেকে গান্ধীজী পুণায় লেডি থ্যাকারসের 'পর্ণকুটির'-এ গিয়া উঠিলেন। মুক্তি পাওয়ার পরই তিনি এক প্রেস-বিবৃতিতে একমাসের জন্য আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেন এবং জওহরলাল ও বল্লভভাই প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি ও সমস্ত দমনমূলক অর্ডিন্যান্স ইত্যাদি প্রত্যাহার করিয়া লইবার জন্য গভর্নমেণ্টের নিকট অনুরোধ জানান। অবশ্য সেই সাথে তাঁহার অনশন চালাইয়া যাইবার কথাও ঘোষণা করেন। দিনের পর দিন কাগজে কাগজে তারে-বেতারে এই খবর ফলাও করিয়া প্রচারিত হইতে থাকে। দেশের রাজনীতিক সমস্যা ও মুক্তি-

আন্দোলন কিছুটা গৌণ হইয়া গেল ;—গান্ধীজীর মাহাত্ম্য ও 'অতিমানবত্ব'ই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

রবীন্দ্রনাথ তখন দার্জিলিঙে। গান্ধীজীর পুনরায় অনশন সংকল্পের কথা জানিতে পারিয়া তিনি কি পরিমাণ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন পূর্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি। কয়েকদিন পূর্বে এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের মারফত সেই মর্মে গান্ধীজীকে তিনি একটি তারবার্তা পাঠান (৩রা মে, ১৯৩৩)।

"Great anxiety darkens the country owing to your tragic resolve. Pray reconsider decision for the sake of humanity which cannot spare you now. We claim your living guidance in these fateful days of India's history, when our future is being shaped and our millions depend upon your wisdom."—A. P. [*The Hindu* : 4th May, 1933]

পরে অবশ্য জানা যায়, গান্ধীজী এই তারবার্তা পান নাই। বলা বাহুল্য, এই ধরনের অনশনব্রতের বাস্তব কার্যকারিতা সম্পর্কে কবির কোনদিনই বিশেষ আস্থা ছিল না। ৯ই মে তিনি দার্জিলিঙ থেকে এই মর্মে গান্ধীজীকে এক পত্র লিখিয়া তাঁহার অনশনব্রতের ব্যাপারে তাঁহাকে পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিবার অনুরোধ জানান। কবির চিঠির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হইল :

"You must not blame me, if I cannot feel a complete agreement with you at the immense responsibility you incur by the step you have taken. ...It is not unlikely that you are mistaken about the imperative necessity of your present vow and when we realize that there is a grave risk of its fatal termination, we shudder at the possibility of the tremendous mistake never having the opportunity of being rectified. I cannot help beseeching you not to offer such an ultimatum of mortification to God for his scheme of things and almost refuse the great gift of life with all its opportunities to hold up till its last moment the ideal of perfection which justifies humanity.

"However, I must confess, that I have not the vision which you have before your mind, nor can I fully realize the call which has come only to yourself and therefore, whatever may happen, I shall try to believe that your are right in your resolve and that my misgivings may be the outcome of a timidity of ignorance."

[*The Modern Review* : June, 1933 ; pp. 704-05]

কিন্তু সাংবাদিকরা ছাড়ে না। ঐদিনই দার্জিলিঙে এ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেসের এক প্রতিনিধি কবির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গান্ধীজীর অনশনের বিষয়ে তাঁহার মতামত জানিতে চাহেন। কবি খুব বিনয়ের সহিত সংক্ষেপে বলেন :

'আমি রাজনৈতিক নহি। মহাত্মাজি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে

ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন অভিমত প্রকাশ করিবার নাই, কিন্তু মহাত্মাজির বিজ্ঞতায় আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে এবং আমি তাঁহার নেতৃত্ব অনুসরণ করিতে প্রস্তুত।"—এ. পি.

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৭ বৈশাখ. ১৩৪০ : ১০ই মে, ১৯৩৩]

রবীন্দ্রনাথ এইসব ব্যাপারে অনশন ইত্যাদি কোনদিনই সমর্থন করেন নাই—ইহা অন্তত সাংবাদিকদের নিকট সুবিদিত ছিল। লক্ষ্য করিবার বিষয়, কবি এই সম্পর্কে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত বা মন্তব্য করার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। অতীতে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁহার বিভিন্ন বিষয়ে মতদ্বৈধতার খবরটি সাম্রাজ্যবাদী প্রচারযন্ত্র কিভাবে তাহাদের জঘন্য স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাইয়াছে সে সম্পর্কে কবির অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল। এই কারণেই তাঁহার এই সতর্কতা। এই সম্পর্কে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমতের কথা তিনি গান্ধীজীকে পর পর দুটি চিঠিতে পরিষ্কার খুলিয়া লিখিয়া জানাইয়াছিলেন।

গান্ধীজীর অনশনের সংবাদে বিভিন্ন দেশের বিবেকী মনীষীরা উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বাণী পাঠাইতেছিলেন। এই সময় রোলাঁও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া গান্ধীজীকে এক পত্রে লিখিলেন : (ভিলন্যভ্ : ২রা মে, ১৯৩৩)

…"সমগ্র পৃথিবী বর্তমানে অত্যাচারে জর্জরিত। আপনি কিছু মনে না করিলে এই সময়ে অস্পৃশ্যদের জন্য আপনার এই আত্মত্যাগের আমি আরও মহত্তর ব্যাখ্যা প্রদান করিতে চাই। **পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের সূচনা হইয়াছে, অতীতের সকল যুদ্ধই নিষ্ঠুরতায় ও বিশালতায় ইহার নিকট ম্লান হইবে। এই সময়ে মানবজাতি অত্যাচারী ও অত্যাচারিত, এই দুইভাগে বিভক্ত।** অত্যাচারিতগণ নানা দুঃখ দুর্দশা ও অন্যায়ের জ্বালায় উন্মত্তপ্রায়; এই সময়ে অহিংসা ও প্রেমের প্রতীক সত্যের দেবতার নিকট আপনার এই আত্মবলি ক্রুশকাষ্ঠে যীশুর আত্মাদানের ন্যায় সার্বজনীন ও পবিত্রতা অর্জন করিবে। যীশুর আত্মবলিদান যদিও পৃথিবীকে রক্ষা করিতে পারে নাই, কিন্তু পৃথিবীকে আত্মরক্ষার উপায় প্রদর্শন করিয়াছে। লক্ষ লক্ষ দুর্গতদের দুর্যোগের রাত্রির ঘনান্ধকারে ইহা আলো দেখাইয়াছে। কিন্তু আজ আপনার এই আত্মদান যেন সার্থক হয়। আপনার জীবন যেন আরও দীর্ঘ হয়—"
(বড় হরফ আমার)…

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০ : ২০ মে, ১৯৩৩]

বলা বাহুল্য, রোলাঁ শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গীতে গান্ধীজীর 'হরিজন আন্দোলন'-এর বিচার করিতে চাহিলেন। উহার সহিত গান্ধীজীর জীবনদর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য কোথায় ও কতখানি তাহা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন হয় না।

৯ই মে কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি মিঃ আণে ৬ সপ্তাহের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেন এবং কংগ্রেস কর্মীদের হরিজন আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ দেন। গভর্নমেণ্ট অবশ্য এক প্রেস-বিবৃতিতে পরিষ্কার জানাইয়া দিলেন যে, কংগ্রেসের সাময়িকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার অর্থ এই নয় যে, তাঁহারা উহা চূড়ান্তভাবে পরিত্যাগ করিতেছেন;

সুতরাং এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস নেতাদের সহিত আপস-আলোচনা কিংবা কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দেওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না।

এদিকে গান্ধীজী কর্তৃক আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার ঘোষণায় বহু কংগ্রেস কর্মীর মধ্যে খুবই হতাশা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ৯ই মে ভিয়েনা থেকে ভি. জে. প্যাটেল ও সুভাষচন্দ্র বসু একযোগে 'রয়টারে'র প্রতিনিধির নিকট গান্ধীজীর ঐ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এক বিবৃতি দিয়া বলেন যে, 'আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার কার্যটির দ্বারা গান্ধীজীর বিফলতার স্বীকারোক্তি সূচিত হইতেছে এবং উহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তিনি সম্পূর্ণ বিফল প্রযত্ন হইয়াছেন।' এই বিবৃতির পরিশেষে তাঁহারা কংগ্রেসের আগুয়ান কর্মীদের এক নূতন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গঠনের আহ্বান জানাইয়া বলেন :

…"The time has therefore come for a radical reorganisation of the Congress on a new principle and with a new method. For bringing about this reorganisation a change of leadership is necessary, for it would be unfair to Mahatma Gandhi to expect him to evolve or work a programme and method not consistent with his life-long principles.…Non-co-operation can not be given up but the form of Non-co-operation will have to be changed into a more militant one and the fight for freedom to be waged on all fronts."

[*The Indian Struggle* : P. 357]

উল্লেখযোগ্য, এই বলিষ্ঠ প্রতিবাদ-বিবৃতি কংগ্রেসের রাজনীতিতে এক ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে কংগ্রেসের রাজনীতিতে গান্ধীযুগের সূচনা হয়। এই ঘটনার আগে পর্যন্ত গান্ধী-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এইভাবে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করিতে অন্য কোন দায়িত্বশীল কংগ্রেস নেতাকে বড়ো একটা দেখা যায় নাই। উল্লেখযোগ্য, ভি. জে. প্যাটেল ও সুভাষচন্দ্র উভয়েই গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তখন ভিয়েনায় বিশেষজ্ঞদের চিকিৎসাধীন ছিলেন।

এদিকে রবীন্দ্রনাথ অনশনরত গান্ধীজীর সংবাদের জন্য উত্তরোত্তর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে থাকেন। ১১ই মে দার্জিলিঙ থেকে তিনি পুনরায় এক পত্রে গান্ধীজীকে তাঁহার অনশনব্রত চালাইয়া যাওয়ার বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ জানান। পত্রের শেষে তাঁহার আকুল অনুরোধ জানাইয়া কবি লিখেন :

…"I cannot bear the sight of a sublimely noble career journeying towards a finality which, to my mind, lacks a prefectly satisfying justification. And once again I appeal to you for the sake of the dignity of our nation, which is truly impersonated in you, and for the sake of the millions of my countrymen who need your living

touch and help to desist from any act that you think is good only for you and not for the rest of humanity."

[*Modern Review* : June, 1933 ; P. 705]

কিন্তু গান্ধীজী তাঁহার সঙ্কল্পে অটল রহিলেন। এবং এই অনশনরত অবস্থাতেই তিনি হরিজন পত্রিকার সম্পাদনা করিয়া যাইবার সংকল্প প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে তিনি একথাও জানাইয়া দেন যে, 'হরিজন' পত্রিকায় শুধুমাত্র 'হরিজন আন্দোলন' বিষয়ক আলোচনা থাকিবে,—রাজনীতিক বিষয় থাকিবে না।—'It will still be solely devoted to the Harijan cause and will *scrupulously exclude all politics.*' (*Italics—mine*).

কিন্তু কবি দার্জিলিঙে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কয়েকদিন পর তিনি অমিয় চক্রবর্তীকে গান্ধীজীর নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহার সঙ্গে কবি গান্ধীজীকে যে-বাণীটি পাঠান তাহা ছিল এই :

"My prayer for Mahatmaji. May your penance bring you close to the bosom of the eternal, away from the burdensome pressure of life's malignant facts, thus refreshing your spirit to fight them with rigorous detachment."

অমিয় চক্রবর্তীর নিকট হইতে কবির এই বাণী পাঠ করিয়া গান্ধীজী উৎফুল্ল হইয়া তাঁহাকে বলেন (২৩শে মে) :

"Tell Gurudev that I treasure his gift. I realize his presence with me. His prayer is a great help to me in this ordeal God's will be done." [*The Statesman* : 24th May, 1933]

এর প্রায় এক সপ্তাহ পরে অনশনের মেয়াদ পূর্ণ হইলে গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করেন (২৯শে মে)। ঐদিনই কবি দার্জিলিঙ হইতে এক তারবার্তায় গান্ধীজীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া লিখিলেন :

"Relieved from poignant anxiety. With thankful heart we welcome this great day when from death's challenge you have come out victorious, to renew your faith against sacrilegious bigotry sinuating piety and the moral degeneracy of the powerful."

[*Ceylon Observer* : 31st May, 1933]

মতাদর্শের কথা বাদ দিলে—রবীন্দ্রনাথ যে গান্ধীজীকে কতখানি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসিতেন, এই সব ঘটনা থেকেই তাহার আভাস পাওয়া যায়।

এই সময়ই আন্দামান সেলুলার জেলে বিপ্লবী বন্দীরা (৩৯ জন) কতকগুলি অতীব ন্যায়সঙ্গত দাবীতে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন (১২ই মে,)। গান্ধীজীর অনশন ভঙ্গের পূর্বদিন,—২৮শে মে, এক সরকারী প্রেস নোটেই এই সংবাদ লোকে সর্বপ্রথম জানিতে পারে। দীর্ঘদিন অনশনের পর বন্দীদের অবস্থা ক্রমেই সংকটজনক হইয়া উঠিতে থাকিলে জেল কর্তৃপক্ষ বলপূর্বক তাহাদের খাওয়াইবার চেষ্টা করেন। তাহার ফলে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী মহাবীর সিং-এর মৃত্যু হয়

(১৭ই মে)। মানকৃষ্ণ নমঃদাস ও মোহিতমোহন মৈত্র নামক অপর দুইজন অনশনরত বন্দীও নাকি পরে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যান (২৬শে ও ২৮শে মে)।

এই সংবাদে কলিকাতায় ও দেশের সর্বত্র দারুণ উত্তেজনা ও বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয়। ৩০শে মে কলিকাতায় এ্যালবার্ট হলে মেয়র সন্তোষ বসুর সভাপতিত্বে এক মহতী জনসভায় উহার তীব্র নিন্দা ও বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়া সমস্ত বিষয়টি তদন্ত ও বন্দীদের ফিরাইয়া আনিবার দাবী করা হয়।

এই সভায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উত্থাপিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

"সর্বসাধারণের বিরুদ্ধ মনোভাব সত্ত্বেও ভারতবর্ষ হইতে রাজবন্দীদিগকে দ্বীপান্তর প্রেরণ করিবার জন্য পুনরায় আন্দামানে সেলুলার জেল খোলা সম্পর্কে এই সভা তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে। এই সভা এই মত প্রকাশ করিতেছে যে, জনমতের প্রভাবে তাহাদের বন্দীজীবন যাহাতে সুখস্বচ্ছন্দকর হয় এবং জনসাধারণ এবং গভর্নমেণ্ট যাহাতে তাহাদের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে অধিকতর খোঁজখবর যত্নসহকারে লইতে পারেন তজ্জন্য আন্দামানে প্রেরিত রাজবন্দীগণকে ভারতবর্ষে ফিরাইয়া আনা হউক।"

[দ্র. আনন্দবাজার পত্রিকা : ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০ : ৩১শে মে, ১৯৩৩]

দিনের পর দিন কলিকাতায় এই লইয়া আন্দোলন চলিতে থাকে।

পুণা-চুক্তির প্রতিবাদে

গান্ধীজীর অনশন ভঙ্গের কয়েকদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, চিন্তামণি, পঃ মালব্য, এম. বিশ্বেশ্বরাইয়া, স্যর চুণিলাল মেটা প্রমুখ দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও লিবারেল নেতা বিলেতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, ভারত-সচিব এবং প্রিভি কাউন্সিলের লর্ড প্রেসিডেণ্টকে রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি এবং কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতার আবেদন জানাইয়া টেলিগ্রাম বা তারবার্তা পাঠান (৫ই জুন, ১৯৩৩)। তাছাড়া টেলিগ্রামের কপি বড়লাট, গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের অস্থায়ী প্রেসিডেণ্টের কাছেও পাঠানো হয় (দ্র. *Modern Review* · July, 1933 ; P. 106)। উহার মর্মার্থ ছিল :

"মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি কর্তৃক আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখায় দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মনে যে প্রবল মনোভাব দেখা দিয়াছে, আমরা তৎপ্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যে সব রাজনীতিক বন্দী বিনাবিচারে আটক আছে, অথবা হিংসামূলক কার্যে সংশ্লিষ্ট নয়, অধিকাংশ অর্ডিন্যান্সসমূহ অথবা বিশেষ আইনসমূহে দণ্ডিত হইয়া কারারুদ্ধ আছে, তাহাদিগকে মুক্তিদান করিবার সময় আসিয়াছে। বর্তমানে যে শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে

আলোচনা চলিতেছে, তাহার গঠনে সাহায্য করিবার জন্য কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ করা হইলে তাহা খুব মূল্যবান হইবে ; উহা করিবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি। আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত হইবার পর গভর্নমেণ্ট যে ইস্তাহার জারী করিয়াছেন, তাহাতে সুনিয়ন্ত্রিত পথে জাতীয় উন্নতিকামী সকলের মনে বিষাদ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। কংগ্রেস যে সদিচ্ছার ইঙ্গিত করিয়াছেন, তৎপরতার সহিত তাহাতে সাড়া দিয়া রাজনীতিক বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করিবার জন্য এবং তদ্বারা প্রস্তাবিত শাসনসংস্কার গৃহীত হইবার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার জন্য আমরা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি। গভর্নমেণ্টের পক্ষের অসহযোগিতার মতিগতির ফল কিরূপ শোচনীয় হইবে, তাহা চিন্তা করিতেও আমরা শঙ্কিত হইতেছি।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০ : ৬ই জুন, ১৯৩৩]

উল্লেখযোগ্য, এই টেলিগ্রামে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর ছিল। বলাবাহুল্য, গভর্নমেণ্ট এই আবেদনে কর্ণপাত করেন নাই। আপস-আলোচনা কিংবা দমননীতি প্রত্যাহার ও বন্দীমুক্তির প্রশ্নে গভর্নমেণ্ট পূর্ববৎ কঠোর মনোভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

কলিকাতায় তখন আন্দামান বন্দীদের অনশন ধর্মঘট লইয়া দারুণ উত্তেজনা ও আন্দোলন চলিতেছিল। ক্রমেই অনশনকারী বন্দীদের অবস্থা সংকটজনক হইয়া পড়িবার খবর আসিতে থাকে। দিনের পর দিন সভাসমিতি করিয়া ইহাদের দাবীর সমর্থনে আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু ইংরেজ গভর্নমেণ্ট তাহাতে মোটেই বিচলিত হইলেন না।

রবীন্দ্রনাথ তখনও দার্জিলিঙে। এই সংবাদে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ৯ই জুন তিনি সেখান থেকে—'Give up Hunger strike'—এই বলিয়া টেলিগ্রাম করিয়া আন্দামান বন্দীদের অনশন ত্যাগ করিবার অনুরোধ জানান। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ ও দেশের অন্যান্য নেতাদের অনুরোধে দীর্ঘ ৪৫ দিন পর আন্দামান বন্দীরা অনশন স্থগিত রাখেন (২৬শে জুন)। সরকার পক্ষ হইতে আশ্বাস দেওয়া হয়, এই ব্যাপারে উপযুক্ত তদন্ত করিয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

জুলাই মাসের প্রথমভাগেই কবি দার্জিলিঙ থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। ৮ই জুলাই বর্ষামঙ্গল-উৎসব ও বৃক্ষরোপণ-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উহার কয়েকদিন পরেই বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর তাঁহার দলবলসহ শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হন। শান্তিনিকেতনে তাঁহাদের নৃত্যানুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হয়। উদয়শঙ্করের নৃত্য দেখিয়া কবি অত্যন্ত মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হন। পূর্বেই বলিয়াছি, কবি সঙ্গীত, নৃত্য ও ললিতকলা-চর্চাকে কোনদিনই পৌরুষের বিরোধী বলিয়া মনে করিতেন না।

অনশনভঙ্গের প্রায় মাস দেড়েক পর গান্ধীজী কিছুটা সুস্থ হইয়া উঠিলে পর পুণাতে দেশের বিভিন্ন প্রদেশের দায়িত্বশীল কংগ্রেস প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন (১২-১৪ জুলাই, ১৯৩৩)। সম্মেলনে দীর্ঘ আলোচনা ও তর্কবিতর্কের পর স্থির হয়, গান্ধীজী বড়লাটের নিকট সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিবেন। তদনুসারে

১৫ই ও ১৭ই জুলাই গান্ধীজী বড়লাটের নিকট আপস-আলোচনার উদ্দেশে সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করেন ; বড়লাট পরিষ্কার সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া জানাইয়া দিলেন, কংগ্রেস আন্দোলন প্রত্যাহার না-করা পর্যন্ত গভর্নমেণ্ট এই সাক্ষাৎ-আলোচনায় সম্মতি দিতে পারেন না। এই নিদারুণ অবমাননাকর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের পক্ষে সংগ্রামের পথ বাছিয়া লওয়া ছাড়া আর অন্য কোনো গত্যন্তর ছিল না। অনতিকাল পরেই গান্ধীজীর সহিত পরামর্শক্রমে কংগ্রেস থেকে ব্যক্তিগতভাবে আইন অমান্য আন্দোলন করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। অবশ্য কংগ্রেস সংগঠন থেকে ইহার কোনরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করা হইবে না, ইহাও জানাইয়া দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য, এই ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস সভাপতি আণে সমস্ত কংগ্রেস সংগঠন ভাঙিয়া দিবার নির্দেশ দেন। স্বভাবতই ইহার ফলে সাধারণ কংগ্রেস কর্মীদের মনে হতাশা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

এদিকে 'হোয়াইট-পেপার' ঘোষণার অল্পকাল পরেই উহার বিস্তারিত আলোচনা ও চূড়ান্তরূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট থেকে একটি 'জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটি' (Joint Select Committee) গঠিত হয়। পার্লামেণ্টের উভয় কামরার ১৬ জন করিয়া সদস্য লইয়া এই কমিটি গঠিত হয়, এপ্রিলের প্রথমভাগেই। লর্ড লিনলিথগো উহার চেয়ারম্যান বা সভাপতি নির্বাচিত হন। এই আলোচনায় যোগদানের জন্য কমিটির কিছু ভারতীয় প্রতিনিধি (assessors) মনোনয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়। বলাবাহুল্য ভারতীয় এ্যাসেসর বা সদস্যদের কোনো রিপোর্ট দাখিল করিবার বা ভোটদানের অধিকার ছিল না। ১০ই মে, ইহার বৈঠক শুরু হয় এবং দীর্ঘকাল এই বৈঠক চলে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' ও 'পুণা-চুক্তি'র বিরুদ্ধে দেশে তীব্র সমালোচনা ও তর্ক-বিতর্ক দেখা দেয়। সবচেয়ে গণ্ডগোল বাধে বাংলায় ও পাঞ্জাবে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও পুণা-চুক্তির ফলে এই দুটি প্রদেশে হিন্দুরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার *India Divided* গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

…"বাংলায় হিন্দুগণ সমগ্র জনসমষ্টির শতকরা ৪৪'৮ ভাগ হিসাবে সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়। অথচ তাহাদিগকে দেওয়া হইল মোট ২৫০টি আসনের মধ্যে ৮০টি, অর্থাৎ সমগ্র আসনসংখ্যার শতকরা ৩২ ভাগ। মুসলমানগণ মোট জনসংখ্যার ৫৪'৮ ভাগ ; কিন্তু তাহারা অধিকার করিল ১১৯টি আসন, অর্থাৎ মোট আসনসংখ্যার শতকরা ৪৭'৬ ভাগ। আবার ইউরোপীয়গণ মোট জনসংখ্যার শতকরা ০'১ ভাগ এবং তাহা সত্ত্বেও তাঁহাদের জন্য আসনসংখ্যা নির্ধারিত হইল ২৫টি, অর্থাৎ মোট আসনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘুত্বে পরিণত করিয়া এবং সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ অপহরণ করিয়া ইউরোপীয়দিগকে ২,৫০,০০০ গুণ অধিক 'ওয়েটেজ' দিবার ব্যবস্থা কায়েম করা হইল। এ স্থলে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই আসন সংখ্যা হ্রাস করা হইল বটে, কিন্তু হ্রাসপ্রাপ্ত হিন্দু-আসনের সংখ্যাই হইল অধিকতর। …পাঞ্জাবেও শিখদিগকে 'ওয়েটেজ' দিবার জন্য হিন্দুগণকে নিজেদের প্রাপ্য আসনের

অংশ ছাড়িয়া দিতে হইল। অথচ ন্যায়-নীতির দিক হইতে বিচার করিলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রূপে তাহারাই 'ওয়েটেজ' পাইবার দাবীদার। এ স্থলে ইহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যদিও মুসলমানগণ এতদুভয় প্রদেশের আইন-পরিষদসমূহে একক সর্ববৃহৎ দল এবং যদিও পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা পরিপূরণীয় কিছু-সংখ্যক আসন এখনও তাঁহাদের জন্য সংরক্ষিত ; তথাপি মুসলিম প্রতিনিধির সংখ্যা এরূপভাবে হ্রাস করিয়া ফেলা হইল যে, তাহার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পরিণত হইয়া গেল সংখ্যালঘু দলে। যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলে সংখ্যালঘিষ্ঠতা ও গরিষ্ঠতা নির্বিশেষে হিন্দুদিগকে প্রত্যেক প্রদেশেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল, বিশেষ করিয়া বাংলায় যে ব্যবস্থার দ্বারা তাহাদের উপর আরোপিত ক্ষতির পরিমাণ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত ক্ষতি অপেক্ষা বহু বেশী—প্রায় দ্বিগুণ, সমগ্র হিন্দুসমাজ যদি তাহার উপর বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।"...

[খণ্ডিত ভারত : পৃঃ. ১৫৭]

তাছাড়া বাংলা দেশের উচ্চবর্ণের হিন্দুদের 'পুণা-চুক্তি'র বিরুদ্ধেও প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও অসন্তোষ ;—কেননা, 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা'র মূল প্রস্তাবে বাংলা দেশের অনুন্নত শ্রেণীগুলির জন্য যেখানে মোট ৮০টি আসনের মধ্যে ১০টি আসন নির্ধারিত করা হইয়াছিল, পুণা-চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে তাঁহারা মোট ৩০টি আসন লাভ করিলেন।

২১শে জুলাই, বিলেতে জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির বৈঠকে স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার পুণা-চুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি ও সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ইহাতে বাংলা দেশের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইয়াছে এবং বাংলা দেশের প্রখ্যাত নেতারা ইহাতে কেহই সম্মতি বা স্বাক্ষরদান করেন নাই। জবাবে স্যামুয়েল হোর বলেন যে, তাঁহার কাছে পুণা-চুক্তি আলোচনার সময় ইহার সমর্থনে বহু লোকের কাছ থেকে টেলিগ্রাম আসিয়াছিল এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু স্যামুয়েল হোর-এর এই বক্তব্য সমর্থন করিয়া বলেন যে, তিনি ও জয়াকার সেই সময় পুণায় উপস্থিত ছিলেন ; এবং রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে যে সকল তার আসিয়াছিল সেগুলির কথা তাঁহার মনে আছে।—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের পুণা-চুক্তির সমর্থনে বিলেতে টেলিগ্রাম করার বিষয়টি সত্য।

[দ্র. আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৪শে জুলাই, ১৯৩৩]

রয়টার প্রচারিত এই খবর প্রকাশিত হইলে কবি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও পুণা-চুক্তির পরিণাম যে কতখানি ক্ষতিকর ও মারাত্মক সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সৃষ্টি করিবে, তাহা ইতিমধ্যে কবির নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। বাংলা দেশের ক্ষেত্রে ইহার দ্বারা কতবড় অন্যায় অবিচার করা হইয়াছে, সে-কথাও বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। ঐদিনই তিনি (২৪শে জুলাই) শান্তিনিকেতন থেকে বিলেতে স্যর নৃপেন্দ্রনাথকে এক জরুরি তারবার্তায় পুণা-চুক্তির বিরুদ্ধে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়া একটি বিবৃতি পাঠান। তাছাড়া 'এ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেসের' মাধ্যমে তিনি ঐদিনই বিবৃতিটি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দেন। গান্ধীজীর অনশনের সময় সেদিন কি মানসিক অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্যে তিনি পুণা-চুক্তির

সমর্থনে বিলেতে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন তাহার ব্যাখ্যা করিয়া তিনি ঐ বিবৃতিতে বলেন :

"সাম্প্রদায়িক রায় সম্বন্ধে মহাত্মাজি প্রধানমন্ত্রীর নিকট যে প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা গ্রহণ করিতে বিলম্ব না করিবার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রীর নিকট একটি তার পাঠাইয়াছিলাম, ইহা আমার স্মরণ আছে। সে সময় এমন এক মর্মন্তুদ পরিস্থির উদ্ভব হইয়াছিল যে, পুণা-চুক্তির পরিণাম সম্বন্ধে ধীরভাবে বিবেচনা করিবার মত মনের শান্তি বা অবসর ছিল না। পুণা-চুক্তি তখন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং সেই সম্মেলনে বাঙলার কোন দায়িত্বশীল প্রতিনিধি যোগদান করেন নাই। এই সমস্যার আশু সমাধানের উপর মহাত্মাজির জীবন নির্ভর করিতেছিল। এই সমস্যা হেতু যে দারুণ উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার ফলে আমি তাড়াতাড়ি এমন কথা বলিয়াছি, যাহা দেশের স্থায়ী উন্নতির দিক হইতে বলা ভুল বলিয়া এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি। রাজনৈতিক ব্যাপারে আমার কখনও কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, পক্ষান্তরে মহাত্মাজির প্রতি গভীর ভালোবাসা ও ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁহার জ্ঞান আছে, এই বিশ্বাসে আমি অধিকতর বিবেচনার জন্য প্রতীক্ষা করিতে সাহস করি নাই। ইহা বস্তুতই দুর্ভাগ্যের বিষয়, কারণ বাঙলার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ন্যায়বিচার করা হয় নাই। আমার এখন এ বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই যে, এই অন্যায় বাঙলার সকল সম্প্রদায়ের উপরই অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিবে এবং এতৎ প্রদেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবহ্নিকে প্রচণ্ডভাবে প্রজ্বলিত রাখিবে, ফলে শান্তিপূর্ণ শাসন এদেশের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিবে। হোয়াইট পেপারের অপর সকল প্রস্তাবনা সম্পর্কে যদিও পুনর্বিবেচনা সম্ভবপর হইতেছে তথাপি আমাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নটি সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করিতে ব্রিটিশ সরকারের অসম্মতিতে আমরা বিস্মিত বা দুঃখিত হই নাই, কিন্তু বাঙলা ছাড়া ভারতের অপরাপর প্রদেশের প্রতিনিধিগণের এই ব্যাপারে শুধু উদাসীন থাকা নহে, বরং বাংলার স্বার্থবিরুদ্ধ কার্যে অংশ গ্রহণ করা বস্তুতই অতিমাত্র মর্মপীড়াদায়ক—ইহা হইতে আমাদের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের যে চিত্র কল্পনা করা যায় তাহা মোটেই কল্যাণসূচক নহে।"
—এ. পি. [আনন্দবাজার পত্রিকা : ১০ই শ্রাবণ, ১৩৪০ : ২৬শে জুলাই, ১৯৩৩]

এই বিবৃতির শেষের কয়েকটি কথায় এক শ্রেণীর ভারতীয় প্রতিনিধির বাংলার স্বার্থবিরোধী মনোভাব ও আচরণের বিরুদ্ধে কবির যে ক্ষোভ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা লক্ষণীয় ;—বলাবাহুল্য, সপ্রু-জয়াকরদের লক্ষ্য করিয়াই তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন। এই প্রসঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কবির উপরোক্ত মন্তব্যের টীকায় বলেন :

"The reference in the last few lines of the statement is to what Sir Tej Bahadur Sapru said on behalf of himself and Mr. Jayakar, supporting Sir Samuel Hoare. Dr. Tagore's apprehension are not baseless. It has been reported that Sir Purushottamdas Thakurdas has opposed the proposal to give Bengal even half the proceeds of the Jute export duty, though in Bengal the Government, the Europeans, the Musalmans and the Hindus are convinced that Bengal is entitled

to the entire proceeds of that duty. ·· Bengal may be despicable, but facts and justice are not. And the facts are that the Central Government takes the largest amount and the highest percentage of revenue from Bengal, and that Bengal is consequently a deficit province, not on account of lack of resources but because of 'inequitable distribution of revenue between the Centre and the Provinces', as the Bengal Publicity Board semi-official pamphlet on 'Provincial Finance under the White Paper' puts it."

[*Modern Review* : August, 1933 ; pp. 239-40]

এদিকে ২৩শে জুলাই অকস্মাৎ বজ্রপাতের ন্যায় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মৃত্যু-সংবাদ আসিয়া পৌঁছে। ১৯৩২ সালের শুরুতেই ইউরোপ থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে বোম্বাইয়ে জাহাজে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় (১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন বলে)। তদবধি তিনি অন্তরীণাবদ্ধ ছিলেন এবং সেই অবস্থাতেই রাঁচীতে তাঁহার মৃত্যু হয় (২২শে জুলাই মধ্যরাত্রে)। জে. এম. সেনগুপ্তের মৃত্যুতে সারা দেশে নিদারুণ শোকের ছায়া নামিয়া আসে। শান্তিনিকেতনে এই সংবাদ আসার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ২৪শে জুলাই প্রাতে এক স্মরণ-সভায় কবি অল্প কয়েকটি কথায় জাতির গভীরতম মর্মবেদনা প্রকাশ করিয়া বলেন :

"স্বদেশের মঙ্গলের জন্য যে সমস্ত সাহসী যোদ্ধা সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, যতীন্দ্রমোহন তাঁহাদের অন্যতম। মাতৃভূমির উন্নতিসাধনের জন্য কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকারেই তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। তিনি তাঁহার লাভজনক আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন এবং স্বয়ং আন্দোলনের আবর্তে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সমগ্র পরিবারের সহিত অপরিসীম দুঃখের জীবন বরণ করিয়া লন। আচরণে মহৎ এবং সৌজন্যে সর্বজয়ী যতীন্দ্রমোহন সমগ্র ভারতের একজন সর্বজনপ্রিয় রাষ্ট্রনৈতিক নেতা ছিলেন, ভারতের জাতীয় জীবনের এই সঙ্কট মুহূর্তে এরূপ একজন নেতাকে হারাইয়া দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। দীর্ঘকাল রাজনৈতিক বন্দীরূপে আবদ্ধ থাকার জন্যই যে তাঁহার মৃত্যু এত ত্বরান্বিত এবং এত অসময়ে সংঘটিত হইল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি রুচিসম্পন্ন এবং শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন কিন্তু যখন তাঁহার স্বদেশের আহ্বান আসিল, তখন তিনি স্বাধীনতার বেদীমূলে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করার মধ্যেই আনন্দ উপভোগ করিলেন। যে জীবন মহৎভাবে উদ্‌যাপিত এবং অকুণ্ঠিতচিত্তে উৎসর্গীকৃত, তাঁহার স্মৃতি ভারতের পক্ষে গৌরবের ও বেদনার।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ৯ই শ্রাবণ, ১৩৪০ : ২৫শে জুলাই, ১৯৩৩]

ব্যক্তিগত আইন-অমান্য আন্দোলন পরিচালনার ব্যাপারে গান্ধীজী এই সময় খুবই ব্যস্ত ছিলেন। তিনি কংগ্রেসকর্মীদের সর্বপ্রকার গোপনীয়তা বর্জন করিয়া প্রকাশ্যেই আন্দোলন চালাইবার নির্দেশ দেন। তাছাড়া সবরমতী আশ্রম পরিচালনার ব্যাপারেও নানা সমস্যা দেখা দেয়। ২৬শে জুলাই তিনি এক বিবৃতিতে সবরমতী আশ্রম ভাঙিয়া দিবার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। এই সময়ই পুণা-চুক্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ঐ প্রেস-বিবৃতি পাঠ করিবার পর গান্ধীজী বেশ কিছুটা

বিষণ্ণ ও মর্মাহত হইয়া পড়েন। ২৭শে জুলাই আমেদাবাদ থেকে তিনি কবিকে এ-বিষয়ে পরিষ্কারভাবে খুলিয়া লিখিবার অনুরোধ জানাইয়া একটি পত্র দেন। পত্রটি ছিল এই :

Ahmedabad. 27 July, 1933

Dear Gurudev,

I have read your press message regarding the Yeravda Pact, in so far as it applies to Bengal. It caused me deep grief to find that you were misled by very deep affection for me and by your confidence in my judgment into approving of a Pact which was discovered to have done a grave injustice to Bengal. It is now no use my saying that affection for me should not have affected your judgment, or that confidence in my judgment ought not to have made you accept a Pact about which you had ample means for coming to an independent judgment. Knowing as I do your very generous nature, you could not have acted otherwise than you did and in spite of the discovery made by you that you have committed a grave error you would continue to repeat such errors if the occasions too were repeated.

But I am not at all convinced that there was any error made. As soon as the agitation for an amendment of the Pact arose, I applied my mind to it, discussed it with friends who ought to know and I was satisfied that there was no injustice done to Bengal. I corresponded with those who complained of injustice. But they too, including Ramananda Babu, could not convince me of any injustice. Of course, our points of view were different. In my opinion, the approach to the question was also wrong.

A Pact arrived at by mutual arrangement cannot possibly be altered by the British Government except through the consent of the parties to the Pact. But no serious attempt seems to have been made to secure any such agreement. Your appearence, therefore, on the same platform as the complainants, I, for one, welcome, in the hope that it would lead to a mutual discussion, insted of a futile appeal to the British Government. If, therefore, you have, for your own part, studied the subject and have arrived at the opinion

that you have now pronounced, I would like you to convene a meeting of the principal parties and convince them that a grave injustice has been done to Bengal. If it can be proved, I have no doubt that the Pact will be re-considered and amended so as to undo the wrong, said to have been done to Bengal. If I felt convinced, that there was an error of judgment, so far as Bengal was concerned, I would strain every nerve to see that the error was rectified. You may know that upto now I have studiously refrained from saying anything in public, in defence of the Pact, save by way of reiterating my opinion, accompanied by the statement that if injustice could be proved, redress would be given. I am. therefore, entirely at your service.

Just now I am absorbed in disbanding the Ashram and devising means of saving as much as can be for public use. My service will, therefore, be available after I am imprisoned, which event may take place any day after the end of this month. I hope you are keeping good health.

Yours sincerely
Sd/ M. K. Gandhi

কিন্তু গান্ধীজীর এই পত্র পাবার পূর্বেই কবি তাঁহার বিবৃতির একটি কপি গান্ধীজীকে পাঠাইয়া দিয়া লিখিলেন (২৮শে জুলাই) :

Uttarayan, Santiniketan.
28 July, 1933.

Dear Mahatmaji,

This is the copy of the message which with very great pain and reluctance, I cabled to Sir Nripen and from which you will know how I feel about the Poona Pact. I am fully convinced that if it is accepted without modification it will be a source of perpetual communal jealousy leading to constant disturbance of peace and a fatal break in the spirit of mutual co-operation in our province. With love and reverence.

Sd/ Rabindranath Tagore

এই সময় বিখ্যাত ইংরেজ মানবপ্রেমিক উইলিয়াম উইলবারফোর্সের মৃত্যু-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে কবি একটি বাণী পাঠান। দাসত্বপ্রথা উচ্ছেদের জন্য এই বিখ্যাত মানবপ্রেমিক আমরণ অক্লান্ত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ খৃঃ ২৯শে

জুলাই ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে দাস ব্যবসা রহিত করিয়া আইন পাশ হয়। ঐদিনই উইলবারফোর্সের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুদিবস উপলক্ষে ঐ দিনটি বিশ্বের দাসত্বপ্রথা উচ্ছেদ দিবস হিসাবে স্মরণ করা হয়। ২৯শে জুলাই ইংলণ্ডে 'হাল' (Hull) শহরে উক্ত শতবার্ষিকী আন্তর্জাতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী—উভয়েই বাণী পাঠান এবং সেগুলি প্রথমে ডাঃ কালিদাস নাগ সম্পাদিত *'India and the World'* পত্রে প্রকাশিত হয়। কবির বাণীর মর্মার্থ ছিল এই :

"উইলবারফোর্সের মহাপ্রাণতায় যেদিন লাভের ব্যবসায় দাস-ব্যবসায় রহিত হয়, সেদিন হইতে একশত বৎসর অতীত হইল ; যথোপযুক্ত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া সেই মহাপুরুষের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু আমাদের ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে, ঐ বীভৎস প্রথা অদ্যাপি নিঃশেষে বিলুপ্ত হয় নাই ; আজিও সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত জগতের অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণে দাসত্বপ্রথা বর্তমান—উহার নাম আজ শ্রুতিগোচর হয় না বটে, সেই মনোবৃত্তি পূর্ববৎ বর্তমান রহিয়াছে। **চা, কফি, রবার প্রভৃতি ক্ষেত্রে, কলকারখানায়, সওদাগরী অফিসে আজিও দাসত্বপ্রথা বর্তমান ; গভর্নমেণ্টসমূহের বিচার-বিভাগ আজিও দাস-ব্যবসায়ের মনোবৃত্তিতে ভরপুর ; আজিও তথায় আদিম যুগের প্রতিহিংসাপরায়ণতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানুষ নৃশংস বর্বরতা অনুষ্ঠানের অধিকার দাবী করে।** আজিও মানবজাতির এক বিরাট অংশ ক্ষমতা ও লাভের জন্য উম্মত্ত হইয়া শিকার খুঁজিয়া বেড়ায়, এবং অধিকতর পরিতাপের বিষয় এই যে, একদল লোক তাহাদের স্বার্থ-পরায়ণ উদ্দেশ্য-সাধনকল্পে নির্মমভাবে স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করিয়া মনে করে, তাহারা পরম অনুকম্পাশীল আদর্শ অনুসরণ করিতেছে। (বড়ো হরফ আমার)

"যে অসংযত দাসত্বপ্রথা সমগ্র জগতে পরিব্যপ্ত এবং যাহা আপনার নৃশংসতায় উদাসীন হইয়া মানুষের বিবেককে উৎকোচে বশীভূত করিতেছে—হৃদয়হীনতায় সর্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, কবে সেই দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে কম্বুকণ্ঠে দণ্ডাদেশ উচ্চারিত হইবে, আবহমানকাল যাবত মানব সেই দিনেরই প্রতীক্ষা করিতেছে।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ১৩ শ্রাবণ, ১৩৪০ : ২৯শে জুলাই, ১৯৩৩]

এই বিষয়ে তাঁহার মূল বক্তব্যটির সাথে কমিউনিস্টদের মূল বক্তব্যের অন্তত একটি জায়গায় খুবই সাদৃশ্য আছে। এবং সেটি হইতেছে এই যে, গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইয়া পুঁজিবাদী সমাজ মুখে সভ্যতার যত বড়াই-ই করুক না-কেন, সমগ্র পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী জগতে জনগণের অবস্থা দাসযুগের স্তরেই রহিয়া গিয়াছে।

উল্লেখযোগ্য, গান্ধীজীও উইলবারফোর্সের মৃত্যুশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে তারযোগে একটি সংক্ষিপ্ত বাণী প্রেরণ করেন। উহাতে তিনি বলেন :

"India has much to learn from the heroes of the abolition of slavery for we have slavery based upon supposed religious sanction and more poisonous than its Western fellows."

এই সময় গান্ধীজী স্বয়ং ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, ১লা আগস্ট তিনি আশ্রমের ৩৩ জন

স্বেচ্ছাসেবকসহ গুজরাটের রাস অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে এই আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য যাত্রা করিবেন। ঐদিনই পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া প্রথমে সবরমতী জেলে পরে যারবেদা জেলে আটক করিয়া রাখে। ৪ঠা আগস্ট তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গতিবিধি পুণা শহরে নিয়ন্ত্রিত রাখিবার নির্দেশ জারী করা হয়। বলাবাহুল্য, গান্ধীজী উহা অমান্য করেন। ফলে পুনরায় গ্রেপ্তার হইয়া তিনি যারবেদা জেলে ফিরিয়া আসেন। গভর্নমেণ্টের নির্দেশ অমান্য করার অপরাধে এবারে তাঁহার একবৎসর কারাদণ্ড হয়। ৭ই আগস্ট তিনি জেলখানা থেকে রবীন্দ্রনাথের পত্রের উপর কোনরূপ মন্তব্য না-করিয়া, শুধুমাত্র প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াই তাঁহাকে একটি পত্রে কয়েকছত্র লিখেন। কিন্তু কবি গান্ধীজীর এই পত্র পাবার পূর্বেই গান্ধীজীর পূর্বপত্রের জবাবে পুণা-চুক্তি সম্পর্কে তাঁহার বহুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে একটি পত্র দেন (৮ই আগস্ট, ১৯৩৩)। পত্রটি ছিল এই :

August 8, 1933

Dear Mahatmaji,

At this unhappy moment when I am sure you need complete rest after the streneous days of mental and physical strain I do not wish to trouble you with any detailed discussion of the Poona Pact. You are satisfied that there was no injustice done to Bengal. I wish I could accept your words and remain silently contented about it, but it has become impossible for me knowing for certain that the communal award advocated by the Pact, if it remains unaltered will inflict a serious injury upon the social and political life in Bengal. Justice is an important aspect of truth and if it is allowed to be violated for the sake of immediate peace or speedy cutting of some political knots in the long run it is sure to come back to those who are apparently benefited by it and will claim a very heavy price for the concession cheaply gained. You know that I am not a politician, and I look upon the whole thing from the point of view of humanity which will cruelly suffer when its claim to justice is ignored. I give you in this letter only my own considered opinion and do not desire any answer for it. With love and reverence.

Yours sincerely
Sd/ Rabindranath Tagore.

গান্ধীজীও কবির এই পত্রের জবাব দেন নাই বা প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

'কালান্তর' : রাজনীতিক পটভূমি

১৯৩৩ সালের নববর্ষের দিন জাপ সেনাবাহিনী অকস্মাৎ মূল চীনা-ভূখণ্ডে অবস্থিত শানহাই কোয়ান্ শহর আক্রমণ করিয়া বসে। কামানের গোলা ও এরোপ্লেন হইতে অবিরাম বোমাবর্ষণের ফলে শানহাই কোয়ান্ শহরটির প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়। জাপান 'লীগ অব নেশনস্'-এর কোনরূপ তোয়াক্কাই করিল না পরন্তু এই সময়ই সে বিধিমত দুই বৎসরের নোটিশ দিয়া লীগের সভ্যপদে ইস্তফা দিয়া হাত পরিষ্কার রাখিতে চাহিল (২৭শে মার্চ, ১৯৩৩)। তারপর বিজয় উল্লাসে জাপবাহিনী চীনের জেহোল প্রদেশ অধিকার করিয়া পিকিঙের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। অবশেষে জাপ-সেনাবাহিনী যখন পিকিঙ্ শহরের উপকণ্ঠে আসিয়া উপনীত হইল (মে, ১৯৩৩), তখন নিরুপায় হইয়া চীনসরকার এক অপমানকর শর্তে জাপানের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। ফলে প্রায় সমগ্র মাঞ্চুরিয়াই চীনকে হারাইতে হয়।

উল্লেখযোগ্য, ইহার অত্যল্পকাল পূর্বেই জার্মানীতে হিটলারী নাৎসীবাদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। নাৎসী 'ঝটিকা বাহিনীর' (Storm Troops Brownshirts) হিংস্র ক্রিয়াকলাপে ও জার্মান সমরনায়কদের চাপে একরকম বাধ্য হইয়াই প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গ হিটলারকে চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ করেন (৩০শে জানুয়ারী, ১৯৩৩)। ইহার পর হিটলারের লক্ষ্য হয় জার্মানীর চূড়ান্ত ডিক্টেটরিয়েল্ ক্ষমতা লাভ। হিটলার চূড়ান্ত ক্ষমতায় আসিবার পূর্বেই রাইখস্টাগে অগ্নিকাণ্ড ঘটাইয়া (২৭শে ফেব্রুয়ারি) ইহার জন্য কমিউনিস্টদের দায়ী করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে এক মিথ্যা ও জঘন্য ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করেন। তারপর সহস্র সহস্র কমিউনিস্টকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ভয়েই হোক ভক্তিতেই হোক, ইহার অল্পকাল পরেই রাইখস্টাগের অধিকাংশ সদস্যের ভোটে হিটলার চার বৎসরের জন্য জার্মানীর সর্বেসর্বা বা 'ফ্যুয়রর' পদে অধিষ্ঠিত হন (২৪শে মার্চ, ১৯৩৩)। তারপর শুরু হয় কমিউনিস্ট ও ইহুদী নিধন পর্ব। শুধু কমিউনিস্ট ও ইহুদীদের 'পরেই নহে —ইহার পর হিটলারের 'ঝটিকা বাহিনী' সারা জার্মানীর বুকে এক প্রচণ্ড বিভীষিকার রাজত্ব শুরু করিয়া দেয়। রাইখস্টাগ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, পবিত্র হ্বাইমার শাসনতন্ত্রও পদদলিত হইল। সহস্র সহস্র কমিউনিস্ট, সোস্যালিস্ট, ট্রেড ইউনিয়ন-পন্থী, ইহুদী, গণতন্ত্রবাদী, শান্তিবাদী, উদারপন্থী ও প্রগতিশীলদের রক্তে জার্মানীর কলকারখানা-পথ ঘাট-বাজার কলুষিত হইয়া উঠিল। বর্বরতায় ও নৃশংসতায় হিটলার তাহার দোসর মুসোলিনীকেও যেন ছাড়াইয়া যাইতে চাহিল। এই সংবাদে সারা পৃথিবীর গণতন্ত্রবাদী ও শান্তিকামী মানুষ আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া পড়িল।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে-সব ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকা ইহার কিছুকাল পূর্বেও

জার্মানীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আসিতেছিল তাহারাও এখন ফলাও করিয়া নাৎসী বর্বরতার সংবাদ প্রকাশ করিতে থাকে। ১৯৩৩ সালের এপ্রিলের শেষভাগে প্রায় সমস্ত পত্র-পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথের পৌত্র সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর জার্মানীতে নাৎসী পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। সৌম্যেন্দ্রনাথ নাৎসী কনসেণ্ট্রেশন্ ক্যাম্পে কিছুদিন নির্যাতন ভোগ করিবার পর মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি ফ্রান্সে গিয়া বারবুস ও রোলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং পরে তিনি "ডেলি ওয়ার্কার" ও League Against Imperialism-এর ব্রিটিশ শাখার নিকট নাৎসী বর্বরতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া একটি বিবৃতি পাঠান (*The Referee* : London, 7th May, 1933)। রয়টারের মাধ্যমে এই সংবাদ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই প্রচারিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ সংবাদপত্রযোগে কিছু কিছু করিয়া সব খবরই জানিতে পারেন। সভ্যতা-সংস্কৃতি, শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য—সব কিছুই এক মহাবিপর্যয় ও সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে, কবি মর্মে মর্মে ইহা উপলব্ধি করিয়া অশান্ত ও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। দেশের ও বিশ্বের সমগ্র পরিস্থিতির পর্যালোচনা করিয়া এই সময়ই তিনি সুবিখ্যাত 'কালান্তর' নামক প্রবন্ধটি রচনা করেন (পরিচয় : শ্রাবণ, ১৩৪০)।

একদা ব্রিটিশ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগমন উপলক্ষে কিভাবে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের আলো ভারতবাসী তথা সমগ্র প্রাচ্যবাসীর চিত্তে আলোড়ন এবং নবজাগরণের প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিল, কবি এই প্রবন্ধের শুরুতেই তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এই প্রবন্ধে কবি ভারতের প্রাচীন সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত দৃষ্টিতে বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইউরোপের রেনেসাঁস-রিফর্মেশন-রেভলিউসনের মর্মবাণীকে কবি চিরদিনই স্বাগত জানাইয়াছেন কিন্তু এই প্রবন্ধে তিনি উহা যত সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় করিয়াছেন ইতিপূর্বে অন্য কোনো রচনায় তেমনটি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

ভারতে ইংরেজ আগমনের প্রথমযুগের তাৎপর্য সম্পর্কে পর্যালোচনা করিতে গিয়া তিনি বলেন যে, সেদিন ইংরেজ শুধু মানুষরূপেই আসে নাই, আসিয়াছে নব্য ইউরোপের 'চিত্তদূত' ও 'চিত্ত-প্রতীকরূপে'। ইংলণ্ডের কবি-সাহিত্যিক ও বিবেকী বুদ্ধিজীবীদের 'পরে সেদিন ভারতের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অসীম শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল এবং শুধু তাহাই নয়, এই আস্থা ও বিশ্বাসই সেদিন আমাদের রাজনীতিক চেতনা ও মুক্তি-সাধনার পথে উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগাইয়াছিল। ইউরোপ তাহার এই চিত্তসম্পদ ও জ্ঞানের আলোকে সারা পৃথিবীকে আলোকিত করিবে এই ছিল কবির তথা শিক্ষিত ভারতবাসীর ধারণা। কিন্তু অচিরেই ইউরোপ সম্পর্কে তাঁহার মোহভঙ্গের পালা শুরু হয় যখন ইউরোপ তাহার কুৎসিত পররাজ্যগ্রাসী ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের তাড়নায় নবজাগ্রত প্রাচ্যের জাতীয় চেতনাকে নিষ্পেষিত করিবার অভিযান শুরু করে। এই নিদারুণ মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিতে গিয়া কবি বলিলেন :

"ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয়মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্য নয়, আগুন লাগাবার জন্যে। তাই একদিন কামানের গোলা আর আফিমের পিণ্ড এক সঙ্গে বর্ষিত হল চীনের মর্মস্থানের উপর।... সভ্য য়ুরোপ চীনের মতো এতো বড়ো দেশকে জোর করে যে বিষ গিলিয়েছে তাতে চিরকালের মতো তার মজ্জা জর্জরিত হয়ে গেল। এক দিন তরুণ পারসিকের দল দীর্ঘকালের অসাড়তার জাল থেকে পারস্যকে উদ্ধার করবার জন্যে যখন প্রাণপণ করে দাঁড়িয়েছিল, তখন সভ্য য়ুরোপ কিরকম ক'রে দুই হাতে তার টুঁটি চেপে ধরেছিল, সেই অমার্জনীয় শোকাবহ ব্যাপার জানা যায় পারস্যের তদানীন্তন পরাহত আমেরিকান রাজস্ব সচিব শুস্টারের *Strangling of Persia* বইখানা পড়লে। ও দিকে আফ্রিকার কন্‌গো প্রদেশে য়ুরোপীয় শাসন যে কিরকম অকথ্য বিভীষিকায় পরিণত হয়েছিল সে সকলেরই জানা। আজও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোজাতি সামাজিক অসম্মানে লাঞ্ছিত, এবং সেই-জাতীয় কোনো হতভাগ্যকে যখন জীবিত অবস্থায় দাহ করা হয় তখন শ্বেতচর্মী নর-নারীরা সেই পাশব দৃশ্য উপভোগ করবার জন্যে ভিড় ক'রে আসে।"

তারপর প্রথম মহাযুদ্ধকালে য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির হনন-বিদ্যা ও পৈশাচিক যুদ্ধোন্মাদনা সম্পর্কে তাঁহার যে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা জন্মে তাহার কথা বর্ণনা করিতে গিয়া কবি বলিলেন :

"তার পরে মহাযুদ্ধ এসে অকস্মাৎ পাশ্চাত্য ইতিহাসের একটা পর্দা তুলে দিলে। যেন কোন্ মাতালের আব্রু গেল ঘুচে। এত মিথ্যা, এত বীভৎস হিংস্রতা নিবিড় হয়ে বহুপূর্বকার অন্ধ যুগে ক্ষণকালের জন্যে হয়তো মাঝে মাঝে উৎপাত করেছে, কিন্তু এমন ভীষণ উদগ্র মূর্তিতে আপনাকে প্রকাশ করে নি।...তারপর থেকে দেখছি য়ুরোপের শুভবুদ্ধি আপনার 'পরে বিশ্বাস হারিয়েছে, আজ সে স্পর্ধা ক'রে কল্যাণের আদর্শকে উপহাস করতে উদ্যত। আজ তার লজ্জা গেছে ভেঙে।... আজকাল দেখছি, আপনাকে ভদ্র প্রমাণ করবার জন্যে সভ্যতার দায়িত্ববোধ যাচ্ছে চলে। অমানবিক নিষ্ঠুরতা দেখা দিচ্ছে প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে। সভ্য য়ুরোপের সর্দার-পোড়ো জাপানকে দেখলুম কোরিয়ায়, দেখলুম চীনে; তার নিষ্ঠুর বলদৃপ্ত অধিকার-লঙ্ঘনকে নিন্দা করলে সে অট্টহাস্যে নজির বের করে য়ুরোপের ইতিহাস থেকে। আয়র্লণ্ডে রক্তপিঙ্গলের যে উন্মত্ত বর্বরতা দেখা গেল অনতিপূর্বেও আমরা তা কোনো দিন কল্পনাও করতে পারতুম না। তার পরে চোখের সামনে দেখলুম জালিয়ানওয়ালাবাগের বিভীষিকা।..."

কিন্তু কবি তাঁহার এই শেষজীবনে সবচেয়ে বেশি আঘাত পান গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সাধনপীঠ ইউরোপে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের উদ্ভবে। তিনি বলিলেন :

"...**যে য়ুরোপ এক দিন তৎকালীন তুর্কিকে অমানুষ ব'লে গঞ্জনা দিয়েছে তারই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকাশ পেল ফ্যাসিজ্‌ম্-এর নির্বিচার নিদারুণতা।** এক দিন জেনেছিলুম আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা য়ুরোপের একটা শ্রেষ্ঠ সাধনা, আজ দেখছি য়ুরোপে এবং আমেরিকায় সেই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ প্রতিদিন প্রবল হয়ে উঠেছে।...

"পোলিটিকাল মতভেদের জন্যে ইটালি যে দীপান্তরবাসের বিধান করেছে, সে কিরকম দুঃসহ নরকবাস সে কথা সকলেরই জানা আছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার আলোক যে-সব দেশ উজ্জ্বলতম ক'রে জ্বালিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রধান স্থান নিতে পারে জর্মনি। **কিন্তু আজ সেখানে সভ্যতার সকল আদর্শ টুকরো টুকরো ক'রে দিয়ে এমন অকস্মাৎ, এত সহজে উন্মত্ত দানবিকতা সমস্ত দেশকে অধিকার করে নিলে, এও তো অসম্ভব হল না।** যুদ্ধ পরবর্তীকালীন য়ুরোপের বর্বর নির্দয়তা যখন আজ এমন নির্লজ্জভাবে চার দিকে উদ্ঘাটিত হতে থাকল তখন এই কথাই বার বার মনে আসে, কোথায় রইল মানুষের সেই দরবার যেখানে মানুষের শেষ আপিল পৌঁছবে আজ। মনুষ্যত্বের 'পরে বিশ্বাস কি ভাঙতে হবে? বর্বরতা দিয়েই কি চিরকাল ঠেকাতে হবে বর্বরতা?"... (বড় হরফ আমার)

[কালান্তর-কালান্তর : পৃঃ. ২১-২৪]

গভীর দুঃখ ও ক্ষোভের মধ্যে এইসব প্রশ্নে মনের মধ্যে আলোড়ন চলিতে থাকিলেও মনুষ্যত্বের 'পরে কবি কোনদিনও আস্থা হারান নাই। তাছাড়া তিনি ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যে-ইউরোপে সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের উন্মত্ত তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে, সেই খাস ইউরোপেই উহার প্রতিরোধে দুর্জয় সাহস ও সংকল্প লইয়া একদল বিবেকী মানুষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উল্লেখযোগ্য, রোলাঁ ও বারবুস্ প্রমুখ ইউরোপের একদল মহান চিন্তানায়ক শুরু থেকেই ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের উন্মত্ত দানবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের আহ্বান জানান। গত মহাযুদ্ধকাল থেকে কবি ইঁহাদের অবিস্মরণীয় ও মহান সংগ্রামী-প্রচেষ্টা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন এবং বার বার অকুণ্ঠচিত্তে তিনি তাঁহাদের এই মহান প্রচেষ্টাকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানাইয়া আসিতেছিলেন। আর স্বদেশেও তিনি গান্ধীজী এবং দেশের মুক্তিসংগ্রামের বীর যোদ্ধাদের সেই অপরাজেয় সংগ্রামী মনোবল ও নৈতিক শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাই পৃথিবীর এই অন্ধকারময় দুর্যোগ মুহূর্তেও 'মাভৈঃ' বাণী উচ্চারণ করিয়া সকলকে নৈরাশ্য পরিহার করিবার আহ্বান জানাইয়া উপসংহারে বলিলেন :

..."কিন্তু সেই নৈরাশ্যের মধ্যেই এই কথাও মনে আসে যে, দুর্গতি যতই উদ্ধতভাবে ভয়ংকর হয়ে উঠুক, **তবু তাকে মাথা তুলে বিচার করতে পারি, ঘোষণা করতে পারি 'তুমি অশ্রদ্ধেয়', অভিসম্পাত দিয়ে বলতে পারি 'বিনিপাত',** বলবার জন্যে পণ করতে পারে প্রাণ এমন লোকও দুর্দিনের মধ্যে দেখা দেয়—এই তো সকল দুঃখের, সকল ভয়ের উপরের কথা। আজ পেয়াদার পীড়নে হাড় গুঁড়িয়ে যেতে পারে, তবুও তো আগেকার মতো হাতজোড় করে বলতে পারি নে, দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা। বলতে পারি নে, তেজীয়ান যে তার কিছুই দোষের নয়। বরঞ্চ মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, তারই দায়িত্ব বড়ো, তারই আদর্শে তারই অপরাধ সকলের চেয়ে নিন্দনীয়। যে দুঃখী, যে অবমানিত, সে যেদিন ন্যায়ের দোহাইকে অত্যাচারের সিংহগর্জনের উপরে তুলে আত্মবিস্মৃত প্রবলকে ধিক্কার দেবার ভরসা ও অধিকার সম্পূর্ণ হারাবে, সেই দিনই বুঝব, এই যুগ আপন শ্রেষ্ঠ সম্পদে শেষ কড়া পর্যন্ত দেউলে হল। তার পরে আসুক কল্পান্ত।" (বড় হরফ আমার) [ঐ : পৃঃ ২৪]

এখানে কবি তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় ও ভঙ্গীতে মানুষের বিবেকবুদ্ধি ও অপরাজেয় নৈতিক সংগ্রামের জয়গান করিয়াছেন, সত্য কথা। সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে ইহাও এক প্রকার সংগ্রাম, একথাও সত্য। কিন্তু কবির এই সংগ্রাম অনেকটা প্রতিবাদ-আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাছাড়া এই সংগ্রামের কোন স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল পরিপ্রেক্ষিত তাঁহার সম্মুখে ছিল না। এই জন্যই নৈরাশ্যজনক ও অন্ধকারময় ভবিষ্যতের চিত্র ছাড়া বড় একটা কিছু তিনি দেখিতে পাইলেন না। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রোলাঁ ও বারবুসের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য।

রোমাঁ রোলাঁ ও আঁরি বারবুস্—উভয়েই যেন বিংশ শতাব্দীর সদাজাগ্রত বিবেক-বুদ্ধির 'মহান প্রহরী'। তাঁহারা শুধু সাহিত্যিক ও শিল্পীই নন—শিল্পী-যোদ্ধা। কিন্তু তাঁহাদের এই সংগ্রাম ঠিক অকারী বা Passive ছিল না পরন্তু ছিল সঙ্ঘবদ্ধ সক্রিয় সংগ্রাম। সমগ্র বিশ্বব্যাপী এই আন্দোলনকে সংহত ও সংগঠিত করার জন্য উভয়েই জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম ও সংগ্রাম করিয়াছিলেন। ফরাসী-বিপ্লব ও 'প্যারী-কমিউন'-এর উত্তরসাধক হিসাবে তাঁহারা যে মননশীলতা ও মানসিকতার উত্তরাধিকারী হন, তাহার বলেই তাঁহারা অনায়াসে স্বচ্ছ ইতিহাস-চেতনা অর্জন করিতে সক্ষম হন। এই কারণেই রুশ-বিপ্লবের যুগান্তকারী তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহাদের যেমন বিলম্ব ঘটে নাই, তেমনি বিলম্ব ঘটে নাই ইতালী ও জার্মানীর ফ্যাসিবাদের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে। তাই সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ থেকে সোভিয়েট রাশিয়াকে রক্ষার আন্দোলনকে তাঁহারা যুদ্ধ-সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতেন না। অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রের সামগ্রিক চিত্রটি এবং যুদ্ধ ও সংগ্রামের সমগ্র পরিপ্রেক্ষিতটি তাঁহাদের নিকট অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। তাছাড়া সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে তাঁহাদের যেমন স্বচ্ছ চেতনা ছিল, তেমনি ছিল সংগ্রামের মোর্চা বা Front সম্পর্কে। ১৯৩২ সালের বসন্তকালে রোলাঁ ও বারবুস্ উভয়েই সর্বপ্রথম বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীদের এক সংযুক্ত ফ্রণ্ট গঠনের আহ্বান জানান। উহার কয়েকমাস পরে আমস্টার্ডামে তাঁহারা পৃথিবীর সমস্ত যুদ্ধ-বিরোধী দল, সঙ্ঘ ও গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের লইয়া এক মহাশান্তি সম্মেলন (২৭শে ও ২৮শে আগস্ট, ১৯৩২) আহ্বান করেন। উহার অনতিকাল পরেই জার্মানীতে কমিউনিস্ট ও শান্তিকামী গণতন্ত্রবাদীদের বিরুদ্ধে হিটলারী ফ্যাসীবাদের আক্রমণ শুরু হয়। রাইখস্টাগ অগ্নিকাণ্ডের কয়েকদিন পরই রোলাঁ পৃথিবীর শান্তিকামী গণতন্ত্রবাদী বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন (২রা মার্চ, ১৯৩৩):

"অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই হিটলারের বিভীষিকা মুসোলিনীর বিভীষিকাকে ছাপাইয়া গিয়াছে। যে-প্রভুর পদতলে বসিয়া ও যাহার আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া হিটলারী ফাশিজম্ আপনাকে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করিয়াছে সেই ইতালীয় ফাশিজম্ দশ বৎসরে যতখানি নির্বিকার হিংস্রতার পরিচয় দিতে পারে নাই, সে তাহার বেশি দিয়াছে মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই। যে রাইখস্টাগ অগ্নিকাণ্ডকে উপলক্ষ করিয়া সেই হিংসার নরক উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে তাহা যে কতবড় প্রতারণা এবং তাহার

পশ্চাতে যে কতখানি পুলিসের প্ররোচনা ছিল তাহা জানিতে আজ ইউরোপের কাহারও বাকী নাই, এই প্রতারণা ও অপপ্রচার; ন্যায়ের গণ্ডীর এই নির্লজ্জ উল্লঙ্ঘন; হিংস্র, প্রগতিবিরোধী দলবিশেষের হাতে এই যে সমস্ত সরকারী ক্ষমতা তুলিয়া দেওয়া; শিক্ষালয়ের অভ্যন্তরে পর্যন্ত রাজনীতির এই উদ্ধত অনধিকার প্রবেশ, স্বাধীন মতপ্রকাশে সাহসী যে দু একজন লেখক ও শিল্পী সেখানে আজো অবশিষ্ট আছেন তাহাদের এই নির্যাতন ও বিতাড়ন; শুধু সোশালিস্টদের নিকট নহে বুর্জোয়া লিবারেলদের নিকটেও যাহারা পরম শ্রদ্ধার পাত্র তাহাদের গ্রেপ্তার, সমগ্র জার্মানিতে সামরিক স্বেচ্ছাশাসন প্রতিষ্ঠা এবং যে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার উপর বর্তমান সভ্যতা দাঁড়াইয়া আছে তাহা প্রত্যাহার—ইহা আমরা কিছুতেই সহ্য করিব না। দল ও মত নির্বিশেষে ইউরোপ ও আমেরিকার সমস্ত লেখক ও জনমতবাহী প্রতিষ্ঠানকে আমরা এই আহ্বান জানাইতেছি যে, মানুষের ও নাগরিকের মৌলিক সম্মানকে ধূলিলুণ্ঠিত করিয়া এই যে নির্বিবেক বিভীষিকার রাজত্ব শুরু হইয়াছে, আসুন আমরা সকলে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া ইহার অকুণ্ঠ প্রতিবাদ জানাই।" [শিল্পীর নবজন্ম : পৃঃ. ৩০১-২]

ইহার অল্পকাল পরেই জার্মানীতে হিটলারী ফ্যাসীবাদ চূড়ান্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। নাৎসীদের পৈশাচিক দলননীতির সংবাদে সারা পৃথিবীর বিবেকী মানুষ যখন স্তম্ভিত ও আতঙ্কে বিহ্বল সেই সময় রোলাঁ ও বারবুস ইহার প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে একটি ফ্যাসি-বিরোধী আন্তর্জাতিক সমিতি গঠনের পরিকল্পনায় উদ্যোগী হন। স্মরণ রাখা দরকার, কয়েক বৎসর পূর্বে ইতালির ফ্যাসিস্ত বর্বরতার প্রতিরোধের জন্য প্যারীর সাল-ব্যুলিয়েতে তাঁহারা প্রথম একটি ফ্যাসি-বিরোধী সম্মেলন আহ্বান করেন (২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭)। বারবুস সেদিন রবীন্দ্রনাথকে এই মহান আন্দোলনে সাহায্য ও সহযোগিতা করিবার আবেদন জানান এবং রবীন্দ্রনাথও তাহাতে সাড়া দিয়া তাঁহার আন্তরিক সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এসব কথা পূর্বখণ্ডেই বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে।

রোলাঁ এই আন্তর্জাতিক ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া সারা বিশ্বের তরুণ ও যুবকদের উদ্দেশে এক আবেদন জানাইয়া বলেন (১৭ই মে, ১৯৩৩):

"আমাদের পক্ষ হইতে আমরা বলিব, জাতীয়তাবাদই আমাদের শত্রু। তরুণ সহকর্মিগণ, এই বাণীই আমাদের রণধ্বনি হউক।...

..."জার্মানির, ইতালীর এবং ডুচে ও ফুরার-শাসিত সবদেশেরই দুর্গত জনসাধারণের বন্ধু আমরা। আমরা আজ এখানে সংঘবদ্ধ হইয়াছি 'স্বেচ্ছাচারীদের বিরুদ্ধে' (তরুণ শীলারের এই কথাটি ফরাসী বিপ্লব গভীরভাবে গ্রহণ করিয়াছিল)। ধনতান্ত্রিক নিপীড়ন হইতে যে সকল জাতি মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতেছে তাহাদের লইয়া আমরা একটা আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ গড়িতে চাই। আমরা কোনো একটি বিশেষ জাতির জন্য লড়িতেছি না। শুধু আমাদের নিজের জাতির জন্যও নয়। আমরা যে সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ সমর্থন করিয়া লড়াই করিতেছি তাহার কারণ

সোভিয়েট ইউনিয়ন কোনো একটি জাতি নহে, রাশিয়া নহে, ইহা বিশ্বের সমস্ত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট গণতন্ত্রগুলির এক সম্মেলন। এই সম্মেলন বর্তমানের, ভবিষ্যতের, আমার, তোমার অর্থাৎ পৃথিবীর যে-কেহ উহাতে থাকিতে চাও সকলেরই।

…"ফাশিস্ত শত্রুকে পরাজিত করিতে হইবেই এবং সর্বপ্রথমে স্বদেশেই। স্বস্তিকার বিনাযুদ্ধে জয়লাভের কলঙ্ককাহিনী লইয়া যাহারা উল্লাসে মাতিয়া উঠিয়াছে সেই সকল উদীয়মান ফ্যুরারকে নিষ্ঠুরহস্তে দমন করিতে হইবে, এ আগাছাকে যদি আমরা শিকড় বসাইতে দিই তবে বিপদ আমাদের ঘনাইয়া আসিবে। এ-বীজ যেন আমাদের ঘিরিয়া না ফেলে।…

"সংগ্রামের ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত করিতে হইবে। পরিব্যাপ্ত করিতে হইবে উহাকে পৃথিবীর সর্বত্র।…সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী একটি কঠিন ফ্রণ্টে আমরা যখন একত্রে দাঁড়াইব, তখন গোষ্ঠী, জাতি ও ধর্মের বিভেদকে আমরা মানিব না। যে আমাদের পথরোধ করিবে সে ধ্বংস হইবে। সমগ্র মানুষের অভিযাত্রা রোধ করিবার শক্তি কাহারো নাই।" [ঐ : পৃঃ. ৩১০-১৩]

এখন বুঝিতে অসুবিধা হইবে না, রোলাঁ ও বারবুসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতার সাযুজ্য এবং পার্থক্য কোথায় ও কতটুকু। এখানে উল্লেখযোগ্য, ১৯৩৩ সালের জুন মাসেই ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্তর্জাতিক সমিতি গঠিত হয় এবং রোলাঁ উহার সভাপতি নির্বাচিত হন। যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনকে সারা বিশ্বব্যাপী সংগঠিত ও প্রসারিত করাই ছিল এই সঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষেও ইহার শাখা-কমিটি গঠিত হয় এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উহার সভাপতি নির্বাচিত হন। যথাসময়ে আমরা এই আলোচনায় আসিব।

এই প্রসঙ্গে এখানে একটি কথা বলা দরকার। রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বপরিস্থিতির পর্যালোচনা করিয়া 'কালান্তর' প্রবন্ধটি রচনা করেন তখনও পর্যন্ত ভারতে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে একমাত্র জওহরলাল ছাড়া অপর কাহাকেও বিশ্ব-পরিস্থিতির সমস্যা-সংকট সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করিতে দেখি না ;—আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণ সম্পর্কেও কাহারও কোনরূপ সচেতনতাও লক্ষ্য করা যায় না (অবশ্য কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্টরা ছাড়া)।

প্রসঙ্গত ভারতের সমসাময়িক রাজনীতিক চিন্তা-চেতনার মানটিও স্মরণ রাখা দরকার। উল্লেখযোগ্য, এর বেশ কিছুকাল থেকেই রয়টার পরিবেশিত নাৎসীদের গুণ্ডামী এবং ইহুদী ও কমিউনিস্ট নির্যাতনের খবর এদেশেরও সংবাদপত্রে নিয়মিত ফলাও করিয়া প্রচারিত হইতেছিল। অবশ্য এদেশের জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকাগুলি তা' ইংরেজদের মিথ্যা অপপ্রচার বলিয়া মনে করিতেছিলেন। বস্তুত হিটলার সম্পর্কে তাঁহাদের গোপন শ্রদ্ধা ও মোহ কম ছিল না। হিটলার চূড়ান্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পর 'আনন্দবাজার পত্রিকা' "হার হিটলার ও নব্য জার্মানী" এই শিরোনামায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিলেন :

এই নূতন ডিক্টেটর হিটলারের বিরুদ্ধে আমরা অনেক কথাই শুনিতেছি। তিনি

প্রতিপক্ষদিগকে নির্যাতন করিতেছেন, তাঁহার নাজীদলের উগ্রজাতীয়তার ফলে, ইহুদীরা লাঞ্ছিত হইতেছে, কমিউনিস্টদের উপর ভীষণ নির্যাতন হইতেছে ইত্যাদি। মিথ্যা প্রচার দক্ষ ইউরোপের সংবাদদাতাদের এই সকল সংবাদের অধিকাংশই সত্য নহে বলিয়াই আমাদের ধারণা। হিটলারের মত স্বদেশপ্রেমিক,—স্বজাতির কলঙ্ক বৃদ্ধি হয় এমন কার্য অনুমোদন করিবেন না বলিয়াই আমাদের ধারণা।

"যে শক্তিমান বীর নূতন পতাকাহস্তে ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে অন্যতম ভাগ্য-বিধাতারূপে পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন—তিনি হিটলার সফলকাম নায়ক মুসোলিনীর শিষ্য, ফরাসীর দুশ্চিন্তার স্থল এবং ইংরেজের উৎকণ্ঠার কারণ। চারি বৎসর নহে—কয়েক মাসেই বোঝা যাইবে, বাক্যানুযায়ী কার্য করিবার ক্ষমতা ও দক্ষতা ইঁহার আছে কি না? জার্মানীকে হীনতামুক্ত করিতে যদি তিনি কৃতকার্য হন, তাহা হইলে তিনি বর্তমানের রাষ্ট্রক্ষেত্রে এক মহৎ কার্য করিয়া ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন, সন্দেহ নাই।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ১১ই চৈত্র, ১৩৩৯ : ২৫শে মার্চ, ১৯৩৩]

ফ্যাসিবাদ ও ন্যাৎসীবাদকে—মুসোলিনী ও হিটলারের অভ্যুদয়কে ইঁহারা কি চোখে দেখিতেছিলেন ইহা হইতেই তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবিদের পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধের সুখ্যাতি ছিল। বিস্ময়ের কথা, বাংলার বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী সমাজের ফ্যাসিজম্ সম্পর্কে মোহ সেদিনও কম কিছু ছিল না। *Modern Review* ছিল তৎকালীন উচ্চবুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মুখপত্র। যে-মডার্ণ রিভিউতে রয়টার পরিবেশিত ফ্যাসিস্ত ও ন্যাৎসী বর্বরতার সংবাদ পরিবেশিত হইতেছিল, সেই পত্রিকাতেই মুসোলিনী ও ফ্যাসিজমের স্তুতি ও প্রশংসাবাদ করিয়া জনৈক পি. এন. রায়ের পর পর ২টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (Fascism and the New Generation—*Modern Review* : July, 1931. P. 64)। পি. এন. রায় ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতালীয় ভাষা-সাহিত্যের অধ্যাপক। রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতার তিনি ইতালীয় ভাষায় তর্জমা করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি '*Mussolini and the cult of Italian Youth*' নামে একটি পুস্তকে মুসোলিনীর বক্তৃতা সংকলন করিয়া ফ্যাসিস্ত জীবনাদর্শের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া লিখেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই পুস্তকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া মডার্ন রিভিউ-এ এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেন (দ্র. India and the Fascist Ideal—*M. R.* : February, 1932. pp. 152-53)। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় তার এক জায়গায় লিখিলেন ·

"The Fascist definition of the state makes it something essentially dynamic and educative, embracing all sections of the people and recognizing each section in its proper place. It is something which is refreshingly definite before the agnosticism which is apparently the guiding principle of the state such as we find in the most advanced countries where parliamentary institutions and *laissez faire* are the guiding principles···In the Fascist State it is not the domination of

the entire community by one section of the people ; whether capitalists or workers, or an exclusive ruling class, or this combination, or that other. These are excellent ideas which we should ponder over. In fact, there is a great deal in the Fascist case as put by Mr. Roy, that gives us food for thought. I would wish we could roll in this great principle enunciated by Mussolini with all the vigour that his personality stands for,…" ইত্যাদি

১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ-মুসোলিনী সংক্রান্ত গোলমালের দীর্ঘকাল পরও সুনীতিবাবুরা এসব কথা লিখিয়াছেন। যাহাই হোক, বাংলাদেশের উচ্চ বুদ্ধিজীবী সমাজ তখনও পর্যন্ত ফ্যাসিজমকে কি চোখে দেখিতেছিলেন ইহা হইতে তাহার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

জওহরলাল তখন কারাগারে। এই সময় কারাগারে বন্দী থাকাকালেই তিনি বিভিন্ন পুস্তক ও পত্র-পত্রিকাযোগে বিশ্বপরিস্থিতির গতিপ্রকৃতিটি অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সময়ই তিনি তাঁহার কন্যাকে পত্রচ্ছলে লেখা *Glimpses of world History* গ্রন্থটি রচনা করিতেছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্ব-ইতিহাসের শুধু একটি রেখাচিত্রই উপস্থাপিত করেন নাই ; একদিকে রুশ-বিপ্লবের যুগান্তকারী তাৎপর্যকে যেমন তিনি দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন অপরদিকে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের উদ্ভব ও তাহার বিপজ্জনক পরিণতি সম্পর্কে সময়োচিত সতর্কবাণী করিয়া তিনি যথার্থ ঐতিহাসিকের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। তাই গ্রন্থশেষে বিশ্বপরিস্থিতির সংকট ও যুদ্ধের ঘনায়মান কথা বলিয়াও তিনি মোটামুটি স্বচ্ছ একটি পরিপ্রেক্ষিত রাখিবার চেষ্টা করিলেন (৮ই আগস্ট, ১৯৩৩) :

"দুর্বল আর নিপীড়িত জনসাধারণের এই প্রচণ্ড জাগরণ দেখে মালিক শ্রেণীরা সর্বত্রই ভয়ে চঞ্চল হয়ে উঠছে, একে দমন করবার জন্য একত্রে দল বাঁধছে তারা। এরই ফলে আসে ফ্যাসিজ্‌ম্ ; সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সমস্ত বিরোধীপক্ষকে ভেঙে চূর্ণ করে দেয়। গণতন্ত্র, জনসাধারণের কল্যাণ আর তাদের মঙ্গলসাধনের দায়িত্ব ইত্যাদি যত বড়ো বড়ো বুলি এরা এতদিন কপ্‌চে এসেছে সেগুলো আর শোনা যায় না ; মালিক শ্রেণীর কায়েমী-স্বার্থের শাসন একেবারে উলঙ্গ মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, বহু ক্ষেত্রে হয়তো তারা জয়লাভও করেছে বলে মনে হয়। আসে একটা কঠোরতর যুগ, একটা তরবারি আর উগ্র উৎপীড়নের যুগ, কারণ সর্বত্রই তখন যুদ্ধ চলছে, সে যুদ্ধ প্রাচীন ব্যবস্থা আব নূতন ব্যবস্থার মধ্যে জীবনমরণ নিয়ে যুদ্ধ।…সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী ধনিকতন্ত্রী ব্যবস্থার গোড়াতেই যখন ভাঙন ধরেছে, যখন তার যেটা ন্যায্য দেনা এবং তার উপরে যে দাবি চাপানো হচ্ছে, সেটা শোধ করে দেবার সামর্থ্যও তার নেই ; তখন এ অবস্থায় একটা আংশিক সংস্কারের ব্যবস্থা করে আপাত-সমস্যাটার মীমাংসা বা সমাধান করে নেওয়া চলবে না।

"রাজনীতি নিয়ে অর্থনীতি নিয়ে জাতিগত পরিচয় নিয়ে এত অসংখ্য বিরোধ চলেছে। পৃথিবীতে এর ধোঁয়ায় আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে

আসন্ন হয়ে উঠেছে যুদ্ধের কৃষ্ণছায়া। পণ্ডিতেরা বলেন, এই অসংখ্যপ্রকার বিরোধের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ, সবচেয়ে তলস্পর্শী হচ্ছে একদিকে সাম্রাজ্যবাদ এবং ফ্যাসিজমের সঙ্গে অন্যদিকে কমিউনিজমের বিরোধ। পৃথিবীর সর্বত্রই এরা পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে, এদের মধ্যে আপস হবার কোনো সম্ভাবনা আর নেই।"

উপসংহারে তিনি বলিলেন :

"সমগ্র পৃথিবী আজ বেদনায় বিহ্বল, যুদ্ধের ছায়া বিপ্লবের সম্ভাবনা একে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই অলঙ্ঘ্য ভাগ্যের হাত এড়িয়ে পালিয়ে বাঁচবার পথ যদি আমাদের না থাকে, তার সম্মুখীন হব আমরা কোন্ ভঙ্গীতে? উট পাখীর মতো কি বালিতে মাথা গুঁজব, নিজেদের লুকিয়ে রাখব এর দৃষ্টির সামনে থেকে? না বীরের মতো এগিয়ে এসে অংশগ্রহণ করব পৃথিবীকে গড়ে তোলবার কাজে, প্রয়োজন হলে ক্ষতি আর বিপদের সম্ভাবনাকেও স্বীকার করে নিয়ে, লাভ করব একটা বিরাট ও মহান ব্রত সাধনের আনন্দ; গৌরব বোধ করব এই জেনে যে, আমাদের পদচিহ্ন ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে অঙ্কিত হয়ে যাচ্ছে?"

[বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ : পৃঃ. ৯১৬-১৮]

যে সমাজতান্ত্রিক এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতাবোধ থেকে তিনি জগতের ঘটনা-পরম্পরার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়া একটি সঠিক পরিপ্রেক্ষিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে-যুগে অন্তত এদেশে তাহার খুব প্রাদুর্ভাব ছিল না। বিশেষত এই দৃষ্টিভঙ্গী ও ইতিহাস-চেতনা রবীন্দ্রনাথের নিকট আশা করাই যায় না।

রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের চরিত্ররূপ ভালো করিয়াই জানিতেন। শুধু তাহাই নহে, ১৯২৬ সালে ইউরোপ থেকে ফেরার পর এদেশে তিনিই সর্বপ্রথম উহাদের তীব্র নিন্দাবাদ করিয়া নিপাত জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার এই জানার ভিত্তি বৈজ্ঞানিক-রাজনীতিক-আর্থনীতিক জ্ঞানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না। এই জন্য জগতের দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনা-পরম্পরার বিশেষ তাৎপর্য ও অর্থ তাহার নিকট পরিষ্কার ছিল না এবং এই কারণেই ভবিষ্যৎ সংগ্রাম ও যুদ্ধক্ষেত্রের সামগ্রিক চিত্র ও পরিপ্রেক্ষিতটিও তাঁহার নিকট খুব পরিষ্কার ছিল না।

মানসিক ধাতুগত বৈশিষ্ট্যে তিনি প্রধানত কবি; দেশের ও বিশ্ব-পরিস্থিতির কথা আলোচনা করিতে গেলেই তিনি তীব্র মানসিক যন্ত্রণা ও বেদনা অনুভব করিতেন। বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য মানুষের মধ্যে যে এত কুৎসিত লোভ, দ্বেষ, কপটতা. শঠতা, ক্রূরতা ও পৈশাচিক হিংসাবৃত্তি থাকিতে পারে তাহা ভাবিতেও পারেন নাই। দেখিয়া শুনিয়া এক একসময় তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ ও মানসিক যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়িতেন। উল্লেখযোগ্য, এই সময় এমনই দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে বুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়া তিনি 'প্রার্থনা' কবিতাটি (২৯শে জুলাই, ১৯৩৩) রচনা করেন।

"কামনায় কামনায় দেশে দেশে যুগে যুগান্তরে
নিরন্তর নিদারুণ দ্বন্দ্ব যবে দেখি ঘরে ঘরে
প্রহরে প্রহরে; দেখি অন্ধ মোহ দুরন্ত প্রয়াসে
বুভুক্ষার বহ্নি দিয়ে ভস্মীভূত করে অনায়াসে

নিঃসহায় দুর্ভাগার সকরুণ সকল প্রত্যাশা,
জীবনের সকল সম্বল ; দুঃখীর আশ্রয়বাসা
নিশ্চিন্তে ভাঙিয়া আনে দুর্দাম দুরাশাহোমানলে
আহুতি-ইন্ধন জোগাইতে ; নিঃসংকোচ গর্বে বলে,
আত্মতৃপ্তি ধর্ম হতে বড়ো ; দেখি আত্মম্ভরী-প্রাণ
তুচ্ছ করিবারে পারে মানুষের গভীর সম্মান
গৌরবের মৃগতৃষ্ণিকায় ; সিদ্ধির স্পর্ধার তরে
দীনের সর্বস্ব সার্থকতা দলি দেয় ধূলি-'পরে
জয়যাত্রাপথে ;—দেখি' ধিক্কারে ভরিয়া উঠে মন,
আত্মজাতি-মাংসলুব্ধ মানুষের প্রাণনিকেতন
উন্মীলিছে নখে দন্তে হিংস্র বিভীষিকা ;—চিত্ত মম
নিষ্কৃতিসন্ধানে ফিরে পিঞ্জরিত বিহঙ্গমসম,
মুহূর্তে মুহূর্তে বাজে শৃঙ্খলবন্ধন-অপমান
সংসারের।···

···"ভগবান বুদ্ধ তুমি,
নির্দয় এ লোকালয়, এ ক্ষেত্রেই তব জন্মভূমি।
ভরসা হারাল যারা, যাহাদের ভেঙেছে বিশ্বাস,
তোমারি করুণাবিত্তে ভরুক তাদের সর্বনাশ,—
আপনারে ভুলে তারা ভুলুক দুর্গতি।—আর যারা
ক্ষীণের নির্ভর ধ্বংস করে, রচে দুর্ভাগ্যের কারা
দুর্বলের মুক্তি রুধি', বোসো তাহাদেরি দুর্গদ্বারে
তপের আসন পাতি' ; প্রমাদবিহ্বল অহংকারে
পড়ুক সত্যের দৃষ্টি ; তাদের নিঃসীম অসম্মান
তব পুণ্য আলোকেতে লভুক নিঃশেষ অবসান।"

[রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১৫'শ খণ্ড : পৃঃ. ৩১০-১১]

আগস্ট মাসের শেষভাগে (৩০শে আগস্ট, ১৯৩৩) জওহরলাল নৈনী-কারগার থেকে মুক্তিলাভ করেন। কারামুক্তির অল্পকাল পরেই তিনি পুণাতে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। জাতীয় স্বাধীনতার লক্ষ্য ও তাহার পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়। জাতীয় আন্দোলনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির সহিত উহার স্বচ্ছ আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত ও নীতি সম্পর্কে কংগ্রেসের বক্তব্য স্পষ্টভাবে ঘোষণা করার জন্য জওহরলাল গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহিলেন। এই আলোচনার পরও এক দীর্ঘ পত্রের এক জায়গায় তিনি গান্ধীজীকে লিখিলেন, (১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩) :

"Another aspect has to be borne in mind. The problem of Indian freedom cannot be separated from the vital international problems of the world. The present crisis in the world's affairs is having its repercussions in India. At any moment, it may result in a complete

breakdown, or in a violent international conflagaration. Everywhere there is a conflict and a contest between the forces of progress and betterment of the masses and the forces of reaction and vested interests. We cannot remain silent witnesses to this titanic struggle for it affects us intimately. Both on the narrower ground of our own interests and the wider ground of international welfare and human progress, we must, I feel, range ourselves with the progressive forces of the world. This ranging ourselves at present can, of course, be ideological only." [*Mahatma* : Vol. III-Appendix ; P. 306]

পরদিনই গান্ধীজী উহার জবাবে এক দীর্ঘ পত্রে জওহরলালের প্রতিটি প্রশ্নেরই আলোচনা করেন। কংগ্রেসের আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণ সম্পর্কে জওহরলালের মতটি সমর্থন করিয়া তিনি ঐ পত্রের এক জায়গায় লিখিলেন :

…"Nor have I the slightest difficulty in agreeing with you that in these days of rapid intercommunication and a growing consciousness of the oneness of all mankind, we must recognize that our nationalism must not be inconsistent with progressive internationalism. India cannot stand in isolation and unaffected by what is going on in other parts of the world. I can, therefore, go the whole length with you and say that 'we should range ourselves with the progressive forces of the world." [*Ibid* : P. 309]

চিঠিতে একথা লিখিলেও গান্ধীজী তখনও পর্যন্ত ফ্যাসিবাদ ও নাৎসী বর্বরতার বিরুদ্ধে তেমন কোন সমালোচনা করেন নাই। কংগ্রেসের আন্তর্জাতিক নীতি-নির্ধারণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতেও তিনি তখনও পর্যন্ত বিশেষ চিন্তা-ভাবনা করিতে পারেন নাই। বস্তুতপক্ষে জওহরলালই এই বিষয়টিতে কংগ্রেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সময় তিনি '*Whither India*' নামক নিবন্ধে পরিষ্কার ঘোষণা করেন :

…"International and intranational activities dominate the world and nations are growing more and more interdependent. Our ideal and objective cannot go against this historical tendency, and we must be prepared to discard a narrow nationalism in favour of world co-operation and real internationalism.…

"Whither India ? Surely to the great human goal of social and economic equality, to the ending of all exploitation of nation by nation and class by class, to national freedom within the framework of an international co-operative Socialist world federation…"

এই প্রগতিশীল ও স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনা অন্তত তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদের কাহারও ছিল না। বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের রাজনীতির প্রকৃত উত্তরসাধক

ছিলেন জওহরলাল। হঠাৎ পড়িলে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতা ও প্রগতিশীল চিন্তাগুলিকে তিনি যেন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। ভাবাদর্শ, চিন্তা ও মানসপ্রকৃতিতে তিনি গান্ধীজী অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের অতি কাছাকাছি ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য, ইহার অল্পকাল পরেই সুভাষচন্দ্র প্রবাস থেকে ফ্যাসিস্ট আদর্শের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া এক বিবৃতি দেন। এই বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন, বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ হইতেছেন মুসোলিনী। প্রতিবাদে অমরেন্দ্র রায় 'দেশ' পত্রিকায় সুভাষচন্দ্রের এই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন।

[দ্র. দেশ : ১ম বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা ; ১৭ই মার্চ, ১৯৩৪ : পৃঃ. ৪৫-২৬]

তাছাড়া পূর্বেই বলিয়াছি ভারতবর্ষের পত্র-পত্রিকায় এই সময় হিটলার-মুসোলিনীর—এক কথায় ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের সপ্রশংস আলোচনা চলিতে থাকে। এইসব সংবাদে রোমাঁ রোলাঁ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ সম্পর্কে সতর্কবাণী করিয়া ভারতের তরুণ যুবসম্প্রদায়ের উদ্দেশে এক আবেদন জানান। রোলাঁর এই আবেদন-বাণীর মর্মার্থ ছিল এই :

"হে আমার ভারতের তরুণবন্ধুগণ! চিরদিন আমি ভারতবাসীকে শ্রদ্ধা করি এবং আপনাদের স্বাধীনতালাভের সংগ্রামে আপনাদিগকে সাহায্য করিতে আমি সর্বদাই ব্যগ্র। আপনাদের কাছে আমি তাই আজ একটি আবেদন করিতে চাই।

"ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে আমি আমার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকার উপর এই ফ্যাসিজম তাহার হিংস্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, ভারতবর্ষের উপরও করিতে উদ্যত হইয়াছে। ফ্যাসিজমের মার্জার-সদৃশ সাধুতায় আপনারা কিছুতেই ভুলিবেন না। আত্মমর্যাদা, স্বায়ত্তশাসন অথবা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য জাতির অব্যাহত চলার পথে ইহা অপেক্ষা ভীষণ শত্রু আর নাই। প্রত্যেক জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ইহা মিথ্যা এবং ভণ্ডামির মুখোশে নিজেকে আবৃত রাখে। অতি সুচতুরভাবে এই ফ্যাসিজম বিভিন্ন জাতির মনোবৃত্তির উপর, তাহাদের জাতীয় সংস্কারের উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে এবং বিজাতীয়গণের প্রতি তাহাদের যে ঘৃণা, তাহারই সুযোগ লইয়া ফ্যাসিজম স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া থাকে। কখনও কখনও ইহা এমন ভাব দেখায় যেন উৎপীড়িতদের লাঞ্ছনার প্রতি ইহাদের অশেষ সহানুভূতি আছে এবং তাহাদের লইয়া ইহারা যেন সংগ্রাম করিতে ইচ্ছুক।

"আসলে ফ্যাসিজম হইতেছে, অতীত যুগের পরাভূত এবং অজ্ঞাতনামা শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। এবং ইহাই আজ ধনতান্ত্রিক এবং সামরিক শক্তিপুঞ্জ কর্তৃক পরিচালিত ছদ্ম স্বদেশহিতৈষণার এক অস্ত্রবিশেষ। ছদ্ম আবরণের সহায়তা ভিন্ন যে শক্তি নিজেকে প্রকাশ করিতে সমর্থ নয় এবং যাহার প্রকাশ মাত্র জনসাধারণের মধ্যেই নহে, শিক্ষিতের মধ্যেও বিপ্লব জাগিয়া উঠে, সেই শক্তিই আজ হিটলার, মুসোলিনী প্রভৃতি ব্যক্তিকে শিখণ্ডীর মতন তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া স্বীয় স্বার্থ সাধন করিতেছে। এই হিটলার-মুসোলিনীর দল এরূপ দাবী করেন যে, জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া তাঁহারা তাহাদেরই নামে দেশের কাজ করিতেছেন, অর্থাৎ তাঁহারা বুঝাইতে চাহেন

তাঁহারা যেন জনসাধারণেরই প্রতিনিধিস্বরূপ। এইরূপ প্রচ্ছন্ন মনোভাবের অন্তরাল হইতে তাঁহারা নিয়ত জাতির প্রাণশক্তিকে নিঃশোষিত ও দুর্বল করিয়া দিতেছেন।

" 'সাবধান হউন'—ইহাই আমার একান্ত আবেদন। সাবধান হউন মুখোসপরা এই ফ্যাসিজমের হাত হইতে, আর সাবধান হউন ঐ হিটলার-মুসোলিনীর মতন লোকের ভণ্ড স্বাদেশিকতার সংস্পর্শ হইতে। আমি জানি কি ভাবে তাহারা অর্থ দ্বারা, সংবাদপত্র দ্বারা, রাষ্ট্রনীতিক কূটচক্রের দ্বারা তাহাদের প্রচারকার্য চালায় এবং কেমন করিয়া তাহারা দেশের যুবশক্তিকে ফ্যাসিজমের তীব্র সুরায় উন্মত্ত করিয়া তোলে এবং অন্ধ জনসাধারণকে প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে। আপনারা ইহা জানেন না, অথবা বুঝিতে পারেন না। আমরা ইউরোপে তাহা জানিয়াছি এবং বুঝিতে পারিয়াছি।

"হে আমার ভারতীয় তরুণগণ! চক্ষু উন্মীলন করিয়া একবার চাহিয়া দেখুন এবং আজও যাহারা ঘুমাইতেছে তাহাদিগকে জাগাইয়া তুলুন। আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হউন। সমগ্র পৃথিবীর উপর সাম্রাজ্যবাদী-একনায়কত্বের জাল ছড়াইয়া পড়িতেছে। যাঁহাদিগকে ভয় দেখান হইতেছে, তাঁহারাও এই মুহূর্তে সমবেত হউন। ভুলিয়া যাইবেন না যে, অন্যদেশের স্বাধীনতার কথা বাদ দিয়া আপনারা মাত্র আপনাদের স্বাধীনতার কথাই চিন্তা করিতে পারেন; সকল জাতিই আজ ঐক্যবদ্ধ। আজ যে সংগ্রাম চলিতেছে, ইহা মাত্র এক দেশের লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, এই সংগ্রাম পৃথিবীর সকল দেশের লোকের মধ্যেই চলিতেছে, অর্থাৎ আন্তজাতিকভাবেই আজ সমস্ত সংগ্রাম নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'—সুইজারল্যাণ্ডের এই প্রাচীন প্রবাদটি আজ পৃথিবীর সকল জাতির পক্ষেই প্রযোজ্য। প্রত্যেক জাতিকে আজ প্রত্যেক জাতির জন্য এবং উৎপীড়িত ও অবমানিত মনুষ্যত্বের জন্য ঐক্যবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। যাঁহারা আজ অন্য কর্তৃক শোষিত হইতেছেন তাঁহাদেরও আজ ঐক্যবদ্ধ হইবার সময়।

"আর তোমরা, হে আমার তরুণদল, তোমরা যে এই সব উৎপীড়িতদেরই অগ্রগামী রক্ষী সৈন্য। সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিজমের হাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করা এবং সকল রকমে তাহাদিগকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তোলাই তোমাদের বর্তমানের একমাত্র কর্তব্য।" [দেশ: ১ম বর্ষ, ১২'শ সংখ্যা; ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪, পৃঃ. ১৬]

এইভাবে রোলাঁ ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতটি ভারতীয় তরুণদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া তাহাদের সঠিক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রোলাঁর এই সতর্কবাণী ভারতের প্রগতিশীল তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ও নূতন চেতনার সঞ্চার করিলেও কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের ইহা বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করিল না।

তাসের দেশ

১৩৪০ সালের শ্রাবণ মাসে কবি 'চণ্ডালিকা' ও 'তাসের দেশ' নামে নাটিকা দুটি রচনা করেন। এবং এই নাটিকা দুটিই ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

'চণ্ডালিকা'র আখ্যান-অংশ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত *The Sanskrit Bnddhist Literature of Nepal* গ্রন্থের একটি বৌদ্ধ উপাখ্যান থেকেই লওয়া হইয়াছে বটে তবে মূলত এটি গান্ধীজীর অস্পৃশ্যতা-নিরোধ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তবু ইহার সামাজিক ও রাজনীতিক তাৎপর্য খুব মুখ্যভাবে প্রকটিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। এই কারণেই উহা আমাদের আলোচনার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু 'তাসের দেশ' রবীন্দ্রনাথের এক অসাধারণ সৃষ্টি। 'তাসের দেশ' রূপক-নাট্য। কিন্তু রূপক ও প্রতীক নির্বাচনে তিনি অসাধারণ দক্ষতা ও সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে এটিকে একটি কৌতুক-নাট্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সুতীব্র এই ব্যঙ্গ-কৌতুকের আড়ালে কবি অত্যন্ত গভীর কথা প্রচণ্ড দুঃসাহসের সঙ্গে বলিয়াছেন। ব্যঙ্গ-কৌতুকের দিক থেকে বিচার করিলেও এতখানি সার্থক নাটক তাঁহার আর আছে বলিয়া মনে হয় না।

লৌহ-কঠিন আইন ও শৃঙ্খলার আর বিধি-বিধানে সুনিপুণ যান্ত্রিক ছাঁদে বাঁধা এক সনাতনী অচলায়তন-সমাজকে রবীন্দ্রনাথ তীব্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে আক্রমণ করিয়াছেন, এই নাটকে। বলা বাহুল্য, 'তাসের দেশ' সেই পরম পাকা ও প্রবীণ পণ্ডিতদের সেই সনাতনী অচলায়তন-সমাজের এক কল্পিত রূপ বা রূপকমাত্র। এ এমন দেশ যেখানে স্বাধীন চিন্তা বা স্বাধীন মতামত তো দূরের কথা,—এমন কি চলা-ফেরা, উঠা-বসা, হাসা-কাঁদাটিও সেখানকার নির্দিষ্ট যান্ত্রিক বিধি-বিধানের কঠিন শাসনে বাঁধা। সেখানে এইসব 'বাধ্যতামূলক আইন'কে চালু রাখার জন্য গোলামের দল আছে,—পণ্ডিত-পুরোহিত-গোঁসাইজীর দল আছে,—আর আছে 'তাস-দ্বীপ'-এর 'জাতীয়-কৃষ্টি'র ধারক-বাহকরূপে সেখানকার 'সম্পাদকীয় স্তম্ভ'।

"রাজা—ওহে ইস্কাবনের গোলাম।

গোলাম—কী রাজাসাহেব।

রাজা—তুমি তো সম্পাদক।

গোলাম—আমি তাসদ্বীপপ্রদীপের সম্পাদক। আমি তাসদ্বীপের কৃষ্টির রক্ষক।

রাজা—কৃষ্টি! এটা কী জিনিস। মিষ্টি শোনাচ্ছে না তো।

গোলাম—না মহারাজ, এ মিষ্টিও নয়, স্পষ্টও নয়, কিন্তু যাকে বলে নতুন, নবতম অবদান। এই কৃষ্টি আজ বিপন্ন।

সকলে—কৃষ্টি, কৃষ্টি, কৃষ্টি।

রাজা—তোমার পত্রে সম্পাদকীয় স্তম্ভ আছে তো ?
গোলাম—দুটো বড়ো বড়ো স্তম্ভ।
রাজা—সেই স্তম্ভের গর্জনে সবাইকে স্তম্ভিত করে দিতে হবে। এখানকার বায়ুকে লঘু করা সইব না।
গোলাম—বাধ্যতামূলক আইন চাই।
রাজা—ওটা আবার কী বললে! বাধ্যতামূলক আইন!
গোলাম—কানমলা আইনের নব ভাষ্য। এও নবতম অবদান।"

[রবীন্দ্র-রচনাবলী ; ২৩ 'শ খন্ড, পৃঃ ১৭৬]

এই অচলায়তন দ্বীপবাসীর বন্দীত্বদশা ঘুচাইবার জন্য—আধমরাদের ঘা দিয়া বাঁচাইবার জন্য, কবি এখানেও মুক্তিদূতরূপী এক রাজপুত্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি আনিলেন মুক্তির বারতা,—তিনি গাহিলেন নূতন যৌবনের গান—অনন্ত যাত্রার গান। সেই গান প্রথমে তাসের দেশের অন্তঃপুরে-অন্দর-মহলে বা অন্তরের অন্তস্তলে গিয়া পৌঁছিল। তারপর শুরু হয় তাহার অন্তর-বিপ্লব।

"হরতনী—চলো চলো, বীর, মরণ পণ করে বেরিয়ে পড়ি দুজনে মিলে। দেখতে পাচ্ছি যে, সামনে কী যেন কালো পাথরের ভ্রূকুটি, ভেঙে চুরমার করতে হবে। ভেঙে মাথায় যদি পড়ে পড়ুক। পথ কাটতে হবে পাহাড়ের বুক ফাটিয়ে দিয়ে। কী করতে এসেছি এখানে। ছী ছী, কেন আছি এখানে। এ কী অর্থহীন দিন, কী প্রাণহীন রাত্রি। কী ব্যর্থতার আবর্তন মুহূর্তে মুহূর্তে।
রুইতন—সাহস আছে তোমার, সুন্দরী ?
হরতনী—আছে, আছে।
রুইতন—অজানাকে ভয় করবে না ?
হরতনী—না, করব না।
রুইতন—পা যাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে, পথ ফুরোতে চাইবে না।
হরতনী—কোন্ যুগে আমরা চলেছিলুম সেই দুর্গমে। রাত্রে ধরেছি মশাল তোমার সামনে, দিনে বয়েছি জয়ধ্বজা তোমার আগে আগে। আজ আর-একবার উঠে দাঁড়াও, ভাঙতে হবে এখানে এই অলসের বেড়া, এই নির্জীবের গণ্ডি, ঠেলে ফেলতে হবে এই-সব নিরর্থকের আবর্জনা।
রুইতন—ছিঁড়ে ফেলো আবরণ, টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলো। মুক্ত হও শুদ্ধ হও, পূর্ণ হও।" [ঐ : পৃঃ ১৮৪]

তাসের দেশের ভিত্তিমূল টলমল করিয়া উঠিল। তারপর শুরু হয় তাহার প্রচণ্ড ক্রিয়া—শুরু হইল বিদ্রোহ-বিপ্লব—শুরু হইল তাসের দেশের অচলায়তন বাঁধ-ভাঙার দুরন্ত অভিযান। যে-অভিযানে আপামর জনতার স্রোত দৃঢ় পদক্ষেপে আগাইয়া চলিয়াছে মুক্তির যুদ্ধে।—কণ্ঠে তাহাদের বাঁধভাঙার সমবেত ঐকতান সঙ্গীত :

"বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও,
বাঁধ ভেঙে দাও।

বন্দী প্রাণমন হোক উধাও।
শুকনো গাঙে আসুক
জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক ;
ভাঙনের জয়গান গাও।
জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক,
যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক ॥
আমরা শুনেছি ঐ
মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ
কোন্ নূতনেরি ডাক।
ভয় করি না অজানারে,
রুদ্ধ তাহারি দ্বারে
দুর্দাড় বেগে ধাও ॥"

'তাসের দেশ' নাটকের এইটিই কবির বাণী। লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই নাটকটিতে যে-সমাজচেতনতা ও নিরন্তর বিদ্রোহ-বিপ্লবের বাণী আছে ;—যে বলিষ্ঠ ও উদাত্ত প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের আহ্বান আছে তাহা তাঁহার পূর্বেকার নাটকগুলিতে এতখানি স্পষ্টত প্রকাশ পায় নাই। অথচ বিস্ময়ের কথা এই, বাস্তব রাজনীতিক ক্ষেত্রে তিনি বিদ্রোহ-বিপ্লবের,—বিশেষত প্রত্যক্ষ গণ-সংগ্রামের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিতে পারেন নাই।

উল্লেখযোগ্য, ইহার কয়েক বৎসর পরে কবি 'তাসের দেশ' নাটিকাটি সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন (১৩৪৫)।

নাটক দুটি রচনার পর কলিকাতায় উহা অভিনয় করা স্থির হয়। এবং সেইমত প্রস্তুতি চলিতে থাকে। কিছুকাল পরে কবি সদলবলে কলিকাতায় আসিলেন। 'ম্যাডান থিয়েটার' হলে 'চণ্ডালিকা' ও পরে 'তাসের দেশ' অভিনীত হয় (১, ২, ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩)।

এই সময় কলিকাতায় আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরাইয়া আনিবার দাবীতে প্রবল আন্দোলন চলিতে থাকে। কিছুকাল পূর্বে আন্দামান বন্দীরা কয়েক দফা দাবীতে অনশন করিয়াছিলেন এবং সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য রায় প্রমুখ নেতাদের আবেদনে সাড়া দিয়া তাঁহারা অনশন স্থগিত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের মূল দাবীগুলির ব্যাপারে সরকারপক্ষ থেকে বিশেষ কিছু করা হয় নাই। বন্দীদের দেশে ফিরাইয়া আনা তো দূরের কথা আন্দামানে নূতন করিয়া বন্দীদের চালান করা হইতে থাকে। কলিকাতায় এই ব্যাপারটি লইয়া প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। গভর্নমেণ্ট আন্দোলনকারীদের ধরিয়া জেলে পুরিতে লাগিলেন। এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ দেশের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আন্দামান বন্দীদের দাবীগুলির সমর্থনে ইউনাইটেড প্রেসের মারফত নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করেন।

এই বিবৃতিতে প্রধানত ৪টি দাবী উত্থাপন করা হয় : (১) অনশনকারী তিন জন বন্দীর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে উপযুক্ত তদন্ত ; (২) আন্দামান-বন্দীদের সমস্ত দাবী

ও অভাব-অভিযোগগুলি মানিয়া লওয়া ; (৩) আন্দামানে নূতন করিয়া বন্দী পাঠান বন্ধ রাখিতে হইবে ; (৪) সমস্ত আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরাইয়া আনিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে কোন বন্দীকে আন্দামান পাঠান চলিবে না। বিবৃতিটি এই :

"আন্দামান সেলুলের জেলের অনশনব্রতী বন্দী শ্রীযুক্ত মহাবীর সিং, শ্রীযুক্ত মানকৃষ্ণ নমঃদাস ও শ্রীযুক্ত মোহিত মৈত্রের মৃত্যুতে জনসাধারণের মনে দারুণ শংকা ও সংশয় জন্মিয়াছে। বন্দীত্রয়ের মৃত্যু সম্পর্কে গভর্নমেণ্ট অবশ্যই একটি কৈফিয়ত দিয়াছেন, কিন্তু গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের মৃত্যু সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা না-করিলে জনসাধারণের আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠা দূর হইবে না। অধিকন্তু সরকারী ইস্তাহার এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ হইতে বুঝা যায়, যে কারণে বন্দীগণ গত মে মাসে অনশন ধর্মঘট করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ বৈধ। সেলে রাত্রিতে আলো সরবরাহ, উপযুক্ত খাদ্য, সংবাদপত্র, আত্মীয়স্বজনের সহিত সাক্ষাৎকারের অনুমতি এবং আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার নিমিত্ত আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে টাকা আনাইবার অনুমতি দাবী করিয়া বন্দীগণ অনশন ধর্মঘট করিয়াছিলেন। এই দাবী নিশ্চয়ই ন্যায়সঙ্গত। জনসাধারণের বিশ্বাস এই যে, বন্দীদের অভাব ও অভিযোগ দূর করিবার ব্যবস্থা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হওয়ায় ৪৫ দিন পর তাঁহারা অনশন ধর্মঘট ভঙ্গ করেন। সংবাদপত্রে প্রকাশ, স্বরাষ্ট্রসচিব ব্যবস্থাপরিষদে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে বন্দীদের কোনও কোনও অভিযোগ দূর করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে। বন্দীদের সমস্ত অভিযোগ দূর করা আবশ্যক।

"আরও প্রকাশ যে, কারাগারে বন্দীদের ব্যবহার কিরূপ ছিল, তাহা বিবেচনা না-করিয়াই ভারতবর্ষের বিভিন্ন জেল হইতে বন্দী বাছিয়া আন্দামান প্রেরণ করা হইয়াছে। নির্বাসিত বন্দীদের অধিকাংশই নাকি দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত নহেন। তাঁহাদের অধিকাংশই নাকি চারি বৎসর ও তদূর্ধকাল সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। কেহ কেহ চারি বৎসরের কম মেয়াদেও দণ্ডিত হইয়াছেন এই সংবাদেও জনসাধারণ ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। যে সকল বন্দী তাঁহাদের দণ্ডকালের অধিকাংশ ভারতবর্ষের জেলে কাটাইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও কেন মেয়াদ শেষ করিবার জন্য আন্দামানে প্রেরণ করা হইবে, তাহার কারণও বুঝা যায় না। অনেক বন্দী সুদীর্ঘকাল ভারতবর্ষের জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন। মাত্র তিন চারি বৎসরের জন্য তাঁহাদিগকে আন্দামান প্রেরণ করা হইয়াছে।

"১৯১৯ সালের ভারতীয় কারা-কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯২৬ সালে ভারত গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করেন যে সকল বন্দী আন্দামান যাইতে সুস্পষ্ট সম্মতি দান করিবে, কেবল তাহাদিগকেই আন্দামানে প্রেরণ করা হইবে। বর্তমানে রাজনৈতিক বন্দীদিগকে প্রেরণ করায় গভর্নমেণ্টের সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচারণ করা হইয়াছে।

"উপসংহারে আমরা গভর্নমেণ্টকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি যে, যে-শতাধিক বন্দীকে প্রবল জনমত উপেক্ষা করিয়া আন্দামানে নির্বাসিত করা হইয়াছে অবিলম্বে তাহাদিগকে ভারতবর্ষে ফিরাইয়া আনা হউক এবং রাজনৈতিক বন্দীই হউন বা

সাধারণ বন্দীই হউন বন্দীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে আন্দামানে প্রেরণের নীতি অতঃপর পরিত্যক্ত হউক।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৯শে ভাদ্র, ১৩৪০ : ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩]

স্বাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বাসন্তী দেবী, সরোজিনী নাইডু, নেলী সেনগুপ্তা, মৌলানা আজাদ, সি. এফ. এন্ড্রুজ, সি. ওয়াই. চিন্তামনি, জওহরলাল, বি. জি. হর্নিম্যান, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ইত্যাদি আরও অনেকে।

বলা বাহুল্য, আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরাইয়া আনা বা তাহাদের মূল দাবীগুলি মানিয়া লওয়ার কোন লক্ষণই গভর্নমেন্ট দেখাইলেন না। উল্টা স্বরাষ্ট্র-সচিব উপরোক্ত বিবৃতির জন্য এবং বন্দীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য স্বাক্ষরকারীদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা ও মন্তব্য করেন।

ইহার কিছু পূর্বে গান্ধীজী কারাগারে পুনরায় আমরণ অনশন শুরু করায় গভর্নমেন্ট তাঁহাকে মুক্তি দেন (২৩শে আগস্ট, '৩৩), একরকম বিনা-শর্তেই। কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পর তিনি আন্দামান বন্দীদের দাবী সম্পর্কে—অথবা রাজনীতিক বিষয়ে কোন কিছু করিতে অসম্মত হন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, বিচারে তাঁহার এক বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। সুতরাং নৈতিক দিক থেকে তাঁহার ঐ দণ্ডাদেশের পূর্ণ মিয়াদ অতিক্রান্ত না-হওয়া পর্যন্ত তিনি রাজনীতিক বিষয় কিছু বলিবেন বা করিবেন না। ইহার ফলে কংগ্রেসকর্মী ও দেশবাসীর মনে ক্রমেই বিভ্রান্তি বাড়িতে থাকে। এমন সময় অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত আর এক দুঃসংবাদ আসে;—২২শে অক্টোবর সুইজারল্যাণ্ডের এক হাসপাতালে ভি. জে. প্যাটেলের মৃত্যু হয়। জে. এম. সেনগুপ্তের মৃত্যুর পর ইহা দেশবাসীর কাছে নিদারুণ আঘাতরূপে নামিয়া আসে। তাঁহার শেষ ইচ্ছা রূপে বিঠলভাইয়ের শবদেহ বোম্বাইয়ে সৎকার্যের জন্য আনা হইলে ঐদিন প্রায় দুই লক্ষ লোক তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে হাজির হন। এই সংবাদে রবীন্দ্রনাথের কি মানসিক প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল তাহা অনুমান করা শক্ত নয়। ঐদিন কবি বিঠলভাইয়ের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট এক বিবৃতিতে (২৫শে অক্টোবর) বলেন :

"By the death of Mr. Vithalbhai Patel India has lost a most valiant fighter for the cause of her freedom. A selfless patriot, he most ungrudgingly gave ot his best to the cause of his country. Cruel death snatched him away at a time when his services were most sorely needed and it is all the more pitiable that he breathed his last thousands of miles away from his beloved motherland. Together with the rest of India, I pay homage to the memory of the departed leader."—A. P.

[*The Pioneer* : 28 October, 1933]

কবির সাহিত্য কর্মের দিক থেকে এই সময় যেগুলি রচিত হয়, তাহার মধ্যে 'দুই বোন' (বিচিত্রা : ১৩৩৯ অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুণ), 'মালঞ্চ' (বিচিত্রা : ১৩৪০ আশ্বিন

থেকে অগ্রহায়ণ), এবং 'বাঁশরী' (ভারতবর্ষ : ১৩৪০ কার্তিক থেকে পৌষ) উল্লেখযোগ্য। 'বাঁশরী'-তে কবি বাংলাদেশের তৎকালীন তথাকথিত রিয়ালিষ্ট সাহিত্যিকদের অত্যন্ত তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। তাহার বিস্তারিত আলোচনা এ-গ্রন্থের বিষয় বহির্ভূত।

বোম্বাই ও অন্ধ্রে

এবার পূজাবকাশের পূর্বেই অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বক্তৃতার জন্য কবির আমন্ত্রণ আসিয়াছিল, বক্তৃতা করিতে হইবে ডিসেম্বরের প্রথমভাগে (১৯৩৩)। তাছাড়া এই সময় বোম্বাইয়ে রবীন্দ্র-অনুরাগী মহলের উদ্যোগে সেখানে রবীন্দ্রসপ্তাহ উদ্‌যাপনের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে সেখানে কলা-ভবনের ও কবির অঙ্কিত চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নাট্যাভিনয়েরও আয়োজন করা হয়। এই উৎসব-অনুষ্ঠানে কবিকে বিশেষভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিবারও ব্যবস্থা করা হয়। বিশ্বভারতীর তখন দারুণ অর্থ-সংকট চলিতেছে। কবি ভাবিলেন, এই উপলক্ষে বোম্বাইয়ের ধনপতি ও শ্রেষ্ঠী-সমাজের কাছে বিশ্বভারতীর এই সংকটের কথাটা উত্থাপন করিলে হয়ত তাহাতে তাঁহারা উপযুক্ত সাড়া দিতেও পারেন। এবারে কবির সঙ্গে চলিলেন নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেন, অমিয় চক্রবর্তী, অনিল চন্দ, পুর-এ-দাউদ, জিয়াউদ্দীন, গোঁসাইজী, সুরেন্দ্রনাথ কর, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কলা-ভবন ও সংগীত-ভবনের এক দল ছাত্র-ছাত্রী।

২৩শে নভেম্বর (১৯৩৩ : ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০) কবি তাঁহার দলবলসহ বোম্বাই স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলেন। স্টেশনে বিশাল এক জনতা কবিকে সম্বর্ধনা জানাইতে আসিয়াছিল। তাছাড়া সরোজিনী নাইডু, কে. এফ. নরিম্যান ও বোম্বাই কর্পোরেশনের মেয়র এবং ভাইস-চ্যান্‌সেলর চন্দ্রভরকর প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিও কবিকে সম্বর্ধনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্য স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। বোম্বাইয়ে স্যর দোরাব টাটার মর্মর-প্রাসাদে কবির থাকিবার ব্যবস্থা হয়। সেখানে ঐদিন অপরাহ্ণেই কবি সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকট আলোচনা প্রসঙ্গে বিশ্বপরিস্থিতির সম্পর্কে এক বিবৃতি দেন।

এই বিবৃতিতে কবি আন্তর্জাতিকতাবাদের ভাবাদর্শের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন যে, বর্তমানে আন্তর্জাতিক শান্তির আশা ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং শান্তির আন্দোলন যতদিন রাজনীতিকগণের হাতে থাকিবে—যাঁহারা রাজনৈতিক স্বার্থ ও সুবিধার দিক দিয়া শান্তির বিচার করেন, বৃহত্তর মানবতার দিক হইতে দেখেন না, ততদিন উহা অন্ধকারাচ্ছন্নই থাকিবে। তিনি বলিলেন :

"*The greatest need of the world to-day is Internationalism.* The prospects of it at present are not very bright but things are certainly improving.

"A great handicap in the way of international peace is that politicians look upon peace from the point of view of political expediency and not from the point of view of higher human ideals.

"Such peace would be machine-made peace and not natural. Unless, therefore, *the message of internationalism develops and spreads throughout the world* there is sure to be disaster after disaster, and all talk of peace will be forlorn hope. [*Italics—mine*]

[*Free Press Journal* : 24th November, 1933]

বিশ্বশান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ প্রশ্নে তিনি বলেন যে, নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে যে-সকল জাতি যোগদান করিয়াছে তাহাদের মন ক্ষমতালাভের জন্য পারস্পারিক সন্দেহ-সংশয়ে পরিপূর্ণ। তাছাড়া তাহাদের মন আদ্যন্ত সশস্ত্র। এই মনোভাবের সত্যকার পরিবর্তন ব্যতীত নিরস্ত্রীকরণ কার্যকরী হইবার কোন আশা নাই বলিয়া তিনি বিবেচনা করেন। পরিশেষে তিনি জাতীয়তার উপর অত্যধিক জোর দেওয়ার নিন্দা করেন এবং সকলকে আন্তর্জাতিকতার আদর্শে কাজ করিবার আহ্বান জানাইয়া বলেন, এই মহান আদর্শ সর্বজনীনভাবে গৃহীত হইতে সময় লাগিলেও উহা পরিশেষে জয়লাভ করিবে। তিনি রোলাঁ-বারবুস-আইনস্টাইন-রাসেল প্রমুখ শান্তিবাদীদের মহান সাধন-সংগ্রামের তাৎপর্য প্রসঙ্গে বলেন :

"I have many friends abroad, who are pacifists and who are intensely interested in spreading the ideal of internationalism in the world. The ideal takes time to be universally accepted. Twenty years ago, when I began to preach the gospel of internationalism, and when I talked against narrow nationalism, people were surprised and even angry that I should be talking like that. They perhaps thought it was foolish of me to talk against nationalism, which had then become second religion with the people both here and abroad. But gradually that mentality has changed now, and it will be completely changed by the application of a proper remedy."

'কিন্তু কী সেই সমাধান, কিভাবে উহা বাস্তবে কার্যকরী করা যায় ?'—এই প্রশ্নের জবাবে কবি বলেন যে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমেই আন্তর্জাতিকতার আদর্শে ব্যাপক ও দৃঢ়ভাবে মানুষের মনের ভিত্তি গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাই তিনি প্রচলিত শিক্ষা-বিধি ও শিক্ষাদর্শের আমূল পরিবর্তনের দাবী করিয়া বলিলেন :

"*The only remedy I would suggest, is Education.* Our text-books to-day are too full of lessons against the spirit of internationalism. Everywhere, local patriotism is gaining the upper hand and unless this is eradicated there is little scope for internationalism. Races and nations are, however, coming together closer to-day and the out-

look appears hopeful. *But let me say once more that unless the message of internationalism develops and spreads throughout the world, there is sure to be disaster after disaster and all talk of peace will be a forlorn hope.*" [*Italics—mine*]

[*Free Press Journal* : Bombay ; 24th November, 1933]

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়, কবি আন্তর্জাতিকতার আন্দোলনকে প্রধানত চিন্তা ও ভাবাদর্শের মধ্যেই যেন সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহিয়াছিলেন এবং কতকটা সেই কারণেই তিনি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মাধ্যমের উপরই বেশি নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু যখন সারা বিশ্বের শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র—সমগ্র মানবসভ্যতাই চূড়ান্তভাবে বিপন্ন—যখন প্রতিক্রিয়ার শক্তি উহাদের 'পরে প্রচণ্ড আক্রমণ ও আঘাত হানিতেছে, তখন প্রত্যক্ষ গণপ্রতিরোধ-সংগ্রামের কথাই অত্যন্ত জরুরী ও আশুকর্তব্য হিসাবে দেখা দেয়। এই কারণেই রোলাঁ-বারবুস প্রমুখ ইউরোপের আন্তর্জাতিক শান্তিবাদীরা এক সর্বাত্মক প্রতিরোধ-সংগ্রামের (total and all-out resistance) পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা চালাইতেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, নাৎসীবাদ—এককথায় অন্ধ প্রতিক্রিয়ার শক্তিজোটের বিরুদ্ধে তাঁহারা বিশ্বের সকল শান্তিকামী, গণতন্ত্রবাদী, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী ও প্রগতিশীলদের সঙ্ঘবদ্ধ এক সর্বাত্মক প্রতিরোধ-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইঁহাদের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং ইঁহাদের এই মহান প্রচেষ্টাকে ব্যক্তিগতভাবে সমর্থনও করিয়াছেন কিন্তু এই আন্দোলনকে সংগঠিত করার জন্য ইঁহারা যে নেতৃত্বের ও সক্রিয় সংগঠকের ভূমিকা গ্রহণ করেন, রবীন্দ্রনাথ তাহা পারেন নাই,—হয়ত তা' তাঁহার মানসিক গঠন-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের জন্যই। এসব কথা পরে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচিত হইবে।

উল্লেখযোগ্য, বেশ কিছুকাল থেকেই জার্মানীতে নাৎসীদল কর্তৃক ইহুদী-নির্যাতনের ভয়াবহ সব খবর আসিতেছিল। হিটলার স্থির ও শীতল মস্তিষ্কে জার্মানী থেকে সমগ্র ইহুদী জাতিটিকেই উৎসাদন ও নিশ্চিহ্ন করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এবং সেই পরিকল্পনা মত নাৎসীরা অগ্রসর হইতেছিল। সাধারণ ইহুদীরা তো দূরের কথা—ইহুদীদের মধ্যে যাঁহারা বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, আইনজীবী, লেখক, শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ—তাঁহাদেরকেও জার্মানী থেকে বিতাড়িত করা হইতে থাকে। কিছুকাল পূর্বে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনকে এইভাবে জার্মানী থেকে বিতাড়িত করা হয়। এই সংবাদে সারা পৃথিবীর বিবেকী বুদ্ধিজীবী-সমাজ উহার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করিয়াছিলেন। সাংবাদিকরা এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত জানিতে চাহিলে কবি জবাবে বলেন :

"বিচারকরূপে নহে—সাধারণ মানুষ হিসাবে আমি ইহা না ভাবিয়া পারি না যে, অধ্যাপক আইনস্টাইনের প্রতি যে ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা নির্মম অন্যায় ও অসভ্যোচিত হইয়াছে। যে য়ুরোপীয় সভ্যতা প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকবুদ্ধি ও অভিমত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রচার করে, ইহা তাহার বিরোধী।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ : ২৪শে নভেম্বর, ১৯৩৩]

তাছাড়াও সাংবাদিকরা নানা বিষয়ে কবিকে প্রশ্ন করিতে থাকেন। অস্পৃশ্যতা দমনের জন্য আইন প্রণয়নের কল্পনা তিনি অনুমোদন করেন কিনা, জিজ্ঞাসা করা হইলে কবি বলেন যে, তিনি এইরূপ ব্যবস্থার বিরোধী, কারণ তাঁহার বিশ্বাস যে, এই পাপ একমাত্র লোকশিক্ষার দ্বারা নির্মূল হইতে পারে। জনসাধারণের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য তিনি ব্যাপক আন্দোলনের পক্ষপাতী, তাহার পর আইন প্রণীত হইতে পারে।

ঐদিনই সন্ধ্যায় কবির চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বোম্বাই হাইকোর্টের জজ্ মিঃ মির্জা আলী আকবর খাঁ। ইহার পর 'রবীন্দ্র-সপ্তাহ' উৎসব উপলক্ষে বোম্বাইয়ে কয়েকদিনই রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ, সংগীত ও নৃত্য-নাট্যাভিনয় প্রভৃতি চলিতে থাকে। ২৫শে নভেম্বর রাত্রে বিশ্বভারতী ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা 'শাপমোচন' অভিনীত হয়। পরদিন অপরাহ্নে পার্শি যুবক সমিতির উদ্যোগে বোম্বাইয়ের রীগ্যাল থিয়েটার-এ এক বিরাট জনসমাবেশে কবি The Challenge of Judgment নামে ভাষণটি পাঠ করেন।

কিভাবে পাশ্চাত্য শক্তিগুলি এশিয়া ও সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের বেড়াজাল বিস্তার করিয়া অবাধে শোষণ-লুণ্ঠন করিয়া চলিয়াছে, এই বক্তৃতায় কবি তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, অতীতেও এশিয়ার প্রায় প্রত্যেকটি দেশই বৈদেশিক শক্তির দ্বারা আক্রান্ত ও পরাভূত হইয়াছে। কিন্তু তখন ঐসব বৈদেশিক শক্তি বিজিতদের সহিত একত্রে বসবাস করিয়া পারস্পরিক ঘনিষ্ট আত্মিক সম্পর্কে আসিতে পারিয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ইউরোপীয় শক্তিগুলির ক্ষেত্রে তাহা হইল না। এশিয়ার বুকে ইউরোপের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই তাহারা এশিয়াবাসীর সঙ্গে সেই আত্মিক ও প্রাণের সম্পর্ক স্থাপনের কোন চেষ্টাই করে নাই। কেননা তাহারা এশিয়াবাসীদের সজীব মানুষ বলিয়াই গণ্য করে না এবং তাই এক নির্মম ও সুনিপুণ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রাচ্যবাসীদের পেষণ করিয়া তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে উদর পরিপূর্ণ করিতেছে। তিনি বলিলেন:

"বর্তমান যুগ য়ুরোপীয় শক্তিমত্তার যুগ। যেভাবে তাহারা সমগ্র পৃথিবীতে তাহাদের অধিকার স্থাপন করিয়া চলিয়াছে এবং যেভাবে তাহারা অন্যান্য মহাদেশের উপর পাশ্চাত্য আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতেছে—তাহাই যে বর্তমান যুগের একমাত্র বৈশিষ্ট্য ইহা অস্বীকার করা চলে না।· ·

···"যে অপরিসীম দম্ভ আপনার ভিতর অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিতে উদ্যত হয়, য়ুরোপের সহিত আমাদের সম্বন্ধ আজ কতকটা সেইরূপ। ইহা যেন তাহার প্রকৃতি-সঞ্জাত অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত একটি দুর্বহভার—যাহা আজ আমাদের উপর বলপূর্বক চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সম্বন্ধ অতিমাত্রায় কৃত্রিম, ইহার মধ্যে জীবনের সৃজনশক্তির লেশমাত্র নাই। লুণ্ঠনের পথ সহজ ও সুগম করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই ইঞ্জিনীয়ার যেমন তৃণাচ্ছাদিত ভূমিপ্রান্তরের শ্যামলশ্রী হরণ করিয়া তাহার স্থলে পাথর বাঁধান রাস্তা নির্মাণ করিয়া দেয়, পাশ্চাত্য সভ্যতাও কতকটা সেইভাবে আমাদের উপর তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

আপাতত ইহা যতই কৌশলপূর্ণ ও সুবিধাজনক হউক না কেন, আমাদের চারিদিকে এই যে প্রভাব বিস্তারের চাতুর্যপূর্ণ রীতি উহার ভিতর রাশি রাশি অকল্যাণ পুঞ্জীভূত হইয়া আছে।…

"আমাদের একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও য়ুরোপ আমাদের উপর তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে বিরত হয় নাই। প্রাচ্যের বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত পূজাবিধিতে অনুপ্রাণিত হইয়া পশ্চিমও আজ দিকে দিকে বিপুল সমারোহের সহিত তাহার সঙ্গে আত্মপূজার উপকরণ লইয়া চলিয়াছে। এই পূজার বলিস্বরূপ সে তাহার নিকট অন্যান্য মহাদেশের আত্মসমর্পণের দাবী করে। য়ুরোপের ইহাই সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসিক সংকল্প। পশ্চিম হইতে আজ পর্যন্ত আমরা যত কথা শুনিয়াছি, তাহার মধ্যে সর্বোচ্চ স্বরে বিঘোষিত নির্দেশ হইতেছে—'তোমরা আমাদের কেহ নও।' একমাত্র এই দম্ভপূর্ণ বাক্যের জন্যই য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ অবদানগুলি আমাদের নিকট আজ দারুণ অপমানকর বস্তু বলিয়া মনে হইতেছে।…তাহারা যে আমাদের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং তাহাদের মনুষ্যত্বের পরিমাপ যে কয়েকখণ্ড মুদ্রা মাত্র, ইহা আমাদের পক্ষে আজ উপলব্ধি করা আর কঠিন নহে। প্রাচ্যের সহিত সম্পর্ক পাতাইবার সময় য়ুরোপ সর্বদা এই কথা স্মরণ রাখিয়াছিল—'তাহারা (প্রাচ্য) চিরকালের জন্য আমাদের (পাশ্চাত্যের) নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।' পাশ্চাত্যের এই ভেদাভেদ-তন্ত্রের মূলে রহিয়াছে অন্য জাতির প্রতি ইহাদের অপরিসীম ঘৃণা। জন্মগত স্বাধিকারের নামে অসীম গর্বভরে অন্য জাতিকে ঘৃণা করাই পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কবি আরও বলিলেন :

"যুগযুগান্ত ধরিয়া আপনার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া এশিয়ার মর্যাদা অন্যান্য মহাদেশ অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না। তাই সে প্রথমে য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রাধান্যের দাবীকে স্বীকার করে নাই। কিন্তু কালক্রমে পাশ্চাত্যের সংঘবদ্ধ ক্ষমতা ও অদম্য আত্মশক্তির নিকট ইহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। সুতীক্ষ্ণ নখর ও দংষ্ট্রা বলে তাহারা যে সুবিপুল জয়গৌরব অর্জন করিল, তাহাই ক্রমে ক্রমে প্রাচ্যের মনের উপর এক গভীর রেখা অঙ্কিত করিয়া দিল। এই জয়ের পশ্চাতে যে অপমানকর বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা জয়ের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিয়া এশিয়ার হৃদয়কে নির্মমভাবে মুগ্ধ করিয়া তুলিল। এই অপমানকর বিদ্রূপ একদিনের তরেও সে ভুলিতে পারে নাই। অবশেষে য়ুরোপের সর্বগ্রাসী সভ্যতার কুক্ষিতলগত হইয়া এশিয়া তাহার প্রভাবের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল। আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়স্বরূপ সংঘবদ্ধ ক্ষমতার উপর য়ুরোপের যতদিন বিশ্বাস আছে এবং পৃথিবীর সমস্ত সুখ-সুবিধা একচেটিয়া করিয়া লইবার জন্য ইহারা যতদিন কৃতসংকল্প আমরা এশিয়াবাসী ততদিন তাহাদের ক্ষমতার উপর নম্রভাবেই বিশ্বাস স্থাপন করিব। বেওনেটের মুখে আমাদিগকে তাহারা বিশ্বাস করাইয়াছে যে, তাহারাই ভগবানের একমাত্র নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ জাতি এবং সহিষ্ণুতার বিপরীত ক্ষমতা বলে সসাগরা পৃথিবী করায়ত্ত করিবার যে ক্ষমতা, তাহা একমাত্র তাহাদিগেরই জাতিগত ক্ষমতা। বাহিরের প্রভাব-প্রতিপত্তিই যে সত্যনির্ণয়ের মানদণ্ড—এই ভ্রান্ত

বিশ্বাসের সম্মুখে আমরা আজ মাথা নত করিয়াছি।…

[দেশ : ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ; ২রা ডিসেম্বর, ১৯৩৩, পৃঃ. ৭০-৭১]

প্রশ্ন এই, পাশ্চাত্যের এই নির্বিবেক বণিকস্বার্থের যান্ত্রিক নিষ্পেষণের সম্মুখে আমরা কি নিষ্ক্রিয় ও অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিব? জবাবে কবি যাহা বলেন তাহার মর্মার্থ এই যে, এই ঘৃণ্য পাশবিকতা ও অন্যায়ের সহিত কোনরকমেই আপস চলিবে না ;—সর্বজনীন ন্যায়ধর্ম ও বিচারের দিক থেকে ইহার বিরুদ্ধে অবশ্যই আমাদের সংগ্রাম করিতে হইবে। আর এই মানবিকতার সংগ্রামে আমাদের নৈতিক বিচারশক্তিই (Moral Judgment) হইবে শ্রেষ্ঠতম অস্ত্র। তাই তিনি বলিলেন :

…"কোনও প্রকার প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া আমরা য়ুরোপকে বিচার করিব না, কারণ তাহা হইলে অসহায় প্রাচ্যের প্রতি পাশ্চাত্য যে কুৎসা ও গ্লানি অক্লান্ত-ভাবে এতকাল ধরিয়া বর্ষণ করিয়াছিল, আমাদেরও মধ্যে সেই উত্তেজনা আসিবে। য়ুরোপকে সমগ্রভাবে বিচার করিয়া দেখিবার সাহস আমাদের আজ চাই। নৈতিক বিচারের মানদণ্ডই আমাদের জীবনের প্রকৃত পরিচালক।

"**পৃথিবীতে সংগ্রাম চলিবেই। এই সংগ্রাম এড়াইয়া চলিতে গেলেই আমাদিগকে শাস্তিভোগ করিতে হইবে।** সংগ্রামের পর সংগ্রামের ভিতর দিয়া আমাদের আদর্শ বিকাশের পথে চলিয়াছে। **সমগ্র মানবজাতিকে ধ্বংস হইতে বাঁচাইবার জন্য নৈতিক বিচারই যুদ্ধকালে আমাদের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। এই অস্ত্রের দ্বারাই আমরা প্রতিরোধ করিব, প্রয়োজন হইলে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য আক্রমণও করিব।**…(বড় হরফ আমার)

"নৈতিক বিচারই একমাত্র প্রশস্ত উপায়—ইহা যদি আমরা বর্জন করি, তাহা হইলে আমরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইব। এই পরাজয়ের পথ দিয়াই পাশ্চাত্যের আক্রমণ আসিয়া প্রাচ্যকে বিপর্যস্ত করিয়াছে। আমাদের চিন্তাস্রোতকে কুপথে পরিচালিত করিয়াছে, আমাদিগকে রাষ্ট্রনীতি ও ব্যবসাবাণিজ্যের জুয়াচুরি শিখাইয়াছে, সামরিক শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতারূপ উৎকট আত্মহত্যার উন্মাদনায় আমাদিগকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে।…আজ আর আমরা ইহা চলিতে দিব না। নির্ভীক হইয়াই য়ুরোপকে আজ আমরা বলিব—'বলপূর্বক তোমরা আমাদের উপর অনেক জিনিষ চাপাইতে পার, আমাদের জীবনের সম্ভাবনা রুদ্ধ করিতে পার—তথাপি তোমাকে আমরা বিচার করিয়া দেখিব। সে বিচার তুমি উপেক্ষা করিতে পার এবং এই বিচার হয়ত তোমার পক্ষে বিশেষ কোনও ক্ষতিকর হইবে না, অথবা এই বিচারের ফলে তোমার ক্ষমতামদগর্বিত গতিও ব্যাহত হইবে না, কিন্তু নৈতিক ধ্বংসের হাত হইতে ইহা আমাদিগকে রক্ষা করিবে। বলবান বলিয়া যে তুমি শ্রদ্ধার পাত্র অথবা ধনশালী বলিয়াই যে তুমি সম্মানের পাত্র—এই কথা বলিয়া আমরা আর অপমানিত হইতে চাহি না।"

[ঐ : পৃঃ. ৭১-৭২]

এই কথাই কবি পূর্বে কয়েকবারই বলিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়, পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে এশিয়া ও আফ্রিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে কবি এখানে স্পষ্ট করিয়া কোন কথাই বলেন নাই। বস্তুত রাজনীতিক সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন—বিশেষত সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম সম্পর্কে কবি কদাচ স্পষ্ট

করিয়া কিছু বলিয়াছেন। কবির এই সংগ্রাম-চিন্তার বৈশিষ্ট্যটিও আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

উল্লেখযোগ্য, ঐদিন মুসলমানদের 'সিরাতুন নবী' বা 'পয়গম্বর দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিচারপতি মির্জা আলী আকবর খাঁ'র সভাপতিত্বে বোম্বাইয়ে মুসলমানদের এক মহতী জনসভা হয়। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের নিকট একটি বাণী পাঠাইবার অনুরোধ আসিলে কবি নিম্নলিখিত বাণীটি পাঠান। কবির বাণীটি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ঐসভায় পাঠ (২৬শে নভেম্বর) করেন। বাণীটি ছিল এই :

"Islam is one of the few great religions of the world and the responsibility is immense upon its followers who must, in their lives, bear testimony to the greatness of their faith. Our one hope of mutual reconciliation between the communities inhabiting this unfortunate country depends not merely on the realisation of intelligent national self-interest, but on the eternal source of inspiration that comes from immortal lives of these messages of truth who have been beloved of God and lovers of men." —A. P. [*Forward* : 27th November, 1933]

এই রকম নানা সামাজিক ব্যক্তিগত ও জাতীয় সমস্যার প্রশ্নে কবিকে কিছু বলিতে অথবা বাণী দিতে হয়। উল্লেখযোগ্য, এই সময় টাকার আনুপাতিক মূল্যমান বিতণ্ডা (ratio controversy) তীব্র আকার ধারণ করে।

স্মরণ রাখা দরকার, ১৯২৭ সালেই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট পাউণ্ড ও সোনার দরের সঙ্গে টাকার আনুপাতিক মূল্যের হার বাড়াইয়া ১৬ পেনি হইতে ১৮ পেনি নির্ধারণ করে। সারা ভারতবর্ষে তখন সকলেই একবাক্যে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ১৬ পেনিতেই (বা ১ শিঃ ৪ পেনি) নির্ধারিত করিবার দাবী জানান। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার, গান্ধীজী তাঁহার 'স্বাধীনতার সারাংশ' নামে ১১ দফা দাবীতে বড়লাটকে যে চরমপত্র দেন (১৯৩০), তাহাতে তিনি টাকার দর ১৬ পেনিতেই নির্ধারিত করিবার দাবী জানাইয়াছিলেন। পরে বিলেতে গোলটেবিল বৈঠকেও তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে এই দাবী পুনরুত্থাপন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন বোম্বাইয়ে তখন টাকার এই আনুপাতিক বিতণ্ডা (ratio controversy) তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। এমন সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এক প্রেস্ বিবৃতিতে টাকার মূল্যমান ১৮ পেনিতেই বজায় রাখিবার দাবী জানাইলেন (দ্র. ৫ই নভেম্বর ১৯৩৩ : আনন্দবাজার পত্রিকা)। আচার্য রায় প্রমুখ একদল বাঙালী বুদ্ধিজীবী তাঁহাদের দাবীর সমর্থনে এই কথাই বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে, ইহার ফলে প্রধানত বোম্বাইয়ের শিল্পপতিরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন তবে ইহা পরোক্ষভাবে বাংলার শিল্প-প্রসার আন্দোলনের পক্ষেই বা অনুকূলে যাইবে। ইহার ফলে বোম্বাই-শিল্পপতিরা প্রমাদ গণিলেন। তাঁহারা তখন রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হইয়া বিষয়টি বুঝাইয়া তাঁহাকে এ বিষয়ে আচার্য রায়কে নিরস্ত করিবার অনুরোধ জানান। কবি এক মহা সংকটে পড়িলেন। এই জটিল বিষয়টি যখন তিনি নিজেই ভালোমত বুঝেন না তখন

সে-বিষয়ে কোন কিছু মন্তব্য করেন কী করিয়া! কিন্তু এই রকম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয় সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার স্বার্থে কোন রকমেই বিচার করা উচিত নহে, এইটুকু বুঝিতে তাঁহার ভুল হয় নাই। তিনি বোম্বাই শিল্পপতিদের এই ব্যাপারে বাঙালী শিল্পপতি ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া সম্মিলিত সিদ্ধান্তে আসিবার পরামর্শ দিলেন। তদনুযায়ী 'কারেন্সী লীগ'-এর সভাপতি শেঠ মথুরাদাস বিষণজী ও সম্পাদক এ. ডি. স্রফ্ কলিকাতা যাত্রা করেন। কবি নলিনীরঞ্জন সরকারকে বিষয়টি জানাইয়া একটি তার করেন (২৭শে নভেম্বর, ১৯৩৩)। তারবার্তাটি ছিল এই :

"Understand Sir P. C. Roy has issued Press statement regarding ratio which has caused consternation among commercial community. President and Secretary Currency League who have left for Calcutta should be given fair hearing in matter of such great national importance. Please induce Bengal friends to take no precipitate action."—U. P. [*Forward* : 30th November, 1933]

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকেও কবি অনুরূপ মর্মে একটি তার করেন।

নলিনীরঞ্জন টাকার মূল্য হ্রাসের পক্ষেই ছিলেন। কবির তার পাওয়ার পর তিনি 'কারেন্সী লীগে'র কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাংলার অর্থনীতিবিদ্‌গণের এক খোলাখুলি আলোচনার ব্যবস্থা করেন। ২৮শে নভেম্বর কলিকাতার হিন্দুস্থান ভবন-এ এই আলোচনা সভা হয়। বলাবাহুল্য এই আলোচনার ফলে কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় নাই।

উল্লেখযোগ্য, নলিনীরঞ্জন সরকার তখন বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্সের প্রেসিডেণ্ট। তিনি অবশ্য আচার্য রায়ের এই দৃষ্টিভঙ্গী ও মত খণ্ডন করিয়া এক দীর্ঘ বিবৃতি দেন। উহা এই সময় 'বিচিত্রা'তে (অগ্রহায়ণ, ১৩৪০) সংকলিত হয়। তিনি লিখিলেন :

"টাকার দাম বাড়িয়ে আঠারো পেন্স রাখা হয়েছে,—ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থ দেখতে হলে একে ষোলো পেন্সে নামিয়ে আনা উচিত, বহু পূর্বেই এটা উচিত ছিল; একথা কেবল আমার নয়, এ দেশে যারা বাণিজ্য-ব্যবসায়ী সকলেরই মত। ভারতের সর্বাঙ্গীন আর্থিক উন্নতি টাকার এই মূল্য হ্রাসের উপরে বড় বেশি পরিমাণে নির্ভর করে। কেবল ব্যবসায়ী ব্যাপারীরাই নন, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্‌দেরও এই মত, কিন্তু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্প্রতি উলটো গেয়েছেন। তিনি টাকার বর্তমান হার বজায় রাখার পক্ষে।...

"এই বাদ-প্রতিবাদের ক্ষেত্রে বোম্বাই-বাংলার পুরনো কচ্‌কচি টেনে আনা হয়েছে। বলা হয়েছে যে টাকার মূল্য কামানোর ফলে বোম্বাইয়ের মিলের মালিকদের টাকা কামানোর সুযোগ হবে। কেননা মুদ্রা-বিনিময়ের এই নতুন হারে বিদেশের আমদানি যন্ত্রপাতির, বিশেষ করে কাপড়-তৈরির কলকব্জার দর বেড়ে যাবে; ফলে বাংলাদেশে যে-সব কাপড়ের কলের পত্তন এবং প্রসার হচ্ছে তাদের হবে অসুবিধা এবং তার সুবিধাটুকু ভোগ করবে বোম্বাই। অর্থাৎ টাকার হার কমানো মানে বি-প্রদেশী

কলের আহার যোগানো, আমাদের পেট কেটে অন্য প্রদেশের পকেট ভারী ক'রে তোলার ব্যবস্থা।...

"কিন্তু একথা মনে করা ভুল। যে মুদ্রানীতি সমগ্র দেশে চলবে তার ফল সমগ্র প্রদেশেই সমান হবার কথা—তার ভেতরে এক প্রদেশের ফলার আর অন্য প্রদেশের একাদশীর বিধান নেই। এবং একথা মনে করাও ভুল যে কলকারখানা যা কিছু হবার তা কেবল বাংলাদেশেই হচ্ছে এবং বোম্বাই তা বহুদিন আগেই চুকিয়ে দিয়েছে।...

"কিন্তু টাকার দাম কমে গেলেই কলকারখানা করার অসুবিধা হবে এই মত মানা যায় না, কেননা বোম্বাইয়ের বেশির ভাগ মিল যখন খোলে সে সময় টাকার দাম আঠারো নয়, ষোলো পেন্সই ছিল।...যদি নতুন মিল খোলার দিকে লক্ষ্য রেখেই আচার্য রায় আঠারো পেন্স হারের পক্ষপাতী হয়ে থাকেন তাহলে একথাও বলতে হয় যে বোম্বাইয়ে এখনও যথেষ্ট নতুন মিল খুলছে।...

তিনি আরও বলিলেন :

"কিন্তু অন্যদিকে টাকার মূল্য যদি বর্ধিত হারেই থাকে তাতে বিদেশী যন্ত্রপাতির সুলভতার সঙ্গে বিদেশী মালও সুলভ হবে ; এবং তার আমদানির ধাক্কায় এদেশী সব মিলের অবস্থাই সঙ্গীন হতে বাধ্য, তা বাংলারই কি আর বোম্বাইয়েরই কি। আজকের দিনে যখন বিদেশী মালের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সমস্যাই সব চেয়ে নিদারুণ; সে-সময় কেবল সস্তায় কারখানা করার দিকে তাকালেই চলবে না, সেই কারখানার তৈরি জিনিস আমদানি-মালের চেয়ে সস্তায় বাজারে কাটানো যাবে কিনা সে-দিকটাও দেখতে হবে।

"টাকার দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্রের দর বেড়ে যাবে। বিশেষ করে, সেই সব জিনিসের যা বিদেশে চালান যায় অর্থাৎ আমদানীর হাটে ভারতবর্ষের কিঞ্চিৎ ক্ষতি হলেও রপ্তানির বাজারে তার লাভের বরাত।"

সুস্থ জাতীয় অর্থনীতির মূলনীতিটি কী হওয়া উচিত তাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি ইংলণ্ড ও জাপানের তৎকালীর বৈদেশিক বাণিজ্য ও মুদ্রামান নীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলিলেন :

"প্রত্যেক দেশেরই লক্ষ্য থাকে যাতে তার আমদানি কমে গিয়ে রপ্তানি বেশি হয় —দেশের ধনবৃদ্ধির যেটা সহায়। ইংলণ্ড পাউণ্ড স্টার্লিং-এর দর কমিয়ে এবং বিদেশী আমদানির বিরুদ্ধে উঁচু টারিফের বেড়া তুলে এই উদ্দেশ্য সাধন করছে। আজ যে জাপান তার সস্তা মালে ভারতবর্ষ ছেয়ে ফেলতে পেরেছে এবং এদেশের ব্যবসার সব চেয়ে শত্রুতা-সাধন করছে সেটা সম্ভব হয়েছে তার ইয়েনের (Yen) দর কমিয়ে দেওয়ার ফলে।"... [বিচিত্রা : অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ ; পৃঃ. ৫৯৭-৯৯]

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তখন মাদ্রাজে থাকায় কলিকাতার ঐ আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই—কবির তারটিও যথাসময়ে হস্তগত হয় নাই। কয়েক-দিন পর কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি সব শুনিয়া তাঁহার বক্তব্যের সপক্ষে এক দীর্ঘ প্রেস-বিবৃত দেন (৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩)। এই বিবৃতির শুরুতেই তিনি বলেন :

"আমি মাদ্রাজে গিয়াছিলাম। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুরের এক তার পাইলাম। তিনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, আমি যেন বোম্বাইয়ে কারেন্সী লীগের সভাপতি ও সম্পাদকের সহিত টাকার মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা করি। কলিকাতা পৌঁছিতে আমার একদিন বিলম্ব হইয়াছিল। তাই আমি তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিবার আনন্দলাভ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।

"টাকার মূল্য হ্রাস করার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ হইতে যে আন্দোলন দেখা যাইতেছে, আমি তাহার জন্য কতকটা দায়ী, সুতরাং আমার কৈফিয়ৎ কি, তাহা পরিষ্কার করিয়া জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করা আমার কর্তব্য।

"এরূপ বলা হইয়াছে যে, গত ৪ঠা নভেম্বর তারিখে সংবাদপত্রে আমি যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছিলাম, তাহাতে সমগ্র ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থের কথা বিবেচনা করি নাই। বর্তমান আর্থিক দুরবস্থার ফলে বাংলা দেশেরই সর্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট হইয়াছে। তাই বাংলার কথাই সর্বাগ্রে আমার মনে জাগে। সে যাহাই হউক, বাংলাদেশের স্বার্থের দিক হইতে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা ভারতের অন্যান্য সকল প্রদেশের বেলায়ই প্রযুক্ত হইতে পারে।"

তিনি বলেন, কেবল টাকার মূল্য হ্রাস করিয়াই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবসা-বাণিজ্যে যে মন্দা দেখা দিয়াছে তাহা সর্বনিম্ন সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। এই সময়ে কেবল মুদ্রার মূল্য হ্রাসের দ্বারা জগতের ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুন্নতি সম্ভবপর হইবে না; কারণ মুদ্রামূল্য হ্রাস প্রণালী কোনও দেশবিশেষের একচেটিয়া প্রণালী নহে,—যে কোন দেশ ইচ্ছা করিলেই পারে। তিনি আরও বলেন:

"আমি এমন কথা বলি না যে, আমাদের বাট্টার হারের মধ্যে কোনপ্রকার গলদ নাই তবে আমার মত এই যে, আমাদের দেশের বর্তমান দুর্গতির জন্য একমাত্র বাট্টার হারকেই দায়ী করা যায় না।"

তারপর তিনি চিনি ও কাপড় কলের যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের আমদানী-রপ্তানীর পরিসংখ্যান দিয়া বলেন:

"যাহারা মুদ্রার মূল্য হ্রাস করার পক্ষপাতী এবং যাহারা পাউণ্ডের সহিত টাকার সম্পর্ক ছিন্ন করিতে প্রয়াসী, তাঁহারা বোধ হয় একটা কথা ভাবিয়া দেখেন নাই। আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, এরূপ ব্যবস্থা করিলে আমাদের মুদ্রা বিনিময়ের হার অস্বাভাবিকভাবে উঠতি-পড়তির মধ্যে আসবে। ইহাতে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

"আমি বলিয়াছিলাম, টাকার মূল্য হ্রাস করিলে বাংলা দেশে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠায় অসুবিধা হইবে। উত্তরে বলা হইয়াছে যে, বাংলা দেশে যে পরিমাণ কাপড়ের কলের সরঞ্জাম আমদানী হয়, বোম্বাই তদপেক্ষা অনেক বেশি কলকব্জা আমদানী করে, সুতরাং বাংলার ন্যায় বোম্বাইয়েরও অসুবিধা ঘটিবে। এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বোম্বাইয়ে যে কলকব্জা আমদানী হয় তাহার অধিকাংশই কলকব্জার বদলে ক্রয় করা হয়। আর বাংলা দেশে যে কলকব্জা আমদানী হয়, তৎসমস্তই নূতন কলের জন্য নগদ টাকা দিয়া কিনিতে হয়,—পুরাতন কলকব্জার

বিনিময়ে নহে ; কাজেই কলকব্জা আমদানীর প্রশ্ন বোম্বাইয়ের পক্ষে তেমন গুরুতর না হইলেও, বাংলার কাপড়ের পক্ষে ইহা অতিশয় গুরুতর ব্যাপার।

"উপসংহারে বলিতেছি যে, গত ১৯২৭ সালে আমি ১৬ পেনীর পক্ষপাতী ছিলাম, কিন্তু এখন ১৮ পেনীর পক্ষপাতী হইয়াছি ইহার কারণ কী? উত্তর এই যে, তখন আমি স্বর্ণমানযুক্ত ১৬ পেনীর সমর্থন করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন স্বর্ণমান বর্জিত ১৬ পেনীর কথা হইতেছে। ইহা পূর্বেকার ১৬ পেনী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

"এই সমস্ত কারণে আমি বলিতে চাই যে, এখন মূল্যপরিবর্তনের উপযুক্ত সময় নহে, যখন পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা কতকটা স্বাভাবিক হইবে, তখন নূতন অবস্থাধীনে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া মুদ্রার মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে। বর্তমানে দেশের শিল্পোন্নতির কার্যে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা আবশ্যক। একমাত্র এই উপায়েই বর্তমান অর্থকষ্টের প্রতিকার হইতে পারে।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ২১ অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ ; ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩]

যাহাই হোক, এই বিতর্ক আরও কিছুকাল চলিয়াছিল। ২১শে ডিসেম্বর আচার্য রায় আরও একটি এই সম্পর্কে বিবৃতি দেন। নলিনীরঞ্জনের অর্থাৎ টাকার মূল্য-হ্রাসের পক্ষ সমর্থন করিয়া মৌলবী ফজলুল হক, তুষারকান্তি ঘোষ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং পক্ষান্তরে আচার্য রায়ের বক্তব্য সমর্থন করিয়া অধ্যাপক বিনয় সরকার, যদুনাথ রায়, ডঃ এম. রায়, অধ্যাপক যোগেশ সিংহ প্রমুখ অনেকেই বিবৃতি দেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কোনদিনই এই ধরনের বিতর্কে প্রবেশ করিতে চাহিতেন না—আবার একেবারে উদাসীনও থাকিতে পারিতেন না। বিশেষত এই বিষয়টিতে তাঁহাকে অত্যন্ত সতর্কতা ও সংযম অবলম্বন করিতে হয়। কেননা বিশ্বভারতীর অর্থসংগ্রহের ব্যাপারে তিনি বোম্বাইয়ে শিল্পপতিদের নিকট আবেদন জানাইয়া-ছিলেন। এই অবস্থায় এই বিতর্কে এতটুকু অসতর্ক মন্তব্য করিলে বাংলাদেশে কোন কোন মহল থেকে তাহার নানা কদর্থ ও অপপ্রচার হইত—এই কথা তিনি ভালোভাবেই জানিতেন। এই কারণেই নলিনীরঞ্জনকে তিনি ঐরূপ তার করিয়াছিলেন।

বোম্বাইয়ে কবিকে আরও কয়েকদিন থাকিতে হয়। এবং কয়েকটি সামাজিক অনুষ্ঠানেও যোগ দিতে হয়। ১লা ডিসেম্বর বোম্বাইয়ের Cowasji Jehangir Hall-এ ছাত্রদের একটি বিরাট সভায় কবিকে বক্তৃতা করিতে হয়। সভানেত্রী ছিলেন সরোজিনী নাইডু। এইদিন কবির বক্তৃতার বিষয় ছিল 'স্বাধীনতার মূল্য' (The Price of Freedom) [দ্র. পূর্ণাঙ্গ বয়ান : দেশ, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা : ৯ই ডিসেম্বের, ১৯৩৩ পৃঃ. ১৮-২১]। স্বাধীনতার মূল্য ও তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কবি বলিলেন :

"প্রকৃত স্বাধীনতা হইতেছে মনের ও আত্মার। উহা কখনও বাহির হইতে আসিতে পারে না। একমাত্র তাহারই স্বাধীনতা আছে, যে ব্যক্তি জীবনের পথে স্বাধীনতাকে আদর্শরূপে ভালবাসে এবং তাহা অপরকে প্রদান করিতে আনন্দিত হয়। যে ক্রীতদাস রাখিতে চাহে, সে নিজেকে তাহার নিকট শৃঙ্খলবদ্ধ করে ; যে অপরকে পৃথক

করিবার জন্য প্রাচীর নির্মাণ করে, সে নিজ স্বাধীনতার চারিদিকে প্রাচীর গড়িয়া তোলে; যে অপরের স্বাধীনতায় অবিশ্বাস করে, সে নিজের স্বাধীনতা লাভের নৈতিক অধিকার নষ্ট করে।"

তিনি আরও বলেন :

"আমি আমার দেশবাসীগণকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, তাহা বাহিরের কিনা, তাহা চিন্তা করিয়া দেখুন। তাঁহাদের সন্তানদের মন যাহাতে অন্যায় বাধানিষেধ-নির্মুক্ত আদর্শ মানব-মর্যাদার মধ্যে পুষ্টিলাভ করিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহারা কি সমাজে স্থান করিতে প্রস্তুত? একটা অনমনীয় পদ্ধতির মুষ্টির মধ্যে মানবগণকে পিষিয়া এবং বলপূর্বক অনমনীয় করিয়া আমরা জীবনের বিধান উপেক্ষা করিতেছি। আমরা আমাদের জীবন্ত আত্মাকে স্থায়ী জড়ত্বে পরিণত করিয়াছি এবং আমাদের আত্মাকে তাহার প্রভু হইবার উপযোগীভাবে রূপান্তরিত করিবার অযোগ্য করিয়াছি।"

সভ্যনামধারী ইউরোপের বড় বড় রাষ্ট্রগুলি—যাহারা মুখে স্বাধীনতা, সাম্য ও গণতন্ত্রের বড় বড় বুলি আওড়ায়—কবি তাহাদের সেই তথাকথিত স্বাধীনতার ও গণতন্ত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে গিয়া বলিলেন :

"আমরা স্বাধীন, সার্বভৌম ক্ষমতা আমাদের করতলগত, এরূপ মনে করিয়া পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা গৌরব বোধ করেন বটে, কিন্তু একদল স্বার্থপর লোক তাহাদের এই স্বাধীনতার সবটুকুই অপহরণ করিতেছে। জনসাধারণকে মনে মনে বাহ্যিক স্বাধীনতা ভোগ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়, কিন্তু কার্যত সঙ্ঘবদ্ধ স্বার্থের পরিকল্পনা অনুসারে তাহাদের চিন্তাগুলি পর্যন্ত গড়িয়া তোলা হয়। আদর্শ নির্বাচনে এবং মতামত গঠনে পর্যন্ত ইহারা বাধা পাইয়া থাকে। অপবাদ এবং মিথ্যার চাপ অথবা দণ্ডদানে সক্ষম শক্তির প্রভাবে পদে পদে তাহারা বাধা পাইয়া থাকে সুতরাং একটি কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যেই ইহারা জীবন কাটাইতে বাধ্য হয়।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০; ২রা ডিসেম্বর, ১৯৩৩]

উপসংহারে কবি দেশবাসীকে যান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থার বন্ধন থেকে চিন্তা ও মনের অবাধ ও সর্বাত্মক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিবার আবেদন জানান।

২রা ডিসেম্বর, বোম্বাইয়ে Indian Merchants' Chamber-এর উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় কবি বিশ্বভারতীর সুপ্রতিষ্ঠার জন্য দেশবাসীর নিকট অর্থসাহায্যের আবেদন জানান। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন যে তাঁহার এই মহৎপ্রচেষ্টায় ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে অধিকতর উৎসাহ ও সহযোগিতা লাভ করিয়াছেন অথচ দেশবাসীর কাছ থেকে তেমন সাড়া পান নাই। গভীর আক্ষেপের সঙ্গে তিনি বলিলেন :

"Have I come here merely to entertain you? Do people respect me merely because I entertain them?"

—রুদ্ধ আবেগে তাঁহার কণ্ঠস্বর ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচাইয়া রাখিতে গিয়া তিনি ভিক্ষাপাত্র হাতে লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিতেছেন অথচ দেশবাসী তাঁহার আবেদনে উপযুক্ত সাড়া দিতেছেন না।

তাই শ্রেষ্ঠীসমাজের কাছে তিনি ইহার আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানাইয়া বলিলেন :

"If you acknowledge me as a great poet you should also see that my mission in life should be a success···I have not been able to realize the ideal of an Eastern University fully, because I have not received sufficient response from my countrymen."

[*Bombay Chronicle* : 5th December, 1933]

যাহাই হোক, কবির এই আবেদন একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। ইহার পর শেঠ মথুরাদাসের উদ্যোগে বিশ্বভারতীর জন্য একটি অর্থ ভাণ্ডার বা তহবিল খোলা হয়। মোটামুটি কিছু অর্থও সংগৃহীত হয় বটে তবে তাহা কবির আশানুরূপ হয় নাই। এইভাবে বিশ্বভারতীর আর্থিক সমস্যায় কবিকে সারা জীবনই দীনতা ও আত্মাবমাননা ভোগ করিতে হয়, অথচ উহাতে 'জাতও যায় পেটও ভরে না'।

৫ই ডিসেম্বর কবি ওয়ালটেয়ার যাত্রা করেন। ৮ই ও ১০ই ডিসেম্বর অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাকে পর পর দুটি বক্তৃতা করিতে হয়। পরে এ দুটি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক *Man* নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

অন্ধ্র থেকে কবি হায়দ্রাবাদেও যান (১২ই ডিসেম্বর)। সেখানে তিনি হায়দ্রাবাদের নিজামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিছুকাল পূর্বে বিশ্বভারতীতে ঐস্লামিক সংস্কৃতির আলোচনা ও গবেষণা-চর্চার জন্য নিজাম প্রায় লক্ষাধিক টাকা দান করিয়াছিলেন। এই সব লৌকিকতা ও সামাজিকতা রক্ষা ছাড়াও তাঁহাকে দু' একটি বক্তৃতাও করিতে হয়। ডিসেম্বরের শেষভাগে কবি কলিকাতায় ফিরিলেন (২৮শে ডিসেম্বর)।

বিহার ভূমিকম্প : গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ বিতর্ক

হায়দ্রাবাদ থেকে কলিকাতায় ফিরিয়াই কবিকে কয়েকটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়। ২৯শে ডিসেম্বর (১৯৩৩) রামমোহন রায়ের মৃত্যুশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে এক জনসভা হয়। এই সভায় কবি 'ভারত পথিক রামমোহন' নামক বক্তৃতাটি (দ্র. 'ভারত পথিক রামমোহন'-বিশ্বভারতী) পাঠ করেন। আধুনিক যুগের ইতিহাসে রামমোহন যে বিশেষ ভূমিকা ও বাণীটি বহন করিয়া আনেন, কবি তাঁহার ভাষণে উহার তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করেন। রামমোহন রায়ই যে তাঁহার জীবনের আদর্শ ও আরাধ্য পুরুষ—এইকথা বহুবার নানাভাবে তাঁহার রচনায় ও বক্তৃতায় ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কলিকাতায় এই সময় 'নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন'-এর অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন (All India Women's Conference : December 28-30, 1933)

চলিতেছিল। লেডি আব্দুল কাদের ইহার সভানেত্রী নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রায় দুইশত মহিলা প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনের উদ্বোধনের দিনই কবির যোগদান করার কথা ছিল কিন্তু কলিকাতায় তখনও প্রত্যাবর্তন করিতে না পারায় সম্মেলনের শেষদিন তিনি ইহাতে যোগদান করেন (৩০শে ডিসেম্বর)। তাঁহার জীবনের মূল প্রেরণাশক্তি হিসাবে নারীর যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, এই কথা বলিয়া তিনি 'মানব-সভ্যতায় নারীর ভূমিকা' সম্পর্কে তাঁহার পূর্বলিখিত একটি নিবন্ধের সামান্য একটু রদবদল করিয়া সম্মেলনে উহা পাঠ করেন।

যুদ্ধ-সংঘর্ষভরা এই পুরুষ-প্রধান সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ-উদ্ঘাটন করিতে গিয়া কবি তাঁহার ভাষণে বলিলেন :

"Man having the advantage over woman in a comparative freedom from biological obligations, could devote his unhampered leisure in constructing civilisation which naturally followed in a large measure his own temperament and tendencies and woman for ages was constrained to adjust herself to a narrowness of sphere allowed to her. At the present stage of history civilisation has become *primarily masculine*, a civilisation of power in which woman from her captivity spends her surplus wealth of emotion in merely decorative purposes of society.

"Therefore this civilisation has lost its balance and is moving by hopping from war to war trampling helpless life on its path under its drunken tread. Its motive forces are the forces of constant coercions in big scales for the sake of results of absurdly vast dimensions entailing apalling member of human sacrifices. To-day, we find this uncadenced civilisation crashing at a tremendous speed along a perilous slope knocking against unforeseen catastrophies never knowing how to stop. And at last the time has arrived when woman must step in and impart her life-rhythm to this reckless movement of power."

তিনি বলিলেন, নারীর সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতা প্রেমে,—যাহার দ্বারা সে অনায়াসে কোন জিনিসের অন্তরে প্রবেশ করিয়া জীবনের গভীর রহস্য ও চিরন্তন কৌতূহল উদ্ঘাটন করিতে পারে এবং এই কারণে প্রেম নারীর হৃদয়ে স্বতঃ-উৎসারিত। তাই সভ্যতা সৃষ্টির প্রয়োজনে নারীর প্রয়োজন ও ভূমিকা পুরুষ অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে বরঞ্চ অধিক। তিনি বলিলেন, নারী আজ জীবিকাসংস্থানের ক্ষেত্রে পুরুষের একচেটিয়া কর্তৃত্বের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করিতেছে না,—পরন্তু সভ্যতা সৃষ্টিতে পুরুষের একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে। নারী তাহার সহজাত প্রেমের স্পর্শে পৃথিবীর ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাপ্লুত

ব্যক্তিমানবকে রক্ষা করার জন্য আগাইয়া আসিবে এবং আমাদের প্রতিটি সুন্দর ভাব-কল্পনাকেও রক্ষা করিবে। কবি বলিলেন :

"কিন্তু পুরুষের উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থার চাপে নারীকে চিরকালের মত মনুষ্যসমাজের শোভাবর্ধক করিয়া রাখাও সম্ভবপর নহে—কেননা সভ্যতার বিস্তৃতির দিক হইতে পুরুষ অপেক্ষা নারীর আসন কম উচ্চে নহে—সম্ভবত সে-ক্ষেত্রে পুরুষের ঊর্ধ্বেই তাহার আসন।…

"জগতেতিহাসে বর্তমান যুগে পুরুষ যদিও পৌরুষ প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠ করিতে যত্নবান হইয়া সৃজনশক্তির মূলনীতিকে উপেক্ষা করিয়া ইষ্টক ও প্রস্তর রাশিদ্বারা সভ্যতার সৌধ গঠনে ব্যস্ত, তথাপি তাহারা কিছুতেই নারীর নারীত্বকে ধূলিতলে বা প্রাণহীন ইটপাথরের নীচে নিষ্পেষিত করিয়া রাখিতে পারিবে না। নারী আজ আর শুধু জীবন-সংগ্রামে স্বাধীনতা চাহিতেছে না, ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে পুরুষের একাধিপত্যের বিরুদ্ধেই শুধু সে আজ লড়িতেছে না—সে আজ সভ্যতা-প্রগতি প্রচেষ্টায় পুরুষের একাধিপত্যের বিরুদ্ধেও আত্মপ্রতিষ্ঠা চাহে। সৃষ্টির রথ ধ্বংস ও দুঃখ দৈন্য চারিদিকে ছড়াইতে ছড়াইতে জীবনের দীর্ঘ পথ বাহিয়া আগাইয়া চলিয়াছে; কেননা জগতে শক্তি ও গতির প্রয়োজনীয়তা উহারই সর্বাপেক্ষা অধিক। তাই দলিত-নিষ্পেষিত মানবসাধারণের মধ্যে আজ নারীকে ছুটিয়া আসিতে হইবে। দীনহীন তুচ্ছাতিতুচ্ছ সকলকেই তাহাকে আপনা বলিয়া টানিয়া তুলিতে হইবে। আত্মপ্রাধান্যের তীক্ষ্ণ দাহ হইতে নারীকে সযত্নে পুরুষের কোমল মনোবৃত্তিগুলিকে আবরিয়া রাখিতে হইবে। নির্যাতিত মানব-সমাজের ভারাক্রান্ত ধরিত্রী নারীর নিকট কাতর আবেদন পাঠাইয়াছেন—এই নির্যাতিত দলিতগণকে তাহাদের যোগ্য মূল্য দিতে হইবে, তাহাদের মাথা উচ্চে তুলিয়া ধরিতে হইবে। নারীর ভালবাসার শক্তি দিয়া ভগবানের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা ভালবাসা জিয়াইয়া তুলিতে হইবে। আমরা মনে যেন এ বিষয়ে কোনই সংশয় না-রাখি যে, স্বৈরক্ষমতা গর্বে স্ফীত ও পরস্বার্থ-শোষণে বিচার-বিবেচনাহীন পুরুষগণকে জীবনপ্রবাহের আগামী পর্যায়েই পরাভব স্বীকার করিতে হইবে।…ভবিষ্যৎ সভ্যতার আমলে বর্তমানকালের এই অত্যাচারী পরস্ব-গ্রাসিগণকে অপেক্ষাকৃত দুর্বলদের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং নর-নারীর মিলনে জীবনের সর্বস্তরে তুল্যাধিকার প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে মনুষ্যসমাজের ইতিহাস রচনায় নর-নারীর পূর্ণ সহযোগিতা আত্মপ্রকাশ করিবে। **ভবিষ্যতের ইভ্ ক্ষমতাগর্বে স্ফীত ও বিভ্রান্ত আদমকে বিপথ হইতে ভুলাইয়া আনিয়া উভয়ের সুখস্বর্গ গঠনে নিজশক্তির সহিত তাহার যোগ্যতার সংমিশ্রণ সাধন করিবে—** প্রচণ্ড পীড়নযুগের অবসানে এক উদার মৈত্রীযুগের উদ্ভব হইবে, মনের সহিত সামর্থ্যের মিলন ঘটিবে এবং ঐযুগে কেহ কাহাকেও আদর্শবাদের ধাপ্পায় অধীনতার চাপে নিষ্পেষিত করিয়া রাখিতে পারিবে না—স্ব স্ব মুখোস খুলিয়া ফেলিতে বাধ্য হইবে"। (বড় হরফ আমার)

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ১৬ই পৌষ, ১৩৪০ ; ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩]

তিনি বলিলেন :

"Therefore woman must come into the bruised and maimed world

of the individual, she must claim each one of them as her own, the useless and the insignificant, the lowliest and the lost. She must protect with her care all the beautiful flowers of sentiment from the scorching laughter of the science of proficiency. The world with its insulted individuals has sent its appeal to her."…

উপসংহারে কবি বলিলেন :

…"The union of man and woman will represent a perfect co-operation in building up of human history on equal terms in every department of life. The future Eve will lure away the future Adam from the wilderness of a masculine dispensation and mingle her talents with that of her partner in a joint creation of a paradise of their own. The rudely elbowing age of relentless rapacity will give way to that of a generous communion of minds and means, when individuals will not be allowed to be terrorised into abject submission by idealistic bullies complled to lose their own physiognomy in a gigantic mask of a nebulous abstraction."

[*Forward* : January 1, 1934]

বিশ্বসভ্যতায় নারীর স্থান বা ভূমিকাকে কবি যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ও মহিমান্বিত দেখিতে চাহিয়াছিলেন, এই ভাষণের প্রতিটি ছত্রেই তাহা অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সম্মেলনের শেষে কবি সকলের সাথে দণ্ডায়মান হইয়া সমবেতকণ্ঠে তাঁহার "জনগণ মন" সংগীতটি গাহিলেন।

নিঃ ভাঃ মহিলা সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার দিন চারেক পরেই কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন। উহার দিন দুই পর সরোজিনী নাইডু শান্তিনিকেতনে আসেন (৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৪)। শান্তিনিকেতনে আম্রকুঞ্জে তাঁহাকে যথোচিত সংবর্ধনা জানানো হয়। এই সভায় 'বর্তমান সমস্যা' সম্পর্কে তিনি একটি ভাষণ দেন।

সরোজিনী নাইডু চলিয়া যাওয়ার কিছুদিন পর জওহরলাল নেহরু সস্ত্রীক কবি-সন্দর্শনে শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করিতে আসেন (১৯শে জানুয়ারী, ১৯৩৪)। কয়েকদিন পূর্বে তিনি কলিকাতা গিয়াছিলেন—ফিরিবার পথে শান্তিনিকেতনে নামিলেন। সম্ভবত জহওরলালের ইহাই তৃতীয়বার শান্তিনিকেতন পরিদর্শন। তাঁহারা তখন তাঁহাদের কন্যা ইন্দিরাকে শান্তিনিকেতনে ভর্তি করিয়া দিবার কথা চিন্তা করিতেছিলেন এবং প্রধানত সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের শান্তিনিকেতন আসা।

[দ্র. আত্ম-চরিত : পৃঃ. ৫১৬]

উহার দিন চার পূর্বে—১৫ই জানুয়ারি অপরাহ্ণে বিহার ও নেপাল অঞ্চলে এক অত্যন্ত ভয়াবহ ভূমিকম্প হইয়া যায়। কয়েকদিন পর উহার ভয়াবহ ধ্বংসলীলার ও ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ প্রকাশিত হইতে থাকে। এই অবস্থায় গভর্নমেণ্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদকে মুক্তি দেন (১৭ই জানুয়ারি)। মুক্তি পাওয়ার পরই তিনি দুর্গত এলাকায় উদ্ধার ও সেবাকার্যের জন্য ছুটিলেন। উহার দিন দুই পর গান্ধীজীকে

তিনি এক তারাবার্তায় পরিস্থিতির শোচনীয়তা ও ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করিয়া অবিলম্বে দুর্গতদের সাহায্যের প্রেরণের আবেদন জানাইলেন, এবং ঐ মর্মে তিনি এক প্রেস-বিবৃতিও দিলেন। জওহরলালও সেবাকার্যের জন্য সেখানে ছুটিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। এই সংবাদে কবির মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। ২৩শে জানুয়ারি তিনি এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস-এর মাধ্যমে বিহার ভূমিকম্পের দুর্গতদের অবিলম্বে সাহায্য প্রেরণের জন্য দেশবাসীর উদ্দেশে এক আবেদন জানান। কবির আবেদনটি ছিল এই :

"নৈসর্গিক বিপৎপাতে বিহারের অধিকাংশ আজ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। এখনও এই ধ্বংসলীলার বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় নাই। অবিলম্বে দুর্গতদের দুঃখহরণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আমার দেশবাসী প্রত্যেক নরনারীর নিকট আমার অনুরোধ—তাঁহারা নিরাশ্রয় আর্তগণের সাহায্যে অগ্রসর হউন। ভারতের বাহিরে যেখানে যত ভারতবন্ধু আছেন—তাঁহাদিগকেও আমি বিহারের দুর্গতিমোচনে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করি।"

[দেশ-১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা : ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৩৪ পৃঃ. ৭১]

গান্ধীজী তখন হরিজন আন্দোলনে দক্ষিণ ভারত পরিক্রমা করিতেছিলেন। সংবাদপত্রে ভূমিকম্পের বিবরণ এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদের তার পাইয়া মর্মান্তিক দুঃখে তাঁহার হৃদয় ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হয়। ২৪শে জানুয়ারি, তিনি তিন্নেভেলিতে এক জনসভায় বিহারে ভূমিকম্প-দুর্গতদের অকাতরে সাহায্য প্রেরণের জন্য দেশবাসীর কাছে এক করুণ আবেদন জানাইলেন। কিন্তু এই ভূমিকম্পের কার্যকারণ সম্পর্কে তিনি এমন কিছু মন্তব্য করেন যাহার ফলে দেশে খুব তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন :

"এই সকল বিবরণ পাঠেই বুঝিতে পারা যায়, কতখানি অকিঞ্চিৎকর ও কতটা নশ্বর জীব আমরা। আমাদের মধ্যে ভগবানে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহাদের মনে অবশ্যই এ ধারণা বলবৎ থাকিবে যে, এই মর্মান্তিক দৈব-দুর্বিপাকের পশ্চাতেও মঙ্গলময়ের জনমঙ্গলময় মহদভিপ্রায় লুক্কায়িত রহিয়াছে। আপনারা আমাকে ইচ্ছা করিলে কুসংস্কারাপন্ন বলিতে পারেন, কিন্তু আমার মত একজন লোকের পক্ষে ইহা বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই যে, এই দুর্বিপাকের মধ্য দিয়াই ভগবান আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমার দৃঢ় আস্থা বিদ্যমান যে, ভগবানের অভিপ্রায় ব্যতীত তৃণখণ্ডও স্থানচ্যুত হইতে পারে না।"...

তিনি আরও বলিলেন :

"For me there is a vital connection between the Bihar calamity and the untouchability campaign. The Bihar calamity is a sudden and accidental reminder of what we are and what God is ; but untouchability is a calamity handed down to us from century to century···Let this Bihar calamity be a reminder to us that, whilst we have still a few more breaths left, we should purify ourselves of the

taint of untouchability and approach our Maker with clean hearts.'

[*Makatma* : Vol. III, pp. 247-48]

পরদিন প্রায় সমস্ত পত্র-পত্রিকায় গান্ধীজীর এই বিবৃতি প্রকাশিত হয়—প্রায় সাথে সাথেই দেশের চারিদিকে একটা সমালোচনার গুঞ্জন উঠিল। এই বিবৃতি পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এমন কথা যে গান্ধীজী বলিতে পারেন, উহা প্রথমে তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন এমন কথা বিনা-প্রতিবাদে চলিতে দিলে উহার পরিণাম খুবই অশুভ হইবে। তাই গান্ধীজীর এই বক্তব্যের যুক্তি খণ্ডন করিয়া তিনি একটি বিবৃতি রচনা করেন। কবি তাঁহার বিবৃতিতে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্মার্থ ছিল এইরূপ :

"যাঁহারা অস্পৃশ্যতা সামাজিক সংস্কারে বিশ্বাস করেন গান্ধীজী তাঁহাদের বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন যে, এই পাপের জন্যই ঈশ্বরের রোষানল বিহারের কিয়দংশের উপর (স্পষ্টত তাঁহার বিশেষ নির্বাচিত স্থান হিসাবে) পতিত হইয়াছে। এই কথা পাঠ করিয়া আমি অত্যন্ত বেদনাজনক বিস্ময় বোধ করিয়াছি। আরও এক দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার এই যে, বিশ্ব ঘটনা সম্পর্কে এই ধরনের অবৈজ্ঞানিক চিন্তা আমাদের দেশের এক বৃহৎসংখ্যক মানুষ অনায়াসে মানিয়া লয়।

"প্রাকৃত জড়ঘটনাসমূহের একটি বিশেষ সমবায়ই হইল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অনিবার্য ও একমাত্র কারণ। বিশ্ব-বিধানসমূহ অলঙ্ঘ্য; এই বিধানগুলির কাজে ঈশ্বর নিজেও কোনদিন হস্তক্ষেপ করেন না। যদি করিতেন তবে তিনি নিজেই তাঁহার নিজের সৃষ্টির সামগ্রিক সততা নষ্ট করিয়া দিতেন। এই কথায় যদি আমরা বিশ্বাস করিতাম তাহা হইলে বর্তমান যে-ঘটনাটি ভয়াবহরূপে ও ব্যাপকভাবে আমাদের মর্মে তীব্র আঘাত করিয়াছে এই জাতীয় ঘটনাস্থলে বিধাতার কার্যকলাপের সমর্থন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত।

"আমরা যদি আমাদের নৈতিক সত্যগুলিকে বাহ্যসৃষ্টির ঘটনাসমূহের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলি তাহা হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, নৈতিক দিক দিয়া বিধাতা হইতে মানবপ্রকৃতি অনেক বড়; কারণ, দেখা যাইবে সৎচরিত্র-শিক্ষার প্রচারের জন্য তিনি এমন বিপর্যয় ঘটাইয়া বসেন যাহা সর্বনিকৃষ্ট চরিত্রের পরিচায়ক। আমরা মানুষের মধ্যে এমন কোনও সুসভ্য শাসকের কথা কল্পনা করিতে পারি না যাহা আকস্মিক নরহত্যার দ্বারা একটা বাছবিচারহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবেন; এ নরহত্যার মধ্যে শিশু আছে, অস্পৃশ্য সমাজের লোকেরাও আছে; আর এই হত্যা সাধন করা হইবে সেই সকল লোকেরই মনে দাগ কাটিবার জন্য যাহারা বেশ নিরাপদে দূরে বাস করিতেছে—অথচ তাহারাই হইল তীব্র নিন্দার ও শাস্তির যোগ্য।…

পরিশেষে কবি লিখিলেন :

…"আমার দিক হইতে এই বিশ্বাসেই নিজদিগকে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিতেছি যে আমাদের পাপ এবং ভুলভ্রান্তি যত বিপুলই হোক—তাহারা এত শক্তিশালী কখনই নয় যাহাতে সৃষ্টির কাঠামোটিকেই নিম্নে টানিয়া লইয়া একেবারে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। এই সৃষ্টির কাঠামোর উপরে আমরা পাপী এবং পুণ্যাত্মা,

গোঁড়া এবং প্রথাভঙ্গকারী দল—সকলেই নির্ভর করিতে পারি। মহাত্মাজী তাঁহার বিস্ময়কর প্রেরণা দ্বারা দেশবাসীর মনে যে ভয় ও ভীরুতা সঞ্চিত ছিল তাহা হইতে সকলকে মুক্তির জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে পারিয়াছেন ; তাহার জন্য তাঁহার কাছে আমরা যাহারা অশেষভাবে কৃতজ্ঞ বলিয়া মনে করি তাহারাই আবার মনে অত্যন্ত বেদনা বোধ করি যখন দেখি যে মহাত্মাজীর মুখ হইতে এমন বাণী নিঃসৃত হইতেছে যাহা সেই সব দেশবাসীর মনে অযুক্তির উপাদানসমূহকে বড় করিয়া তুলিতে পারে—এই অযুক্তিই সকল অন্ধশক্তির মূল আকর—যাহা আমাদিগকে জোরপূর্বক স্বাধীনতা ও আত্ম-সম্মানের পথ হইতে দূরে সরাইয়া লইতে পারে।"

কিন্তু এই বিবৃতি গান্ধীজীকে না-দেখাইয়া তিনি প্রেসে দিতে চাহিলেন না। তাছাড়া সংবাদপত্রে গান্ধীজীর যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কতখানি সত্য কতখানি বিকৃত, তাহা নির্ধারণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই কারণেই প্রথমে তিনি তাঁহার এই বিবৃতি গান্ধীজীকেই পাঠাইয়া দিয়া এক পত্রে লিখিলেন (২৮শে জানুয়ারি, ১৯৩৪) :

January 28, 1934

Dear Mahatmaji,

The Press reports that you in a recent speech referring to the recent earthquake in Bihar spoke as follows, 'I want you, the superstitious enough (sic) to believe with me that the earthquake is a divine chastisement for the great sin we have committed against those whom we describe as Harijans'. I find it difficult to believe it. But if this be your real view on the matter, I do not think it should go unchallenged. Herewith you will find a rejoinder from me. If you are correctly reported in the Press, would you kindly send it to the press ? I have not sent it myself for publication, for I would be the last person to criticise you on unreal facts.

I am looking forward to meeting you here. With deep love,

Yours as ever,
Sd/ Rabindranath Tagore.

কবির বিবেকবুদ্ধি ও সৌজন্যবোধ কত প্রখর ছিল, এই ঘটনাটি থেকে তাহার কিছু পরিচয় মেলে। যাহাই হোক, গান্ধীজীকে এই পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া কবি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। প্রেস-বিবৃতি ছাড়াও দুর্গতদের সাহায্য সংগ্রহের জন্য ব্যক্তিগতভাবেও চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরদিন নেপালের মহারাজকে সহানুভূতি জানাইয়া কবি এক তারবার্তা পাঠাইলেন (২৯শে জানুয়ারি) :

"I am staggered at the detailed news of the devastation of your land. Pray accept our sincerest sympathies in your terrible affliction."

তাছাড়া ইতিপূর্বে রাজেন্দ্রপ্রসাদ কবিকে এই মর্মে তার করিয়াছিলেন যে, তিনি বিহার দুর্গতদের সাহায্য ভিক্ষা করিয়া বিদেশে যেন আবেদন জানান। কবি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া জানাইলেন যে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা হইতেছে।

এদিকে গান্ধীজী তখনও হরিজন আন্দোলনে দক্ষিণ-ভারত পরিক্রমা করিতেছিলেন এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের পত্রটি যথাসময়ে তাঁহার হস্তগত হয় নাই। ২রা ফেব্রুয়ারি কুনুরে তিনি কবির পত্র ও বিবৃতিটি পান। ইতিমধ্যেই বিহার ভূমিকম্প সম্পর্কে গান্ধীজীর ঐ উক্তি সম্পর্কে তখন নানা বিরূপ ও তীব্র সমালোচনা চলিতেছিল। স্বভাবতই ইহার ফলে গান্ধীজী মানসিক দিক থেকে ক্লান্তি ও অবসাদবোধ করিতেছিলেন। ২রা ফেব্রুয়ারি সংখ্যা 'হরিজন' পত্রে আর একটি বিবৃতি দিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্যবিষয় পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিলেন। তিন্নেভেলিতে তিনি যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহারই পুনরুক্তি করিয়া তিনি 'হরিজন'-এ [দ্র. *Mahatma* : Vol. III, pp. 248-49] লিখিলেন :

"সমগ্র সভ্যজগৎ ও অসভ্য জগতের ন্যায় আমিও বিশ্বাস করি যে, বিহারের ভূমিকম্পের ন্যায় দুর্বিপাক মানুষরে পাপের শাস্তিস্বরূপই ভগবান প্রেরণ করিয়া থাকেন। আন্তরিকভাবে যখন মানুষ এই বিশ্বাস পোষণ করে, তখনই মানুষ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, অনুশোচনা করে এবং চিত্তশুদ্ধি করে। আমি মনে করি, অস্পৃশ্যতা এরূপ গুরুতর পাপ যে, ভগবান তজ্জন্য শাস্তি দিতে পারেন। যাঁহারা বলেন, 'চিরপ্রচলিত পাপের জন্য এতদিন পর শাস্তি কেন?—দক্ষিণ-ভারত দণ্ডিত না হইয়া একমাত্র বিহার দণ্ডিত হইল কেন? ভূমিকম্প ব্যতীত আর কোন শাস্তি ভগবান দিলেন না কেন?'—যাঁহারা এই সকল প্রশ্ন উত্থাপন করেন, আমি তাঁহাদের যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিতে পারি না। আমার উত্তর এই যে, আমি সর্বজ্ঞ ভগবান নহি। সুতরাং ভগবানের অভিপ্রায় উপলব্ধি করা আমার ক্ষমতাতীত। ভগবান অথবা নিসর্গের খামখেয়ালবশত এই সকল দুর্ঘটনা ঘটে না। আকাশের গ্রহ-উপগ্রহগণ যেরূপ কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন হইয়া ঘূর্ণায়মান, এই সকল নৈসর্গিক দুর্ঘটনাও তদ্রূপ কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। ঐ সকল নিয়ম কি, তাহা আমরা জানি না বলিয়াই সাব্যস্ত করি যে, এইগুলি 'দুর্ঘটনা' অথবা নিসর্গের ব্যতিক্রম। সুতরাং এই সম্পর্কে যিনি যাহা বলুন না কেন, সমস্তই অনুমান সাপেক্ষ। তবে, মানুষের জীবনে অনুমানেরও স্থান আছে; সুতরাং আমি যে অনুমান করি, অস্পৃশ্যতা-পাপের শাস্তিস্বরূপই ভূমিকম্প সংঘটিত হইয়াছে, সেই অনুমানে বরং হৃদয় উন্নত হয়। এই অনুমান আমাকে বিনয় শিক্ষা দেয়, অস্পৃশ্যতা উচ্ছেদ প্রচেষ্টায় আমাকে সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যে লইয়া যায়। হইতে পারে আমার অনুমান ভিত্তিহীন, কিন্তু তাহা হইলেও পূর্বোক্ত সুফল লাভের কোনও বিঘ্ন হয় না। কারণ সন্দেহবাদী ও সমালোচকের নিকট যাহা অনুমান, আমার নিকট তাহা জীবন্ত বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাস অনুসারেই আমি আমার ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নির্ধারণ করি।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ২১ মাঘ, ১৩৪০ ; ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪]

ঐদিনই তিনি রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার পত্র-প্রাপ্তির কথা স্বীকার করিয়া এই

সংখ্যা 'হরিজন'-এর এক কপি পাঠাইয়া দিয়া তার করিলেন যে, এটি পাঠ করিবার পর তিনি যদি প্রয়োজন বোধ করেন তবে তাঁহার প্রতিবাদ-বিবৃতিটি প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু তার করিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না।

ডাক ছাড়িবার শেষ মুহূর্তে তাঁহার এই বিবৃতির একটি কপিসহ কবিকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন (২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪)। তাঁহার বিরুদ্ধে তখন যে নিন্দা ও কুৎসার ঝড় বহিতেছিল তাহার উল্লেখ করিয়াও তিনি কবিকে লিখিলেন যে, তাঁহার প্রবন্ধটি পাঠ করিবার পর তিনি প্রয়োজন মনে করিলে তাঁহার প্রতিবাদ-বিবৃতিটি প্রকাশ করিতে পারেন। গান্ধীজীর পত্রটি ছিল এই :

Dear Gurudev,

I received your letter only just now. There is a campaign of vilification of me going on. My remarks on the Bihar calamity were a good handle to beat me with. I have spoken about (sic) it at many meetings. Enclosed is my considered opinion. I see from your statement that we have come upon perhaps a fundamental difference. But I cannot help myself. I do believe that super physical consequences flow from physical events. How they do so, I do not know.

If after reading my article, you still see the necessity of publishing your statement, it can be at once published either here or there just as you desire. I hope you are keeping well.

2-2-34 yours sincerely

Sd/- M K Gandhi

এই পত্রের পুনশ্চে গান্ধীজী (স্বহস্তে) লিখিয়াছিলেন :

"The last lines are disgracefully written but I was tired out and half asleep. Please forgive. If I am to catch the post today, I may not wait to make a fair copy." (পত্রটি 'রবীন্দ্রসদন'-এ রক্ষিত আছে।)

সম্ভবত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কবি গান্ধীজীর প্রেরিত এই পত্র ও 'হরিজন' পত্রিকাটি পান। এই পত্র পাওয়ার এবং 'হরিজন'-এ গান্ধীজীর প্রবন্ধটি পাঠ করার পর গান্ধীজীর বক্তব্য তাঁহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই অবস্থায় তিনি তাঁহার প্রতিবাদ-বিবৃতিটি প্রকাশ করাই যুক্তিযুক্ত বোধ করিয়া উহা ইউনাইটেড্ প্রেস্-এর প্রতিনিধিকে দেন। পরদিন উহা দেশের অধিকাংশ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (৫-৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪)। কিন্তু গান্ধীজীর ঐ পত্রে এমন একটি বেদনাজনক উক্তি ছিল যাহা পাঠ করিয়া কবি অত্যন্ত মর্মাহত ও বিচলিত হইয়া পড়েন। বিহার-ভূমিকম্প সম্পর্কে গান্ধীজীর মন্তব্যকে উপলক্ষ করিয়া তখন গান্ধীজীর বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচার চলিতে ছিল। বিশেষ করিয়া পুণা-চুক্তির ব্যাপারে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে একশ্রেণীর বাঙালী বুদ্ধিজীবীর মনে প্রচুর বিদ্বেষবাষ্প জমিয়াছিল—এই উপলক্ষে তাহার স্ফুরণ ঘটিল। কবি

স্পষ্টই বুঝিলেন, তাঁহার প্রতিবাদটি প্রকাশিত হইলে গান্ধীজীর বিপক্ষ ও নিন্দুকের দল আরও উৎসাহিত হইবেন। এইসব বিবেচনা করিয়া পরদিনই তিনি 'ইউনাইটেড্ প্রেস'-এর মাধ্যমে এক বিবৃতিতে এই গান্ধী-বিরোধী কুৎসা-প্রচার অবিলম্বে বন্ধ করিবার আবেদন জানাইলেন। এই কুৎসা-প্রচারকদের তিরস্কার করিয়া তিনি জানাইয়া দিলেন যে, সুস্থ-সমালোচনাকে সমর্থন করিলেও, সমালোচনার নামে কুৎসা-প্রচারের হীনতাকে তিনি কখনও সহ্য করিবেন না। ভারতের জাতীয় সাধনার ক্ষেত্রে গান্ধীজীর মহান অবদানটুকু সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করিয়া লইবার আবেদন জানাইয়া তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে ঐ বিবৃতিতে বলেন (৬ই ফেব্রুয়ারি, '৩৪) :

"মহাত্মা গান্ধীর বর্তমান কর্মপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আমার দেশবাসীর মধ্যে একদল লোকের বৈর-মনোভাব আমি কিছুকাল যাবৎ লক্ষ্য করিতেছি। খাঁটি সমালোচনা হইলে কাহারও তাহাতে আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু সমালোচনা ও কুৎসা রটনার মধ্যে একটা পার্থক্য সর্বদাই আছে। যিনি প্রকৃতই মহৎ, তাঁহার নিকট স্তুতিবাদও যেমন অসার, কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকের টিট্‌কারীও তেমনই এবং আমি জানি যে, মহাত্মাজির মধ্যে সে মহত্ত্ব আছে। কিন্তু তথাপি, তাঁহার বিরুদ্ধে যে কুৎসা-প্রচারের কার্য চলিতেছে, তাহার প্রতিবাদ যদি আমি না করি, তাহা হইলে আমার কর্তব্যে আমি পরাঙ্মুখ হইব। কারণ মহাত্মাজিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি জনসাধারণকে বহু শতাব্দীর দাসত্বসঞ্জাত নৈরাশ্য ও আত্মাবমাননার পঙ্ককুণ্ড হইতে উদ্ধার করিতে সর্বাপেক্ষা অধিক সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার আশা ও বিশ্বাসের বাণী যেন এক রাত্রের মধ্যেই জনসাধারণের সমগ্র মনোভাব পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে। যাহারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া নিজেদের শিরে অসম্মানের বোঝা অসীম সহিষ্ণুতায় বহন করিয়া চলিয়াছিল এবং ভাবিয়াছিল যে, এ বোঝা চিরকালই বহিতে হইবে, তাহাদের হৃদয়ে তিনি সাহস ও আত্মসম্মান জাগ্রত করিয়াছেন। যিনি তাঁহার আশ্চর্য ক্ষমতায় এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ না করিয়া আমরা পারি না।

"সময় সময় মতপার্থক্য ঘটে বলিয়াই যখন তাঁহার মত মানব সেবায় উৎসর্গীকৃত জীবনকে কুৎসালিপ্ত করা হয়, তখন মনে হয় যে, জনসাধারণের অকৃতজ্ঞতা নীচতার সীমায় উপনীত হইয়াছে। আমি অনেক সময় প্রকাশ্যে তাঁহার সহিত মত-পার্থক্য জ্ঞাপন করিয়াছি; এমন কি সম্প্রতি তিনি ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলাকে অস্পৃশ্যতা-পাপের জন্য ঈশ্বরের ভর্ৎসনা বলিয়া যে বিশ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন, আমি তাহারও সমালোচনা করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার ধর্মবিশ্বাসের আন্তরিকতা এবং দরিদ্র জনগণের প্রতি তাঁহার যে ঐকান্তিক প্রেম, তাহার প্রতি এতদূর শ্রদ্ধা আমার আছে যে, আমার মত হইতে পৃথক তাঁহার মতকে আমি শ্রদ্ধার সহিতই দেখিয়া থাকি।

"আমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত বাংলা দেশে অভ্যর্থনা করিতেছি এবং বাংলার জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইতেছি যে, মাতৃভূমির সেবায় মহাত্মার জীবনের যে মহার্ঘ্যতা, তাহা আমার সহিত তাঁহারাও উপলব্ধি করুন।"—ইউ. পি.

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৫শে মাঘ, ১৩৪০ ; ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪]

কবির এই বিবৃতি এবং মূল প্রতিবাদটি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অল্প সময়ের

ব্যবধানে প্রকাশিত হয়। এই সবই গান্ধীজীর নজরে আসে। বলা বাহুল্য, কবির ঐ বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই ;—তিনি তাঁহার পূর্বমত ও বিশ্বাসে অটল রহিলেন। কয়েকদিন পর কবির ঐ প্রতিবাদের জবাবে তাঁহার বক্তব্য ব্যাখ্যা করিয়া 'Superstition versus Faith' এই শিরোনামায় 'হরিজন'-এ একটি প্রবন্ধ লিখিলেন। (১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪)। উহার মর্মার্থ ছিল এইরূপ :

"শান্তিনিকেতনের কবি শুধু শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসীদেরই গুরুদেব নন, —আমারও গুরুদেব। দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে যখন দীর্ঘ স্বেচ্ছা-নির্বাসন হইতে আমরা প্রত্যাবর্তন করি তখন আমি ও আমার সহকর্মীরা ঐখানেই আশ্রয় পাইয়াছিলাম। কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই গুরুদেব এবং আমি আমাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর কতকগুলি পার্থক্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি। আমাদের নানা বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের দ্বারা আমাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রীতির কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই, বিহারের বিপৎপাতের সহিত আমি অস্পৃশ্যতার যোগাযোগ স্থাপন করায় গুরুদেব সর্বশেষে যে-সব কথা বলিয়াছেন তাহা দ্বারাও এই শ্রদ্ধা-প্রীতির কোনও লাঘব হইবে না।

"আমি ভুল করিয়াছি, এই যখন তাঁহার বিশ্বাস তখন আলবাৎ তাঁহার প্রতিবাদ করিবার সেই অধিকার আছে। তাঁহার প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা আছে বলিয়াই তাঁহার কথা আমি অন্যান্য সমালোচক অপেক্ষা অধিক আগ্রহের সহিত শুনিয়া থাকি। কিন্তু বিবৃতিটি আমি তিনবার পাঠ করিয়াছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ঐ বিবৃতিতে যাহা বলিয়াছি এখনও তাহার সমর্থন করিতেছি।

"তিন্নেভেলিতে বসিয়া আমি প্রথমে যখন বিহারের বিপৎপাতকে অস্পৃশ্যতার সহিত যুক্ত করিয়াছিলাম তখন আমি যতদূর সম্ভব ভাবিয়া চিন্তিয়াই কথা বলিয়াছিলাম এবং সে-কথা আমার পরিপূর্ণ অন্তর হইতে উৎসারিত হইয়াছিল। আমি যেমন বিশ্বাস করি তেমনই বলিয়াছিলাম। আমি বহুদিন ধরিয়া এই কথা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি যে প্রাকৃতিক ঘটনা প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক এই উভয়বিধ ফলই উৎপাদন করে। আমি ইহার উল্টাটাকেও সমভাবেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।

"আমার কাছে ভূমিকম্প ভগবানের কোনও খেয়ালমাত্র নয়, নিছক কতকগুলি অন্ধশক্তির মিলনেও ইহা সংঘটিত হয় নাই। আমরা ভগবানের সব বিধানের কথা জানি না, সেগুলির কার্যবিধির কথাও জানি না। সর্বাপেক্ষা সমুন্নত বৈজ্ঞানিক অথবা সর্বাপেক্ষা বড় অধ্যাত্মবাদীর জ্ঞানও একটি ধূলিকণার মত। আমার কাছে আমার ভগবান শুধু আমার পিতার ন্যায় একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জীব নন, তিনি তাহা অপেক্ষাও অনন্তগুণে বেশি। আমার জীবনের ক্ষুদ্রতম খুঁটিনাটিতেও তিনি আমাকে পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। আমি আক্ষরিকভাবেই একথা বিশ্বাস করি যে, তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত একটি পাতাও নড়ে না। তাঁহার করুণাময়ী ইচ্ছার উপরেই আমার প্রত্যেকটি শ্বাস নির্ভর করিতেছে।

"তিনি এবং তাঁহার বিধান এক। বিধানই (Law) ঈশ্বর। তাঁহার সম্পর্কে যেটাকে বিভূতি (attribute) বলিয়া বলা হয় তাহা বিভূতি মাত্র নহে ; তিনি নিজেই

বিভূতি। তিনিই সত্য, প্রেম, বিধান—মানুষের বুদ্ধিচাতুর্য আরও যত লক্ষ লক্ষ জিনিসের নাম করিতে পারে তিনি তাহার সবই। গুরুদেবের সহিত আমিও 'বিশ্ববিধানের অমোঘতা'য় বিশ্বাস করি—'যাহার ভিতরে ভগবান নিজেও হস্তক্ষেপ করেন না।' ইহার কারণ ঈশ্বর নিজেই বিধান। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার নিবেদন এই যে, আমরা বিধানকে বা বিধানসমূহকে পূর্ণভাবে জানি না, আমাদের নিকট যাহা একটা সর্বনাশ বলিয়া মনে হয় তাহা ঐরূপ মনে হইবার কারণ এই যে, আমরা বিশ্ববিধানসমূহকে যথোপযুক্তভাবে জানি না।

"অনাবৃষ্টি, বন্যা, ভূমিকম্প এবং অনুরূপ যাহা কিছু দেখা দেয়—যদিও ঐগুলি প্রাকৃতিক বা বস্তুগত কারণ হইতেই সম্ভূত বলিয়া মনে হয় কিন্তু আমার মনে হয় যে, ঐগুলি মানুষের নৈতিক আচরণের সহিত সম্পর্কযুক্ত। সেই কারণেই আমি স্বতঃই উপলব্ধি করি যে, অস্পৃশ্যতার পাপের জন্যই ভূমিকম্পটি সংঘটিত হইয়াছে। অবশ্য সনাতনীদেরও এই কথা বলার যুক্তিসঙ্গত অধিকার আছে যে, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রচার করার দরুন আমারই অপরাধে উহা ঘটিয়াছে। অনুশোচনা ও আত্মশুদ্ধির আহ্বানের মধ্যেই আমার আস্থা আছে।...

"প্রাকৃতিক বিধানসমূহের কার্যকারিতা সম্পর্কে আমার অতীব অজ্ঞতার কথা আমি স্বীকার করিতেছি। কিন্তু তবুও আমি যেমন ঈশ্বরে বিশ্বাস না-করিয়া পারিব না—যদিও সন্দেহবাদীদের (sceptics) কাছে তাঁহার অস্তিত্ব আমি প্রমাণ করিতে পারিব না, অনুরূপভাবে বিহারের ঘটনার সহিত অস্পৃশ্যতাজনিত অপরাধের সম্পর্কটি কি উহাও আমি প্রমাণ করিতে পারিব না—যদিও সে-সম্পর্কটি আমার স্বাভাবিক বা সহজাত অনুভূতি দ্বারা অনায়াসে অনুভব করিতে পারি।...

..."গুরুদেবের সহিত আমি এ কথায় একমত নহি যে, 'আমাদের পাপ এবং ভুলভ্রান্তি যত বিপুলই হোক—তাহারা এত শক্তিশালী কখনই নয় যাহাতে সৃষ্টির কাঠামোটিকে নিম্নে টানিয়া লইয়া একেবারে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে।' অপর পক্ষে আমার বিশ্বাস, অন্য কোনও প্রাকৃতিক ঘটনা অপেক্ষা আমাদের পাপসমূহ এই কাঠামোটিকে ধ্বংস করিয়া দিতে অধিক শক্তিশালী। জড়বস্তু ও আত্মার মধ্যে একটা অচ্ছেদ্যবিবাহবন্ধন রহিয়াছে। আমরা এতদুভয়ের ফলগুলি সম্বন্ধে অজ্ঞ, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই অজ্ঞতাই অনেককে বাহ্য বিপৎপাতকে নিজেদের নৈতিক উন্নয়নের কাজে লাগাইতে সক্ষম করিয়া তুলিয়াছে।"

[দ্র. *Amrita Bazar Patrika* : 16 February, 1934]

এখানে গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের মানস-প্রকৃতি ও চিন্তার পার্থক্যটি লক্ষ্য করিবার মত। মানুষের যুক্তি-বিচার ও আধুনিক বিজ্ঞানের শক্তির সীমাবদ্ধতার অভিযোগে গান্ধীজী বস্তুত উহাদের ক্ষমতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে তীব্র সংশয় ও সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। গান্ধীজীর কাছে তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস ও সুগভীর ঈশ্বরপ্রেম বা ভগবৎবিশ্বাসই আসল কথা। এই ধরনের বিশ্বাসের উপর আর কথা নাই,—অন্তত যুক্তিতর্ক ও প্রশ্ন করিয়া সেখানে লাভ হয় না,—এবং সত্যসত্যই গান্ধীজীর ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। তিনি তাঁহার অন্তর ও মনের চারিপাশে এই বিশ্বাসের এমনই একটি লৌহপ্রাচীর সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন যে তাহার কাছে

যত বড় বৈজ্ঞানিকই যত যুক্তি দিয়াই আঘাত করুন না কেন, বয়লারের গায়ে কড়াইশুঁটি দ্বারা আঘাত করার মতই তাহা ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইয়াছে। যাহাই হোক, বিহার ভূমিকম্পের প্রসঙ্গে গান্ধীজীর উক্তির চূড়ান্ত অবৈজ্ঞানিকতা লইয়া আজিকার দিনে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন হয় না।

পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে প্রধানত ছিলেন যুক্তিবাদী এবং আধুনিক বিজ্ঞানের শক্তি ও সম্ভাবনার 'পরে তাঁহার আস্থা ক্রমেই দৃঢ়তর হয়। তাই ভূমিকম্প প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রধান বক্তব্যই ছিল এই যে, মানুষের পাপপুণ্য বা নৈতিক আচরণের প্রাকৃতিক ঘটনার উপর কোন ক্রিয়া বা প্রভাব নাই;—প্রকৃতি-জগৎ বা বস্তুজগৎ আপন অপরিবর্তনীয় বিধান অনুসারেই চলিতেছে।

প্রশ্ন থাকিয়া যায়, ভূমিকম্প প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে যুক্তিনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পক্ষে এত কথা বলিলেন, ব্যক্তিগত জীবনে তিনিই কি একেবারে শেষপর্যন্ত এই নীতিতে অবিচল নিষ্ঠ থাকিতে বা পুরোপুরি গ্রহণ করিতে (totally and consistently) পারিয়াছিলেন? গন্ধীজীর মত ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নে তিনি যে অভিযোগ করিয়াছেন, সেই অভিযোগ কি তাঁহার সম্পর্কেও আসে না? অস্পৃশ্যতার পাপ ও অপরাধে ভগবানের রুদ্ররোষ ভূমিকম্পরূপে গিয়া পড়িয়াছিল বিহার অঞ্চলে,—এই কথা বলায় যে অবৈজ্ঞানিকতার অভিযোগ আসে, তাঁহার 'গীতাঞ্জলি'র 'অপমানিত' এবং অন্যান্য বহু কবিতা, ভাষণ ও রচনার জন্যও সেই অভিযোগ আসিতে পারে।

"বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্ন পান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান ॥"

এখানেও তো তিনি অস্পৃশ্যতাজনিত পাপের শাস্তিস্বরূপ উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বিধাতার রুদ্ররোষের ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন।

"ভূকম্পের পর ভূকম্পের সৃষ্টি ক'রে যাবে সভ্যতাসৌধের এই সমূল উৎপাটন; মানুষকে প্রস্তুত থাকতে হবে আরও দুঃখভোগের জন্যে।"—এই বলিয়া কঠোর ভর্ৎসনা করিয়াছেন তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকারী ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতাকে।

'Organizations' প্রবন্ধে তাহাদেরই উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছিলেন:

..."then we cannot help hoping *that God's vengeance will strike these idolators to the dust* and with them the blood-stained altar of their ugly image, the fetish of organization for production or profit that is superfluous, and the hungry spirit of possession that is unmeaning." [*Modern Review* : January, 1930 pp. 1-2]

এই রকম বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে—

'নৈবেদ্য', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি'র কবির কথা স্মরণ রাখা দরকার। সেদিন মরমীয়া কবিদের মত তিনি শুধু ঈশ্বরের সহিত প্রেমাভিসারেরই

কল্পনা করিয়াই গান রচনা করেন নাই। ঈশ্বর তাঁহার কাছে শুধু দয়িতই নহেন—প্রিয়তমই নহেন ; জগতের যত কিছু অন্যায় অবিচার ও উৎপীড়নের দ্রষ্টা এবং বিচারকও তিনি। তাই প্রবলের অন্যায় ও উৎপীড়ন যখনই যেখানে অসহ্য মাত্রায় পোঁছিয়াছে যখন তাহার প্রতিকারের কোন রাস্তা তিনি দেখিতে পান নাই, তখনই অশ্রুসিক্ত নয়নে তিনি আকাশের পানে মাথা তুলিয়া তাহার প্রতিকার ও উপযুক্ত বিচার মাগিয়াছেন। কখনও কখনও বা 'বিচারের ন্যায় দণ্ড' আপন হাতে তুলিয়া লইয়া অত্যাচারী ও উৎপীড়কদের বজ্রগর্জনে ভৎর্সনা ও বিনিপাত করিয়াছেন। কিন্তু এই পর্যন্ত আসিয়াই তিনি থমকিয়া দাঁড়াইয়াছেন,—উহার অধিক তিনি তখন খুববেশী দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

কিন্তু শেষ জীবনে কবি ক্রমশই বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। অবশ্য আধুনিক বস্তুবাদী দর্শনকে বাদ দিয়াই বিজ্ঞানকে গ্রহণ করার দিকে তাঁহার ঝোঁক ছিল বেশী। কিন্তু মানুষের সৃষ্ট অন্যায় ও অত্যাচারী সমাজব্যবস্থা কিংবা রাষ্ট্রব্যবস্থার মানুষই প্রতিকার ও সংশোধন করিবে,—এই প্রত্যয় তাঁহার থাকিলেও বাস্তব কার্যক্ষেত্রে সেই অন্যায় ও অত্যাচারী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করিবার জন্য সাধারণ মানুষকে তিনি বলিষ্ঠ সংগ্রামের আহ্বান জানাইতে (অবশ্য তাঁহার কিছু কবিতা ও নাটক বাদ দিলে) পারেন নাই। জনসাধারণের সচেতন ভূমিকা ও সৃজনশীলতার প্রতি কবির গভীর আস্থা ছিল, একথাও সত্য—এমন কি 'আসন্ন বিদ্রোহ ও সমাজ-বিপ্লবের'ও সতর্কবাণী করিয়াছেন কিন্তু তবুও গান্ধীজীর মত কিংবা রোলাঁ-বারবুসের মত গণ-আন্দোলন ও গণ-সংগ্রামের বলিষ্ঠ উদাত্ত আহ্বান জানাইতে পারেন নাই। এই কারণেই চরম বিপদের দিনে 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের' কাছে কখনো কখনো তাঁহাকেও শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে, অন্যায়-অবিচারের প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া। কিন্তু দুর্ভিক্ষ, ভূকিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতির দ্বারা ঈশ্বর মানুষকে তার 'পাপের' জন্য শাস্তি দিয়া থাকেন—একথা তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করিতেন না, যদিও অত্যাচারী ও উৎপীড়কদের মনে ভীতি উৎপাদনের জন্য কখনো কখনো তিনি ঐগুলিকে পরোক্ষে ঈশ্বরের শাস্তিবিধান বলিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু তবুও অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য তাঁহার ঈশ্বরনির্ভরতা এক এক সময় অত্যন্ত বেদনাদায়ক নিষ্ফল ক্রন্দনের মত শুনাইয়াছে যাহাতে সত্য সত্যই মানুষের যুক্তিবুদ্ধি আঘাত পায়।

আসলে কযেকটি পরস্পরবিরোধী মানসিক প্রবণতার অন্তর্দ্বন্দ্ব চিরকাল তাঁহার মধ্যে চলিয়াছিল। একদিকে তাঁহার যুক্তি ও বিজ্ঞান-নিষ্ঠা এবং বাস্তবতাবোধ, অপরদিকে তাঁহার অধ্যাত্মবাদ ও মরমীয়া লীলাবাদ ;—একদিকে বিদ্রোহ ও সংগ্রাম-প্রবণতা অপরদিকে সংগ্রাম-বিমুখতা ও শান্তরস-নিমগ্নতা ;—একদিকে বাস্তব গঠনমূলক কর্মপ্রবণতা অপরদিকে রোমাণ্টিক ভাবালুতা। গান্ধীজীর মধ্যেও দুটি স্বতন্ত্র ধরনের পরস্পরবিরোধী সত্তার অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তিবুদ্ধির 'পরে তাঁহার বড় একটা আস্থা ছিল না, সত্য কথা ; তবে গান্ধীজীর ভগবৎপ্রেম ও ঈশ্বর-নির্ভরতা প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় সংগ্রামের অন্তরায় হয় নাই। গান্ধীজী অসীম ভগবৎপ্রেমিক আবার কর্মযোগীও বটেন, শুধু কর্মযোগী বলিলেও

সম্পূর্ণ হয় না, অপরাজেয় সংগ্রামের যোদ্ধাও। কখনও কি বিষয়ে সংগ্রাম অথবা সন্ধি করিতে হইবে এ-ব্যাপারে তিনি তাঁহার অন্তরের রহস্যময় পুরুষটির নির্দেশ মানিয়া চলিতেন সত্য কথা ; তবে তা সংগ্রামের চূড়ান্ত ও ব্যাপক স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই করিতেন—অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইটিই দেখা গিয়াছে। আর যেহেতু তিনি প্রায় সর্বদাই 'গণ-আন্দোলনের' পরিপ্রেক্ষিতেই চিন্তা করিতেন, সেই কারণেই তিনি জনসাধারণের সহজ অনুভূতিপ্রবণতা ও তাহাদের মত খুব সহজ ও সরল ভাষায় কথা বলিতেন।

কিন্তু বিহার ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে দেশবাসীর অস্পৃশ্যতা কুসংস্কারকে আঘাত করিবার উদ্দেশ্যেই যে গান্ধীজী ঐ কথা বলিয়াছিলেন তাহা নয় ;—তিনি সত্যসত্যই বিশ্বাস করিতেন, যে মানুষের 'পাপাচার' নৈতিক আচরণই ঐ ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের মুক্তিসাধনায় দেশবাসীর বিজ্ঞান-চেতনা ও চিত্তের সর্বপ্রকার মুক্তির স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। তাই এ-ক্ষেত্রে কবির আপত্তির প্রধান কারণ এই যে, আধুনিক যুগে এই ধরনের অবৈজ্ঞানিক ও কুসংস্কারপূর্ণ কথা যদি স্বয়ং গান্ধীজীর মুখ হইতে নিঃসৃত হয়, তবে তাহার পরিণাম অত্যন্ত মারাত্মক হইবে। কিন্তু শুধু রবীন্দ্রনাথই নহেন—জওহরলাল প্রমুখ কংগ্রেসের নবীন ও প্রগতিশীল গোষ্ঠীও গান্ধীজীর ঐ ধরনের উক্তির সুদূরপ্রসারী কুফলের কথা চিন্তা করিয়া বিব্রত ও অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্বয়ং জওহরলাল লিখিতেছেন :

"পীড়িত অঞ্চলে ভ্রমণকালীন অথবা যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে আমি সংবাদপত্রে গান্ধীজীর বিবৃতি পাঠ করিয়া মর্মাহত হইলাম ; তিনি বলিয়াছেন অস্পৃশ্যতার পাপের শাস্তি এই ভূমিকম্প। এরূপ মন্তব্য শুনিলে বিহ্বল হইতে হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার যে উত্তর দিলেন তাহা আমার মনঃপূত হইল এবং আমি আনন্দিত হইলাম। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ইহাপেক্ষা অধিক বিরোধী কথা, কল্পনা করাও কঠিন। জড়প্রকৃতির উপর ভৌতিক ঘটনাগুলি মনোরাজ্যে যে ভাবাবেগ উদ্বোধিত করে, তাহার সম্বন্ধে বিজ্ঞানও সম্ভবত বর্তমানে এতখানি যুক্তিহীন মতবাদ সমর্থন করিবে না। মানসিক আঘাতে কোন ব্যক্তির অজীর্ণ রোগ বা আরও কিছু কঠিন ব্যাধি হইতে পারে। কিন্তু মানুষের কোন আচার ব্যবহার বা ত্রুটির ফলে ভূপৃষ্ঠের স্তরগুলি সঞ্চালিত হয় এমন কথা শুনিলে বিমূঢ় হইতে হয়। পাপবোধ, ঐশ্বরিক ক্রোধ এবং সৌরজগতের ব্যাপারে মানুষের আপেক্ষিক সম্পর্ক প্রভৃতি আমাদিগকে কয়েক শতাব্দী পিছাইয়া লইয়া যায় ;—যখন ইউরোপে ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদীদের বিচার করিবার জন্য খৃস্টান যাজকদের বিচারালয়ের প্রাবল্য ছিল, যখন ধর্মবিরোধী বৈজ্ঞানিক কথা বলার দরুন জিওরদানো ব্রুনোকে পোড়াইয়া মারা হইয়াছিল এবং আরও অনেককে 'ডাইনী' প্রভৃতি বলিয়া পোড়াইয়া মারা হইত।...

"এই ভূমিকম্প যদি আমাদের পাপের ঐশ্বরিক শাস্তি হয়, তাহা হইলে কি বিশেষ পাপের ফলে আমরা এই শাস্তি পাইলাম, কেমন করিয়া নির্ণয় করিব ? হায় ! আমাদের বহুতর প্রায়শ্চিত্ত বাকী রহিয়াছে ? প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার পছন্দমত ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারে।...দক্ষিণ-ভারতের লোকের অস্পৃশ্যতাবোধের শাস্তি

আসিয়া পড়িল অল্প বিস্তর নির্দোষ বিহারের লোকের উপর, একথা বলা অপেক্ষা পূর্বের কথাগুলি লক্ষ্যের অধিকতর নিকটবর্তী। যে দেশে ছুঁৎমার্গের প্রাবল্য সর্বাধিক, সেখানে ভূমিকম্প হইল না কেন? অথবা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টও বলিতে পারেন, এই দৈবদুর্বিপাক, আইন অমান্য আন্দোলন করার জন্য ঐশ্বরিক শাস্তি।"... [আত্মচরিত : পৃঃ. ৫২৩-২৪]

যাহাই হোক, এই প্রসঙ্গে দেশে কিছুদিন তিক্ত তর্কবিতর্ক চলিলেও গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাব এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কবি যে গান্ধীজীকে কতখানি শ্রদ্ধা করিতেন তাহা এই প্রসঙ্গে তাঁহার শেষ বিবৃতিটি (৬ই ফেব্রুয়ারি) থেকেই প্রমাণিত হয়। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, অসহযোগ আন্দোলন ও চরকা-বিতর্কের সময় তিনি গান্ধীজীর মতাদর্শ খণ্ডন করিতে গিয়া যে তীব্র কঠোর ভাষা ও উপমা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, আইন-অমান্য আন্দোলনের পরবর্তীকালে গান্ধীজীর সমালোচনায় তাহার প্রায় কিছুই করেন নাই—যদিও বহুবিষয়ে তাঁহাদের চিন্তার ও দৃষ্টিভঙ্গীর দুস্তর ব্যবধান ও পার্থক্য ছিল।

আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার

৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) যথারীতি শ্রীনিকেতনে বার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন হয়। এবার নলিনীরঞ্জন সরকার এই অনুষ্ঠানে বিশেষ-অতিথিরূপে আমন্ত্রিত হইয়া আসেন। কবি এবার পৌষ-উৎসবে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই কিন্তু শ্রীনিকেতনের উৎসবে তিনি স্বয়ং বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উৎসবের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পরে উৎসব-প্রাঙ্গণে কবি 'উপেক্ষিতা পল্লী' নামে তাঁহার লিখিত ভাষণটি পাঠ করেন।

হোয়াইট পেপার ও জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির আলোচনার দিকেই দেশের অধিকাংশ রাজনীতিকদের লক্ষ্য। কবির নিকট ইহা অসহ্য। তাই তাঁহার পূর্বাপর ভাষণের ন্যায় এই ভাষণেও তিনি দেশের নেতা ও রাজনীতিবিদদের যান্ত্রিক রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তুলনা দিতে গিয়া তিনি বলেন যে, ইউরোপের বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি লুণ্ঠন ও শোষণের লোভ পরিত্যাগ না করিয়াই শুধু 'লীগ অব নেশনস্'-এর যান্ত্রিক সংগঠনের মাধ্যমে যেমন শান্তি স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছে, অনুরূপভাবে আমাদের দেশের রাজনীতিকেরা দেশের সামাজিক, আর্থনীতিক ও নৈতিক দুর্গতির সমস্যাগুলি এড়াইয়া গিয়া শুধু 'পার্লামেণ্টিক শাসনতন্ত্র নাম-ধারী একটা যন্ত্রের সহায়তায়' দেশের সমস্যার সমাধানের স্বপ্ন দেখিতেছেন। কবি তাঁহাদের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিলেন,—"এ কথা মনে রাখতেই হবে, মানবিক সমস্যা যান্ত্রিক প্রণালীর দ্বারা সমাধান করা অসম্ভব।"

তারপর শহর ও নগর-কেন্দ্রিক এই পুঁজিবাদী সভ্যতার অসঙ্গতি ও অন্তর্বিরোধের বৈশিষ্ট্যটি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কবি বলিলেন :

"বর্তমান সভ্যতায় দেখি, এক জায়গায় এক দল মানুষ অন্ন-উৎপাদনের চেষ্টায় নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে, আর-এক জায়গায় আর এক দল মানুষ স্বতন্ত্র থেকে সেই অন্নে প্রাণ ধারণ করে। চাঁদের যেমন এক পিঠে অন্ধকার, অন্য পিঠে আলো, এ সেই রকম। এক দিকে দৈন্য মানুষকে পঙ্গু করে রেখেছে—অন্য দিকে ধনের সন্ধান, ধনের অভিমান, ভোগবিলাস-সাধনের প্রয়াসে মানুষ উন্মত্ত। অন্নের উৎপাদন হয় পল্লীতে, আর অর্থের সংগ্রহ চলে নগরে।...পল্লীতে সেই ভোগের উচ্ছিষ্ট যা-কিছু পৌঁছয় তা যৎকিঞ্চিৎ। গ্রামে অন্ন উৎপাদন করে বহু লোকে, শহরে অর্থ উৎপাদন ও ভোগ করে অল্পসংখ্যক মানুষ ; অবস্থার এই কৃত্রিমতায় অন্ন এবং ধনের পথে মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ ঘটেছে। এই বিচ্ছেদের মধ্যে যে সভ্যতা বাসা বাঁধে তার বাসা বেশিদিন টিঁকতেই পারে না।..

[উপেক্ষিতা পল্লী-পল্লীপ্রকৃতি : পৃঃ. ৮২-৮৩]

ভারতবর্ষে এই পুঁজিবাদী সভ্যতার অনুপ্রবেশের ফলে শহর ও গ্রামবাসীদের আর্থিক সংগতি ও অবস্থার মধ্যে কী ভয়াবহ পার্থক্য ও ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে, কবি তাঁহার ভাষণে তাহার বিশদ বর্ণনা করেন। এই সময় সারা পুঁজিবাদী জগতে যে-ভয়াবহ আর্থনীতিক মন্দা ও সংকট চলিতেছিল, কবি তাহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিলেন :

..."আজ পৃথিবীর আর্থিক সমস্যা এমনি দুরূহ হয়ে উঠেছে যে, বড়ো বড়ো পন্ডিতেরা তার যথার্থ কারণ এবং প্রতিকার খুঁজে পাচ্ছে না। টাকা জমছে অথচ তার মূল্য যাচ্ছে কমে, উপকরণ-উৎপাদনের ত্রুটি নেই অথচ তা ভোগে আসছে না। **ধনের উৎপত্তি ও ধনের ব্যাপ্তির মধ্যে যে ফাটল লুকিয়ে ছিল আজ সেটা উঠেছে মস্ত হয়ে।...পৃথিবীতে ধন-উৎপাদক এবং অর্থসঞ্চয়িতার মধ্যে সেই সাংঘাতিক বিচ্ছেদ বৃহৎ হয়ে উঠেছে।** তার একটা সহজ দৃষ্টান্ত ঘরের কাছেই দেখতে পাই। বাংলার চাষী পাট উৎপাদন করতে রক্ত জল করে মরছে, অথচ সেই পাটের অর্থ বাংলাদেশের নিদারুণ অভাব-মোচনের জন্যে লাগছে না। এই-যে গায়ের জোরে দেনাপাওনার স্বাভাবিক পথ রোধ করা, এই জোর একদিন আপনাকেই আপনি মারবে।"...

তিনি বলেন, এই ভয়াবহ অবস্থা বেশি দিন চলিতে পারে না। যে-সমাজ পরস্পরের প্রতি সামাজিক কর্তব্যসাধনে এতটুকু দায়িত্ব স্বীকার করে না,—যে-সভ্যতা মানবসমাজের সর্বত্রই এই প্রাণ-শোষণকারী বিদীর্ণতা ও ভয়াবহ অসাম্য আনিয়াছে, তাহার ধ্বংসের দিন আগতপ্রায়। এই আসন্ন সমাজবিপ্লবের সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া তিনি বলিলেন :

..."দেওয়া-নেওয়ার সর্বব্যাপী সম্বন্ধ আজ শিথিল। এই সম্বন্ধত্রুটির মধ্যেই আছে **অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের সূচনা**। এক ধারেই সব-কিছু আছে, আর-এক ধারে কোনোকিছুই নেই, এই ভারসামঞ্জস্যের ব্যাঘাতেই সভ্যতার নৌকা কাত হয়ে পড়ে। একান্ত অসাম্যেই আনে প্রলয়। ভূগর্ভ থেকে সেই প্রলয়ের গর্জন সর্বত্র শোনা যাচ্ছে।" (বড় হরফ আমার)

উপসংহারে তিনি দেশের মুষ্টিমেয় সংস্কৃতিবান বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশে সতর্ক-বাণী করিয়া বলেন :

"এই আসন্ন বিপ্লবের আশঙ্কার মধ্যে আজ বিশেষ করে মনে রাখবার দিন এসেছে যে, যারা বিশিষ্ট সাধারণ বলে গর্ব করে তারা সর্বসাধারণকে যে পরিমাণেই বঞ্চিত করে তার চেয়ে অধিক পরিমাণেই নিজেকে বঞ্চিত করে—কেননা, শুধু কেবল ঋণই যে পুঞ্জীভূত হচ্ছে তা নয়, শাস্তিও উঠছে জ'মে।...দেশের জনসাধারণের মন যেখানে অজ্ঞানে অন্ধকার সেখানে কণা কণা জোনাকির আলো গর্তে প'ড়ে মরবার বিপদ থেকে আমাদের বাঁচাতে পারবে না। আজ পল্লী আমাদের আধমরা ; যদি এমন কল্পনা করে আশ্বাস পাই যে, অন্তত আমরা আছি পুরো বেঁচে তবে ভুল হবে, কেননা মুমূর্ষুর সঙ্গে সজীবের সহযোগ মৃত্যুর দিকেই টানে।" [ঐ : পৃঃ. ৮৩-৮৪]

শ্রীনিকেতন উৎসবের শেষে কবিকে কলিকাতায় আসিতে হয় (৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার বক্তৃতার কথা ছিল এবং এই উপলক্ষেই সেখানে তিনি 'সাহিত্যতত্ত্ব' প্রবন্ধটি পাঠ করেন (দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী-২৩'শ খণ্ড : পৃঃ. ৪৩৪-৫৩)। তা'ছাড়াও নানা সামাজিক অনুষ্ঠানেও তাঁহাকে যোগ দিতে হয়।

এই সময়ই কলিকাতায় 'হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স কোম্পানি'র রজত-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য, বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের যুগেই প্রতিষ্ঠানটি জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার প্রধান-উদ্যোক্তা ও পরিচালক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই সূচনাকাল থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটিকে নানাভাবে উৎসাহ ও প্রেরণা দান করিতেছিলেন এবং সেই কারণেই এই প্রতিষ্ঠানটির সম্পর্কে তাঁহার একটি বিশেষ-আগ্রহ ও আকর্ষণ ছিল। ১৩ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা টাউন হল-এ উহার 'রজত-জয়ন্তী উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়,—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উহার সভাপতিত্ব করেন। সভায় লর্ড সিংহ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নেলী সেনগুপ্তা, নলিনীরঞ্জন সরকার প্রমুখের বক্তৃতার পর কবি তাঁহার সভাপতির ভাষণটি পাঠ করেন।

কিভাবে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তাঁহাদের জোড়াসাঁকো বাড়ির একটি কক্ষে এই প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয় এবং কালে কি ভাবে প্রতিষ্ঠানটি উন্নতিলাভ করিয়া বর্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিস্তৃত ও প্রতিষ্ঠালাভ করে, কবি প্রথমেই তাঁহার ভাষণে সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে একটি মামুলী ব্যবসায়ী কিংবা পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানের মত দেখিতেছিলেন না, পরন্তু সমবায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইহার সাফল্যের দ্বারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের সম্ভাবনা কল্পনা করিতেছিলেন। এবং উহারই উপর গুরুত্ব দিয়া কবি তাঁহার ভাষণে বলিলেন :

"The most precious wealth that man has attained is the consciousness of his fundamental unity, which is more and more impelling the human world to work together for the service of every individual born in it. This consciousness which is gradually gaining ground in

our economic life, because it represents the highest truth of man, is the only means that can lead to the true wealth of the people, the wealth born of the fruitful meeting of individual wills. The huge megatherium of capitalism with its stupendous tail of bought-up workers will naturally become extinct when individual men come to realise that this real well-being can be achieved, not through an exaggeration of their own exclusive wealth but by the associated endeavour of their individualities based upon mutual trust and help. It was a realisation of this fundamental truth, as it seemed to me, that impelled the promoters of the Hindusthan Co-operative Insurance Society to make this daring experiment for which the country was then hardly prepared to venture out into the open road in the face of all risks."··· [*The Hindu* : 14th February, 1934]

ফেব্রুয়ারীর শেষভাগে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে ও ভারতের প্রায় সর্বত্রই হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তীব্র হইয়া উঠিতে থাকে। আন্দোলন যখন স্তিমিতপ্রায়,—বিশেষ করিয়া ভারত শাসন-সংস্কার আইনের ব্যাপারে 'জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটি'র রিপোর্ট যখন প্রকাশ হইবার মুখে, সেই মুহূর্তে প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা ও শক্তিগুলিই যে দেশে প্রাধান্য লাভ করিবে, উহা খুবই স্বাভাবিক। বিশেষত, বাংলাদেশের এক শ্রেণীর হিন্দু-মুসলিম বুদ্ধিজীবীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক-চেতনা এই সময় থেকেই অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করিতে থাকে। কিছুকাল পূর্বে বাংলা সাহিত্য ও ভাষার মধ্যেও এই বিরোধ প্রকাশ পায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অত্যন্ত হিন্দু-সংস্কৃতির প্রভাব,—এই অজুহাতে একশ্রেণীর মুসলিম বুদ্ধিজীবী বাংলা ভাষার মধ্যে নির্বিচারে আরবী-পার্সী ও উর্দু শব্দ প্রয়োগ করিবার আন্দোলন তুলিবার চেষ্টা করেন। স্বভাবতই হিন্দু-সংস্কৃতিবান বুদ্ধিজীবীরা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথ এই বাদ-প্রতিবাদে ঠিক অংশ গ্রহণ না-করিলেও তিনি বাংলা সাহিত্য ও ভাষার মধ্যে এই বিশেষ-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ও কৃত্রিম শব্দ সৃষ্টির বিরোধী ছিলেন। কবির প্রধান বক্তব্য এই যে, ভাষার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা আনিলে তাহার পরিণাম অত্যন্ত মারাত্মক হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি এম. এ. আজানকে একটি পত্রে লিখিলেন (১১ই চৈত্র, ১৩৪০):

"সর্বপ্রথমে ব'লে রাখি আমার স্বভাবে এবং ব্যবহারে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব নেই। দুই পক্ষেরই অত্যাচারে আমি সমান লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হই এবং সে-রকম উপদ্রবকে সমস্ত দেশেরই অগৌরব মনে ক'রে থাকি।···বাংলা ভাষায় সহজেই হাজার হাজার পারসী আরবী শব্দ চলে গেছে, তার মধ্যে আড়াআড়ি বা কৃত্রিম জেদের কোনো লক্ষণ নেই। কিন্তু যেসব পারসী আরবী শব্দ সাধারণ্যে অপ্রচলিত, অথবা হয়তো কোনো এক শ্রেণীর মধ্যেই বদ্ধ, তাকে বাংলাভাষার মধ্যে প্রক্ষেপ করাকে জবরদস্তি বলতেই হবে।"

পরিশেষে কবি বলেন, "আমাদের ঝগড়া আজ যদি ভাষার মধ্যে প্রবেশ ক'রে

সাহিত্যে উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ হয়ে ওঠে তবে এর অভিসম্পাত আমাদের সভ্যতার মূলে আঘাত করবে।" [দ্র. প্রবাসী : পৌষ, ১৩৪২ পৃঃ. ৩১৩-১৪]

প্রায় মাসখানেক পরে অপর একখানি পত্রে আলতাফ চৌধুরীকে এই সম্পর্কে লিখিলেন (১৭ই বৈশাখ, ১৩৪১) :

"আজকাল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে আশ্রয় ক'রে ভাষা ও সাহিত্যকে বিকৃত করবার যে চেষ্টা চলছে তার মতো বর্বরতা আর হতে পারে না। এ যেন ভাইয়ের উপর রাগ করে পারিবারিক বাস্তুঘরে আগুন লাগানো। এমনতর নির্মম অন্ধতা বাংলা প্রদেশেই এত বড়ো স্পর্ধার সঙ্গে আজ দেখা দিয়েছে ব'লে আমি লজ্জা বোধ করি।" [দ্র. রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড : পৃঃ. ৪৯৪]

প্রায় এক বৎসর পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণদান কালে (ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩) তিনি এই লজ্জাজনক আন্দোলনটিকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছিলেন :

..."আজ হিন্দু-মুসলমানে যে-একটা লজ্জাজনক আড়াআড়ি দেশকে আত্মঘাতে প্রবৃত্ত করছে তার মূলেও আছে সর্বদেশব্যাপী অবুদ্ধি। ...শেষকালে নিজের সর্বনাশ করবার জেদ এতদূর পর্যন্ত আজ এগোল যে, বাঙালি হয়ে বাংলাভাষার মধ্যেও ফাটল ধরাবার চেষ্টা আজ সম্ভবপর হয়েছে ; শিক্ষার ও সাহিত্যের যে উদার ক্ষেত্রে সকল মতভেদ সত্ত্বেও একরাষ্ট্রীয় মানুষের মেলবার জায়গা সেখানেও স্বহস্তে কাঁটাগাছ রোপণ করবার উৎসাহ ব্যথা পেল না, লজ্জা পেল না। দুঃখ পাই তাতে ধিক্কার নেই।"... [শিক্ষার বিকিরণ - শিক্ষা : পৃঃ. ২৮১]

এপ্রিলের প্রথমভাগেই কবিকে পুনরায় কলিকাতা আসিতে হয় (৫ই এপ্রিল ?)। এই সময় আন্তর্জাতিক শান্তি প্রচেষ্টায় আমেরিকার বিখ্যাত ধনকুবের, এণ্ড্রু কার্নেগীর অর্থসাহায্যে (Carnegie endowment for the International Peace) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথকে উহার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই উপলক্ষ্যে ৭ই এপ্রিল (১৯৩৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হল-এ একটি জনসভা ও উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী সভায় জার্মান কন্সাল হার সেলজান্স, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডি. আর. ভাণ্ডারকার, অর্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলী ও কার্নেগী ইন্স্টিটিউটের পক্ষে অধ্যাপক-ফেব্রী প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ভাইস-চ্যানসালার স্যর হাসান সুহরাবর্দি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কবিকে অভ্যর্থনা জানান। এইদিন কবি তাঁহার ভাষণে 'সর্বজাতীয় মানবিকতার মূল্য' বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেন। তিনি প্রধানত ছাত্রদের উদ্দেশ করিয়া বলেন :

"তোমার নিজের জাতি যেখানে দরিদ্র, সর্বজাতীয় মানবিকতা তোমার নয়—এমন সব কথা শুনেছি। এ সম্বন্ধে তর্ক করার প্রয়োজন নাই। কারণ মানুষের মন এতে অনুকূল হয়েছে।"

তিনি বলিলেন :

"যে চিত্ত অন্য দেশের মানুষের চিত্তের সঙ্গে পরিচিত নয়, সে-চিত্তের দ্বার রুদ্ধ, সে-চিত্ত সীমাবদ্ধ। সে ভূমা চিত্তের সঙ্গে আমাদের যোগ হয়েছে। এই যে দেশচিত্তের

প্রসার এটা লজ্জার কথা নয়—অনুকৃতির কথা হতে পারে। কিন্তু যা কিছু সুন্দর তা অস্বীকার করা যায় না। এই সার্বজনীন আতিথ্য তাদের হয় যাদের চিত্তের মধ্যে মৈত্রীর ভাব আছে। একথা গৌরবের বিষয় যে, বাংলায় য়ুরোপের বাণী প্রথম এসে পৌঁছেছিল এবং বাংলা তাকে একান্ত মনে গ্রহণ করেছিল। এই গ্রহণের ফল তার সাহিত্যে পরিস্ফুট হয়েছে। সর্বজাতীয় মানবিকতা সেখানে নেই যেখানে জাতিগত বৈষয়িকতা রয়েছে। যেখানে জাতিগত বৈষয়িকতা সেখানে মানুষ নিষ্ঠুর—সেখানে তার দ্বার রুদ্ধ।"

এই প্রসঙ্গে তিনি যুদ্ধোত্তর ইউরোপের ফ্যাসিস্ট অভ্যুত্থান—বিশেষত জার্মানীতে নাৎসীবাদের অভ্যুদয়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন :

"আজকের দিনে মনে হয়, গত য়ুরোপীয় যুদ্ধের পর জাতিসমূহের চিত্তরোধের কি চেষ্টা হয়েছে। আজকের জার্মানী নিজ চিত্ত অবরুদ্ধ করবার জন্য কি ব্যবস্থাই না করেছে! জার্মানীতে এমনতর দৃশ্য কখনও দেখতে পাব ভাবি নাই। আজকের দিনের মানুষ ভাবীকালের কাছে কত কৃষ্ণ—কত কালিমময়, কত কলঙ্কিত হয়ে চিত্রিত হবে তা কি বুঝি না? আজকের দিনে আপনার অধিকার পেতে হবে নিজের সম্পদ প্রসার দ্বারা—বাণিজ্য দ্বারা—ভিক্ষা দ্বারা নয়।...সে-বাণিজ্য হবে শিক্ষার, জ্ঞানের ও সৌন্দর্যের।"

'সংস্কৃতি কি?'—এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলিলেন, 'সর্বকালের সম্পদ ফুটিয়ে তোলাই সংস্কৃতি।' সহজ উপমা দিয়া বুঝাইতে গিয়া তিনি বলিলেন :

"স্ত্রী পুরুষের অর্ধাঙ্গ। স্ত্রীর সঙ্গে পরিণয়েই মানুষের পূর্ণত্ব। মানুষ যখন আপনার ভৌগোলিক সংকীর্ণ সীমার মধ্যে তখন তার পূর্ণত্ব হয় না। পরিণয়েই মানুষের পূর্ণত্ব। সর্বমানবের সঙ্গে যখন তার পরিণয় তখনি তার পূর্ণত্ব। তার নিজের সত্তা আছে অস্বীকার করি না কিন্তু সমস্ত মানবের সঙ্গে তার শুভ পরিণয় চাই। সুতরাং আজকের দিনে সমস্ত দুঃখ ভুলে এই বৃহৎ মানবের সঙ্গে পরিচয় করতে হবে।

"আপনাকে প্রকাশ করবার একমাত্র উপায় গর্বান্ধ না-হওয়া—অহঙ্কার পরিহার করা। সেই রকম **আমাদের জাতিগত অহংকার পরিত্যাগ করতে হবে—অহংকারের উপরে উঠতে হবে।** আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বজাতীয় মানবিকতার আহ্বান এসেছে। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান বাড়ল—বিশ্ব-বিদ্যালয় আত্মপরিচয়ের একটা সুযোগ পেল।"... (বড় হরফ আমার)

সভায় কার্নেগী ইনস্টিটিউট থেকে প্রেরিত কয়েকখানি পুস্তক উপস্থিত করা হইয়াছিল। কবি এই সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন যে :

"সর্বজাতীয় মানবিকতা বাহ্য অনুষ্ঠানের অপেক্ষা রাখে না—ইহা সাধনার বিষয়; বড়কে, ভূমাকে, বৃহৎকে সাধনায়ই লাভ করতে হয়। কয়েকখানা বই দ্বারা হবে না। আমরা এই বইগুলোর জন্য কৃতজ্ঞ হতে পারি,—কিন্তু সর্বজাতীয় মানবিকতা লাভ বই দ্বারা হবে না—ইহা সাধনালভ্য।"

উপসংহারে তিনি বলেন :

"মানুষ মানুষকে যদি কোথাও গ্রহণ না করে—যদি এই ভারতে গ্রহণ করতে

সক্ষম হয়, তবে এ আমাদের গৌরবের কথা। আয়ন্তঃ সর্ব্বতঃ স্বাহা!"

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৫শে চৈত্র, ১৩৪০ ; ৮ই এপ্রিল, ১৯৩৪]

ঐদিনই গান্ধীজী পাটনাতে আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখিবার আহ্বান জানাইয়া এক বিবৃতি দেন (৭ই এপ্রিল, ১৯৩৪)। বস্তুত কয়েকদিন পূর্বেই বিহারের ভূমিকম্পদুর্গত অঞ্চলে পরিদর্শন করার সময় তিনি এই প্রস্তাবটি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও অন্যান্য সহকর্মীদের নিকট উত্থাপন করিয়া আলোচনা করেন। দেশের জনসাধারণ মানসিক ও নৈতিক দিক থেকে এখনও সত্যাগ্রহ সংগ্রামের উপযুক্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই, এই কথা উপলব্ধি করিয়াই তিনি সত্যাগ্রহ সংগ্রাম স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার বিবৃতিতে বলেন :

"The introspection prompted by the conversation with the ashram inmates has led me to the conclusion that I must advise all Congressmen to suspend civil resistance for swaraj as distinguished from the specific grievances. They should leave it to me alone. It should be resumed by others in my lifetime only under my direction, unless one arises claiming to know the science better than I do and inspires confidence. I express this opinion as the author and initiator of satyagraha. Henceforth, therefore, those who have been impelled to civil resistance for swaraj under my advice, directly given or indirectly inferred, will please desist from civil resistance. I am quite convinced that this is the best course in the interests of India's fight for freedom."

[*Muhatma* : Vol. III, P. 260]

তিনি সত্যাগ্রহী ও আইন-অমান্য আন্দোলনকারীদের নীরবে অস্পৃশ্যতা ও মাদকদ্রব্য-বর্জন এবং চরকা-কুটিরশিল্প ইত্যাদি জাতীয় গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিবার আহ্বান জানান। পরিশেষে তিনি তাঁহার ঐ বিবৃতিতে পরিষ্কার ঘোষণা করেন যে, যাঁহারা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্য তাঁহার পরিচালনা ও নেতৃত্বে আস্থা রাখেন, ইহা তাঁহাদেরই উদ্দেশে তাঁহার একান্ত ব্যক্তিগত উপদেশমাত্র। তিনি বলিলেন, 'I am in no way usurping the function of the Congress.'

পরদিন প্রায় সমস্ত পত্র-পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হয়। এই বিবৃতিতে প্রায় সকলেই প্রথমটা খুবই চমকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যদিও উহা একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল না। কেননা আন্দোলনের গতি তখন প্রায় স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল। তাছাড়া কংগ্রেসের বামপন্থী ও প্রগতিশীল নেতারা প্রায় সকলেই কারাগারে অথবা বিদেশে। সবচেয়ে আঘাত পান জওহরলাল। কিছুদিন পূর্বেই তিনি গ্রেপ্তার হন (কলিকাতায় রাষ্ট্রবিরোধী বক্তৃতার অভিযোগে) এবং বিচারে তাঁহার দুই বৎসর কারাদণ্ড হয়। আলিপুর কারাগারে গান্ধীজীর ঐ বিবৃতি পাঠ করিবার পর তাঁহার যে মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়, সে সম্পর্কে তিনি তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছিলেন :

…"আমার কাছে এমন প্রস্তাব বীভৎস এবং দুর্নীতিপূর্ণ মনে হইল। কিসে সত্যাগ্রহ হয় এবং হয় না, তেমন কথা আমি জানি বলিয়া ধরিয়া লইতেছি না, কিন্তু

আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় আমি আমার আচরণে কতকগুলি মূলনীতি অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু গান্ধীজীর এই বিবৃতির দ্বারা আমার সেই সমস্ত নীতি বিপর্যস্ত ও আহত হইল।…

"এই সমগ্র বিবৃতি আমাকে ত্রস্ত ও উৎপীড়িত করিল।…দেখা যাইতেছে গান্ধীজী ও আমার মধ্যে বহুদূর ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে। অত্যন্ত বেদনাবিধুর হৃদয়ে আমি অনুভব করিলাম যে, বহু বছর ধরিয়া তাঁহার প্রতি আমার যে অনুরক্তির বন্ধন ছিল তাহা যেন ছিন্ন হইয়াছে।"… [আত্ম-চরিত : পৃঃ. ৫৪০-৪১]

রবীন্দ্রনাথ তখন কলিকাতায়। রয়টারের প্রতিনিধি কবির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গান্ধীজীর ঐ-বিবৃতির সম্পর্কে তাঁহার অভিমত জানাইবার অনুরোধ জানান। কবি সতর্কতার সহিত খুব সংক্ষেপে মন্তব্য করেন :

"I approve Mahatma Gandhi's decision which gives every worker freedom of action in the service of his country."

[*Birmingham Post* : 9th April, 1934]

লক্ষ্য করিবার বিষয়, আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের বিষয়টি সম্পর্কে তিনি কোনরূপ মন্তব্যই না করিয়া পরোক্ষভাবে কংগ্রেস কর্মীদের স্বাধীন বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইবার নির্দেশ দিলেন।

কিন্তু শুধু গান্ধীজীই নহেন;—ডাঃ আন্সারী প্রমুখ কংগ্রেসের কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই অচলাবস্থার অবসান ঘটাইয়া নূতন কোনো নীতি-কৌশল উদ্ভাবনের দ্বারা কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা কাউন্সিলে প্রবেশ ও 'স্বরাজ্য-দল'টি পুনর্গঠনের পরিকল্পনা করেন। ৩১শে মার্চ (১৯৩৪) ডাঃ আন্সারীর সভাপতিত্বে দিল্লীতে এক সম্মেলনে উপরোক্ত কর্মনীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয় এই ব্যাপারে গান্ধীজীর অনুমোদন লাভের জন্য তাঁহার নিকট একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণেরও সিদ্ধান্ত হয়। তদনুসারে ডাঃ আন্সারী, ভুলাভাই দেশাই ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ একটি প্রতিনিধিদল পাটনায় আসিয়া গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া (৪ঠা এপ্রিল) এই ব্যাপারে আলোচনা করেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, গান্ধীজী 'স্বরাজ্য-দল' পুনর্গঠন ও তাহার কাউন্সিল প্রবেশ প্রস্তাবকে স্বাগত জানাইলেন। ৫ই এপ্রিল তিনি পাটনা থেকে ডাঃ আন্সারীকে এক পত্রে লিখিলেন :

…"I have no hesitation in welcoming the revival of the Swarajya Party and the decision of the meeting to take part in the forthcoming elections to the Assembly which you tell me is about to be dissolved.

"My views on the utility of the Legislatures in the persent state are well known. They remain, on the whole, what they were in 1920. But I feel that it is not only the} right but it is the duty of every Congressman who, for some reason or other, does not want to or cannot take part in civil resistance and who has faith in entry into

the Legislatures, to seek entry and form combinations in order to prosecute the programme which he or they believe to be in the interest of the country. Consistently with my view above mentioned, I shall be at the disposal of the party at all times and render such assistance as it is in my power to give".

[*The History of the Congress*-Vol. I, P. 568]

উল্লেখযোগ্য, এই পত্র লেখার দুই দিন পরে গান্ধীজী আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করিয়া পূর্বোক্ত বিবৃতিটি প্রদান করেন।

বলাবাহুল্য, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট গান্ধীজীর ঐ সিদ্ধান্তে বেশকিছুটা আনন্দিত হন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র-সচিব Sir Harry Haig এমন কথাও ঘোষণা করেন যে, কংগ্রেস দল গান্ধীজীর ঐ-সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিলে গভর্নমেণ্ট কংগ্রেস ও তাহার সংগঠনগুলির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া লইবেন এবং আইন-অমান্যকারী সত্যাগ্রহী বন্দীদের মুক্তি দিবেন। কিন্তু বিপ্লবপন্থীদের কিংবা বাংলাদেশের 'ডেটিনিউ'দের মুক্তির প্রশ্নে তিনি 'টু' শব্দটি উচ্চারণ করিলেন না।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। এই বিবৃতি পাঠ করিয়া তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি ঠিক এই আশংকাই করিতেছিলেন যে, সত্যাগ্রহী বন্দীরা মুক্তি পাইলেও 'বেঙ্গল ডেটিনিউ'দের গভর্নমেন্ট মুক্তি দিবেন না। ১৮ই এপ্রিল (১৯৩৪) কবি শান্তিনিকেতন থেকে 'এ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেসের' মারফত এক বিবৃতিতে 'বেঙ্গল ডেটিনিউ'দের মুক্তির আবেদন জানাইয়া বলিলেন :

"I am glad to read the Home Member's statement promising release of Civil Disobedience prisoners, if calling off of movement is ratified by the Congress. For, any further retention of prisoners after ratification will be interpreted as showing a spirit of persecution not worthy of a Government that claims to be civilised. I hope the Viceroy's generosity will rise equal to the occasion and give Bengal detenues also a chance to appreciate the Government's good-will.

"I appeal to the Government to strive for that dignity which is based on its claim to appreciation of human values and not on its mere assertion of power. [*Forward* : 20th April, 1934]

বলাবাহুল্য গভর্নমেণ্ট কবির এই আবেদনে কর্ণপাত করেন নাই।

স্মরণ রাখা দরকার আন্দামানে এবং বাংলার বিভিন্ন জেলখানায় সাজাপ্রাপ্ত বন্দীরা ছাড়াও দেউলী, হিজলী, বক্সা প্রভৃতি বন্দীশিবিরে বাংলার প্রায় আড়াই হাজারের উপর ডেটিনিউ পচিতেছিলেন। ইহাদের মুক্তির দাবীতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তখনও পর্যন্ত কোন সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন করা হয় নাই।

সিংহলে শেষবার

বিশ্বভারতীর আর্থিক সংকট ক্রমশ চরম আকার ধারণ করিতে থাকে। এই অবস্থায় এই বৃদ্ধবয়সেও কবিকে অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতনের দলবল লইয়া বাহির হইতে হয়। স্থির হয়, প্রথমে সিংহলে, পরে দক্ষিণভারতে বক্তৃতা সংগীত অভিনয় ও চিত্রপ্রদর্শনী ইত্যাদির সাহায্যে বিশ্বভারতীর জন্য আর্থিক-সাহায্যের আবেদন জানানো হইবে। ৪ঠা মে (১৯৩৪), কবি তাঁহার দলবল লইয়া কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ কর ও অনিলকুমার চন্দ পূর্বেই কলম্বো যাত্রা করিয়াছিলেন। কলিকাতায় সাংবাদিকরা কবিকে ঘিরিয়া ধরিল: দেশের রাজনীতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁহার অভিমত কী—এই তাঁহাদের প্রশ্ন। এইসব প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়া কবি বলেন যে, রাজনীতি বিষয়ে তিনি আর এখন চিন্তা-ভাবনা করিতে পারেন না। যদিও ইতিপূর্বে বহুবার তিনি রাজনীতিক বিষয়ে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন কিন্তু এখন তাঁহার অবসর গ্রহণের দিন হইয়াছে বলিয়া রাজনীতিক প্রচারের ঘূর্ণাবর্তে নিজেকে আর নিক্ষেপ করিতে চাহেন না।

কিছুদিন পূর্বে যশিডিতে একদল পাণ্ডা ও সনাতনী হিন্দু গান্ধীজীর বিরুদ্ধে কৃষ্ণপতাকা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন কালে (২৬শে এপ্রিল) তাঁহার গাড়ির দরজার কাঁচ ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে অশালীন ভাষা প্রয়োগ করে। সাংবাদিকরা এই ঘটনাটির প্রতি কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তাঁহার মুখাবয়ব কঠিন আকৃতি গ্রহণ করে। তিনি বলেন, ইহা নিতান্তই বর্বরোচিত। তিনি বলেন:

"If I were a Sanatanist and even if I had any sympathy for them. I would certainly have blushed at what has happened. But then those responsible for it do not represent the whole mass of Sanatanists and are only members of individual groups. I of course trust, and we must give them credit, that they did not mean any harm to Mahatma Gandhi. The whole thing was a mere demonstration." [*Pioneer*: 6th May, 1934]

৫ই মে, তিনি কলিকাতা থেকে 'ইনচাংগা' জাহাজে সিংহলের পথে যাত্রা করেন। সমুদ্রপথে জাহাজেই এবার তাঁহার জন্মদিন কাটিল। পরদিন, ৯ই মে, সিংহলের কলম্বো বন্দরে জাহাজ ভিড়িল। বন্দরে বিশাল এক জনতা অপেক্ষমান ছিল। তাছাড়া সিংহলের প্রধানমন্ত্রী স্যর ব্যারন জয়তিলক ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি কবিকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য বন্দরে উপস্থিত ছিলেন। সমুদ্রের ধারে একটি মনোরম গৃহে কবির থাকিবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু সাংবাদিকদের নিরস্ত করা যায় না। সিংহলের *Daily News*-এর সংবাদদাতা আসিয়া ভারতের রাজনীতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কবির অভিমত জানিতে চাহিলেন। কবি সরাসরি রাজনীতিক বিষয়ে

মন্তব্য করিতে অস্বীকার করিয়া বলেন যে, তিনি কবি, রাজনীতির সহিত তাঁহার কোনো সংস্রব নাই।

"With politics I am not concerned. My mission is of spiritual delights, of art and beauty far and wide. I have no other gifts to offer you. I am not a politician, I do not want to refrom the World."

সাংবাদিকদের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য এইরকম সুদৃঢ় বর্মের নীচে প্রায়ই তাঁহাকে আশ্রয় লইতে হইত। কিন্তু সব সময় সফল হইতেন না, তা বলাই বাহুল্য।

ইতিমধ্যে দার্জিলিঙে বাংলার গভর্নরের প্রাণনাশের চেষ্টার খবর আসিয়া পৌঁছে। ৮ই মে দার্জিলিঙে লেবং ঘোড়দৌড় মাঠে বিপ্লবীগণ কর্তৃক বাংলার তদানীন্তন গভর্নর স্যার জন এ্যান্ডারসনের প্রাণনাশের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আক্রমণকারী বিপ্লবীরা প্রায় সকলেই ধৃত হন, ইহাদের মধ্যে একজন মহিলাও ছিলেন। এই সংবাদে রবীন্দ্রনাথ খুবই মর্মাহত হন। ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের এই ব্যর্থ ও ভুলনীতি তিনি কখনও অনুমোদন করিতে পারেন নাই। কী দুঃসহ লাঞ্ছনা ও অবমাননার মধ্যে বাংলার যুবকেরা ক্রোধে আত্মহারা হইয়া এই ভুলপথে ছুটিয়াছে, তাহা কবির বুঝিতে এতটুকু অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা এইভাবে নিষ্ফল আত্মাহুতি দিবেন, ইহা চিন্তা করিয়া তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। ১১ই মে তিনি *Daily News*-এর সংবাদদাতার নিকট এই প্রসঙ্গে বলেন :

"I am shocked and ashamed. It is an ugly sign of the hysteria of crime, one of the exciting causes of which has been the painful experience that some of our towns have had during a regime of wholesale suspicion and humiliating measures of repression.

"I know that Bengal will be forced to make penance for the distardly acts of two silly boys and another ring of a vicious circle will be forged." [*Daily News* : 12th May, 1934]

অবশ্য ইহার পূর্বদিনই তিনি বাংলার গভর্নরকে এই ঘটনার জন্য দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া এক তারবার্তা পাঠান :

"Recent attack on your life is a matter of shame and regret to all of us in Bengal."

উল্লেখযোগ্য, এই সময়ই কবি তাঁহার 'চার অধ্যায়' উপন্যাসটি রচনা করিতে-ছিলেন। সিংহল ভ্রমণকালেই উহা রচনা সমাপ্ত করেন (ক্যান্ডি, ৫ই জুন)। 'চার অধ্যায়' রচনার পশ্চাতে এইসব ঘটনার কোনো প্রত্যক্ষ অভিঘাত ছিল কিনা তাহা জোর করিয়া কিছু বলা যায় না, তবে ইহার কয়েকমাস পরে 'চার অধ্যায়' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে বাংলাদেশে বিপ্লবীদের একটি অংশ ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হন। এই প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনায় আসিব।

সিংহলে পৌঁছানর পরদিন থেকেই কবির বক্তৃতার পালা শুরু হয়। ১০ই মে, কলম্বোর Grand Oriental Hötel-এ অবস্থিত রোটারী ক্লাবে কবি বক্তৃতা করেন।

বক্তৃতার বিষয় ছিল—'Ideals of an Indian University.' পরদিন বিশ্বভারতীর জন্য সাহায্য-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে Indian Mercantile Chamber of Commerce-এর পক্ষ থেকে কবিকে এক জনসভায় সংবর্ধনা জানানো হয়। সভায় কবি বিশ্বভারতীর মহান আদর্শের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া পরিশেষে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে ইহার আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানাইয়া বলেন :

..."But is it possible for me single handed to carry on this pious duty and should you not co-operate with me and enable me to do my duty and lighten my burden which is growing heavy every day and killing me, old man, as I am. Would you not like me to live a few more years to complete my work ? Must I kill myself in gathering funds from unwilling hearts. I do not know how I deserve of my countrymen. And, they all say that I am one of the few great men in India who have brought honour to the motherland, but what is the use of these cheap sayings if you allow me to die as a beggar walking from street to street, country to country. I do not know how to appeal to your higher man. This begging is the most difficult of all professions." [*Daily News* : May 12, 1934]

কবি আর আপনাকে সংযত করিতে পারিলেন না,—আবেগে, ক্ষোভে, দুঃখে অভিমানে কণ্ঠস্বর ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হয়। বিশ্বভারতীর অর্থসংকটের জন্য ধনীর দুয়ারে এই ভিক্ষাবৃত্তি ও হীনতা স্বীকার তাঁহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায় নাই,—তবুও অর্থের জন্য এই শেঠজী ও ধনীদেরই কাছে হাত পাতিতে হইয়াছে। যাহাই হোক, কবি সভাস্থল পরিত্যাগ করার পরই প্রায় সাত শত টাকা সংগৃহীত হয়। তাছাড়া পূর্বেই আরও কিছু অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। Indian Mercantile Chamber ও Bose Sangam নামক দুটি প্রতিষ্ঠানও প্রায় ৬,৫০০ টাকা তুলিয়া দেন।

ইহার পর কয়েকদিনই বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গীত অভিনয় হয়, সেই সঙ্গে চিত্র-প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হয়। সিংহলবাসীরা গভীর আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে এইসব উপভোগ করিয়াছিলেন।

১৯শে মে, কবি তাঁহার দলবল সমেত পানাদুরা নামক স্থানে উপস্থিত হন। কিছুকাল পূর্বে উইলমট পেরারা নামক এক ধনী আদর্শবাদী যুবক শান্তিনিকেতনে কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে শ্রীনিকেতন পল্লী-উন্নয়ন কেন্দ্রটি দেখিয়া তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ ও প্রভাবিত হন এবং সেই-আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি দেশে অনুরূপ একটি আদর্শ পল্লী-উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবার বাসনা ব্যক্ত করিয়া কবির নিকট আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন। সেদিন কবি তাঁহার এই মহান সংকল্পের সাফল্য ও শুভেচ্ছা কামনা করিয়া যে-বাণীটি দেন তাহার অংশ-বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হইল :

"All over the West there have been started movements for

restoring life to the villages, for intensive cultivation of the soil, for a return to the normal life of nature while preserving the essential elements of human progress. Let me hope that Ceylon has outgrown her infatuation of reckless modernity and the greed of artificial wealth and will now devote herself to the truly human task of reconstructing rural life with the help of scientific knowledge and intelligently adjust industrial progress to the well-being of the agricultural population." [*Daily News :* Ceylon, 24th January, 1933]

দেশে প্রত্যাবর্তনের পর উইলমট পানাদুরার সন্নিকটে একটি গ্রামে 'শ্রীপল্লী' নামক একটি পল্লী-উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। উহারই উদ্বোধন উপলক্ষে তিনি রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানান। ২০শে মে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে উহার উদ্বোধন হয়। এইখানে কবি সিংহলের বিখ্যাত ক্যান্ডিনৃত্য দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হন। সেখান থেকে আরও কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করিয়া তাঁহারা সিংহলের ক্যান্ডি শহরে যান (৩রা জুন)। উহার দিন দুই পরে কবি এইখানেই তাঁহার 'চার অধ্যায়' উপন্যাসটি রচনা সমাপ্ত করেন (৫ই জুন)।

ক্যান্ডি থেকে অনুরাধাপুরে, অবশেষে কবি সিংহলের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত জাফ্‌না শহরে আসিয়া পৌঁছিলেন (৯ই জুন)। এখানে তিনদিন 'শাপমোচন' অভিনয় হয়। ১২ই জুন সেখানে এক বিরাট জনসভায় কবিকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

কবি তাঁহার ভাষণের শুরুতেই ভারত ও সিংহলের প্রাচীন সাংস্কৃতিক সম্পর্কের কথা আলোচনা করেন। রামায়ণে বর্ণিত ভারত-সিংহল সেতু-বন্ধনের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তিনি সেই রামচন্দ্রের দেশ থেকে পুনরায় এই দুই দেশের মধ্যে সেতুবন্ধনের মহান ব্রত লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন,—আর সেই সেতু শিল্প-সাহিত্য-সাংস্কৃতিক বন্ধনের সেতু—যাহা মানুষে-মানুষে ব্যবধান দূর করিয়া তাহাদের একত্রে মিলিত করিবে। তিনি বলিলেন :

…"I also have come as a messenger from the land of Ramchandra to build to the best of my ability a bridge, not with stones or rocks but with expressions of beauty in poems, songs and dancing which are the best material for a path of communication that may span the differences between peoples."

কিন্তু কবির গভীর দুঃখ ও আক্ষেপের বিষয় যে, সিংহল তাহার প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ভুলিতে বসিয়াছে এবং একটি বিদেশী ভাষা ও সংস্কৃতির অন্ধমোহে সে বিপথে ছুটিয়া চলিয়াছে। আজও পর্যন্ত তাহার আপন ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি গঠনের ব্যাপারে চরম ঔদাসীন্য ও অমনোযোগ লক্ষ্য করিয়া কবি সিংহলী বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশে সতর্কবাণী করিয়া বলেন :

"I hope that my coming to your country will not end in an ephemeral sensationalism, that even when I leave your shore the

memory of it will speak to you about the greatest of your problems, which is that of finding your own true voice—not that of your master—in your own language. In order to justify your existence you must make yourself heard to your own self and to others.

উপসংহারে কবি বলিলেন :

"Do not waste your time and intellect in carefully imitating other people, however great they may be, imitating their idioms and being utterly lost in a vagueness of futile inanity. I shall considered myself as having failed in my message if I have not sufficiently impressed you with the truism that you cannot belong to yourself if you do not produce your own literature as the trust document of the mastery of your mind, and also if I have not persuaded you to believe that you must have a continental background of your culture, which is the Indian background that will vitalize your thoughts and enrich your imagination." [*Ceylon Observer* : 13th June, 1934]

কবি সিংহলের সম্মানিত অতিথি, কিন্তু মুখের উপরে সত্যকথা স্পষ্ট করিয়া শুনাইয়া দিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই।

কবির বক্তব্য এই, সিংহল তাহার দ্বৈপ সংকীর্ণতা লইয়া থাকিতে পারে না। বস্তুত ভারত ও সিংহল—উভয়েই একই উপমহাদেশীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সম্পর্কে অখণ্ডভাবে সংযুক্ত। সিংহল তাহার এই প্রকৃত আত্মস্বরূপকে আবিষ্কার করুক ;— নবজাগ্রত সিংহল তাহার আপন ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্ম দিক, ইহাই ছিল সিংহলবাসীদের প্রতি কবির সর্বশেষ বাণী।

এই প্রসঙ্গে আর একটি মূল্যবান তথ্য এখানে উল্লেখযোগ্য। বিদেশী ভাষা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রতি অতিরিক্ত মোহগ্রস্ত হওয়ার জন্য সিংহলবাসীদের তিনি যেমন তিরস্কার করিলেন, কিছুদিন পূর্বে ভারতের সিন্ধী বা সিন্ধুপ্রদেশবাসীদেরও ঐ দোষের জন্য তিরস্কার করিয়া কবি তাহাদের উদ্দেশে অনুরূপ একটি বাণী পাঠাইয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্বে করাচীর Rabindra Literary Dramatic Club-এর মুখপত্র *Indus* পত্রিকায় কবির এই বাণীটি প্রকাশিত হয়।

[দ্র. *Modern Review* : July, 1934 pp. 121-22]

কবির ঐ বাণীর মর্মার্থ ছিল এই :

"সিন্ধীরা বুদ্ধিমান এবং সাহসী জাতি। সিন্ধী সরকারী-আমলাদিগকে ভারতের সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সিন্ধী সওদাগরগণ ভারতের বাণিজ্যসম্ভার জগতের দূরতর দেশের বিভিন্ন বন্দরে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তথাপি ভারতের বুকের উপর দিয়া বর্তমানে নব-জাগ্রতির যে প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, আধুনিক সিন্ধুর অবদান তাহাতে অতি সামান্যই। সিন্ধুর এই দারিদ্র্যের মূল কোথায়, সন্ধান করিতে গেলে আমার মনে হয়—দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, যাহা নৈতিক অধোগতিরই কারণ, সিন্ধীরা তাহাতেই অনুপ্রেরণালাভ করিতে চেষ্টা করেন। সিন্ধীরা আজও

বিদেশীর আমদানী করা সস্তা সভ্যতার মোহে পতিত আছেন। তাঁহাদের যুবকেরা বিদেশী পোষাকে সজ্জিত হইয়া ঘুরে ফিরে, বিদেশী বুলি কপচায়, বিদেশী হাব-ভাবের নকল করে, এ-দৃশ্য যেমন উদ্ভট, তেমনই মর্মান্তিক। আমরা, বাঙালীরাই সর্বপ্রথমে বিদেশীর অনুকরণের মোহে পতিত হই, কিন্তু আমরা সত্বরই নিজদিগকে সেই মোহজাল হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হই এবং আত্মস্থ হইবার সাধনা অবলম্বন করি। এই পথে আমরা যে-সব শক্তিকে জাগাইয়া তুলিয়াছি, সেগুলি আমাদিগকে যে নবীন গর্বে গর্বী করিয়াছে, তাহা আমাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব। বিদেশীর নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিতে আপত্তি নাই, কিন্তু অনুপ্রেরণা যেন পাই নিজেদের ভিতর হইতেই। আধুনিক সিন্ধুবাসীদের প্রতি আমার উপদেশ এই যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের অতীতগৌরব বিস্মৃত না হন এবং সিন্ধু নদীর তীরভূমিতে একদিন যে গৌরবের প্রতিষ্ঠা ছিল, সেই গৌরবকে পুনপ্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহারা যেন চেষ্টা করেন। তাঁহারা আত্মস্থ হউন, যে জীবনধারা শতাব্দীর পর শতাব্দী তাঁহাদিগকে তুষ্ট-পুষ্ট রাখিয়াছে, তাঁহারা সেই জীবনধারার সহিত যুক্ত থাকুন,— তবেই তাঁহাদের অতীতগৌরব পুনরায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।"

[দেশ : ১ম বর্ষ, ৩১ সংখ্যা ; ২৩শে জুন, ১৯৩৪ পৃঃ. ১২]

বলাবাহুল্য, বিদেশী-ভাব-ভাষা বলিতে কবি এখানে ইংরাজী ভাষা ও আদব-কায়দার অন্ধ অনুকরণ প্রচেষ্টাকেই ধিক্কার জানাইয়াছেন।

যাহাই হোক, কবির এই সিংহল-ভ্রমণের ফলে ভারত-সিংহল সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। এই সম্পর্কে 'প্রবাসী' লিখিয়াছিল :

"ধর্মে সভ্যতায় সংস্কৃতিতে ভারতবর্ষের সহিত সিংহলের যোগ বহু প্রাচীন। রবীন্দ্রনাথের সিংহলভ্রমণ সেই যোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিল। এই কাজটি তাঁহার দ্বারা যে প্রকারে হওয়া সম্ভব অন্য কোনো এক ব্যক্তি দ্বারা তাহা হইতে পারে না।··· নানা গুণের সমাবেশ একই ব্যক্তিতে থাকায় রবীন্দ্রনাথ সিংহলবাসীদিগকে যেমন আনন্দ দিতে পারিয়াছেন ও তাঁহাদের মধ্যে যে নবজাগরণ আনিয়াছেন, তাহা পূর্বে তথায় সংসাধিত হয় নাই।" [প্রবাসী : আষাঢ়, ১৩৪১ পৃ. ৪৪৭]

কয়েকদিন পর কবি মাদ্রাজ থেকে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। কলিকাতায় বেশ কয়েকদিন থাকিবার পর জুনের শেষভাগে তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন (২৩শে জুন, ১৯৩৪)।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস

গান্ধীজী কর্তৃক সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখার ঘোষণার প্রায় দেড়মাস পরে পাটনাতে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির দুইদিন ব্যাপী অধিবেশন হয় (১৮ ও ১৯শে মে, ১৯৩৪)। এই অধিবেশনে সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার ও গান্ধীজী অনুসৃত নূতন কর্মনীতিকে এবং সেই সঙ্গে আগামী নির্বাচনে স্বরাজ্য-দলের অংশগ্রহণ ও কাউন্সিল-

প্রবেশ নীতিকেও অনুমোদন করা হয়। এই উদ্দেশ্যে পন্ডিত মালব্য ও মিঃ আণের নেতৃত্বে ২৫ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি 'কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড'ও গঠন করিবার সিদ্ধান্ত হয়। উল্লেখযোগ্য, গান্ধীজী স্বয়ং কাউন্সিল-প্রবেশ সিদ্ধান্তটি সভায় উত্থাপন করেন। অবশ্য আচার্য নরেন্দ্র দেব ও জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ কংগ্রেস সোস্যালিস্ট নেতারা কংগ্রেসের কাউন্সিল-প্রবেশ নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া শেষ পর্যন্ত বিরোধিতা করিয়া যান।

৬ই জুন গভর্নমেণ্ট কংগ্রেসের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া লয় এবং কিছু কিছু সত্যাগ্রহী বন্দীদেরও মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু সর্দার প্যাটেল, জওহরলাল ও খান আব্দুল গফ্ফর খাঁ প্রমুখ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই। তাছাড়া 'খুদাই খিদ্‌মদ্‌গার' এবং কংগ্রেসের কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনগুলির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং আন্দোলন চলাকালীন যে-সব দমনমূলক আইন ও অর্ডিন্যান্স জারী করা হইয়াছিল, তাহাও প্রত্যাহৃত হইল না।

উহার প্রায় এক সপ্তাহ পরে ওয়ার্ধায় ও বোম্বাইয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পর পর দুটি বৈঠক (১২, ১৩ এবং ১৭, ১৮ জুন, ১৯৩৪) হয়। এই বৈঠকে বা সভায় কংগ্রেস কর্মীদের স্বদেশী শিল্প ও গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি গ্রহণের উপরই প্রধানত গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 'হোয়াইট পেপার' ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে। এই সিদ্ধান্তে হোয়াইট পেপারের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করিয়া বলা হয় যে, উহা কোনো ক্ষেত্রেই ভারতের জনগণের ইচ্ছার অভিব্যক্তি নহে এবং কংগ্রেসের অভীষ্ট লক্ষ্য হইতেও ইহা বহু দূরে। উহাতে আরও বলা হয় যে, একমাত্র ভারতের সার্বজনীন ও প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারে গঠিত এক গণ-পরিষদই (Constituent Assembly) দেশের সত্যকার শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে পারে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে সিদ্ধান্তটিতে বলা হয় যে, হোয়াইট পেপারটা গেলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাটাও যাইবে (lapse automatically)। সিদ্ধান্তটির শেষাংশটি ছিল এইরূপ :

"Since, however, the different communities in the country are sharply divided on the question of the Communal Award, it is necessary to define the Congress attitude on it. The Congress claims to represent equally all the communities composing the Indian Nation and, therefore, in view of the division of opinion, *can neither accept nor reject the Communal Award* as long as the division of opinion lasts. At the same time, it is necessary to re-declare the policy of the Congress on the communal question.

"No solution that is not purely national, can be propounded by the Congress. But the Congress is pledged to accept any solution, falling short of the national, which is agreed to by all the parties concerned, and, conversely, to reject any solution which is not agreed to by any of the said parties.

"Judged by the national standard, the Communal Award is wholly unsatisfactory, besides being open to serious objections on other grounds.

"It is, however, obvious that the only way to prevent the untoward consequences of the Communal Award is to explore ways and means of arriving at an agreed solution and not by any appeal on this essentially domestic question to the British Government or any other outside authority." [*The History of the Congress* : Vol. I. P. 575]

উল্লেখযোগ্য, পণ্ডিত মালব্য ও আণে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির এই 'না-গ্রহণ না-বর্জন' নীতির সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা হোয়াইট পেপারের মত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকেও বর্জন করিবার দাবী করিয়াছিলেন। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তে বা নীতিতে অটল থাকিলেন। এই মতপার্থক্য-হেতু পণ্ডিত মালব্য ও আণে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড ও ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগপত্র পেশ করেন। অবশ্য পরবর্তী আলোচনায় বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হইবে এই আশ্বাস দিলে পর তাঁহারা উভয়েই সাময়িকভাবে তাঁহাদের পদত্যাগ সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখেন।

ওয়ার্কিং কমিটির এই অধিবেশনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পর্কে শিথিল আলোচনা চলিতেছে' দেখিয়া ওয়ার্কিং কমিটি এই সিদ্ধান্তের দ্বারা কংগ্রেস কর্মীদের স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, করাচী-সিদ্ধান্তে "সঙ্গত কারণ ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ব্যতীত ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কল্পনাও নাই, অথবা ইহা শ্রেণী-সংগ্রামেরও অনুমোদন করে না। ওয়ার্কিং কমিটির আরও অভিমত এই যে, বাজেয়াপ্তকরণ অথবা শ্রেণী-সংঘর্ষ কংগ্রেসের অহিংসা নীতির বিরোধী।"

এই সিদ্ধান্ত পাঠ করিয়া জওহরলাল প্রমুখ সমাজতন্ত্রী ভাবাপন্ন নেতারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হইয়া উঠিলেন। জওহরলাল স্পষ্টই লিখিলেন যে, নবগঠিত কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলকে লক্ষ্য করিয়াই এই প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে। যাঁহারা শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাস করেন তাঁহারা কংগ্রেসের সাধারণ সভ্যও হইতে পারিবেন না, এই প্রস্তাবে স্পষ্টতই এইরূপ ইঙ্গিত করা হইয়াছে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

বস্তুত 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা'র পর ভারতবর্ষে মার্ক্সবাদী রাজনীতিক চিন্তার দ্রুত প্রসার ঘটিতে থাকে। গভর্নমেণ্ট ইহা লক্ষ্য করিয়া অল্পকাল পরেই 'কমিউনিস্ট পার্টি' ও 'ওয়ার্কার্স এ্যাণ্ড পেজাণ্টস পার্টি'কে বে-আইনী ঘোষণা (নভেম্বর, ১৯৩৪) করেন—অবশ্য যদিও উহারা কংগ্রেসের এবং ট্রেড-ইউনিয়নের মধ্যে প্রথম থেকেই গোপনে গোপনে কাজ করিয়া যাইতেছিলেন। আরও উল্লেখযোগ্য, এই সময়ই আচার্য নরেন্দ্র দেব ও জয়প্রকাশের নেতৃত্বে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি গঠিত হয়। কিছুদিন পূর্বে পাটনাতে আচার্য নরেন্দ্র দেবের সভাপতিত্বে এই দলের সারা ভারত সম্মেলন অনুষ্ঠিত (১৭ই মে, ১৯৩৪) হয়। ইঁহারা কংগ্রেসের আইন-অমান্য আন্দোলন

প্রত্যাহার ও কাউন্সিল-প্রবেশ নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছিলেন অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শ্রেণী-সংগ্রামকে সংগঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বলাবাহুল্য, কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে এই রাজনীতির ক্রমবর্ধমান প্রভাব লক্ষ্য করিয়াই ওয়ার্কিং কমিটি উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি পাস করিয়া লন।

পরাধীন দেশের জাতীয় সংগ্রাম ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের জোয়ার-ভাটা আছে। আর জাতীয় সংগ্রামের প্রতিটি পরাজয়ের মুখেই প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতি-বিপ্লবী শক্তিগুলি প্রাধান্য পায়,—ইহা সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনা। তাই আইন-অমান্য আন্দোলন যখন দেশে স্তিমিত হইয়া আসিতে থাকে ঠিক সেই সময়ই কংগ্রেসের বাহিরে ও অভ্যন্তরে আপসকামী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি মুখর ও সোচ্চার হইয়া উঠে এবং ইতিপূর্বে কংগ্রেস রাজনীতিতে যেটুকু প্রগতিশীল ধারা প্রবর্তনের চেষ্টা হইয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে তাঁহারা আক্রমণ শুরু করিয়া দিলেন। এই সব আপসকামী ও সংগ্রাম-বিমুখ ব্যক্তিরা 'স্বরাজ্য দল'টিকে পুনর্গঠিত করিয়া এক দিকে যেমন কাউন্সিল-প্রবেশের জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন অপরদিকে তেমনি কংগ্রেসের বামপন্থী ও প্রগতিশীল গোষ্ঠীর উপর আঘাত হানিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই অশুভ শক্তির উদয় হওয়াতে জওহরলাল কারাগারে অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া লিখিলেন :

"যাহা অপ্রত্যাশিত তাহাই ঘটিল। কিন্তু আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, প্রতিক্রিয়ার মুখে কংগ্রেস তদপেক্ষাও অধিক পিছাইয়া পড়িল। অসহযোগের পর গত পনর বৎসরের মধ্যে কখনও কংগ্রেস নেতারা এমন অতি-নিয়মতান্ত্রিক কায়দায় কথা বলেন নাই। এমন কি বিংশ দশকের মধ্যভাগে প্রতিক্রিয়া হইতে উদ্ভূত স্বরাজ্য দলও, এই নবীন নেতৃমণ্ডলী অপেক্ষা বহু অগ্রগামী ছিলেন এবং স্বরাজ্য দলের প্রখর ব্যক্তিত্ব-শালী নেতৃত্বও বর্তমান ক্ষেত্রে ছিল না। যতদিন বিপদের সম্ভাবনা ছিল, ততদিন যাঁহারা সাবধানতার সহিত দূরে সরিয়া ছিলেন, আজ তাঁহারাই আসিয়া হোমরা-চোমরা হইয়া উঠিলেন।" [আত্ম-চরিত : পৃঃ. ৫৯৭]

ওয়ার্কিং কমিটির শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পর্কিত প্রস্তাব বা সিদ্ধান্তটির বিশ্লেষণ করিতে গিয়া জওহরলাল আরও লিখিলেন :

..."ঐ প্রস্তাবে গুরুত্ব তাহার ভাষায় নহে অথবা উহার বিষয়বস্তুতে নহে, আসলে কংগ্রেস কোন্ পথে চলিয়াছে উহা তাহারই ইঙ্গিত। আগতপ্রায় ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচনে যাঁহারা ধনী সম্প্রদায়গুলির সমর্থন লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, কংগ্রেসের সেই নূতন পার্লামেণ্ট সাফাই ঐ প্রস্তাব রচনার প্রেরণা জোগাইয়াছিল। তাঁহাদেরই অভিপ্রায় অনুসারে কংগ্রেস দক্ষিণ দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং দেশের মডারেট ও রক্ষণশীল ব্যক্তিদের চিত্ত জয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যাঁহারা অতীতে কংগ্রেসী আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়াছেন, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনে সরকারপক্ষে যোগ দিয়াছেন, এমন কি তাঁহাদের পর্যন্ত মিষ্ট কথায় তুষ্ট করা হইতে লাগিল। বামমার্গীদের কোলাহল ও সমালোচনা এই মিলন বা 'হৃদয়ের পরিবর্তনের' পথে অন্তরায়স্বরূপ বোধ হইতে লাগিল এবং

কার্যকরী সমিতির প্রস্তাব ও অন্যান্য ব্যক্তিগত উক্তি হইতে বুঝা গেল যে, বামমার্গীদের বাধা সত্ত্বেও কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের এই নূতন পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবেন না। যদি বামমার্গীদের আচরণ সংযত না হয়, তাহা হইলে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে কংগ্রেসের দল হইতে বাদ দেওয়া হইবে। কংগ্রেসের পার্লামেণ্ট বোর্ড তাঁহাদের ঘোষণাপত্রে অতি সাবধানী যে কর্মপদ্ধতি জ্ঞাপন করিলেন, গত পনর বৎসরে তদপেক্ষা অধিক মডারেট কোন কর্মনীতি কংগ্রেস গ্রহণ করে নাই।"

[ঐ : পৃঃ. ৬০০]

প্রশ্ন থাকিয়া যায়, গান্ধীজী কি করিয়া কাউন্সিল-প্রবেশ-নীতি সমর্থন করিলেন, —অতীতে যিনি নাকি উহার তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলেন।

জনসাধারণের মানসিক অবস্থা বুঝিবার গান্ধীজীর এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। আন্দোলনের ভাটার মুখে প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী শক্তিগুলি যে মাথাচাড়া দিবে, উহা তিনি ভালোরূপেই জানিতেন এবং তিনি ইহাও জানিতেন, ইহারাই কাউন্সিল-প্রবেশের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন,—কংগ্রেস বাধা দিলেও। অথচ এই অবস্থায় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইঁহাদের পার্লামেণ্টারী রাজনীতি করিতে দিলে রাজনীতিক এই অচলাবস্থারও (stalemate) অবসান ঘটিবে এবং কংগ্রেসও তাহার সাংগঠনিক শক্তিকে সংহত ও গুছাইয়া লইবার অবকাশ পাইবে। ভবিষ্যতে এইসব সুবিধাবাদী নেতারা তাঁহার নীতির বিরোধিতা করিলেও তেমন মারাত্মক কিছু ক্ষতি করিতে পারিবেন না কেননা ইঁহাদের কাহারও দেশবন্ধুর বা মতিলাল নেহরুর মত প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব কিংবা জনপ্রিয়তা ছিল না। সম্ভবত এইসব দিক ভাবিয়া-চিন্তিয়া গান্ধীজী কাউন্সিল-প্রবেশনীতি অনুমোদন করেন। কিন্তু গান্ধীজী কংগ্রেস কর্মীদের এই নির্বাচনী-রাজনীতিতে গুরুত্ব না দিয়া প্রধানত গঠনমূলক কর্ম-নীতিতেই গুরুত্ব দিবার আহ্বান জানাইলেন। ইতিপূর্বেই নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে কংগ্রেস কর্মীদের তিনি এই সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন :

"I strongly hope that the majority will always remain untouched by the glamour of council work. In its own place it will be useful. But the Congress will commit suicide, if its attention is solely devoted to the legislative work. Swaraj will never come that way. Swaraj can only be achieved through an all-round consciousness of the masses."

[*Mahatma* : Vol. III, P. 274]

রবীন্দ্রনাথ যখন সিংহল ভ্রমণ করিতেছিলেন তখনই দেশের রাজনীতিক পরিস্থিতিতে এইসব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়া যায়। কবি সংবাদপত্রে ইহার কিছু কিছু খবর পাইলেও এই ধরনের রাজনীতিক আলোচনায় বড় একটা মন্তব্য করিতেন না। অবশ্য সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও পুণা-চুক্তিতে বাংলাদেশের প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে, ইতিপূর্বেই তাঁহার বিবৃতিতে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তবুও এই ধরনের পার্লামেণ্টারী রাজনীতিতে তাঁহার বড় একটা আস্থা ছিল না বলিয়া ব্রিটিশ প্রদত্ত ভারত শাসনসংস্কার সম্পর্কে সচরাচর

মন্তব্য করিতে চাহিতেন না। যাহাই হোক, জুন মাসের শেষভাগে কবি সিংহল ভ্রমণ শেষ করিয়া শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন (২৩শে জুন)।

এদিকে গান্ধীজী ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের পরদিনই হরিজন আন্দোলনের জন্য বোম্বাই থেকে পুণাতে যান (১৯শে জুন)। পুণাতে গোঁড়া সোনাতনী হিন্দুরা খুবই শক্তিশালী ছিলেন। স্বভাবতই তাঁহারা গান্ধীজীর এই প্রচার অভিযানের তীব্র বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। ২৫শে জুন গান্ধীজী পুণা মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং-এ এক জনসভায় যোগ দিবার জন্য যাত্রা করিলে তাঁহার মোটর লক্ষ্য করিয়া একদল দুষ্কৃতকারী বোমা নিক্ষেপ করে। ইহার ফলে গান্ধীজীর সহযাত্রীদের মধ্যে সাতজন আহত হন। গান্ধীজী পরবর্তী মোটরে যাইতেছিলেন বলিয়া সৌভাগ্যবশত অল্পের অন্য বাঁচিয়া যান। এই সংবাদে রবীন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হইয়া যান। এই সম্পর্কে 'ইউনাইটেড্ প্রেস'-এর প্রতিনিধির এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি এক বিবৃতিতে বলেন (শান্তিনিকেতন : ২৮শে জুন ১৯৩৪) :

"Of all the surprises in criminal outrage that lately have startled India into humiliating notoriety this late attack upon Mahatmaji's life is the most malignant of its kind.

"It is deadly attack not only upon his own person which is venerated all over the world but also upon the good repute of Hindu religion and our social mentality.

"We fervently hope that such a shameful expression of maniacal fanaticism may kill its source by its own enormity and that the painful shock occasioned by it may impart a new vigour to Mahatmaji's noble cause."—U. P. [*Forward* : 30th June, 1934]

সিংহল থেকে ফিরিবার পর কবি বিশ্বভারতীর কয়েকটি সাংগঠনিক সমস্যায় কিছুটা ব্যস্ত থাকেন। তাছাড়া তাঁহার নিয়মিত সাহিত্য-কর্ম তো ছিলই। উহার অল্পকাল পরেই গান্ধীজী কলিকাতা আসিতেছেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই সংবাদ পাইয়া কবি গান্ধীজীকে শান্তিনিকেতনে আসিবার আমন্ত্রণ জানাইয়া তার করেন কিন্তু গান্ধীজী তখন খুবই ব্যস্ত ছিলেন। সম্ভবত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ব্যাপারে বাংলার নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে খুব অল্প সময়ের জন্য তিনি কলিকাতায় আসিতেছিলেন। গান্ধীজী জবাবে সেই কথাই কবিকে জানাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তার করেন (১৩ই জুলাই) :

"Your kind wire. Calcutta visit urgent. Friends anxious settlement domestic quarrels. All dates booked. Pray forgive."

এই সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা উপলক্ষে কবির কলিকাতা যাত্রার কথা ছিল। তাছাড়া কিছুকাল থেকেই কবির প্যালেস্টাইন যাত্রার ব্যাপারে নানা গুজব ও জনশ্রুতি উঠিয়াছিল এবং মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে এই মর্মে সংবাদও প্রকাশিত হয়। কলিকাতা যাত্রার পূর্বে কবি প্রমথ চৌধুরীকে এক পত্রে এই সম্পর্কে লিখিলেন (১২ই জুলাই, ১৯৩৪),—"আমার প্যালেস্টাইন যাত্রার একটা

জনশ্রুতি উঠেছে—এখনো সেটা কল্পনার সুদূরপ্রান্তে আছে সংকল্পরূপেও দানা বাঁধে নি।”... [চিঠিপত্র-৫ম : পৃঃ. ৩০০]

বেশ কিছুকাল থেকেই জার্মানীতে ইহুদীদের ’পরে নাৎসীরা অমানুষিক নির্যাতন ও পীড়ন চালাইতেছিল। স্বভাবতই কবির সহানুভূতি ইহুদীদের ’পরে ছিল। কিছুদিন পূর্বে আইনস্টাইনের প্রতি নির্যাতনের খবর প্রকাশিত হইলে কবি তৎক্ষণাৎ উহার তীব্র নিন্দাবাদ জানান। এসব কথা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে '*Israel's Messenger*' নামে একটি পত্রিকায় (এপ্রিল সংখ্যা, ১৯৩৩) একটি প্রবন্ধে নাৎসী বর্বরতার বিবরণ পাঠ করিয়া কবি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। সিংহল থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরিবার পরই কবি ঐ পত্রিকার সম্পাদক N. E. B. Ezra-র নামে একটি খোলা-চিঠি দেন (১৭ই [২৭ ?] জুন, ১৯৩৪)। এই পত্রে নাৎসী-জার্মানীর ইহুদী-নির্যাতনের প্রতিবাদ করিতে গিয়া কবি সর্বপ্রকার বর্ণ-বিদ্বেষ ও পরজাতি-বিদ্বেষের তীব্র নিন্দাবাদ করিলেন। পত্রটি ছিল এইরূপ :

Dear Friend,—

I thank you for drawing my attention to your address on 'Civilization's Debt to Asia', published in *Israel's Messenger,* April, 1934.

To me racial hatred in any form is a creed of barbarism and I cannot recognize the value of any cause in whose name nations and peoples indulge their gluttony of violence. We in India are striving to safeguard our growing spirit of nationalism from this dangerous perversion of racial hatred, and when I see Western nations building their faith on this barbarism and making elaborate preparations for a scientific slaughter, I cannot help feeling proud of my people who, poor as they are and persecuted, yet are unwilling to win human rights through brutish ways. It revives my faith in the undying spirit of the East.

As regards the Hitler regime in Germany, we read different versions of it. And certainly it cannot be denied that the German people were goaded to many acts of desperate folly by the humiliations imposed on them by the victorious nations of the War. Nevertheless, if the brutalities we read of are authentic, then no civilized conscience can allow compromise with them. The insults offered to my friend Einstein have shocked me to the point of torturing my faith in modern civilization. I can only draw consolation

from the hope that it was an unhappy act done in a drunken mood and not the sober choice of a people so gifted as the Germans.

All my life I have cried against blindness of prejudice that divides man from man and called upon my fellowmen all over the globe to stretch their hands in a common endeavour to realize the nobility of the human in each one of us. To-day when this most enduring heritage from the truly great ones of all races, is being assaulted by the aggressive communalism of the Blacks and the fanatic materialistic idealism of the Reds on the other, I once again raise my humble voice of protest and warning, however feeble it may have grown with age. In our frantic despair to save the community let us not crush the free individual on the steps of whose sublime heresies humanity has ever been rising upwards.

Yours sincerely,
Sd/Rabindranath Tagore.

Santiniketan, India.
June 17, 1934

[*Israel's Messenger* : 3rd August, 1934]

খুব সম্ভবত পত্রটি ২৭শে জুন শান্তিনিকেতন থেকে কবি লেখেন—ভুলক্রমে উহা ১৭ই জুন ছাপা হয়। কবি ইতিপূর্বেই জায়নবাদ-এর (Zionism) আদর্শগত দিকটি সমর্থন করিয়া কয়েকবার মন্তব্যও করিয়াছিলেন। সম্ভবত এই সব কারণেই তাঁহার প্যালেস্টাইন যাত্রার জনশ্রুতি রটিয়াছিল।

১৫ই জুলাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা উপলক্ষে কবি কলিকাতায় যান। এবারে তিনি বরাহনগরে প্রশান্ত মহলানবিশের বাড়িতে উঠিলেন। পরদিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সেনেট হল-এ তিনি 'সাহিত্যের তাৎপর্য' নামক ভাষণটি পাঠ করেন। গান্ধীজী তখনও কলিকাতায় নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতেছিলেন। ১৯শে জুলাই সন্ধ্যায় কবি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন। এই সাক্ষাৎকার ও আলোচনার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় নাই। *Visva Bharati News*-এ লেখা হইয়াছে, The visit was entirely personal and there were no dicussions on any public topic.

[*V. B. News* : August, 1934 ; P. 10]

গান্ধীজীর জীবনীকার টেণ্ডুলকরও এই সম্পর্কে কিছু লিখেন নাই। তবে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও পুণা-চুক্তি সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে একেবারেই কোনো আলোচনা হয় নাই তাহা মনে হয় না। উহার দু'একদিন পরেই কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন (১৯শে জুলাই)।

শান্তিনিকেতনে ফিরিবার পরই কবি 'বর্ষামঙ্গল' উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ২৭শে শ্রাবণ (১২ই আগস্ট) প্রাতে মহাসমারোহে 'বৃক্ষরোপণ-উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। কবি প্রকৃতির আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া কয়েকটি গাথা আবৃত্তি করেন। ঐদিনই অপরাহ্ণে শ্রীনিকেতনে 'হলকর্ষণ-উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বভারতীর সাধারণ সম্পাদক রথীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানে হলকর্ষণ করেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামের সমবায় সমিতিসমূহের কৃষকেরা তাহাদের ভালো ভালো বলদ ও লাঙ্গল প্রদর্শনীর জন্য আনিয়াছিল। উহার পর বিশ্বভারতীর উদ্যোগে বিভিন্ন পল্লী সংস্কার সমিতির সদস্যদের এক সভা হয়। সমবায়-সমিতিসমূহের রেজিস্ট্রার খান্ বাহাদুর আরসাদ্ আলী উহাতে সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় কালীমোহন ঘোষ ও নেপালচন্দ্র রায় প্রমুখ শ্রীনিকেতনের নেতৃস্থানীয়রা পল্লী-সংস্কার সমস্যার বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন। ঐদিন রাত্রে শান্তিনিকেতনে কবির নূতন গীতি-নাটিকা 'শ্রাবণ ধারা' অভিনীত হয়।

ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির ঐ সিদ্ধান্ত লইয়া দেশে রাজনীতিক পরিস্থিতির বেশ কিছুটা জটিলতা সৃষ্টি হয়। পণ্ডিত মালব্য ও আণের সঙ্গে ঐ বিষয়ে আলোচনার জন্য জুলাইয়ের শেষভাগে কাশীতে চারদিন-ব্যাপী ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা হয়। (২৭-৩০শে জুলাই, ১৯৩৪)। ঐ সভায় গান্ধীজীও উপস্থিত থাকেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রশ্নে একটি আপস-প্রস্তাব দিয়া তিনি পণ্ডিত মালব্য ও আণের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন,—কিন্তু শেষপর্যন্ত উহাও ব্যর্থ হয়। এই নীতিগত মতবিরোধের দরুন মালব্যজী কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড থেকে এবং আণে ওয়ার্কিং কমিটি ও পার্লামেণ্টারী বোর্ড থেকে পদত্যাগ করেন। উহার পর তাঁহারা Congress Nationalist Party নামে কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই একটি নূতন রাজনীতিক দল গঠনের কথা ঘোষণা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা ১৮ই আগস্ট কলিকাতায় একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রশ্নে বাঙালী হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা খুবই বিক্ষুব্ধ ছিলেন। ফলে বাংলা দেশে ইঁহারা প্রচুর সমর্থন ও উৎসাহ পাইলেন। স্বয়ং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় হইলেন এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি বা চেয়ারম্যান। ১৮-১৯শে আগস্ট (১-২রা ভাদ্র) কলিকাতায় রামমোহন রায় হলে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত মালব্য, মাধব শ্রীহরি আণে, নরসিংহ চিন্তামণি কেলকার ও ডাঃ বি. এস. মুঞ্জে প্রমুখ প্রবীণ হিন্দু নেতারা অনেকেই এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

পণ্ডিত মালব্য সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত ভালভাবেই জানিতেন। এই কারণেই তিনি কিছুদিন আগে এই সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা ও সমর্থন কামনা করিয়া কবিকে পত্র দেন। জবাবে কবি শান্তিনিকেতন থেকে এক পত্রে মালবজীকে এই সম্পর্কে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত জানাইয়া লিখেন যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে দেশের অন্যান্য নেতাদের এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানাইলেও এই সম্মেলনে যোগদান কিংবা এই ধরনের কোনো আন্দোলনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সংযুক্ত থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। কেননা তাঁহার আশঙ্কা

হয় এই যে, ইহার ফলে আমাদের মধ্যে অনৈক্যই বাড়িবে এবং পক্ষান্তরে ইহা প্রতি-পক্ষের হাত শক্তিশালী করিবে। কবির পত্রটি ছিল এই :

13th August, 1934

My dear Panditji,

I got your communication regarding the proposed Nationalist Conference in due time but could not reply to it earlier as we were celebrating the Rain Festival in the Ashrama and had number of guests from Calcutta and other places.

You all know that I have always disapproved of the Communal Award and I hope that our leaders will join their forces to save frcm its paralysing grip the political integrity of our nation. But not being a politician myself I shrink from taking part in a movement which I fear may create dissension in our ranks and strengthen the hands of our opponents. The responsibilty is too great for me to identify myself with any particular party which is fighting for the cause.

Yours sincerely,
Sd/- Rabindrnath Tagore.

কিন্তু এই পত্র লিখিয়াও কবি স্থির থাকিতে পারিলেন না। দলাদলির মধ্যে না গেলেও এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ও সমর্থকদের কাছে তাঁহার বক্তব্যটি যথাযতভাবে রাখিবার প্রয়োজনীয়তাটি তিনি উপলব্ধি করেন। কয়েকদিন পর কবি শান্তিনিকেতন থেকে এই সম্মেলনের উদ্দেশে একটি তার ও পত্রে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়া পণ্ডিত মালব্যের নিকট পাঠাইয়া দেন। সম্মেলনে উহা পাঠ করা হয়। কবির তারটি ছিল এই :

"You all know that I have always disapproved of the Communal Award. I hope our leaders will join their forces to save from its paralysing grip the political integrity of the nation."

কবির পত্রটি ছিল এই (১৮ই আগস্ট, ১৯৩৪ ; শান্তিনিকেতন) :

My dear Panditji,

I address this to Mahomedans as well as Hindus with the most sincere desire for the good of all sections of the community, I urge that Hindus and Mahomedans should sit together dispassionately to consider the Communal Award and its implications to arrive at an agreed solution of the communal problem. It is needless to point out that self-government cannot be based on communal divisions, and

separate electorate. No responsible system of government can be possible without mutual understanding of our communities and united representations at legislatures. We must concentrate all our forces to evolve a better understanding and co-operation between different sections of our people and thus lay a solid foundation for social and political reconstruction of our Motherland. I deprecate all expressions of angry feelings and most strongly appeal to Hindus and Musalmans to avoid saying and doing anything that may increase communal tension and further postpone the understanding between our communities without which there can be no peaceful progress in our country.

[*Modern Review* : September. 1934 ; pp. 347-48]

লক্ষ্য করিবার বিষয়, কবি এখানে তাঁহার বাণীতে নবগঠিত 'কংগ্রেস ন্যাশন্যালিস্ট পার্টি' সম্পর্কে কোনো কিছু বলিলেন না কিংবা 'ওয়ার্কিং কমিটির' ঐ সিদ্ধান্ত সম্পর্কেও প্রত্যক্ষভাবে কোনোরূপ মন্তব্য করিলেন না। তিনি প্রধানত নীতিগত প্রশ্নেই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে তাঁহার আপত্তি জানাইয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে কবির প্রধান বক্তব্য এই যে, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে কিংবা পৃথক নির্বাচন-প্রথার ভিত্তিতে দেশের স্বাধীনতা কিংবা শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। তাই তিনি হিন্দু-মুসলমান কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষ গ্রহণ না করিয়া উভয় সম্প্রদায়কে সম্মিলিতভাবে পারস্পারিক বুঝাপড়া ও আপস-আলোচনার দ্বারা শাসনতান্ত্রিক সমস্যাটির সমাধান করিবার আহ্বান জানাইলেন।

কিন্তু বাংলা দেশের বুদ্ধিজীবীরা প্রাদেশিক বা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থে আঘাত লাগার জন্যই যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরোধিতা করিতেছিলেন,—একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। যে আদর্শ ও নীতির জন্য কংগ্রেস এতকাল সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার দ্বারা উহার মূলেই আঘাত করা হইয়াছে। বস্তুত এই আদর্শ ও নীতিগত প্রশ্নেই দেশের বিবেকী ও চিংতাশীল মহল সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ঐ 'না-গ্রহণ না-বর্জন নীতি' অনুমোদন বা সমর্থন করিতে পারিতেছিলেন না। এই বিক্ষোভ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের বক্তৃতায় অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। কলিকাতায় ঐ ন্যাশন্যালিস্ট-সম্মেলনে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের আদর্শ ও নীতিগত স্ববিরোধিতার সমালোচনা করিয়া আচার্য রায় তাঁহার ভাষণে বলেন :

"কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এদেশে হোয়াইট পেপারের নির্দেশিত জাতির উন্নতি-বিরোধী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু তথাকথিত সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারার ন্যায় প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁহারা নিরপেক্ষ মতিগতি অবলম্বন করিয়াছেন। আপনারা জানেন, তথাকথিত ঐ সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সিদ্ধান্ত এবং ভারতভূমিকে চিরকালের জন্য সাম্প্রদায়িক স্বার্থ

লইয়া বিবদমান বিভিন্নদলের শিবিরে বিভক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই উহা পরিকল্পিত হইয়াছে। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি এই বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে ১৯৩১ সালে কংগ্রেস কর্তৃক নির্দেশিত নীতির সুস্পষ্টভাবে ব্যত্যয় ঘটিয়াছে এবং তাহাকে সুবিধাবাদমূলক অদূরদর্শিতার নীতির নিকট পরাজয় স্বীকার করা ব্যতীত অন্য কিছু বলা চলে না। সুবিধাবাদের দিক হইতে ধরিলেও ঐরূপ নীতিতে যে কোন যৌক্তিকতা থাকিতে পারে, এ বিষয়েও আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। যদি আমাদের নিজেদের বিবেকের মর্যাদা রক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে আমরা কিছুতেই যুক্ত-নির্বাচন-নীতি পরিহার করিতে পারি না ; কারণ ঐ নীতিই শুধু ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে এবং এই দেশকে প্রকৃত জাতীয়তায় শক্তিসম্পন্ন জাতির মর্যাদা দান করিতে পারে। কোন সম্প্রদায়কে কতটা প্রতিনিধি-আসন প্রদান করা হইবে সে বিষয়ের গুরুত্ব আমার নিকট মুখ্য নহে। এই প্রশ্ন লইয়া আপনারা জটিল বিতর্ক উত্থাপন না করেন আমি আপনাদিগকে এই অনুরোধই করিতে চাই।"

উপসংহারে তিনি বলেন :

..."আমি আশা করি এবং আমি এ বিশ্বাস পোষণ করি যে, অদ্য যে জাতীয় দল গঠিত হইতে চলিল তাহা ভারতের জাতীয় মহাসমিতির আশ্রয়েই পরিপুষ্টি লাভ করিবে।...এই দল কংগ্রেসকে তাহার দ্বিধাসংকুল দুর্বলতাসমূহ হইতে মুক্ত করিয়া উক্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে এদেশে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে সর্বময় সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে।" [দেশ : ১ম বর্ষ, ৪০ সংখ্যা, ২৫ আগস্ট, ১৯৩৪ ; পৃঃ. ১৭-১৮]

পণ্ডিত মালব্য তাঁহার ভাষণে ওয়ার্কিং কমিটির ঐ সিদ্ধান্তের স্ববিরোধিতার বিস্তারিত সমালোচনা করিয়া দেখান যে, 'হোয়াইট পেপার' বর্জন করিলেই 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' বর্জন বুঝায় না। তিনি 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা'র কুফলও আলোচনা করিয়া বলেন :

"আমি আমার মুসলমান বন্ধুদিগকে এই কথা জানাইয়া দিতে চাই যে, পৃথক নির্বাচন-প্রথা তাঁহাদের অন্তঃকরণ হইতে আসে নাই। ১৮৮৫-১৯০৮ পর্যন্ত পৃথক নির্বাচনের কথাই উঠে নাই। ১৯০৮ সালে 'মর্লিমিণ্টো শাসন সংস্কারে'র প্রবর্তনকালে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া মুসলমান সম্প্রদায় এই প্রথা অবলম্বনের চেষ্টা করিয়াছেন। সম্প্রতি এই ভাবের নির্বাচন-প্রথা যাহারা চায় নাই, তাহাদিগকে উহা দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় খ্রীস্টান সম্প্রদায় নির্বাচন চায় নাই কিন্তু তাহাদিগকেও দেওয়া হইয়াছে। আপনারা চান গণতন্ত্রমূলক গভর্নমেণ্ট ...কিন্তু যদি পৃথক নির্বাচন-প্রথা দ্বারা জনসাধারণ বিভক্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলে কি ফল হইবে? আপনারা দেখিতে পাইবেন—সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দ্বেষ ও বিবাদ। 'সাইমন কমিশন' হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বড় বড় রাজনীতিজ্ঞ বলিয়াছেন না যে, পৃথক নির্বাচন-প্রথা গণতন্ত্রমূলক গভর্নমেণ্টের মূলনীতির বিপরীত।"

তিনি বলেন যে, ভারতের জনমত যুক্ত-নির্বাচনের পক্ষে। ১৯১৯ সাল থেকে কংগ্রেস পৃথক নির্বাচন-প্রথার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করিয়া আসিতেছিল। এই নীতিতে অবিচল থাকিবার আহ্বান জানাইয়া তিনি পরিশেষে বলেন :

"জাতীয় দলের উদ্দেশ্য হইতেছে বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজ—পূর্ণ স্বাধীনতালাভ।···পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত কিছুই আমাদের গ্রহণীয় নহে। ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য এবং এই জন্যই আমরা চাই কংগ্রেস তাহার অতীত নীতি অনুযায়ী কাজ করুক।"··· [ঐ : পৃঃ. ১৯-২০]

রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিতে কখনও দ্বিধা করেন নাই। তবে তিনি ঠিক এই ধরনের দলীয় রাজনীতিতে আপনাকে সংযুক্ত রাখিতে চাহিতেন না। অবশ্য তিনি এর প্রায় বছরখানেক পর (জুলাই, ১৯৩৬) সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-বিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। যথাস্থানে আমরা এ আলোচনায় আসিব।

এই সময় কবি ভিয়েনা থেকে সুভাষচন্দ্রের একটি পত্র পান। স্মরণ রাখা দরকার সুভাষচন্দ্র তাঁহার অসুখের চিকিৎসার জন্য ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে ভিয়েনাতে যান। উহার কিছুকাল পরে তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত *'The Indian Struggle'* গ্রন্থটি রচনা শুরু করেন। গ্রন্থ রচনা শেষ হইবার মুখে তিনি ভিয়েনা থেকে কবিকে এই মর্মে অনুরোধ জানান যে, তিনি যেন তাঁহার ঐ গ্রন্থের পূর্বভাষণ লিখিবার জন্য বার্নার্ড শ' কিংবা এইচ. জি. ওয়েলস্‌কে অনুরোধ জানাইয়া একটি পত্র দেন ; সুভাষচন্দ্র তাঁহার পত্রের এক জায়গায় লিখেন (৩রা আগস্ট, ১৯৩৪) :

"Bernard Shaw ব্যতীত আর একজনের কাছ থেকে Foreword পাইলেও কাজ হইতে পারে—H. G. Wells। Rolland মহাশয়ের কথাও আমার মনে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি প্রচণ্ড রকমের 'গান্ধীভক্ত', অথচ আমি তাহা নহি এবং তাঁহাকে সে কথা জানাইয়াছি। সুতরাং Rolland মহাশয় যে আমার পুস্তকের সূচনা লিখিতে রাজি হইবেন সে আশা আমি করিতে পারি না। Bernard Shaw বা Wells মহাশয় মহাত্মাজী সম্বন্ধে উচ্চধারণা পোষণ করেন কিন্তু তাঁহার অন্ধ ভক্ত নন—সুতরাং তাঁহারা হয় তো রাজি হইতে পারেন। আপনার কথাও আমার মনে হইয়াছিল, কিন্তু আমি জানি না আপনি রাজনীতিবিষয়ক পুস্তকের জন্য কিছু লিখিতে ইচ্ছুক হইবেন কিনা। তদ্ব্যতীত, আপনি নিজে সম্প্রতি মহাত্মাজীর অন্ধভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন—অন্ততপক্ষে আপনার লেখা পাঠ করিলে সেরূপ ধারণা মানুষ স্বভাবত পোষণ করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় মহাত্মাজীর সমালোচনা আপনি বরদাস্ত করিতে পারিবেন কিনা আমি জানি না।···"

কবি বার্নার্ড শ'কে ভালোরকমেই জানিতেন। তাছাড়া সুভাষচন্দ্রের পত্রে গান্ধীজী সম্পর্কে তাঁহার ধারণায় এমন কিছু ইঙ্গিত আছে যাহা পাঠ করিয়া কবি কিছুটা আহত হ'ন। অনেক চিন্তার পর কবি সুভাষচন্দ্রকে তাঁহার এই অনুরোধ রক্ষার ব্যাপারে তাঁহার অক্ষমতার কথা জানাইয়া জবাব দিয়াছিলেন। কবির পত্রটি ছিল এই :

স্নেহভাজনেষু,

Bernard Shaw-কে আমি ভালোমতো জানি ; তোমার বইয়ের পূর্বভাষণ লেখবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতে আমি সাহস করিনে। করলেও ফল হবে না এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তোমার পাণ্ডুলিপিখানির

এক কপি তুমি নিজেই তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেখতে পার। এতদিনে সংবাদপত্রযোগে নিশ্চয় তিনি তোমার পরিচয় পেয়েছেন।

এই উপলক্ষে একটা কথা তোমাকে বলা আবশ্যক বোধ করি। মহাত্মা গান্ধী অতি অল্পকালের মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষের মনকে এক যুগ থেকে আর এক যুগে নিয়ে যেতে পেরেচেন। কেবল একদল রাষ্ট্রনৈতিকের নয় সমস্ত জনসাধারণের মনকে তিনি বিচলিত করতে পেরেচেন—আজ পর্যন্ত আর কেউ তা পারে নি। এর পূর্বে ভারতবর্ষের এখানে ওখানে ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে দুর্বলরকমের রাষ্ট্রনৈতিক সুড়সুড়ি লেগেছিল মাত্র। মহাত্মাজির চরিত্রের মধ্যে এই একটা প্রবল নৈতিকশক্তিকে ভক্তি যদি না করতে পারি তবে সেইটেকেই বলব অন্ধতা। অথচ তাঁর সঙ্গে আমার স্বভাবের বুদ্ধির ও সংকল্পের বৈপরীত্য অত্যন্ত প্রবল। মনের দিকে কল্পনার দিকে ব্যবহারের দিকে তিনি আর আমি সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর জীব। কোনো কোনো বিষয়ে তিনি দেশের ক্ষতি করেছেন—কিন্তু দেশের নির্জীব চিত্তে হঠাৎ যে বল এনে দিয়েচেন একদিন সেটা সমস্ত ক্ষতিকে উত্তীর্ণ হয়ে টিঁকে থাকবে। আমরা কেউই সমস্ত দেশকে এই প্রাণশক্তি দিই নি। ইতি ১৭ই আগস্ট ১৯৩৪

শান্তিনিকেতন

তোমাদের

স্বাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান্ধীজীর কোন্ মূর্তিটিকে কবি বেশি শ্রদ্ধা করিতেন এই পত্রটিতে তাহার কিছু পরিচয় মেলে। বহুবিষয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁহার মতপার্থক্য সত্ত্বেও গান্ধীজীর মহত্ত্ব ও দেশের রাজনীতিক চেতনায় তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে কবি চিরদিনই সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকৃতি জানাইয়াছেন। এই পত্রে সুভাষচন্দ্রের প্রতি যে মৃদু তিরস্কারের সুর ফুটিয়া উঠে নাই, তাহা নয়। কিন্তু সুভাষচন্দ্র ভারতের রাজ-নীতিক ক্ষেত্রে গান্ধীজীর এই অবদানকে অস্বীকার করেন নাই। তিনি তাঁহার ঐ গ্রন্থে প্রধানত গান্ধীজীর রাজনীতির বাস্তব সার্থকতা সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়াছিলেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য, ইহার অল্প কয়েকদিন পূর্বে গান্ধীজী কংগ্রেসকর্মীদের অন্তরশুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এক সপ্তাহের জন্য অনশন করেন (৬-১৩ই আগস্ট, ১৯৩৪)। এই সংবাদ পাইয়া কবি শান্তিনিকেতন থেকে গান্ধীজীকে এক তারবার্তায় প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, দেশের এখনও তাঁহাকে খুবই প্রয়োজন আছে (১০ই আগস্ট)। ১৭ই আগস্ট গান্ধীজীও তাঁহার অনশন ভঙ্গের ও শারীরিক কুশল জানাইয়া কবিকে তার করেন।

এই সময় শান্তিনিকেতনে একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের সূচনা হয়। এবং সেটি হইতেছে যে, এই সময়েই শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ও অধ্যাপক তান য়ুন-সান্-এর উদ্যোগে 'চীন-ভারত সাংস্কৃতিক সমিতি' গঠিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের চীন-ভ্রমণের ফলে সেখানে কিছু আদর্শবাদী যুবক কবির বক্তৃতায় ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারত-চীন সাংস্কৃতিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের সংকল্পে ব্রতী

ও উদ্যোগী হন। কয়েক বৎসর পর—১৯২৮ সালেই, অধ্যাপক তান য়ুন-সান্ কবির আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনে আসেন। তিনি শান্তিনিকেতনে কয়েক বৎসর থাকিয়া ইংরেজী ভাষা ও ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে অনুশীলন-চর্চা করিয়া ১৯৩১ সালে দেশে ফিরিয়া যান। ১৯৩৩ সালে প্রধানত তাঁহারই উদ্যোগে নানকিং শহরে 'চীন-ভারত সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ' গঠিত হয়। ১৯৩৪ সালের প্রথম ভাগেই চীনের জাতীয় সরকারের পক্ষে তাই চুয়ান-হেসিয়েন্ (Tai Chuan-Hesien-President of the examination Yuan,) চীন-ভারত সাংস্কৃতিক সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতীতে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণের প্রস্তাব দিলে কবি তাহাতে সানন্দে সম্মতি দেন। তদনুসারে ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে অধ্যাপক তান্ তাঁহার অন্যতম সহযোগী বন্ধু অধ্যাপক চেন্ ইউ-সেন্‌কে সঙ্গে লইয়া পুনরায় শান্তিনিকেতনে আসেন। তাঁহারা কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া 'চীন-ভারত সাংস্কৃতিক সমিতি' গঠনের প্রস্তাব লইয়া দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করেন। বলাবাহুল্য, কবি দীর্ঘকাল থেকেই ইহার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। স্মরণ রাখা দরকার, ১৯২১ সাল থেকে বিশ্বভারতীতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন চর্চা শুরু হয় এবং অধ্যাপক সিলভ্যাঁ, লেভি ও অধ্যাপক তুচ্চি (G. Tucci) প্রমুখ প্রখ্যাত মনীষী এই বিষয়ে সেখানে অধ্যাপনা করেন। তাই চীনা অধ্যাপকদ্বয়ের ঐ প্রস্তাবে কবি তৎক্ষণাৎ সানন্দে সম্মতি দেন। কয়েকদিন পর 'চীন-ভারত সাংস্কৃতিক সমিতি' (Sino-Indian Cultural Society) গঠনের উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতনে দুটি আলোচনা-সভা হয় (১৯শে ও ২৬শে আগস্ট, ১৯৩৪)। কবি স্বয়ং উহাতে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় এই সমিতির কর্মকেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশে প্রাথমিক কার্যসূচী হিসাবে শান্তিনিকেতনে একটি চীনা ভবন বা অট্টালিকা নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। চীনা অধ্যাপকদ্বয় অবশ্য উহার ব্যয়ভার বহনের জন্য চীনদেশ থেকে অর্থ-সংগ্রহের আশ্বাস দেন। এই মহান সংকল্পের বাস্তব রূপায়ণে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করিবার জন্য কবি তাঁহার চীন দেশীয় বুদ্ধিজীবী-বন্ধুদের উদ্দেশে এক আবেদন জানান। এই আবদনে ভারত-চীন প্রাচীন সাংস্কৃতিক সম্পর্কের মহান ঐতিহ্যের তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করিয়া কবি অবশেষে বলিলেন :

"It gives me great pleasure to hail you as co-workers for the cause with which I have identified myself all my life, and I am proud to offer our Santiniketan as the centre for the activities of a Sino-Indian Cultural Society which will embody the cause for which we are striving.

"It will take some time to build up this great society, which should insure a continual interflow of cultures ; but we would be wise to make a beginning immediately in the form of erecting here a hall called the Chinese Hall, where students and scholars from China could stay and co-operate with us. That Hall will serve as a foundation on which to build our higher hope.

"I appeal to my friends in China to help in the working out of this plan, with both their sympathy and their funds."

[*The Christian Science Monitor* : 28th September, 1934]

স্থির হয়, কবির এই আবেদন-বাণী লইয়া তাঁহারা কলিকাতা হইতে অক্টোবরের প্রথমভাগেই চীন দেশে রওনা হইবেন। বিশ্বভারতীর কর্মসচিব রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক তান য়ুন-সান্ ও অধ্যাপক চেন ইউ-সেনকে চীনে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে এক প্রীতিভোজে সংবর্ধিত করেন (২৪শে সেপ্টেম্বর)। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ভারত-চীন সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের কাজে তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রশংসা করিয়া তাঁহাদের শুভযাত্রা কামনা করেন।

আগস্ট মাসের শেষভাগে গভর্নমেণ্ট খান আবদুল গফ্ফর খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতা ডাঃ খান্ সাহেবকে মুক্তি দেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের উপর এই মর্মে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়, তাঁহারা সীমান্ত প্রদেশে ও পাঞ্জাবে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

মুক্তির পর খাঁ সাহেব শান্তিনিকেতনে আসেন (৩১শে আগস্ট, ১৯৩৪)। খাঁ সাহেবের পুত্র আবদুল গনি খাঁ তখন কলাভবনের ছাত্র ছিলেন। ঐদিনই অপরাহ্ণে তিনি শ্রীনিকেতন পরিদর্শন করিতে যান। সেখানে পরিদর্শনকালে শিক্ষাসত্রের প্রতিটি বালককে বুকের কাছে টানিয়া আদর করিয়া আবেগভরে বলিয়া উঠেন,—'সাঁওতাল, ব্রাহ্মণ ও মুসলমানের মধ্যে তফাত কোথায় ? মানুষ যে মানুষকে কেন তফাৎ ভাবে আমি তাহা বুঝিতে পারি না। হিন্দুস্থানের সকলেই গোলাম, তবে আর জাতের বড়াই কেন ?'

শ্রীনিকেতনের কার্যাবলী পরিদর্শনের পর সমবেত ছাত্র ও কর্মীদের আহ্বান করিয়া তিনি বলেন যে, শ্রীনিকেতনে যে কাজ হইতেছে, এই কাজ সবচেয়ে বড় কাজ। তিনি গভীর আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন, 'উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আমার এই ধরনের কাজ করিবার খুবই ইচ্ছা ছিল। সেই প্রদেশের যুবকদের লইয়া যে 'খোদাই খিদ্‌মদ্গার' দল গঠন করিয়াছিলাম তাহার সেবা-কার্যই ছিল মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু 'লাল কোর্তা'র বদনাম দিয়া সব কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা বিপ্লবী নহে—দুনিয়ায় খোদার সেবাই তাহাদের প্রধান আদর্শ।'

উহার একদিন পর খান সাহেব শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় লইয়া যান। বিদায়ের প্রাক্‌কালে এক সভায় কবি স্বয়ং তাঁহাকে বিদায়-সংবর্ধনা জানাইলেন। এই বিদায়-সংবর্ধনার ভাষণটি মূলত ইংরেজীতেই লিখিত হইয়াছিল, সভায় পাঠ করিবার সময় কবি উহার উর্দু তর্জমাটি পাঠ করেন। কবি বলেন :

"We have you here with us only for a short period but we will not measure the worth of the event by the standard of time. Those really great, whose hearts are for all, who belong to all the lands of the world, transcened also the bounds of movements ; they are for all time. Believe me, the memory of this short visit of yours to the Ashrama will ever remain fresh in our hearts.

"Truth is the very foundation of your life, and I am sure that you radiate its influence all arround you. We have realised this too, that all our efforts are everyday being frustrated for lack of this devotion to truth. You have come to this land whose unhappy being is shattered into fragments, in order to fulfil the purpose of Providence to save her from the poison of fratricidal hatred with which she is drugging herself to self-destruction. I have not the slightest doubts that you have been able to stimulate the hearts of our folk here with some of that great force of character which is your own. Pray accept the grateful homage of all of us. This is our earnest prayer that you be long spared to help this land sick into death towards vigorous health and truth."—U P. [*Advance* : 5th September, 1934]

'সীমান্ত গান্ধী'র প্রতি কবি যে কতখানি শ্রদ্ধাভাব পোষণ করিতেন তাহা তাঁহার এই বিদায়-সম্ভাষণের মধ্যেই অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

গিলবার্ট মারে ও রবীন্দ্রনাথ

১৯৩৪ সালে আগস্ট মাসের শেষভাগে কবি অক্সফোর্ডের খ্যাতনামা অধ্যাপক, গিলবার্ট মারে'র (Gilbert Murray) নিকট হইতে একটি পত্র পান। অধ্যাপক মারে গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যে শুধু একজন সুপণ্ডিতই ছিলেন না ;—পৃথিবীর সেই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় যে-কয়জন বিবেকী ও মননশীল বুদ্ধিজীবী জাতিতে-জাতিতে যুদ্ধ-সংঘর্ষের অবসান ঘটাইয়া আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্র-স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের সহিত অধ্যাপক মারে'র দীর্ঘকালের সৌহার্দ ছিল এবং তিনি কবির একজন সত্যকারের গুণগ্রাহী বন্ধু ছিলেন।

অধ্যাপক মারে অক্সফোর্ড থেকে রবীন্দ্রনাথকে পত্রটি লিখেন ১৭ই আগস্ট (১৯৩৪)। এই পত্র পাওয়ার কিছুদিন পর কবি অধ্যাপক মারেকে উহার জবাবে এক দীর্ঘ পত্র দেন (১৬ই সেপ্টেম্বর)। তাঁহাদের এই পত্র-বিনিময় পরে লীগ-অব-নেশনস্-এর সহিত সংশ্লিষ্ট 'International Institute of Intellectual Co-operation-'এর উদ্যোগে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত (*An International Series of Open Letters*-No. 4) হয়।

অধ্যাপক মারে তাঁহার পত্রে বিশ্বের রাজনীতিক অশান্তি, অস্ত্রে অস্ত্রে হানাহানি ও জাতিতে-জাতিতে বিরোধ-সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, পৃথিবীর এই দুঃসময়ে বাঁচিতে হইলে এবং মানব সভ্যতাকে এক উন্নততর ও মহত্তর ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে হইলে পৃথিবীর সমস্ত দেশ ও জাতির মধ্যে সৌভ্রাত্র ও সৌহার্দ

স্থাপন করিতে হইবে আর এই কাজে বিশ্বের সকল দেশের মননশীল বুদ্ধিজীবীদের অগ্রণী হইয়া উহার দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন।

এই প্রসঙ্গে আধুনিক সভ্যতা সম্পর্কে তিনি রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার ধারণা পরিষ্কার করিয়া লিখিবার অনুরোধ জানান। কেননা রবীন্দ্রনাথের *La Machine* ('মুক্তধারা' ফরাসী তর্জমা) নাটকখানি পাঠ করিবার পর তাঁহার ধারণা হয় যে, কবি বুঝি আধুনিক বিজ্ঞান ও যন্ত্র-সভ্যতার বিরোধী। এই সম্পর্কে তিনি তাঁহার নিজের ধারণা পরিষ্কার ব্যক্ত করিয়া লিখিলেন যে, আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতা যুদ্ধ রক্তপাত অত্যাচার হিংস্রতা ও নিবুদ্ধিতা প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইলেও এই সভ্যতার অন্তর্নিহিত মহৎ শক্তির 'পরে তিনি আস্থা হারাইতে পারেন নাই। কেননা তাঁহার বিশ্বাস যে, এই সভ্যতাই মানুষের মহত্তর বিবেকবুদ্ধি ও নৈতিকশক্তির জন্ম দিয়াছে এবং মানুষের মনে যুদ্ধ ও ঐসব বর্বরোচিত নৃশংসতার বিরুদ্ধে অপরাধবোধ এবং তীব্র ঘৃণার উদ্রেক করিয়াছে। তাই তিনি বলিলেন :

"I even believe in the healthiness and high moral quality of our poor distressed civilization. It made the most ghastly war in history, but it hated itself for doing so. As a result of the war it is now full of oppressions, cruelties, stupidities and public delusions of a kind which were thought to be obsolete and for ever discarded a century ago. But I doubt if ever before there was what theologians would call such a general sense of sin, such wide-spread consciousness of the folly and wickedness in which most nations and governments are involved or such a determined effort, in spite of failure after failure, to get rid at last of war and the fear of war and all the baseness and savagery which that fear engenders. I still have hope for the future of this tortured and criminal generation ; perhaps you have lost hope and perhaps you will prove right."···

পরিশেষে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক ও মননশীল ব্যক্তিদের লইয়া একটি 'League of Thought' বা মনীষীদের সংঘ গঠন করিবার প্রয়োজনীয়তাটি ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন :

···"The artists and thinkers, the people whose work or whose words move multitudes, ought to know one another, to understand one another, to work together at the formation of some great League of Mind or Thought independent of miserable frontiers and tariffs and governmental follies, a League or Society of those who live the life of the intellect and through the diverse channels of art and science aim at the attainment of beauty, truth and human brotherhood."

এই পত্রের জবাবে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক মারে'র ঐ মহান প্রচেষ্টার প্রতি সম্পূর্ণ

সমর্থন ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। কবি প্রথমেই স্বীকার করেন যে, যদিও বর্তমান জাতি-বৈরীগত এই জটিল সমস্যার সমাধানের কোনো পরিষ্কার পথ তিনি দেখিতে পাইতেছেন না, তথাপি আধুনিক সভ্যতার অন্তর্নিহিত আত্মিক ও নৈতিক শক্তির 'পরে তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা আছে এবং এই বিষয়ে তিনি অধ্যাপক মারে'র দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত সম্পূর্ণ একমত। তিনি বলেন :

"I must confess at once that I do not see any solution of the intricate evils of disharmonious relationship between nations, nor can I point out any path which may lead us immediately to the levels of sanity. Like yourself, I find much that is deeply distressing in modern conditions, and I am in complete agreement with you again in believing that at no other period of history has mankind as a whole been more alive to the need of human co-operation, more conscious of the ineviteble and inescapable moral links which hold together the fabric of human civilization. I cannot afford to lose my faith in this inner spirit of Man, nor in the sureness of human progress which following the upward path of struggle and travail is constantly achieving, through cyclic darkness and doubt, its ever widening ranges of fulfilment."...

তিনি আরও লিখিলেন যে, সত্যকার আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সৌভ্রাত্রের ভিত্তিতেই বিশ্বভারতীতে সেই সর্বজনীন মনুষ্যত্বচর্চার সাধনায় ঐকান্তিক ইচ্ছা নিয়ে আপনাকে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন।

কবি স্পষ্টই বুঝিতে পারেন, বিজ্ঞান ও যন্ত্র সম্পর্কে তাঁহার চিন্তা ও দৃষ্টি-ভঙ্গীর যথার্থ খবর অধ্যাপক মারে পান নাই। তাই তিনি অধ্যাপক মারে'র সেই ভ্রান্তি অপনোদন করিতে গিয়া লিখিলেন :

"My occasional misgivings about the modern pursuit of Science is directed not against Science, for Science itself can be neither good nor evil, but its wrong use. If I may just touch here on your reference to machines, I would say that machines should not be allowed to machanize human life but contribute to its wellbeing, which as you rightly point out, it is constantly doing when it is man's sanity which controls the use of machinery."

এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার কয়েক বৎসর পূর্বে রচিত 'Asia and Europe' নামক নিবন্ধটি (১৯২৯) থেকে উদ্ধৃতি দিয়া যন্ত্র ও বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁহার মতামতটি পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু কবি অধ্যাপক মারে'কে একটি কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ও দৃঢ়তার সঙ্গে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, আজিকার দিনে এই আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্র স্থাপনের পথে প্রধানতম বাধা এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের রাজনীতিক ও আর্থনীতিক শোষণ-শাসনের

সম্পর্ক। রাজনীতিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ইউরোপ তাহার অপরিসীম বিবেকবুদ্ধিহীন নিষ্ঠুরতা দ্বারা পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন নামে ও রূপে দাসত্বেরই জাল বিস্তার করিয়াছে। অবশ্য এই একই ইউরোপে তাহার এইসব 'পাপাচার' ও অপরাধের বিরুদ্ধে সর্বদাই প্রতিবাদ সোচ্চার হইয়া রহিয়াছে ;—সেখানে তাহাদেরই কৃত অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে আত্মাহুতি দিতে শহীদের অভাব হয় না। অবশ্য তাঁহার মতে এইসব ব্যক্তিত্বশালী পুরুষদের কোনো দেশের বা জাতির পরিচয়ে অভিহিত করা উচিত নয়। কিন্তু তবুও এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের এই বলপ্রয়োগ জনিত শাসন-শোষণের সম্পর্কটাই অত্যন্ত প্রকট হইয়া রহিয়াছে এবং এই উভয় মহাদেশের মিলনের পথে এই প্রধানতম বাধাটির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া অধ্যাপক মারে'কে কবি লিখিলেন :

"Unfortunately for us, however, the one outstanding visible relationship of Europe with Asia to-day is that of exploitation ; in other words, its origins are commercial and material. It is physical strength that is most apparent to us in Europe's enormous dominion and commerce, illimitable in its extent and immeasurable in its appetite. Our spirit sickens at it. Everywhere we come against barriers in the way of direct human kinship. The harshness of these external contacts is galling, and therefore the feeling of unrest ever grows more oppressive. There is no people in the whole of Asia to-day which does not look upon Europe with fear and suspicion."

কিন্তু এই পত্রে একটি জিনিস লক্ষ্য না করিয়া পারা যায় না এবং সেটি হইতেছে এই যে, কবি যদিও এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাটির প্রতি যথোচিত গুরুত্ব-সহকারে অঙ্গুলিনির্দেশ করিতেছিলেন তথাপি ইহার কোনো রাজনীতিক সমাধানের উপর তাঁহার বিশেষ একটা আস্থা ছিল না কিংবা উহাতে তেমন গুরুত্ব দিতেন না। বস্তুত কবি মানুষের আধ্যাত্মিক ঐক্যের এবং নৈতিক স্বাধীনতালাভের আদর্শেই অধিক গুরুত্ব দিতেছিলেন এবং সেই কথাই তিনি তাঁহার পত্রে অধ্যাপক মারে'কে লিখিয়া জানাইলেন :

"To me the mere political necessity is unimportant ; it is for the sake of our humanity, for the full growth of our soul, that we must turn our mind towards the ideal of the spiritual unity of man. We must use our social strength, not to guard ourselves against the touch of others, considering it as contamination, but generously to extend hospitality to the world, taking all its risks however numerous and grave. We must manfully accept the responsibility of moral freedom which disdains to barricade itself within dead formulate of external regulation, timidly seeking its security in utter stagnation. Men who live in dread of the spirit of enquiry and lack courage to launch out

in the adventure of truth, can never achieve freedom in any department of life."...

বলা বাহুল্য, মানুষের এই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সংগ্রামের জন্য কবি মননশীল বুদ্ধিজীবীদের 'পরেই অধিক আস্থা রাখিতেন। যুদ্ধোত্তর যুগে তিনি ইউরোপের বেশ কিছু বিবেকী বুদ্ধিজীবীর এই নবজাগরণ প্রত্যক্ষ করিতেছেন,—এই কথাই তাঁহার পত্রে উল্লেখ করিয়া তিনি আনন্দ ও হর্ষ প্রকাশ করিলেন। ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বেও যে এক মহাজাগরণের সূচনা হইয়াছে, কবি সেকথাও তাহার পত্রে উল্লেখ করিলেন। পৃথিবীর দেশে দেশে বেশ কিছু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ যে আজ অন্যায় ও অবিচারের প্রতিরোধ সংগ্রামে দুর্জয় সংকল্প লইয়া আগাইয়া আসিয়াছেন, কবি তাঁহাদের উদ্দেশে তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তাঁহার পত্রের উপসংহারে বলিলেন :

..."To these individuals of every land and race, these youthful spirits burning like clean flame on the altar of humanity, I offer my obeisance from the sunset-crested end of my end.

"I feel proud that I have been born in this great Age. I know that it must take time before we can adjust our minds to a condition which is not only new, but almost exactly the opposite of the old. Let us announce to the world that the light of the morning has come, not for entrenching ourselves behind barriers, but for meeting in mutual understanding and trust on the common field of co-operation; never for nourishing a spirit of rejection, but for that glad acceptance which constantly carries in itself the giving out of the best that we have."

গিলবার্ট মারে'র ঐ পত্রটি প্রায় ১৫ বৎসর পূর্বে কবিকে লিখিত রোমাঁ রোলাঁর একটি পত্রের (১৯১৯) কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রোলাঁ সেদিন 'চিন্তার স্বাধীনতা আন্দোলনে'র সূচনা করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিবেকী ও মননশীল বুদ্ধিজীবীদের এই আন্দোলনে সংগঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই এই আন্দোলনের ব্যর্থতার মধ্যে রোলাঁর যে কী শোচনীয় অভিজ্ঞতা জন্মে পূর্বেই আমরা তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এই অভিজ্ঞতার মধ্যে রোলাঁ স্পষ্টই উপলব্ধি করেন যে, বুদ্ধিজীবীদের স্বতন্ত্র সংগ্রামী ভূমিকাটিকে তিনি যত বড়ো ও মহিমান্বিত ভাবিয়াছিলেন কার্যক্ষেত্রে দেখিলেন উহা ঠিক তাহা নহে;—বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীদের সংগ্রামের ঐক্য ও সংহতি সাধন করিতে পারিলে তবেই তাহা কার্যকরী ও ফলপ্রসূ হইতে পারে। তবেই প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের যুদ্ধের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিয়া তা স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু রোলাঁ এই আন্দোলনকে আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্তরেই সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহেন নাই,—বস্তুত রাজনীতিক ও আর্থনীতিক শ্রেণী-সংগ্রামকেও তিনি ইহার সহিত সংযুক্ত ও সংহত করিয়া প্রগতিশীল

শক্তির শিবিরকে শক্তিশালী ও মজবুত করিতে চাহিতেছিলেন। এই কারণেই তিনি ও বারবুস্ সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ও ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীদের দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী ফ্রন্ট (United Front) গঠনের আবেদন জানাইতেছিলেন। বলা বাহুল্য, গিলবার্ট মারে ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ও মানসে সংগ্রামের ঠিক এই চিত্রটি ছিল না। বস্তুত বুদ্ধিজীবীদের এই সংগ্রামকে তাঁহারা আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্তরেই যেন কতকটা সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহিতেছিলেন।

সমসাময়িক একটি বাংলা দৈনিক পত্রে (১লা নভেম্বর, ১৯৩৪) গিলবার্ট মারে ও রবীন্দ্রনাথের এই পত্রবিনিময়ের সমালোচনা করিয়া মন্তব্য করা হয়:

…'কিন্তু রাজনীতি ও অর্থনীতির নিকট ইউরোপের এই শক্তি কি আত্মবিক্রয় করে নাই এবং ইহার ফলে কি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে অনতিক্রমনীয় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে নাই? কেবল আন্তর্জাতিক মিলন, বিশ্বব্যাপী সৌভ্রাত্র এবং মনীষার সহযোগিতাপূর্ণ বার্তার দ্বারা এই বিষম বিচ্ছেদ দূর হইবে—এমন বাণী আমরা মানিয়া লইতে পারিতেছি না। কারণ এই বিচ্ছেদ রাষ্ট্রগত—প্রতিভাসম্পন্ন কয়েকজন মুষ্টিমেয় দার্শনিকের বিচ্ছেদ ইহা নহে। ইহা এক দেশের আর্থিক ও রাষ্ট্রিক শক্তিসম্পন্ন মনুষ্যদল কর্তৃক অপর দেশের মানবসাধারণের উপর সঙ্ঘবদ্ধ শোষণ—শুধু অপর দেশের কেন, তাঁহাদের স্বদেশের জনসাধারণেরও বটে।

'গিলবার্ট মারে ও রবীন্দ্রনাথ, উভয়েই ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষ…তাঁহাদের সাহিত্য, মনস্বিতা ও চিন্তা যে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহার মধ্যে রোমাণ্টিক আদর্শবাদেরই প্রাবল্য—সুতরাং তাঁহাদের বেদনা ভাবের বেদনা, অভাবের বেদনা নহে।…ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবনযাত্রায় যে ধনতান্ত্রিক আদর্শ মানুষের অলক্ষিতে আশ্চর্য মোহ বিস্তার করিয়াছে, তাহা হইতে রবীন্দ্রনাথ বা গিলবার্ট মারে নিস্তার পান নাই। তাঁহারা বর্তমান পৃথিবীর মুক্তিকে সেই আদর্শ-সঞ্জাত রোমাণ্টিক জীবনের মধ্যেই সন্ধান করিতেছেন কিম্বা আত্মিক মুক্তির নাম করিয়া কেবলমাত্র মননশীলতার মধ্যে মানুষকে আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু মানুষের সমস্যা ইহা নহে,—আদর্শের অভাবও নহে, এমন কি আন্তর্জাতিকতার সৌভ্রাত্রপূর্ণ বাণীও নহে—আজিকার দিনের প্রধান সমস্যা প্রত্যেক মানুষের বাঁচিবার অধিকার, তাহার দাবী অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক পীড়ন হইতে মুক্তির দাবী।'

['রবীন্দ্র-সদন'-এ সংরক্ষিত তথ্যভাণ্ডার থেকে]

এই সমালোচনার মধ্যে কিছু অসতর্ক ও বিক্ষিপ্ত মন্তব্য আছে যাহা লইয়া তর্ক উঠিতে পারে বিশেষত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের আধুনিক সমাজতান্ত্রিক বা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনীতির তাৎপর্যটি ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন তাহা নয়, তবে পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, বর্ণ-বিদ্বেষ এবং যুদ্ধ ও উগ্র-জাতীয়তাবাদের—এক কথায় প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে যখনই যাঁহারাই সংগ্রামের ডাক দিয়াছেন কবি তৎক্ষণাৎ তাহাতে সাড়া দিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত সমর্থন জানাইয়াছেন। রোলাঁ ও বারবুসের সোভিয়েট রাশিয়া-প্রীতি এবং কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা কবি ভালোভাবেই জানিতেন

এবং সে-কথা জানিয়াই বার বার তিনি তাঁহাদের সংগ্রামের আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলেন।

যাহাই হোক, এইসব সত্ত্বেও সে-যুগে বিবেকী মননশীলদের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

উল্লেখযোগ্য, এই একই সময়ে লণ্ডনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিবেকী বৈজ্ঞানিকদের একটি সম্মেলনের কথা হয় (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪)। এই উদ্দেশ্যে কিছুদিন পূর্বে তাঁহারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকদের উদ্দেশে এক আবেদন প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সময় জার্মানীতে বৈজ্ঞানিকদের উপর যে নির্যাতন চলিতেছিল এবং ফ্যাসিস্ট ও সাম্রাজ্যবাদীরা বিজ্ঞানকে যুদ্ধের মারণাস্ত্র নির্মাণের কাজে নিয়োগ করিবার জন্য যে-চাপ সৃষ্টি করিতেছিল, এই আবেদনে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলা হয় যে, শত চাপ সৃষ্টি করিলেও তাঁহারা বিজ্ঞানকে যুদ্ধের বা ধ্বংসকার্যের ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত করিতে সম্মত হইবেন না। এই আবেদনের একটি কপি তাঁহারা ভারতবর্ষে *Modern Review*-এর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই আবেদনে বিশ্বের তৎকালীন যে-কয়জন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন—Sir Basil Blackett, Harold. J. Laski, J. B. S. Haldane, Hyman Levy, Julian Huxley, Baron Earnest Ruttherford, Albert Langier, Paul Langevin, Paul Rivet, Jean Perrin, Lucien Levy-Bruhl, Marcel Prenant, Henri Wallon. Joseph Hect ইত্যাদি আরও অনেকে।

তাঁহাদের ঐ আবেদনপত্রের অংশ-বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হইল :

"Sir, with increasing concern we have observed that, as a result of the political development in many countries, the freedom of science has been threatened or entirely destroyed.…

"We have verified the fact that in various countries science is subordinated almost entirely to the need of war industry and to the propagation of a chauvinistic ideology.…

"We know that in Fascist countries many highly respected scholars have been driven from the scene of their activity or have voluntarily quitted their homes, because they refused to sacrifice their learning to the violent demands of the totalitarian state…In that country the exact sciences have been openly degraded to jobbing for war industries."…

"Through misuses of and contempt for free research there is imminent danger that the whole structure of scientific knowledge will be destroyed and from the fragments a new series of enslaved pseudo-scientists will be erected, which will be harmful for the progress of mankind.

"Because of this condition of affairs we believe that the moment has come to summon all scholars and scientists of all countries and to lay it upon them as a duty to look beyond the limits of their specialities and to recognise the common danger. Let them join with us in maintenance and protection of free science as one of the most essential elements of international culture and peaceful co-operation." [*Modern Review* : October, 1934 ; pp. 472-73]

বলা বাহুল্য, বৈজ্ঞানিকদের এই আন্দোলন অল্পকালের মধ্যেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। হিটলার ও মুসোলিনী 'লীগ অব নেশনস্' কিংবা Disarmament Conference-এর কোনোরূপ তোয়াক্কা না রাখিয়াই পুরাদমে সমরাস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতা শুরু করিয়া দেয়।

গ্রামীণ শিল্পে ও আর্থনীতিক পুনর্গঠনে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ

এবার অনশন ভঙ্গের পর থেকেই গান্ধীজী ওয়ার্ধায় বিশ্রাম গ্রহণকালে গ্রামীণ আর্থনীতিক পুনর্গঠনের কথাই চিন্তা করিতেছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটিও কিছুদিন পূর্বে কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পগুলি সংগঠিত করার জন্য কংগ্রেস কর্মীদের নির্দেশ দেয়,—ইহার কথাও গান্ধীজী চিন্তা করিতেছিলেন। ফলে তাঁহার আর্থনীতিক চিন্তার ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তনও দেখা দেয়। গ্রামীণ আর্থনীতিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে গান্ধীজী এতকাল চরকা ও খাদি-শিল্পের উপরই প্রধানত গুরুত্ব দিয়াছিলেন ; বস্তুত অন্যান্য কুটিরশিল্পের সম্পর্কে তিনি তেমন গুরুত্ব দেন নাই এবং কদাচিৎ সে-সম্পর্কে তাঁহাকে চিন্তা বা মন্তব্য করিতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু এখন থেকে তিনি সমস্যাটিকে সামগ্রিকভাবে দেখিতে শুরু করিলেন। এই চিন্তার ফলে তিনি চরকা ও খাদির সঙ্গে সমস্ত গ্রামীণ কুটিরশিল্পগুলিকে পুনর্গঠিত করার জন্য সারা দেশব্যাপী এক আন্দোলন সৃষ্টি করিতে চাহিলেন। ১০ই আগস্ট 'হরিজন'-এ তিনি 'Cent Percent Swadeshi' শিরোনামায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সমস্যাটির বিস্তারিত সমালোচনা করিয়া এক জায়গায় লিখিলেন :

"We may profess to gratuitously help the textile, the sugar and rice mills and, respectively, kill the village spinning wheel, the hand-loom and their product, the khadi, the village cane-crusher and its product, the vitamin-laden and nourshing *gur* or the molasses, and the hand-pounder and its product, the unpolished rice. ···Our clear duty is, therefore, to investigate the possibility of keeping in existence the village spinning wheel, the village crusher and the village hand-pounder, and by advertising their products, discovering their

qualities, ascertaining the condition of the workers and the number displaced by the power-driven machinery and discovering the methods of improving them, whilst retaining all their village character, to enable them to stand the competition of the mills. How terribly and how caiminally we have neglected them ! And here, there is no antagonism to the textile or the sugar or the rice mills. Their products must be preferred to the corresponding foreign products. If they were in danger of extinction from the foreign competition, they should receive the needed suport. But they stand in no such need. They are flourishing in spite of foreign competition. What is needed is protection of the village crafts and the workers behind them from the crushing competition of the power-driven machinery, whether it is worked in India or in foreign lands, It may be that khadi, *gur* and the unpolished rice have no intrinsic quality and they should die. But, except for khaddar, not the slightest effort has yet been made, so far as I am aware, to know anything about the fate of the tens of thousands of villagers, who were earning their livelihood through crushing cane and pounding rice. Surely, there is in this work enough for an army of patriots. The reader will say 'but this is very difficult'. I admit. But it is most important and equally interesting. I claim that this is true, fruitful and cent per cent swadeshi."
[*Mahatma* : Vol. III, P. 287]

লক্ষ্য করিবার বিষয়, গান্ধীজী এখানে বিদ্যুৎ-চালিত মিল ও যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতার হাত থেকে তাঁত, ঢেঁকি, যাঁতা, ঘানি প্রভৃতি গ্রামের কুটির-শিল্পগুলিকে রক্ষা করার উপরই প্রধান গুরুত্ব দিলেন ; অথচ ধানকল, চিনিকল, কাপড়কল বা মিল-শিল্পগুলিরও ঠিক বিরোধিতা করিলেন না। গান্ধীজীর প্রধান বক্তব্য এই যে, গ্রামদেশের বিপুল দরিদ্র ও বেকার জনসাধারণকে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ও দৃঢ় আর্থনীতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই গ্রামীণ কুটিরশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলা দরকার। এই কাজে তিনি দেশের বিশেষজ্ঞ, রসায়নবিদ্‌ ও বৈজ্ঞানিকদের সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বান জানাইলেন।

বলাবাহুল্য, গান্ধীজীর এই চিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আর্থনীতিক-চিন্তার কয়েকটি জায়গায় বেশ কিছুটা মিল বা সাদৃশ্য দেখা যায়। স্মরণ রাখা দরকার, গান্ধীজীর বহু পূর্বেই,—বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের যুগ থেকেই কবি গ্রামের কুটিরশিল্পগুলিকে পুনর্গঠিত করার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি অবশ্য তকলি বা চরকা কাটাকে কোনো দিনই নীতিগত কারণে গ্রহণ করেন নাই পরন্তু সে-ক্ষেত্রে তিনি আধুনিক বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি প্রধানত কারুশিল্পের রক্ষা ও মানবিক কারণেই কুটিরশিল্পগুলিকে

রক্ষা করার প্রয়োজনটি অনুভব করিয়াছিলেন। তবে একথাও তিনি ভালোভাবেই উপলব্ধি করেন যে, আধুনিক যুগে পুরাতন কারীগরী পদ্ধতিতে কুটিরশিল্পগুলি চলিতে পারে না,—উহাকে আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরী-বিদ্যার সাহায্যে উন্নত ও সংস্কৃত করিয়া তুলিতে হইবে এবং সমবায় প্রথাই হইবে উহার প্রধান ভিত্তি। এই কারণে শ্রীনিকেতনে পল্লী পুনর্গঠন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইলে পর তিনি সমবায় নীতি ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এইসব কারুশিল্প ও কুটিরশিল্পগুলিকে একটা বেশ মজবুত ও শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। বস্তুত শ্রীনিকেতনের এই অভিনব প্রচেষ্টাগুলি দেখিয়া গান্ধীজী খুবই আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ হন। বিশেষত শ্রীনিকেতনের চর্ম-ট্যানিং শিল্প দেখিয়া যাইবার পর তিনি সবরমতী আশ্রমে উহা প্রবর্তন করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। গান্ধীজী স্বয়ং তাহার স্বীকৃতি দিয়া লিখিলেন :

…"The ·tanning chemists have to discover improved methods of tanning.…The only research that I know in thi, direction is being carried on in Santiniketan and then it was started at the now defunct ashram at Sabarmati. I have not been able to keep myself in touch with the progress of experiment at Santiniketan…"

[*Ibid* : P. 290]

সমবায়-সমিতি সম্পর্কে গান্ধীজী তখনও পর্যন্ত তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই, তবে গান্ধীজী আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরী-বিদ্যাকে ততটুকুই গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন যতটুকু কুটিরশিল্পগুলিকে উন্নত করার কাজে একান্তই অপরিহার্য হইবে—কিন্তু তাহার অধিক নহে। নগ্ন বাস্তবের মুখোমুখি হইয়া গান্ধীজী সময় সময় যন্ত্র সম্পর্কে নমনীয় মনোভাব ও মন্তব্য করিলেও আন্তরিকভাবে তিনি যন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁহার অন্তরের অন্তস্থলে '*Hind Swaraj*'-এর জীবনদর্শনকে তিনি সযত্নে লালন করিয়া চলিতেন।

পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই *Hind Swaraj*-এর জীবনদর্শনের বিরোধী ছিলেন। যদিও যন্ত্রব্যবস্থার পুঁজিবাদী শোষণ ও মুনাফা প্রবৃত্তি সম্পর্কে তাঁহার মনে সংশয় ও ভীতি ছিল, তথাপি আদর্শ ও নীতিগত মতবিশ্বাসে তিনি আধুনিক বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পেরই পক্ষে ছিলেন। কেননা, তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করিতেন যে, মানুষ তাহার মনের এবং সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন দ্বারা যন্ত্রকে সত্যকার মানবকল্যাণে নিয়োগ করিতে পারে এবং মানবসভ্যতা সেই দিকেই অগ্রসর হইতেছে। বিশেষত সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণের পর তাঁহার মনে এই ধারণা দৃঢ় হয়। আর তাঁহার এই আন্তরিক বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের কথাই এই সময় গিলবার্ট মারে-কে লিখিয়া জানাইলেন,—পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তবুও রবীন্দ্রনাথ অবাধ অথবা নির্বিচারে শিল্পায়নের বিরোধী ছিলেন,—প্রধানত তাহা বাংলার তথা ভারতের গ্রামদেশের মানুষের জীবিকার কথা চিন্তা করিয়াই। এবং এই কারণেই তিনি গ্রামের কুটিরশিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিবার জন্য এতখানি আগ্রহী ও উদ্যোগী হইয়াছিলেন। অবশ্য জাতীয় সংস্কৃতির দিক থেকে গ্রামে

কারুশিল্পগুলির রক্ষা ও উৎকর্ষসাধনের জন্য তাঁহার এক বিশেষ আগ্রহ ছিল, এ কথা বলাই বাহুল্য। অথচ স্বদেশী মিল বা কলকারখানার প্রসারেও তাঁহার আগ্রহ কম ছিল না। কয়েক বৎসর পূর্বে 'বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত' প্রবন্ধে (প্রবাসী: কার্তিক, ১৩৩৮) তিনি সে কথার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছিলেন। বস্তুত এইসব স্বদেশী কলকারখানা ও হস্তশিল্পের মধ্যে তিনি একটা আপস ও সঙ্গতিসাধনের কথাই চিন্তা করিতেন। এই কারণেই দেশের তাঁতিদের মিলের সুতা ব্যবহার করায় তিনি আপত্তি তো করিতেনই না, পরন্তু তাহা সমর্থন করিতেন। পক্ষান্তরে গান্ধীজী তাহা করিতেন না এবং এই কারণেই তিনি হাতে-কাটা সুতা অর্থাৎ চরকা ও বিশুদ্ধ খাদিশিল্পের উপরই গুরুত্ব দিতেন। বস্তুত গান্ধীজীর আর্থনীতিক-চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুই ছিল, এই চরকা।

এই প্রসঙ্গে এই সময়কার একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এই যে, গান্ধীজী যখন ওয়ার্ধায় হস্তশিল্প ও কুটিরশিল্প প্রচার অভিযান শুরু করেন, রবীন্দ্রনাথ তখন কলিকাতার উপকণ্ঠে 'বাসন্তী কটন্ মিল' নামে বাংলার একটি স্বদেশী কাপড়ের কল উদ্বোধন করিলেন।

২৩শে সেপ্টেম্বর (৬ই আশ্বিন, ১৩৪১), ব্যারাকপুরে পাণিহাটিতে বাসন্তী কটন্ মিলের উদ্বোধন উৎসব হয়। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের পরিবারের লোকেরা এই কারখানাটি স্থাপন করেন এবং স্বয়ং স্যার নৃপেন উহার ডিরেকটর বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। উল্লেখযোগ্য, বাসন্তী কটন্ মিলে তখন অতি-আধুনিক যন্ত্রপাতি আনা হইয়াছিল এবং উহার নূতন কারখানা ঘরের উদ্বোধন উপলক্ষেই কবিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় স্যার নীলরতন সরকার, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, বাসন্তী দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, নলিনীরঞ্জন সরকার এবং স্যার বদ্রীদাস গোয়েংকা ও বি এম. বিড়লা প্রমুখ কয়েকজন শিল্পপতিও উপস্থিত ছিলেন। কবি তাঁহার ভাষণের শুরুতেই জাতীয় আর্থনীতিক সমৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিলেন:

" 'কবি' বলিয়া পরিচিত এক ব্যক্তিকে কাপড়ের কলের উদ্বোধন করিবার নিমিত্ত আহ্বান—এক অদ্ভুত অসামঞ্জস্য; শিল্প-প্রচেষ্টার আধুনিক ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত নাই। কয়েকজন স্থিরমস্তিস্ক ব্যবসায়ী যে এই প্রস্তাব করিতে পারিয়াছেন, তাহার কারণ,—আমাদের দেশে ধনৈশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—শ্রী; তিনি সৌন্দর্য এবং হিতৈষণারও দেবতা। সুতরাং তাঁহার বন্দনায় কবিরও অধিকার আছে। 'শ্রী' নামের সংজ্ঞা হইতেই প্রকাশ, ধনৈশ্বর্যের অভাবে জাতীয় জীবনই যে দুর্বল হইয়া পড়ে তাহা নহে,—তাহার ফলে উহার লালিত্যও বিনিষ্ট হয় এবং জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠার গৌরবে বঞ্চিত করিয়া জগৎ সমক্ষে তাহাকে অধম অবজ্ঞাত করিয়া ফেলে। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সৌভাগ্যশালী জাতিগুলি যে-সকল গৌরবস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছে, সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরই তাহা প্রতিষ্ঠিত। মধ্যযুগীয় সাহিত্য এবং কলা—দেশের রাজা ও সম্পন্ন ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। বহির্জগতের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্কের অভাবে যে-জাতি দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত, সেই জাতির সাহিত্য ও শিল্পকলা প্রাদেশিকতার সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম

করিতে পারে না। বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহের অর্থসম্পদ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যোপভোগের বহুবিধ সুযোগ—বিস্তীর্ণ মানবসমাজের পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহা মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবান বিত্তশালীর মধ্যেই আবদ্ধ নাই।"

কবি অবশ্য ভালোভাবেই জানিতেন, 'বাসন্তী কটন্ মিল'টি বাঙালী শিল্পপতিদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইলেও আসলে এটি একটি পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান। এবং শ্রমিক-শোষণ ও ব্যক্তিগত মুনাফালাভের প্রবণতাই এই ধরনের পুঁজিবাদী শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই 'স্বদেশীশিল্প' 'বাঙালীর-শিল্প'-এর জয়ধ্বনি দিয়া যে-সব বাঙালী শিল্পপতি এই ধরনের শিল্প-প্রতিষ্ঠানে অগ্রণী হইয়াছেন, কবি তাঁহাদের অভিনন্দন জানাইয়াও এই পুঁজিবাদী মুনাফা প্রবৃত্তির সম্পর্কে সতর্কীকরণ করিয়া শ্রমিক ও জনকল্যাণের আদর্শটি তাঁহাদের স্মরণ রাখিতে বলেন। তিনি বলেন :

"এদিকে আবার বর্তমান যুগে স্বার্থপরতার ফলে ধনসম্পদ ব্যক্তি-পরতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। এই স্বার্থপরতার নিকট মনুষ্যত্বের দাবী প্রত্যাখ্যাত, ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধিই তাহার একমাত্র লক্ষ্য ; লভ্যাংশ হ্রাসের সম্ভাবনা থাকিলে, সে সৌন্দর্য ও চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষসাধনের উপকরণকে প্রত্যাখ্যান করিতে কুণ্ঠিত হয় না—প্রকৃত সুসভ্য মানব-সভ্যতার গৌরব রক্ষার নিমিত্তই সমাজের প্রতি কমনীয় সৌজন্যের মনোভাব পোষণ করে। কিন্তু আধুনিক স্বার্থপর অর্থগৃধ্নুতা সেই দায়িত্ব অস্বীকার করে। এই কারণেই এই সকল বিরাট শিল্প-প্রতিষ্ঠানের চতুর্দিকে নৈতিক ও কায়িক জঞ্জাল স্তূপীকৃত হইয়া আছে। এই সকল বিরাট প্রতিষ্ঠান নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে এরূপ বিপুল পরিমাণে জগতের বাজারের জন্য পণ্য উৎপাদন করে যে, সীমাহীন ভোগাসক্তি সত্ত্বেও জগতের বাজার তাহা নিঃশেষিত করিতে পারিতেছে না। সহযোগিতাই সভ্যসমাজের প্রাণস্বরূপ ; কিন্তু লাভ খতাইবার দুষ্প্রবৃত্তি সেই সহযোগিতার মনোবৃত্তি নষ্ট করিয়া সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সাম্য নষ্ট করিতেছে—বাণিজ্যিক ভেদ ও বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিতেছে। এই শোচনীয় অবস্থা অনিবার্য পরিণতি ব্যাপক ধ্বংস ; আভ্যন্তরীণ কম্পন ও ঊর্ধ্বের গর্জন হইতে প্রত্যহই সেই ধ্বংসের সম্ভাবনা স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে।...

"বাসন্তী কটন মিলের কর্তৃপক্ষ একজন কবিকে মিলের উদ্বোধন করিতে আহ্বান করিয়া চরম সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। আজ যদি বলি যে, আমি এই প্রতিষ্ঠানের কেবল আর্থিক সাফল্যই কামনা করি না, তাহা হইলে আশা করি, তাঁহারা আমাকে সমর্থন করিবেন। আমি সর্বান্তকরণে তাঁহাদের প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি। তাঁহারা যেন লক্ষ্মীদেবীর এমন একটি পূজাবেদী নির্মাণ করিতে পারেন, যেখানে তাহাদের অর্জিত অর্থ জাতীয় অর্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে। এবং তাঁহারা যেন ঐ অর্থ দ্বারা অন্তত কিয়ৎ-পরিমাণে নিরক্ষরতা, অস্বাস্থ্য ও নিরানন্দ দূর করিতে পারেন।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ৮ই আশ্বিন, ১৩৪১ ; ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪]

কোনো কারখানার উদ্বোধন উপলক্ষে আসিয়া সৌজন্যসম্মত ভাষায় ইহার অধিক

হয়ত আর কিছু কথা বলা যায় না। কিন্তু তবুও এই কৃষি-নির্ভরশীল দরিদ্র দেশে শিল্পায়নের প্রচেষ্টায় যে-সব শিল্পপতি অগ্রণী হইয়াছেন কবি তাঁহাদের যথোচিত অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে ভুলিলেন না। স্বদেশী শিল্প গঠনে কবি চিরদিনই অত্যন্ত উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলার স্বদেশী-আন্দোলনের যুগে কিভাবে তিনি স্বয়ং একটি স্বদেশী-বিপণীকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া শেষপর্যন্ত সর্বস্বান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিলেন, কবি তাঁহার সেই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়া উপসংহারে বলিলেন :

…"যাহা হউক আমি ভুলি নাই, বাংলার প্রত্যেকটি অধিবাসীই যে কবি নহে, এবং বাংলায়ও যে এমন লোক আছেন, যাঁহারা অনুপ্রাস ও অলঙ্কারের ব্যবসায় করেন না বরং কাঁচামাল হইতে পণ্য প্রস্তুত করিতে জানেন—গর্বের সহিত তাহা ঘোষণা করাই আজ আমার কর্তব্য। আমি শুনিলাম, এই মিলে প্রথমেই ৮০ নম্বরের সুতা উৎপাদন করিতেছে এবং ১২০ নম্বরের সুতাও প্রস্তুত করিতে পারিবে। যখন শুনি যে তদপেক্ষা সুক্ষ্ম সুতা প্রস্তুতের উপযোগী যন্ত্রপাতিও মিলে খাটান হইয়াছে, তখন স্বপ্নপুরীর তাঁতের গৌরবস্পর্ধা বাংলার মসলিনের যুগের অতীত কীর্তি আমার মনে ভাসিয়া ওঠে। কেবল আমার আশীর্বাদেই এই প্রচেষ্টা কিনা, সেই বিষয়ে আমার মনে সঙ্গত সন্দেহ ছিল; সুতরাং নিঃসংশয়তার আরও কিছু উপকরণের সন্ধান করিয়া দেখিলাম বহু কৃতী ব্যবসায়ী এই মিলের ডিরেক্টর এবং ম্যানেজিং এজেন্ট। সুতরাং এই ভাবিয়া আজ আমি গভীর আনন্দ অনুভব করিতেছি যে, এই মিলের অর্থপূর্ণ নামটির প্রভাব যেদিন ইহার সাফল্য-গৌরবে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে—সেইদিন আমার আজিকার অনুষ্ঠানের দাবীও উপেক্ষিত হইবে না।"

[ঐ „]

অথচ এই রবীন্দ্রনাথই একদিন :

…"আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের (আকর্ষণ-জীবী সভ্যতা অর্থাৎ যন্ত্রসভ্যতা—লেখক) লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়েছে; নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন।"—এই বলিয়া 'রক্তকরবী'র প্রস্তাবনায় তিনি যন্ত্রসভ্যতার সম্পর্কে দুঃখ ও আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এখন প্রশ্ন থাকিয়া যায়—'এ তাহা হইলে কোন রবীন্দ্রনাথ'। এই প্রশ্নের জবাব পূর্বেই বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে, এখানে জবাবে এইটুকু বলা যায় যে, রক্তকরবী রচনাকালে যন্ত্রসভ্যতা সম্পর্কে কবির মনে যেটুকু সংশয় দ্বন্দ্ব ছিল, পরবর্তীকালে বিশেষত, সোভিয়েত দেশ ভ্রমণের পর তাহা অন্তর্হিত হইয়া যায়। তাই বাসন্তী কটন্ মিলের অভ্যুদয়কে কবি স্বাগত-অভিনন্দন জানাইলেন।

বক্তৃতাদির পর কবি একটি ইলেকট্রিক বোতাম টিপিয়া কারখানার উদ্বোধন করিলেন এবং তাহার পর মিলের কাজ আরম্ভ হয়। বৈদ্যুতিক বোতাম টিপিবার পূর্বে কবি বলিলেন :

"এই সুজলা সুফলা বাংলাদেশের শিল্প-বাণিজ্য একদিন যন্ত্রদৈত্যের প্রবল পেষণে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বহুকাল পরে সেই যন্ত্রদৈত্যকেই আমাদের নষ্টশিল্প

পুনরুদ্ধারের কাজে আমরা নিযুক্ত করেছি, তার সঙ্গে আমরা একটা আপস করে নিয়েছি।” [আনন্দবাজার পত্রিকা : ৮ই আশ্বিন, ১৩৪১]

কবি কৃষির উন্নতির উপর প্রধান গুরুত্ব দিলেও তিনি ভালোভাবেই জানিতেন কৃষির উপর অত্যধিক চাপ ও অতি-নির্ভরতা কমাইতে হইলে, কুটিরশিল্পগুলিকে যথোচিত পরিমাণে সংগঠিত এবং সেই সাথে আধুনিক কলকারখানাও দেশের সর্বত্র সমভাবে সম্প্রসারিত করা দরকার।

এই উৎসব-অনুষ্ঠানের সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অভিভাষণের সুরটি কিন্তু স্বতন্ত্র ধরনের ছিল। বেশ কিছুকাল থেকেই আচার্য রায় 'বাঙালীর শিল্প' 'বাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্য' গঠনের আন্দোলন তুলিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। উহাই তাঁহার এইদিনকার ভাষণের মূল সুর ছিল। আচার্য রায় যাহা বলেন তাহার মূল কথা ছিল এই যে, বাঙালী জাতি শিল্পে-বাণিজ্যে অপটু। বিদেশীরা এবং অবাঙালীরা আসিয়া তাহার ঐশ্বর্য শোষণ করিতেছে,—বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত একটিও চিনিকল স্থাপিত হয় নাই। বস্ত্রের ব্যবসাতেও ঠিক তাই ; বোম্বাই ও আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানেই অধিকাংশ কাপড়ের কল ; বাঙালীরা তাহাদের কাপড় কিনে। বাংলাদেশে বাঙালীর মূলধন ও পরিচালনায় মাত্র তিন চারিটি উল্লেখযোগ্য কাপড়ের কল আছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। পরিশেষে তিনি বাঙালী জাতিকে শিল্প-ব্যবসায়ে অগ্রণী ও স্বাবলম্বী হইবার আবেদন জানাইলেন।

এখানে লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথের ভাষণে কোথাও এই প্রাদেশিকতার গন্ধ ছিল না। অথচ রবীন্দ্রনাথ মনে-প্রাণে সারা ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশেরও আর্থিক সমৃদ্ধির কামনা করিতেন, কিন্তু তাহার আর্থনীতিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল আচার্য রায়ের থেকে স্বতন্ত্র ধরনের। পূর্বেই আমরা উহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে এখানে আর একটি তথ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

Mr. S. C. Mitra এই সময় (সতীশচন্দ্র মিত্র—ইনি বাংলা সরকারের ডেপুটি ডিরেক্টর অব ইন্ডাস্ট্রিজ ছিলেন) বাংলাদেশের আর্থনীতিক পুনর্গঠনের সম্ভাবনার বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত আলোচনা করিয়া *'A Recovery Plan for Bengal'* নামে একটি গ্রন্থে তাঁহার পরিকল্পনাগুলি প্রকাশ করেন। তিনি কবিকে তাঁহার এই গ্রন্থের এক কপি দিয়া এই সম্পর্কে তাঁহার অভিমত দাবী করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থটি পাঠ করার পর কবি অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া এক প্রেস-বিবৃতিতে বাংলার যুবক ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশে এই গ্রন্থটি পাঠ করিয়া বাংলাদেশের আর্থনীতিক পুনর্গঠনে অগ্রণী হইবার আবেদন জানাইলেন। এই আবেদনের শুরুতেই বাংলার আর্থনীতিক সমস্যার বৈশিষ্ট্যটির কথা উল্লেখ করিতে গিয়া বলিলেন :

“At a certain period of my life I was in close association with some villages in Bengal when I came to realize that the only productive factor in our province almost entirely consisted of cultivators. We who occupy the various upper strata of society are directly or indirectly dependent for our maintenance upon those patient toilers.

of the soil. And yet the educated community in Bengal have for long remained blissfully oblivious of the fact that agriculture as the sole basis of the nation's livelihood cannot but be meagre and uncertain in its boon.

"Once Bengal had the reputation of being rich ; this she did not owe merely to the fertility of her soil, but to other channels of wealth branching out in villages that for ages lavishly supplied needs of the foreign market. Since those have been lost to us like the network for our water-ways silted up and choked by weeds, our villages are driven to desolation and to the living death worse than death itself." [*The Statesman* : 10th October ; 1934]

কবি আরও বলেন যে, সেদিনের সেই জাতীয় দুর্গতির দিনে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সরকারী অফিসের চাকুরীর মোহে ছুটিয়াছিল। তারপর অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। দেশের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পর আজ দেশের 'ভদ্রলোকেরা' যখন আবিষ্কার করিলেন যে, ঐ বিপুল সংখ্যক লোককে সরকারী অফিসের নিয়োগের কোনই সম্ভাবনা নাই তখনই তাঁহারা জাতির আর্থনীতিক ও বৈষয়িক উন্নয়নের কথা চিন্তা করিতে শুরু করিয়াছেন। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই মনোভাবের পরিবর্তনকে স্বাগত জানাইয়া তিনি সতীশচন্দ্রের ঐ গ্রন্থখানির সাহায্য লইবার নির্দেশ দিলেন।

ইতিমধ্যে গান্ধীজী কংগ্রেস ত্যাগের সংকল্প ঘোষণা করায় দেশের রাজনীতিক আলোচনায় বেশ কিছুটা আলোড়ন ও চাঞ্চল্য দেখা দেয়। অবশ্য কিছুকাল থেকেই ঐ মর্মে একটা জনশ্রুতি চলিতেছিল। ১৭ই সেপ্টেম্বর ওয়ার্ধায় কয়েকজন কংগ্রেস নেতার সঙ্গে আলোচনার পর গান্ধীজী এক দীর্ঘ বিবৃতিতে তাঁহার কংগ্রেস-ত্যাগের সংকল্প ঘোষণা করিলেন। বেশ কিছুকাল থেকেই তিনি কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বিভিন্ন চিন্তার ও ভাবধারার ব্যক্তিদের অভ্যুদয় লক্ষ্য করিতেছিলেন যাহাদের সহিত তাঁহাদের মৌলিক মতপার্থক্য ও বিরোধের সম্ভাবনায় তিনি আশঙ্কিত হইয়া উঠিতে থাকেন। তিনি একথাও পরিষ্কার বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ইঁহারা তাঁহাদের সত্যকার বিশ্বাস ও মনোভাব ব্যক্ত বা প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। তিনি অনুভব করেন, এই অবস্থা কখনই সুস্থ নয় এবং কংগ্রেসের সুস্থ ও গণতান্ত্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কটা অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে। এই অবস্থায় কংগ্রেস থেকে তাঁহার সরিয়া আসাটা কর্তব্য বিবেচনা করিয়া তিনি অনুরূপ মর্মে বিবৃতি দেন। এই বিবৃতিতে তিনি পরিষ্কার জানাইয়া দিলেন যে, অহিংসা, খাদি ও নির্বাচন ইত্যাদি সম্পর্কে কংগ্রেসের ঘোষিত নীতি অধিকাংশ কংগ্রেসকর্মীই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন না। তাছাড়া কংগ্রেসের উদীয়মান সমাজতন্ত্রবাদীদের সঙ্গে তাঁহার মৌলিক মতপার্থক্য তিনি স্পষ্টভাবেই স্বীকার করিলেন। এইসব কারণেই বহুচিন্তার পর তিনি কংগ্রেস ত্যাগের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানাইলেন। অবশ্য এই বিবৃতির শেষে কংগ্রেসকে তাঁহার মতাদর্শ

অনুযায়ী পুনর্গঠিত করার জন্য কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের সংস্কারের জন্য কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাব করেন।

তাঁহার প্রথম সংশোধনী প্রস্তাবটি ছিল, কংগ্রেসের সংগ্রামের নীতি সম্পর্কে। এই সম্পর্কে তিনি 'শান্তিপূর্ণ ও আইনসংগত' (legitimate and peaceful) শব্দ দুটির পরিবর্তে 'সত্য ও অহিংসার পথে' (truthful and non-violent) শব্দ দুটি রাখিবার প্রস্তাব দেন। তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংশোধনী প্রস্তাবটি ছিল এই যে, অতঃপর প্রত্যেক কংগ্রেসকর্মী নিয়মিত খদ্দর পরিধান করিলে (habitual wearer) এবং চারি-আনা সদস্য চাঁদার স্থলে প্রতিমাসে নিজহাতে কাটা ২,০০০ রাউণ্ড বা আট হাজার ফিট্ সুতা জমা দিলে পর তাহার সদস্যপদ ও ভোটাধিকার লাভ করিতে পারিবে। তাছাড়া কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনের প্রতিনিধি সংখ্যা তিনি ৬,০০০ হইতে কমাইয়া ১,০০০ করিবার প্রস্তাব দেন।

রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর এই বিবৃতি পাঠ করিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও বিমর্ষ হইয়া পড়েন। গান্ধীজী কংগ্রেসের নেতৃত্বের হাল ছাড়িয়া দিবেন,—ইহা তাঁহার পক্ষে তখন চিন্তা করাও অসম্ভব ছিল। গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁহার বিস্তর মতপার্থক্য ছিল কিন্তু তবুও তাঁহার অসাধারণ চারিত্রশক্তি ও নেতৃত্বের 'পরে তাঁহার গভীর আস্থা ছিল। কিন্তু কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র পরিবর্তন বা সংশোধনের জন্য গান্ধীজী যেসব কঠিন অনমনীয় নীতি ও নিয়মাবলীর প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা তিনি অনুমোদন করিতে পারিলেন না। কেননা তিনি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে খাদি ও চরকা-নীতিতে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি জানিতেন, কংগ্রেসের মধ্যে বহু নেতা ও কর্মী আছেন যাঁহারা নীতিগতভাবে অহিংসা কিংবা চরকাতে বিশ্বাস করেন না অথচ তাঁহাদের স্বদেশ-প্রীতি ও ত্যাগ অন্যান্যদের অপেক্ষা কিছু কম ছিল না। তাই কংগ্রেসের মত একটি সর্বভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানে এইরূপ কঠিন নীতি ও নিয়মাবলীর প্রবর্তন করিলে তাহার ফল খুব ভালো হইবে না, ইহাই তাঁহার ধারণা হয়। এইসব কারণে সম্ভবত তক্ষণই তিনি গান্ধীজীর ঐ বিবৃতি সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করিলেন না। কিছুদিন পর এ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেস-এর প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে কবি শান্তিনিকেতন থেকে এই সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেন (৭ই অক্টোবর, ১৯৩৪)। বিবৃতিটি ছিল এই :

"It is very difficult for me, a mere outsider in the realm of politics, to say anything definitely with regard to the changes which Mr. Gandhi wants to introduce in the present Congress Constitution. But this much I feel that the Congress, being a national institution, *its doors should be kept open for all and no such unnecessarily hard conditions imposed which will effectively bar a very large member of people from its inner sanctum.* And yet, in the alternative, I cannot dispassionately countenance Mr. Gandhi's proposed retirement from the Congress. (*Italic—mine*)

"On fundamental issues I very often disagree with him, a fact

wellknown to Mr. Gandhi himself as well as to my countrymen. But I think Mr. Gandhi's disappearance from the Congress leadership will make for disintegration and distinctly lower the prestige and moral strength of the Congress. I would ask him to think twice before making the final decision.

"Mr. Gandhi's real and everlasting work has been to pull us out from the slough of despondency and of self-abasement, the deadliest of all ills that can possibly afflict a nation. His non-co-operation movement failed, and it must be admitted that his civil disobedience movement fared no better. And yet, it is he and he alone that has vitalized and made real our political life. It will be a serious mistake to think that his mission is ended or fulfilled. And a premature retirement, specially at this critical juncture, will be nothing short of a national calamity."

[*The Statesman* : 8th October, 1934]

গান্ধীজীর প্রতি কবির অগাধ শ্রদ্ধা ও আস্থা থাকিলেও তাহা যে কতখানি মোহমুক্ত ছিল, তাহা উপরিউক্ত বিবৃতি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়।

মাদ্রাজ ভ্রমণ ও তাহার পরে

অক্টোবর মাসের (১৯৩৪) প্রথমভাগেই রবীন্দ্রনাথের মাদ্রাজ-ভ্রমণের আমন্ত্রণ আসে। সেখানে শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত-নৃত্য-নাট্যাদি এবং শিল্প-প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হয়। স্বয়ং বওবিলির (Bobbili) রাজা ইহার অন্যতম উদ্যোক্তা। তিনি বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ-সংগ্রহের আশ্বাস দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে কবির আগ্রহ কোনোদিনই কম ছিল না, কেননা বিশ্বভারতীর আর্থিক সমস্যা তাঁহাকে তখন প্রায় পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। উল্লেখযোগ্য, বরোদারাজ গায়কোবাড়ের নিকট হইতে বার্ষিক ছয় হাজার টাকা করিয়া এতকাল নিয়মিতভাবে যে সাহায্য আসিতেছিল, এই বৎসর এপ্রিল মাস হইতে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। ইহার ফলে বিশ্বভারতীর আর্থিক বিপর্যয় আরও বাড়িয়া যায়। কবি ইহার সমাধানের কোনো কূল-কিনারা দেখিতে পাইলেন না। তাই মাদ্রাজ-ভ্রমণের আমন্ত্রণ আসিলে কবি সানন্দে তাহাতে রাজী হইয়া গেলেন এই আশায় যে, এই উপলক্ষে সেখানে বিশ্বভারতীর জন্য কিছু সাহায্য সংগ্রহ সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু অর্থসংগ্রহের তাগিদে এইভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে তাঁহার আর ভালো লাগে না। ১৭ই অক্টোবর শান্তিনিকেতন থেকে এক পত্রে ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন :

"মাদ্রাজ যাত্রার উপক্রমণিকা চলচে। তার উপরে নানাবিধ খুচরো কাজ।

চারিদিকেই ছুটি, কেবল পুজোর দালানের পথযাত্রী গলায় দড়িবাঁধা ছাগল এবং রবীন্দ্রনাথের ছুটি নেই।…রথীই বলো বৌমাও বলো এঁরা জীবন্মুক্ত, ইচ্ছাধীন এঁদের কর্ম—আমারই কেবল মুক্তি নেই, তাঁরা অনায়াসে বলতে পারেন, যাব না, করব না বা মাঝ আসরে উঠে পালাব—আমার তা বলবার জো নেই, আমি বদ্ধ জীব।"
[চিঠিপত্র-৫ম : পত্র ৫৫, পৃঃ. ৯৮-৯৯]

১৯শে অক্টোবর প্রাতে কবি শান্তিনিকেতন থেকে কলিকাতা যাত্রা করেন। এইদিনই অপরাহ্ণে হাওড়া থেকে মাদ্রাজ মেলে তিনি মাদ্রাজের পথে রওনা হন। ২১শে অক্টোবর প্রাতে মাদ্রাজ পৌঁছিলে স্টেশনেই কবিকে বিরাট অভ্যর্থনা জানানো হয়। ঐদিনই মাদ্রাজের কর্পোরেশনের উদ্যোগে এক জনসভায় তাঁহাকে সংবর্ধনা জানানো হয়। স্বয়ং বওব্বিলির রাজা ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভায় কবি 'Race Problem' সম্পর্কে একটি ভাষণ দেন (দ্র. *Visva Bharati News* : Nov., 1934 ; P. 35) তিনি তাঁহার ভাষণে বলেন যে, ইতিহাসের সূচনাকাল থেকেই এই জাতিসমস্যা অন্যতম প্রধান সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। ভারতবর্ষ কিভাবে প্রথম থেকে এই সমস্যার সম্মুখীন ও সমাধানের চেষ্টা করিয়াছে কবি তাহার সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া পরিশেষে বিশ্বভারতীর মহান আদর্শের কথা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন :

"The problem which appeared before India is still claiming its final solution and has become to-day a world problem. The human races have come out of their traditional reservation fence into mutual contact. This sudden change from a life of comparative seclusion to that of mutual proximity will test to the full their moral adaptability.…

তিনি বলেন :

…"The vastness of the race problem with which we are faced to-day will either compell us to train ourselves to moral fitness, in place of merely external efficiency, or the complications arising out of it will fetter all our movements and drag us to our death."

উপসংহারে কবি বলিলেন :

"When the condition of the world is so desperate, it will not in the least help us if we in the East, as we already find in Japan, also join in this stampede towards a general annihilation. We must discover our salvation in some other power that has its basis upon sanity, and this power is moral."…

[*Visva Bharati News* : November, 1934 ; P. 35]

বক্তৃতাদির পর কবি মোটরে আদেয়ের যাত্রা করেন। সেখানে থিওজফিকাল্ সোসাইটিতে কবির থাকিবার ব্যবস্থা হয়। ইহার পর কয়েকদিনই কবিকে কয়েকটি স্কুল-কলেজ পরিদর্শন এবং কয়েকটি সভায় বক্তৃতা করিতে হয়। কিন্তু এখানে

ইংরেজী ভাষার দৌরাত্ম্য ও যথেচ্ছাচার দেখিয়া কবি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হন। বস্তুত মাদ্রাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজী মাতৃভাষার মতই ব্যবহৃত হয়। মাদ্রাজ তাহার নিজস্ব মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি এইভাবে অবমাননা করিবে, ইহা কবির নিকট অসহ্য বোধ হয়। ২৬শে অক্টোবর কুইন্ মেরী কলেজের ছাত্রী ও অধ্যাপকগণ কবিকে সংবর্ধনা জানাইলে কবি তাঁহাদের মাতৃভাষার প্রতি এই অবমাননার জন্য বেশ কঠোর তিরস্কারের সুরেই বলেন :

"এই প্রদেশ হইতে আমি ইংরেজীতে কবিতা পাই—ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে এই বিচিত্র দৃশ্য দেখা যায় না। এই সমস্ত ইংরেজী কবিতার জন্য লেখকগণ গর্ববোধ করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা মূর্খের কাল্পনিক স্বর্গে বাস করিতেছেন। আপনাদের শিক্ষার জন্যই আপনাদের মাতৃভাষার চর্চার প্রয়োজন। শুনিলাম এই দিকে আপনাদের উৎসাহ নাই। আপনাদের ইহাতে বেদনা ও লজ্জা বোধ করা উচিত।"

কবি আরও বলিলেন :

"মায়েরা তাঁহাদের সন্তানদের জন্য ইংরেজী রূপকথার বই কিনিতেছেন, একথা চিন্তা করাও বেদনাদায়ক! ইহা দ্বারা শিশুকে তাহার জন্মগত মাতৃভাষার অধিকার হইতে এবং নিজের সন্তানকে নিজের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ১৫ই কার্তিক, ১৩৪১ ; ১লা নভেম্বর, ১৯৩৪]

ইহার তিন দিন পরে (৩০শে অক্টোবর) মাদ্রাজের Y. M. C. A.-এর 'ফাইন আর্টস' বিভাগের প্রায় ২৫ জন সভ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি তাঁহাদের মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা করার জন্য অনুরূপভাবে তিরস্কার করেন। এই সম্পর্কে *Ceylon Observer*-এর মাদ্রাজস্থিত সংবাদদাতা একটি সুন্দর বিবরণী দিয়া লিখিয়াছিলেন :

"In reply to another questions, the poet observed that in South India they were using too much English, to the detriment of the vernaculars.…

"When one member pointed out that it was because of English he was able to understand them and they him, the poet observed with a smile : 'Leave me alone ; I am living in the far North ; but how is it among yourselves ?'

" 'Among the educated classes English was a means of communication. This was justifiable to an extent. What about people and activities where English could be safely avoided ?'

"Yet another member claimed in pleasantly : 'you won your Nobel Prize for English poetry.'

"The poet rejoined, 'It was an accident.' At this stage a suggestion was put in that there should be a universal language for all humanity, to which the poet readily replied that we could think of it

when the time would be ripe for it. He said that it would be possible only when communication got to be much faster than now, when people could get to England in four or five hours from India and when frontiers could be easily passed."

[*Ceylon Observer*: 2nd November, 1934]

স্মরণ রাখা দরকার, ইহার কয়েকমাস পূর্বে সিংহল ভ্রমণকালে কবি সিংহলীদের অতিরিক্ত ইংরেজীর মোহ ও মাতৃভাষার প্রতি তাহাদের অবহেলার জন্য অনুরূপভাবে তিরস্কার করিয়াছিলেন। শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই নহে, কবি সামাজিক রাজনীতিক ও সর্বস্তরের কাজকর্মে মাতৃভাষার মাধ্যমের কথাই চিন্তা করিতেন। বলা বাহুল্য, কবি ঠিক ইংরেজীর বিরোধী ছিলেন না কিন্তু ইংরেজী মাতৃভাষার স্থান অধিকার করিবে অথবা মাতৃভাষাকে নিষ্পেষিত করিবে ইহা তাঁহার নিকট অসহ্য ছিল। এইসব কথা আমরা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

ইতিমধ্যে সেখানে নন্দলাল বসু প্রমুখ বিশ্বভারতীর একদল শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী আসিয়া পড়িয়াছিলেন। ২৬শে অক্টোবর শ্রীকুমারমঙ্গলের সভাপতিত্বে চিত্র ও শিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। তাছাড়া পর পর কয়েকদিন সঙ্গীত ও 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যটি অভিনীত হয়। অবশ্য বিশ্বভারতীর এই শিল্প-পরিবেশনা মাদ্রাজ-বাসীদের মনে তেমন একটা রেখাপাত কিংবা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই এবং বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ-সংগ্রহের ব্যাপারেও এই যাত্রা সফল হয় নাই। এই সম্পর্কে প্রতিমাদেবীকে এক পত্রে কবি লিখিতেছেন :

"আমাদের এখানকার পালা আজ শেষ হবে। জিনিসটা এবার সাশুদ্ধ অন্যবারের চেয়ে অনেক বেশি সম্পূর্ণতর হয়েছে। কিন্তু এখানকার লোকের মন অসাড়। যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েচি বললে অত্যুক্তি হবে।"

[চিঠিপত্র-৩য় : পত্র ৪৩]

মাদ্রাজ-ভ্রমণ শেষ করিয়া কবি ওয়ালটেয়ার যাত্রা করেন। কিছুদিন পূর্বে প্রতিমাদেবী এখানে স্বাস্থ্যোদ্ধারের মানসে আসিয়াছিলেন। ৩রা নভেম্বর অপরাহ্নে কবি ওয়ালটেয়ার পৌঁছান। স্টেশনে ডঃ রাধাকৃষ্ণন, অধ্যাপক ভেঙ্কটরান্নান (Prof. Venkataranayyan) ও বিশাল এক জনতা কবিকে অভ্যর্থনা জানান। ওয়ালটেয়ারে কবি ভিজিয়ানাগ্রামের রাজার আতিথ্য গ্রহণ করেন। ওয়ালটেয়ারে থাকাকালে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একদিন কবির বক্তৃতার আমন্ত্রণ আসিল। ৫ই নভেম্বর (১৯৩৪) সন্ধ্যায় অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কবির বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। এইদিন কবির বক্তৃতার বিষয় ছিল,—'The Rule of the Giant'। বলা বাহুল্য, 'Giant' বলিতে কবি এখানে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতাকেই বুঝাইতেছিলেন। এই সভ্যতা সারা পৃথিবী জুড়িয়া তাহার প্রভুত্বজাল বিস্তার করিয়া কী নির্মমভাবে শোষণ করিয়া চলিয়াছে,—কিভাবে সর্ব বিধ্বংসী যুদ্ধ ও সমরবাদের দিকে পৃথিবীকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে, তিনি তাহার বিস্তারিত আলোচনা করেন। কবি তাহার দানবীয় প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যটি বিশ্লেষণ করিয়া বলিলেন :

"This business of exploitation and profit-making has also become boundless in dominion, through its organisations of offensive and defensive measures and taxing a large share of the resources of the whole population of a country···

"To satisfy the growing claims of a military machine of monstrous proportions, we need a lot of money, and for that we need to multiply our money making machines and increase our organisation in order to keep pace in the donkey race of military expansion ; and the new reverence for this deity of militarism does not allow us to see the huge devil himself who is the enemy of human destiny."

[*Madras Mail* : 8th November, 1934]

কয়েক বৎসর পূর্বে 'Organizations' প্রবন্ধে (*Modern Review* : January, 1930 ; pp. 1-4) তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই অন্যভাবে তাঁহার এই ভাষণে বলিলেন। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার দেওয়ার দুইদিন পরেই কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন (৭ই নভেম্বর)।

ইতিমধ্যে দেশের রাজনীতিক পরিস্থিতির দ্রুত ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। ২৬শে অক্টোবর বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের ৪৯ তম বার্ষিক অধিবেশন শুরু হয়। সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার অভিভাষণে **হোয়াইট পেপারের** বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল দিকের তীব্র সমালোচনা করেন। পরিশেষে তিনি সকলকে গান্ধীজী নির্দেশিত নূতন কর্মপন্থায় অগ্রসর হইবার আহ্বান জানাইলেন। কিছুকাল পূর্বে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির পাটনা অধিবেশনে যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল, বোম্বাই কংগ্রেসে প্রায় পুরোপুরিভাবে সেগুলি অনুমোদন করা হয়। তাছাড়া এই কংগ্রেসে সারা দেশব্যাপী গ্রামীণ শিল্পগুলিকে পুনর্গঠিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং এই উদ্দেশ্যে জে. সি. কুমারাপ্পার নেতৃত্বে 'অখিল ভারত গ্রাম-উদ্যোগ সঙ্ঘ' ('All India Village Industries Association') নামে একটি সংস্থা গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্থির হয়, কুমারাপ্পা গান্ধীর নির্দেশ ও উপদেশমত ইহাকে সংগঠিত করিয়া তুলিবেন।

কিন্তু বোম্বাই কংগ্রেসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা,—গান্ধীজীর কংগ্রেস ত্যাগ। আদর্শ ও নীতিগত কারণে গান্ধীজী তাঁহার সিদ্ধান্তে অটল থাকিবেন জানিয়াই অনিচ্ছা ও দুঃখের সঙ্গে কংগ্রেসে উহা অনুমোদন করা হয় তবে সেই সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহার মহান অবদানের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করা হয়। তাছাড়া কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সংশোধনের জন্য গান্ধীজী পূর্বেই তাঁহার বিবৃতিতে যেসব প্রস্তাব করিয়াছিলেন মোটামুটিভাবে উহারই ভিত্তিতে কয়েকটি প্রস্তাব এই কংগ্রেসে গৃহীত হয়। সংগ্রামের নীতির ক্ষেত্রে 'সত্য ও অহিংসার পথে' (truthful and non-violent) শব্দ দুটি রাখার জন্য গান্ধীজী যে প্রস্তাব করেন, এই সম্পর্কে কংগ্রেস কর্মীদের মতামত গ্রহণের জন্য উহা বিভিন্ন প্রদেশ কংগ্রেসে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত হয়।

তাছাড়া কংগ্রেস কর্মীদের নিয়মিত খাদি-পরিধান, শ্রমদান ও মাসিক নির্দিষ্ট পরিমাণ সুতা-কাটার (২৬৬৬ গজ) যে প্রস্তাব তিনি দিয়াছিলেন, তাহাও কংগ্রেসে গৃহীত হয়। অপর একটি সিদ্ধান্তে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনের প্রতিনিধি সংখ্যা ২,০০০ জন এবং A. I. C. C.-র সদস্য সংখ্যা ১৫৫ জন নির্দিষ্ট করা হয়।

গান্ধীজীর প্রচন্ড ব্যক্তিত্বের প্রভাবের কথা বাদ দিলেও বলা যায়, এইসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় গান্ধীজীর রাজনীতি কংগ্রেসে প্রায় পুরোপুরিভাবেই চালু রহিল। অবশ্য ইহার অর্থ এই নয়, কংগ্রেস নেতারা ও প্রতিনিধিরা সকলেই গান্ধীজীর রাজনীতি ও জীবনাদর্শকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিলেন। বস্তুত গান্ধীজীর কংগ্রেস ত্যাগ ঘটনাটি উপলক্ষে সকলেই এতখানি বিহ্বল ও বিচলিত হইয়া পড়েন যে, সেই মুহূর্তে অধিকাংশ প্রতিনিধিরই কংগ্রেসে প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তগুলির প্রকৃত তাৎপর্য ও গুরুত্বটি স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করিবার মত মানসিক অবস্থা ছিল না। তাছাড়া সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল প্রমুখ বামপন্থী নেতারাও এই কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। মাদ্রাজ কংগ্রেস থেকে করাচী কংগ্রেস (১৯২৭-৩১) পর্যন্ত যে-শক্তি কংগ্রেসের মধ্যে একটি প্রগতিশীল ধারা প্রবর্তনের জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিতেছিলেন বোম্বাই কংগ্রেসে তাহা প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। ফলে বোম্বাই কংগ্রেসে গান্ধীজী কংগ্রেস ত্যাগ করিলেও কংগ্রেস পুরোপুরি গান্ধীজীর অনুগত রহিল।

অবশ্য বোম্বাই কংগ্রেস একেবারে নির্ঝঞ্ঝাটে চলে নাই। সম্মেলনের শুরুতেই পুলিশ কমিশনারের আদেশ অমান্য করিয়া কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীলদের নেতৃত্বে প্রায় ৫০০০ শ্রমিক কংগ্রেস নগরের দিকে অগ্রসর হইলে পুলিশ তাহাদের উপর লাঠি চালায়। প্রায় ১২ জন শ্রমিক আহত হয়। ইহার প্রায় এক সপ্তাহ পরে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতায় যুগপৎ সমস্ত কমিউনিস্ট পরিচালিত সংগঠনগুলি বে-আইনি ঘোষিত হয়। বহু কমিউনিস্ট ও শ্রমিক কর্মী গ্রেপ্তার হন।

হোয়াইট পেপার ও জে. পি. সি. রিপোর্ট সম্পর্কে

বোম্বাই কংগ্রেসের অনতিকাল পরেই ব্যবস্থা পরিষদের Legislative Assembly) নির্বাচন আসিয়া পড়ে। কংগ্রেস এবং দেশের ছোট বড় প্রায় সমস্ত দলই নির্বাচনে মাতিয়া উঠেন। ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুল জয়লাভ করে এবং বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ তখন দক্ষিণ-ভারত সফর করিয়া শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াছেন। দেশের সর্বত্রই তখন নির্বাচন, হোয়াইট পেপার ও জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটির আসন্ন রিপোর্ট লইয়া উত্তপ্ত আলোচনা চলিতেছে। এই ধরনের পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে রবীন্দ্রনাথ কখনও উৎসাহ অনুভব করিতেন না। কিন্তু যেহেতু তিনি

সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করিতেন না এই কারণেই এইসব বিষয়ে তিনি বড় একটা প্রকাশ্য মন্তব্য করিতে চাহিতেন না। কয়েকদিন পরই অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি পত্রে তাঁহার মনের চাপা ক্ষোভ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কবি লিখিলেন (১৫ই নভেম্বর, ১৯৩৪):

…"হাসি পায় মনে করলে যখন ভাবি এই সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রনেতারা সমস্ত দেশ জুড়ে বক্তৃতামঞ্চে কংগ্রেসের উত্তেজনা বিস্তার করে বেড়াচ্ছেন, তার গুরুত্ব সম্বন্ধে কারও মনে কোন সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু কী স্তূপাকার অবাস্তবতা, কৃত্রিমতা। এক প্রদেশের সঙ্গে আর এক প্রদেশের অনৈক্য কেবল ভাষাগত নয়, স্থানগত নয়, মজ্জাগত। পরস্পরের মানব সম্বন্ধ কেবল যে শিথিল তা নয়, অনেক স্থলেই বিরুদ্ধ। আমরা ভোটের ভাগবিভাগ নিয়ে তুমুল তর্ক বাধিয়েছি, যেন অন্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলেও ভোটের সামঞ্জস্যে এই ফাটলধরা দেশের সর্বনাশ নিবারণ করতে পারবো। আজকাল আমি সমস্ত ব্যাপারটাকে নিস্পৃহ বৈজ্ঞানিকভাবে দেখবার চেষ্টা করি; মরবার কারণ যেখানে আছে সেখানে মরা অনিবার্য—এর চেয়ে সহজ কথা কিছু নেই। পার্লামেণ্টারী রাষ্ট্রতন্ত্র! এ কি বিলিতি দাওয়াইখানা থেকে ভিক্ষে করে আনলেই তখনই আমাদের ধাতের সঙ্গে মিলে যাবে! নিয়ুয়র্কের আকাশ-আঁচড়া বাড়ি আমাদের পলিমাটির উপর বসিয়ে দিলে সেটা তার অধিবাসীদের কবর হয়ে উঠবে। **সাদা কাগজের মোড়কে** আমাদের ভাগে কী দান কী পরিমাণে এসে পৌঁছল সেটা বেশি কথা নয়, যাকে দেওয়া হচ্ছে তারই পাঁচ আঙুলের ফাঁক দিয়ে গ'লে গিয়ে কতটা টেঁকে সেইটেই ভাববার বিষয়। হয়ত ইংরেজের এই দানের সঙ্গে বিষয়বুদ্ধিও আছে। জগৎজুড়ে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘূর্ণি-বাতাস জেগে উঠছে তাতে ভারতবর্ষের মন না পেলে ভারতবর্ষকে শেষপর্যন্ত আয়ত্ত করা সম্ভব হ'তে পারে না।"…

কবি তাঁহার পল্লী-পুনর্গঠনের আদর্শে দৃঢ় আস্থা জ্ঞাপন করিয়া আরও লিখিলেন:

…"তাই মনে হয় নিজেদের স্বভাবগত সমাজগত প্রথাগত সকলপ্রকার দুর্বলতা সত্ত্বেও নিজের দেশের ভার যে-ক'রেই-হোক নিজেকেই নিতে হবে।…নিজের ভাগ্য নানা ভুলচুক, নানা দুঃখ কষ্ট বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই নিজে নিয়ন্ত্রিত করবার শিক্ষা আমাদের পাওয়া চাই। সেই শিক্ষার আরম্ভ-পথ আমার অতি ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারেই আমি নিয়েছিলুম। য়ুরোপের মতো আমাদের জনসমূহ নাগরিক নয়—চিরদিনই চীনের মতো ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান। নাগরিক চিত্তবৃত্তি নিয়ে ইংরেজ আমাদের সেই ঘনিষ্ঠ পল্লীজীবনের গ্রন্থি কেটে দিয়েছে। তাই আমাদের মৃত্যু আরম্ভ হয়েছে ঐ নীচের দিক দিয়ে। সেখানে কী অভাব, কী দুঃখ, কী অন্ধতা, কী শোচনীয় নিঃসহায়তা,—বলে শেষ করা যায় না। এইখানেই পুনর্বার প্রাণসঞ্চার করবার সামান্য আয়োজন করেছি, না পেয়েছি দেশের লোকের কাছ থেকে উৎসাহ, না পেয়েছি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সহায়তা। তবু আঁকড়ে ধরে আছি। দেশকে কোন্ দিক থেকে রক্ষা করতে হবে আমার তরফ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর আমার, ঐ গ্রামের কাজে। এতদিন পরে মহাত্মাজি হঠাৎ এই কাজে পা বাড়িয়েছেন। তিনি মহাকায় মানুষ, তাঁর পদক্ষেপ খুব সুদীর্ঘ। তবু মনে হয় অনেক সুযোগ পেরিয়ে গেছেন—অনেক

আগে শুরু করা উচিত ছিল, একথা আমি বার-বার বলেছি। আজ তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেছেন। স্পষ্ট না বলুন, এর অর্থ এই যে, কংগ্রেস জাতি-সংগঠনের মূলে হাত দিতে অক্ষম। যেখানে কাজের সমবায়তা স্বল্প সেখানে নানা মেজাজের মানুষ মিললে অনতিবিলম্বে মাথা ঠোকাঠুকি ক'রে মরে। তার লক্ষণ নিদারুণ হয়ে উঠেছে। এই সম্মিলিত আত্মকলহের ক্ষেত্রে কোনো স্থায়ী কাজ কেউ করতে পারে না। আমার অল্প শক্তিতে আমি বেশি কিছু করতে পারি নি। কিন্তু এই কথা মনে রেখো পাবনা-কনফারেন্সে থেকে আমি বারবার এই নীতিই প্রচার করে এসেছি। **আর শিক্ষা সংস্কার এবং পল্লীসঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ।** এর সংকল্পের মূল্য আছে, ফলের কথা আজ কে বিচার করবে ?" (বড় হরফ আমার)

[প্রবাসী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২ ; পৃ. ১৫৮-৫৯]

অবশ্য এই চিঠি অমিয় চক্রবর্তীর উদ্দেশে লেখা হইলেও বস্তুত ইহা দেশবাসীর উদ্দেশেই লেখা। এই ধরনের জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যার বিষয়ে কবি অনেক সময় ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার প্রিয়জনদের কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া তাঁহার মতামত জ্ঞাপন করিতেন এবং উহার কপি 'প্রবাসী'তে প্রকাশের জন্য রামানন্দের নিকট পাঠাইয়া দিতেন।

গান্ধীজী অবশ্য নির্বাচন কিংবা শাসন-সংস্কার সম্পর্কে এতটুকু আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। বোম্বাই কংগ্রেসের পর তিনি 'হরিজন'-এ গ্রামীণ হস্তশিল্প ও কুটিরশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য একটানা প্রচার শুরু করিলেন। এই সময় তিনি রবীন্দ্রনাথকে 'অখিল ভারত গ্রাম-উদ্যোগ কমিটির'-র (A. I. V. I. A,) উপদেষ্টামণ্ডলীতে থাকিবার অনুরোধ জানাইয়া একটি পত্র লিখেন (১৫ই নভেম্বর, ১৯৩৪)। পত্রটি ছিল এই :

Wardha
15th November, 1934

Dear Gurudev,

The All India Village Industries Association which is being formed under the auspices of the Indian National Congress will need the assistance of expert advisers in the various matters that will engage its attention.…

Will you please allow your name to appear among such advisers of the All India Village Industries Association ? Naturally I approach you in the belief that the object of the association and the method of approach to its task have your approval.

Yours sincerely
Sd/ M. K. Gandhi

বলাবাহুল্য, এই পত্র পাওয়ার পর কবি সানন্দে গান্ধীজীর এই প্রস্তাবে তাঁহার সম্মতি জানাইয়া এই তারবার্তাটি পাঠাইলেন,—"Gladly Lend My Name Adviser Village Industries Association." কবির সেক্রেটারী অনিল চন্দও

কয়েকদিন পর মহাদেব দেশাইকে এক পত্রে কবির সম্মতিসূচক তারবার্তা প্রেরণের কথা উল্লেখ করেন (২১শে নভেম্বর)।

উল্লেখযোগ্য, ইহার প্রায় মাসখানেক পরে 'অখিল ভারত গ্রাম-উদ্যোগ সমিতির (A. I. V. I. A.) আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয় (১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪)। শেঠ যমুনালাল বাজাজ সমিতির কর্মকেন্দ্র ভবনের জন্য তাঁহার অট্টালিকা ও তৎসংলগ্ন বহু জমি দান করেন। জি. সি. কুমারাপ্পা হইলেন ইহার সংগঠন অধিকর্তা এবং সম্পাদকমণ্ডলীতে থাকিলেন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার এবং ডাঃ খাঁ সাহেব। উপদেষ্টামণ্ডলীতে রবীন্দ্রনাথ, আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, স্যর সি. ভি. রমণ, ডাঃ আন্সারী এবং আরও অনেকে থাকিলেন।

এদিকে নির্বাচনের অনতিকাল পরেই 'জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটির রিপোর্ট' প্রকাশিত হয় (২২শে নভেম্বর, ১৯৩৪)। কমিটির অধিকাংশ সদস্যের ভোটে রিপোর্টটি গৃহীত হয়। বলা বাহুল্য, হোয়াইট পেপারে যে সামান্যতম শাসনতান্ত্রিক অধিকারের আভাস দেওয়া হইয়াছিল, ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলিকে খুশি রাখার জন্য এই রিপোর্টে তাহাও ছাঁটিয়া ফেলা হয়।

এদিকে জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ায় উহার ভিত্তিতে গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে ভারত-সংস্কার বিল প্রণয়নের উদ্যোগ চলিতে থাকে। এই রিপোর্ট সম্পর্কে কংগ্রেস নেতাদের কী প্রতিক্রিয়া হয়, গভর্নমেণ্ট উহাই গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা এই রিপোর্ট সম্পর্কে এতই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন যে, এই সম্পর্কে তখনই কোনো আলোচনা করিতেই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। এই সম্পর্কে বিলেতের *Birmingham Evening Despatch* লিখিতেছে :

"Indian Congress leaders have refused even to discuss the Joint Select Committee's Report. Gandhi is silent :—'Having retired from the Congress it would ill become of me to pronounce any opinion upon the report at the present juncture.' "

[*Birmingham Evening Post* : 22nd Nov., 1934]

সাংবাদিকদের হাত হইতে কাহারও পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। এ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেসের প্রতিনিধি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এই রিপোর্ট সম্পর্কে তাঁহার অভিমত জানাইবার অনুরোধ জানান। কবি উহার জবাবে কয়েকদিন পূর্বে অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠিতে যাহা লিখিয়াছিলেন উহাই সংক্ষেপে এক বিবৃতি দিলেন।

কবি বলেন :

"It is absolutely useless to ask my opinion about the recommendations, for I take but a mere academic interest in the matter.

"So long as there is any feeling of separateness among the various elements that make up the Indian nation, so long as there is want of sympathy and understanding among the different communities

and different provinces, *Swaraj*—Home Rule—will remain a chimera.

"I have never believed that the salvation of my country could come from any political machinery, however modern and dazzling, imported from a foreign market.

"Swaraj is not a question of apportionment of votes and seats. There can be no Swaraj for us until seven thousand (lac ?) dead villages are again brought to life, and that can be done only through our own work." [*Liverpool Echo* : 22nd Nov., 1934]

ইতিমধ্যে কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে পৌরোহিত্য করার জন্য কবির আমন্ত্রণ আসে। কয়েকদিন পর তিনি তাঁহার সেক্রেটারী অনিল চন্দকে সঙ্গে লইয়া কাশী যাত্রা করেন (২৯শে নভেম্বর)। কিন্তু পণ্ডিত মালব্যের অসুস্থতার জন্য ঐ সমাবর্তন-উৎসব স্থগিত রাখা হয়। সেখানে কয়েকটি ছোটখাটো অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পর কয়েকদিন পরেই তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন।

কাশী থেকে ফিরিবার পর বিশ্বভারতীর আর্থিক ও সাংগঠনিক সমস্যা লইয়া কবি খুবই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। আর্থিক সংকটের দরুন নানা সমস্যা দেখা দিতেছিল। তাছাড়া পুরাতন বন্ধু ও সহকর্মীদের কয়েকজনই এই সময় শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিয়া গেলেন। উল্লেখযোগ্য, অল্পকাল পূর্বেই বিধুশেখর শাস্ত্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা গ্রহণ করিয়া চলিয়া যান (১৯শে নভেম্বর)। উহার প্রায় চারি মাস পূর্বে দিনেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া যান। এইসব কারণে কবি খুবই মানসিক উদ্বেগ ও অশান্তিতে ছিলেন।

অল্পকাল পরেই পৌষ-উৎসব আসিয়া পড়ে। আগেরবার পৌষ-উৎসবে কবি উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। এবার উৎসবে এণ্ড্রুজও উপস্থিত ছিলেন। ৭ই পৌষ মন্দিরে কবি আচার্যের বেদীভূমি থেকে বিশ্বের ঘনায়মান পরিস্থিতির তাৎপর্যটি বিশ্লেষণ করিয়া বলিলেন :

"বিজ্ঞানের পথে মানুষের শক্তি যে আশ্চর্য উন্নতিলাভ করেছে তার তুলনা নেই। বহু শতাব্দীর চেষ্টায় জ্ঞানসাধনা যে ফল লাভ করেছিল এই অল্প কয়েক বৎসরে মানুষ তার চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছে।…

"কিন্তু কী আশ্চর্য, মানুষের যখন এই অপরিসীম উন্নতি ঠিক সেই সময়ে তার এ কী পরিচয়, এ কী হানাহানি, এ কী অসামান্য হিংস্রতা! মানুষের প্রতি মানুষের অন্তহীন শত্রুতা! সমস্ত য়ুরোপখণ্ডে মানব-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এ কী অভিযান! গৌরব করব কিসের ?"

ইতালী ও জার্মানীতে তখন ফ্যাসিস্ট-বর্বরতা অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে। অস্ট্রিয়ার পরিস্থিতিও ক্রমশ অত্যন্ত উদ্বেগজনক হইয়া উঠিতে থাকে। বৎসরের প্রথমভাগেই অস্ট্রিয়ার উদীয়মান যে-ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটরটি কামানের গোলায় সেখানকার শ্রমিক বস্তিগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল, সেই ডলফাসই কিছুকাল

পূর্বে ভিয়েনাতে নাৎসীদের হাতে নিহত হইলেন (জুন, ১৯৩৪)। ডল্‌ফাস্‌-হত্যার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হিট্‌লার ও মুসোলিনী উভয়েই অস্ট্রিয়া আক্রমণের ষড়যন্ত্র করিতে থাকে। এইসব সংবাদে কবির মন অত্যন্ত বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। তাই আচার্যের ভাষণে তাঁহার এই মানসিক যন্ত্রণা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তিনি অবশ্য আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকেই সমস্যাটির বিচার করিতেছিলেন :

"এই থেকে বুঝতে হবে, হওয়াটাই বড় কথা, পাওয়া নয়। পাওয়ার দিকে জানার দিকে সংগ্রহের দিকে জয়ী হয়েছে মানুষ, বাইরের দিকে যত ঐশ্বর্য সে জড়ো করেছে —তার সমস্ত সাধনা চেষ্টা সে দিয়েছে বাইরের পাওয়া ও কাজের দিকে, বিশ্বশক্তিকে আত্মগত করে স্বশক্তিকে বড় করার দিকে।...বাইরের দীনতায় তো শুধু অন্নবস্ত্রের দুঃখ, কিন্তু অন্তরের দীনতায় দেখা দেয় শোচনীয় দানবিক হিংস্রতা। সভ্যতা আপনি আপনার বিষ উৎপন্ন করছে; বুদ্ধির যোগেই মানুষ মরবে এমন আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।"...

তাই ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনার মর্মবাণীটি স্মরণ করাইয়া দিয়া তিনি আরও বলিলেন :

..."বিজ্ঞান যেমন পেয়েছে দেশগত কালগত অসীমকে তেমনি আমাদের দেশের ঋষি পেয়েছিলেন আত্মগত অসীমকে। কত বড়ো সাহসের সঙ্গে তাঁরা বলেছিলেন, আমরা ব্রহ্মের মধ্যে আপনাকে পাব।...এই কথা বলতে পারি নে বলেই আজ এত হানাহানি। পৃথিবী রসাতলের দিকে চলেছে, কী কলুষ তাই আজ চারদিকে! রক্তে রক্তাক্ত আজ এই সুন্দর পৃথিবী।"...

উপসংহারে তিনি বলেন :

"অন্যের আত্মায় আপনার আত্মাকে-এক ক'রে দেখো—উপনিষদের এই তত্ত্বটি বুদ্ধ ব্যবহারে রূপে দিয়েছিলেন 'মৈত্রী'র তত্ত্বে।...আত্মার মধ্যে তার সন্ধান করতে হবে। বাইরের সাধনা কৃত্রিম—যিনি আনন্দরূপমমৃতম্‌ সর্বত্র তাঁর আনন্দ পাওয়া চাই। প্রেমের দ্বারা আত্মার ঐক্যধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সেইখানেই তো অধ্যাত্ম-লোক। সেইখানে পৌছতে পারে নি বলেই তো মানুষের এত দুঃখ।"...

[প্রবাসী : মাঘ, ১৩৪১ ; পৃঃ. ৫৪৭-৪৮]

ইহা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন মন্দিরের আচার্যেরই উপযুক্ত কথা। ৭ই পৌষ উৎসব উপলক্ষে মন্দিরে আচার্যের বেদীভূমি থেকে রাজনীতিক সমাধানের কথা বলা শুধু অপ্রাসঙ্গিকই নহে, অসঙ্গতও। বিশ্বসমস্যা ও আন্ত-র্জাতিকতার প্রশ্নে তাঁহার রাজনীতিক চিন্তার কথা অন্যত্র বহুবার তিনি ঘোষণা করিয়াছেন,—কিন্তু ৭ই পৌষ তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্র নহে, তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র। এখানে যেটি লক্ষ্য করিবার বিষয় সেটি হইতেছে এই যে, কবি আচার্যের বেদীভূমি থেকে নিছক অধ্যাত্মবাদের জন্যই অধ্যাত্ম-আলোচনা করেন নাই। যুদ্ধ, লুণ্ঠন, শোষণ, অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধেই আচার্যের বেদীভূমি থেকে কবি বারংবার তাঁহার ক্ষমাহীন সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন ;—এই বেদীভূমি থেকেই শান্তি, প্রেম ও বিশ্বমৈত্রীর বাণীতে তিনি বারবার আহ্বান জানাইয়াছেন বিশ্বের সকল দেশের মানুষকে।

রবীন্দ্রনাথ এখানে পাশ্চাত্য-সভ্যতার সমালোচনা করিয়া ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনার আদর্শটি উপলব্ধি করিবার আহ্বান জানাইয়াছেন, সত্য কথা। কিন্তু উহার অর্থ এই নয়, কবি আধুনিক পাশ্চাত্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতির 'পরে আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য-সভ্যতার চিত্তসম্পদ এবং উহার মর্মগত সত্যতা ও মহত্বের 'পরে তাঁহার আন্তরিক আস্থা ছিল, পূর্বেই তাহা বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। কয়েকদিন পরেই কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ভাষণে কবি তাঁহার এই আস্থার কথা দৃঢ় ভাষায় ব্যক্ত করিলেন।

পৌষ-উৎসবের দিন দুই পরেই কবি কলিকাতায় যান। সেখানে ২৭শে ডিসেম্বর প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের (দ্বাদশ অধিবেশন) উদ্বোধনীভাষণে কবি 'বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধটি (বিচিত্রা : মাঘ, ১৩৪১) পাঠ করেন। ভাষণের শুরুতেই কবি বাংলার নব-জাগরণের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য-সভ্যতার মহান চিত্তসম্পদের ভূমিকাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন :

"এক দিকে পণ্য এবং রাষ্ট্র-বিস্তারে পাশ্চাত্যমানুষ এবং তার অনুবর্তীদের কঠোর শক্তিতে সমস্ত পৃথিবী অভিভূত, অন্য দিকে পূর্বপশ্চিমে সর্বত্রই আধুনিক কালের প্রধান বাহন পাশ্চাত্যসংস্কৃতির অমোঘ প্রভাব বিস্তীর্ণ। বৈষয়িক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের আক্রমণ আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রতিরোধ করতে পারি নি, কিন্তু পাশ্চাত্য-সংস্কৃতিকে আমরা ক্রমে ক্রমে স্বতঃই স্বীকার করে নিচ্ছি। এই ইচ্ছাকৃত অঙ্গীকারের স্বাভাবিক কারণ এই সংস্কৃতির বন্ধনহীনতা, চিত্তলোকে এর সর্বত্রগামিতা—নানা ধারায় এর অবাধ প্রবাহ, এর মধ্যে নিত্য-উদ্যমশীল বিকাশধর্ম নিয়ত উন্মুখ, কোনো দুর্নম্য কঠিন নিশ্চল সংস্কারের জালে এ পৃথিবীর কোণে কোণে স্থবিরভাবে বদ্ধ নয়, রাষ্ট্রিক ও মানসিক স্বাধীনতার গৌরবকে এ ঘোষণা করেছে—সকলপ্রকার যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসের অবমাননা থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করবার জন্যে এর প্রয়াস। এই সংস্কৃতি আপন বিজ্ঞানে দর্শনে সাহিত্যে বিশ্ব ও মানব-লোকের সকল বিভাগভুক্ত সকল বিষয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত, সকল কিছুই পরীক্ষা করেছে, বিশ্লেষণ সংঘটন বর্ণন করেছে, মনোবৃত্তির গভীরে প্রবেশ করে সূক্ষ্ম স্থূল যতকিছু রহস্যকে অবারিত করছে।...এই বিরাট সাধনা আপন বেগবান প্রশস্ত গতির দ্বারাই আপন ভাষা ও ভঙ্গীকে যথাযথ, অত্যুক্তিবিহীন এবং কৃত্রিমতার-জঞ্জালবিমুক্ত করে তোলে।"

[রবীন্দ্র-রচনাবলী : ২৩'শ খণ্ড : পৃঃ. ৫২১]

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির 'পরে কবির কতখানি শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল তাহা উপরোক্ত ভাষণে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি আরও বলিলেন :

"এই সংস্কৃতির সোনার কাঠি প্রথম যেই তাকে স্পর্শ করল অমনি বাংলাদেশ সচেতন হয়ে উঠল।...মানুষের চিত্তসম্ভূত যাকিছু গ্রহণীয় তাকে সম্মুখে আসবামাত্র চিনতে পারা ও অভ্যর্থনা করতে পারার উদারশক্তিকে শ্রদ্ধা করতেই হবে। চিত্ত-সম্পদকে সংগ্রহ করার অক্ষমতাই বর্বরতা, সেই অক্ষমতাকেই মানসিক আভিজাত্য বলে যে-মানুষ কল্পনা করে সে কৃপাপাত্র।"

এই পাশ্চাত্য-সংস্কৃতির সংস্পর্শে ও প্রভাবে একদা কিভাবে রামমোহন-মধুসূদন-বঙ্কিমের সাধনার ধারায় আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ এবং সমৃদ্ধি

ঘটিয়াছে, কবি তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলেন। সেদিন সমাজের প্রাচীনপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে তাঁহারাও লাঞ্ছনা ও আঘাত পাইয়াছিলেন এই অভিযোগে যে, তাঁহাদের চিন্তা ও সাহিত্যসাধনার আদর্শ দেশের বিশুদ্ধ ন্যাশনাল বা জাতীয় সংস্কৃতি ও রীতি-বিরুদ্ধ। কবি সনাতনী ও বিশুদ্ধ জাতীয়তাবাদীদের চিত্তদৈন্যের সমালোচনা করিয়া বলিলেন :

…"ন্যাশনাল আদর্শ নাম দিয়ে কোনো-একটি সুদূর ভূতকালবর্তী আদর্শবন্ধনে নিজেকে নিশ্চল করে রাখা তার পক্ষে স্বাভাবিক হতেই পারে না, যেমন স্বাভাবিক নয় চীনে মেয়েদের পায়ের বন্ধন। সেই বন্ধনকে ন্যাশনাল নামের ছাপ দিয়ে গর্ব করা বিড়ম্বনা। সাহিত্যে বাঙালির মন অনেক কালের আচারসংকীর্ণতা থেকে অবিলম্বে মুক্তি যে পেয়েছিল, তাতে তার চিৎশক্তিরই অসামান্যতাই প্রমাণ করেছে।"

[ঐ : পৃঃ. ৫২৩]

সাহিত্য সাধনার আদর্শে কবি কোনোদিন কোনো সংকীর্ণ জাতীয়তা বা প্রাদেশিকতাকে প্রশ্রয় দেন নাই। তাই কবি তাঁহার ভাষণের উপসংহারে বাংলার সাহিত্যসাধকদের উদ্দেশে বলিলেন :

… 'বাঙালির যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, শাশ্বত, যা সর্বমানবের বেদীমূলে উৎসর্গ করবার উপযুক্ত, তাই আমাদের বর্তমানকাল রেখে দিয়ে যাবে ভাবীকালের উত্তরাধিকার রূপে। সাহিত্যের মধ্যে বাঙালির যে-পরিচয় সৃষ্টি হচ্ছে বিশ্বসভায় আপন আত্মসম্মান সে (অক্ষুণ্ণ) রাখবে, কলুষের আবর্জনা সে বর্জন করবে, বিশ্বদেবতার কাছে বাংলাদেশের অর্ঘ্যরূপেই সে আপন সমাদর লাভ করবে। বাঙালি সেই মহৎ প্রত্যাশাকে আজ আপন নাড়ীর মধ্যে অনুভব করছে বলেই বৎসরে বৎসরে নানা স্থানে সম্মিলনী-আকারে পুন পুন বঙ্গভারতীর জয়ধ্বনি ঘোষণা করতে সে প্রবৃত্ত। তার আশা সার্থক হোক, কালে কালে আসুক বীণাতীর্থযাত্রীরা, বাংলা-দেশের হৃদয়ে বহন করে আনুক উদারতর মনুষ্যত্বের আকাঙ্ক্ষা, অন্তরে বাহিরে সকলপ্রকার বন্ধনমোচনের সাধনমন্ত্র।" [ঐ : পৃঃ. ৫২৮]

ইহা ছাড়াও নিখিলবঙ্গ সংগীত সম্মেলনের উদ্বোধন উপলক্ষে কবিকে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করিতে হয়। ইহার দিন কয়েক পরেই কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন।

'চার অধ্যায়'

১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে, 'চার অধ্যায়' নামে কবির বিখ্যাত ছোট উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। স্মরণ রাখা দরকার, ঐ বৎসরই তাঁহার সিংহল ভ্রমণকালে (মে-জুন, ১৯৩৪) কবি এই উপন্যাসটি রচনা করিয়াছিলেন।

'চার অধ্যায়' প্রকাশিত হইলে বাংলাদেশে বেশ কিছুটা উত্তেজনা ও তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়—বিশেষত বাংলাদেশের বিপ্লববাদী ও চরমপন্থীদের মধ্যে। কেননা

উপন্যাসটি বাংলাদেশের বিপ্লববাদ ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পটভূমিতেই রচিত হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, এই আন্দোলনের ভয়ঙ্কর ও নেতিবাচক দিকটি ইহাতে এমনভাবে চিত্রিত হইয়াছিল, যাহার ফলে বিপ্লববাদীদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। স্মরণ রাখা দরকার, ঠিক এই একই কারণে কবির 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি লইয়া এমনই তীব্র সমালোচনা ও তর্কবিতর্ক শুরু হইয়াছিল।

কিন্তু 'চার অধ্যায়' লইয়া ক্ষোভ ও বিতর্কের উপযুক্ত কারণ কবি স্বয়ং সৃষ্টি করিয়াছিলেন, উহার ভূমিকার মধ্যে। কেননা কবি একদা তাঁহার নিকট ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের একটি মন্তব্যকে তাঁহার ভূমিকায় এমনভাবে অবতারণা করেন, যাহার ফলে এমনই একটা ধারণার সৃষ্টি হয় যে, কবি ব্রহ্মবান্ধবের বিভ্রান্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া সন্ত্রাসবাদকেই তাঁহার এই উপন্যাসের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য করিয়াছেন। তাছাড়া কিছুকাল পূর্বে দার্জিলিঙে এণ্ডারসন-এর প্রাণনাশের চেষ্টা ব্যর্থ হইলে কবি যে প্রেস-বিবৃতি দেন, লোকে উহাকেই ইহার সহিত সম্পর্কযুক্ত করিয়া দেখিবার চেষ্টা করে।

এইসব সমালোচনায় অসন্তোষ ও ক্ষোভের কারণটি বুঝিতে পারিয়া কবি কিছুদিন পরে 'প্রবাসী'তে (বৈশাখ, ১৩৪২) তাঁহার আত্মপক্ষ সমর্থনে 'চার অধ্যায়'-এর এক কৈফিয়ত লিখিলেন। ইহাতে কবির বক্তব্যের মূল কথা ছিল এই যে, এলা ও অতীন্দ্রের সুতীব্র ভালোবাসা এবং এই প্রেমোপাখ্যানই হইল এই উপন্যাসের মূল কথা। তিনি লিখিলেন, (৮ই চৈত্র, ১৩৪১):

"যেটাকে এই বইয়ের একমাত্র আখ্যানবস্তু বলা যেতে পারে সেটা এলা ও অতীন্দ্রের ভালোবাসা। নরনারীর ভালোবাসার গতি ও প্রকৃতি কেবল যে নায়ক-নায়িকার চরিত্রের বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে তা নয় চারিদিকের অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের উপরেও।…

"বাইরের এই অবস্থা যেটা আমাদের রাষ্ট্রপ্রচেষ্টার নানা সংঘটনে তৈরি, সেটার অনেকখানি অগত্যা আমার নিজের দৃষ্টিতে দেখা, ও তার কিছু কিছু আভাস আমার নিজের অভিজ্ঞতাকে স্পর্শ করেছে। তার সংবেদন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন রকমের হওয়ারই কথা, তার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারও পার্থক্য আছে। কিন্তু গল্পটাকে যদি সাহিত্যের বিষয় বলে মানতে হয় তাহলে এ নিয়ে তর্ক অনাবশ্যক, গল্পের ভূমিকারূপে আমার ভূমিকাকেই স্বীকার করে নিতে হবে।…

পরিশেষে কবি বলেন:

"চার অধ্যায়ের রচনায় কোনো বিশেষ মত বা উপদেশ আছে কিনা সে-তর্ক সাহিত্যবিচারে অনাবশ্যক। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এর মূল অবলম্বন কোনো আধুনিক বাঙালী নায়ক-নায়িকার প্রেমের ইতিহাস। সেই প্রেমের নাট্যরসাত্মক বিশেষত্ব ঘটিয়েছে বাংলাদেশের বিপ্লবপ্রচেষ্টার ভূমিকায়। এখানে সেই বিপ্লবের বর্ণনা-অংশ গৌণ মাত্র; সেই বিপ্লবের ঝোড়ো আবহাওয়ায় দুজনের প্রেমের মধ্যে যে তীব্রতা যে বেদনা এনেছে সেইটেতেই সাহিত্যের পরিচয়। তর্ক ও উপদেশের বিষয় সাময়িক-পত্রের প্রবন্ধের উপকরণ।" [রবীন্দ্র-রচনাবলী: ১৩শ খণ্ড; পৃঃ. ৫৪৩-৪৫]

কবির এই যুক্তি যদি মানিয়াও লওয়া যায়, তবুও বলিতে হইবে যে, ইহা তো

শুধুমাত্র এলা-অতীনের প্রেমের উপাখ্যানই নয়। যেখানে তাহাদের এই ভালোবাসার সুতীব্র বাসনা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে সেখানে তাহার রসগ্রহণে বাধা থাকে না। কিন্তু 'সেই প্রেমের নাট্যরসাত্মক বিশেষত্ব ঘটিয়েছে বাংলা দেশের বিপ্লব প্রচেষ্টার ভূমিকায়' এবং 'সেই বিপ্লবের বর্ণনা-অংশ'—যেটাকে তিনি বলিতে চাহিয়াছেন গৌণ—সেটা যদি ঐতিহাসিক দিক হইতে যথাযথ না-হয় তবে তাহা লইয়া সমালোচনা ও তর্ক-বিতর্ক উঠিবেই।

কেননা কবি তাঁহার এই উপন্যাসে বাংলাদেশের বিপ্লব প্রচেষ্টার পটভূমিই শুধু গ্রহণ করেন নাই,—একটি বিপ্লবী দলের নেতা ও কর্মীদের তাঁহার উপন্যাসের আসল চরিত্র ও নায়ক-নায়িকা করিয়াছেন। এই দল কবির কল্পিত কিছু একটা সৃষ্টি নয়—পরন্তু যাহারা দীর্ঘকাল জুড়িয়া বাংলাদেশের যুবচিত্তকে প্রচণ্ড সংক্ষোভে উন্মথিত করিয়া আপন রক্তের অক্ষরে ইতিহাস সৃষ্টি করিতেছিল তাহারাই এই উপন্যাসের প্রধান পাত্রপাত্রী। এই কারণেই এই দলের উদ্দেশ্য, মতাদর্শ ও কার্য-কলাপকে তাহার সত্যকার রূপে ও বর্ণে (in their true official colour) চিত্রিত করার দায়িত্ব লেখকের থাকিয়াই যায়। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ রাজনীতিক পটভূমিতে বিপ্লবী দলের সদস্যদের লইয়া একটি প্রেমের উপাখ্যান লেখাতে কবির কোনো অন্যায় বা ভুল হয় নাই, কিন্তু যখন সেই দলের বিভ্রান্ত এক নায়কের মুখে সেই দলের শুধুমাত্র ক্লেদাক্ত দিকটিই উদ্ঘাটিত হইয়াছে তখন তাহার সমালোচনার ভাগ লেখক হিসাবে কবিকে চিরদিনই বহন করিতে হইবে। কবি যদি এই উপন্যাসে ইন্দ্রনাথ ও অতীনের মুখে রাজনীতিক মতাদর্শ ও তত্ত্বকথা না-বলিতেন ও তাহাদের জবানীতে বিপ্লবীদলের কার্য-বিবরণ না দিতেন, তবে তাঁহার সে-দায়িত্ব অবশ্যই থাকিত না।

এইসব দিক থেকে 'চার অধ্যায়'-এর কয়েকটি ত্রুটির কথা আলোচনা করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,-ইন্দ্রনাথের চরিত্র তিনি যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তাহাতে সত্যই কি বাংলাদেশের বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্বকে সে প্রতিনিধিত্ব করিয়াছে? ইন্দ্রনাথ তাহার জীবনাদর্শ ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কানাই গুপ্তকে যে-কথা বলে, তাহা লক্ষণীয় :

"আমার মনে কোনো অন্ধ বিশ্বাস নেই কানাই। হারজিতের কথা ভাবা একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। প্রকাণ্ড কর্মের ক্ষেত্রে আমি কর্তা, এইখানেই আমাকে মানায় বলেই আমি আছি,—এখানে হারও বড়ো জিতও বড়ো। ওরা চারদিকের দরজা বন্ধ করে আমাকে ছোটো করতে চেয়েছিল. মরতে মরতে প্রমাণ করতে চাই আমি বড়ো। আমার ডাক শুনে কত মানুষের মতো মানুষ মৃত্যুকে অবজ্ঞা করে চারিদিকে এসে জুটল; সে তো তুমি দেখতে পাচ্ছ কানাই। কেন? আমি ডাকতে পারি বলেই। সেই কথাটা ভালো করে জেনে এবং জানিয়ে যাব, তার পরে যা হয় হ'ক।...আর বেশি কী চাই? ঐতিহাসিক মহাকাব্যের সমাপ্তি হতে পাবে পরাজয়ের মহাশ্মশানে। কিন্তু মহাকাব্য তো বটে। গোলামি-চাপা এই খর্ব মনুষ্যত্বের দেশে মরার মতো মরতে পারাও যে একটা সুযোগ।"

ইন্দ্রনাথ আরও বলে :

..."ডাক দিই অসাধ্যের মধ্যে, ফলের জন্যে নয়, বীর্য প্রমাণের জন্যে। আমার

স্বভাবটা ইম্পার্সোন্যাল। যা অনিবার্য তাকে আমি অক্ষুব্ধমনে স্বীকার করে নিতে পারি। ইতিহাস তো পড়েছি, দেখেছি কত মহা মহা সাম্রাজ্য গৌরবের অভ্রভেদী শিখরে উঠেছিল আজ তারা ধুলোয় মিলিয়ে গেছে,—তাদের হিসেবের খাতায় কোথায় মস্ত একটা দেনা জমে উঠেছিল যা তারা শোধ করে নি। আর এই দেশ যেহেতু এ আমারই দেশ, সৌভাগ্যের চিরস্বত্ব নিয়ে ইতিহাসের উঁচু গদিতে গদিয়ান হয়ে বসে থাকবে পরাভবের সমস্ত কারণগুলোর গায়ে সিঁদুরচন্দন মাখিয়ে ঘণ্টা নেড়ে পুজো করতে করতে, বোকার মতো এমন আবদার করব কার কাছে? আমি তা কখনই করি নে। বৈজ্ঞানিকের নির্মোহ মন নিয়ে মেনে নিই যার মরণদশা সে মরবেই।"

[রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১৩শ খণ্ড, পৃঃ. ২৮৩-৮৪]

লক্ষ্য করিবার বিষয়, স্বাধীনতার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও পরাধীনতার তীব্র জ্বালা অহোরাত্র ইন্দ্রনাথকে ক্ষুব্ধ, অশান্ত ও অস্থির করিয়া তুলে নাই। ইন্দ্রনাথের কাছে স্বদেশপ্রেম, মানবিকতা, মহান আদর্শবাদ—এসব তুচ্ছ কথা না হইলেও 'সেণ্টিমেণ্টালিজম' মাত্র। ইন্দ্রনাথের ভাষায়,—'দেশকে দেবী বলে মা মা বলে অশ্রুপাত করব না, তবু কাজ করব।' ইংরেজের বিরুদ্ধে তাহার ঠিক আক্রোশও নাই, শত্রুতাও নাই, পরন্তু ইংরেজের মনুষ্যত্বের 'পরে তাহার আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে। বিদেশী রাজত্ব ভিতর থেকে দেশবাসীর আত্মলোপ করিতেছে—এটি সে স্বীকার করে বটে তবুও ফললাভ বা স্বাধীনতা অর্জন ঠিক তাহার লক্ষ্যও নয়। দেশের বীর্য-প্রমাণ করার জন্যই বৈজ্ঞানিকের নৈর্ব্যক্তিক ও নির্মোহ দৃষ্টিতে তাহার ভীষণ ল্যাবোরেটরিতে দেশের যুবকদের লইয়া প্রচণ্ড দুঃসাহসিক ও এ্যাডভেঞ্চারিস্ট মহানাট্য রচনা করাই তাহার সাধনা, আর সে-নাটকে মহা-নায়কগিরি করিবেন স্বয়ং ইন্দ্রনাথ। আসলে তাহার বিকৃত ব্যক্তিত্ববাদ—তাহার উৎকট ও বীভৎস বীররস বা বীর্যবত্তার মোহে, সে একজন প্রচণ্ড দাম্ভিক এবং নীতিজ্ঞানবর্জিত হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ক্ষমতালোভী নায়কের প্রচণ্ড প্রহসন মাত্র। বস্তুত তাহার কোনো আদর্শবাদও নাই।

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, বাংলার বিপ্লববাদী নেতৃত্বের এই কি প্রকৃত স্বরূপ নাকি? আরও প্রশ্ন থাকিয়া যায়, এই উপন্যাসে বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার বর্ণনা দিতে গিয়া কেন তিনি ইন্দ্রনাথের মত নায়ককেই বাছিয়া লইলেন? অরবিন্দ, ব্যারিস্টার পি. মিত্র, সরলাদেবী, পুলিন দাস, যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায় হইতে শুরু করিয়া সূর্য সেন এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতাদের আদর্শবাদ ও চরিত্র-সম্পদ, তখনকার দিনে একেবারে অজানা কিছু ছিল না। অথচ কবির 'ঘরে বাইরে' অথবা 'চার অধ্যায়'-এ তাঁহাদের মত কোনো চরিত্র দেখা যায় না কেন, স্বভাবত এ প্রশ্ন উঠিবেই।

কবি তাঁহার কৈফিয়তে লিখিয়াছেন :

"একজন মহিলা আমাকে চিঠিতে জানিয়েছেন যে তাঁর মতে ইন্দ্রনাথের চরিত্রে উপাধ্যায়ের জীবনের বহিরংশ প্রকাশ পেয়েছে আর অতীন্দ্রের চরিত্রে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর অন্তরতর প্রকৃতি। এ কথাটি প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নেই।"

[রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১৩শ খণ্ড, পৃঃ. ৫৪৫]

অর্থাৎ কবি কতকটা স্বীকার করিয়া লইতেছেন, ইন্দ্রনাথের চরিত্রে ব্রহ্মবান্ধবের

বহিরংশ প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সত্যই কি তাই? ব্রহ্মবান্ধবকে কবি খুবই ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন এবং কবি স্বয়ং তাঁহার ভূমিকায় 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার সহিত ইন্দ্রনাথের চরিত্রের সংগতি কোথায়?

তারপর অতীন্দ্রের জবানীতে কবি বিপ্লবীদলের মতাদর্শ ও কার্যকলাপের যে বিবরণ ও পরিচয় দিয়াছেন তাহা কতখানি বাস্তবানুগ হইয়াছে, তাহাও বিচার্য-বিষয়। দল সম্পর্কে অতীন্দ্রের বিভ্রান্তি যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে তখন সে ক্ষুব্ধকণ্ঠে এলাকে বলে :

"আমি আজ স্বীকার করব তোমার কাছে—তোমরা যাকে পেট্রিয়ট বলো আমি সেই পেট্রিয়ট নই। পেট্রিয়টিজ্‌মের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চ না মানে তাদের পেট্রিয়টিজ্‌ম কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়ানৌকো। মিথ্যাচারণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতালাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়। এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই গর্তের ভিতরকার কুশ্রী জগৎটার মধ্যে দিনরাত মিথ্যের বিষাক্ত হাওয়ায় কখনোই নিজের স্বভাবে সেই পৌরুষকে রক্ষা করতে পারব না যাতে পৃথিবীতে কোনো বড়ো কাজ করতে পারা যায়।

…"দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা যায় এই ভয়ংকর মিথ্যে কথা পৃথিবীসুদ্ধ ন্যাশনালিস্ট আজকাল পাশবগর্জনে ঘোষণা করতে বসেছে, তার প্রতিবাদ আমার বুকের মধ্যে অসহ্য আবেগে গুমরে গুমরে উঠছে—এই কথা সত্য-ভাষায় হয়তো বলতে পারতুম, সুরঙ্গের মধ্যে লুকোচুরি করে দেশ-উদ্ধারচেষ্টার চেয়ে সেটা হত চিরকালের বড়ো কথা।…"

শেষের দিনে এলার কাছে অতীন্দ্র তীব্র খেদোক্তি করে :

"কী না করতে পারি আমি। পড়েছি পতনের শেষ সীমায়। সেদিন আমাদের দল অনাথা বিধবার সর্বস্ব লুঠ করে এনেছে। মন্মথ ছিল বুড়ীর গ্রামসম্পর্কে চেনা লোক—খবর দিয়ে পথ দেখিয়ে সে-ই এনেছে দলকে। ছদ্মবেশের মধ্যেও বিধবা তাকে চিনতে পেরে বলে উঠল, মনু, বাবা তুই এমন কাজ করতে পারলি? তার পরে বুড়ীকে আর বাঁচতে দিলে না। যাকে বলি দেশের প্রয়োজন সেই আত্মধর্মনাশের প্রয়োজনে টাকাটা এই হাত দিয়েই পৌঁছেছে যথাস্থানে। আমার উপবাস ভেঙেছি সেই টাকাতেই। এতদিন পরে যথার্থ দাগি হয়েছি চোরের কলঙ্কে, চোরাই মাল ছুঁয়েছি, ভোগ করেছি। চোর অতীন্দ্রের নাম বটু ফাঁস করে দিয়েছে।"…

[ঐ : পৃঃ. ৩১৬, ৩২৭]

উপন্যাসের স্বার্থে কবি অতীন্দ্রের যে চারিত্রিক ও মানসিক ধাতুগত বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছেন তাহাতে তাহার এই ধরনের মানসিক প্রতিক্রিয়া ও বিভ্রান্তি আসাটা হয়ত স্বাভাবিক। কিন্তু অতীন্দ্রের জবানিতে বাংলার বিপ্লবপ্রচেষ্টার যে-স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে উহাই কী তাহার সত্যকার যথার্থ পরিচয়? বাংলার সুদীর্ঘ বিপ্লবপ্রচেষ্টা শুধুই কী ডাকাতি, হত্যা, মিথ্যাচরণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতালোভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তির কলুষিত ও কলঙ্কিত ইতিহাস? বিপ্লবীদেরও

যে একটা কঠিন ethical & moral code ছিল, এ তো ইংরেজ গভর্নমেণ্টের গুপ্তচর বিভাগ ও পুলিশের বড়কর্তারাও স্বীকার করিয়াছেন। উপন্যাসে অতীন্দ্রের জবানি ছাড়া আর কোনো উপলক্ষেই এই আন্দোলনের কোনো মহান স্বরূপ তো প্রকাশ পাইল না।

নাটকের শেষ অঙ্কে আখ্যানভাগে যে-দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও উল্লেখযোগ্য। পুলিশের অত্যাচার ও পীড়নের মুখে এলা দলের গোপন কথা ফাঁস করিয়া দিবে, এই আশঙ্কায় দলের পক্ষ থেকে এলাকে পৃথিবী থেকে সরাইয়া ফেলিবার দায়িত্বভার দেওয়া হয় অন্তুর 'পরে। কিন্তু এরকম ঘটনা কিছুটা অবাস্তব —অন্তত বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে এমন ঘটনার বড় একটা নজির পাওয়া যায় না। সরলাদেবীর মত নেত্রীস্থানীয়াদের কথা বাদ দিলেও,—বিপ্লবীরা শান্তি, সুনীতি, প্রীতিলতা, কল্পনা, বীণা ও উজ্জ্বলার মত অপরিণত বয়স্কা স্কুল-কলেজের মেয়েদের 'পরেই 'এ্যাকশন'-এর নেতৃত্ব করার দায়িত্ব দিয়াছিলেন। অত্যাচার ও পীড়নের মুখে মেয়েরা দলের গোপন কথা ফাঁস করিয়া দিবে—বিশেষত এলার মত মেয়েরা—বিপ্লবীরা একথা কখনও বিশ্বাস করিতেন না। বিপ্লবীদের গোপন কার্যকলাপের প্রধান সহায় ছিলেন তাঁহাদের মা-বোন-পিসিমা-মাসিমা ও আত্মীয়ারা। গ্রামের কত কত অশিক্ষিতা মেয়েদের 'পরে অত্যন্ত বিপজ্জনক ও গুরুদায়িত্বভার দেওয়া হয়। পুলিশী নির্যাতনের ঝড় তাহাদের 'পরে বহিয়া গিয়াছে কিন্তু তাঁহারা যে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দেন ইতিহাসে তাহার তুলনা বিরল।

অতীন্দ্র-এলার প্রেমোপাখ্যানের কথা বাদ দিলেও সমগ্র উপন্যাসটিতে কবির রাজনীতিক মতাদর্শ অত্যন্ত সুকৌশলে পরিবেশিত হইয়াছে এবং সেইভাবেই উপন্যাসের কাঠামো, অবয়ব, পাত্র-পাত্রী সংলাপ ও ঘটনাবলীর বিন্যাস করা হইয়াছে, একথা একটু লক্ষ্য করিলেই পরিষ্কার বুঝা যায়। 'চার অধ্যায়'-এ সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি তীব্র ও কঠোরভাবে নিন্দিত হইয়াছে, তা বলাই বাহুল্য। শুধু এই উপন্যাসেই নয়,—একেবারে সূচনাকাল থেকেই কবি বিপ্লববাদীদের সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ সমর্থন করিতে পারেন নাই এবং কেন পারেন নাই সে-কথাও পূর্বেই আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। অথচ অন্যত্র কবি তাঁহার কবিতায়, প্রবন্ধে ও বিবৃতিতে বিপ্লবীদের দুর্জয় সাহস, ত্যাগ, বীরত্ব, অগাধ দেশপ্রেম ও অপরাজেয় মনোবলের বার বার অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন। তাছাড়া যখনই তাহাদের উপর ইংরেজের অত্যাচার ও নির্যাতনের ঝড় নামিয়া আসিয়াছে তখনই তাহার প্রতিবাদ করিয়া কবি দেশের মুক্তিপাগল ছেলেদের রক্ষা ও মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বহুকাল আগেই 'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধে (অগ্রহায়ণ, ১৩২৪) কবি বাংলার মুক্তিপাগল বিপ্লবী তরুণদের উদ্দেশে তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া লিখিয়াছিলেন :

"কিন্তু একটা কথা ভুলিলে চলিবে না যে, দেশ ভক্তির আলোকে বাংলাদেশে কেবল যে চোর-ডাকাতকে দেখিলাম তাহা নহে, বীরকেও দেখিয়াছি। মহৎ আত্মত্যাগের দৈবী শক্তি আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যেমন সমুজ্জ্বল করিয়া দেখিয়াছি এমন কোনো দিন দেখি নাই। ইহারা ক্ষুদ্র বিষয়বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রবল নিষ্ঠার

সঙ্গে দেশের সেবার জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই পথের প্রান্তে কেবল যে গবর্নমেণ্টের চাকরি বা রাজসম্মানের আশা নাই তাহা নহে, ঘরের বিজ্ঞ অভিভাবকদের সঙ্গেও বিরোধে এ রাস্তা কণ্টকিত। আজ সহসা ইহাই দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি যে, বাংলাদেশে এই ধনমানহীন সংকটময় দুর্গম পথে তরুণ পথিকের অভাব নাই। উপরের দিক হইতে ডাক আসিল, আমাদের যুবকেরা সাড়া দিতে দেরি করিল না ; তারা মহৎ ত্যাগের উচ্চ শিখরে নিজের ধর্মবুদ্ধির সম্বল মাত্র লইয়া পথ কাটিতে কাটিতে চলিবার জন্য দলে দলে প্রস্তুত হইতেছে। ইহারা কংগ্রেসের দরখাস্তপত্র বিছাইয়া আপন পথ সুগম করিতে চায় নাই ; ছোটো-ইংরেজ ইহাদের শুভ সংকল্পকে ঠিকমত বুঝিবে কিম্বা হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিবে, এ দুরাশাও ইহারা মনে রাখে নাই।...আত্মঘাতী শচীন্দ্রের অন্তিমের চিঠি পড়িলে বোঝা যায় যে, এ ছেলেকে যে ইংরেজ সাজা দিয়াছে সেই ইংরেজের দেশে এ যদি জন্মিত তবে গৌরবে বাঁচিতে এবং ততোধিক গৌরবে মরিতে পারিত। আদিম কালের বা এখনকার কালের যে-কোনো রাজা বা রাজার আমলা এই শ্রেণীর জীবনবান ছেলেদের শাসন করিয়া, দলন করিয়া, দেশকে এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত অসাড় করিয়া দিতে পারে। ইহাই সহজ, কিন্তু ইহা ভদ্র নয়, এবং আমরা শুনিয়াছি ইহা ঠিক 'ইংলিশ' নহে।...দেশের সমস্ত বালক ও যুবককে আজ পুলিশের গুপ্ত দলনের হাতে নির্বিচারে ছাড়িয়ে দেওয়া—এ কেমনতরো রাষ্ট্রনীতি ? এ-যে পাপকে হীনতাকে রাজ-পেয়াদার তকমা পরাইয়া দেওয়া। এ-যেন রাতদুপুরে কাঁচা ফসলের খেতে মহিষের পাল ছাড়িয়া দেওয়া।"...

[ছোটো ও বড়ো : কালান্তর ; পৃঃ. ১০৩-০৫]

স্মরণ রাখা দরকার, পরবর্তীকালে আন্দামান বন্দী ও বেঙ্গল ডেটিনিউ মুক্তি আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন পুরোধাস্বরূপ।

এই প্রসঙ্গে সর্বশেষে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। 'চার অধ্যায়' যখন প্রকাশিত হয়, তখন বিপ্লবীদল ও গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সন্ত্রাসবাদী নীতি ও কর্মপন্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা ও তীব্র আত্ম-সমালোচনা শুরু হইয়াছে। কিন্তু তা 'হিংসা ও অহিংসা' কিংবা 'লক্ষ্য ও পন্থা'র (Ends & Means) বিতর্ক লইয়া নয়। বিপ্লববাদেও তাঁহারা আস্থা হারান নাই, পরন্তু এই সময় থেকেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী-রাজনীতিতে তাহারা অধিকতর আকৃষ্ট হয়। অবশ্য খুব অল্পসংখ্যক বিপ্লবী যে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহী রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন নাই তা নয়, তবে অধিকাংশ বিপ্লবীই এই সময় কারাগারে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনীতিতে পাঠ ও অনুশীলন-চর্চা করিতে থাকেন। উত্তরকালে তাঁহারাই 'কমিউনিস্ট পার্টি', 'কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি', 'রেভল্যুশানরী সোস্যালিস্ট পার্টি',—ইত্যাদিতে যোগদান করিয়াছেন।

পরিশেষে একটি কথা। 'চার অধ্যায়'-এ বিপ্লবীদের অন্তর্নিহিত স্ববিরোধী প্রবণতা এবং তাদের অন্তর-জীবনের বা আভ্যন্তরীণ জীবনের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা একেবারেই ভিত্তিহীন কিংবা কবির নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত কিছু নয়। চন্দ্রেরও আলোকিত অংশের বিপরীতে কলঙ্কের দিক আছে। বাংলার বিপ্লবীদের নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে কবির ঘনিষ্ঠভাবে দেখিবার ও জানিবার সুযোগ হইয়াছিল, যাঁহারা

যৌবনের রোমাঞ্চকর অধ্যায় অতিক্রম করিয়া রূঢ় বাস্তবের বা সত্যের মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সন্ত্রাসবাদ যে পন্থা হিসেবে ভুল ও ক্ষতিকারক পন্থা, কেউ কেউ ছাপার অক্ষরে স্বীকারোক্তি করিয়া ইতিমধ্যেই তাঁহাদের প্রতিক্রিয়ার বা আত্মসমালোচনার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এইসব বক্তব্য ও প্রতিক্রিয়া জানিবার পর কবি তাঁহার পূর্বমত আরও দৃঢ়ভাবে বলিবার তাগিদ অনুভব করেন। সন্ত্রাসবাদ যে ভুল এবং আত্মহননের পথ, একথা কবি ১৯০৮ সাল থেকেই বার বার ঘোষণা করিয়া বাংলার তরুণ ও যুবকদের উদ্দেশ্যে হুঁসিয়ার করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কবির 'চার অধ্যায়' রচনার পশ্চাতে অন্যতম এই উদ্দেশ্যই যে কাজ করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কারুশিল্প ও পল্লী-উন্নয়নের প্রশ্নে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচন ও জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার কিছুকাল পরে পাটনাতে নবগঠিত ওয়ার্কিং কমিটির তিনদিনব্যাপী এক বৈঠক হয় (৫-৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪)। এই বৈঠকে জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটির রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা ও নিন্দাবাদ করিয়া উহা বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। এবং এই সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতির পুনরায় ব্যাখ্যা করিয়া বলা হয় যে, একমাত্র গণ-পরিষদই ভারতের সত্যকার শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবার অধিকারী।

উহার প্রায় দেড়মাস পরে দিল্লীতে ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন শুরু হয় (২১শে জানুয়ারি, ১৯৩৫)। পরিষদে ভুলাভাই দেশাই কংগ্রেস দলের এবং মহম্মদ আলি জিন্না 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টি'র নেতা নির্বাচিত হন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পরিষদে নূতন ভারত সংস্কার আইনটি গোটাগুটি বর্জনের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু জিন্না উহা সম্পূর্ণভাবে বর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাই কংগ্রেসের প্রস্তাবটি পরাজিত হয়। তবে ইহার পর জিন্না তিনটি সংশোধনী প্রস্তাব আনিলে শেষোক্ত দুটিতে কংগ্রেসের সমর্থন লাভ করেন। এবং সে-তিনটি সংশোধনী প্রস্তাবের মূল কথা ছিল এই: (১) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলিত বা ঐক্যবদ্ধ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাটি গ্রহণ; (২) প্রাদেশিক ক্ষেত্রে আইনটির মারাত্মক ত্রুটির সমালোচনা; (৩) যুক্তরাষ্ট্র গঠনের (All India Federation) পরিকল্পনার মৌলিক মতপার্থক্যগত কারণে উহার বর্জন এবং সে ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ব্রিটিশভারতেই পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তনের দাবী। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত দুটি সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ফলে জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটির রিপোর্টের সারবস্তুটিই আহত হয়। আইন সভার বাহিরেও এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে আপত্তি ও বিক্ষোভ জানাইবার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ৭ই ফেব্রুয়ারী সারা দেশব্যাপী 'প্রতিবাদ দিবস' পালনের আহ্বান জানানো হয়।

কলিকাতা থেকে ফিরিয়া কবি শান্তিনিকেতনেই ছিলেন। ভারত সংস্কার আইন সম্পর্কে দেশের এই রাজনীতিক উত্তেজনা সম্পর্কে তাঁহার বিশেষ কোনো আগ্রহ ছিল না। এ-সম্পর্কে তাঁহার ব্যক্তিগত মতামত পূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ আসে। কয়েকমাস পূর্বেই এই সমাবর্তন উৎসব হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পণ্ডিত মালব্যের অসুস্থতার জন্য উহা স্থগিত রাখা হয়।

কবি কাশীযাত্রার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় বাংলার তদানীন্তন গভর্নর, স্যার জন এণ্ডারসন্ শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই অবস্থায় মানসিক বিরক্তি ও অনিচ্ছাসত্ত্বেও কতকটা ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধের খাতিরেই কবিকে এই প্রস্তাবে রাজি হইতে হয়। বলা বাহুল্য, এই ঘটনাটি উপলক্ষে দেশে নানা বিরূপ সমালোচনা চলিতে থাকে। স্মরণ রাখা দরকার, বাংলাদেশের বিপ্লববাদ দমনের জন্য এণ্ডারসন্ যে বীভৎস দমননীতি অবলম্বন করেন তাহার ফলে সারা দেশে তাঁহার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। কয়েক মাস পূর্বে দার্জিলিঙে বিপ্লবীগণ কর্তৃক তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা হইলে কবি সিংহল থেকে তাঁহাকে যে শুভেচ্ছাজ্ঞাপক তারবার্তাটি প্রেরণ করেন তাহাও অনেকে ভালোভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাছাড়া 'চার অধ্যায়' প্রকাশিত হওয়ার পর, এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য সম্পর্কেও তর্কবিতর্ক শুরু হয়। এইসব কারণে এণ্ডারসনের শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের ব্যাপারটিও লোকে ভালোভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এদিকে গভর্নরের শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের পূর্বেই পুলিশ তাঁহার নিরাপত্তার ব্যাপারে এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব দেয় যাহার ফলে কবি অত্যন্ত উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। এই সম্পর্কে 'রবীন্দ্রজীবনী'কার লিখিতেছেন :

…"এ-হেন লাটসাহেবের আগমন উপলক্ষ্যে স্থানীয় জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও বঙ্গীয় পুলিশ বিভাগ যেরূপ কড়াক্কড়ি ও জবরদস্তি করিতে লাগিলেন, তাহা যেমন বিরক্তিকর, তেমনি হাস্যোদ্দীপক। পুলিশ বিভাগ হইতে জানানো হয় যে, গভর্নরের নিরাপত্তার জন্য শান্তিনিকেতন-কলেজের কয়েকজন ছাত্রকে তাঁহারা সাময়িকভাবে আটক রাখিবেন। কবি এই কথা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হন; জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কে. এস্. মুখার্জিকে জানাইয়া দিলেন যে, এইরূপ ব্যবহার করিলে তিনি আশ্রম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবেন, গভর্নরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য থাকিবেন না। যাহাই হউক, কবির নির্দেশে আশ্রমবাসী ছাত্র অধ্যাপক সকলেই শ্রীনিকেতন-উৎসবে (৬ ফেব্রুয়ারি) চলিয়া গেলেন; আশ্রমে থাকিলেন কয়েকজন বিভাগীয় কর্তা মাত্র। তাঁহারাও, পুলিশের কর্তা ও কর্মসচিবের সহিযুক্ত ছাড়পত্র বা পাস্ লইয়া পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের লোকদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া শূন্য পুরীতে রাজপ্রতিনিধির অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন! আন্ডার্সন ছাত্রশূন্য বিদ্যায়তন দেখিয়া গেলেন।"… [রবীন্দ্রজীবনী : চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৩]

গভর্নর চলিয়া গেলে পর ঐদিনই অপরাহ্ণে কবি কাশী যাত্রা করেন (৬ই ফেব্রুয়ারী)। ৮ই ফেব্রুয়ারী কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত

হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কবিকে ডি. লিট্‌ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এইদিন কবি তাঁহার ভাষণে তৎকালীন বিশ্বপরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের গুরুদায়িত্বের কথাটি স্মরণ করাইয়া দিয়া যাহা বলিলেন, তাহার মর্মার্থ ছিল এই :

"জগতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বর্তমানে কেবলমাত্র হিংসার সম্পর্কই বিদ্যমান। যে জাতি যত বেশিমাত্রায় আতঙ্ক সৃষ্টি করিতে পারে, সেই জাতি তত সামর্থবান বলিয়া বিবেচিত হয়। ফলে ভীতি সঞ্চার ও ধাপ্পাবাজীর প্রতিযোগিতায় প্রভূত সম্পদের অপব্যয় হইতেছে। শীঘ্রই এক মহা-আহ্বান শ্রুত হইবে এবং তমিস্রা রজনীর ঘোর অন্ধকার ভেদ করিয়া সত্যের বিমল জ্যোতি প্রকাশিত হইয়া এই রাজনীতিক দুঃস্বপ্নের অবসান হইবে। ভারতের অবস্থা কিন্তু একটু স্বতন্ত্র। আমাদের কণ্ঠস্বরে এখনো অতটা কৃত্রিমতা প্রশ্রয় পায় নাই ;—আমাদের কর্তব্যের এখনও সত্য প্রকাশের উপযোগী মনুষ্য-কণ্ঠস্বরই রহিয়াছে। রাজনীতিক কর্মক্ষেত্রে ভারত যদিও পরাজিত ও বিপর্যস্ত হইলেও ভারতের সত্যের ধ্বজা ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিবার গুরুদায়িত্বভার বহন করিয়া চলিতে হইতেছে। অরণ্যে রোদন হইলেও ভারতের কণ্ঠ সত্যের মর্যাদা ঘোষণায় ক্ষান্ত হইবে না—ভারত তাহার শ্রেষ্ঠ দান শিক্ষার আকারে সমগ্র বিশ্বকে দান করিবে।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৭শে মাঘ, ১৩৪১ ; ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫]

এই সময় দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে এক সম্মেলন আহূত হয়। পণ্ডিত মালব্য ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। মালব্যজী কবিকে এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকিবার অনুরোধ করিলে কবি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলেন যে, এই ধরনের রাজনীতিক সভা-সম্মেলনে তাঁহার যোগদান না করাটাই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য ইহার প্রায় দেড় বৎসর পরে কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে যে জনসভা হয় কবি স্বয়ং উহাতে সভাপতিত্ব করিয়া সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন (৩২শে আষাঢ়, ১৩৪৩)। পরে যথাস্থানে তাহা আলোচিত হইবে। দিল্লীর এই সম্মেলনে কবির যোগদান না করার সম্ভবত একটি কারণ এই যে, এই সময় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পরিবর্তে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্মিলিত কোনো আপস-চুক্তির সূত্র অনুসন্ধানের জন্য কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মুসলিম লীগ্‌ সভাপতি জিন্নার মধ্যে এক দীর্ঘ আপস-আলোচনা চলিতেছিল (২৩শে জানুয়ারি-১লা মার্চ, ১৯৩৫)। সম্ভবত কবি এই আপস-আলোচনার সম্পর্কে আশাবাদীর দৃষ্টিতে অপেক্ষা করিতেছিলেন যদি ইহার ফলে আপস-মীমাংসার কোনো সাধারণ সূত্র আবিষ্কৃত হয়। যাহাই হোক, কবি ইহাতে যোগদান করেন নাই। কিছুদিন পর বিখ্যাত সাংবাদিক চিন্তামণির (C. Y. Chintamani) সভাপতিত্বে দিল্লীতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় (১১ই ও ১২ই ফাল্গুন, ১৩৪১ ; ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫)। কবির সুহৃদ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও বাংলাদেশের আরও অনেকে ইহাতে যোগদান করেন।

কাশী সমাবর্তন উৎসবের পরদিনই কবি মোটরে এলাহবাদে পৌঁছিলেন। কিন্তু এলাহবাদে পৌঁছিয়াই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। দু'-একদিন পর একটু সুস্থ বোধ করিলে তিনি কয়েকটি ছোট-খাট সভা-সমিতি ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান

করেন। এলাহবাদে চার-পাঁচদিন কাটাইয়া লাহোর যাত্রা করেন। লাহোরে কবি শ্রীধনীরাম ভল্লার আতিথ্য গ্রহণ করেন। লাহোরে কবি প্রায় সপ্তাহকাল কাটান। কিন্তু শারীরিক সম্পূর্ণ সুস্থ না-থাকার দরুন বড় রকমের কোনো সভা-সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন নাই। পাঞ্জাবে তখন সাম্প্রদায়িক বিরোধ-বিদ্বেষে আবহাওয়া বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহাতে কবি অত্যন্ত মর্মাহত হন। একদিন সাংবাদিকদের সম্মুখে কবি তাঁহার এই মনোবেদনার কথা ব্যক্ত করিয়া সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মৈত্রী প্রচারের জন্য তাঁহাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করিবার আহ্বান জানাইলেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারী কবি লাহোর থেকে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করেন।

লক্ষ্ণৌতে কবি অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্তের আতিথ্য গ্রহণ করেন। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইদিন বক্তৃতাও করিতে হয়। অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও তখন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদ কবির উদ্দেশ্যে একটি সঙ্গীতের জলসার আয়োজন করেন। এই জলসায় বিখ্যাত সঙ্গীতশাস্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ রতনঝনকর কণ্ঠসঙ্গীতে মার্গ-সঙ্গীতের রাগ ও রূপ পরিবেশন করেন। কবি অসুস্থ শরীরেও এই জলসায় উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরিবার পর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে তাঁহার বেশ কিছুকাল পত্র-বিনিময় চলে। এগুলি পরে 'সুর ও সঙ্গতি' গ্রন্থে সংকলিত হইয়া প্রকাশিত হয়। উহার বিস্তারিত আলোচনা আমাদের বিষয় বহির্ভূত। এখানে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে, কবি সঙ্গীত ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রীয় রীতির (Classical & traditional art) অন্ধ অনুবর্তনকে কখনও স্বীকার করেন নাই। কবি পূর্ব ও পশ্চিমের সাংস্কৃতিক মিলনে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করিতেন। এই কারণেই সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পে তিনি পাশ্চাত্য রীতির শ্রেষ্ঠ সবকিছু গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন এবং তিনি স্বয়ং তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছিলেন।

৪ঠা মার্চ কবি উত্তরভারত সফর শেষ করিয়া শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করেন। পরদিন শেঠ যমুনালাল বাজাজ সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে আসেন। তাঁহাদের সঙ্গে আসেন সীতারাম সাকসেনা। তাঁহারা কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া পল্লীশিল্প পুনর্গঠনের বিষয়ে আলোচনা করেন। ঐদিন সন্ধ্যায় শেঠ বাজাজ বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মুখে খাদি সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। পরদিন প্রাতে তাঁহারা কলিকাতা যাত্রা করেন।

ইহার অল্পকাল পরেই বসন্তোৎসব আসিয়া গেল। বসন্ত-উৎসবের দিন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, রণজিৎ পণ্ডিত ও শ্রীমতী কুমারস্বামী প্রমুখ বহু সম্মানিত অতিথির সমাগম হয়।

উহার কয়েকদিন পরেই অধ্যাপক কাজি আবদুল ওদুদ শান্তিনিকেতনে আসেন। হিন্দু-মুসলমান বিরোধ-সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্পর্কে তিনি শান্তিনিকেতনে পর পর তিনদিন বক্তৃতা করেন (২৬, ২৭ ও ২৮শে মার্চ, ১৯৩৫)। কবি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত অধ্যাপক ওদুদের বক্তব্য শুনিলেন। পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের বিষাক্ত আবহাওয়া দেখিয়া আসিবার পর কবির মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ছিল। উল্লেখযোগ্য সাম্প্রদায়িক আপস-মীমাংসার বিষয়ে রাজেন্দ্রপ্রসাদ

ও জিন্নার মধ্যে আলোচনাও ভাঙিয়া যায়। এই সময় কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি পত্রে দেশের রাজনীতিক পরিস্থিতি ও দেশবাসীর চিন্তার পর্যালোচনা করিয়া তাঁহার মানসিক যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করেন (৭ই মার্চ, ১৯৩৫)। পত্রটির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হইল :

"অমিয়, প্রায় এক মাস ধরে ঘুরেছি। এবারে বেরিয়েছিলুম পশ্চিম ভারতের অভিমুখে। গিয়েছি লাহোর পর্যন্ত।...তুমি যে মহাদেশে আছ সেখানে মানুষের চিত্তসমুদ্রে সুরাসুরের মন্থন চলচে, আবর্তিত হয়ে উঠচে বিষ এবং অমৃত প্রকাণ্ড পরিমাণে।...ভারতবর্ষের দিগন্ত আবদ্ধ হয়ে রয়েছে সংকীর্ণতার প্রাচীরে। সেই বেড়ার মধ্যে যা হচ্ছে তাই হচ্চে, তার বাইরের দিকে বেরোবার কোনো গতি নেই। ...তাই আমাদের পলিটিক্স, সাহিত্য, কলাবিদ্যা সব কিছুরই মাপকাঠি ছোটো। এই নিয়ে মহাজাতির পরিচয় গড়ে তোলা অসম্ভব।...

"সর্বত্রই দেখা গেল White Paper নিয়ে আলোচনা চলচে। ছেলেবেলায় কাঙালীবিদায়ের যে দৃশ্য দেখেছি তাই মনে পড়ে গেল। ধনীর প্রাসাদ অভ্রভেদী, তার সদর ফাটক বন্ধ। বাহিরের আঙিনায় জীর্ণ চীরপরা ভিক্ষুকের ভীড়। কেউ পায় চার পয়সা, কেউ দু আনা, কেউ চার আনা। তকমাপরা দ্বারীদের সঙ্গে তাদের যে দাবীর সম্বন্ধ তা কেবল কণ্ঠের জোরে। এই জন্যে তারস্বরের চর্চাটাই প্রবল হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে যেটা লজ্জা, সে এই ভিক্ষুকদের নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছেঁড়ি নিয়ে। যে ব্যক্তি দান করছে সুদূর ঊর্ধ্বে দোতলার বারান্দায় তাদের আত্মীয়কুটুম্বের মজলিশ। যত কম দিয়ে যত বেশি দেওয়ার ভড়ং করা যেতে পারে স্বভাবতই তাদের সেই দিকে দৃষ্টি। রাজদ্বারীদের একহাতে শিকি দুয়ানির থলি, আরেক হাতে লাঠি; সেটা পড়চে, যারা চোখ রাঙায় তাদের মাথার পরে।

"দেখতে দেখতে হিন্দু-মুসলমানের ভেদ অসহ্য হয়ে উঠল, এর মধ্যে ভাবীকালের যে সূচনা দেখা যাচ্ছে তা রক্তপঙ্কিল। লক্ষ্ণৌয়ে এক জন মুসলমান ভদ্রলোক আক্ষেপ করে বলছিলেন, কী করা যায়। আমি বললুম, রাষ্ট্রীয় বক্তৃতামঞ্চে নয়, কাজের ভিতর দিয়ে মিলতে হবে। আজকাল পল্লীগঠনের যে উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছে সেই উপলক্ষ্যে উভয় সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টার ঐক্যবন্ধন সৃষ্টি হতে পারে। তিনি বললেন, আগা খাঁ এই কাজে মুসলমানদের স্বতন্ত্র হয়ে চেষ্টা করতে মন্ত্রণা দিচ্চে। পাছে গান্ধিজির অনুষ্ঠানে পল্লীবাসী হিন্দুমুসলমানের মধ্যে আপনি মিলন ঘটে সেই সম্ভবনাটাকে দূর করবার এই উপক্রম। বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে হিন্দুর সঙ্গে পৃথক হওয়াই মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার প্রধান উপায়। এতকাল ধর্মে যে দুই সম্প্রদায়কে পৃথক করেছিল আজ অর্থেও তাদের পৃথক করে দিল—মিলবে কোন শুভবুদ্ধিতে আপীল করে? না মিললে ভারতে স্বায়ত্তশাসন হবে ফুটো কলসিতে জল ভরা।"

তিনি আরও বলিলেন :

"কোনো এক সময়ে য়ুরোপে যখন প্রলয়কাণ্ড ঘটবে তখন ইংরেজের শিথিল মুষ্টি থেকে ভারতবর্ষ খসে পড়বেই। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো এত বড়ো দেশে দুই

প্রতিবেশী জাতির মজ্জায় মজ্জায় এই যে বিষবৃক্ষ আজ বর্ধিত ও শাখায়িত হ'ল কবে আমরা তাকে উৎপাটিত করতে পারব?···আমরা নিরস্ত্র আমরা নিঃসহায়, বিনাশের সঙ্গে লড়ব কী করে? পঞ্জাবে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে বিচ্ছেদের ছবি দেখে এলুম তা অত্যন্ত দুশ্চিন্তাজনক এবং লজ্জাকররূপে অসভ্য। বাংলার অবস্থা তো জানোই—এখানে উভয়পক্ষের বিকৃতসম্বন্ধের ভিতর দিয়ে প্রায়ই যে সব বীভৎস অত্যাচার ঘটচে তাতে কেবল অসহ্য দুঃখ পাচ্চি তা নয়, আমাদের মাথা হেঁট ক'রে দিলে।

"এখন দোহাই দেবো কার? সভ্যতার দোহাই? কিন্তু একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, মানুষের যে সভ্যতার রূপ আমাদের সামনে বর্তমান, সে সভ্যতা মানুষখাদক।···তার ঐশ্বর্য, তার আরাম, এমন কি তার সংস্কৃতি উপরে মাথা তোলে নিম্নতলস্থ মানুষের পিঠের উপর চ'ড়ে। এই নিয়েই য়ুরোপে আজ শ্রেণীগত বিপ্লবের লক্ষণ প্রবল হয়ে উঠেছে।···যত ক্ষণ লোভ রিপু এই বর্তমান সভ্যতার ও স্বাজাত্যের অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে কাজ করে তত ক্ষণ এর থেকে বলহীনের নিষ্কৃতি নেই; কেননা, যে দুর্বল এই সভ্যতা তারই প্যারাসাইট্। **অতএব প্রবলের হাত থেকে যখন দানপত্র আসবে তখন তা অত্যন্তই হোয়াইট পেপার হয়ে আসবে,** তাতে রক্তের লেশ থাকবে না; সেই পাতে যে উচ্ছিষ্ট আমাদের ভোগে পড়বে সেটা হবে কাঁটাচর্চ্চড়ি, তাতে মাছের গন্ধ থাকবে মাত্র—খাদ্যবস্তু অতি অল্পই থাকবে।···

"এই পেটুক সভ্যতা-সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান হবে কী ক'রে? অধিকাংশ মানুষকে স্বল্পসংখ্যক মানুষের উদ্দেশে নিজেকে কি চিরকালই উৎসর্গ করতে হবে? শুধু তাদের প্রাণরক্ষার জন্যে নয়, তাদের মানরক্ষার জন্যে, তাদের অতিরিক্তের তহবিলকে স্ফীত রাখবার জন্যে!···বিগত যুদ্ধে সেই সহায়তা পেয়ে চার্চহিলও কৃতজ্ঞের বদান্যতায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। আর কখনো যে সেই সহায়তার প্রয়োজন হবে না তা বলা যায় না।···

"যখন সামনে এত বড় দুর্ভেদ্য নিরুপায়তা দেখি তখনি বুঝতে পারি যে **দুর্বলের প্রতি নির্মম সভ্যতার ভিত্তি বদল না হ'লে ধনীর ভোজের টেবিল থেকে উপেক্ষায় নিক্ষিপ্ত রুটির টুক্‌রো নিয়ে আমরা বাঁচব না। সভ্যতার বণিক্‌বৃত্তি যত দিন না ঘুচবে তত দিন ভারতবর্ষকে ইংরেজ মহাজনের পণ্যদ্রব্য হয়ে থাক্‌তেই হবে, কোনোমতেই তার অন্যথা হ'তে পারবে না।** এক পক্ষে লোভ যে-রাষ্ট্রব্যবস্থার সারথি, সেখানে অপর পক্ষে দুর্বলকে বল্গাবদ্ধ বাহন দশা যাপন করতেই হবে। অবস্থাবিশেষে কখনো দানা বেশি জুটবে কখনো কম। অসহিষ্ণু হয়ে যে-জীব হ্রেষাধ্বনি করবে পা-ছোঁড়াছুঁড়ি করবে তার স্পর্ধা টিঁকবে না।"···(বড় হরফ আমার)। [প্রবাসী : বৈশাখ, ১৩৪২ ; পৃঃ. ৭০-৭৩]

বলা বাহুল্য, এই চিঠিও অমিয় চক্রবর্তীকে উদ্দেশ করিয়া লেখা হইলেও বস্তুত ইহা দেশবাসীর উদ্দেশেই কবির খোলা-চিঠি। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়, হোয়াইট পেপার ও ভারত সংস্কার বিলটিকে কবি সেদিন যে কতখানি ঘৃণার চক্ষে দেখিতে-ছিলেন, এই সুদীর্ঘ পত্রের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। শুধু তাহাই নহে,—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কৃপণহস্তের এই যৎসামান্য দান লইয়া দেশের বিভিন্ন

রাজনৈতিক দল ভিক্ষু কাঙালের মত আপনাদের মধ্যে কলহ ও বাদ-বিসম্বাদ করিতেছে, ইহাই সেদিন কবিকে গভীরভাবে পীড়িত করিয়াছে। এই কারণেই দেশের রাজনীতিবিদ্‌দের এই ভিক্ষাবৃত্তি ও চিত্তদৈন্যকে তিনি এই পত্রে বারংবার তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রূপ করিয়াছেন। স্মরণ রাখা দরকার, ইতিপূর্বে 'মণ্ট-ফোর্ড শাসনসংস্কার' পরিকল্পনাটি আলোচনাকালে কবি অনুরূপ তীব্র ভাষায় দেশের রাজনৈতিক দলগুলির এই ভিক্ষুকমনোবৃত্তির নিন্দা ও সমালোচনা করিয়াছিলেন। কবি কোনোদিনই ইংরেজের দয়ার দানে বিশ্বাস করতেন না; তিনি বার বার বলিয়াছেন —'ভিক্ষার দানে আমরা স্বাধীন হইব না।'

অবশ্য কবি যদিও অন্যত্র বহুবার গঠনমূলক কার্যের উপর গুরুত্ব দিয়াছেন তবুও কিভাবে ইউরোপের এই প্রবলতম সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বজ্রমুষ্টি হইতে মুক্তিলাভ করা যায় তাহার কোনো পরিষ্কার পথনির্দেশও এই পত্রে করিতে পারিলেন না। তিনি যেন কতকটা অসহায়ভাবে অনুকূল সময়, অবস্থা ও ঘটনার পরিবর্তনের আশায় অপেক্ষা করিতে চাহিতেছেন। আর সে-অনুকূল মুহূর্ত হয়ত খাস্ ইউরোপেই শ্রেণী-সংঘর্ষ ও বিদ্রোহ-বিপ্লবের মধ্যে অথবা পুনরায় সাম্রাজ্যবাদীদের কোনো আত্মঘাতী মহাযুদ্ধের সুযোগেই আসিতে পারে, এমনই একটা ইঙ্গিত এই চিঠিতে দিয়াছেন। কিন্তু তবুও এই নিরাশার অন্ধকারে সোভিয়েট রাশিয়ার মহান প্রচেষ্টার মধ্যেই তিনি একটি স্থির আলোকবর্তিকা দেখিতেছিলেন।

সোভিয়েট রাশিয়ার এই মহান প্রচেষ্টা সম্পর্কে তিনি (এই পত্রের পাঠান্তরে) লিখিলেন :

"সভ্যতার এই ভিত্তি বদলের প্রয়াস দেখেছিলুম রাশিয়ায় গিয়ে। মনে হয়েছিল নরমাংসজীবী রাষ্ট্রতন্ত্রের রুচির পরিবর্তন যদি এরা ঘটাতে পারে তবেই আমরা বাঁচব নইলে চোখ রাঙানীর ভান করে অথবা দয়ার দোহাই পেড়ে দুর্বল কখনোই মুক্তিলাভ করবে না। নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানবের নবযুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখি নি। জানি প্রকাণ্ড একটা বিপ্লবের উপরে রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু এই বিপ্লব মানুষের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব—এ বিপ্লব অনেকদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান। আর আজ য়ুরোপের যে সভ্যতার পিঞ্জরে বাঁধা হয়ে আছি আমরা, ঐশ্বর্যভোগের বিষবাষ্প তার তলায় জমে উঠেছে। সে কি নিরাপদ প্রতাপের কোনো মন্ত্রের সন্ধান খুঁজে পেয়েছে তার লোহার ক্যাশবাক্সের মধ্যে? অনেক বড়ো বড়ো জাত লুপ্ত হয়েছে, অনেক উদ্দামগতি ইতিহাস হঠাৎ পথের মাঝখানে মুখ থুবড়ে পড়ে স্তব্ধ হয়েছে, আর আমরাই যে White paper-এর ক্ষুদ-কুঁড়ো খুঁটে খুঁটে খেয়ে চিরকাল টিঁকে থাকব এমন আশা করি নে—মরণদশার অনেক লক্ষণ তো দেখতে পাই। কিন্তু সর্বমানবের তরফে তাকিয়ে যখন ভাবি তখন এ মনে আপনি আসে যে, **নব্য রাশিয়া মানব-সভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড়ো মৃত্যুশেল তুলবার সাধনা করছে যেটাকে বলে লোভ। এ প্রার্থনা মনে জাগে যে তাদের এই সাধনা সফল হোক।** দুর্ধর্ষপ্রতাপ জরাসন্ধের কারাগার থেকে শ্রীকৃষ্ণ যেমন বহুকালের বহু বন্দীকে মুক্তি দিয়েছিলেন

তেমনি ধনমদমত্ত সভ্যতার বিরাট কারাগারে শৃংখলাবদ্ধ অসংখ্য বন্দী যেন একদা মুক্তি পায়।" (বড় হরফ আমার) [কবিতা : চৈত্র, ১৩৪৯]

সে-যুগে কোনো খোলা-চিঠিতে ইহার বেশি কিছু লেখা সম্ভব ছিল না। সোভিয়েট রাশিয়ার উপর কবির যে কতখানি আশা ও ভরসা ছিল উপরিউক্ত পত্রে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বজোড়া বন্দীশালা থেকে পৃথিবীর সমস্ত নিপীড়িত দেশ ও জাতির মুক্তিসংগ্রামে সোভিয়েট রাশিয়া যে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবে, কবি তাহা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করিতেন।

গান্ধীজী অবশ্য এই পার্লামেণ্টারী শাসন-সংস্কারের আলোচনায় এতটুকু আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। তিনি তখনও ওয়ার্ধায় গ্রামীণ শিল্পরক্ষার জন্য 'হরিজন'-এ দিনের পর দিন লিখিতেছিলেন। গ্রামের কৃষকের উপকরণহীন সরল জীবনযাত্রা-প্রণালী ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দারিদ্র্যবরণের উদ্দেশ্যে তিনি নিজের উপরও বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করিলেন। বস্তুত উহা শুধু গ্রামীণ শিল্পরক্ষার জন্যও নহে; উহার পশ্চাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনদর্শনের প্রেরণাই অধিক ছিল। গান্ধীজীর জীবন-দর্শনে জৈনধর্মের 'চাতুর্যাম'-এর এবং বৌদ্ধধর্মের 'পঞ্চশীল'-এর সুস্পষ্ট প্রভাব ছিল এবং এই কারণেই তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দারিদ্র্যবরণ ও আধুনিক উপকরণ সভ্যতার বিরোধী ছিলেন। এই কারণেই সুন্দর ও মূল্যবান কারুশিল্পজাত পণ্যদ্রব্যকেও তিনি বিলাসিতা জ্ঞানে ঘৃণা ও বর্জন করিতেন। শুধু তাহাই নহে,—আধুনিক চিকিৎসা ও ঔষধপত্র ব্যবহারেরও তিনি তীব্র সমালোচনা করিতে লাগিলেন। এমন কি সাবান ও বীজাণু-নাশক ঔষধের পরিবর্তে শুষ্ক ছাই এবং 'টুথ-ব্রাশ' ও পেস্টের পরিবর্তে বাবলা ও নিমকাঠি ব্যবহারের কথা বলিলেন। সাধারণ মানুষের কাছে যাহা বেশি আতঙ্কজনক বোধ হইল, সেটি হইতেছে, রসনাতৃপ্তিকারী রন্ধনপদ্ধতির বিরোধিতা করিতে গিয়া তিনি কাঁচা শাকসব্জি খাইবার উপদেশ দিলেন এবং নিজের উপর সেইসব অদ্ভুত পরীক্ষা শুরু করিয়া দিলেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৫) 'হরিজন'-এ তিনি এইসব অভিনব খাদ্য পরীক্ষার (dietetic experiment) অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিলেন :

"For nearly five months, I have been living entirely on uncooked foods. I used to take what appeared to me an enormous quantity of vegetable every day. For the past five months I have been taking green leaves in the place of cooked leaves or other vegetables. It then seemed to me monstrous that I should have to depend upon the Wardha bazar for the few ounces of leaves I needed. One fine morning Chhotelalji of the Wardha Ashram brought to me a leaf that was growing wild among the Ashram grasses. It was *luni*. I tried it, and it agreed with me. Another day he brought *chakwat*. That also agreed. But before recommending these jungle leaves to the public, I thought I would have them botanically identified. Here is the result."... [*Mahatma* : Vol. IV, P. 18]

গান্ধীজীর এই জীবনাদর্শ দেশের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে খুবই প্রভাব বিস্তার করে। সরল জীবনযাত্রার নামে তাঁহারা যাহা কিছু সুন্দর ও শিল্প-সম্মত উহাকেই অবজ্ঞা ও উপহাস করিতে উদ্যত হইলেন। স্বভাবতই ইহাতে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। শান্তিনিকেতনে নববর্ষ উৎসবের ভাষণে তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গীর তীব্র সমালোচনা করিয়া মানুষের সৌন্দর্যবোধের ও শিল্প-চেতনার জয়গান গাহিলেন। তিনি বলিলেন :

"সুন্দরকে অবজ্ঞা করার শিক্ষা আজ এ দেশে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্প্রতি দেখা দিয়েছে। যে অসুন্দরে প্রকাশের পূর্ণতা ভ্রষ্ট হয়, তাকে স্পর্ধাপূর্বক বরণ করবার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে; দারিদ্র্যের অনুকরণ করাকে কর্তব্য ব'লে মনে করছি; ভুলে যাচ্ছি দারিদ্র্যের বাহ্য ছদ্মবেশে আত্মার অবমাননা করা হয়। ঐশ্বর্যই বীরের। ঐশ্বর্য মহৎ, ঐশ্বর্য দাস নয়;...ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করতে চায় বীর্যশালী নির্লোভ নিরাসক্ত মনে।..." [প্রবাসী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২ ; পৃঃ. ১৫৭]

এই সময় জনসাধারণের উপযোগী সাহিত্য সৃষ্টির আন্দোলন শুরু হয়। কিছুকাল পূর্বে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 'গণসাহিত্য সৃষ্টি চাই'—এই শিরোনামায় 'দেশ' পত্রিকায় (১ম বর্ষ, ২৩'শ সংখ্যা ; ২৮শে এপ্রিল, ১৯৩৪ ; পৃঃ. ১৬-১৭) একটি প্রবন্ধ লিখিলে পর এই সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা তর্ক-বিতর্ক উঠে। কবি অবশ্য এই আন্দোলনকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। এই উপলক্ষে তিনি তাঁহার ভাষণে আরও বলেন :

..."সংখ্যা গণনা করলে পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষই বাক্যদীন, শিক্ষার অভাবে শক্তির অভাবে বাক্যের দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করতে জানে না; সেই বাক্যদৈন্যের সাধনাকেই যদি তাদের প্রতি মমতা প্রকাশের উপায় বলে গণ্য করি তবে সেই দীনদেরই সকলেরই চেয়ে বঞ্চিত করা হবে। যে-ভাষার ঐশ্বর্য কাব্যে মহাকাব্যে মহানাটকে, বাণীর সেই ঐশ্বর্যক্ষেত্রেই বাক্যদীনদের আনন্দসত্র...দেবতা যেমন সর্ববর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষেরই, শিল্পৈশ্বর্যের প্রকাশও তেমনই সকল মানুষেরই। তাকে বোঝবার, স্বীকার করবার শিক্ষা অবস্থানির্বিশেষে সকলেরই হোক এই কথাটাই বলবার যোগ্য। শোনা যায় এসকিলস, সফোক্লিস, য়ুরিপিডীস প্রমুখ মহৎ প্রতিভাবান নাট্যকারদের নাটক এথেন্সের সর্বসাধারণের জন্যেই অভিনীত হয়েছে—সর্বসাধারণের প্রতি এই হচ্ছে যথার্থ সম্মান প্রকাশ। তাদের প্রতি দয়া করে নাটকের রচনাকে যদি দরিদ্র করা হ'ত তবে সেই গর্বোদ্ধত দারিদ্র্য সাধনার প্রতি সর্বকালের অভিশাপ বর্ষিত হত।" [ঐ]

অবশ্য পরবর্তী কালে কবির এই দৃষ্টিভঙ্গী ও মতের বেশ কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। 'ঐকতান' কবিতায় তিনি স্বয়ং তাহার স্বীকারোক্তি করিয়াছেন। যথাসময়ে আমরা এই আলোচনায় আসিব। কিন্তু কবি এখানে সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের জয়গান গাহিলেও তিনি চিরদিনই উপকরণ বাহুল্য ও বিলাস-ব্যসনের বিরোধী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রেম ও প্রকৃতির কবি; চিরদিনই প্রকৃতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইবার জন্য আকুল হইয়াছেন। এই কারণেই বড় বড় অট্টালিকা-ইমারত এবং আধুনিক নাগরিক সভ্যতার ভোগোপকরণকে তিনি বর্জন না করিলেও খুব

আন্তরিকভাবেও গ্রহণ করিতে পারেন নাই, অন্তত ব্যক্তিগত জীবনে। কবির কল্পনা ও সৌন্দর্য-চেতনায় একদিকে যেমন ছিল সংস্কৃত ক্লাসিক্‌স্‌-এর প্রভাব অপরদিকে তেমনি ছিল মরমীয়া ও সহজিয়া কবিদের প্রভাব। বিশেষত জীবনের শেষার্ধে সহজিয়া কবিদের মানবিকতাবাদের প্রতি কবির আকর্ষণ যত প্রবল হয় অপরদিকে সহজ হইয়া সাধারণ মানুষের সাথে মিলিবার আকাঙ্ক্ষাও ততই প্রবল হয়।

উল্লেখযোগ্য, এই সময়ই উত্তরায়ণের মধ্যে কবির 'শ্যামলী' নামে মাটির ঘরখানি রচিত হইতে থাকে। সুরেন্দ্রনাথ কর ও নন্দলাল বসুর পরিকল্পনা মত এই ঘরখানি নির্মিত হইতে থাকে। ২৫শে বৈশাখ জন্মদিনে কবি গৃহপ্রবেশ করিবেন এইরূপ স্থির হয়। কবি স্থির করেন, জীবনের অবশিষ্ট কয়েকদিন এই মাটির ঘরখানিতেই অতিবাহিত করিবেন। এই সময় ইন্দিরা দেবীকে এক পত্রে তিনি লিখিতেছেন (৭ই এপ্রিল, ১৯৩৫):

"একটা মাটির ঘর বানাতে লেগেছি। জন্মদিনের মধ্যে সেটা শেষ হবে বলে কথা আছে। সেই সময়ে ঐ ঘরে প্রবেশ করব, তার পরে শেষ পর্যন্ত আর বাসা বদল করা না এই আমার অভিপ্রায়।" [চিঠিপত্র-৫ম : পৃঃ ১০৩]

কবিকল্পনায় এই ঘরের মূর্তিটি তিনি যেভাবে দেখিতে চাহিলেন সেটি এই সময়ে একটি কবিতার মধ্যে এইভাবে প্রকাশ পায়:

"আমার শেষবেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে
তার নাম দেব শ্যামলী।
ও যখন পড়বে ভেঙে
সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতো,
মাটির কোলে মিশবে মাটি;
ভাঙা থামে নালিশ উঁচু করে
বিরোধ করবে না ধরণীর সঙ্গে;
ফাটা দেয়ালের পাঁজর বের ক'রে
তার মধ্যে বাঁধতে দেবে না
মৃতদিনের প্রেতের বাসা।
সেই মাটিতে গাঁথব
আমার শেষ বাড়ির ভিত
যার মধ্যে সব বেদনার বিস্মৃতি,
সব কলঙ্কের মার্জনা,
যাতে সব বিকার সব বিদ্রূপকে
ঢেকে দেয় দূর্বাদলের স্নিগ্ধ সৌজন্যে;
যার মধ্যে শতশত শতাব্দীর
রক্তলোলুপ হিংস্র নির্ঘোষ
গেছে নিঃশব্দ হয়ে।"

[রচনাবলী : ১৪'শ খণ্ড, পৃঃ ৯৭]

বলা বাহুল্য, ইহার মধ্যে কবি ও Artist মানুষটাই মুখ্যত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যাহাই হোক, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই 'শ্যামলী' ঘরখানি রচনা সমাপ্ত হয়। ২৫শে বৈশাখ প্রাতে উৎসবান্তে কবি 'শ্যামলী'তে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহপ্রবেশ করেন। উল্লেখযোগ্য, এইদিনই 'শেষ সপ্তক' কাব্যগ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়।

ইহার কয়েকদিন পূর্বে কবি ভাওয়ালী থেকে জওহরলালের লেখা একটি পত্র পান। জওহরলালের পত্নী তখন ভাওয়ালী স্যানাটোরিয়ামে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়িলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ আলমোড়া জেল থেকে, জওহরলালকে সেখানে একদিনের জন্য লইয়া যান। সেই সময় স্থির হয়, চিকিৎসার জন্য কমলা ইউরোপে যাত্রা করিবেন এবং তাঁহার সঙ্গে কন্যা ইন্দিরাও যাইবেন। ভাওয়ালী থেকে জওহরলাল কবিকে এক পত্রে এইসব কথা খুলিয়া লিখেন (১৬ই এপ্রিল, ১৯৩৫)। ইন্দিরা তখন শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। কবি জওহরলালের পত্র পাওয়া মাত্র কৃষ্ণ কৃপালিনীর সঙ্গে ইন্দিরাকে তাঁহার মাতার নিকট পাঠাইয়া দেন।

কিছুকাল পূর্বে শ্রীনিকেতন পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে চতুষ্পার্শ্বস্থ সাঁওতাল পল্লীগুলি লইয়া তাহাদের একটি 'কো-অপারেটিভ স্টোর' গঠন করা হয়। 'বিশ্বভারতী সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক' থেকে উহার আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৬ই এপ্রিল উহার উদ্বোধন উপলক্ষে শান্তিনিকেতনের পার্শ্ববর্তী সাঁওতাল পল্লীতে কবিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সভায় উপস্থিত সাঁওতালদের মধ্যে একজন (উহারই মধ্যে একটু লেখাপড়া জানা) উঠিয়া তাহাদের পল্লী-উন্নয়ন সমিতির বিগত কয়েক বৎসরের কার্যবিবরণী পাঠ করেন। এই বিবরণী থেকে ঐ সমিতির কার্যকলাপের অনেক মূল্যবান ও কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য জানা যায়। এই সম্পর্কে *Visva-Bharati Quarterly*-র তৎকালীন সম্পাদক কৃষ্ণ কৃপালিনী লিখিয়াছেন :

…"the speech disclosed several interesting facts. Their five villages had been helped to form themselves into a Society which has been carrying on the fourfold programme of Education, Health, Cottage Industries and Agriculture ; with a combined strength of 111 families, making up 570 individuals. He claimed that they had built 996 yards of road and 1192 of drain and cleared seven bighas of jungle and filled up nine pits of stagnant water ; with perceptible improvement in their health."

[*Visva-Bharati Quarterly* : May, 1935 ; pp. 113-14]

সভার শেষে কবি তাঁহার ভাষণে সাঁওতাল পল্লীতে এই কার্য শুরু করার অতীত অভিজ্ঞতার বর্ণনা করিয়া বলেন যে, প্রথমে সাঁওতালরা তাঁহাদের বিশ্বাস করিতে পারে নাই, এমনকি কিছুটা বিরোধিতাও করিয়াছিল। তিনি তাহার জন্য উহাদের দোষ না দিয়া বলেন যে, এই সরলবিশ্বাসী সাঁওতালরা তাহাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখিয়াছে যে 'ভদ্রলোকেরা'ই তাহাদের স্বার্থ ও লোভের বশে সর্বত্রই তাহাদের

প্রবঞ্চনা ও শোষণ করিতেছে। পরিশেষে কবি সাঁওতালদের আত্মমর্যাদাবোধ ও কর্মপ্রচেষ্টার খুবই প্রশংসা করেন।

দীর্ঘকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ পল্লী-পুনর্গঠনের কর্মসূচীতে প্রধানত চারিটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতেছিলেন,—কৃষি, কুটির-শিল্প, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও স্বাস্থ্য; আর সমবায় প্রথাই হইবে ইহার প্রধান ভিত্তি। শ্রীনিকেতন পল্লী-পুনর্গঠন কেন্দ্র কবির উপরিউক্ত কর্মনীতির ভিত্তিতে পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে ঐ কাজে অগ্রসর হইতেছিল।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যটি লক্ষ্য করিবার মত। পল্লী-পুনর্গঠন পরিকল্পনায় গান্ধীজী এই সময় প্রধানত খাদি, কুটিরশিল্প ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারেই গুরুত্ব দিতেছিলেন। বস্তুত পল্লীর আর্থনীতিক ক্ষেত্রে তিনি তখনও পর্যন্ত কৃষির উন্নতির বিষয়ে প্রায় কিছুই চিন্তা করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে প্রধানত কৃষির উন্নতির (বৈজ্ঞানিক প্রথা ও সমবায় নীতির ভিত্তিতে) উপরই গুরুত্ব দিতেছিলেন। কৃষি-উন্নয়নের ক্ষেত্রে গান্ধীজী অতি বিনীতভাবে তাঁহার অনভিজ্ঞতার কথা স্বীকার করিয়া এইসময় এক বিবৃতিতে বলিলেন (২৩শে জানুয়ারি, ১৯৩৫):

…"I dare not think of land improvement and improvement in the methods of agriculture, for I know my limitations. and I want people to do all that they can do without any outside help. My only object is to abolish idleness, to help people to turn their time to good account, to prevent misfeeding and to stop all economic waste. The whole of my present campaign for unpolished rice, for hand-ground flour, for *gur,* for hand-pressed oil and for the economic disposal of carcasses should be looked at in that light."

[*Mahatma* : Vol. IV, P. 15]

তাছাড়া জনশিক্ষা প্রসারের এবং পল্লীর শিল্প-সংস্কৃতি রক্ষার ব্যাপারেও গান্ধীজী তখনও পর্যন্ত মনোযোগ দিতে পারেন নাই, এটিও লক্ষ্য করিবার মত। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ জনশিক্ষা প্রসারে এবং পল্লীর শিল্প-সংস্কৃতি রক্ষার ব্যাপারে সমান গুরুত্ব দিতেছিলেন। জনশিক্ষার প্রশ্নটিকে কবি শুধু পল্লী-উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতেই দেখেন নাই পরন্তু উহাকেই রাজনীতিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের প্রধান ভিত্তি করিবার জন্য দেশ নেতাদের কাছে বার বার আবেদন জানাইতেছিলেন; এসব কথা আমরা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এক কথায় পল্লী উন্নয়নের বিষয়টি কবি যতখানি সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন গান্ধীজী তখনও পর্যন্ত তাহা পারেন নাই।

আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এই যে, এই সময় গান্ধীজী পল্লীশিল্প পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে "All India Village Industries Museum, নামে দেশের একটি হস্তশিল্প সংগ্রহালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণের জন্য তিনি কুমারাপ্পাকে (J. C. Kumarappa) এই সময়

শান্তিনিকেতনে প্রেরণ করেন (১২ই মে, ১৯৩৫)। সেদিন কবি কুমারাপ্পার মাধ্যমে গান্ধীজীর নিকট এই মর্মে আবেদন জানান যে, তিনি যেন হস্তশিল্পকে কেবলমাত্র গ্রামের মানুষের জীবিকার সংস্থান ও আর্থনীতিক দিক থেকেই বিচার না করেন;—হস্তশিল্পের বা কারুশিল্পের শিল্পগত (artistic) উৎকর্ষের মান উন্নয়নের জন্যও যেন তিনি সমান গুরুত্ব ও সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। গান্ধীজী এই দিকটির প্রতি আদৌ গুরুত্ব দিতেন না অথচ রবীন্দ্রনাথ তাহা দিতেন এবং শ্রীনিকেতন কেন্দ্রে তাহার জন্য তিনি দীর্ঘকাল থেকে বহু অর্থব্যয়ে বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন। কবি গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গী ভালোভাবেই জানিতেন এবং এই কারণেই তিনি কুমারাপ্পাকে বলিলেন :

"Please tell Mahatmaji that I appeal to him, since he is endeavouring to found a Museum for the nation, not to limit it to crafts as crafts. Crafts have been the media of artists in all ages, and our artists, as painters, as architects, as decorators, have helped our folks to get finer satisfaction out of the same material. The economic life of a nation is not such an isolated fact as Mahatmaji imagines and, to-day, side by side with economic poverty, we are faced with a cultural poverty which puts us to shame—shame that is in no way lessened when we consider what we once were. Our art treasures to-day are found in museums outside India, and our village artists are dying out, while the taste of our people is being slowly perverted by foreign fashions, ill-related to our life. Perhaps one day we will have no art treasures left : we will have to go visiting museums in foreign lands to feel pride in our past and pain in our present. *Please tell Mahatmaji to consider that art is not a luxury of the well-to-do.* The poor man needs it as much and employs it is much in his cottage-building, his pots, his floor decorations, his clay deities, and in many other ways. If Mahatmaji's men go round collecting specimens of village industries, why may they not also look for and collect specimens of the various indigenuous arts spread all over our land and waiting to be re-cherished ? A section of the museum may be devoted to it, which will show as how our peoples have lived and are living, and how in diverse ways, with what material means at their disposal, they have tried to create some *ras* in their life. I would do it myself, but I know only too well that I do not command tho resources nor the necessary popular confidence that Mahatmaji commands." (Italics—mine)

[*Visva-Bharati Quarterly* : May-July, 1935 ; pp. III-13]

আচার্য নন্দলাল বসুও কুমারাপ্পাকে ঠিক অনুরূপ মর্মে পরামর্শ দেন। তিনি বুঝাইয়া বলেন যে, যখন দেশের সাধারণ লোকেরাও আজ বিদেশে ছাপানো তাহাদের দেব-দেবীর পট ও মূর্তি ক্রয় করিয়া থাকে,—এমন কি গ্রামের অত্যন্ত গরীব সম্প্রদায়ের মেয়েরাও যখন জাপানে প্রস্তুত অলঙ্কারাদি ক্রয় করিয়া থাকে তখন তাহাদের এই চাহিদা মিটাইবার জন্য দেশীয় কারুশিল্পগুলিকে উন্নত করিবার প্রয়োজনীয় বিষয়টি গান্ধীজী যেন বিবেচনা করিয়া দেখেন। তাঁহার প্রধান বক্তব্য এই যে, বিদেশী ব্যবসায়ীরা যখন দেশের সাধারণ মানুষের রুচি ও শিল্প-চেতনাকে বিকৃত করিতেছে,—যাহার ফলে জাতীয় সংস্কৃতিই বিপন্ন হইয়া উঠিতেছে, তখন দেশীয় কারুশিল্পগুলিকে সুপরিকল্পিতভাবে উন্নত ও পুনর্গঠিত করা দরকার এবং সেই সঙ্গে দেশের লোকের রুচির ও সৌন্দর্যবোধের পরিবর্তন ঘটাইবার জন্যও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার। স্মরণ রাখা দরকার, ১৯৩০ সালে নন্দলাল স্বয়ং এই ব্যাপারে উদ্যোগী হইয়া কলাভবনে শিল্পী ও ছাত্রদের লইয়া 'কারু সঙ্ঘ' গঠন করিয়াছিলেন। গ্রামের বিভিন্ন কারুশিল্পীদের রঙ, ডিজাইন ও সুন্দর নক্শা ইত্যাদির ব্যাপারে সাহায্য করাই ছিল ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

অবশ্য কারুশিল্পের দিকে কবির বহুকাল থেকেই সতর্ক দৃষ্টি ছিল, পূর্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি। বস্তুতপক্ষে শ্রীনিকেতনের সূচনাকাল থেকেই কবি কারু-শিল্পের উপর গুরুত্ব দেন। তখনকার দিনে শ্রীনিকেতনের বিশিষ্ট কর্মী লক্ষ্মীশ্বর সিংহ কাঠের কাজে কিছুটা দক্ষতালাভ করিলে কবি তাঁহাকে সুইডেনের বিখ্যাত স্লয়ড্ শিক্ষা (Sloyd Education) লইবার পরামর্শ দেন। কবির নির্দেশে ১৯২৮ সালে লক্ষ্মীশ্বর সুইডেনে যান। সেখানে তিন বৎসর স্লয়ড্ শিক্ষাবিধির পাঠ লইয়া কাঠের ও কার্ড বোর্ডের এবং ধাতুশিল্পের কাজে পারদর্শী হইয়া শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন (১৯৩২)। শান্তিনিকেতনে স্লয়ড্ শিক্ষাবিধিতে কাজ শুরু করার জন্য কবি তখন তাঁহাকে কারুশিল্পের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। এই বিষয়ে লক্ষ্মীশ্বরের কিছু বয়স্ক ছাত্রও জুটিয়া যায়। আর্যনায়কম ও আশা দেবী তাহাদের অন্যতম ছিলেন। কয়েকমাস শিক্ষকতা করিয়া লক্ষ্মীশ্বর কবির পত্রাদি লইয়া পুনরায় সুইডেন যাত্রা করেন। কবি সেই সময় সোয়েন হেডিন (Sven Hedin) ও কাউণ্টেস্ হ্যামিল্টন (Countess Hamilton) প্রমুখ বন্ধুদের নিকট পত্রে জানাইয়াছিলেন যে, শান্তিনিকেতনে নিখিল ভারত স্লয়ড্ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করাই তাঁহার মনের একান্ত বাসনা ;—কিন্তু উপযুক্ত অর্থাদির অভাবে তাঁহার এই প্রচেষ্টা ব্যাহত হইতেছে। কবির এই আবেদনে সাড়া দিয়া এই সময় কাউণ্টেস্ হ্যামিলটন মিস্ জিয়ানসন্ (Miss Jeansen) নামে খুব পারদর্শী স্লয়ড্ শিক্ষিকাকে শান্তিনিকেতনে প্রেরণ করেন (১৯৩৪, নভেম্বর)। লক্ষ্মীশ্বরও সেখানে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় স্লয়ড্ শিক্ষার সাজসরঞ্জাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাহায্যাদি সংগ্রহ করিয়া শান্তিনিকেতনে প্রেরণ করেন। মিস্ জিয়ানসন্ শান্তিনিকেতনে আসিয়া স্লয়ড্ পদ্ধতিতে একটি বয়নশিল্প বিভাগ খুলিলেন। এই সম্পর্কে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'রবীন্দ্রজীবনী' গ্রন্থে (চতুর্থ খণ্ড : পৃঃ. ২৮-৩৪) বহু তথ্যাদি দিয়া আলোচনা করিয়াছেন।

২৩শে মে কমলা নেহরু চিকিৎসার জন্য জাহাজে ইউরোপ যাত্রা করেন। পূর্বদিন গান্ধীজী বোম্বাইয়ে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। গান্ধীজী বোম্বাইয়ে পৌঁছিবামাত্র সাংবাদিকরা কয়েকটি প্রশ্ন করেন। জনৈক সাংবাদিক কারুশিল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত মতামত সম্পর্কে তাঁহাকে মন্তব্য করিবার অনুরোধ জানাইলে গান্ধীজী বলেন যে, কবির সব উপদেশই যথোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গেই বিবেচিত হইবে। তিনি বলেন :

"Every message coming from Tagore must receive respectful attention from me. I quite believe we have not taken care of village art and with his assistance we will not neglect it."

[*Daily News*-Ceylon : May 23, 1935]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ওয়ার্ধাতে All India Village Industries Museum-এর নক্‌শা ও পরিকল্পনাটির ব্যাপারে তিনি কলা-ভবনের সুরেন্দ্রনাথ করের সহযোগিতা পাইয়াছিলেন।

এর পর লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেস (১৯৩৬) থেকে কংগ্রেসের বাৎসরিক সম্মেলনগুলির মণ্ডপসজ্জা, চিত্রাঙ্কন এবং শিল্প-প্রদর্শনীর ব্যাপারে গান্ধীজী নন্দলাল বসুর এবং তাঁহার ছাত্রদের মূল্যবান সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা পাইয়াছিলেন। বস্তুত কবির তাহাতে প্রবল উৎসাহ ও সমর্থন ছিল। তাছাড়া ১৯৩৭ সালে, ওয়ার্ধায় বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইলে গান্ধীজী শান্তিনিকেতন থেকে লক্ষ্মীশ্বর সিংহ এবং আর্যনায়কম ও আশা দেবীর সক্রিয় সাহায্য পাইয়াছিলেন। বস্তুত গান্ধীজী তাঁহার এই গঠনমূলক পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতনের কর্মীদের নিকট থেকে যে সাহায্য ও সহযোগিতা পাইয়াছিলেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। যথাস্থানে আমরা এ আলোচনায় আসিব।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে

জন্মোৎসবের হৈ-চৈ চুকিয়া গেলে উহার কয়েকদিন পরই কবি শান্তিনিকেতন থেকে কলিকাতায় আসেন (২৮শে বৈশাখ, ১৩৪২)। কলিকাতায় আসিলেই কোনো-না-কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে কবির ডাক পড়ে। পরদিন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ থেকে কবির চুয়াত্তর বৎসরপূর্তি উপলক্ষে তাঁহাকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এইদিন কবি তাঁহার ভাষণের শেষে 'শেষ সপ্তক' থেকে '২৫শে বৈশাখ' কবিতাটি পাঠ করেন।

ইহার কয়েকদিন পরেই বুদ্ধপূর্ণিমা। এইদিন কলিকাতার ধর্মরাজিক চৈত্য-বিহারের উদ্যোগে 'মহাবোধি সোসাইটি হল'-এ বুদ্ধ-জন্মোৎসব উপলক্ষে সভাপতিত্ব করার জন্য কবিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বুদ্ধকে কবি সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন, তাই তিনি সানন্দে উহাতে সম্মতি দেন। এইদিন কবি তাঁহার ভাষণের

শুরুতেই বুদ্ধের প্রতি তাঁহার অন্তরের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন (৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২) :

"আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি। এ কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের উপকরণগত অলঙ্কার নয়, একান্তে নিভৃতে যা তাঁকে বার-বার সমর্পণ করেছি সেই অর্ঘ্যই আজ এখানে উৎসর্গ করি।"

দেশের ও বিশ্বের তৎকালীন হিংসা-দ্বেষ ও যুদ্ধ-সংঘর্ষজনিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধের বাণী এবং উপদেশের তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করিয়া কবি বলিলেন :

…"বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে, অপবিত্র ভেদবুদ্ধির নিষ্ঠুর মূঢ়তা ধর্মের নামে আজ রক্তে পঙ্কিল করে তুলেছে এই ধরাতল ; পরস্পর হিংসার চেয়ে সাংঘাতিক পরস্পর ঘৃণায় মানুষ এখানে পদে পদে অপমানিত। সর্বজীবে মৈত্রীকে যিনি মুক্তির পথ ব'লে ঘোষণা করেছিলেন সেই তাঁরই বাণীকে আজ উৎকণ্ঠিত হয়ে কামনা করি এই ভ্রাতৃবিদ্বেষকলুষিত হতভাগ্য দেশে। পূজার বেদীতে আবির্ভূত হোন মানবশ্রেষ্ঠ, মানবের শ্রেষ্ঠতাকে উদ্ধার করবার জন্যে।…

"জিজ্ঞাসা করি, মানুষে মানুষে বেড়া তুলে দিয়ে আমরা কী পেরেছি ঠেকাতে ? …একদিন যে ভারতবর্ষ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর কাছে আপন মনুষ্যত্ব উজ্জ্বল করে তুলেছিল আজ সে আপন পরিচয়কে সঙ্কুচিত করে এনেছে ; মানুষকে অশ্রদ্ধা ক'রেই সে মানুষের অশ্রদ্ধাভাজন হল। আজ মানুষ মানুষের বিরুদ্ধ হয়ে উঠেছে ; কেননা মানুষ আজ সত্যভ্রষ্ট, তার মনুষ্যত্ব প্রচ্ছন্ন। তাই আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মানুষের প্রতি মানুষের এত সন্দেহ, এত আতঙ্ক, এত আক্রোশ। তাই আজ মহামানবকে এই ব'লে ডাকবার দিন এসেছে : তুমি আপনার প্রকাশের দ্বারা মানুষকে প্রকাশ করো।"

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর রাজনীতিক সংকটের তাৎপর্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়া কবি আরও বলিলেন :

"ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে। কিছুদিন পূর্বেই পৃথিবীতে এক মহাযুদ্ধ হয়ে গেল। এক পক্ষের জয় হল, সে জয় বাহুবলের। কিন্তু যেহেতু বাহুবল মানুষের চরম বল নয়, এইজন্যে মানুষের ইতিহাসে সে জয় নিষ্ফল হল, সে জয় নূতন যুদ্ধের বীজ বপন করে চলেছে। মানুষের শক্তি অক্রোধে, ক্ষমাতে, এই কথা বুঝতে দেয় না সেই পশু যে আজও মানুষের মধ্যে মরে নি। তাই মানবের সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ক'রে মানবের গুরু বলেছেন : ক্রোধকে জয় করবে অক্রোধের দ্বারা, নিজের ক্রোধকে এবং অন্যের ক্রোধকে। এ না হলে মানুষ ব্যর্থ হবে, যেহেতু সে মানুষ। বাহুবলের সাহায্যে ক্রোধকে প্রতিহিংসাকে জয়ী করার দ্বারা শান্তি মেলে না, ক্ষমাই আনে শান্তি, এ কথা মানুষ আপন রাষ্ট্রনীতিতে সমাজ-নীতিতে যতদিন স্বীকার করতে না পারবে ততদিন অপরাধীর অপরাধ বেড়ে চলবে ; রাষ্ট্রগত বিরোধের আগুন কিছুতে নিভবে না ; জেলখানার দানবিক নিষ্ঠুরতায় এবং সৈন্যনিবাসের সশস্ত্র ভ্রূকুটিবিক্ষেপে পৃথিবীর মর্মান্তিক পীড়া উত্তরোত্তর দুঃসহ হতে থাকবে—কোথাও এর শেষ পাওয়া যাবে না। পাশবতার সাহায্যে

মানুষের সিদ্ধিলাভের দুরাশাকে যিনি নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন, যিনি বলেছিলেন 'অক্রোধেন জিনে কোধং', আজ সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করে মনুষ্যত্বের জগদ্ব্যাপী এই অপমানের যুগে বলবার দিন এল : বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। তাঁরই শরণ নেব যিনি আপনার মধ্যে মানুষকে প্রকাশ করেছেন।...আজ স্বার্থক্ষুধান্ধ বৈশ্যবৃত্তির নির্মম নিঃসীম লুব্ধতার দিনে সেই বুদ্ধের শরণ কামনা করি যিনি আপনার মধ্যে বিশ্বমানবের সত্যরূপ প্রকাশ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন।"

[বুদ্ধদেব : পৃঃ. ৮-১২]

বুদ্ধের জন্মদিবস উপলক্ষে—বিশেষত, ধর্মরাজিক চৈত্যবিহারের বেদীভূমি থেকে রবীন্দ্রনাথের মত কবির পক্ষে এই ধরনের ভাষণ সুসংগত হইয়াছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রী স্থাপনে—বিশ্বসমস্যার সমাধানে তিনি বুদ্ধের বাণী ও উপদেশকে গ্রহণ করার জন্য এখানে যে-সব কথা বলিলেন, তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বস্তুত এখানে তিনি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকেই আন্তর্জাতিকতা এবং বিশ্ব-মৈত্রীর প্রশ্নটি বিচার করিয়াছেন ; অথচ অন্যত্র বহুবার বহুক্ষেত্রেই তিনি রাজনীতিক ও আর্থনীতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ সব সমস্যার বিচার করিয়াছেন। যখন তিনি পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ভর্ৎসনা ও নিন্দাবাদ করিয়াছেন, যখন তিনি যুদ্ধ, উগ্র-জাতীয়তাবাদ ও বর্ণ-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন—যখন সমস্ত উপনিবেশ ও পরাধীন দেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার দাবী করিয়াছেন—যখন তিনি আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক ও রাজনীতিক সহযোগিতা এবং শিক্ষা-সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের কথা বলিয়াছেন, বস্তুত তখন তিনি একজন বাস্তববাদী রাজনীতিবিদের দৃষ্টিভঙ্গীতে সমস্যাগুলির সমাধানেরও বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ-বিষয়ে কবি-মানসে চিরদিনই একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব ও স্ববিরোধিতা ছিল। কখনও তিনি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে (Spiritual & moral) কখনও বা কবি ও ভাবুকের (Idealist & utopian), কখনও বা বাস্তববাদী আর্থনীতিক ও রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সমস্যাগুলির বিচার করিবার চেষ্টা করিতেন। বস্তুত কবি-মানসের এই আধ্যাত্মসত্তা একদিকে যেমন বেদ-উপনিষদাদি থেকে অপরদিকে তেমনি বুদ্ধ, যীশু, নানক, চৈতন্য, কবীর প্রভৃতি মহাপুরুষের জীবন ও মহান মানবিকতাবাদের বাণী হতে উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করিয়াছে।

পরদিন,—১৯শে মে কংগ্রেসের নির্দেশে অন্তরীণাবদ্ধ বন্দীদের মুক্তির দাবীতে সারা ভারতে 'ডেটিনিউ দিবস' প্রতিপালিত হয়। দুঃস্থ ডেটিনিউদের পরিবার-বর্গদের সাহায্যের জন্য একটি তহবিল খোলা হয়। এই উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সভাপতি দেশবাসীর উদ্দেশে এক আবেদন জানাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এক বাংলাদেশেই অন্তরীণাবদ্ধ বন্দীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২,৭০০। স্বভাবতই বাংলাদেশে এই লইয়া খুবই উত্তেজনা দেখা দেয়। বাংলা সরকার পূর্বেই প্রেস আইনের বলে (Under Sec. 2-A, Indian Press Act) 'ডেটিনিউ দিবস' সংক্রান্ত সমস্ত খবর প্রকাশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়া একটি নির্দেশ জারি করিয়াছিলেন।

ইহার প্রতিবাদে বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত পত্র-পত্রিকাই (অবশ্য *Statesman* বাদে)

একদিনের জন্য সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ রাখিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে কোনো বিবৃতি কিংবা বাণী দিয়াছিলেন কিনা এখনও পর্যন্ত তাহা জানা যায় নাই। অবশ্য যদিও ইতিপূর্বে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে তিনি কয়েকবারই বিবৃতি দিয়াছিলেন তবুও অনেক সময় এই ধরনের প্রতিবাদ-বিবৃতিতে 'দুর্বলের নিষ্ফল কান্না' ভাবিয়া তীব্র বিষাদ ও বেদনা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চুপ করিয়া থাকিতেন।

এই বৎসর অনাবৃষ্টির দরুন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ দেখা দিয়াছিল। কবি প্রথমে শিলং, দার্জিলিং, সিমলা পাহাড়— প্রভৃতি জায়গায় যাইবার কথা ভাবিতেছিলেন। শেষপর্যন্ত গঙ্গাবক্ষে বোটেই গ্রীষ্মটা কাটাইবেন, স্থির হয়।

কবি ভাগীরথীবক্ষে বোটে প্রায় সারা গ্রীষ্মটাই কাটান। সঙ্গে ছিলেন অনিলকুমার চন্দ ও তাঁহার স্ত্রী রাণীদেবী। এই সময়ই কবি 'বীথিকা' ও 'প্রহাসিনী'র অধিকাংশ কবিতা রচনা করেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, এই সময়ই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতি সৌধটি কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে নির্মিত হয়। এটি সুরেন্দ্রনাথ করের পরিকল্পনা অনুযায়ী রচিত হয়। দেশবন্ধুর মৃত্যুদিবস উপলক্ষে এটি উন্মোচন করার কথা ছিল। কবির নিকট অনুরোধ আসিয়াছিল তিনি যেন এই উপলক্ষে কিছু লিখিয়া দেন। কবি উহার জবাবে নিম্নলিখিত কয়েকছত্র লিখিয়া দেন (১৬ই জুন, ১৯৩৫):

"স্বদেশের যে ধূলিরে শেষস্পর্শ দিয়ে গেলে তুমি
বক্ষের অঞ্চল পাতে সেথায় তোমার জন্মভূমি।
দেশের বন্দনা বাজে শব্দহীন পাষাণের গীতে—
এসো দেহহীন স্মৃতি মৃত্যুহীন প্রেমের বেদীতে।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ১লা আষাঢ়, ১৩৪২]

ইতিমধ্যে চীন থেকে অধ্যাপক-তান্ য়ুন-সান এক পত্রে বিশ্বভারতীর সম্পাদককে জানান যে, কিছুকাল পূর্বে নানকিঙে 'চীন-ভারত সংস্কৃতি সমিতি'র আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হইয়াছে এবং তিনি বিশ্বভারতীতে 'চীনা ভবন' নির্মাণের জন্য সেখানে থেকে ৫০,০০০ চীনা ডলার সাহায্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অধ্যাপক তান্-এর পত্রটি ছিল এইরূপ :

"Let me report to you with delight that the 'Sino-Indian Cultural Society' in China has been formally and successfully inaugurated at Nanking, after a long preparation, with Dr. Tsai Yuan-Pie, President of the National Central Research Institute in the chair at the inaugural meeting. For the Chinese Hall at Santiniketan, we have had one donation of fifty thousand Chinese Dollars (a little more than Rs. 50,000) already, of which 30,000 dollars are for the building and 20,000 for purchasing books. The building money will be sent to Visva Bharati in Gurudeva's name through the bank and the books will be sent to Santiniketan direct. I hope to be able to come to Santiniketan soon." [*Visva-Bharati News* : June, 1935 ; P. 99]

বলা বাহুল্য, এই সংবাদে কবি অত্যন্ত আনন্দিত হন,—তাঁহার বহুকালের স্বপ্ন এতদিনে বুঝি সফল হইতে চলিয়াছে।

জুলাইয়ে প্রথমভাগেই কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনে আসিয়া বিশ্বভারতীর বিভিন্ন সমস্যা লইয়া কবি চিন্তিত হইয়া পড়েন। বিশ্বভারতীর আর্থিক সমস্যা তো ছিলই তাছাড়া শিক্ষা-পদ্ধতি ও আদর্শগত দিকেও নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁহার নজরে পড়ে। এই সময় একটি মার্কিন পত্রিকায় শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে একটি রচনায় তাঁহার চিন্তাধারার সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া কবি খুবই আনন্দিত হন। তিনি আধুনিক শিক্ষা-সমস্যার সমগ্র বিষয়টি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করিয়া বিলেত-প্রবাসী ধীরেন্দ্রমোহন সেনকে একটি দীর্ঘপত্র লিখেন (১৫ই জুলাই, ১৯৩৫)। এই পত্র-প্রবন্ধটি 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি' শিরোনামায় এই সময় 'বিচিত্রা'য় (শ্রাবণ, ১৩৪২) প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের শুরুতেই মার্কিন লেখকের বক্তব্য সম্পর্কে কবি লিখিলেন :

…"আমার মতটি এই লেখায় ঠিকমতো ব্যক্ত হয়েছে। হবার প্রধান কারণ এই, আমেরিকা দীর্ঘকাল থেকে বৈষয়িক সিদ্ধির নেশায় মেতে ছিল। সেই সিদ্ধির আয়তন ছিল অতি স্থূল, তার লোভ ছিল প্রকাণ্ড মাপের। এর ব্যাপ্তি ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। তার ফলে সামাজিক মানুষের যে পূর্ণতা সেটা চাপা পড়ে গিয়ে বৈষয়িক মানুষের কৃতিত্ব সব ছাড়িয়ে উঠেছিল। আজ হঠাৎ সেই অতিকায় বৈষয়িক মানুষটি সিদ্ধিপথের মাঝখানে অনেক দামের জটিল যানবাহনের চাকা ভেঙে, কল বিগড়িয়ে, ধুলোয় কাৎ হয়ে পড়েছে। এখন তার ভাবনার কথা এই যে, সব ভাঙাচোরা বাদ দিয়ে মানুষটার বাকি রইল কী?…সে এই বলে শোক করছে যে, সে আজ ভিক্ষুক; বলতে পারছে না, 'আমার অন্তরের সম্পদ আছে।' "…

[শিক্ষা ও সংস্কৃতি-শিক্ষা : পৃঃ. ২৮৫]

অবশ্য পাশ্চাত্য দেশের এই বৈষয়িক সমৃদ্ধিকে (material richness) কবি কোনোদিন লঘু করিয়া দেখেন নাই, এই প্রবন্ধেও দেখিলেন না। পাশ্চাত্য সভ্যতা তাহার আন্তরিক বা আত্মিক উন্নতির (spiritual richness) জন্য গুরুত্ব দেয় নাই, এই ছিল তাঁহার প্রধান অভিযোগ। বলাবাহুল্য, পাশ্চাত্য সভ্যতা বলিতে তিনি ইউরোপ আমেরিকার পুঁজিবাদী সভ্যতাকেই বুঝাইতেন। অপরদিকে, ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশ—দীর্ঘকাল ধরিয়া বৈষয়িক সমৃদ্ধিকে উপেক্ষা করিয়া দৈন্যের শেষদশায় আসিয়াছে—তাহার পক্ষে আজ পাশ্চাত্য দেশের এই বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া লওয়াই অন্যতম প্রধান কর্তব্য, এইটি কবি বারবার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এই প্রবন্ধেও করিলেন। বৈষয়িক ও আত্মিক বা মানস-সম্পদ—এই উভয় দিকেই সমভাবে বিকাশ ও উৎকর্ষলাভ করিতে পারিলে তবেই মানুষের সংস্কৃতি পূর্ণতা ও সংহতিলাভ করিতে পারে। এই সাংস্কৃতিক আদর্শে আমাদের শিক্ষাবিধি গড়িয়া তোলা দরকার, ইহাই এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্যবিষয়। কবি উক্ত আমেরিকান লেখকের বক্তব্য সমর্থন করিয়া বলিলেন :

…"তিনি বলেন আধুনিক শিক্ষা থেকে একটা জিনিস কেমন করে স্খলিত হয়ে পড়ছে, সে হচ্ছে সংস্কৃতি। চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা করে আমরা জীবনযাত্রার

সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি। কিন্তু সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধিলাভ কি কখনো যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে?

"সংস্কৃতি সমগ্র মানুষের চিত্তবৃত্তিকে গভীরতর স্তর থেকে সফল করতে থাকে। তার প্রভাবে মানুষ অন্তর থেকে স্বতই সর্বাঙ্গীন সার্থকতা লাভ করে। তার প্রভাবে নিষ্কাম জ্ঞানার্জনের অনুরাগ এবং নিস্বার্থ কর্মানুষ্ঠানের উৎসাহ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। যথার্থ সংস্কৃতি জড়ভাবে প্রথাপালনের চেয়ে অকৃত্রিম সৌজন্যকে বড়ো মূল্য দিয়ে থাকে।"...

[ঐ : পৃঃ. ২৫৮]

শান্তিনিকেতনের শিক্ষাদর্শের প্রধান লক্ষ্য হইবে, জীবনের এইরূপ সামগ্রিক পূর্ণতালাভ। এইটি নির্দেশ করিতে গিয়া কবি বলিলেন :

" 'আমরা সব কিছু পারব' এই কথা সত্য ক'রে বলবার শিক্ষাই আত্মাবমাননা থেকে আমাদের দেশকে পরিত্রাণ করতে পারে, এ কথা ভুললে চলবে না। আমাদের বিদ্যালয়ে সকল কর্মে সকল ইন্দ্রিয়মনের তৎপরতা প্রথম হতেই অনুশীলিত হোক, এইটেই শিক্ষাসাধনার গুরুতর কর্তব্য বলে মনে করতে হবে। জানি এর প্রধান অন্তরায় অভিভাবক; পড়া মুখস্ত করতে করতে জীবনীশক্তি মননশক্তি কর্মশক্তি সমস্ত যতই কৃশ হোতে থাকে তাতে বাধা দিতে গেলে তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। কিন্তু মুখস্থ বিদ্যার চাপে এই সব চিরপঙ্গু মানুষের অকর্মণ্যতার বোঝা দেশ বহন করবে কী ক'রে?...আমাদের শিক্ষালয়ে নবীন প্রাণের মধ্যে অক্লান্ত উদ্যোগিতার হাওয়া বয়েছে যদি দেখতে পাই তা হোলেই বুঝব, দেশের লক্ষ্মীর আমন্ত্রণ সফল হোতে চলল। এই আমন্ত্রণ ইকনমিক্‌সে ডিগ্রি নেওয়ায় নয়; চরিত্রকে বলিষ্ঠ কর্মিষ্ঠ করায়, সকল অবস্থার জন্যে নিজেকে নিপুণভাবে প্রস্তুত করায়, নিরলস আত্মশক্তির উপর নির্ভর ক'রে কর্মানুষ্ঠানের দায়িত্ব সাধন করায়। অর্থাৎ কেবল পাণ্ডিত্যচর্চায় নয়, পৌরুষচর্চায়। সাধারণ ইস্কুলে এই সাধনার সুযোগ নেই, আমাদের আশ্রমে আছে। এখানে নানা বিভাগে নানা কর্ম চলছে, তার মধ্যে শক্তি প্রয়োগ করাতে পারে এমন ব্যবস্থা থাকা চাই।"

সূচনাকাল থেকেই শান্তিনিকেতনের শিক্ষায় এই বলিষ্ঠ জীবনবোধ আনিবার জন্য কবি সচেষ্ট ছিলেন। সেদিন তাহারা সামাজিক কর্তব্যবোধ ও কায়িক শ্রমকে মর্যাদা দিবার শিক্ষা পাইয়াছিল। কবি তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন :

"একদিন দেখেছিলেম, শান্তিনিকেতনের পথে গরুর গাড়ির চাকা কাদায় বসে গিয়েছিল; আমাদের ছাত্ররা সকলে মিলে ঠেলে গাড়ি উদ্ধার করে দিলে। সেদিন কোনো অভ্যাগত আশ্রমে যখন উপস্থিত হলেন তাঁর মোট বয়ে আনবার কুলি ছিল না; আমাদের কোনো তরুণ ছাত্র অসংকোচে তাঁর বোঝা পিঠে করে নিয়ে যথাস্থানে এনে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। অপরিচিত অতিথিমাত্রের সেবা ও আনুকূল্য তারা কর্তব্য বলে জ্ঞান করত। সেদিন তারা আশ্রমের পথ নির্মাণ করেছে, গর্ত বুজিয়েছে। এ-সমস্তই তাদের সতর্ক ও বলিষ্ঠ সৌজন্যের অঙ্গ ছিল, বইয়ের পাতা অতিক্রম করে তাদের শিক্ষার মধ্যে সংস্কৃতি প্রবেশ করেছিল। সেই সব ছেলেদের প্রত্যেককে তখন আমি জানতেম; তার পরে অনেক দিন তাদের দেখি নি। আশা করি, তারা

নিন্দাবিলাসী নয়, পরশ্রীকাতর নয়; অক্ষমকে সাহায্য করতে তারা তৎপর এবং ভালোকে তারা ঠিকমত যাচাই করতে জানে।" [ঐ : পৃঃ. ২৮৮-৯০]

কিন্তু ধীরে ধীরে বিশ্বভারতী এই শিক্ষাদর্শ থেকে এখন যেন অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছে; কবি গভীর দুঃখের সঙ্গে ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন এবং বিভিন্ন সময়ে বিশ্বভারতীর পরিচালকবর্গকে তাহার উল্লেখ করিয়া সতর্ক করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। পরবর্তীকালেও প্রকাশ্যেই তিনি এই বিষয়ের জন্যে খেদ ও মনোবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন।

এ বিষয়ে গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তার বৈশিষ্ট্যটি লক্ষণীয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে গান্ধীজী তাহার মূল বা গোড়া ধরিয়া টান দিয়াছেন তাঁহার 'রুটির শ্রম' বা 'Bread Labour' তত্ত্বে। রাস্কিনের '*Unto this Last*' এবং টলস্টয়ের 'Bread labour' তত্ত্ব পাঠ করিয়া গান্ধীজী অত্যন্ত মুগ্ধ ও প্রভাবিত হন। ইহার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শোষণহীণ সমাজ এবং সামাজিক সাম্য আনিতে হইলে সমাজের প্রতিটি মানুষকেই দৈহিক শ্রমের বিনিময়েই তাহার জীবিকা অর্জন করিতে হইবে। কিছুকাল পূর্বেই '*From Yervada Mandir*' পুস্তিকায় (১৯৩২) এই তত্ত্বকে তিনি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাছাড়া এই সময় 'হরিজন' পত্রিকায় (২৯শে জুন, ১৯৩৫) Duty of Bread Labour শিরোনামায় একটি প্রবন্ধে এই তত্ত্বটির আরও ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি লিখিলেন :

"Brahma created his people with the duty of sacrifice laid upon them and said, 'By this do you flourish. Let it be the fulfiller of all your desires.' 'He who eats without performing this sacrifice, eats stolen bread'—thus says the Gita. 'Earn thy bread by the sweat of thy brow', says the Bible. Sacrifices may be of many kinds. One of them may well be bread labour. If all laboured for their bread and no more, then there would be enough food and enough leisure for all. Then there would be no cry of overpopulation, no disease, and no such misery as we see around. Such labour will be the highest form of sacrifice. Men will no doubt do many other things either through their bodies or through their minds, but all this will be labour of love for the common good. There will then be no rich and no poor, none high and none low, no touchable and no untouchable."

গান্ধীজীর বিশ্বাস ইহারই উপর ভিত্তি করিয়া মানুষের সত্যকারের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিতে পারে। এই সমাজে তিনি বুদ্ধিজীবীদেরও তাহাদের বিশেষ বৃত্তিগত শ্রম ছাড়া কায়িক শ্রম করিবার আহ্বান জানাইলেন। বস্তুতপক্ষে তিনি এক নয়া সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাইতে চাহিলেন। এই সম্পর্কে স্বভাবতই যে-সব প্রশ্ন উঠিতে পারে গান্ধীজী স্বয়ং সেইগুলি প্রশ্নোত্তরের ছলে ব্যাখ্যা করিয়া ঐ প্রবন্ধে আরও লিখিলেন :

"May not men earn their bread by intellectual labour? No. The needs of the body must be supplied by the body. 'Render unto Caesar that which is Caesar's', perhaps applies here well.

"Mere mental, that is, intellectual labour is for the soul and is its own satisfaction It should never demand payment. In the ideal state, doctors, lawyers and the like will work solely for the benefit of society, not for self. *Obedience to the law of bread labour will bring about a silent revolution in the structure of Society. Man's truimph will consist in substituting the struggle for existence by a struggle for mutual service. The law of the brute will be replaced by the law of man.*" (Italics—mine) [*Mahatma* : Vol. IV ; pp. 35-36]

এখানে গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সাদৃশ্য ও পার্থক্যটি লক্ষ্য করিবার মত। রবীন্দ্রনাথ পরশ্রমভুক সভ্যতার তীব্র বিরোধী ছিলেন, তিনিও দৈহিক বা কায়িক শ্রমকে যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন কিন্তু গান্ধীজীর মত কঠোর সামাজিক ন্যায়-নীতির দৃষ্টিতে 'রুটির শ্রম' তত্ত্বটির বিচার কিংবা গ্রহণ করেন নাই। অপরদিকে আপাতদৃষ্টিতে গান্ধীজীর 'রুটির শ্রম' তত্ত্বটির সঙ্গে কমিউনিস্টদের সমাজতান্ত্রিক ন্যায়নীতির কিছুটা সাদৃশ্য থাকিলেও মূলত উহাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যই বিদ্যমান। কেননা গান্ধীজী শ্রেণী-সংগ্রাম কিংবা বলপ্রয়োগের দ্বারা পরশ্রমজীবীদের ধনসম্পদের রাষ্ট্রীয়করণের বিরোধী ছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগের দ্বারাও 'রুটির শ্রম' তত্ত্বকে প্রয়োগ করিতে চাহেন নাই। এ বিষয়ে তিনি অহিংসা ও স্বতঃপ্রণোদিত বশ্যতার নীতিতেই বিশ্বাস করিতেন। পক্ষান্তরে কমিউনিস্টরা 'সর্বহারা বিপ্লবে'র মাধ্যমে রাষ্ট্রের হাতে সমস্ত ধনসম্পদের মালিকানা দাবী করেন, যে-সমাজের প্রতিটি মানুষকে আবশ্যিকভাবে তাহার শ্রমের বিনিময়ে জীবিকা অর্জন করিতে হইবে। 'He who does not work, he will not get his bread'—ইহাই হইল সমাজ-তান্ত্রিক সমাজের মূল ন্যায়নীতি।

জার্মানীতে তখন নাৎসীবাদদের প্রচণ্ড তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে। কমিউনিস্ট ও ইহুদী নিধন পর্বের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন চিন্তা ও বিবেকবুদ্ধিকেও সেখানে টুঁটি টিপিয়া হত্যা করা হয়। হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক, শান্তিবাদী ও স্বাধীন চিন্তা-বিদকে জার্মানী থেকে বিতাড়িত করা হয়। কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীল সাহিত্যের সঙ্গে যে সমস্ত গ্রন্থে স্বাধীন চিন্তার লেশমাত্র আছে, সেগুলিকে হয় পোড়াইয়া ফেলা হইল নতুবা বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ হইল। এই সম্পর্কে রোলাঁ লিখিয়াছেন :

"ইউরোপের যে-সকল আন্তরিক লেখকগণ সংগ্রামে যোগদান করা সম্পর্কে মন স্থির করিতে পারেন নাই, তাহাদের জবাব দিয়াছে ইতিহাস। ১৯৩৩ সালের ১০ই মে বার্লিনের স্কোয়ারে স্কোয়ারে জার্মান ফ্যাসিস্টরা যে-সকল বই পোড়াইয়া বহ্নুৎসব করে সেগুলি কেবল স্টালিন, গোর্কি অথবা রেনের মত জার্মান মজুরদের লেখা বই নহে ; সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত বিখ্যাত মানবপ্রেমিক লেখকদের রচনাও উহাদের মধ্যে ছিল।"... [দ্র. শিল্পীর নবজন্ম : পৃঃ ৩৬২]

উল্লেখযোগ্য, ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পুস্তকও বাদ যায় নাই। এই সম্পর্কে মাদ্রাজের সাপ্তাহিক *The Guardian* লিখিল (২৭শে জুন, ১৯৩৫):

"Tagore's book in the German language brought in more royalties than in any other, and these royalties were employed by the Poet for his International University at Santiniketan But his pacific philosophy is taboo to all good Nazis, and as a result his royalties have dwindled and Santiniketan is a sufferer thereby."

কবির সুহৃদ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এ-বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সঠিক সংবাদটি জানাইবার অনুরোধ করিলে কবি তাহার জবাবে লিখেন :

…"আজ আমার বই সেখানে কী পরিমাণে বিক্রি হয় এবং তার গতি কোন্ পথে আমি কিছুই জানি নে। এইটুকু জানি আমার তহবিলে এসে পৌঁছয়না। সে জন্য দুঃখ করে ফল নেই, কেননা লাভের অঙ্ক বেশি হবার প্রত্যাশা করি নে।…আমার পক্ষে হিটলারের প্রয়োজনই হয় না। মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিই যে একদা এমন ছিল যখন কালিদাস প্রভৃতি কবি রসজ্ঞমহলে তাঁদের কাব্যের প্রচার হলেই খুশি হতেন। আমার দুঃখ এই যে বিক্রমাদিত্যের ঠিকানা পাওয়া যায় না। তখন একজন কোনো অসাধারণের উপর ভার ছিল সর্বসাধারণের হয়ে কবিকে পুরস্কৃত করা। পাই কোথায় তেমন রাজা।…বাণীকে সোনার দরে বিক্রির বৈশ্যরীতি বর্বরতা এ কথা মানতেই হবে।" [প্রবাসী : শ্রাবণ, ১৩৪২ ; পৃ. ৫৮৯-৯০]

কবি অন্যত্র নাৎসী-বর্বরতার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাবাদ করিয়াছেন। স্বভাবতই এ'ক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ উপলক্ষে ঐ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা সমীচীন বোধ করেন নাই। ইহা কবির স্বভাব ও রুচিবিরুদ্ধ।

বস্তুত জার্মানীতে তখন পুরাবেগে যুদ্ধপ্রস্তুতি চলিতেছে। স্মরণ রাখা দরকার, ১৯৩৩ সালে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে জার্মানী তাহার পুনরস্ত্রীকরণের দাবীতে যেসব প্রস্তাব করিয়াছিল, সেগুলি প্রত্যাখ্যাত হয়। জার্মানী তাহার জবাবে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ও লীগ অব নেশন্স্ পরিত্যাগ করিয়া (অক্টোবর, ১৯৩৩) গোপনে সকল রকম যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করিয়া দেয়। ১৯৩৫ সালের ৯ই মার্চ হিট্‌লার প্রকাশ্যেই জার্মান বিমানবাহিনী গঠন করার কথা ঘোষণা করেন ; উহার এক সপ্তাহ পরেই (১৬ই মার্চ) সারা জার্মানীতে বাধ্যতামূলক সামরিক আইন (Conscription) জারী করা হয়। এইভাবে হিট্‌লার প্রকাশ্যেই জার্মানীর বিশাল এক সৈন্যবাহিনী ও বিমানবহর গঠনের প্রস্তুতি চালাইলেন। হিট্‌লারের লুব্ধ দৃষ্টি তখন অস্ট্রিয়ার দিকে। ডল্‌ফাস্ হত্যার পর হিট্‌লার প্রকাশ্যেই অস্ট্রিয়া আক্রমণের তোড়জোড় করিতে থাকেন। অপরদিকে আবিসিনিয়ার প্রতি ইতালির লুব্ধ দৃষ্টি সকলকেই তখন আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসেই আবিসিনিয়ার সীমান্তে ইতালীয় ও আবিসিনিয় সৈন্যদলের মধ্যে এক সংঘর্ষ হইয়া যায়। ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণের এটা একটা ছলনা মাত্র,—একথা কাহারও বুঝিতে অসুবিধা হইল না। অপরদিকে পূর্বদিগন্তে জাপান তখন মাঞ্চুরিয়ার বুকে বসিয়া চীনের উপর বড় রকমের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। বস্তুতপক্ষে, আসন্ন যুদ্ধের

প্রস্তুতিতে তখন পৃথিবীর প্রতিটি বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যেই সৈন্যবাহিনী ও সমরাস্ত্র বৃদ্ধির তীব্র প্রতিযোগিতা পড়িয়া যায়।

পৃথিবীর এই দুর্যোগ ও সংকটময় পরিস্থিতিতে অ্যাঁরি বারবুস্ ও রোমাঁ রোলাঁ প্রমুখ শান্তিবাদীরা ১১ই নভেম্বর যুদ্ধবিরতি দিবসে (১৯৩৫) প্যারিসে এক মহা শান্তিসম্মেলন আহ্বান করেন। এই শান্তিসম্মেলনে যোগদান ও সফল করিয়া তুলিবার জন্য বারবুস্ সকল দেশের যুদ্ধ-বিরোধী ও শান্তিকামী মানুষের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানাইলেন। উল্লেখযোগ্য, বারবুস এই সময়ে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা এক পত্রের মাধ্যমে (সম্ভবত জুলাইয়ের মধ্যভাগেই) ভারতবর্ষে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃস্থানীয়দের এই সম্মেলনে সাহায্য ও সহযোগিতা করিবার আবেদন জানাইয়াছিলেন।

বারবুসের পত্রটি ছিল এইরূপ :

"পৃথিবীর ক্ষমতালিপ্সু রাষ্ট্রগুলির যুদ্ধোন্মাদনার ফলেই দেশে দেশে দিকে দিকে এইরূপ শান্তি-সম্মেলনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। দুনিয়ার শান্তিকামীগণ সমবেত হইয়া আন্তর্জাতিক আত্মঘাতী যুদ্ধায়োজন প্রতিরোধ করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিবে। সকল দেশের যুদ্ধ-বিরোধী সঙ্ঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় সংকল্পিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনের অধিবেশন সম্ভবপর হইলে তদ্দ্বারা বর্তমান অবস্থায় নিশ্চিত সুফল লাভ হইবে।

"অবশ্য একথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, ধর্ম, জাতি, সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে মতানৈক্য বিদ্যমান থাকিতে পারে; কিন্তু যুদ্ধনিবৃত্তি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার কার্যে কতকগুলি বিষয়ে সকলেই একমত হইয়া একটি নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করিতে পারিবে। নিরস্ত্রীকরণ, যুদ্ধোপকরণ নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিরোধ বাধাইবার উন্মাদ প্রচেষ্টা প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে যে একটি সর্বসম্মত কর্মপন্থা নির্ণীত হইতে পারে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

"যদি এই প্রতিনিধিমূলক বিশ্বশান্তি-সম্মেলনে সর্বদেশের অধিকাংশের শান্তি কামনার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি পাওয়া যায় তাহা হইলে পৃথিবীর ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইবে। আগামী ১১ই নভেম্বর (১৯৩৫) যুদ্ধ-বিরতি দিবসেই সম্মেলনের অধিবেশন হইবার সংকল্প করা হইয়াছে এবং এই বিশ্বশান্তি কংগ্রেস ইউরোপেরই কোন সমস্যাবহুল রাষ্ট্রের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হইবে।

"এতদুদ্দেশ্যে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্মানী, বেলজিয়ম, স্পেন, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে খ্যাতনামা প্রতিনিধিবর্গ আহ্বান করা হইয়াছে। এই কংগ্রেসের পরিকল্পনা বিশ্বব্যাপক, সুতরাং অন্যান্য মহাদেশের, বিশেষত ভারতবর্ষের প্রতিনিধিগণ ব্যতীত এই অনুষ্ঠান অঙ্গহীন থাকিয়া যাইবে।

"এতদুদ্দেশ্যে আপনার সহযোগিতা প্রার্থনীয়। আন্তর্জাতিক বিশ্বকমিটি গঠনের পরে প্রত্যেক দেশে জাতীয় কমিটি গঠন করিতে হইবে। ভারতবর্ষ হইতে দল ও মতবাদ নির্বিশেষে প্রতিনিধিত্ব আহ্বান করা হইতেছে যাহাতে শান্তি ও স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিরা এই কংগ্রেসে যোগদান করিয়া ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে পারেন। ফ্রান্সে আমরা কতিপয় বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও শান্তিকামীর

মধ্যস্থতায় ফ্রান্স ভিজিলেন্স কমিটির নেতা অধ্যাপক ল্যাঁজভা ও রিভেটের সাহায্য পাইয়াছি। এই ভিজিলেন্স কমিটির ১০,০০০ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সভ্যকে কমিটিতে যোগদান করাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিভিন্ন খৃস্টান ও অপরাপর সমিতিগুলির শান্তিকামী নেতৃগণের সঙ্গে আলোচনা করিতেছি। ইতিমধ্যে অধ্যাপক ও সুধী সমাজের নব-প্রতিষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক কেন্দ্র' স্কুল, কলেজ ও উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বিশ্বশান্তি সম্মেলনের আদর্শ প্রচারে যত্নবান থাকিবেন। বিশ্বকমিটিতে যাহাতে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি সত্বর মনোনীত হয় তজ্জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি। এতদুদ্দেশ্যে আমরা আপনার সচেষ্ট সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়া জানাইতেছি যে, ভারতবর্ষ হইতে যাহাতে অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি ইউরোপে এই কংগ্রেসে যোগদান করিতে পারেন আপনি তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৪শে আষাঢ়, ১৩৪২ ; ৯ই জুলাই, ১৯৩৫]

এই পত্র পাওয়ার পর সৌম্যেন্দ্রনাথ, গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ দেশবরেণ্য নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ইউরোপে আসন্ন শান্তি-সম্মেলনে তাঁহারা ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হইয়া যোগদান করিতে পারিবেন কিনা সে সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত জানিবার চেষ্টা করেন। বলা বাহুল্য, এই প্রস্তাবে নেতারা সর্বান্তকরণে সমর্থন জানান। স্থির হয়, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, সরোজিনী নাইডু ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ইউরোপের আসন্ন শান্তি-সম্মেলনে ভারতবর্ষের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই শান্তি-সম্মেলনে সংবাদ দিয়া 'প্রবাসী'তে লিখিলেন :

"পৃথিবীর গবর্মেণ্ট পক্ষীয় লোক নহেন এরূপ কতকগুলি আদর্শানুরাগী (idealist) মনীষী আছেন যাঁহারা বাস্তবিক জাতিতে জাতিতে শান্তি চান। তাঁহারা লেখা বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা সকল দেশের জনসাধারণকে যুদ্ধবিরাগী ও শান্তির অনুরাগী করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের মুখপাত্রস্বরূপ ফ্রান্সের বিখ্যাত সম্পাদক ও গ্রন্থকার আঁরী বারবুস (Henri Barbusse) আগামী নভেম্বর মাসে প্যারিসে শান্তিবাদের সমর্থক একটি কংগ্রেসের আয়োজন করিতেছেন। সকল দেশের লোকদের সমর্থন এই কংগ্রেসের উদ্যোক্তারা চান। সকল দেশের প্রতিনিধিরা কংগ্রেসে উপস্থিত হইবেন ; উপস্থিত হইতে না-পারিলে নিজ নিজ বক্তব্য লিখিয়া পাঠাইবেন। কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, কবি ও স্বরাজ প্রতিষ্ঠার অন্যতমা নেত্রী সরোজিনী নাইডু এবং পত্রিকা সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে আপাতত উদ্যোক্তারা ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করিতে সম্মতি পাইয়াছেন।..."

[প্রবাসী : শ্রাবণ, ১৩৪২ ; পৃঃ. ৬০১]

উল্লেখযোগ্য, এই সময়ই বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের ভারতের একটি জাতীয় উদ্যোগ কমিটিও (National Initiative Committee of the World Peace Congress) গঠিত হয়। এই কমিটির মধ্যে ছিলেন : মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরোজিনী নাইডু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত নীলকান্ত দাস, নবকৃষ্ণ চৌধুরী, কে. এল. যোগলেকর, প্রভাত সেন, আচার্য নরেন্দ্র দেব, সম্পূর্ণানন্দ, আর. এস. রুইকর, এ. ওয়াসেক ('অল বেঙ্গল মুসলিম স্টুডেণ্টস এ্যাসোঃ'-এর সম্পাদক), সুধাময়

দাশগুপ্ত ('অল বেঙ্গল স্টুডেণ্টস লীগ'-এর সম্পাদক) এবং সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ইহার সাংগঠনিক সম্পাদক (দ্র. *Modern Review* : October, 1935 ; P. 486) ।

বিশ্বশান্তি কংগ্রেসটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য অ্যাঁরি বারবুস্ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া মস্কোর একটি হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু (৩০শে আগস্ট, ১৯৩৫) হয়। বারবুসের মৃত্যুতে শান্তি আন্দোলন নিদারুণ আঘাত পায়। তাহার ফলে বিশ্বশান্তি সম্মেলনও বেশ কিছুদিনের জন্য পিছাইয়া যায়। বারবুসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে মস্কোতে বলশেভিক নেতারা তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে যে সম্মান প্রদর্শনের আয়োজন করেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' তাহার জন্য গৌরব প্রকাশ করিয়াছিলেন :

"বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী লেখক অ্যাঁরি বারবুসের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শিত হয়েছে, তাহাতে অনেক সম্রাটেরও হিংসার উদ্রেক হইতে পারে। মঃ স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট মন্ত্রীগণ অ্যাঁরি বারবুসের শবাধার বহন করিবেন এবং লালফৌজ ও বিমানবাহিনীর বাছা বাছা সদস্যগণ শোভাযাত্রার উপরিদেশে বিমানপোতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া থাকিবেন। শোভাযাত্রায় বহু বিশ্ববিখ্যাত লেখক যোগদান করিবেন।...

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ২২শে ভাদ্র, ১৩৪২ ; ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫]

আবিসিনিয়া যুদ্ধ ও ভারতবর্ষ

১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক 'ভারত শাসন আইন'টি পাস হয় (২রা জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে উহা Royal assent লাভ করে)।

আইনটি প্রধানত দুই অংশে বিভক্ত ছিল : (১) বর্মা ও এডেন বাদে সমগ্র ব্রিটিশ ভারত এবং দেশীয় রাজ্যগুলিকে লইয়া একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন (Federal Government) ; (২) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন (বা Provincial Autonomy)।

কেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত হয় : উচ্চকক্ষ বা রাষ্ট্রপরিষদ (Council of State) ও নিম্নকক্ষ (বা House of Assembly)। দেশীয় নৃপতিরা যথাক্রমে ইহাদের $\frac{২}{৫}$ ও $\frac{১}{৩}$ অংশ সদস্য মনোনয়ন করিবার অধিকার পান। অপরদিকে ব্রিটিশ ভারতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। তাহার ফলে উচ্চকক্ষে মোট ২৬০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৭৫ জন এবং নিম্নকক্ষে মোট ৩৭৫ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৮৬ জন সদস্য সাধারণ নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচিত হইবেন ; এইরূপ ব্যবস্থা হয়। অর্থাৎ পরিসংখ্যানগতভাবে বলিতে গেলে উচ্চকক্ষে ব্রিটিশ ভারতের মোট জনগণের ০'০৫ অংশ এবং নিম্নকক্ষে $\frac{১}{৯}$ অংশের 'ইলেক্টোরেট' বা নির্বাচনাধিকার থাকিল। কেন্দ্রে দ্বৈতশাসনব্যবস্থার (Diarchy) প্রবর্তন করা হয়। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকার্য প্রধানত সংরক্ষিত

(Reserved) ও হস্তান্তরিত (Transferred) এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। বস্তুত ইহার দ্বারা আইনসভার ক্ষমতা অত্যন্ত সঙ্কুচিত ও সীমাবদ্ধ করা হয়। কেননা বড়লাটের হাতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক ও পররাষ্ট্র, অর্থ, ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপার এবং পুলিশ ও আমলাতন্ত্র-সংক্রান্ত বিষয়গুলি থাকিল। তাছাড়াও বড়লাটের হাতে প্রচুর ক্ষমতা (discretionary power) দেওয়া হয়; যথা: আইনসভায় গৃহীত যে-কোনো আইন তিনি বাতিল ও আইনসভা কর্তৃক বাতিল যে কোনো বিল পাস করিতে পারিবেন, আইনসভা ভাঙিয়া দিতে—এমনকি গঠনতন্ত্রও suspend বা স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

প্রাদেশিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধভাবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন (Provincial Autonomy) প্রবর্তিত হয়। সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের মোট ১১টি প্রদেশ ইহার আওতাভুক্ত হয়। ইহার মধ্যে মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও আসাম—এই ছয়টি প্রদেশে দুই কক্ষ বিশিষ্ট এবং বাকী পাঁচটি প্রদেশে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠিত হয়। প্রাদেশিক ক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে আইন-সভার সদস্য নির্বাচন ব্যবস্থা,—তাছাড়াও তপশিলভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য কিছু আসন নির্দিষ্ট বা সংরক্ষিত করা হয়। উল্লেখযোগ্য, প্রাদেশিক ক্ষেত্রে দ্বৈত-শাসনের অবসান হইলেও গভর্নরদের হাতে বেশ কিছুটা (discretionary power) ক্ষমতা দেওয়া হয়। গোপন পুলিশ বিভাগ তো তাঁহাদের হাতে থাকিলই, তাছাড়া প্রদেশের শান্তি ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা বোধ করিলে তাঁহারা অর্ডিন্যান্স বা জরুরী আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হয়।

বলাবাহুল্য, দেশের প্রায় সমস্ত দলই, বিশেষত কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আইনটির তীব্র নিন্দাবাদ করা হয়। গান্ধীজী অবশ্য এ সম্পর্কে কোনো মন্তব্যই করিলেন না,—এমনকি 'হরিজন'-এ ইহার উল্লেখ পর্যন্ত করিলেন না। তিনি তখন গ্রামীণ শিল্প গঠনের জন্য একটানা প্রচার-অভিযান চালাইতেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। ভারত শাসন আইনটি সম্পর্কে তিনি কোনো মন্তব্যই করিলেন না। এ-সম্পর্কে তাঁহার মনোভাব পূর্বেই অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা খোলাচিঠিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। শারীরিক দিক থেকেও এ সময় কবি কিছুটা অসুস্থ হইয়া পড়েন। কিন্তু বিশ্বভারতীর আর্থিক সমস্যা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কী-যে করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। এই সময় এন্ড্রুজ কবিকে পরামর্শ দেন, তিনি যেন সমস্ত অবস্থাটা খোলাখুলি গান্ধীজীকে লিখিয়া জানান। ইতিমধ্যে অবশ্য সুরেন্দ্রনাথ করও ওয়ার্ধা থাকাকালে গান্ধীজীকে বিশ্বভারতীর সমস্যার কথাটা জানাইয়া রাখিয়াছিলেন। কবিও বুঝিতে পারেন, এই বিপদের দিনে গান্ধীজীই একমাত্র ভরসা। এই সময় অনিল চন্দের মারফত কবি গান্ধীজীকে এক পত্রে (১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫) বিশ্বভারতীর আর্থিক সমস্যাটি খুলিয়া জানাইলেন। কবির পত্রটি ছিল এই:

Santiniketan (Birb)
12 September, 1935.

My dear Mahatmaji,

I am glad Suren had an opportunity to discuss with you in detail the financial situation of the asrama during his recent visit to Wardha. I know how busy you are with your various activities and though I have often thought of telling you of my difficulties I have never done so before. But Charlie insisted that you must be informed about the situation and then only I gave permission to discuss it with you. Over thirty years I have practically given my all to this mission of my life 'and so long as I was comparatively young and active I faced all my difficulties unaided and through my struggles the institution grew up(in) its manifold aspects. And now, however, when I am 75 I feel the burden of my responsibility growing too heavey for me that owing to some deficiency in me that my appeals fail to find adequate response in the heart of my people though the cause that I have done my utmost to serve is certainly valuable···constant begging excursions with absurdly meagre results added to the strain of my daily anxieties have brought my physical constitution nearly to an extreme verge of exhaustions. Now I know of none else but yourself whose words may help my countrymen to realise that it is their worth while to maintain this institution in fullness of its functions and to relieve me of perpetual worry at this last period of my waning life and health. With deepest love.

Sd/ Rabindranath Tagore

গান্ধীজী অবশ্য যথাসময়ে এই পত্র পান নাই। প্রায় এক মাস পরে অনিল চন্দ স্বহস্তে গান্ধীজীকে এই পত্রটি দেন। (১১ই অক্টোবর)। পরদিনই গান্ধীজী কবিকে আশ্বাস দিয়া লিখিলেন যে, এই ব্যাপারে তিনি তাঁহার সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। গান্ধীজীর পত্রটি ছিল এই :

Dear Gurudev,

Your touching letter was received only on 11th instant, when I was in the midst of meetings. In the hope of delivering it to me personally Anil needlessly detained it. I hope he is now quite restored to health. Yes I have the

financial position before me now. You may depend upon my straining every nerve to find the required money. I am groping. I am trying to find the way out. It will take some time before I can report the result of my search to you.

It is unthinkable that you should have to undertake another begging mission at your age. The necessary funds must come to you without your having to stir out of Santiniketan.

I hope you are keeping well. Padmaja who was with you a few days ago, is here for the day and has been telling me how you have aged.

With reverential love,

Wardha
13th October, 1935

Yours
Sd/ M. K. Gandhi

উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে যে কতখানি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-প্রীতি ছিল উপরোক্ত পত্র দুটিতে তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

কিছুকাল পূর্বে গ্রামীণ শিল্প পুনর্গঠনের জন্য গান্ধীজী যে উদ্যোগ ও নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উহাকে স্বাগত জানাইয়াছিলেন। গান্ধীজীর আসন্ন জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহার এই নূতন কর্মোদ্যোগের গুরুত্ব উল্লেখ করিয়া কবি শান্তিনিকেতন থেকে All India Village Industries Association-এর নিকট নিম্নলিখিত শুভেচ্ছাজ্ঞাপক তারবার্তাটি প্রেরণ করেন (২১শে সেপ্টেম্বর)।

"While with the whole country I have my best wishes for Mahatmaji on his birthday this year, I cannot forget the great endeavour that has been started this year under his example and inspiration towards the revival of the village industries, a step of tremendous importance to Indian National reconstruction."—U. P.

[*Advance* : 23 Sept., 1935]

এই সময় মন্দিরে জীববলি লইয়া কলিকাতায় হিন্দুসমাজের মধ্যে বেশ কিছুটা উত্তেজনা ও তর্ক-বিতর্ক চলে। উপলক্ষটি ছিল এই যে, এই সময় জয়পুর নিবাসী রামচন্দ্র শর্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক মন্দিরে জীববলি বন্ধ করিবার জন্য কলিকাতায় কালীঘাট মন্দিরে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। ফলে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। সাময়িক পত্র-পত্রিকায়ও এই লইয়া তর্ক-বিতর্ক চলিতে থাকে। এই সময় গান্ধীজী কবিকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অনুরোধ জানাইয়া একটি তারবার্তায় লিখিলেন (৩রা অক্টোবর):

"Pandit Ramchandra said to be dying if you wire promising lead

all Bengal movement stop sacrifice to Kali and on strength there of suspend fast he may listen."

এই উত্তেজনায় রবীন্দ্রনাথ স্থির থাকিতে পারেন নাই। কবি মন্দিরে জীববলি প্রথাকে কোনোদিন সমর্থন করিতে পারেন নাই। তাই রামচন্দ্রের আন্দোলনকে তিনি পূর্ণ সমর্থন করেন। এই সময় রামচন্দ্রের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া তিনি একটি কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। কবিতাটির প্রথমাংশটি ছিল এইরূপ :

"প্রাণ-ঘাতকের খড়্গে করিতে ধিক্কার
হে মহাত্মা, প্রাণ দিতে চাও আপনার
তোমারে জানাই নমস্কার।
হিংসারে ভক্তির বেশে দেবালয়ে আনে,
রক্তাক্ত করিতে পূজা সংকোচ না মানে।
সঁপিয়া পবিত্র প্রাণ, অপবিত্রতায়
ক্ষালন করিবে তুমি সংকল্প তোমার,
তোমারে জানাই নমস্কার।"

এই প্রসঙ্গে কবি এই সময় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে একটি পত্রে লিখলেন (১৮ই সেপ্টেম্বর) : "শক্তিপূজায় এক সময়ে নরবলি প্রচলন ছিল, এখনও গোপনে কখনো কখনো ঘটে থাকে। এই প্রথা এখন রহিত হয়েছে। পশুহত্যাও হবে এই আশা করা যায়।"

এই প্রসঙ্গে জনৈক প্রশ্নকারীর জবাবে কবি যে পত্রটি দেন তাহার অনুলিপিও তিনি হেমেন্দ্রপ্রসাদকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কবি ঐ পত্রে লিখিয়াছিলেন (২৪শে ভাদ্র, ১৩৪২) :

…"ঠগীরা দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যাকে তাদের ধর্মের অঙ্গ করেছিল। নিজের লুব্ধ ও হিংসাপ্রবৃত্তিকে দেবদেবীর প্রতি আরোপ করে তাকে পুণ্য শ্রেণীতে ভুক্ত করাকে দেবনিন্দা বলব। এই আদর্শ-বিকৃতি থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য যিনি প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রবৃত্ত, তিনি তো ধর্মের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ; শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই ধর্মের উদ্দেশ্যেই প্রাণ দিতে স্বয়ং উপদেশ দিয়েছিলেন। সেই উপদেশই রামচন্দ্র শর্মা পালন করছেন। সাধারণ মানুষের হিংস্রতা নিষ্ঠুরতার অন্ত নেই—স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ তাকে সম্পূর্ণ রোধ করতে পারেন নি—তবুও ধর্ম অনুষ্ঠানে হিংস্রতার বিরুদ্ধে আত্মোৎসর্গের মতো দুষ্কর পুণ্যকর্ম আর কিছু হ'তে পারে না ; …রামচন্দ্র শর্মা আপনার প্রাণ দিয়ে নিরপরাধ পশুর প্রাণ-ঘাতক ধর্মলোভী স্বজাতির কলঙ্ক ক্ষালন করতে বসেছেন এই জন্যে আমি তাঁকে নমস্কার করি। তিনি মহাপ্রাণ ব'লেই এমন কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়েছে।"

[প্রবাসী : কার্তিক, ১৩৪২ ; পৃঃ. ১২০-২১]

মাদ্রাজে এই সময় ভারতীয় ঔপনিবিশিকদের প্রথম একটি সম্মেলন করার কথা হয়। উল্লেখযোগ্য, 'ভারতীয় ঔপনিবেশিক সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৬ খৃঃ। উহার সভাপতির মৃত্যুর পর 'সংঘ' কাজের দিক দিয়া তেমন অগ্রসর হইতে পারে নাই। ১৯৩৪ সালে রবীন্দ্রনাথকে লইয়া এই সংঘ পুনর্গঠিত হয়। যাহাই হোক, সম্মেলনের

উদ্যোক্তরা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর নিকট এই উদ্দেশ্যে বাণী পাঠাইবার অনুরোধ জানান। কবি তাহার জবাবে নিম্নলিখিত বাণীটি পাঠান। Indian Colonial Conference নামে ২৮শে সেপ্টেম্বর মাদ্রাজের গোখলে হলে উক্ত সম্মেলন হয়। সম্মেলনে কবির এই বাণীটি পাঠ করা হয় :

"India is painfully struggling with her immediate problem, which she is yet unable to solve, while lacking physical power and political prestige she fails to save from indignity and injustice those of her children who are out to seek their fortune abroad. We have our only recourse to-day to a moral appeal to civilised humanity, and at the same time to developing power and character that can effectively ensure us human treatment wherever we may find ourselves."

গান্ধীজী তাঁহার সংক্ষিপ্ত বাণীতে লিখিয়া পাঠাইলেন :

"Even at the risk of being misunderstood I must refrain from attending the Conference. I shall watch the deliberations with sympathy." [*Civil & Military Gazette* : 1st October, 1935]

সম্ভবত এই সম্মেলনে যোগদান করার জন্যই এণ্ড্রুজ পুনরায় ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন।

স্মরণ রাখা দরকার, বেশ কিছুকাল পূর্বে আফ্রিকা এবং মালয়, ফিজি, জাঞ্জিবার, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে ভারতীয় উপনিবেশিকদের মানবিক অধিকারের দাবীতে পিয়ার্সন ও এণ্ড্রুজ যে আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন তাহাতে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর পূর্ণ সমর্থন ছিল। আর এণ্ড্রুজ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১লা অক্টোবর থেকে বিশ্বভারতীর শারদাবকাশ শুরু হয়। তাহার পূর্বেই মিস্ জিয়ানসন্ শান্তিনিকেতন ছাড়িয়া দেশের পথে যাত্রা করেন। কাউণ্টেস্ হ্যামিলটন্ ইঁহাকে শান্তিনিকেতনে স্লয়ড্ শিক্ষা দিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন পূর্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি। ইতিমধ্যে সুইডেন থেকে লক্ষ্মীশ্বরের পত্রে কবি জানিতে পারেন যে কাউণ্টেস্ হ্যামিলটন্ মিস্ সেডারব্লম্ নামে অপর একজন স্লয়ড্ শিক্ষিকাকে শান্তিনিকেতনে প্রেরণ করিতেছেন। এই কথা জানিতে পারিয়া কবি কাউণ্টেস্ হ্যামিলটনকে ধন্যবাদ জানাইয়া এক পত্রে লিখিলেন :

"Miss Jeanson would be leaving us soon and I shall be failing in my duty if I did not tell you how much we have appreciated her quiet, unostentatious, good work. She has already laid the foundation of the department quite well and I am sure it will go on flourishing under the able guidance of Miss Cederblom,—whom I understand from a letter from Mr. Sinha—you are sending out to us. Our gtatitude to you is immense and it will give you pleasure to know

-that your kindness and beneficence has been deeply appreciated by my countrymen." [দ্র. রবীন্দ্রজীবনী-চতুর্থ খণ্ড : পৃঃ. ৩২-৩৩]

মিস্ জিয়ান্সন্ চলিয়া যাইবার কিছু দিন পরই মিস্ সেডারব্লম্ শান্তিনিকেতনে আসেন। এই দুঃসাহসিকা মহিলা সুইডেন থেকে একটি মোটরবোটে ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। কিন্তু ৮ই অক্টোবর কলম্বো থেকে ভারতে আসার পথে কারিকল্ উপকূলের নিকট ঝড়ে তাহার বোট্খানি উল্টাইয়া যায়। অবশ্য দুর্ঘটনার কিছুদূরে একটি জাহাজের ক্যাপ্টেন ও লোকজন তাঁহাকে উদ্ধার করেন। উহার দিন কয়েক পরেই মিস্ সেডারব্লম্ শান্তিনিকেতনে আসিয়া কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

ইতিমধ্যে ইতালী-আবিসিনিয়া বিরোধ ঘনীভূত হইয়া উঠে। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া ইতালির বিশাল সৈন্যবাহিনী আবিসিনিয়া সীমান্তে কুচকাওয়াজ করিতে থাকে। দিনের পর দিন মুসোলিনী তাহার বক্তৃতায় আবিসিনিয়ার উদ্দেশে রণহুঙ্কার ও তর্জন গর্জন করিতে থাকেন। আবিসিনিয়া লীগ-অব-নেশন্স্-এর শরণাপন্ন হ'ন। 'লীগ্' উভয় দেশের মধ্যে আপস-মীমাংসার কপট অভিনয় করিতে থাকে। মুসোলিনী 'লীগ্' থেকে বাহির হইয়া আসার হুমকী দেয়।

আবিসিনিয়ার উদ্দেশে মুসোলিনীর এই রণহুঙ্কার ও তাহার সাম্রাজ্য-লালসার বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর শান্তিকামী ও গণতন্ত্রবাদী মানুষ তীব্র নিন্দাবাদ ও ধিক্কার জানাইতে থাকেন। এই আন্দোলনে ভারতবর্ষও একেবারে পিছাইয়া ছিল না। ২৬শে জুলাই (১৯৩৫) কলিকাতায় এলবার্ট হল-এ জে. সি. গুপ্তের সভাপতিত্বে আবিসিনিয়ার প্রতি ইতালির আগ্রাসন-নীতি এবং তাহার সাম্রাজ্য-লালসার তীব্র নিন্দাবাদ করিয়া এক জনসভা হয়। সভায় জে. সি গুপ্ত, রামমনোহর লোহিয়া, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বক্তারা বক্তৃতা করেন। সভার শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :

"সাম্রাজ্যবাদী ইতালি আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা হরণের জন্য যে ভয় প্রদর্শন করিয়াছে, এই সভা তাহার তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং আবিসিনিয়াবাসী স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে বীরোচিত চেষ্টা করিতেছে, তাহার প্রশংসা করিতেছে। এই সংকটকালে আবিসিনিয়ার সংহতিশক্তি যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, এই সভা তাহাই আশা করিতেছে। আবিসিনিয়া তাহার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে সংগ্রাম করিতেছে, তাহা পৃথিবীর সমস্ত নির্যাতিত জাতির সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামেরই একটা অংশ।

"বিশ্বশান্তি রক্ষার ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ, বিশেষত গ্রেটবৃটেন ও ফ্রান্স যে অসামর্থ্য ও শঠতা প্রকাশ করিতেছে, এই সভা তাহার প্রতিবাদ করিতেছে। এই সমস্ত শক্তি তাহাদের আপন আপন স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্যই নিজেদের মধ্যে একটা অলীক শান্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে,—এই অলীক ব্যবস্থার ফলাফলের কথা তাহারা মোটেই ভাবে না।

"সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যে সমগ্র বিশ্ব চড়াও করিবার মতলব আঁটিতেছে, এই সভা ভারতবাসীকে সেই বিপদের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ইতালির সাম্রাজ্যবাদমূলক আক্রমণের প্রতিবাদার্থ ভারতবাসীকে সভা-সমিতি আহ্বান করিবার

জন্য এবং ইতালীয় মজুর ও কৃষকদিগকে ফ্যাসিস্ট গভর্নমেন্টের এই কাজে বাধাদানের জন্য এই সভা আহবান করিতেছে। কারণ এইরূপ প্রতিবাদ দ্বারা ফ্যাসিজম্, যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহাকে শক্তিশালী করা হইবে।

"ফ্যাসিস্ট ইতালির এই কার্যের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে সমস্ত বাণিজ্যগত আদান-প্রদান বন্ধ রাখিবার জন্য এই সভা ভারতবাসীকে আহবান করিতেছে।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ১১ই শ্রাবণ, ১৩৪২ ; ২৭শে জুলাই. ১৯৩৫]

কলিকাতার ছাত্রসমাজ চিরদিনই প্রগতিশীল আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়াছেন। এই আন্দোলনেও তাঁহারা পিছাইয়া থাকিলেন না। এর কয়েকদিন পর, ১লা আগস্ট কলিকাতার একদল প্রগতিশীল ছাত্রের উদ্যোগে এলবার্ট হল-এ 'যুদ্ধ-বিরোধী দিবস' পতিপালিত হয়। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

এর পর ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশে এই আন্দোলনের প্রসার ঘটে। ১লা সেপ্টেম্বর কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের উদ্যোগে লক্ষ্ণৌ-এর আমিনুদ্দোল্লা পার্কে 'আবিসিনিয়া দিবস' প্রতিপালিত হয়। ১৮ই সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ে যমনাদাস মেটার সভাপতিত্বে ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণের তীব্র নিন্দাবাদ করিয়া এক জনসভা হয়। ঐ সভায় বোম্বাইয়ে একটি যুদ্ধ-বিরোধী সম্মেলনের আহবানের উদ্দেশ্যে যমনাদাস মেটা, মনিবেন কারা, হংসবাঈ মেটা, ভি.বি. কার্ণিক ও কে. এন. যোগলেকর প্রভৃতিদের লইয়া একটি অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয়।

২রা অক্টোবর গান্ধীজীর জন্মদিন। ঐদিনই মুসোলিনীর সৈন্যবাহিনী আবিসিনিয়া আক্রমণ করে। এই সংবাদে বিশ্বের সমস্ত শান্তিকামী মানুষ স্তম্ভিত হইয়া গেল। বস্তুতপক্ষে মুসোলিনী বেশ কিছুকাল থেকেই আবিসিনিয়া আক্রমণের তোড়জোড় করিতেছিল। লীগ-অব-নেশন্স্-এর পাণ্ডারা তাহা ভালোভাবে জানিলেও মুসোলিনীকে কেহই কোনরূপ সতর্কীকরণ করিলেন না। বস্তুত তাঁহারা এতদিন মুসোলিনীর তোষণ করিয়াছিলেন এই আশায় যে, হিটলার অস্ট্রিয়া আক্রমণ করিলে মুসোলিনী তাহাকে প্রতিহত করিতে আগাইয়া আসিবে। ধূর্ত মুসোলিনী ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া আবিসিনিয়া আক্রমণ করিল। লীগ-অব-নেশন্স্-এর তখন অধিবেশন চলিতেছে। ১০ই অক্টোবর, লীগের এক সভায় প্রায় সমস্ত সদস্যই একবাক্যে ইতালিকে আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করেন এবং পরে ইতালির বিরুদ্ধে মৃদুরকমের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা (Sanction) জারি করা হয়। বলা বাহুল্য, এই নিষেধাজ্ঞাও নামমাত্র, ঐ নিষিদ্ধ পণ্য তালিকা থেকে তৈল, লৌহ-ইস্পাত, কয়লা প্রভৃতি পণ্যকে বাদ দেওয়া হয়। 'অ্যাংলো-ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানি' সমানে ইতালিকে তৈল সরবরাহ করিয়া চলিল। ফলে আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ইতালির তেমন কোনো ব্যাঘাত বা অসুবিধা হইল না।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণের সংবাদে কবি অত্যন্ত মর্মাহত হন ;—কিন্তু কী যে করিবেন বা বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। সাম্রাজ্যবাদীদের পররাজ্যলোলুপতা ও আক্রমণ-লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে কবি সারাজীবনই তীব্র প্রতিবাদ ও ভর্ৎসনা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এই প্রতিবাদ ও নিন্দাবাদের

কার্যকারিতা সম্পর্কে মাঝে মাঝে তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মাইত ; ভাবিতেন, ইহা অক্ষম ও দুর্বলের প্রতিকারহীন নিষ্ফল কান্না,—বিশেষত ভারতবর্ষের মত পরাধীন দেশের পক্ষে। এণ্ড্রুজ তখন ভারতবর্ষ ছাড়িয়া ইংলণ্ড যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন। এই সময় ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণ সম্পর্কে কবি তাঁহাকে এক পত্রে তাঁহার মর্মবেদনার কথা ব্যক্ত করেন। এণ্ড্রুজ পরে পত্রটি *Manchester Guardian*-এ (November 1, 1935) প্রকাশ করেন। এই পত্রের এক জায়গায় কবি লিখেন :

"I keenly feel the absurdity of raising my voice against an act of unscrupulous and virulent imperialism of this kind when it is pitiably feeble against all cases that vitally concern ourselves."…

কবি ক্ষোভের সঙ্গে যাহা বলিতে চাহিলেন তাহার অর্থ এই, নিজে যে-দেশে স্বাধীন নয়,—এমন পরাধীন দেশের পক্ষে অন্যদেশের স্বাধীনতার পক্ষে প্রতিবাদ করায় কিছু লাভ হয় না।

আবিসিনিয়া সম্পর্কে ঠিক অনুরূপ মনোবেদনা ও ক্ষোভ প্রকাশ পায় কিছুকাল পরে তাঁহার অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি পত্রে। তিনি লিখিয়াছিলেন (২১শে জুলাই, ১৯৩৬) :

"দিশি এমন একটি কাগজও নেই যাতে আবিসিনিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ প্রকাশ করে নি। রাষ্ট্রনৈতিক শ্রেয়োবুদ্ধি থেকেই যে এটা করা হয়েছে তা নয়, এর মধ্যে বর্ণভেদমূলক উত্তেজনা আছে।

"আমার জীবনলীলার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে সে কথা বলা বাহুল্য। আমি য়ুরোপীয় নই, কর্মের কাছে আত্মবলি দিয়ে শান্তি সাধনার চরম মূল্য স্বীকার করিনে।

"বাইরের কর্মক্ষেত্রে আমাদের নিরুপায় অক্ষমতা সুদীর্ঘকাল স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি। তার বিরুদ্ধে কণ্ঠচালনা করে সান্ত্বনা চেষ্টারও অন্ত নেই। ক্ষীণ কলরবের ব্যর্থ প্রতিধ্বনি নিজের কাছে ফিরে এসে আমাদের পরিহাস করে। তবুও এই পথে অনেক দিন স্বরসাধনা করতে ছাড়ি নি—এখন দিন শেষ হয়ে এল, বহির্মুখী চেষ্টাগুলোকে প্রতিসংহার করার সময় এসেছে।

"প্রবলের বাহুবল প্রয়োগের যুদ্ধরূপটা আমাদের কাছে স্পষ্ট আকারে দেখা দেয়। তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশের অর্থ বুঝতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু যুদ্ধের চেয়ে দারুনতর অভিঘাত আছে তার লাল রংটা চোখে পড়ে না বলে সে সম্বন্ধে ইণ্টার-ন্যাশনাল দরদ জাগাবার সম্ভাবনা নেই। তারি সাংঘাতিকতা দুর্বল জাতির পক্ষে সবচেয়ে মর্মান্তিক। আমাদের মতো দুর্বল যখন মার খায় তখন স্বীকার করে নিতে হয় সেটা অনিবার্য। আমরা মারের জন্যে নিজের হাতে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছি, অথচ বোকার মতো কান্নাকাটি করি।…এত কথা তোমাকে বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, পঁচাত্তর বছরের জীর্ণ শরীরের বোঝা নিয়ে আয়ুপথের শেষ মাইলটা যখন চলতে হচ্ছে তখন উপস্থিত দায় সামলানোই যথেষ্ট কঠিন, আর কোনো উত্তেজনায় এই ফাটলধরা মনটাকে দোল খাওয়াতে উৎসাহ হয় না।"

[কবিতা কার্তিক : ১৩৪৯, বিশেষ ক্রোড়পত্র ; পৃঃ. ৬-৭]

বলা বাহুল্য কবির এই মানসিক প্রতিক্রিয়া খুবই সাময়িক। স্মরণ রাখা দরকার যুদ্ধ ও ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনের শুরু থেকেই তিনি তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তাছাড়া কিছুকাল পরে যখন জেনারেল ফ্রাঙ্কো কর্তৃক স্পেন এবং জাপান কর্তৃক চীন আক্রান্ত হয়, তখন পুনরায় তাঁহার কণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহার কণ্ঠ সরবে ধিক্কার দিয়াছে শিশুঘাতী নারীঘাতী যুদ্ধবাজ ফ্যাসিস্ট সভ্যতাকে।

ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণের সংবাদে গান্ধীজীও অত্যন্ত মর্মাহত হন। এই সময় একটি মার্কিন পত্রিকায় এক বাণীতে তিনি চিরন্তন ও স্থায়ী শান্তির প্রতিই তাঁহার আন্তরিক আস্থা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, বিশ্বের বড় বড় শক্তিগুলি তাহাদের ধ্বংসাত্মক শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি পরিত্যাগ না করিলে স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না। তাছাড়া গান্ধীজী কোনোদিনই সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে বিশ্বাস করিতেন না। ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণের প্রশ্নেও সশস্ত্র প্রতিরোধের পরিবর্তে তিনি আবিসিনিয়াবাসীদের অহিংস প্রতিরোধ-নীতি গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। ১২ই অক্টোবর (১৯৩৫) তিনি হরিজন-এ এই সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য ব্যাখ্যা করিয়া লিখিলেন:

"Non-violence to be a creed has to be all-pervasive. I can not be non-violent about one activity of mine, and violent about others. That would be a policy, not a life-force. That being so, I cannot be indifferent about the war that Italy is now waging against Abyssinia. But I have resisted most pressing invitations to express my opinion and give a lead to the country.···Nevertheless, it is my unshakable belief that India's destiny is to deliver the message of non-violence to mankind. It may take ages to come to fruition. But so far as I can judge, no other country will precede her in the fulfilment of that mission.

"If Abyssinia were non-violent, she would have no arms, would want none. She would make no appeal to the League or any other power for an armed intervention. She would never give any cause for complaint. And Italy would find nothing to conquer if the Abyssinians would not offer armed resistance, nor would they give co-operation, willing or forced. Italian occupation in that case would mean that of the land without its people. That however, is not Italy's exact object. She seeks submission of the people of that beautiful land." [*Mahatma* : Vol. IV, P. 41]

ইতিপূর্বে কখনো কখনো তিনি এইসব সমস্যায় বিক্ষিপ্ত মন্তব্য করিয়াছেন বটে তবে বস্তুতপক্ষে এই সময় থেকেই আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ও বিশ্বপরিস্থিতির অবনতি সম্পর্কে গান্ধীজী ক্রমশই উদ্বিগ্ন হইয়া উহার সমাধান সম্পর্কে চিন্তা-

ভাবনা শুরু করেন। এই সময় থেকেই তিনি তাঁহার আন্তর্জাতিক নীতিকে সুস্পষ্ট-ভাবে রূপদানে উদ্যোগী হইলেন। বলা বাহুল্য, গান্ধীজীর এই আন্তর্জাতিক নীতি প্রধানত অহিংসা, প্রেম ও শান্তির নীতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

উল্লেখযোগ্য ভারতবর্ষের অধিকাংশ পত্র-পত্রিকাই আবিসিনিয়ার উপর ইতালির বর্বরোচিত আক্রমণের তীব্র সমালোচনা ও নিন্দাবাদ করিতেছিল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো সিদ্ধান্ত কিংবা কংগ্রেস সভাপতির পক্ষে এই আক্রমণের নিন্দাবাদ করিয়া কোনো বিবৃতি প্রচার করা হয় নাই। এর পরও দীর্ঘকাল পর্যন্ত আবিসিনিয়ার বীর জনগণের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে সহানুভূতি জানাইয়াও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনো বাণী প্রেরণ করা হয় নাই। বস্তুতপক্ষে অধিকাংশ কংগ্রেস নেতাদের আন্তর্জাতিক নীতি কিংবা পররাষ্ট্র-নীতি সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ধারণাই ছিল না। জওহরলালের নেতৃত্বে মাদ্রাজ কংগ্রেসে (১৯২৭) যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যে-সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় উহার তাৎপর্য অধিকাংশ কংগ্রেস নেতাই যে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, এই ঘটনা থেকেই তাহা প্রমাণিত হয়। ফ্যাসিজমের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী ও জঙ্গীবাদী নীতির বিপজ্জনক তাৎপর্য সম্পর্কে জওহরলাল ছাড়া অন্য কোনো দায়িত্বশীল ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতাকে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতে দেখি না।

কিন্তু জওহরলাল তখন ইউরোপে। জার্মানীর এক স্বাস্থ্যনিবাসে কমলা নেহরুর অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক হইয়া উঠিলে গভর্নমেণ্ট জওহরলালকে মুক্তি (৪ঠা সেপ্টেম্বর) দেন। উল্লেখযোগ্য, এই সময় রবীন্দ্রনাথ জওহরলালের মুক্তির আবেদন জানাইয়া লর্ড উইলিংডনকে একটি তার (২রা সেপ্টেম্বর) করেন। মুক্তি পাওয়ার পরই তিনি বিমানযোগে জার্মানীতে তাঁহার পীড়িতা স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হন। উহার কিছুদিন পরেই ইতালি আবিসিনিয়া আক্রমণ করে। এইরূপ মানসিক পরিস্থিতিতে তাঁহার পক্ষে কোনো গুরুতর রাজনীতিক বিষয়ে চিন্তা করা সম্ভব ছিল না। অবশ্য ফ্যাসিস্ট ও নাৎসী বর্বরতার বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে বহুবার তিনি তীব্র ভাষায় নিন্দাবাদ করিয়াছেন বটে তবে এবার দেশে ফেরার আগে পর্যন্ত (মার্চ, ১৯৩৬) আবিসিনিয়া যুদ্ধ কিংবা যুদ্ধ ও ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনের নির্দেশ দিয়া তিনি কংগ্রেস ও দেশবাসীর উদ্দেশে উল্লেখযোগ্য কোনো আবেদন পাঠান নাই। সত্য কথা, এবার দেশে ফেরার পথে রোমে তিনি মুসোলিনীর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন তবে ইউরোপে থাকিতে মুসোলিনীর কিংবা ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণের নিন্দা করিয়া কোনো প্রেস-বিবৃতিও তিনি দেন নাই।

সুভাষচন্দ্রও তখন ইউরোপে। কিন্তু জওহরলালের তীব্র ফ্যাসিবাদ বিরোধিতাকে তিনি নীতি ও কৌশলগত দিক থেকে খুব প্রাজ্ঞোচিত ভাবিতেন না। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদকে তিনি সুস্পষ্টভাষায় নিন্দাও করেন নাই পরন্তু দু'একটি বিবৃতিতে তিনি ফ্যাসিজম ও মুসোলিনীর প্রশংসা করিয়াছিলেন, পূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বস্তুতপক্ষে আদর্শের ক্ষেত্রে তিনি তখন কমিউনিজম ও ফ্যাসিজমের একটা সমন্বয় সাধনের (বা synthesis) কথাই চিন্তা করিতেছিলেন এবং উহাকেই তিনি 'সাম্যবাদ' নামে আখ্যা দিতে চাহিয়াছিলেন (দ্র. *The Indian Struggle* :

P. 314)। তাছাড়া ভারতবর্ষের আন্তর্জাতিক ও পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের প্রশ্নে প্রায় দেড়বৎসর পূর্বে জেনিভা থেকে এক বিবৃতিতে তিনি যাহা বলেন তাহা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ (১৯৩৪, মার্চ)। তিনি বলেন :

"In the domain of our external policy, our own socio-political views or predilections should not prejudice us against people or nations holding different views, whose sympathy we may nevertheless be able to acquire. This is a universal cardinal principle in external policy and it is because of this principle that to-day in Europe a pact between Soviet Russia and Fascist Italy is not only a possibility but an accomplished fact. Therefore in our external policy, we should heartily respond to any sympathy for India which we may find in any part of the world.

"In determining our internal policy, it would be a fatal error to say that the choice for India lies between Communism and Fascism. No standpoint or theory in socio political affairs can be the last word in human wisdom.···My own view has always been that India's task is to work out a synthesis of all that is useful and good in the different movements that we see to-day. For this purpose we shall have to study with critical sympathy all the movements and experiments that are going on in Europe and America. And we would be guilty of folly if we ignore any movement or experiment because of any preconceived bias or predilection.,"

[*The Modern Review* : March, 1934 ; P. 670]

কী কারণে তিনি ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদকে সুস্পষ্ট ভাষায় নিন্দাবাদ করেন নাই, তাহা উপরোক্ত বিবৃতি থেকে স্পষ্টই বুঝা যায়। এই পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা এই যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বার্থে ফ্যাসিস্ট অথবা বৃটেনের শত্রু অন্য সাম্রাজ্যবাদী যে কোনো দেশ থেকেই সাহায্য আসিবে উহাকে নির্বিচারে গ্রহণ করিতে হইবে এবং এই কারণেই সেই সব দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার কোনো সমালোচনা করা প্রাজ্ঞোচিত হইবে না। বলা বাহুল্য, এই নীতির মধ্যে আন্তর্জাতিকতার কোনো মহান আদর্শবাদ নাই। মূলত ইহাতে পররাষ্ট্রনীতির কূটকৌশল (বা diplomacy) গ্রহণের উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়। পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে এই কথাই পরবর্তীকালে হরিপুরা কংগ্রেসের (১৯৩৮) ভাষণে তিনি বলেন।

উল্লেখযোগ্য, ইতালি-আবিসিনিয়া বিরোধের সূচনাকাল থেকে তিনি কংগ্রেস ও দেশবাসীর উদ্দেশে সতর্কবাণী করিতে থাকেন যে, ব্রিটেন এ যুদ্ধে জড়িত হইলে ভারতীয় সৈন্যদের আবিসিনিয়া রণাঙ্গনে প্রেরণ করিবে। ১লা অক্টোবর (১৯৩৫) *Manchester Guardian*-এ এক খোলাচিঠিতে তিনি এই আশঙ্কাই প্রকাশ করিলেন।

তাছাড়া ভারতবর্ষে ইউনাইটেড্ প্রেসকে তিনি এই মর্মে পর পর কয়েকটি বিবৃতি পাঠান। একটি বিবৃতিতে তিনি বলেন :

…ব্রিটেন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ভারত হইতে সেনা সাহায্য গ্রহণ করা হইবে কি না সে প্রশ্নের উত্তরে লর্ড জেটল্যান্ড বলিয়াছেন যে, যুদ্ধ বাধিলে তখনকার অবস্থার উপর নির্ভর করিবে। কাজেই মনে হয়, ব্রিটেন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অবশ্যই সাহায্যার্থ প্রস্তুত হইতে হইবে। ভারতের প্রধান সেনাপতি-মহাশয়ও সেদিন ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে বলিয়াছেন যে, যুদ্ধ বাধিলে ভারতীয় সেনাবাহিনী তাহাতে কি অংশ গ্রহণ করিবে সে বিষয়ে ভারতীয় জনমত গ্রহণ করা হইবে। এতৎসম্পর্কে আমার বিশ্বাস, সমগ্র ভারত তথা জগতের অধিকাংশ স্থানই আবিসিনিয়ার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। আবিসিনিয়ার এই বিপদে সাহায্যকল্পে ভারত যে নিশ্চয়ই অগ্রসর হইবে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

"ভারতীয় জনগণকে আমি দুইটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করি। প্রথমটি হইল—ভারতীয় সেনাবাহিনীর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হওয়ার সম্ভাবনা ; দ্বিতীয়টি হইল আবিসিনিয়ার প্রতি ভারতীয়দের সহানুভূতিকে ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ কর্তৃক নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কিভাবে নিয়োজিত করা হয়। ইউ. পি.

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ ; ২২শে নভেম্বর, ১৯৩৫]

উল্লেখযোগ্য, ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণের পর ইংরেজেরা কংগ্রেস বা ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়াই ভারতীয় সৈন্যদের আদ্দিস্-আবাবায় প্রেরণ করে। ৩রা সেপ্টেম্বর পণ্ডিত নীলকান্ত দাস উপরোক্ত মর্মে অভিযোগ করিয়া ব্যবসা-পরিষদে এক মুলতুবী প্রস্তাব আনেন।

ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণের ঘটনাটির তাৎপর্য ও শিক্ষা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র এই সময় ইউরোপ থেকে The Secret of Abyssinia And Its Lesson—এই শিরোনামায় *Modern Review*-এ (Nov., 1935) একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান। তাঁহার মতে আবিসিনিয়া আক্রমণের থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তাহা হইতেছে এই যে, বিংশ শতাব্দীতে কোনো জাতি স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা করিলে তাহাকে দৈহিক ও সামরিক—উভয় দিক থেকেই শক্তিশালী হইতে হইবে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান যে সমস্ত বিদ্যা ও জ্ঞানরাজি, তাহাও তাহাকে আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে।

এই প্রবন্ধে তিনি কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ আনিলেন যে আন্তর্জাতিক নীতি সম্পর্কে তাঁহাদের এতকালের ঔদাসীন্যের ফলেই ব্রিটিশরা আজ ভারতীয় জনমতকে উপেক্ষা করিয়া আদ্দিস্-আবাবায় ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ করিতে সাহস পাইয়াছে। তিনি ইহার মধ্যে ব্রিটিশের কূটনীতির তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিলেন, (১৫ই অক্টোবর, ১৯৩৫) :

…"The reason is clear. Indian troops were sent with the idea of committing Indian support to British policy in Abyssinia and on the

other hand, to remind Italy that the vast resources of India are behind Great Britain."

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের যে চিত্রটি তিনি দেখিতেছিলেন, সে সম্পর্কে তিনি এই প্রবন্ধের উপসংহারে বলিলেন :

"There are two ways in which Imperialism may come to an end—either through an overthrow by an anti-imperialist agency or through an internecine struggle among imperialists themselves. If the second course is furthered by the growth of Italian Imperialism, then Abyssinia will not have suffered in vain."

[*Modern Review* : Nov., 1935 ; P. 571-77]

লক্ষ্য করিবার বিষয়, এইসব প্রবন্ধে ও বিবৃতিতে তিনি ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী কূট-নৈতিক অভিসন্ধি বা মতলবের তাৎপর্যটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়াছেন কিন্তু তিনি ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত ও গণ বিক্ষোভ প্রদর্শনের আহ্বান জানাইয়া দেশবাসীকে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশ দিলেন না। ভারতবর্ষে সেই সময় যে-সব বামপন্থী ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ইতালির সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি ও আক্রমণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়া ভারতে যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহাদিগকেও অভিনন্দন জানাইয়া এই আন্দোলনকে তিনি জোরদার ও বেগবান করার আহ্বান জানান নাই। তাছাড়া আবিসিনিয়ার বীর জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অকুণ্ঠ নৈতিক ও সক্রিয় সাহায্য (moral and material) করার জন্য ইউরোপ থেকে দেশবাসীর উদ্দেশে কোনো আবেদন তিনি জানান নাই। অবশ্য পরবর্তীকালে তিনি কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হইলে স্পেনে ও চীনে অনুরূপ সাহায্য প্রেরণের জন্য দেশবাসীকে সেই আহ্বান জানাইয়াছিলেন। অবশ্য তাহার পূর্বেই স্পেন ও চীনের পক্ষে ভারতবর্ষে প্রবল জনমত সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। ১২ই অক্টোবর (১৯৩৫) 'হরিজন'-এ আবিসিনিয়ার অহিংস প্রতিরোধ সংগ্রামের আহ্বান জানাইয়া গান্ধীজীর নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ১৫ই অক্টোবর পুণাতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শুরু হয়। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণ কিংবা বিশ্বের সংকটজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনো আলোচনা বা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নাই।

উল্লেখযোগ্য, এই সময়ই কমিউনিস্ট, সোস্যালিস্ট ও প্রগতিশীল বামপন্থী বুদ্ধি-জীবীরা আবিসিনিয়াবাসীদের প্রতি পূর্ণ নৈতিক সমর্থন এবং ফ্যাসিস্ট ইতালির বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ প্রচার অভিযান শুরু করেন। এই সময়ই কলিকাতায়, 'ইতালি-আবিসিনিয়া যুদ্ধ-বিরোধী সঙ্ঘ' নামে একটি কমিটি গঠিত (২৭শে অক্টোবর, ১৯৩৫) হয়। এই সম্পর্কে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সংবাদদাতা লিখিতেছেন :

"গত রবিবার, ২৭শে অক্টোবর সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় বঙ্গীয় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের কার্যালয়ে ইতালি-আবিসিনিয়া বিরোধ সম্পর্কে ভারতের মনোভাব প্রকাশ

করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ট্রেড্ ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সভা হয়। বঙ্গীয় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস, গণবাণী দল, মুশ্লিম যুব পরিষদ, বঙ্গীয় সমাজতন্ত্রী দল, কলিকাতা প্রেস কর্মচারী সঙ্ঘ, বঙ্গীয় শ্রমিক দল, বি. এন. রেলওয়ে কর্মচারী সঙ্ঘ, কলিকাতা ট্রামওয়ে শ্রমিক সঙ্ঘ, পোর্ট ট্রাস্ট কর্মচারী সমিতি প্রভৃতি অনুমান ৬০টি রাজনীতিক ট্রেড্ ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় 'ইতালি-আবিসিনিয়া যুদ্ধবিরোধী সঙ্ঘ' নামে একটি সঙ্ঘ গঠন করা হয়।...

"আরও ৫জন সদস্য কো-অপট্ করার ক্ষমতা-সহ এবং শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বসুকে আহ্বানকারী করিয়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়: আশু দাস, সুধীন প্রামাণিক, ফণী দত্ত, মহঃ ইস্মাইল, ডি বি. সিংহ, প্রভাত সেন, অমৃত নাগ, অঘোর সেন, হীরেন চৌধুরী, এ. আর. ওসমান, নেপাল ভট্টাচার্য, শিবনাথ পাঠক, বীর সিংহ ও মণি দাস।...

"নিঃ ভাঃ ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখা বঙ্গীয় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের উদ্যোগে গত ২৭শে অক্টোবর তারিখে কলিকাতার নাগরিকদের এক সভা হয়। নিঃ ভাঃ ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের অর্গানাইজিং সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত শান্তিরাম মণ্ডল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কলিকাতা ট্রামওয়ে শ্রমিক সমিতির সেক্রেটারী ইস্মাইল, বঙ্গীয় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের সাধারণ সম্পাদক শ্রী অতুলকৃষ্ণ বসু, শিবনাথ পাঠক, ধরমবীর সিং বক্তৃতা করেন। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আবিসিনিয়ার বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টায় সহানুভূতি জ্ঞাপন ও ফ্যাসিস্ট ইতালির আক্রমণাত্মক নীতির নিন্দাবাদ করিয়া সভায় শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বসু কর্তৃক উত্থাপিত একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।"

[দ্র. আনন্দবাজার পত্রিকা : ১২ই কার্তিক, ১৩৪২ ; ২৯শে অক্টোবর, ১৯৩৫]

ভারতে যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট, সোস্যালিস্ট ও আগুয়ান শ্রমিক শ্রেণীর এই ভূমিকা নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং গৌরবজনকও। এই প্রসঙ্গে আর একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উল্লেখ করা দরকার। কংগ্রেসের কোনো আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত বা নির্দেশের আপেক্ষ না রাখিয়াই, এই সময় দিল্লীতে 'ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েসন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদে এক সভায় আবিসিনিয়ার আহত সৈন্যদের শুশ্রূষা ও ঔষধপত্রাদি দিয়া সাহায্য করার জন্য একটি 'মেডিকেল মিশন' পাঠাইবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই উদ্দেশ্যে 'ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েসন'-এর পক্ষ থেকে অর্থ ও ঔষধ-পত্রাদি দিয়া সাহায্যের জন্য দেশবাসীর উদ্দেশে একটি আবেদন-বিবৃতি প্রচার করা হয় [দ্র. আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৮শে নভেম্বর, ১৯৩৫]। ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ আন্সারী, ডাঃ এম. জি. নাইডু, ডাঃ বি. সি. রায়, ডাঃ জীবরাজ মেটা প্রমুখ সারা ভারতের খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ ইহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

আবিসিনিয়া যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই সময় বিশ্বশান্তি সম্মেলনের প্রয়োজনটি আরও গভীরভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু বারবুসের মৃত্যুতে ইহার সাংগঠনিক ও

প্রস্তুতিকার্য নিদারুণভাবে ব্যাহত হয়। স্মরণ রাখা দরকার, কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী প্রমুখ ভারতের নেতৃস্থানীয়রা উহার উদ্যোগ বা প্রস্তুতি কমিটিতে যোগদান করার সম্মতি জানাইয়াছিলেন। এই সম্মতিদানের জন্য এই সময় রোলাঁ *League Against War*-এর পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে ধন্যবাদ জানাইয়া এক পত্র (২০শে নভেম্বর, ১৯৩৫) দেন। তাছাড়াও তিনি শান্তিসম্মেলনের উদ্দেশে রচিত তাঁহাদের একটি ঘোষণা-পত্রে কবিকে স্বাক্ষরদানের জন্য এই পত্রে আবেদন জানাইয়াছিলেন। রোলাঁর পত্রটি ছিল এই :

"The *World Committee Against War* requests me to thank you for having kindly consented to join the Initiative Committee of the Universal Congress of Peace. They have asked me to send you the accompanying circular. There is no question of appealing for an effective subscription from India, which needs all her resources to meet her own needs and the calamities produced by pitiless Nature. It is only as a good example which is encouraging for the rest of the world that India should demonstrate her fraternal solidarity with other countries, in this endeavour for a universal assemblage for the defence of Peace. It will be enough to express it by a jesture. Will you associate yourself with our appeal by signing it ?"

[*Rolland and Tagore* : Letter no. XX. P. 70]

সম্ভবত নভেম্বরের শেষভাগে কবি রোলাঁর এই পত্রটি পান এবং ঐ আবেদনপত্রে তাঁহার নাম স্বাক্ষর করিয়াও তিনি পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে কোনোই সন্দেহ নাই। তবে দুঃখের বিষয় কবির জবাবী পত্রটির এখনও পর্যন্ত কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নাই। অবশ্য শান্তি সম্মেলনও বেশ কিছু দিনের জন্য পিছাইয়া যায়। ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রুসেলস্ নগরীতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই সময়ও কবি একটি বাণী পাঠাইয়াছিলেন। যথাস্থানে তাহা আলোচিত হইবে।

এই সময় জাপানী কবি য়োন নোগুচি (Yone Noguchi) শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন (২১শে নভেম্বর, ১৯৩৫)। ঐদিনই রাত্রে কবির সঙ্গে নোগুচির সাক্ষাৎ-আলোচনা হয়। আবিসিনিয়ার ব্যাপারে তখন কবির মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ভারাক্রান্ত। আলোচনা প্রসঙ্গে কবি তাঁহার মনের তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণ ও ফ্যাসিস্ট আচরণের তীব্র নিন্দাবাদ করেন। ভয়ে নোগুচির বুক শুকাইয়া যায়। এই প্রসঙ্গে বিশেষ কোনো আলোচনা বা কথা বলিতে তিনি সাহস পান নাই,—পাছে এই প্রসঙ্গে জাপানের কথাও (অর্থাৎ চীনে জাপ-আক্রমণের) আসিয়া পড়ে। এর প্রায় তিন বৎসর পরে যখন ঐ সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে তীব্র মতপার্থক্য ও মসীযুদ্ধ হয় তখন নোগুচি ঐ কথা স্বীকার করিয়া লিখেন (২৩শে জুলাই, ১৯৩৮) :

"When I visited you at Shantiniketan a few years ago, you were troubled with the Ethiopian question, and vehemently condemned

Italy. Retiring into your guest chamber that night, I wondered whether you would say the same thing on Japan, if she were equally situated like Italy."…

[*Visva Bharati Quarterly* : Vol. IV, Part III. Nov-Jan., 1938 ; P. 199]

পরদিন প্রাতে শান্তিনিকেতন আম্রকুঞ্জে নোগুচিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই সভায় কবি স্বয়ং নোগুচিকে সংবর্ধনা জানাইতে গিয়া বলেন :

"বন্ধু,…জাপানে আমার অভ্যর্থনার মধ্যে ছিল প্রীতি-নিবেদনের অপ্রত্যাশিত অজস্রতা। আমি সবিনয়ে সে নিবেদন গ্রহণ করেছিলেম এই জেনে যে এই প্রীতি-নিবেদনের অনেকখানিই যে দেশের সঙ্গে জাপান সুপ্রাচীন আধ্যাত্মিক মৈত্রীর সূত্রে জীবন্ত প্রেম ও প্রচার-বন্ধনে আবদ্ধ সেই ভারতবর্ষের উদ্দেশে উৎসারিত।"

পরিশেষে কবি বলেন :

…"আপনাকে এবং আপনার মধ্যে দিয়ে যে জাতি নবযুগে জন্মলাভ করে মানব-ভাগ্য-নিয়ন্তার হাত থেকে মৃত্যুহীন গৌরবের বর দাবী করবার জন্য প্রস্তুত—সেই আপনার দেশবাসীদের ভারতবর্ষের অভিনন্দন হিসাবে সেই বাণী আমরা নিবেদন করি।"

প্রত্যুত্তরে নোগুচি নাটকীয় ভঙ্গিতে আবেগরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন :

"সত্য ও সৌন্দর্যের সন্ধানে আমিও নিঃসঙ্গ হয়ে এতদিন গান গেয়ে ফিরেছি। আজ এতদিনে আমার আনন্দের সীমা নেই—সৌন্দর্যের নগর যেখানে সার্থকভাবে গড়ে উঠেছে সেখানে আমি পৌঁছেছি।" [নবশক্তি : ১১ই পৌষ, ১৩৪২]

তিনি বলিলেন :

"Miller (Joaquim Miller, an American poet) always remarked that one who had eyes to see beauty was truthful ; where he said truth he justly meant beauty ; and this beauty was nothing but poetry. It was his desire to build a City Beautiful on his hill ; but before its completion he passed away in 1913. Being still on the quest of beauty and truth, singing a lonely song, I have such a great pleasure in finding this successful example of the City Beautiful here." [*Visva Bharati News* : December, 1935 ; pp. 44-47]

বলা বাহুল্য, কবি বিশ্বভারতীর আদর্শের দিক থেকে ভারত ও জাপানের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টিতেই গুরুত্ব দিতে চাহিলেন। অবশ্য চীনের উপর জাপানের হামলা ও আক্রমণাত্মক আচরণের জন্য কবি জাপানের উপর খুবই রুষ্ট ছিলেন এবং ইতিপূর্বে বহুবার নানা উপলক্ষে তাঁহার সে মনোভাব প্রকাশ্যেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু নোগুচির শান্তিনিকেতন আগমন উপলক্ষে তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক ও শালীনতা-বিরুদ্ধ হইবে বলিয়া কবি সে প্রসঙ্গে কোনো কথাই উত্থাপন বা উল্লেখ করেন নাই। তাছাড়া নোগুচি একজন সম্মানিত অতিথি এবং কবি। রবীন্দ্রনাথের আতিথেয়তা ও সৌজন্য-বোধের অন্ত ছিল না, যাহার জন্য জীবনে

তাঁহাকে বহু দুর্ভোগে পড়িতে হইয়াছে। বহু অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকেও আপ্যায়ন করিতে হইয়াছে।

কিন্তু নোগুচি তাঁহার ভাষণে ভারত-জাপান সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রশ্নটিতে গুরুত্বই দিলেন না এবং এই বিষয়ে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না।

এইখানে নোগুচি ও অধ্যাপক তান্ য়ুন-সানের পার্থক্যটি লক্ষ্য না করিয়া পারা যায় না। অধ্যাপক তান্ তখন 'ভারত-চীন সাংস্কৃতিক সমিতি' এবং 'চীনা-ভবন' নির্মাণের প্রয়োজনীয় অর্থাদি সংগ্রহের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন। এই সময় ভারত-চীন সাংস্কৃতিক সম্পর্ক পুনস্থাপনের আবেদন জানাইয়া তিনি শান্তিনিকেতনে কথিত তাঁহার একটি আবেদনে বলিলেন :

…"Hence needless to say, we Indians and Chinese must wake up at once, and restore our old national relationship. By the interchange of our cultures, we shall achieve our cultural renaissance, *by cultural renaissance we shall create a new world civilization ; and by the new civilization we shall relieve all mankind. Our two countries having made a glorious world in the past, can't we make again a glorious world in the future ?" (Italics—mine)*

[*Modern Review* : November, 1935 ; P. 542]

বলা বাহুল্য, নোগুচি অধ্যাপক তান্-এর মত এইরূপ কোনো মহান আদর্শবাদের 'মিশন' লইয়া ভারতবর্ষে আসেন নাই,—যে মিশন লইয়া একদা কাউণ্ট্ ওকাকুরা ভারতবাসীর চিত্ত জয় করিয়াছিলেন। বস্তুতপক্ষে, বিশ্বভারতীতে 'চীন-ভারত সাংস্কৃতিক সমিতি' স্থাপিত হওয়ায় এবং চীনের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাওয়ায় জাপানের ফ্যাসিস্ট গভর্নমেণ্ট ক্রমশই উদ্বেগ বোধ করিতেছিলেন। এই জাপ সরকারের নির্দেশেই নোগুচি যে ভারতবর্ষে আসেন নাই,—একথা জোর করিয়া বলা যায় না। মোট কথা নোগুচির ভারত আগমন এবং গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নিছক উদ্দেশ্যহীন কিংবা তাঁহার একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল না, কিছুকাল পরেই তাহা উদ্ঘাটিত হয়। কেননা পরবর্তীকালে যখন চীনে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের জন্য রবীন্দ্রনাথ জাপানকে তীব্র তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিলেন তখনই নোগুচির অভিসন্ধি ও স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়। সেদিন নোগুচি রবীন্দ্রনাথকে যে কুৎসিত ও জঘন্য ভাষায় আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাতে এইরূপ সন্দেহ করা মোটেই অসঙ্গত বোধ হয় না। পরে যথাস্থানে তাহা আলোচিত হইবে।

এই সময় জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের প্রখ্যাত নেত্রী শ্রীমতী মার্গারেট স্যাংগার নিঃ ভাঃ মহিলা সম্মেলনের আসন্ন ত্রিবাঙ্কুর অধিবেশন উপলক্ষে আমন্ত্রিত হইয়া ভারতবর্ষে আসেন। উল্লেখযোগ্য, বেশ কিছুকাল থেকে এই মহিলা সম্মেলনের নেত্রী ও উদ্যোক্তারা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের সমর্থনে দেশে আন্দোলন তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। স্মরণ রাখা দরকার, ১৯৩৩ সালে ডিসেম্বরের শেষভাগে কলিকাতায় নিঃ ভাঃ মহিলা সম্মেলনের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে মহিলা সমাজকে আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ

আন্দোলনে অগ্রণী হইবার আবেদন জানাইয়া একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তটি ছিল এই :

"In view of the appalling hygienic and economic conditions of society this Conference is of opinion that immediate efforts be made to spread scientific knowledge on birth control amongst parents through the medium of recognised clinics."

[*Forward* : January 1, 1934]

স্মরণ রাখা দরকার এই সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ যোগদান করিয়া দীর্ঘ একটি ভাষণ দান করেন।

যাহাই হোক শ্রীমতী স্যাংগার ভারতে আসিয়াই রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিতে উদ্যোগী হন। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য শান্তিনিকেতনে আসেন। দুঃখের বিষয় এই আলোচনার কোনো বিবরণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ৭ই ডিসেম্বর তিনি কলিকাতায় জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বক্তৃতা করিতে উপস্থিত হইয়া সাংবাদিকদের যাহা বলেন, সে-সম্পর্কে *Madras Mail* লিখিতেছে :

"She (Mrs. Sanger) told the Associated Press about her interviews with Mr. Gandhi and Dr. Tagore, and said that the latter promised his moral support for her movements while an exchange of views on the subject was passing between herself and Mr. Gandhi."

[*Madras Mail* : December 7, 1935]

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে ভারতবর্ষের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমর্থন করিয়াছিলেন এবং সে সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে তাঁহার এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। গান্ধীজী জন্মনিয়ন্ত্রণ সমর্থন করিলেও ইহার আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণের তীব্র বিরোধী ছিলেন। বস্তুত গান্ধীজী ব্রহ্মচর্য ও প্রবৃত্তির সংযমের উপরই প্রধান গুরুত্ব দিতেন। স্মরণ রাখা দরকার, প্রায় ১০ বৎসর পূর্বে শ্রীমতী স্যাংগার এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত জানিতে চাহিলে কবি তাঁহাকে এক পত্রযোগে (৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৫) বৈজ্ঞানিক জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের প্রতি তাঁহার পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এইসব কথা পূর্ব খণ্ডেই (দ্র. দ্বিতীয় খণ্ড, পরিশিষ্ট, পৃঃ. ৪৫৮) উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে এখানে একটি মূল্যবান তথ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রায় তিন বৎসর পূর্বে (১৯৩২, ২রা নভেম্বর) কবি আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করিয়া শ্রীমতী নীলিমা দাসকে একটি পত্র দেন। এই পত্রে তিনি সুস্পষ্টভাষায় জন্মনিয়ন্ত্রণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণের পক্ষে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি লিখেন, (খড়দহ, ২রা নভেম্বর, ১৯৩২) :

"অবাধ সন্তান-জননের যে দুঃখ দৈন্য অপমান কত, আমাদের চারদিকেই তা দেখতে পাই, প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে বেশি গবেষণার দরকার হবে না। আমাদের মতো দেশে, যেখানে জীবিকার অন্ন নিতান্তই পরিমিত, সেখানে জীবিতের অতৃপ্ত ক্ষুধার

দাবীর পরিমাণ থাক্‌বে না, এর চেয়ে নিষ্ঠুরতা আর নেই। উপদেষ্টারা সংযমের পরামর্শ দেন, প্রত্যক্ষ দুঃখেও যাদের শিক্ষা দিতে পারে না, মুখের উপদেশ তাদের কী করতে পারে? এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে মেয়েদের স্বাস্থ্য শান্তি আত্মসম্মানের প্রতি অনেক সময়ে কি রকম অসহ্য পীড়ন করা হয়, তার বিস্তর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এ সম্বন্ধে যাঁরা সন্ধান করেছেন তাঁদের গ্রন্থে।

"এই তো গেল ব্যক্তিগত জীবনের কথা, রাষ্ট্র-জাতিগত জীবনের সমস্যা আরো বড়ো, এই প্রসঙ্গে তাও আলোচ্য। আজকের দিনে পৃথিবীতে যত অশান্তি, যত যুদ্ধ, পররাষ্ট্রের প্রতি যত অন্যায়, তার মূল কারণ অতিপ্রজন। জাপান মারামারি ক'রে চীনের অধিকার থেকে মাঞ্চুরিয়া কেড়ে নিচ্চে। অন্যায়, সন্দেহ নেই, কিন্তু জাপানই বা করে কি? তার দ্বীপ কয়টির মধ্যে যতটুকু অন্নের ও বসতির সংস্থান আছে, তাতে জাপানের প্রজাদের আর কুলোয় না। যে সময় ইংলণ্ডের বহিঃসাম্রাজ্য ছিল না, তার তুলনায় এখন তার অন্নের প্রয়োজন প্রভূত পরিমাণে বেড়ে গেছে। ন্যায়ের দোহাই দিয়ে হাঁক পাড়চি যে, ভারতবর্ষ ছাড়ো, কিন্তু পেটের দোহাই তার চেয়ে প্রবল। এক সময়ে ভারতবর্ষ যে অন্নবস্ত্র উৎপাদন করেছে তাতে তার সচ্ছল-ভাবে চলে গেল, এখন সেদিনের চেয়ে প্রজাবৃদ্ধি অনেক বেশি হয়েছে, সুতরাং সেদিনকার হিসাব এখন আর খাটে না। দুর্ভিক্ষের দ্বারা অনশনের দ্বারা প্রজাক্ষয় হয়ে সাম্যরক্ষা হবে, একথা বলে নিশ্চেষ্ট থাকা কি মানুষের মতো জীবের কর্তব্য? জন্ম দেবার দুঃখ, পালন করবার দুঃখকে কি অবসান করতে হবে অনশন অনারোগ্য অনাদর অপমানের মৃত্যুতে?

"অপর পক্ষেও বলবার কথা আছে, কিন্তু এখন সে আলোচনা নিষ্ফল। যে কালে বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কৃত ও সহজলব্ধ হয় নি, সে কালে সকল দুঃখের উপরেও মানুষের প্রবৃত্তি প্রজাজননে সহায়তা করেছে এখন যদি উপায় আবিষ্কৃত হয়ে থাকে, তবে মানুষ সহজেই আপন ইচ্ছার কর্তৃত্বের দ্বারাই প্রজাজনন নিয়ন্ত্রিত করবে। তাতে সংসারে যা কিছু পরিবর্তন আনবে তা অনিবার্য। আমরা শুভবুদ্ধির দোহাই দিই; সেই শুভবুদ্ধিকে তো নির্বাসন দিতে কেউ বল্‌চে না। অর্থাৎ সন্তানজনন যখন প্রবৃত্তির অধীন ছিল, তখনও শুভবুদ্ধির যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল, সন্তানজনন যখন ইচ্ছাধীন হবে তখনো সেই শুভবুদ্ধির কাজ বন্ধ হয়ে যাবে একথা কেউ বলবে না। সকল অবস্থাতেই মানুষের বিচারবুদ্ধিই হবে শেষ নিয়ামক। সেই বিচারবুদ্ধির সাহায্যে সমাজ-সংস্থানকে মানুষ আজ গড়চে, অবস্থার পরিবর্তন হলে তদনুসারে কালও গড়বে।"

[বিচিত্রা : পৌষ, ১৩৩৯ ; পৃঃ. ৭৬২-৬৩]

বলা বাহুল্য, এই পত্রে তিনি জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পরোক্ষভাবে গান্ধীজীর অভিমতের সমালোচনা করিলেন।

উল্লেখযোগ্য, এই সময় গান্ধীজী অসুস্থ থাকার জন্য শ্রীমতী স্যাংগারকে সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। জানুয়ারি মাসের (১৯৩৬) মাঝামাঝি নাগাদ তাঁহাকে এই অনুমতি দেওয়া হইলে উভয়ের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ সমস্যা লইয়া দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়। টেণ্ডুলকর এই আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন

(দ্র. *Mahatma* : Vol. IV, pp. 45-48)। অবশ্য এই আলোচনার বিশেষ কোনো ফল হয় নাই। গান্ধীজী তাঁহার নিজমতে অটল রহিলেন।

ডিসেম্বরের শেষভাগে যথারীতি 'পৌষ-উৎসব' (৭-৮ই পৌষ) অনুষ্ঠিত হয়। শান্তিনিকেতনে এইসময় বিদেশী অতিথি অভ্যাগতের বিরাম নাই। কিন্তু কবির মন নানা চিন্তাভারে ক্লান্ত অবসন্ন। ক্রমাগত বিশ্বভারতীর আর্থিক সমস্যার কথা চিন্তা করিতে করিতে এক একসময় দুঃখে ক্ষোভে হতাশায় তিনি যেন ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইতেন। এই সমস্যার কথা তিনি গান্ধীজীকে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন,—উহার কিছুদিন পরে জওহরলালকেও লিখিলেন। জওহরলাল তখন ইউরোপে। এই পত্রে কমলার স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া পরিশেষে কবি তাঁহার নিদারুণ মানসিক অবসাদ ও উদ্বেগের সম্পর্কে লিখিলেন (৯ই অক্টোবর, ১৯৩৫) :

"Every winter Visva Bharati rudely reminds me of the scantiness of her means, for that is the season when I have to stir myself to go out for gathering funds. It is a hateful trial for me—this begging business either in the guise of entertaining people or appealing to the generosity of those who are by no means generous. I try to exult in a sense of martyrdom accepting the thorny crown of humiliation and futility without complaining. Should I not keep in mind for my consolation what you are going through yourself for the cause which is dearer to you than your life and your personal freedom ? But the question which often troubles my mind is whether it is worth my while to exhaust my energy laboriously picking up minute crumbs of favour from the tables of parsimonious patrons or keep my mind fresh by remaining aloof from the indignity of storing up disappointments.··· [*A Bunch of old Letters* : P. 109]

তাছাড়াও বেশ কিছুকাল থেকেই বিশ্বভারতীর শিক্ষাবিধি-ব্যবস্থার নানা ত্রুটি বিচ্যুতি তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল, পূর্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি। বিশ্বভারতীকে তিনি যেমনটি গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা হয় নাই। ইহার জন্য ছাত্রদের অভিভাবকরা এবং সাধারণভাবে দেশের তথাকথিত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মনোবৃত্তিই অধিক দায়ী ছিল। ঘটনা ও অবস্থার চাপে পড়িয়া তাঁহার আদর্শ ও ইচ্ছা-বিরুদ্ধ বহু জিনিসের সঙ্গে তাঁহাকে আপস করিয়া লইতে হইয়াছিল। ইহার জন্য তাঁহার মনোবেদনার অন্ত ছিল না। বিশ্বভারতী পরীক্ষা-পাশের জন্য সাধারণ একটি বিদ্যালয়ে পরিণত হইবে—এই চিন্তা করিতেও তিনি আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেন। ৮ই পৌষ (১৩৪২) বিশ্বভারতীর বার্ষিক সভায় তিনি এইসব কথা আলোচনা করিতে গিয়া তীব্র মনোবেদনা ও ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলেন :

"ক্রমে যেটা সহজ পন্থা বিদ্যালয় সেই দিকেই চলেছে বলে মনে হয়—শিক্ষার যে-সব প্রণালী সাধারণত প্রচলিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি, সেইগুলিই বলবান হয়ে

ওঠে, তার নিজের ধারা বদলে গিয়ে হাই-ইস্কুলের চলতি ছাঁচের প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে, কেননা সেই দিকেই ঝোঁক দেওয়া সহজ ; সফলতার আদর্শ প্রচলিত আদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়ে।…বিদ্যালয় যদি একটা হাই-ইস্কুলে মাত্র পর্যবসিত হয় তবে বলতে হবে ঠকলুম।…এতে হয়তো খুব দক্ষ পরিচালনা হতে পারে কিন্তু তার চেয়ে বড়ো জিনিসের অভাব ঘটতে থাকে।"

তাছাড়া বিশ্বভারতীর শিক্ষাবিধিব্যবস্থায় রসচর্চার প্রাবল্য ও আধিক্যও কবি এই সময় লক্ষ্য করেন। দেশের ও বিশ্বের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি ছাত্রদের মনকে আলোড়িত করে না, স্পর্শও করে না। পারিপার্শ্বিক গ্রামবাসীদের নিদারুণ দুঃখকষ্ট ও সমস্যায়ও এখন আর তাহারা তেমন বিচলিত হয় না। বেশ কিছু কাল থেকেই বিশ্বভারতীর ছাত্রদের এই বলিষ্ঠ মানসিকতা ও চিত্তবৃত্তির অভাব লক্ষ্য করিয়া কবি মাঝে মাঝে কিছুটা নিরাশ হইয়া পড়িতেন। কিছুদিন পূর্বে বিশ্বভারতীর সম্মিলনী সভায় তিনি ছাত্রদের চিন্তাশক্তি ও মানসিকতার অভাবটি (ideal, thought—power and spiritual deficiency) বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার সুযোগ পান। এই সম্মেলনে কলেজ বিভাগের ছাত্ররা নিজেদের কিছু রচনা পাঠ করিলে পর কবি তাহাদের উদ্দেশে বলেন :

"তোমরা যে-সব লেখা পড়লে…প্রায় সবগুলোই রসসাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে।

"তোমাদের রচনাতে একটা জিনিষের অভাব—সে চিন্তার উপাদানের। আজ পৃথিবীতে নানা সমস্যা দুর্বার হয়ে উঠেছে, চারদিকে প্রলয় তাণ্ডবের গর্জন—এ অবস্থায় মন নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। মানুষের ভাগ্য যখন ঘটনাসংঘাতে প্রবলভাবে নাড়া খেয়ে ওঠে, তখন ভাবী পরিণামচিন্তায় মন স্বভাবতই উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে।…চারদিকে দৃষ্টিকে সজাগ রেখে কান পেতে থাকার উদ্যম আমাদের ক্ষীণ। কিন্তু মানব-ইতিহাসের ঢেউয়ের ধাক্কা থেকে উদাসীনভাবে নিজেকে সরিয়ে রাখা আজ আর শোভা পায় না। একটা প্রচণ্ড আলোড়ন উঠেছে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী জন-সমুদ্রে, যেন সমস্ত সভ্যজগৎকে এক কল্প থেকে আর এক কল্পে উৎক্ষিপ্ত করবার মন্থন ব্যাপার শুরু হয়েছে। আমরা আছি কালের রুদ্রলীলাক্ষেত্রের নেপথ্যকোণে। বর্তমান মানবসমাজের বড়ো আন্দোলনে যোগ দেবার সম্যক উপলক্ষ আমাদের আসে নি, তার ঝঞ্ঝাগর্জন দূর ব্যবধানের মধ্যে দিয়ে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণভাবে পৌঁছয় আমাদের কানে। কিন্তু আমরাও তো সুখে নেই। ঐতিহাসিক চক্রবাত্যার লেজের ধাক্কা বাইরের থেকে আমাদের বাসায় এসে লাগে, আবার ভিতরের থেকেও দুর্গতি বিচিত্র আকারে দিনে দিনে উঠছে দুঃসহ হয়ে। দেখতে পাচ্ছি আমাদের বর্তমানের ম্লানদিগন্তে ভবিষ্যৎরাত্রির অন্ধকার আসছে ঘনিয়ে। সমস্যার পর দুর্জয় সমস্যা এসে অভিভূত করেছে দেশকে, কিসের তার সমাধান, আমরা জানি না। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে আজ যে পরস্পর বিচ্ছেদ ও বিদ্রোহ উত্তাল হয়ে উঠেছে, যদি দেখতেম, এর সহজ নিষ্কৃতি আছে তবে চুপ করেই থাকতেম। কিন্তু তার মূল প্রবেশ করেছে গভীরে, সহজে এর সমাধান হবে না। আর যদি সমাধান না করতে পারি, তবে আসবে 'মহতী বিনষ্টি'। এখন চুপ করে থাকবার সময় নয়। আমাদের ভাবতে হবে, বড়ো করে ভাবতে হবে—ভাবাবিষ্ট আর্দ্রচিত্তে নয়, বুদ্ধিপূর্বক চিন্তা ক'রে। দেশের

সম্বন্ধে, সমস্ত মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের ভাবতে হবে। ভাববার কারণ হয়েছে। সেই ভাবনার অভাব দেখলাম তোমাদের রচনায়।"

বলা বাহুল্য, ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণ ও যুদ্ধের ঘনায়মান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ং কবির মনে এইসব গভীর প্রশ্নে আলোড়ন চলিতেছিল। কবি আরও বলেন :

"আমরা ভাঙনধরা নদীর কূলে বসে আছি, এক মুহূর্তেই তা একেবারে ভেঙে ধ্বসে পড়তে পারে। এই যে চারদিকে গ্রামগুলো আমাদের বেষ্টন করে আছে, সেখানে প্রবেশ করলে তোমরা দেখতে পাবে, মরণদশা ধরেছে তাদের।...তোমরা কলেজ বিভাগে প্রবেশ করেছ...মোহাবেশ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পৌরুষের সঙ্গে সমস্ত সমস্যাকে তার সকল গ্লানিসত্ত্বেও স্বীকার ক'রে নাও। এই পণ ক'রে তোমাদের চলতে হবে—**পরাস্ত যদি হ'তেই হয়, তবে বিরুদ্ধতার আঘাতকে সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রত্যাখ্যান করতে করতেই মরব**। অর্থাৎ কাপুরুষের মতো প্রতিকূল অবস্থার কাছে হাল ছেড়ে দিয়ে মরব না—অথবা নির্বোধের মতো নির্বিচারে আত্মহত্যার পথে ছুটব না।"

উপসংহারে কবি ছাত্রদের অত্যধিক রসচর্চা সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন :

"**জীবনের সার্থকতার জন্যে আমি রসের প্রয়োজনকে খুবই মানি কিন্তু রসের প্লাবনকে মানি নে। তার সঙ্গে সঙ্গে কঠিন সত্যকে মানতে হবে চিন্তাশক্তির সাহায্যে।**
—(বড় হরফ আমার) [প্রবাসী : অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ ; পৃঃ. ১৬৯-৭০]

বলা বাহুল্য, কবি এইসব কথা ছাত্রদেরকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেও এই উপলক্ষে বিশ্বভারতীর শিক্ষক ও পরিচালকমণ্ডলীকেও স্পষ্টভাবে জানাইয়া, দিলেন বিশ্বভারতীর শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কিভাবে তিনি পুনর্গঠিত করিতে চাহিতেছেন।

প্রশ্ন হইবে, এই অবস্থার জন্য কবি স্বয়ংই কি কিছুটা দায়ী ছিলেন না। একেবারেই ছিলেন না, এমন কথা বলা যায় না। বস্তুতপক্ষে বিশ্বভারতীর সূচনা-কাল থেকেই তিনি দেশের ও বহির্বিশ্বের সমস্ত আলোড়ন ও ধূলিঝঞ্ঝা থেকে শান্তিনিকেতনকে দূরে রাখিবার জন্য সহকর্মীদের পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের উত্তালতরঙ্গাভিঘাতে যখন শান্তিনিকেতনের কূল ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে ;—দাসত্বশৃঙ্খল ছিন্ন করিবার জন্য সমগ্র জাতির প্রচণ্ড উত্তেজনা ও উন্মাদনা যখন শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলীকেও আবেগ-চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, তখনও কবি শান্তিনিকেতনকে এই সমস্ত ধূলিঝঞ্ঝাপূর্ণ রাজনীতির ('dusty politics') ঊর্ধ্বে রাখিবার আবেদন জানাইয়াছিলেন। বিংশ শতাব্দীর মানুষ জীবনের দিকে দিকে যে-সমস্ত বাধা ও অশুভশক্তির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে, তা থেকে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিলে যে অনিবার্য প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, বিশ্বভারতী তা'থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না। কঠোর বাস্তব জীবনের সত্য ও সংগ্রামকে অস্বীকার করিয়া জীবনে যখন ললিতকলা এবং আনন্দ ও রসচর্চার আধিক্য দেখা দেয়, তখন স্বাভাবিক কারণেই তাহার কতকগুলি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অথচ তাঁহার কবি ও শিল্পী সত্তা এবং নানা পরস্পরবিরোধী প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত ধ্যানধারণায় কবি ছিলেন দেশমানব তথা বিশ্বমানব। দেশের ও বিশ্বের যতকিছু অকল্যাণ ও অশুভশক্তির বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন।

বিশ্বের যাবতীয় সমস্যায় গভীরভাবে তিনি চিন্তা করিয়াছেন,—অজস্র কথা বলিয়াছেন। কিন্তু কবির দেশভাবনা ও বিশ্বভাবনা,—কবির বলিষ্ঠ জীবনবোধ বিশ্বভারতীর শিক্ষা ও পরিচালন বিভাগে সংক্রমিত হয় নাই (অবশ্য শ্রীনিকেতনের কথা বাদ দিলে)। কবির চিন্তায় ও দৃষ্টিভঙ্গীতে যে সম্পূর্ণতা ও সামগ্রিকতা ছিল তাঁহার সহকর্মী ও শিক্ষকবৃন্দের তাহা ছিল না। বিশ্বভারতীর শিক্ষাব্যবস্থায় ও আবহাওয়ায় ইহার দৃঢ় ছাপ পড়িয়াছিল। ফলে বিশ্বভারতী ললিতকলা ও রসচর্চার কেন্দ্র হিসাবেই দেশবাসীর নিকট সুপরিচিত ছিল। বিশ্বভারতীর শিক্ষাব্যবস্থার এই ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা সময় সময় কবির নিকট ধরা পড়িয়াছে এবং সেকথা সহকর্মীদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যক্তও করিয়াছেন, কিন্তু তাহা খুব ফলপ্রসূ হয় নাই।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ শেষ হইয়া আসিল। এই বৎসর ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি হয়। এই উপলক্ষে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ২৮শে ডিসেম্বর দেশের সর্বত্র 'সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব' পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে ২৭শে ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট একটি বাণী পাঠান। পরদিন বিশ্বভারতীয় ছাত্র ও কর্মীবৃন্দ কংগ্রেসের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব পালন করেন। কবির বাণীটি ছিল এই :

"My warmest greetings on the happy occasion of the Golden Jubilee celebrations. The destiny of India has chosen for its ally *the power of soul and not that of muscle.* And she is to raise the history of man from *the muddy level of physical conflicts to a higher moral altitude.*" (*Italics—mine*) [*Forward* : 29th December, 1935]

বিশ্বের চতুর্দিকে যুদ্ধের ঘনকৃষ্ণ ছায়া দুই পক্ষ বিস্তারিয়া নামিয়া আসিতেছে। চতুর্দিকে শুধু শক্তির দম্ভ,—অস্ত্রের আস্ফালন ও কোলাহলের মধ্যে খ্রীষ্টীয় বৎসর শেষ হইয়া আসিতেছে। কবি পুনরায় সতর্ক করিয়া দিতে চাহিলেন, শক্তিপূজার এই ভৈরবীচক্রে ভারতবর্ষের স্থান নাই। মানুষের আত্মিক, মানসিক ও মহত্তর নৈতিক বিপ্লব ঘটাইবার মহান দায়িত্ব আজ ভারতবর্ষের 'পরে। কংগ্রেস ভারতের এই মহান বাণীকে সার্থক করিয়া তুলিয়া তাহাকে সত্যকারের ভাষা দিক, ইহাই ছিল কবির মনের একান্ত কামনা।

পরিশিষ্ট - ১

To, Dr. B. C. Roy, M. D., F. R. C. S.
Mayor of Calcutta Corporation
Calcutta.

April 25, 1931

Dear Dr. Roy,

Please accept my sincere congratulations on your election as the Mayor of Calcutta Corporation.

I wrote sometime ago to Srijukta Subhas Chandra Bose about our Jiu-Jitsu professor, Mr. Takagaki but apparently he has not been able to reply to it as he is touring about in East Bengal. May I now put before you the case of Prof. Takagaki whom as you may know, I brought from Japan specially for the purpose of giving a thorough training in the art of Jiu-Jitsu to the students of Bengal. Prof. Takagaki comes of a highly distinguished family in Japan and is one of the most well-known experts in Jiu-Jitsu in that country. When I found that our countrymen did not properly realize the importance of the visit of Prof. Takagaki to our country, I had to take up myself the entire financial responsibility of his travel and stay in this country. I engaged his services for two years and boys and girls of our institution have received instruction from him with remarkable results. Our students gave a demonstration of Jiu-Jitsu in Calcutta at which several members of the Corporation were present, and I was told that they all appreciated it very much. ****

It will be a great pity if Prof. Takagaki has to be sent back to Japan without the student community in Calcutta ever getting the opportunity of mastering from him the art of self-defence and physical training which I need hardly point out is specially required by our boys and girls. Prof. Takagaki, has to make definite arrangements from now for his future programme, and therefore I am writing to you requesting the Corporation to take advantage of his presence

in our country and to engage him for giving instructions to the students in Calcutta. Prof. Takagaki is willing to remain in Calcutta for the purpose if suitable arrangements are made for him.

I do hope that my appeal will find response in the Calcutta Corporation and that both yourself and Srijukta Subhas Chandra Bose will consider the proposal favourably and retain the services of Prof. Takagaki for a cause which concerns the well-being of the students of Bengal.

With kind regards,

Yours sincerely,
Sd/- Rabindranath Tagore

* [দ্র. পৃ. ১৩৮]

পরিশিষ্ট - ২

১৯৩০ সালে বিলেতে থাকাকালে রবীন্দ্রনাথ কোয়েকারদের *Society of Friends*-এর নিকট একটি বাণী দেন। কবির সংগ্রামচিন্তার দিক থেকে এটি একটি মূল্যবান তথ্য। বাণীটি ছিল এই :

"By segregating ethics to the Kingdom of Heaven and depriving the Kingdom of Earth from its use man has upto now never seriously acknowledged the need of higher ideals in politics or in practical affairs. That is why when disagreements occur between individuals, violence is not encouraged but punished ; but when the combatants are nations, barbaric methods are not only not condemned but glorified. The greatest of men like Buddha or Christ have from the dawn of human history stood for the ideal of non-violence, they have dared to love their enemies and defied tyrannism by peace, but we have not claimed the responsibility they have offered us.

"Fight is necessary in this world, combat we must and relentlessly against the evils that threaten us, for by tolerating untruth we admit their claim to exist. But war on the human plane must be what in India we call—*Dharma-Yuddha*—moral warfare, in it we must array our spiritual powers against the cowardly violence of evils. This is the great ideal which Mahatma Gandhi represents, challenging his people to fearlessly apply man's highest strength not only in our individual dealings but in the clash of nation and nation.

"In the barbaric age man's hunger did not impose any limits on its range of food, which included even human flesh but with the evolution of society this has been banished from extreme possibility: in a like manner we await the time when nothing may supposedly justify the use of violence whatever consequences we are led to face. Because, success in a conflict may be terrible defeat from the human point of view, and material gain is not worth the price we pay at spiritual cost. Much rather should we lose all than barter out soul for an evil victory. We honour Mahatma Gandhi because he has brought this ideal into the sphere of politics and under his lead India is proving everyday how aggressive power pitifully fails when human nature in its wakeful majesty bears insult and pain without retaliating. India to-day inspired by her great leader opens the new chapter of human history which has just begun."

1930 Sd/ Rabindranath Tagore

[*Visva Bharati Quarterly* : Vol. 8. Part IV, 1931-32 ; pp. 403-4]

পরিশিষ্ট - ৩

১৯৩০ সালে অক্টোবর মাসে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা যাত্রা করিলে পর বিলাতে তাঁহার গুণগ্রাহী বন্ধুরা বিশ্বভারতীর সাহায্যের জন্য আবেদন জানান (দ্র. পৃ. ১০৪)। সেটি ছিল এই :

To

The Editor of the *Manchester Guardian*

Sir—The recent visit to this country of the poet Rabindranath Tagore has been welcomed by all who value sympathetic and cultural relations between East and West. He is himself the most distinguished representative of Indian culture in the literature of our day, and his life-work—the founding of the International University at Santiniketan—has been an embodiment of the desire which he expressed some years ago 'that the mind of India should join its forces to the great movement of mind which is in the present-day world.' Of the University he says, 'We invite students and scholars from different parts of the world to an Indian University, to meet there our own students and scholars in a spirit of collaboration.'

We are sure that there are many who, like ourselves, feel that a

debt of gratitude is owing to him and would be glad of an opportunity to express this in a practical way by helping the work of the University.

With this object a fund is being raised to which all well-wishers of the work done at Santiniketan are invited to contribute. It is hoped that the fund may be completed before the poet returns to India. Contributions should be sent to the Hon. treasurer, R. O. Menhell, Woden Law, Kenly Surrey.—

Yours &c : A. M. Daniel, S. Margery Fry, Laurence Housman, A. D. Lindsay, John Masefield, Marian E. Parmoor, William Rothenstein, Michael E. Sadlar, C. P. Scott, H. R. L. Sheppard, Edward J. Thompson, Evelyn Underhill, Evelyn Wrench, Francis Younghausband. *London, October 8.*

[*Manchester Guardian* : 10th October, 1930]

১৯৩০ সালে বিলেতে থাকাকালে সেখানকার কয়েকটি পত্রপত্রিকায় ‘গোলটেবিল বৈঠক’ এবং ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের সম্পর্ক ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ‘খোলাচিঠি’র আকারে তাঁহার লিখিত অভিমত জ্ঞাপন করেন। এখানে তাহার কয়েকটি সংকলিত হইল :

RABINDRANATH TAGORE ON INDIA AND ENGLAND

(From Our Special Correspondent.)

[Special statement for *Manchester Guardian*]

Birmingham, Thursday night

[The poet Rabindranath Tagore has come from India to England to deliver the Hibbert Lectures at Manchester College, Oxford. The subject of the course will be "The religion of man." Tagore is staying this week at the Woodbrooke Settlement of the Society of friends, near Birmingham, where he has been giving talks on religion and literature to the students, with readings from his own poems. The first Hibbert Lecture is next Monday ; the second on the following, Wednesday, and the last on Monday week. Tagore will also preach in the chapel of Manchester College, at Dr. L. Jack's invitation, on May 25. On the previous day, Saturday, May 24, he will be present at the annual gathering of the Society of Friends in London, and will speak at their general meeting on that occasion.

Since the poet left India the situation there has become much more critical, but Tagore has not made any public pronouncement upon it since his arrival in England. He kindly consented to-day to give me the following exclusive statement, which represents his considered views of the situation.]

ENGLISH LITERATURE OF LIBERTY

"When I was young we were all full of admiration for Europe, with its high civilisation and its vast scientific progress, and especially for England, which had brought this civilisation to our own doors. We had come to know England through her glorious literature, which had brought a new inspiration into our young lives. The English authors, whose books and poems we studied, were full of love for humanity, justice, and freedom.

"This great literary tradition had come down from the Revolution period. We felt its power in Wordsworth's sonnets about human liberty. We gloried in it even in the immature productions of Shelley, written in the enthusiasm of his own youth, when he declared against the tyranny of priest-crafts and preached the overthrow of all despotisms through the power of suffering bravely endured.

"All this fired our own youthful imaginations. We believed with all our simple faith that even if we rebelled against foreign rule we should have the sympathy of the West. We felt that England was on our side in wishing us to gain our freedom.

"But during the interval that followed there came a rude awakening as to our actual relations. We found them at last to be those of force rather than freedom. This not only disturbed in a great measure our youthful dream; it also began to shatter our high idea concerning our English rulers themselves. We came to know at close quarters the Western mentality in its unscrupulous aspect of exploitation, and it revolted us more and more. During the present century, and especially since the European War, this evil seems to have grown still worse, and our bitterness of heart has increased.

EUROPE'S MORAL PRESTIGE GONE

"Those who live in England, away from the East, have now got to recognise that Europe has completely lost her former moral prestige in Asia. She is no longer regarded as the champion throughout the world of fair dealing and the exponent of high principle, but rather as the upholder of Western race supremacy and the exploiter of those outside her own borders.

"For Europe it is, in actual fact, a great moral defeat that has

happened. Even though Asia is still physically weak and unable to protect herself from aggression where her vital interests are menaced, nevertheless she can now afford to look down on Europe where before she looked up.

"This new strained mental attitude carries with it tragic possibilities of long-continued conflict. The European nations, dimly realising the danger of this growing alienation, still only think of artificial readjustments through various mechanical means. They merely talk of possibilities of the big Powers themselves combining for united action, forgetful of the fact that these very Powers are daily destroying world peace, for in their racial pride they altogether ignore the East. They do not realise that their blindness of arrogance and insistence on their own superiority must sooner or later involve both hemispheres in ruin.

A WAY TO BETTER UNDERSTANDING

"In face of all this, which has become more and more apparent to me as I have grown old, I have often been asked in England to offer my opinion about what should be done at the present juncture when things have become so critical. My answer has always been that I do not believe in any external remedy where inner relations have been so deeply affected. For this reason, I cannot truly point to any short cut to win relief, or any easy remedy to heal the deep-seated disease. What is most needed is rather a radical change of mind and will and heart.

"What I really believe in is a meeting between the best minds of the East and the West in order to come to a frank and honourable understanding. If once such an open channel of communication could be cut whereby sincere thought-might flow freely between us, unobstructed by mutual jealousy and suspicion and unimpeded by self-interest and racial pride, then a reconciliation might be bridged over.

"Meanwhile let it be clearly understood in the West that we who are born in the East still acknowledge in our heart of hearts the greatness of the European civilisation. Even when in our weakness and humiliation we aggressively try to deny this we still inwardly accept it. The younger generation of the East, in spite of its bitterness of soul, is eager to learn from the West, and to assimilate the

best that Europe has to offer. Even in our futile attempts to sever our connection with the West, while we struggle for political freedom, we are really paying the West the highest compliment we can offer. For we acknowledge in the very act of striving for Liberty the noble character of the Western education which has roused us from our slumbers. We tacitly admit that it was the literature of the West which inspired us with a courageous love of freedom and aroused us to proclaim our independence.

APPEAL FOR CONCILIATION

"The comparative immunity which we enjoyed in the past, together with large powers of freedom of speech—all this quickened our courage and kept us free within. It should therefore be the anxious care as well as the proud privilege of Britain to maintain and foster the encouragement of that freedom. In spite of the trouble in which we are all involved at the present moment, England has to show herself broad-minded, upright and conciliatory in her dealings with India to-day.

"For it must be clearly understood in England that complications have now arisen which can never be done away with by repression and by a violent display of physical power. They can only be cured by some real greatness of heart which will attract in its turn a genuine spirit of co-operation from our side. Those who have experience of bureaucratic and irresponsible Governments can easily understand how the repressive measures which are being undertaken to-day, culminating in martial law at Sholapur, are bound to react upon our own people, for fear and panic always make a Government in power harsh and vindictive. Instances of this are well known in human history, and what is happening to-day in India is not likely to be an exception to the general rule.

"Though much news has been suppressed, still information keeps trickling through from those who are reaching England by sea from India. They tell us how cruel and arbitrary is the punishment that is being meted out even to those who have been entirely inoffensive. These actions are called by high-sounding names, such as 'upholding law and order', when they are themselves the worst breaches of the law of humanity, which is greater then any other.

THE WHITE CAPS AT SHOLAPUR

"As a slight indication of the contemptuous violence which is being exercised under the cover of martial law we are told by press cables from India how the military go about the streets of Sholapur with sticks, flicking off the white caps of those who wear such a headdress in honour of Mahatma Gandhi. The physical suffering may be slight, but the insult will be deeply resented by millions who hold Mahatma Gandhi's name in reverence. If such insolent actions continue these proud people will have to pay the penalty later, for the mute cry of the defenceless and weak cannot be ignored.

"The time will come when reparation will have to be made. Therefore I trust and hope that the best minds of England will feel ashamed of every form of tyrannical action, just as we ourselves have been ashamed at the violence which has broken out on our side. We must on no account, if we can help it, find ourselves involved in a vicious circle wherein one violence leads on to another, for that in the end can only result in further bitterness and estrangement."

[*Manchester Guardian* : May 16, 1930]

AN APPEAL TO IDEALISM

I find it difficult to do my duty to-day in a spirit of patience and calmness, and at the same time to do justice to the Indian cause, to myself and my friends in this country. For the atmosphere of mutual relationship between India and Great Britain has grown dark with suspicion and suffering.

It is my desire in this article to write concerning a reconciliation between two peoples who for over a century have had a close connexion with each other, and yet are still separated by a moral distance more difficult to overcome than mountains and seas. In this sensitive age of new awakening, the human in us in India has felt the indignity and pain of being dealt with by an abstraction of a government from across a dark chasm of impersonal aloofness, devoid of the light of imagination and the living touch of sympathy. This large gap in humanity has offered a breeding-place to a diseased political condition in our history that is crying for a cure. It can only be effected by a generous co-operation from both sides, by a union of minds which know how to make proper allowance for

weakness in human nature, and at the same time maintain firm faith in it where it is great.

Our task is every day growing harder ; for the situation is solely left in the hands of the politicians, who represent the organization and not the humanity of a people. And therefore my appeal to-day is to that idealism which has made English history glorious, and which must extend its glory in an alien country.

Once Asia in her spring time of exuberant life offered the world her spiritual ideals. To-day Europe in the illumination of her intellect has brought her science and also her spirit of service. But unfortunately she has not come to Asia to reveal the generosity of her civilization, but to seek an unlimited field for her pride and power, trying to make these things eternal. She has come with her need and not with her wealth ; and therefore she has belied her own mission and used the truth itself for a utilitarian purpose of self-aggrandisement. In order to wake her up to her own responsibility Asia must refuse weakly to yield her contribution to the impious belief that dehumanized power can succeed for ever with the help of science.

The people of England appear doomed to remain ignorant of the true state of things that prevails to-day in India. For in critical times like these Governments which have their faith in the short cut of punitive force for the speedy solution of their problems become more afraid of the higher spirit of their own people than their enemies themselves. And therefore they create in the surrounding air the smoke screens of obscurity and calumny in order to hide their own method of action and discredit that of their opponents. This has been amply proved in the late war. The organized power has the organ of a magnified voice ; but we who have no proper means of publicity nor the bond of kinship with the British people to make it easy for us to gain credence, must resignedly accept all misrepresentation at the bitterest part of our national penance, the unavoidable penance for our own long history of weakness, Yet I cannot allow this occasion to pass by without declaring that with few exceptions. inevitable in the present atmosphere of panic and defiance, India in this trial has maintained her dignity of soul. Even through distortion and suppression of

truth, and circulation of untruth with belated contradiction in small letters, the fact glimmers out that our people, with a pious determination, has kept unshaken the difficult ideal which they have accepted from their great leader Mahatma Gandhi, who upholds the noblest spirit of India, the spirit of Buddha himself. To us who are away from our homes there has reached the voice of the sufferers across the barriers of silence and the sea, carrying above the smothered cry of pain, the exaltation of a fulfilled vow under extreme provocation. My prayer for my people is not for the cessation of their suffering, but for the keeping up of their trust in the power of the human spirit which shows itself in all its might of truth among those who are physically weak; for we have both the occasion and the responsibility to prove this, not only on behalf of India, but of all humanity.

For the sake of justice I must declare that in such a conflict between an unarmed people and a Government in possession of unlimited power of destruction, our sufferings would have been terribly greater under any imperialistic rulers other than the British; and the fact that our country even in her desperate effort of utter defiance should still feel resentful at the acts of injustice due to methods of coercion hastily improvised, is an evidence of her strong faith in the standards of justice and humanity possessed by the British nation. It also shows our lack of direct experience of any great political revolution. In fact, if the lesson of history must be acknowledge, our people should never murmur against violence on the part of their rulers when normal conditions of Government have been upset. We must expect this and face it, and never complain and blame the government for the drastic measures which we have deliberately made inevitable, while fully, I hope, anticipating the consequence. To light the fire and then complain that it burns is absurdly childish. And, therefor, we should. in all fairness, take upon ourselves the ultimate responsibility of the floggings and shooting, of injuries and indignities, of indiscriminate methods of striking terror into the hearts of a helpless multitude and of the awful fact that the majority of victims must necessarily be innocent in a catastrophic outrage of this nature. None of us can cowardly claim immunity or mitigation of suffering, when, even if rashly,

the subversive forces of history have been brought down upon our country in the hope of building her history upon a new foundation.

The only thing which is most important for us to remember is that we should heroically uphold our own *Dharma* and refuse to accept defeat by offering violence in return.

Rabindranath Tagore

[*The Spectator* : June 7, 1930]

RACIAL RELATIONS

[A message from Rabindranath Tagore to the Racial Commission of the Universal Relations Peace Conference.]

I regard the race and colour prejudice which barricades human beings against each other as the greatest evil of modern times, which should be overcome is humanity must be realised as on in spirit.

The different paths along which progress may be made towards recovery from this evil are manifold. My own stress would be laid upon the elevation of the public mind and the collection and dissemination of accurate scientific knowledge as against the pseude-scince and pseude-religion which in their disguise of truth are treacherously dealing mortal blows to truth heerself.

There should be a united effort to combine the emotional forces of religion, in its broadest sense, with the spread of education based on fully ascertained truth concerning the human race as a whole.

June 5, 1930 Rabindranath Tagore

[*The Friend* : London, June 13, 1930]

LETTER TO THE EDITOR

The Round Table Conference

Sir,

I have often been asked to give my opinion about Mahatma Gandhi's rejection of the invitation to the Round Table Conference because his terms were found impossible to be at once accepted by the British Government. I am not competent to discuss this question from a narrowly political point of view, though I am sure it has another perspective of meaning which needs serious consideration.

Through the blinding mist of the past the time is struggling to appear when people's destinies are no longer to be moulded and

modelled by the politicians who are the modern medicine men of diplomacy. The collaboration of the world mind is daily acquiring a supreme value for all important national problems, and the centre of gravity is shifting itself from the exclusive conference of national interest to the conference of moral judgment of all nations. Every day the idea is growing clearer in our minds that the affairs which once were jealously considered as special to one's own country do concern all humanity when they comprehend moral issues. The potent force of public opinion has already extended its field of activity across all political barbed wire fences of individual countries, and the human world is rapidly developing its universal organ of voice and sense of hearing to a very high degree of sensitiveness.

This has generated a power which national organizations of all free countries are busily exploiting for their own interest with the help of a large expenditure and often of unscrupulous means and meassengers. We have seen how in the late War, while the manufacture of the poison gas which has its range of mischief only within the battlefield was not neglected, dissemination of poisonous slanders was also carried on far and wide with lavish extravagance. The instruments of propaganda have become to-day a permanent political necessity, not only for informing the world of facts, but also deluding it; and insinuations against their rivals and victims are shown broadcast by Governments through the agencies that seem inoffensive and camouflage that has the appearance of moderation and fairness.

But all this has a great meaning proving that our history has come to a stage when moral force has to be acknowledged even by politics and be captured at any cost, even at the cost of truth. This fact is all the more remarkable because the efficiency of the physical and material power has, in this present scientific age, attained a degree of virulent perfection never before achieved. And yet this power hesitates to-day to assert its unashamed supremacy except in rare cases of short-sighted stupidity and fanatical barbarism. The necessity to give a dog a bad name and then to hang it certainly proves a higher moral spirit than the defiant spirit that allows a dog to be hanged without the accompaniment of a libellous justification.

The invitation to a Round Table Conference accorded to the representatives of a people who can with perfect impunity be thro-

ttled into silence or trampled into a pulp, is in itself a sign of the time undreamt of even half a century ago. Mahatma Gandhi may not believe in the success of its obvious purpose, but he must acknowledge that it represents the same moral principle which he himself invokes on behalf of his countrymen in their endeavour after self-government. The real importance of this conference is not in the opportunity it may offer of a co-operation with the British politicians, but with the soul force of the whole world. We must know that this Conference is going to hold its sittings before the world-tribunal whose approbation it is eager to win.

When the continents began to be formed on the geography of the earth the amount of the land was insignificant, as it were, contemptuously tolerated by the all-pervading reign of the sea which kicked it and lashed it and nearly smothered it under an engulfing protection. But those very uncertain points of concession, scarcely solid, were significant of a fruitful future. We human beings have the cause to be thankful for that precarious geological small favour, surrounded by unfathomable restrictions. And to-day, when on the one hand the police batons are bloodily busy cracking our unresisting heads and admiringly defended by authorities, majestically aloof from the tragic scene, a beckoning gesture from the other shore has reached the disarmed multitude of India, denuded of educational facilities, in the shape of an invitation to a Conference. I do not know if it is too small or ineffectual, but there is no doubt that it is a moral gesture, the gesture inspired not merely by the political necessity but the necessity of a world sanction. And I believe that it would have been worthy of Mahatma Gandhi if he could have accepted unhesitatingly the seat offered to him, even though the conditions were not fully acceptable to himself. To come there without any absolute assurance of political success would all the more enhance the significance of his moral mission. God's great boons come humbly through small openings, and we on our part should be humble when we hail them, trust them, and by our own merit make them bear the best fruits. The gifts that have any real value claim for their perfection our own faith and sacrifice.

This present age waits for a new and a noble technique for all reparations of national maladjustments. Mahatma Gandhi is the one

man in the present age who has preached it and shaped it through his movement of non-violent resistance in South Africa and India. And now he has had the opportunity to introduce the moral spirit of that movement into a Conference which only he has made compellingly possible, and which only he could have used as a platform wherefrom to send his voice to all those all over the world who truly represent the future history of man, a history that has to be built upon the foundation of numerous immediate failures and futile sufferings. Any such Conference can never be from the beginning a ready-made apparatus into whose rigid narrowness one must squeeze and torture oneself for accommodation. It waits for a man of genius, as he surely is, to turn it into an instrument for giving expression to the spirit of the age in the field of political intercommunication. I feel sad that such an opportunity has been lost for the moment, for India and for all the world. For to-day is the age of co-operation in all departments of life, including politics, the age of the creation of the continent in which all the human islands are to merge their isolation for a grand festival of civilization.

But here my pen stops, for I have suffered, and my suffering has been too cruel and too recent for me to leave it aside and think of a millennium that is still remote. I have known what has been done in Dacca, and from the light of that I can read the story of the Peshawar tragedy.

These people, the rulers of the world, are afraid of the judgment of their own peers, but are not afraid of the suffering caused by themselves. The time made safe for the weak will be slow in its journey through a long moral path which is still in the making. In the meanwhile the mothers' tears are flowing in our neighbourhood, and the wretched dumbness of the desolated homes is a burden we find difficult to remove from our hearts. There are wounds that cry for the immediate healing of their pain, and I am silenced by my own shame as I try to talk of an age when the tedious ceremony of exorcism is completed by which the devil is made to slink away for his own safety and self-interest. Those of our brothers who have suffered, till their hearts are ready to break cry to me angrily "Stop that discussion about the future ; it is natural and therefore healthy for us to struggle through the process of the suffering which we have

undertaken on our own soil, and instead of appealing to the world to take our side, let us, unarmed and resourceless, stand up and defy the mighty power and say : 'We fear thee not. We do need redress of our wrongs, but we need even more our self-respect which nobody outside our own selves can restore to us.' "

I do not know how to answer them, and say to myself : "Possibly they are wiser with the natural wisdom of the sufferer."

It was the great personality of Mahatma Gandhi which inspired this courage, under persecutions frankly brutal or cowardly insidious, into the heart of the dumb multitude of India, suffering for ages from the diffidence of their own human power. I myself have too often doubted the possibility of such a sudden quickening of life in a country whose mind has remained parched under a long drought of education. But a miracle has happened through the magical touch of Mahatma's own indomitable spirit and his courageous faith in human nature. And after this experience of mine I hesitate to doubt his wisdom when he holds himself aloof from the invitation that seems to offer the opportunity for at least the beginning of an endeavour which, through the usual path of diplomacy, with its tortuous bends and sudden pitfalls of reactions, may at last lead us to our goal. Let me belive in his firmness of attitude, and not in my doubts.—I am, Sir, &c.,

Rabindranath Tagore.

Although we do not share all Rabindranath Tagore's views, we welcome his outspoken letter. We are sure that it correctly represents views widely held in India At this moment it is of the utmost importance that we, in Great Britain, should recognize the need for making a supreme effort to win Indian belief in our good faith

—ED. Spectator.

[*The Spectator* : Nov. 15, 1930]

পরিশিষ্ট - ৪

Bernard Shaw Meets Rabindranath Tagore
Regret Politician Represent Nations

London, January 8, (1931)—(U P). Intellectuals of the East and West met to-day when George Bernard Shaw, genial and smiling, shook hands with Rabindranath Tagore, timid, dreamy-eyed poet of India.

The Irish playwright and the Indian poet met at a reception this afternoon at which Tagore spoke. He regretted that nations had to be represented by politicians. This he said, was "almost as bad as allowing a band of robbers to organize the police force."

"You know," Shaw said to Tagore, "I have always been telling my people not to listen to politicians. I have tried to do this in my writings. But you know what uphill work it is to convince people against their own will."

The pair met after Tagore's philosophical dissertation on peace and a plea for better understanding between the peoples of the East and the West. He addressed the All People's Association at Hyde Park Hotel.

Shaw and Tagore later posed for the photographers, the flowing beard of the Indian dwarfing the white whiskers of the Irishman.

Asked later to comment on Tagore's contention that nations should not be represented by politicians, Shaw commented : "Oh, that idea is as old as the hills."

He laughed when asked if they should be represented by poets and authors instead.

[*Daily Mail & Empire* : Toronto, Canada ; 9th January, 1931]

পরিশিষ্ট - ৫

Rabindranath Tagore on Proselytism

The following letter from Rabindranath Tagore to one who was intending to come out as a missionary to India will be read with interest and should be carefully considered :

"I have read your letter with pleasure. I have only one thing to say : it is this : Do not be always trying to preach your doctrine, but

give yourself in love. Your Western mind is too much obssesed with the idea of conquest and possession; your inveterate habit of proselytism is another form of it. Christ never preached himself or any dogma or doctrine; he preached the love of God. The object of a Christian should be to be like Christ—never like a coolie recruiter trying to bring coolies to his master's tea garden. Preaching your doctrine is no sacrifice at all—it is indulging in a luxury far more dangerous than all the luxuries of material living. It breeds an illusion in your mind that you are doing your duty—that you are wiser and better than your fellow-beings. But the real preaching is in being perfect, which is through meakness and love of self-dedication. If you have strong in you your pride of race, pride of sect, and pride of personal superiority, then it is no use to try to do good to others. They will reject your gift, or even if they do accept it they will not be morally benefitted by it—instances of which can be seen in India every day. On the spiritual plane you cannot *do* good until you *are* good. You cannot preach the Christianity of the Christian sect until you be like Christ—and then you do not preach Christianity, but the love of God, which Christ did." *

[*Indian Social Reformer*: Bombay, 11th July, 1931]

পরিশিষ্ট - ৬

Prof. Einstein's Appeal

The following letter from Prof. Einstein was addressed to the Conference of War Resisters' International which met at Lyons from August 1 to August 4, (1931):

"I address myself to you, the delegates of the War Resisters' International, meeting in conference at Lyons, because you represent the movement most certain to end war. If you act wisely and courageously, you can become the most effective body of men and women in the greatest of all human endeavours. Those you represent in fifty-six countries have a potential power far mightier than the sword.

All the nations of the world are talking about disarmament. You

* এই চিঠির আর একটি বয়ান বিলেতের *Methodist Recorder*-এ (London, 20. 7. 26) পাওয়া যায়।

must lead them to do more than talk. The people must take this matter out of the hands of statesmen and diplomats. They must grip it in their own hands. Those who think that the danger of war is past are living in a fool's paradise. We have to face to-day a militarism far more powerful and destructive than the militarism which brought the disaster of the Great War.

This is the achievement of governments. But among the peoples the idea of war resistance spreads. You must challengingly and fearlessly extend this idea. You must lead the people to take disarmament into their hands and to declare that they will take no part or lot in war or in the preparation of war. You must call upon the workers of all countries unitedly to refuse to become the tool of death dealing interests. There are young men in twelve countries who are resisting conscription by refusal to do military service. They are the pioneers of a warless world. Every sincere friend of peace must support them and help to arouse the moral conviction of the world against conscription.

I appeal especially to the intellectuals of the world. I appeal to my fellow-scientists to refuse to co-operate in research for war purposes. I appeal to the preachers to seek truth and renounce national prejudices. I appeal to the men of letters to declare themselves unequivocally. I ask every newspaper which prides itself on supporting peace to encourage the peoples to refuse war service. I ask editors to challenge men of eminence and of influence by asking them bluntly : 'Where do you stand ? Must you wait for everyone else to disarm before you put down your weapons and hold out the hand of friendship ?'

This is no temporizing. You are either for war or against war. If you are for war, you must encourage science, finance, industry, religion, and labour to exert their power to make your national armaments as efficient and deadly as they can be made. If you are against war, you must encourage them to resist it to the uttermost. I ask every one who reads these words to make this great and definite decision. Let this generation take the greatest step forward ever made in the life of men. Let it contribute to those who follow, the inestimable right of a world in which the barbarity of war has been for ever renounced. We can do it if we will. It requires only that

all who hate war shall have the courage to say that they will not have war.

I appeal to all men and women, whether they be eminent or humble, to declare before the World Disarmament Conference meets at Geneva in February, that they will refuse to give any further assistance to war or the preparation of war. I ask them to tell their governments this in writing, and to register their decision by informing me that they have done so.

I shall expect to have thousands of responses to this appeal. They should be addressed to me at the headquarters of the War Resisters' International, 11 Abbey Road, Enfield, Middlesex, England. To enable this great effort to be carried through effectively, I have authorized the establishment of the 'Einstein War Resisters' International Fund.' Coniributions to this fund should be sent to the treasurer of the W. R. I. 11 Abbey Road, Enfield, Middlesex, England.* [*Modern Review* : October, 1931 ; P. 482]

* [চি. প., ২০২]

পরিশিষ্ট - ৭

My appeal to America : Tagore

(This message was brought by the poet's friend and admirer, Mr. Cyril Modak, a christian Indian Nationalist.)

"Owing to increasing facilities to communication the different countries and peoples of the world have now been brought closer together than before but this external proximity has yet to be transformed into spiritual unity by the united endeavour of individuals and nations. Till this has been achieved the very fact of our material linkedness will be grieviously hurtful to the different peoples which is evidenced just now when disturbances in remote parts of the world helplessly drag into the common net of suffering people who are far removed from the scence of action.

The need of recognizing this urgent fact of our inescapable relatedness in the modern age can no longer be shelved by diplomatic machinations or frenzied politics. Nations like America, therefore, who because of their central geographical position are able to take a more detached view of events should now come forward and offer to

lead the human world toward a future of mutual understanding and harmonious co-operation.

America with her internal unity of purpose, her resources of power, and her noble traditions of freedom is peculiarly fitted to exercise this sagacity of mind, and her moral influence is already one of the most powerful assets in the comity of nations. America is young, she has the fire of creative energy, and unfettered by any complicated heritage of rankling political memories of the past, she is free to develop a great edifice of human solidarity. With her gifts of applied science she can liberate the human spirit from the dominance of privation and disease, she can evolve purposive Government of the peoples of the world from her own experience of combining diverse races into one democracy in inter-dependence ; she can fearlessly take her stand against exploitation of weaker peoples and uphold the sacred right of human honour above the din of clamorous greed.

"My appeal to the America of to-day is founded on my profound belief in her moral integrity and her true mastery of the resources of power."

Sd/ *Rabindranath Tagore*

[*Dharma* : Newyork, July-December, 1932]

পরিশিষ্ট - ৮

হিজলী ও চট্টগ্রামের অনাচারে দেশবাসীর বিক্ষোভ কলিকাতায় গড়ের মাঠে লক্ষাধিক নরনারীর সমাবেশ : জনসভায় রবীন্দ্রনাথের তেজোদৃপ্ত প্রতিবাদবাণী :

[আনন্দবাজার পত্রিকা · ১০ই আশ্বিন, ১৩৩৮, রবিবার ; ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩১]

চট্টগ্রাম ও হিজলীর প্রতি বাংলার কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনার জন্য গতকাল টাউন হলে কলিকাতার নাগরিকদের এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বেলা ১৷৷০ ঘটিকা হইতে টাউন হল অভিমুখে জনস্রোত বহিতে থাকে। বেলা ৪৷৷০ ঘটিকার সময় সভা আরম্ভ হইবার কথা ছিল। নির্দিষ্ট সময়ের দুই ঘণ্টা পূর্বেই সমস্ত সভাগৃহ বারান্দা ও সিঁড়ি পরিপূর্ণ হইয়া যায়। কোথাও তিল-ধারণের স্থানমাত্র অবশিষ্ট ছিল না, কবিবরকে দর্শনের জন্য আগ্রহ আকুল জনতার ভিড় ঠেলিয়া বক্তৃতামঞ্চের দিকে পৌঁছানো নেতাদের পক্ষে কণ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল।

জনতার চাপে শ্রোতাদের মধ্যে কয়েকজন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। স্বেচ্ছাসেবকগণ উঁহাদিগকে সভার বাহিরে বহন করিয়া লইয়া যান। কবিবর আসিবার অর্ধঘণ্টা পূর্বে দ্বিতলে উঠিবার কাঠের সিঁড়ির উপর জনতার এরূপ চাপ পড়িয়াছিল যে, সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া পড়িবে বলিয়া আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল।

শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও শ্রীযুত নিশীথ সেন সভাস্থলে আসিয়া জনতার অবস্থা দেখিয়া সভাধিবেষনের স্থান পরিবর্তনের বিষয় চিন্তা করেন। পরে স্থির করেন যে, মনুমেণ্টের নীচেই দুইটি সভার অধিবেশন করিতে হইবে। বহুকষ্টে শ্রীযুত সেনগুপ্ত বক্তৃতামঞ্চের নিকট গমন করিয়া সকলকে জানান যে, কবিবরের স্বাস্থ্য অতিশয় খারাপ, এ অবস্থায় এরূপ জনতার মধ্যে তাঁহার প্রবেশ করা কঠিন হইবে। শ্রীযুত সেনগুপ্ত তখন জনতাকে মনুমেণ্টের নীচে যাইতে অনুরোধ করেন এবং বলেন যে কবিবর শীঘ্রই তথায় গমন করিবেন।

রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি

এই সময় কবিবরের গাড়ী সভাগৃহের দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হয়। কবিবর আসিয়াছেন জানিয়া সেই বিপুল জনতা চঞ্চল হইয়া উঠে ও কবিবরকে দর্শনের জন্য তাঁহার গাড়ীর দিকে ঝুকিয়া পড়ে। শ্রীযুত সেনগুপ্ত তখন অন্যান্য নেতাদিগের সহিত ঐ স্থানে ছুটিয়া যান ও কবিবরের অসুস্থতার দোহাই দিয়া সকলকে ভিড় ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করেন, জনতা তখন মনুমেণ্টের দিকে ধাওয়া করে।

মনুমেণ্টের নীচে একটি দক্ষিণ দিকে একটি উত্তর দিকে দুইবার সভার অধিবেশন হয়।

সভার স্থান পরিবর্তন ঘোষণা করিবার অর্ধঘণ্টার মধ্যেই মনুমেণ্টের চতুর্দিকে এক বিরাট জনসমুদ্রে পরিণত হয়। সভায় স্যর নীলরতন সরকার, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, নিশীথচন্দ্র সেন, শ্রীযুত এম. এন. হালদার, শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ সেন, কিরণশঙ্কর রায়, ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি. এন. শাসমল, সন্তোষকুমার বসু, মৌলবী সিরাজী, প্রতাপচন্দ্র গাঙ্গুলী, মৌলবী সামসুদ্দীন আমেদ, শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী, শ্রীযুক্তা ঊর্মিলা দেবী, শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার ও শ্রীযুক্তা নির্ঝরিণী সরকার প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

বেলা ঠিক ৫টায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও অপরাপর নেতাদের সহিত কবিবর ময়দানে আগমন করেন, কিন্তু জনতা ভেদ করিয়া, অগ্রসর হইতে না-পারিয়া তিনি মনুমেণ্টের উত্তর দিকে দাঁড়াইয়া তাঁহার পূর্বোক্ত অভিভাষণ দান করেন।

কবির বাণী

অভিভাষণ দান সমাপ্তির পর শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত কবিবরকে তাঁহার গাড়ীতে লইয়া তুলিয়া দেন এবং তাঁহাকে বাড়ীতে নামাইয়া দেন, কেন না, তাঁহার শরীর অতিমাত্রায় অসুস্থ ছিল।

মনুমেণ্টের দক্ষিণে

মনুমেণ্টের দক্ষিণ দিকে যে বিপুল জনতা সমবেত হইয়াছিল, ঐ জনতা ইতিমধ্যে কবিবরকে দেখিবার জন্য অসহিষ্ণু হইয়া উঠে। এই সময় শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত, স্যার নীলরতন সরকার ও এন. সি. সেনের সহিত ঐস্থানে গমন করেন এবং সভার কাজ আরম্ভ হয়।

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের বক্তৃতা

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, কলিকাতায় নাগরিকদিগের এই বিরাট সভায় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করা হইয়াছিল, যদিও তাঁহার শরীর অতিশয় অসুস্থ তথাপি তিনি ঐ আহ্বান গ্রহণ করিয়া টাউন হলে আসিয়াছিলেন। টাউন হলে বিষম ভিড় হওয়ায় ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া দুইটি সভা আহ্বানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কবিবর ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ময়দানে আসিয়া এই মনুমেণ্টের অপর পার্শ্বের সভায় বক্তৃতা দান করেন। শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি দক্ষিণ দিকের এই সভায় আসিয়া বক্তৃতা দিতে রাজী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে এই সভায় আনিবার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কবিবর এই স্থান ত্যাগ করিবার পূর্বে আমাকে এই সভায় আর কোনরূপ বক্তৃতা না-দিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন কেন না কবি মনে করেন যে, এই অপূর্ব জনসমাবেশেই দেশবাসীর প্রকৃত মনোভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। কাজেই আর কোন বক্তৃতা আবশ্যক করে না।

গৃহীত প্রস্তাবাবলী

স্যার নীলরতন সরকার অতঃপর নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি সভায় উত্থাপন করেন :

"(১) চট্টগ্রামের ঘটনা সম্বন্ধে গত ১৮ই তারিখ টাউন হলে কলিকাতার নাগরিকদিগের সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল এই সভা উক্ত প্রস্তাব পুনর্গ্রহণ করিতেছে।

(২) হিজলী বন্দীশালায় বিনা বিচারে আবদ্ধ, আত্মসমর্থনের সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত, সরকারী কর্মচারিদিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য নিরস্ত্র বন্দীদিগের উপর নির্বিচারে গুলীবর্ষণে এবং উহাদের দুইজনের মৃত্যু সংঘটনে ও অপর অনেককে আহত করণে এই সভা বিশেষ আতঙ্ক ও তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে।

(৩) কলিকাতার নাগরিকগণের অভিমত এই যে, যে-আইনের বলে শাসন কর্তৃ-পক্ষের হাতে বিনা বিচারে লোককে অনির্দিষ্ট কালের জন্য আটক রাখিবার অধিকার দান করা হইয়াছে ঐরূপ আইন সকল সভ্য শাসনতন্ত্রের মূলনীতির বিরোধী এবং যে আইনের বলে হিজলীর এই নৃশংসতা সম্ভবপর হইল উহাতে শাসন অধিকারের বিষম অপব্যবহারই হইয়াছে।

(৪) কলিকাতার নাগরিকগণের এই সভা দাবী জানাইতেন যে, হিজলীর ব্যাপার সম্পর্কে জনগণের শ্রদ্ধাসম্পন্ন একটি কমিটি দ্বারা অবিলম্বে তদন্ত করান হউক।

(৫) (১) বাংলার নাগরিকগণের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য (২) এই ধরনের আইন

সকল বাতিল করিয়া দিবার জন্য জোর প্রচারকার্য চালাইবার জন্য, (৩) বাংলায় যাহাতে আর এরূপ নৃশংস কাণ্ড না ঘটে তাহার ব্যবস্থার জন্য (৪) রাজবন্দীদের ও তাহাদের পরিবারবর্গের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা সম্পূরণের জন্য এবং চট্টগ্রামের বিপন্ন অত্যাচারিতদিগের কষ্টের লাঘবের জন্য সকল ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ও ঐজন্য অর্থ-সংগ্রহের জন্য একটি কমিটি গঠিত হউক।"

কমিটিগঠন

উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি কার্যে পরিণত করার জন্য নিম্নোক্তরূপ একটি কমিটি গঠিত হয় :—

প্রেসিডেণ্ট—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সদস্যগণ : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যর নীলরতন সরকার, শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, বি. এন. শাসমল, টি. সি. গোস্বামী, প্রভুদয়াল হিম্মৎ সিংকা, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, অশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী, শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জী, কিরণশঙ্কর রায়, শ্রীযুক্তা বিমল প্রতিভা দেবী, উর্মিলা দেবী, শান্তি দাস, হেমন্তকুমার বসু, অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, সতীন্দ্রনাথ সেন, নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী, হরিকুমার চক্রবর্তী, অবিনাশ ভট্টাচার্য, অরুণাংশ দে, মৌলানা আক্রাম খাঁ, মৌলবী মুজীবার রহমান।

অনশন ভঙ্গের চেষ্টা

হিজলীর অনশনব্রতী রাজবন্দীগণকে অনশনব্রত ত্যাগে সম্মত করাইবার জন্য কমিটির সদস্যদের এক ডেপুটেশন অদ্য হিজলীর অনশনব্রতী রাজবন্দীদিগের নিকট গমন করিবেন এবং রাজবন্দীদিগকে জানাইবেন যে কমিটি তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার জন্য সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।

পরিশিষ্ট - ৯

শান্তিনিকেতনে কারু-সঙ্ঘ : (বিজ্ঞাপন)

শান্তিনিকেতন কলাভবনে শিল্পীগণ এই সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছেন। এখানে সংবাদ দিয়া সকলেই অল্প আয়াসে এক স্থানে নিজ নিজ প্রয়োজন মত শিল্প দ্রব্য বা তাহার নূতন ডিজাইন করাইয়া লইতে পারিবেন। বর্তমানে নিম্নলিখিত কারু-শিল্পসমূহের আয়োজন আছে :

ছবি—জলবর্ণ (Water colour), তৈলবর্ণ (Oil colour), বইয়ের ছবি ও বিজ্ঞাপন (Book illustration and poster) ;

মূর্তি (Designs and portraits in clay, terra-cota and plaster of Paris) ;

সূচীশিল্প (Embroidery) ;

বাটিকের কাজ (Battique work on handkerchiefs, hand bags, table cloths and door curtains) ;

প্রাচীর চিত্র (Fresco) ;

বাসন এবং গহনার নূতন ডিজাইন ;
দারু শিল্পের নূতন ডিজাইন (Furniture) ;
এতদ্ভিন্ন গৃহসজ্জার জন্য সকল রকম শিল্পদ্রব্যের ডিজাইন উপযুক্ত মূল্যে উপযুক্ত সময়ে করিয়ে দেওয়া হয়।

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা ঃ সম্পাদক, কারু সংঘ, কলাভবন, শান্তিনিকেতন পোঃ।

[প্রবাসী : শ্রাবণ, ১৩৩৭ ; পৃঃ. ৬১৫-১৬]

বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতনে পল্লীসেবক শিক্ষণের ব্যবস্থা

আগামী পূজাবকাশের মধ্যে ৯ই অক্টোবর হইতে ৪ঠা নভেম্বর পর্যন্ত (২২শে আশ্বিন হইতে ১৮ই কার্তিক পর্যন্ত) বিশ্বভারতীর পল্লীসেবা বিভাগের তত্ত্বাবধানে পল্লীসেবকদিগের শিক্ষার জন্য শ্রীনিকেতনে এক 'শিক্ষা শিবির' পরিচালনা করা হইবে। শিক্ষার্থীদিগকে বিশেষ অভিজ্ঞদিগের দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইবে। (১) পল্লীসমস্যা ও পল্লী সংগঠন, (২) কুটীর-শিল্প, (বয়ন ও রংয়ের কাজ), (৩) ব্রতী সংগঠন, (৪) পল্লী-স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক চিকিৎসা, (৫) প্রাথমিক কৃষি।

গত ছয় বৎসর হইতে নিয়মিতরূপে 'শিক্ষা শিবিরে'র কার্য পরিচালনা করা হইতেছে। শিক্ষা শিবিরে এযাবৎ মোট ১২২ জন কর্মী শিক্ষালাভ করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে পল্লীসংগঠন কার্যে নিযুক্ত আছেন। শিক্ষাকালে শিক্ষার্থীদিগকে নিম্নলিখিত ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। প্রবেশিকা ফি—১৲; আহার বাবদ—১৫৲ ও কুটীর-শিল্প বাবদ—৩৲; মোট—১৯৲।

যাঁহারা এই 'শিক্ষা শিবিরে' শিক্ষালাভ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে ১লা অক্টোবরের পূর্বে প্রবেশিকা ফি সহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে :— সম্পাদক, পল্লীসেবা-বিভাগ, শ্রীনিকেতন, পোঃ সুরুল, জেলা বীরভূম।

[প্রবাসী : ভাদ্র, ১৩৩৭ ; পৃ. ৭৫৬]

শ্রীনিকেতনে শিক্ষা শিবির

অধুনা বাংলাদেশের সর্বত্র পল্লী সংগঠনের কার্যের জন্য বিশেষ আগ্রহ জাগ্রত হইয়াছে এবং বিভিন্ন জিলায় পল্লী সমিতি স্থাপন করিয়া বহুকর্মী কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই সকল কর্মী যাহাতে পল্লীসমস্যা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য শ্রীনিকেতনে প্রতি বৎসর শিক্ষা শিবিরের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এ যাবৎ ১৯৫ জন কর্মী এখান হইতে শিক্ষালাভ করিয়া গিয়াছেন।

এ বৎসর ৫ই অক্টোবর হইতে ৩১শে অক্টোবর (১৯৩৩) পর্যন্ত একটি শিক্ষা শিবিরের ব্যবস্থা করা হইতেছে। শিক্ষা ও আহারাদির জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মোট ব্যয় ১২৲ টাকা হিসাবে পড়িবে। নিম্নে শিক্ষিতব্য বিষয়গুলির উল্লেখ করা হইল :—

(১) পল্লী সংগঠনের আদর্শ

(২) পল্লী-স্বাস্থ্য, সংক্রামক ব্যাধি এবং প্রাথমিক চিকিৎসা

(৩) পল্লীর প্রাথমিক শিক্ষা

(৪) সমবায় সংগঠন নীতি

(৫) ব্রতী সংগঠন

(৬) কুটির শিল্প (ফিতা ও আসন বয়ন এবং রংয়ের কাজ) ইহা ব্যতীত বিশ্বভারতীর খ্যাতনামা অভিজ্ঞ কর্মীগণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রতি সন্ধ্যায় ছাত্রদের নিকট বক্তৃতা করিবেন।

১। প্রাচীন ভারতে পল্লী সংগঠন—বক্তা পণ্ডিত শ্রীযুত ক্ষিতিমোহন সেন, এম. এ. ; ২। পল্লী সমস্যার গবেষণা—ডাঃ আমীর আলী, এম. এস. সি. পি.এইচ-ডি. ৩। ইউরোপ ও ভারতে পল্লী সংগঠন আন্দোলন—শ্রীযুত কালীমোহন ঘোষ ; ৪। পল্লীর শিল্পকলা—শ্রীযুত নন্দলাল বসু ; ৫। জুগোশ্লাভিয়ায় সমবায় পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যোন্নতির প্রচেষ্টা—ডাঃ এইচ. টিম্বার্স, এম. ডি. ডি. টি. এম. ; ৬। পাশ্চাত্যে বালক সংঘ—ডাঃ পি. সি. লাল. বি. এস. সি, এইচ. ডি। শিক্ষার্থীদিগকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে। সম্পাদক—পল্লীসেবা বিভাগ, সুরুল—পো:, বোলপুর, বীরভূম।

[আনন্দবাজার পত্রিকা : শনিবার ২৪শে ভাদ্র, ১৩৪০ : ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩]

পরিশিষ্ট - ১০

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রকাশিত হইলে স্যর চিন্তামণি (C. Y. Chintamani) রবীন্দ্রনাথকে ঐ-সম্পর্কে তাঁহার অভিমত জানাইবার অনুরোধ করিয়া তার করেন (১৮ই আগস্ট, ১৯৩২)। জবাবে কবি চিন্তামণিকে পরদিনই এক খোলা চিঠির মাধ্যমে ঐ সম্পর্কে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত জানান, পূর্বেই তাহা উল্লিখিত হইয়াছে (দ্র. পৃ. ২৪২)। কিন্তু এই জবাবেও কবি ঠিক সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। পরদিন আর একখানি পত্রে তিনি আরও কিছু সংযোজন করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয়টি পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করেন। পত্রটি ছিল এই :

20th August, 1932

Dear Mr. Chintamani,

After writing to you it occurs to me that I have forgotten to mention one important point in my communication. The social iniquities that have been encouraged to continue in the name of sacred tradition for ages creating dangerous gaps in our corporate organism are the origin of all the futilities that are pursuing us in our building up of national life. It is high time that we should concentrate our attention to

eradicate these evils which are hounding us to failures and utter humiliation.

Yours etc.
Sd/ Rabindranath Tagore

পরিশিষ্ট - ১১

সংস্কার সমিতি

অস্পৃশ্যতা বর্জনে বিশ্বভারতীর উদ্যম : রবীন্দ্রনাথের বিবৃতি

বহুকাল ধরিয়া আমাদের দেশ পরাভবের পথে চলিয়াছে। আমাদের সমাজে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর ব্যবহারে উপেক্ষা ও অসম্মান এই সাংঘাতিক দুর্গতির কারণ। এইজন্যই মহাত্মা গান্ধী মৃত্যুপণ করিয়া তপস্যায় বসিয়াছেন। সমস্ত দেশবাসীরও প্রাণপণ করিয়া এই অপরাধ দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত। এখন অবিলম্বে আমাদের এই কয়টি ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে—

১। কাহাকেও আমরা সামাজিকভাবে হীন মনে করিব না, বা অস্পৃশ্য করিয়া রাখিব না। সকল জাতিকেই আমাদের জল-চল করিয়া লইতে হইবে।

২। সাধারণের মন্দির, পূজার স্থান ও জলাশয় সকলের জন্যই সমানভাবে উন্মুক্ত হইবে।

৩। বিদ্যালয়, তীর্থক্ষেত্র, সভা-সমিতি প্রভৃতিতে কোথাও কাহারও আসিবার কোনো বাধা থাকিবে না।

৪। কাহারও জাতি লক্ষ্য করিয়া আত্মসম্মানে আঘাত দিবার অন্যায় ব্যবস্থা সমাজে থাকিতে দিব না।

হিন্দুসমাজ হইতে অস্পৃশ্যতা দূর করা, দুর্গতদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, পরস্পর শ্রদ্ধা দ্বারা সর্বশ্রেণীর মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধকে সত্য করা, জনসাধারণের মধ্যে আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মশক্তি উদ্বোধন করার উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতন পল্লীসেবা-বিভাগের ভিতর দিয়া বহুদিন যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছে। এখন হইতে ঐ কাজকে আরও ব্যাপক এবং শক্তিশালী করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের দ্বারা গঠিত একটি কেন্দ্রীয় সভার পরিচালনায় বিশ্বভারতীতে **সংস্কার সমিতি** স্থাপিত হইল :

বিশ্বভারতী কর্মসচিব, শ্রীনিকেতন সচিব, শ্রীনেপালচন্দ্র রায়, শ্রীজগদানন্দ রায়, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীধীরানন্দ রায়,

শ্রীকালীমোহন ঘোষ—সম্পাদক, শ্রীসুধীরচন্দ্র কর—সহ-সম্পাদক।

এতদুদ্দেশ্যে অর্থ ইত্যাদি যাবতীয় সাহায্য বিশ্বভারতী কর্মসচিবের নিকট সংগৃহীত থাকিবে। সংস্কার সমিতির কেন্দ্রীয় সভার ব্যবস্থামত তিনি তাহা ব্যবহার করিবেন। সংস্কার সমিতির কার্যধারা মোটামুটি এইরূপ :—(ক) কেন্দ্রীয়

সভার অধীনে সুবিধামত অন্যান্য স্থানেও কয়েকটি গ্রাম লইয়া এক-একটি শাখা-কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। (খ) ঐ শাখা-কেন্দ্র হইতে পারিপার্শ্বিক গ্রামসমূহে সংস্কার সমিতি গড়া এবং তাহার অধীনে হরিসভা স্থাপন করিয়া তাহাতে সপ্তাহের নির্ধারিত দিনে কীর্তন, পাঠ, কথকতা, এবং সংবাদপত্র হইতে দেশের ও তৎপ্রসঙ্গে নিজ গ্রামের অবস্থা পর্যালোচনা। মাঝে-মাঝে উৎসব উপলক্ষ্যে সর্বজনীন ভোজের আয়োজন। ঐ-সঙ্গে দুর্গতদের ঘনিষ্ঠ সহযোগ, তাহাদেরই সেবার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, গ্রামে দিবা ও নৈশবিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, স্বাস্থ্য ও সেবা-সমিতি, ব্রতীদল, সালিশী-পঞ্চায়েৎ, সমবায় সমিতি পরিচালনা, মুষ্টি-ভিক্ষাসংগ্রহ, আবাস পরিষ্করণ এবং রাস্তাঘাট সংস্কার।

বিনা দক্ষিণায় শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন দুর্গতদের ছেলে রাখিয়া অন্যান্য ছাত্রদের সহিত সমভাবে শিক্ষা দিয়া তাহাদের মধ্য হইতেই সমিতির ভাবী কর্মী ও কেন্দ্রপরিচালক তৈরী করা। এই আবাসিক শিক্ষাশ্রমের ছাত্রগণ প্রথম হইতেই যাহাতে আয়করী বৃত্তি শিখিয়া কাজ করিয়া নিজেদের ব্যয় নিজেরা বহন করে এবং ভবিষ্যতেও উপার্জনক্ষম হয়, সেই ব্যবস্থায় তাহাদিগকে আশ্রমে গ্রহণ করা হইবে।

হিন্দুসমাজের বিভিন্ন কেন্দ্রে এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সভা সম্মেলনের অনুষ্ঠান। ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ সাহায্যে জনসভায় বক্তৃতা। পাঁতি, বিজ্ঞাপন, পুস্তক-পুস্তিকা এবং সম্ভবমত পত্রিকাদি প্রকাশ ও প্রচার। প্রচারকার্যে পরিভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে নানাস্থানে সংস্কার সমিতির শাখা স্থাপন। তদ্বারা স্থায়ীভাবে অস্পৃশ্যতা পরিহার ও শিক্ষার প্রসারে দুর্গতদের সামাজিক অধিকার বৃদ্ধির প্রচেষ্টা। দুর্গতদের সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় উন্নতির পথে যে সকল অন্তরায় আছে তাহার প্রতিকার।

আমরা দেশবাসীদিগকে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য দেশের সর্বত্র এইরূপ স্থায়ী কাজের অনুষ্ঠান গড়িতে আহ্বান করিতেছি। দেশহিতৈষী কর্মীমাত্রেই এই উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হইয়া অবিলম্বে কাজে অগ্রসর হইবেন, ইহাই আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ। কে কীভাবে কোথায় কাজ করিতেছেন, ইহা জানিতে পারিলে আমরা বিশেষ উপকৃত ও আনন্দিত হইব। আশাকার প্রয়োজন মতো,—সম্পাদক, সংস্কার সমিতি, শ্রীনিকেতন, পোঃ সুরুল, জেঃ বীরভূম এই ঠিকানায় সকল পত্রাদি ব্যবহার করিবেন এবং এই কাজে কেহ কিছু অর্থ সাহায্য করিতে চাহিলে, কর্মসচিব, বিশ্বভারতী, পোঃ শান্তিনিকেতন, জিঃ বীরভূম—এই ঠিকানায় তাহা পাঠাইয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন]

ইতি-১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ সাল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (আচার্য বিশ্বভারতী)

[আনন্দবাজার পত্রিকা : বুধবার ২০শে পৌষ, ১৩৩৯ ; ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৩৩]

পরিশিষ্ট - ১২

ভিয়েনা থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা (৩রা আগষ্ট, ১৯৩৪)

সুভাষচন্দ্রের পত্র

C/o American Express Company
Vienna
৩রা আগষ্ট, ১৯৩৪

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

একটা বিশেষ কারণে আপনাকে বিরক্ত করিতেছি, আশা করি তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন।

লণ্ডনের জনৈক প্রকাশকের অনুরোধে আমি এখন একটি পুস্তক লিখিতেছি। পুস্তকের বিষয়—'The Indian Struggle, 1920-34'। প্রকাশকের নাম—Wishart and Company, John Street adelphi, London, W. C. 2। আগস্ট মাসের মধ্যেই আমার লেখা শেষ হইবে এবং অক্টোবরের মধ্যে বই প্রকাশিত হইবে। যে সময়ে Joint Select Committee-র রিপোর্ট সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হইবে, ঠিক সময়ে আমার বইটিও প্রকাশিত হইবে। পুস্তকের গোড়ায় 'Historical Background' শীর্ষক এক অধ্যায় থাকিবে এবং একেবারে শেষে 'Coming Events' শীর্ষক এক অধ্যায় থাকিবে। প্রকাশকদের আশা যে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় খুব বেশী বিক্রী হইবে এবং তাঁহারা জার্মান ও ফরাসী অনুবাদেরও চেষ্টা করিতেছেন। আমি এখন চাই কোনও বিশিষ্ট ইংরাজী লেখকের কাছ থেকে আমার পুস্তকের জন্য সূচনা বা Foreword।

আমি নিজে খুব সুখী ও সন্তুষ্ট হইব যদি Bernard Shaw-র লেখনী হইতে কয়েকটী ছত্র পাই। এ বিষয়ে হয় তো আপনি সাহায্য করিতে পারিবেন। আপনি যদি Bernard Shaw মহাশয়কে এ বিষয়ে লিখিতে পারেন তাহা হইলে বড় উপকৃত হইব। তবে আপনি যদি কোনও প্রকার সঙ্কোচ বা অনিচ্ছা বোধ করেন তাহা হইলে আমি আপনাকে অনুরোধ করিতে চাই না। এবং আপনি যদি লেখা স্থির করেন, তাহা হইলে এমনভাবে অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন যাহাতে প্রকৃতপক্ষে কিছু কাজ হয়। কেবল আমার অনুরোধ রক্ষার জন্য লিখিয়া কোনও লাভ নাই। আমি যখন ইয়ুরোপে আসি, আপনি তখন অনুগ্রহ করিয়া Romain Rolland মহাশয়কে আমার সম্বন্ধে পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন কিন্তু সে পরিচয়পত্র যেন অনুরোধ রক্ষার জন্য লেখা।* সুতরাং সে পত্রের আমি সদ্ব্যবহার করিতে পারি নাই এবং নিজেই

---

* এই সময় কবি সুভাষচন্দ্রকে যে পরিচয় পত্রটি লিখিয়া পাঠান সেটি ছিল এই :

৬, Dwarakanath Tagore Lane,
Calcutta
Feb. 18, 1933.

My friend Subhas Chandra Bose is going for his treatment. I earnestly hope my friends will be kind to him and help him. Rabindranath Tagore

পত্রের অনুলিপি শান্তিনিকেতনে 'রবীন্দ্রসদন'-এ রক্ষিত আছে। এই সম্পর্কে লেখকের "রবীন্দ্রনাথ-সুভাষচন্দ্র পত্র বিনিময়ে সূচনা" প্রবন্ধ (দেশ : ২২শে জানুয়ারী, ১৯৬৬ ; পৃঃ. ১২১৩-২১৮) দ্রষ্টব্য।

Rolland মহাশয়ের সহিত পত্র ব্যবহার আরম্ভ করি। Bernard Shaw মহাশয় বোধ হয় আমার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না সুতরাং তাঁহাকে ভাল করিয়া লেখা দরকার হইবে।

আমি ভরসা করি যে আমার পুস্তকের আদর হইবে। কারণ প্রকাশক মহাশয় আমার সহিত advance contract করিয়াছেন এবং royalty-র টাকা লইয়া আমি লেখা আরম্ভ করিয়াছি।

Bernard Shaw ব্যতীত আর একজনের কাছ থেকে Foreword পাইলেও কাজ হইতে পারে—H. G. Wells। Rolland মহাশয়ের কথাও আমার মনে হইয়াছিল কিন্তু তিনি প্রচণ্ড রকমের 'গান্ধীভক্ত' অথচ আমি তাহা নহি এবং তাঁহাকে সেকথা আমি জানাইয়াছি। সুতরাং Rolland মহাশয় যে আমার পুস্তকের সূচনা লিখিতে রাজি হইবেন সে আশা আমি করিতে পারি না। Bernard Shaw বা Wells মহাশয় মহাত্মাজী সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন কিন্তু তাঁহারা অন্ধ ভক্ত ন'ন—সুতরাং তাঁহারা হয় তো রাজি হইতে পারেন। আপনার কথাও আমার মনে হইয়াছিল কিন্তু আমি জানি না আপনি রাজনীতি বিষয়ক পুস্তকের জন্য কিছু লিখিতে ইচ্ছুক হইবেন কিনা। তদ্ব্যতীত, আপনি নিজে সম্প্রতি মহাত্মাজীর অন্ধভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন—অন্ততপক্ষে আপনার লেখা পাঠ করিলে সেইরূপ ধারণা মানুষ স্বভাবতঃ পোষণ করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় মহাত্মাজীর সমালোচনা আপনি বরদাস্ত করিতে পারিবেন কিনা আমি জানি না। আমার পুস্তকটা হইবে—'an objective study of the Indian movement from the standpoint of an Indian rationalist.'

Bernard Shaw মহাশয়ের ঠিকানা—4 White hall Court, London, S. W.। আপনি ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে লিখিতে পারেন অথবা চিঠিটা আমার নিকট পাঠাইতে পারেন। আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি

আপনার অনুগত

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

পুঃ আমার ব্যক্তিগত মতামত আমি শেষ অধ্যায়ে লিখিব। ঐ অধ্যায়ে ভবিষ্যত ভারতের আন্দোলন কি আকার ও রূপ ধারণ করিবে সে বিষয়ে আমার মত ও ধারণা প্রকাশ করিব।

সুভাষ

পরিশিষ্ট - ১৩

ইতালি-আবিসিনিয়া যুদ্ধে 'ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েসনে'র আবেদন : আবিসিনিয়ায় 'মেডিক্যাল মিশন' পাঠাইবার সিদ্ধান্ত :

"ইতালি-আবিসিনিয়া যুদ্ধ দুর্বলের বিরুদ্ধে প্রবলের অভিযান। ইতালির প্রচুর রণসম্ভার ও অর্থ আছে—আবিসিনিয়ার তাহা সে তুলনায় কিছু নাই। এই অবস্থায় ভারতের সহানুভূতি নিঃস্ব স্বাধীনতাপ্রিয় আবিসিনিয়ার পক্ষে যাওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই গত অক্টোবর মাসে দিল্লীতে 'ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েসনের কেন্দ্রীয় পরিষদের এক সভায় স্থির হয় যে, আবিসিনিয়ায় আহত বিশেষ করিয়া হাবসীদিগকে শুশ্রূষা করিবার জন্য এ্যাসোসিয়েসেন যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। এই উদ্দেশ্যে এ্যাসোসিয়েসেন আবিসিনিয়ায় যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যদিগকে শুশ্রূষা করিবার জন্য একদল স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণের সংকল্প করিয়াছেন। ইহাতে প্রায় ২৷৷০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে। আশা করি জনসাধারণ ঔষধপত্রাদি দিয়া সর্বতোভাবে এ্যাসোসিয়েসেনকে সাহায্য করিবেন। সকলপ্রকার দান এ্যাসোসিয়েসেনের অনারারী সেক্রেটারী কর্তৃক ৬৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—এই ঠিকানায় গৃহীত হইবে। যাঁহারা স্বেচ্ছাসেবক হইতে চাহেন—তাঁহারা উপরের ঠিকানায় সম্পাদকের নিকট আবেদন করিবেন।

ইতি—স্বাঃ নীলরতন সরকার (কলিকাতা), ভোলানাথ (লাহোর), এম. এ. আন্সারী (দিল্লী), এম. জি. নাইডু (হায়দারাবাদ), বি. সি. রায় (কলিকাতা), জীবরাজ মেটা (বোম্বাই), ভূপাল সিং (মীরাট), আর. এন. বসু (মীরাট), জে. পি. মোদী (আমেদাবাদ), এম. আর. সাথে (বাঙ্গালোর), কে. কে. চাটুজ্যে (পুণা), এন. বি. দীক্ষিত (মোরাদাবাদ), এইচ. এন. শিবপুরী (ঝাঁসী), আর. এ. আমেসুর (করাচী), জে. এন. রোহৎজী (কানপুর), এস. এন. মিশ্র (কানপুর), ডি. এল. পুলকার (জলগাঁও), এ. সি. সেন (দিল্লী), লতিফ সৈয়দ (হায়দারাবাদ), বি. টঙ্গম (বারাণসী), পি. বি. মুখার্জী (পাটনা), টি. এন. বাড়ুজ্যে (পাটনা), এস. হালদার (মজঃফরনগর), কে. এস. রায় (কলিকাতা), এ. ডি. মুখার্জী, জে. এন. বসু, ডি. পি. ঘোষ, আর. সি. সেন, এ. কে. চক্রবর্তী, এস. সি. সেনগুপ্ত, এন. এন. বসু, এস. পি. সেনগুপ্ত, ডি. এন. ব্যানার্জী, সি. সি. বসু (কলিকাতা)।

[দ্র. আনন্দবাজার পত্রিকা : ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ ; ২৮শে নভেম্বর, ১৯৩৫]

পরিশিষ্ট - ১৪

The Rice We Eat

Rabindranath Tagore

When a people's diet takes a vicious path of its own impoverishment, it causes a graver mischief than any act of cruelty inflicted by an alien power. Such has unfortunately been the case in our province. Rice has been our staple food from which we have for generations received a great part of our health, strength, energy and intelligence. But curiously enough, especially among the upper class of our community, a fatal epidemic of foolishness has become prevalent which allows this principal foodstuff of ours to be depleted of its precious nourishing element. Rice mills are menacingly spreading fast extending throughout the province an unholy alliance with malaria and other flag-bearers of death robbing the whole people of its vitality through a constant weakening of its nourishment. We not only boil away an essential amount of nutrition from our daily ration of rice but also use elaborate machinery to polish off its skin which contains its most vital gift. This is a self-imposed form of famine deliberately welcomed by a people who had already been suffering from the scarcity of milk and that of ghee of a non-poisonous kind. One of the consequent diseases in the form of beri-beri has specially chosen its victims from the Bengalis, who still remain indifferent to its lesson. There had been, I am told, some proposal to check the progress of this fatal evil through the intervention of legislature. I am glad that it failed, for the people must not be treated like etarnal babies carefully protected by its appointed nurses from its own utter silliness. It is only for ourselves to exercise our intelligence for chosing our food which must be wholesome and sustaining. It is for the people themselves to realise that in the long run it is not cheaper to substitute the callous force of machinery for the indigenous rice-huller, oil-press and grind stone for crushing the wheat Physical vigour born of healthy meals is valuable, not only for itself but for its power of enhancing one's earning capacity. Then again, we have to take into account the immense importance of our rural economic life whose course has been cruelly obstructed by the iron monster robbing our village women of some of their natural

means of livelihood and the labouring class of its right to gather its simple living out of the gleanings from the people's own green field of life. It has gone on for long, this tampering with the time-honoured irrigation of living, in this country causing large desert tracks of privation in our villages. Would it be too much to expect a body of volunteers in Bengal to form a league whose members should take a solemn vow to use *dhenki-hulled* rice for their meals not allowing its nourishment to be stupidly thrown away by wasteful cooking ? Could they not realise that it is the perpetuation of a national calamity to which most of us is daily helping by instituting in our homes an insidious method of suicide ?"

Santiniketan
December 28, 1935,

[*Visva-Bharati News* : January, 1936 ; P. 51]

পরিশিষ্ট - ১৫

১৯৩২ সালে ৫ই জানুয়ারি রেবতী বর্মণ সিউড়ী জেল থেকে কয়েকটি রাজনীতিক ইংরেজী শব্দের বাংলা পারিভাষিক প্রতিশব্দ নির্ধারণ করিবার অনুরোধ জানাইয়া রবীন্দ্রনাথকে এক পত্র দেন। এইটি এবং জবাবে কবি রেবতীবাবুকে যে পত্র দেন (২২শে জানুয়ারি) সেটিও এখানে উদ্ধৃত করা হইল,

Passed by Superintendent, Suri Jail : সিউড়ী জেল
পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫/১/৩২

পরম পূজনীয়েষু,

রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে বাংলায় একখানা গ্রন্থ তৈয়ারি করিতে শুরু করিয়া পরিভাষায় খুবই অসুবিধা বোধ করিতেছি।· ·

. Nationalism-কে জাতীয়তা ও nation-কে জাতি বলিয়া চালানো কি উচিত ? শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেশ বিদ্যানিধি মহাশয় nationalist-কে রাষ্ট্রিক ও nation-কে 'রাষ্ট্র জন ও রাষ্ট্রজন' এই তিনটি প্রতিশব্দ দিয়া চালাইতে চাহিয়াছেন কিন্তু এ বিষয়ে আমার সংশয় রহিয়া গিয়াছে। আশা করি আপনার উপদেশ পাইয়া সংশয়মুক্ত হইব।

আমার অসংখ্য প্রণাম ও অশেষ শ্রদ্ধা আপনি জানিবেন।

একান্ত অনুগত
শ্রীরেবতী বর্মণ

কবির জবাব :

কল্যাণীয়েষু,

আমার মনে হয় নেশান্, ন্যাশনাল প্রভৃতি শব্দ ইংরেজীতেই রাখা ভালো। যেমন অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ! ওর প্রতিশব্দ বাংলায় নেই। রাষ্ট্রজন কথাটা চালানো যেতে পারে। রাষ্ট্রজনিক এবং রাষ্ট্রজনিকতা শুনতে খারাপ হয় না। আমার মনে হয় রাষ্ট্রজনের চেয়ে রাষ্ট্রজাতি সহজ হয়। কারণ নেশন্ অর্থে জাতি শব্দের ব্যবহার বহুল পরিমাণে চ'লে গেছে। সেই কারণেই রাষ্ট্রজাতি কথাটা কানে অত্যন্ত নতুন ঠেকবে না।

Caste—জাতি　　Nation—রাষ্ট্রজাতি

Race—জাতি　　People—জনসমূহ

Population—প্রজন

ইতি　২২শে জানুয়ারি, ১৯৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[দ্র. বিচিত্রা : ফাল্গুন, ১৩৩৮ ; পৃঃ. ১৪৭]

পরিশিষ্ট - ১৬

১৯৩৪ সালে বিলেতের প্রখ্যাত অধ্যাপক গিলবার্ট ম্যারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে দীর্ঘ পত্র বিনিময় হয়, পরে উহা *League of Nations* হতে প্রকাশিত 'An International Series of Open Letters' এর (No : 4) চার নং সংখ্যায় পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এখানে তাহার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল :

An International Series of
Open Letters
4
Gilbert Murray—Rabindranath Tagore

L		O
E	EAST	F
A	And	N
G	WEST	A
U		T
E		I
		O
		N
		S

International Institute of Intellectual Co-operation
2, Rue Montpensier
Palais Royal-Paris.

Gilbert Murray : to Tagore

Yatscombe, Boar's Hill, Oxford

August 17th, 1934

My dear Tagore,

I venture to trouble you with this letter for several reasons. First, you are a great poet, probably the most famous poet now living in the world, and poetry is to me almost the chief pleasure and interest in life. Your life and work are inspired by a spirit of harmony, and it is in the interest of harmony between man and man that I make my appeal. You are a Thinker, and in this distracted world, where nation stands armed against nation and the old liberal statesmanship of the nineteenth century seems to have given way to a blind temper of competition, I cannot but look to the Thinkers of the world to stand altogether, not in one nation but in all nations, reminding all who care to listen of the reality of human brotherhood and the impossibility of basing a durable civilized society on any foundation save peace and the will to act justly.

... ...

There are touchy and vain people in all parts of the world, just as there are criminals in all parts ; just as there are thinkers, artists, poets, men of learning ; just as there are saints and sages. And it is valuable to remember that, as Plato pointed out long ago, while criminals tend to cheat and fight one another, and stupid people to misunderstand one another, there is a certain germ of mutual sympathy between people of good will or good intelligence. An artist cannot help liking good art, a poet good poetry, a man of science good scientific work, from whatever country it may spring. And that common love of beauty or truth, a spirit indifferent to races and frontiers, ought, among all the political discords and antagonisms of the world, to be a steady well-spring of good understanding, a permanent agency of union, and brotherhood.

"...Men of imagination appreciate what is different from themselves : that is the great power which imagination gives. For example, I have just been reading your play called in French "La Machine", and see in it, if I am not mistaken, your hatred of

machines as such, and of all the mechanization of modern life. Now I happen to admire machines and the engineers who make them. I respect their educational influence. ···He has to think and work, to find out what is wrong and to put it right : which is a priceless lesson for any boy. Then the use of machinery teaches conscientiousness to the mechanic.

... ...

···"It is the Age of Machines that, for the first time in history, has made them so.···

... ...

"I even believe in the healthiness and high moral quality of our poor distressed civilization. It made the most ghastly war in history, but it hated itself for doing so. As a result of the war it is now full of oppressions, cruelties, stupidities and public delusions of a kind which were thought to be obsolete and for ever discarded a century ago. But I doubt if ever before there was what theologians would call such a general sense of sin, such widespread conciousness of the folly and wickedness in which most nations and governments are involved or such a determined effort, in spite of failure after failure, to get rid at last of war and the fear of war and all the baseness and savagery which that fear engenders. I still have hope for the future of this tortured and criminal generation : perhaps you have lost hope and perhaps you will prove right···

"My beloved and admired colleague, Mme Curie, when she threw herself into the work of Intellectual Co-operation, gave one special reason for doing so. She had seen during the World War, how often the intellectual leaders in the verious nations had been not better but, if any thing, worse than the common people in the bitterness and injustice of their feelings. She had seen that this was a great evil and one that would be remedied, The artists and thinkers, the people whose work or whose words move multitudes, ought to know one another, to understand one another, to work together at the formation of some great League of Mind or Thought independent of miserable frontiers and tariffs and governmental follies, a League or Society of those who live the life of the intellect and through the diverse channels of art

or science aim at the attainment of beauty, truth and humar brotherhood.

"I need not appeal to you, Tagore, to join in this quest ; yo already belong to it ; you are inevitably one of its great leaders. only ask you to recognize the greatness of your own work for the intellectual union of East and West, of thinker with thinker and poet with poet, and to appreciate the work that may be done by the intellectuals of India not merely for their own national aims, however just and reasonable they may be ; there is a higher task to be attempted in healing the discords of the political and material world by the magic of that inward community of spiritual life which even amid our worst failures reveals to us Children of Men our brotherhood and our high destiny."

Believe me, with deep respect,

Yours sincerely

Gilbert Murray.

Tagore's Letter :

"Uttarayan" Santiniketan, Bengal.

September 16th, 1934

My dear Professor Murray,

In the midst of my busy seclusion in a corner of this Educational Colony in India comes your letter bearing its call for close understanding of the problems that face our commor humanity. I have no difficulty in responding to your friendly voice, for it is not only the voice of a friend whom I have the privilege to know and love ; *but it also carries the highest authority of European culture and scholarship, and is therefore eminently fitted to represent the great humanity of Europe.*

"I must confess at once that I do not see any solution of the intricate evils of disharmonious relationship between nations, nor can I point out any path which may lead us immediately to the levels of sanity. Like yourself, I find much that is deeply distressing in modern conditions, and I am in complete agreement with you again in believing that at no other period of history ha mankind as a whole been more alive to the need of human co operation, more conscious of the inevitable and inescapable mora links which hold together the fabric of human civilization. I

cannot afford to lose my faith in this inner spirit of Man, nor in the sureness of human progress which following the upward path of struggle and travail is constantly achieving, through cyclic darkness and doubt, its ever-widening ranges of fulfilment. Willingly therefore I harness myself, in my advanced age, to the arduous responsibility of creating in our Educational Colony in Santiniketan a spirit of genuine international collaboration based on a definite pursuit of knowledge, a pursuit carried on in an atmosphere of friendly community life, harmonized with Nature, and offering freedom of individual self-expression,"

[P. 31-33]

"*My occasional misgivings about the modern pursuit of Science in directed not against Science, for Science itself can be neither good or evil, but its wrong use.* If I may just touch here on your reference to machines, I would say that machines should not be allowed to mechanize human life but contribute to its wellbeing, which as you rightly point out, it is constantly doing when it is man's sanity which controls the use of machinery.

"I would like here to quote a passage from one of my writings published in April, 1929 which I think may interest you,"···* [P. 34]

... ...

II

"Now that mutual intercourse has become easy, and the different peoples and nations of the world to have come to know one another in various relations, one might have thought that the time had arrived to merge their differences in a common unity. But the significant thing is, that the more the doors are opening and the walls breaking down outwardly, the greater is the force which the consciousness of individual distinction is gaining within.··· [P. 38]

... ...

"We have seen Europe cruelly unscrupulous in its politics and commerce, widely spreading slavery over the face of the earth

* See "Asia And Europe" article.

in various names and forms. And yet, in this very same Europe, protest is always alive against its own iniquities, Martyrs are never absent whose lives of sacrifice are the penance for the wrongs done by their own kindered. The individuality which is western is not to be designated by any sect-name of a particular religion, but is distinguished by its eager attitude towards truth, in two of its aspects, scientific and humanistic. This openness of mind to truth has also its moral value and so in the West it has often been noticed that, while those who are professedly pious have sided with tyrannical power, encouraging repression of freedom, the men of intellect, the sceptics, have bravely stood for justice and the rights of man. [P. 40-41]

"To many thinkers there has appeared a clear connection between Darwin's theories and the "imperialism", Teutonic and other, which was so marked a feature during the sixties···

... ...

"Unfortunately for us, however, the one outstanding visible relationship of Europe with Asia today is that of exploitation ; in other words, its origins are commercial and material. It is physical strength that is most apparent to us in Europe's enormous dominion and commerce, illimitable in its extent and immeasurable in its appetite. Our spirit sickens at it. Everywhere we come against barriers in the way of direct human kinship. The harshness of these external contacts is galling, and therefore the feeling of unrest ever grows more oppressive. There is no people in the whole of Asia today which does not look upon Europe with fear and suspicion. [42-44]

"Thus modern Europe, scientific and puissant, has portioned out this wide earth into two divisions. Through her filter, whatever is finest in Europe cannot pass through to reach us in the East. In our traffic with her, we have learnt, as the biggest fact of all, that she is efficient, terribly efficient.···

"The bigger thing to remember is, that in Europe these evils are not stagnant. There the spiritual force in man is ever trying to come to grips. *While, for instance, we find in Europe the evil Giant's fortress of Nationalism, we also find Jack the Giant-killer. For, there is growing up the international mind. This Giant-killer,*

the international mind—though small in size—is real.

[P. 45-48]

"*To me the mere political necessity is unimportant ; it is for the sake of our humanity, for the full growth of our soul, that we must turn our mind towards the ideal of the spiritual unity of man.* We must use our social strength, not to guard ourselves against the touch of others, considering it as contamination ; but generously to extend hospitality to the world, taking all its risks however numerous and grave. We must manfully accept the responsibility of moral freedom, which disdains to barricade itself within dead formulae of external regulation, timidly seeking its security in utter stagnation. Men who live in dread of the spirit of enquiry and lack courage to launch out in the adventure of truth, can never achieve freedom in any department of life. Freedom is not for those who are not lovers of freedom and who only allow it standing space in the porters's vestibule for the sake of some temporary purpose, while worshipping, in the inner shrine of their life, the spirit of blind obedience.

"In India what is needed more than anything else, is the broad mind which, only because it is concious of its own vigorous individuality, is not afraid of accepting truth from all sources."... [P. 51-52]

III

"Your letter has been a confirmation to me of the deep faith in the ultimate truths of humanity which we both try to serve and which sustains our being. I have tried to express how religion today as it exists in its prevalent institutionalised forms both in the West and the East has failed in its function to control and guide the forces of humanity ; how the growth of nationalism and wide commerce of ideas through speeded-up communication have often augmented external differences instead of bringing humanity together. Development of organizing power, mastery over Nature's resources have subserved secret passions or the openly flaunted greed of unashamed national glorification. *And yet I do not feel despondent about the future, For the great fact remains that man has never stopped in his urge for self-expression,*

in his brave quest of knowledge ; not only so, there is today all over the world inspite of selfishness and unreason a greater awareness of truth. The fury of despotic tyranny, the denial of civic sanity and the violence with which the citadels of international federation are constantly assaulted, combine to betray an uncomfortable and increased consciousness in the mind of man of the inescapable responsibilities of humanity. It is this stirring of the human conscience to which we must look for a reassertion of man in religion, in political and economic affairs, in the spheres of education and social intercourse. It is apparent that innumerable individuals in every land are rising up vitalized by this faith, men and women who have suffered and sought the meaning of life and who are ready to stake their all for raising a new structure of human civilization on the foundation of international understanding and fellowship. *In this fact lies the great hope of humanity this emergence in every nation, in spite of repression and the suicidal fever of national war-mindedness, of the clean radiant fires of individual consciousness.* When I read some of the outstanding modern books published after the War I realize how the brighter spirits of young Europe are now alive to the challenge of our times. Nothing can be of greater joy to us in India than to find how unimpeachably great some of your scholars, historians, artists and literary men are in their fearless advocacy of truth, their passion for righteousness. *In India, too, there is a great awakening everywhere, mainly under the inspiration of Mahatma Gandhi's singular purity of will and conduct, which is creating a new generation of clear-minded servers of our peoples.* To these individuals of every land and race, these youthful spirits burning like clean flame on the alter of humanity, I offer my obeisance from the sunset-crested end of my end.

I feel proud that I have been born in this great age. I know that it must take time before we can adjust our minds to a condition which is not only new, but almost exactly the opposite of the old. Let us announce to the world that the light of the morning has come, not for entrenching ourselves behind barriers, but for meeting in mutual understanding and trust on the common field of co-operation ; never for nourishing a spirit of

rejection, but for that glad acceptance which constantly carries in itself the giving out of the best that we have.

Yours sincerely,
Rabindranath Tagore
[P. 63-67]

* *All Italics—mine*

পরিশিষ্ট - ১৭

বিশ্বভারতীতে 'চীন-ভারত সাংস্কৃতিক সমিতি' ও 'চীনা-ভবন' নির্মাণের সাহায্য দানের জন্য রবীন্দ্রনাথের আবেদন :

Santiniketan, Bengal
September 22, 1934

I gladly offer hospitality to the Sino-Indian Cultural Society to use my university at Santiniketan as the centre of its activity in India. It is my hope that my Chinese friends will heartily welcome the Society and give generous help to my friend Prof. Tan Yun-Shan to realise this scheme of making a permanent organisation for facilitating closer cultural contact between China and India."

Sd/ Rabindranath Tagore
[*Visva-Bharati News :* October, 1934 ; P. 28]

কিছুকাল পরে শান্তিনিকেতনে 'চীন-ভারত সাংস্কৃতিক সমিতি' (*Sino-Indian Cultural Society*) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উহার প্রচার-পুস্তিকায় সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য-সম্পর্কে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় :

THE SINO-INDIAN CULTURAL SOCIETY

OBJECT

'To investigate the learning of India and China, to help in the interchange of their cultures, to cultivate friendship between their peoples, and lastly to work for universal peace and human fraternity."

PROGRAMME

"To organise an Indian cultural delegation to go to China and a Chinese cultural delegation to come to India for research work.

"To organise lecturing delegations to deliver lectures on Indian and Chinese Cultures in both countries.

"To introduce and recommend Indian students to study in China and Chinese students to study in India.

"To establish Chinese institutions in India and Indian institutions in China for students and scholars.

"To publish books and magazines embodying the results of such investigations and researches into Indian and Chinese learnings and to propogate the spirit and merit of their cultures."

OBSERVANCE

"The activities of the Society shall be kept strictly non-political."

নির্দেশিকা

ক

ফ

'কমলা বক্তৃতা', 'মানুষের ধর্ম' আলোচনা ২৭০-৭৮, শ্রীনিকেতন উৎসবে কবির ভাষণ ২৭৯-৮২, 'হরিজন'-এ 'মেথর' কবিতার ইংরাজী তর্জমা ২৮২, অধ্যাপক টাকার কর্তৃক 'মন্দির প্রবেশ' আন্দোলনের সমালোচনা : ঐ সম্পর্কে গান্ধীকে কবির পত্র ২৮৩-৮৪, 'মুক্তি' 'প্রেমের সোনা' 'শুচি' 'স্নান সমাপণ' কবিতা রচনার পটভূমি ২৮৫, কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ : 'শিক্ষার বিকিরণ' ২৮৬-৮৮, রামমোহন মৃত্যুশতবার্ষিকী উদ্বোধন সভায় ভাষণ ২৮৮, পঃ মালব্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ২৮৯, বিদেশে ভারত-বিরোধী প্রচারের বিরুদ্ধে কবির বিবৃতি ২৯০-৯১, বাংলা পরিভাষা সংকলনে কবির উদ্যোগ গ্রহণ ২৯১, ইউরোপে নারী প্রগতি আন্দোলন সম্পর্কে রামানন্দকে পত্র ২৯২, গান্ধীর পুনর্বার অনশন সংকল্প সম্পর্কে বিবৃতি ২৯২, ঐ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া গান্ধীকে দুটি পত্র ও তার ২৯৩-৯৫, ২৯৬-৯৭, অমিয় চক্রবর্তীকে পত্রসহ গান্ধীর নিকট প্রেরণ ২৯৭, কবিকে গান্ধীর তার ২৯৭, অনশন ভঙ্গের পর গান্ধীকে তার ২৯৭, আপস-মীমাংসা ও বন্দী মুক্তির দাবীতে রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখের বিলাতে তার ২৯৮-৯৯, অনশনভঙ্গের অনুরোধ জানাইয়া আন্দামান বন্দীদের তার ২৯৯, 'পুণা-চুক্তি'র বিরুদ্ধে বিবৃতি ও বিলাতে স্যর নৃপেনকে তার ৩০১-০২, ঐ সম্পর্কে গান্ধীর পত্র কবিকে ৩০৪-০৫, প্রত্যুত্তরে গান্ধীকে কবির পত্র ৩০৫-০৭, দাসত্ব অবলোপ ও উইলবারফোর্সের মৃত্যুশতবার্ষিকীতে বাণী প্রেরণ ৩০৬, 'কালান্তর' প্রবন্ধ রাজনীতিক পটভূমি ৩০৯-১১, রোলাঁ বারবুস-জওহরলাল রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা ৩১২-১৫, 'প্রার্থনা' কবির রচনা ৩১৭-১৮, 'তাসের দেশ' ও 'চণ্ডালিকা' ৩২২-২৪, 'তাসের দেশ' সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ ৩২৪, আন্দামান বন্দীদের দাবীর সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ আচার্য রায় প্রমুখের বিবৃতি ৩২৪-২৬, বিঠলভাই প্যাটেলের মৃত্যুতে শ্রদ্ধাঞ্জলি ৩২৬, বোম্বাইয়ে শেষবার ৩২৭, সাংবাদিকদের নিকট বিবৃতি ৩২৭-২৯, আইনস্টাইনের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ৩২৯, বোম্বাইয়ে পয়গম্বর দিবস উপলক্ষে বাণী ৩৩০, The Challenge of Judgement বক্তৃতা ৩৩০-৩২, টাকার বিনিময় হার সম্পর্কে নলিনীরঞ্জন ও আচার্য রায়কে তার ৩৩৪ ৩৩৭, বোম্বাইয়ে ছাত্রসভায় The Price of Freedom বক্তৃতা ৩৩৭-৩৮, বিশ্বভারতীর জন্য বণিক সভায় অর্থ-সাহায্যের আবেদন ৩৩৮-৩৯, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা ৩৩৯, রামমোহন মৃত্যুশতবার্ষিকী উপলক্ষে সেনেট হলে ভাষণ ৩৩৯, নিঃ ভাঃ মহিলা সম্মেলনে ভাষণ ৩৩৯-৪০, বিহার ভূমিকম্প : দুর্গতদের সাহায্যের জন্য আবেদন ৩৪১, ভূমিকম্প সম্পর্কে গান্ধীর বিবৃতির প্রতিবাদে গান্ধীকে পত্র ও বিবৃতির অনুলিপি প্রেরণ ৩৪৪-৪৫, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও নেপালের মহারাজকে সহানুভূতিসূচক তার ৩৪৫-৪৬, গান্ধীর জবাবী পত্র ও তার ৩৪৬-৪৭, গান্ধীবিরোধী অপপ্রচারের প্রতিবাদে বিবৃতি ৩৪৭-৪৮,

রবীন্দ্র রচনা ও দিনপঞ্জী

১৯৩০ থেকে ১৯৩৫—এই কালের মধ্যে কবির কয়েকটি মূল্যবান বক্তৃতা বিবৃতি চিঠিপত্র এবং রচনাসূত্র ও দিনপঞ্জী দেওয়া হইল।

১৯৩০

১০ই জানুয়ারি	বরোদার পথে লক্ষ্ণৌ ও কানপুর যাত্রা
১৮ই "	সবরমতীতে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও আলোচনা : ঐ বিবরণ (*Hindu*: 23rd January, 1930)
২৬শে "	বরোদায় পৌঁছান
২৭শে "	বরোদায় বক্তৃতা : Man the Artist ; বরোদা ভ্রমণকালে রাজনীতিক প্রবন্ধ 'Organizations', 'Wealth and Welfare' (*Modern Review* : Jan-Feb, 30) ; ভবানীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনে ভাষণ প্রেরণ : 'পঞ্চাশোর্ধ্বম' (রবীন্দ্ররচনাবলী : ২৩শ খণ্ড ; পৃঃ ৫১৫-২০) ; ঐ সম্পর্কে রামানন্দকে পত্র (প্রবাসী : আষাঢ় ১৩৪৮ ; পৃঃ ২৭৬)
৫ই ফেব্রুয়ারী	শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন
৬ই "	শ্রীনিকেতন উৎসবের উদ্বোধন ও ভাষণ (আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৯শে মাঘ, ১৩৩৬ ; ১২ই ফেব্রুয়ারী, '৩০)
২রা মার্চ	বিলাত যাত্রা
২৬শে "	মার্সেলস-এ পৌঁছান
২রা মে	প্যারিসে কবির চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন (ঐ বিবরণ *Manchester Guardian* : 3rd May, '30)
১১ই "	লণ্ডনে পৌঁছান
১৩ই "	বার্মিংহামে কোয়েকার কলোনীতে
১৫ই "	ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও বৃটিশ দমননীতি সম্পর্কে বিবৃতি (*Manchester Guardain* : 16th May, '30)
১৯শে "	মাঞ্চেস্টার কলেজে প্রথম 'হিবার্ট বক্তৃতা' এবং ২১শে ও ২৬শে মে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বক্তৃতা (দ্র. *The Religion of Man*)
২২শে "	বার্মিংহামে George Cadbury Hall-এ 'Civilisation and Progress' সম্পর্কে বক্তৃতা

২৪শে মে লন্ডনে Society of Friends-এর বাৎসরিক সম্মেলনে ভাষণ : পূর্ণাঙ্গ বয়ান (*Unity* : 18th August, '30)

২৫শে মে Chapel of Manchester College-এ ভাষণ : Night and Morning (দ্র *The Religion of Man*)

৫ই জুন Universal Relations Peace Conference-এ বাণী দান (*The Friend* : 13th June, '30)

৬ই জুন ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন দমনে ইংরেজের দমননীতির প্রতিবাদে বিবৃতি (*Spectator* : 7th June, '30)

১১ই জুলাই জার্মানী যাত্রা—বার্লিনে পৌঁছান

১২ই ,, রাইখস্টাগ সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

১৪ই ,, আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার (ঐ বিবরণ *New York Times Magazine* : 10th August, '30 এবং *The Religion of Man* গ্রন্থের পরিশিষ্টে)

১৬ই ,, বার্লিনে কবির চিত্রপ্রদর্শনী

১৯শে ,, মিউনিকে পৌঁছান ; অপরাহ্ণে Oberammergau-তে 'প্যাশন প্লে' দেখিতে যান। পরদিন সারাদিন অভিনয় দেখার পর সন্ধ্যায় মিউনিকে প্রত্যাবর্তন

২১শে ,, মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ কর্তৃক কবিকে সংবর্ধনা-জ্ঞাপন : মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন

২৩শে ,, Gallery Caspari-তে কবির চিত্রপ্রদর্শনী

২৪শে ,, ড্রেসডেন-এ, : মারবুর্গ থেকে কলিন্স ও বগদানফ সম্পর্কে বিধুশেখরকে পত্র (২৮শে জুলাই, '৩০)

১৩ই আগস্ট (?) *Daily Herald* (15th Aug. 1930)-এ বিবৃতি * * My Prayer for India (*Modern Review* : August, '30, p. 240)

১৯শে ,, জেনিভায় গমন : জেনিভায় আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কে বক্তৃতা (ঐ সারমর্ম *The Calcutta Review* : October, 1933)

২৯শে ,, অধ্যাপক জীমার্ন-এর সঙ্গে লীগ অব্ নেশনস্ সম্পর্কে আলোচনা (ঐ সারমর্ম-*Modern Review* : December, 1933 ; pp. 609-13) ; * * রোলার সঙ্গে আলোচনার বিবরণ (*Rolland and Tagore* : pp. 95-101) ; Women's International League for Peace-এর জন্য বাণী দান (*Modern Review* : November, 1930 ; p. 595) * * ঢাকার দাঙ্গা ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে বিবৃতি (*Spectator* : 30th August, '30)

১১ই সেপ্টেম্বর	সদলবলে মস্কোয় পৌঁছান
১২ই „	অধ্যাপক পেত্রভ ও সোভিয়েটের লেখক শিল্পীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়
১৩ই „	মস্কোর ছাত্র অধ্যাপকদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা—ত্রেতিয়াকভ গ্যালারী পরিদর্শন ও সোভিয়েটের শিল্প সমালোচকদের সঙ্গে আলোচনা। (কবির সোভিয়েট রাশিয়া সফরের কার্যসূচী। দ্র. "সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ" : পৃ. ১৭৯-৮১)
২৫শে „	মস্কো ত্যাগের প্রাক্কালে 'ইজভেস্তিয়া'র সংবাদদাতার নিকট বিবৃতি (*Visva Bharati Quarterly* : 1930-31 pp, 46-49)
৯ই অক্টোবর	আমেরিকায় পৌঁছান ; জাহাজের কেবিনে প্রেস-বিবৃতির মার্কিন পত্র-পত্রিকায় বিকৃত ব্যাখ্যা (*New York Herald Tribune* : 10th October, '30)
১০ই „	উহার প্রতিবাদে এবং দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে কবির খোলা চিঠি (*New York Times*: 13th October, '30)
১৩ই „	ঐ সম্পর্কে প্রেস প্রতিনিধিদের নিকট বিবৃতি (*The Boston Herald* : 14th October, '30) ; ঐদিনই বিধুশেখরকে পত্র বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহের ব্যাপারে (বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭২, পৃঃ ২৮৬)
১৪ই „	রাশিয়ার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথকে পত্র (চিঠিপত্র-২য় : পত্র ৩৮), পরদিন নিউ হ্যাভেন-এ যান
১৯শে „	নিউ হ্যাভেন-এ অসুস্থ
২৫শে „	অসুস্থতা সম্পর্কে ইন্দিরা দেবীকে পত্র (চিঠিপত্র-৫ম : পত্র ৩৪)
২৮শে „	সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পত্রের জবাব, দেশের আন্দোলন সম্পর্কে (রবীন্দ্ররচনাবলী-২০শ খণ্ড : পৃ. ৩২৯-৩০) ; ঐ সম্পর্কে হেমবালা সেনকেপত্র (প্রবাসী : কার্তিক, ১৩৪৮, পৃঃ ১১৫-১৬)
৩রা নভেম্বর	পুনরায় নিউইয়র্কে ; কয়েকদিন পরে 'প্রেস কনফারেন্সে' ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে বিবৃতি (*Modern Review* : January, 1931; p. 118-20) ; গোলটেবিল বৈঠক (প্রথম) সম্পর্কে খোলা চিঠি (*Spectatore* : 15th November, '30)
১০ই „	নিউইয়র্ক বেতার কেন্দ্র হইতে বিশ্বভারতী সম্পর্কে বেতার ভাষণ
২৫শে „	হোটেল বালটিমোর-এ রবীন্দ্র সংবর্ধনা-সভা

	(*New York Eve Post* এবং *New York American* : 26 Nov. '30) ঐ সম্পর্কে বিলেতের *Sunday Chronicle*-এর (28 Dec. '30) কুৎসা প্রচার
২৬শে	*New York Times* এর প্রতিনিধির নিকট বিবৃতি ; এই সময় প্যালেস্টাইন সমস্যা ও Zionism সম্পর্কে জনৈক সাংবাদিকের সঙ্গে আলোচনা (*The Jewish Standard* : 28 Nov. '30),
২৮শে ,, (?)	ওয়াশিংটনে প্রেসিডেণ্ট হুভারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, পরদিন নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্তন
৩০শে ,,	*NewYork Herald Tribune* (1st Dec. '30)-এর সাংবাদিকের সঙ্গে আলোচনা
১লা ডিসেম্বর	নিউইয়র্কে 'কার্নেগী হল'-এ বক্তৃতা (*Visva-Bharati Quarterly*-1930 : 31, pp. 236-40)
৭ই ,,	Ritz-Carlton Hotel-এ আব্দুল বাহা ও জরথুস্ত্র সম্পর্কে ভাষণ দান
১৪ই ,,	আইনস্টাইন-রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎকার
২২শে ,,	ইংলণ্ড পৌঁছান
	১৯৩১
৮ই জানুয়ারি	হাইড্ পার্ক হোটেলে সংবর্ধনা সভায় 'International Goodwill Relation' সম্পর্কে বক্তৃতা (*Visva Bharati Quarterly*-1930-31. pp. 200-01)
৯ই ,,	দেশের পথে যাত্রা
৩০শে ,,	বোম্বাইয়ে অবতরণ ও বিবৃতি (*Times of India* : 31st January '31), বোম্বাই থেকে শান্তিনিকেতন যাত্রা
৬ই ফেব্রুয়ারী	শ্রীনিকেতন উৎসবে যোগদান ও ভাষণ (দ্র. পল্লীপ্রকৃতি : ৫৮-৬৬)
১৭ই এপ্রিল	The Colour Bar : বর্ণসমস্যা সম্পর্কে বিলেতের *Spectator* (9th May, '31) পত্রিকায় খোলা চিঠি
১৭ই এপ্রিল (?)	সুভাষচন্দ্রকে পত্র, তাকাগাকিকে কলিঃ কর্পোরেশনে নিযুক্ত করার ব্যাপারে
২৫শে ,,	ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে পত্রে অনুরূপ মর্মে অনুরোধ (রবীন্দ্র-সদন) ; এই কালে : Will Durant-এর *The Case for India*-র সমালোচনা (*Modern Review* : March, '31) ; 'আমেরিকান ফ্রেণ্ডস্ সার্ভিস কমিটি'র নিকট বাণী (*Great Thoughts, London* : April, 1931 ; p. 3)
৮ই মে	সত্তর বৎসরপূর্তি উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশে বাণী ও প্রেস

প্রেস বিবৃতি (*Amrita Bazar Patrika*, 9 May, '31 ; আনন্দবাজার পত্রিকা: ২৬শে বৈশাখ, ১৩৩৮ ; *Visva Bharati Quarterly* · Vol. 8. Part III, 1930-31 ; pp-293) [বি.দ্র. প্রবাসী : ১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ ; বিশেষ ক্রোড়পত্র]

৯ই মে — ২৫শে বৈশাখ অনুষ্ঠানে শান্তিনিকেতনে কবির ভাষণ (আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৮ বৈশাখ, ১৩৩৮ ; ১১ই মে, '৩১)

২রা জুন — দার্জিলিং থেকে বক্সা বন্দীদের প্রত্যভিনন্দন জানাইয়া কবিতা "নিশীথেরে লজ্জা দিল……" (প্রবাসী : আষাঢ়, ১৩৩৮ ; পৃ. ৪২৪) ম্যাট্রিকুলেশন সিলেবাসে সংস্কৃতকে আবশ্যিক রাখার আবেদন (*The Hindu* : 3 June, '31) *** "হিন্দু মুসলমান" প্রবন্ধ (প্রবাসী : শ্রাবণ, ১৩৩৮ ; কালান্তর, পৃ. ৩২৩-৩৬)

২৯শে আগস্ট — বন্যাপীড়িতদের সাহায্য সংগ্রহের জন্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে পত্র, ১২ই ভাদ্র (দ্র. আনন্দবাজার প. : ২২শে ভাদ্র, ১৩৩৮ ; ৮ই সেপ্টেম্বর, '৩৭ এবং *Liberty* : 10 Sept., '31)

৪ঠা সেপ্টেম্বর — বি. পি. সি. সি ফ্লাড্ রিঃ কমিটির সভাপতিত্বে সম্মতি জানাইয়া সুভাষচন্দ্রকে পত্র ও কবিতা (*Liberty* : 6 Sept. '31)

৫ই সেপ্টেম্বর — ঐ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রকে অপর একখানি পত্র, তহবিল সংক্রান্ত দায়িত্ব লইতে অসম্মতি জানাইয়া (রবীন্দ্র সদন) ; ঐ সম্পর্কে প্রেস বিবৃতি (আনন্দবাজার প. : ২০শে ভাদ্র, ১৩৩৮ ; ৬ই সেপ্টেম্বর, '৩১) ; ঐ তারিখেই চট্টগ্রামের ও দেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রেস বিবৃতি ও আবেদন ; পরদিন ঐ সম্পর্কে জনৈকা মহিলাকে পত্র (প্রবাসী : আশ্বিন, ১৩৩৮ ; পৃ. ৮৫৫-৫৬) * * *

২০শে সেপ্টেম্বর — সংস্কৃত কলেজের পক্ষ হইতে 'কবি সার্বভৌম' উপাধি দান

২৬শে সেপ্টেম্বর — হিজলী ও চট্টগ্রামের অত্যাচারের প্রতিবাদে মনুমেন্টের নীচে বিক্ষোভসভায় ভাষণ (আনন্দবাজার প. : ১০ই আশ্বিন, ১৩৩৮ ; ২৭শে সেপ্টেম্বর। দ্র. কালান্তর, পৃ. ৩৮০-৮১ ; *Amrita Bazar Patrika* : p. 27 Sept. '31)

২রা অক্টোবর — বিলেতে গান্ধীজীকে জন্মদিবস উপলক্ষে তার ও প্রেসবিবৃতি (আনন্দবাজার প. : ১৬ই আশ্বিন, ১৩৩৮ ; ৩রা অক্টোবর, '৩১) ; ঐদিন শান্তিনিকেতনে ভাষণ (মহাত্মা গান্ধী : পৃ. ৩১-৩৪) * * এইকালে প্রবন্ধ "বাঙালির কাপড়ের কারখানা

	ও হাতের তাঁত" (প্রবাসী : কার্তিক, ১৩৩৮ ; দ্র. পল্লীপ্রকৃতি, পৃ. ১৪৮-৫৪)
৪ঠা „	নি. ব. মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে কবির বাণী পঠিত (প্রবাসী : কার্তিক, ১৩৩৮ ; (*Modern Review* : Nov. 1931 p. 536)
২৪শে „	'বুদ্ধদেবের প্রতি' কবিতা রচনা
২রা নভেম্বর	'হিজলী গুলিচালনা তদন্ত কমিটির রিপোর্ট' সম্পর্কে *Statesman*-এর মন্তব্যের প্রতিবাদে বিবৃতি (*Calcutta Municipal Gazette* : 13th Sept. 1941 ; দ্র. কালান্তর, পৃ. ৩৮২-৮৪ ; *Amrita Bazar Patrika* : 4th Nov. '31)
১১ই „	সারনাথে মূলগন্ধকুটী বিহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বাণী প্রেরণ (*Modern Review* : Dec. '31 pp. 720-21)
১লা ডিসেম্বর	হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি (আনন্দবাজার প. : ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ ; ৭ই ডিসেম্বর, '৩১)
২৫শে „	টাউন হলে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন * * * P.E.N. আবেদন বাণীতে কবির স্বাক্ষর (*Glassgow Herald* : 28 Dec. '31)
	১৯৩২
৪ঠা জানুয়ারি	গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বিবৃতি (আনন্দবাজার প. : ২০শে পৌষ, ১৩৩৮ ; ৫ই জানুয়ারি, ১৯৩২) ঐ সম্পর্কে বিলেতে প্রধানমন্ত্রীকে তার ও *Spectator*-এ খোলা চিঠি (*Modern Review* : Feb. '32, p. 226) * * *
২২শে জানুয়ারি	হিজলী বন্দীদের উদ্দেশে প্রত্যভিনন্দন পত্র (প্রবাসী : ফাল্গুন, ১৩৩৮, পৃ. ৬১৩)
২৫শে „	কলিকাতায় ছাত্রসমাজের উদ্দেশে বাণী (আনন্দবাজার প. : ১২ই মাঘ, ১৩৩৮ ; ২৬শে জানুয়ারী, '৩২) বি. দ্র. *Modern Review* : Feb. '32, p. 230)
৬ই ফেব্রুয়ারী	শ্রীনিকেতন উৎসবে 'দেশের কাজ' প্রবন্ধ পাঠ (প্রবাসী : চৈত্র, ১৩৩৮ : দ্র. পল্লীপ্রকৃতি, ৭৬-৭৮); এই সময় লীগ অব্ নেশনস্ জেনারেল সেক্রেটারীর নিকট বাণী (আনন্দধাজার প. : ৫ই ফাল্গুন, ১৩৩৮ ; ১৮ই ফেব্রুয়ারী, '৩২)
২২শে মার্চ	বিলাতের Friends Society'র পক্ষে সদিচ্ছা মিশনের উদ্দেশে : বিবৃতি-বাণী (*Modern Review* : June. '32 p. 720)
১১ই এপ্রিল	পারস্য যাত্রা (পারস্য ভ্রমণকালে বক্তৃতা বিবৃতি ও দিনপঞ্জী

৩১শে মে	দ্র. "পারস্যযাত্রী" গ্রন্থ)

২০শে জুলাই	ব্রিটিশ নির্যাতন নীতির প্রতিবাদে বিবৃতি (আনন্দবাজার প. : ৭ই শ্রাবণ, ১৩৩৯ ; ২৩শে জুলাই, '৩২ . *Liberty*-24 July, '32 * * * এই সময় The Save the Children International Union-এ বাণী প্রেরণ (*The World's Children* : Sept. 1932)

১৯শে আগস্ট	সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে চিন্তামণির তারের জবাব (আনন্দবাজার প. : ৬ই ভাদ্র, ১৩৩৯ ; ২২শে আগস্ট, '৩২)

২৫শে আগস্ট	ঐ সম্পর্কে প্রেস বিবৃতি (আনন্দবাজার প. : ১০ই ভাদ্র, ১৩৩৯ ; ২৬শে আগস্ট, '৩২ ; ঐ *Modern Review* : Sept. '32. pp. 353-54)

১৬ই সেপ্টেম্বর	শরৎচন্দ্রকে 'কালের যাত্রা' উৎসর্গ (৩১শে ভাদ্র, ১৩৩৯)

১৯-২০ সেপ্টেম্বর	গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ তার বিনিময় : অনশনের সূচনায় (রবীন্দ্র সদন)

২০শে ,,	শান্তিনিকেতনে কথিত ভাষণ : গান্ধীজীর অনশন সম্পর্কে (মহাত্মা গান্ধী : পৃ. ৩৬-৪২)

২১শে ,,	ঐ সম্পর্কে গ্রামবাসীদের উদ্দেশে ভাষণ (মহাত্মা গান্ধী : পৃঃ ৪৫-৫৩)

২২শে ,,	অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য আবেদন বাণী (*Liberty* : 24 Sept, '32)

২৪শে ,,	পুণা যাত্রা—২৬শে সেপ্টেঃ যারবেদা কারাগারে গান্ধীজীর সকাশে (পুণা ভ্রমণ, বিচিত্রা : ১৩৩৯ ; ঐ 'মহাত্মা গান্ধী' : পৃ. ৫৫-৬২) শিবাজী ময়দানে ভাষণ (*Daily News* : 28 Sept, '32)

১৫ অক্টোবর	বিলেতের India Conciliation Group-এর পক্ষে Carl Heath-এর পত্রের জবাবে কবির দীর্ঘ খোলাচিঠি (*Modern Review* : Nov. '32 pp. 605-06 ; ঐ 'বঙ্গবাসী' ও আনন্দবাজার প. : ৩০শে আশ্বিন ১৩৩৯ : ১৬ই অক্টোবর '৩২)

২রা নভেম্বর	জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নীলিমা দাসকে পত্র (বিচিত্রা : পৌষ, ১৩৩৯)

১৬ই নভেম্বর	গুরুভায়ুর মন্দিরদ্বার অনুন্নত হিন্দুদের জন্য উন্মুক্ত রাখার আবেদন জানাইয়া রাজা জামোরিনকে পত্র (*The Bombay Chronicle* : 9 Dec. '32

২রা ডিসেম্বর	শান্তিনিকেতনে 'সংস্কার সমিতি' গঠনে বিবৃতি (আনন্দবাজার প. : ২০শে পৌষ, ১৩৩৯ ; ৪ঠা জানুঃ, ১৯৩৩); পঃ

	মাল্যব্যের শান্তিনিকেতনে অভ্যর্থনা : এশিয়ার বিভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতির সংহতি ও ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে একটি সম্মেলন আহ্বানের আবেদন (*Modern Review* : Dec. '33, p. 661)
৮ই ডিসেম্বর	'প্রবর্তক সঙ্ঘে'র নেতা মতিলাল রায়কে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সম্পর্কে পত্র (প্রবর্তক : পৌষ, ১৩৩৯ ; ঐ *Amrita Bazar Patrika* : p. 11 Dec. '32)
১১ই ,,	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সত্তর বর্ষ পূর্তি উৎসব সভায় ভাষণ (প্রবাসী : পৌষ, ১৩৩৯ ; পৃ. ৫১-৫২)
২৩শে ,,	৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে 'পৌষ-উৎসবে' ভাষণ : 'নবযুগ' (প্রবাসী : মাঘ, ১৩৩৯ ; পৃ. ৫২৫-২৭ ; কালান্তর, পৃ. ৩৯২-৯৭)
২৯শে ,,	গোসাবা পরিদর্শন ; পরদিন বিদায়কালে ভাষণ (*Amrita Bazar Patrika* : 2nd January, 1933)
	১৯৩৩
৯ই জানুয়ারি	শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক পুর-এ-দাউদ্ এর সংবর্ধনা সভায় ভাষণ (আনন্দবাজার পঃ : ২৮শে পৌষ, ১৩৩৯ : ১২ই জানুয়ারি, ১৯৩৩)
১০ই ,,	বার্নার্ড 'শ-কে শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ জানাইয়া তার (*Madras Mail* : 19 January, '33)
১৬, ১৮, ২০ জানু	'কমলা বক্তৃতামালা' (দ্র. মানুষের ধর্ম)
৬ই ফেব্রুয়ারী	শ্রীনিকেতন উৎসবে ভাষণ (আনন্দবাজার প. : ২৬শে মাঘ, ১৩৩৯ ; ৮ই ফেব্রুঃ '৩৩) ঐ দিনই অপরাহ্ণে মেলাপ্রাঙ্গণে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের দাবীতে জনসভায় ভাষণ (আনন্দবাজার প. : ৩রা ফাল্গুন, ১৩৩৯, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, '৩৩) * * এই সময় অধ্যাপক বয়ড টাকারের পত্রপাঠের পর গান্ধীজীকে পত্র, মন্দির-মসজিদে উপাসনা সম্পর্কে (বাংলা 'হরিজন'-এ তর্জমা)
১৮ই ,,	সুভাষচন্দ্রকে বিদেশের জন্য পরিচয়পত্র দান (রবীন্দ্রসদন)
২৫শে ফেব্রুয়ারী	কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ—'শিক্ষার বিকিরণ' (দ্র. 'শিক্ষা')
১৩ই এপ্রিল	বিদেশে ভারত-বিরোধীদের অপপ্রচারের প্রতিরোধের আহ্বান জানাইয়া বিবৃতি (বঙ্গবাণী : ২রা বৈশাখ, ১৩৪০ ; ১৫ই এপ্রেল, ১৯৩৩, দ্র. Tagore Clippings : Vol. 63. pp. 205)
২১শে ,,	রামানন্দ চট্টোঃকে পত্র, ইউরোপের-নারী প্রগতি আন্দোলন সম্পর্কে (প্রবাসী : ফাল্গুন, ১৩৪১ ; পৃ. ৬২৩-২৪)
২রা মে	গান্ধীজীর পুনরায় অনশনের সংবাদে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া

	বিবৃতি (আনন্দবাজার প. : ২০শে বৈশাখ, ১৩৪০ ; ৩রা মে, ১৯৩৩)
৩রা মে	গান্ধীজীকে দার্জিলিঙ্ থেকে তার : অনশন সংকল্প সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানাইয়া (*The Hindu* : 4 May, '33)
৯ই ও ১১ই মে	পর পর গান্ধীজীকে দুইটি পত্র : অনশন সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার অনুরোধ (*Modern Review* : June, '33. pp. 704-05)
২৯শে ,,	অনশন ভঙ্গের পর গান্ধীজীকে তার (*Ceylon Observer* : 31 May '33)
৫ই জুন	রাজনীতিক বন্দী মুক্তি এবং কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা ও আপস মীমাংসার অনুরোধ জানাইয়া বিলেতের প্রধান মন্ত্রী, ভারতসচিব প্রভৃতিকে রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, রামানন্দ প্রমুখের তার (*Modern Review* : July, '33 p. 106, ঐ আনন্দবাজার প. : ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০ ; ৬ই জুন, '৩৩)
৯ই জুন	আন্দামান-বন্দীদের অনশন স্থগিত রাখার অনুরোধ জানাইয়া তার
২৪শে জুলাই	'পুণা-চুক্তি'র প্রতিবাদে বিবৃতি ও বিলেতে স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারকে তার *Statesman* : 26 July '33 ; ঐ *Modern Review :* August '33.-pp. 239-40 ; ঐ আনন্দবাজার প. : ১০ই শ্রাবণ, ১৩৪০ ; ২৬শে জুলাই, '৩৩) ; ঐ দিনই জে. এম. সেনগুপ্তের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি
২৮শে জুলাই	গান্ধীকে 'পুণা-চুক্তি'র প্রতিবাদ-বিবৃতির কপি পাঠাইয়া পত্র (রবীন্দ্রসদন) ; এই সময় উইলবার ফোর্সের মৃত্যু শতবার্ষিকী উপলক্ষে বাণী প্রেরণ (*Pioneer* : 30 July, '33 ; ঐ আনন্দবাজার প. : ১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪০ ; ২৯শে জুলাই, ১৯৩৩)
৮ই আগস্ট	গান্ধীজীকে পত্রের জবাব : 'পুণা-চুক্তি' সম্পর্কে (রবীন্দ্রসদন * * * 'কালান্তর' প্রবন্ধ (পরিচয় : শ্রাবণ, ১৩৪০)
৫ই সেপ্টেম্বর	আন্দামানবন্দীদের দাবীর সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, রামানন্দ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সম্মিলিত বিবৃতি (আনন্দবাজার প. : ২৯শে ভাদ্র, ১৩৪০ ; ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০ ; ঐ *Modern Review* : Oct. '33, pp. 469-70)
২৫শে অক্টোবর	বিঠলভাই প্যাটেলের মৃত্যু সংবাদে শ্রদ্ধাঞ্জলি (*The Pioneer* : 28 October '33)
২৩শে নভেম্বর	বোম্বাই পৌঁছাইয়া আন্তর্জাতিক সমস্যা ও স্থায়ী শান্তির

প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিবৃতি (*Free Press Journal* : 24 Nov. '33) আইনস্টাইনের প্রতি নাৎসীদের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে (আনন্দবাজার প. : ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ ; ২৪শে নভেঃ '৩৩)

২৬শে নভেম্বর — বোম্বাইয়ে রীগ্যাল থিয়েটারে ভাষণ : The Challenge of Judgment (*Amrita Bazar P.* : 29 Nov. '33 দ্র. দেশ : ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২রা ডিসেম্বর '৩৩ ; পৃ. ৭০-৭১) ; ঐদিন বোম্বাইয়ে 'পয়গম্বর দিবস' উপলক্ষে বাণী (*Forward* : 27 Nov. '33)

২৭শে " — টাকার বাট্টার হার সম্পর্কে বোম্বাইয়ের কারেন্সী লীগের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য আচার্য রায় ও নলিনীরঞ্জন সরকারকে তার (*Forward :* 30 Nov. '33)

১লা ডিসেম্বর — বোম্বাইয়ে কওসজী জাহাঙ্গীর হলে বক্তৃতা : The Price of Freedom (দেশ-১ম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা ; ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩, পৃ. ১৮-২১ ; ঐ আনন্দবাজার পঃ : ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ ; ২রা ডিসেম্বর, '৩৩)

২রা " — Indian Merchants' Chamber-এ বিশ্বভারতীর জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন (*Bombay Chronicle* : 5 Dec '33)

৮ ও ১০ই " — অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা (*Man* পুস্তিকা)

২৯শে " — রামমোহন রায় মৃত্যু-শতবার্ষিকী উপলক্ষে সেনেট হলে ভাষণ (দ্র. "ভারত পথিক রামমোহন")

৩০শে ডিসেম্বর — নিঃ ভাঃ নারী সম্মেলনের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনে ভাষণ (*Forward* : 1 January '34 ; ঐ আনন্দবাজার পঃ : ১৬ই পৌষ, ১৩৪০ ; ৩১শে ডিসেঃ '৩৩)

১৯৩৪

২৩শে জানুয়ারী — বিহার ভূমিকম্প দুর্গতদের সাহায্য প্রেরণের আবেদন (*Liberty* : 24 January '34 ; ঐ 'দেশ'-১ম বর্ষ : ১০ম সংখ্যা-২৭শে জানুয়ারি '৩৪ : পৃঃ ৭১)

২৮শে " — বিহার ভূমিকম্প সম্পর্কে গান্ধীজীর বিবৃতির প্রতিবাদ : ঐ কপি সহ গান্ধীজীকে কবির পত্র (রবীন্দ্রসদন)

২রা ফেব্রুয়ারী — উহার জবাবে গান্ধীজীর কবিকে তার ও পত্র (রবীন্দ্রসদন)

৫ই " — ঐ পত্র পাওয়ার পর কবি প্রতিবাদপত্রটি প্রেসে দেন

৬ই " — গান্ধী-বিরোধীদের কুৎসাপ্রচারের প্রতিবাদে বিবৃতি (আনন্দবাজার প. : ২৫শে মাঘ, ১৩৪০ ; ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪),

	শ্রীনিকেতন উৎসবে কবির ভাষণ-"উপক্ষিতা পল্লী" (দ্র. পল্লী-প্রকৃতি, পৃ. ৮২-৮৪)
৮ই ফেব্রুয়ারী	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা—"সাহিত্যতত্ত্ব" (দ্র. রবীন্দ্র রচনাবলী-২৩শ খণ্ড : পৃ. ৪৩৪-৫০)
১৩ই ,,	টাউন হলে 'হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স' এর 'রজত জয়ন্তী' উৎসবে ভাষণ (*Statesman*-14 Feb. '34 ; *Hindu* : 14 Feb., '34)
৭ই এপ্রিল	এণ্ড্রু কার্নেগীর অর্থসাহায্যে কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক ক্লাব-এর উদ্বোধন সভায় ভাষণ (আনন্দবাজার প. : ২৫শে চৈত্র, ১৩৪০ ; ৮ই এপ্রিল, ১৯৩৪)
৮ই এপ্রিল	গান্ধীজী কর্তৃক আইন অমান্য প্রত্যাহার সম্পর্কে কবির মন্তব্য (*Birmingham Post* : 9 April '34)
১৮ই এপ্রিল	বাংলার ডেটিনিউদের মুক্তির দাবীতে বিবৃতি (*Forward* : 20 April '34)
৫ই মে	যশিডিতে গান্ধীজীর প্রতি অপমানকর ব্যবহারের প্রতিবাদে কবির প্রেস বিবৃতি (*Pioneer* : 6 May '34) : সিংহল যাত্রা
১০ই মে	কলম্বোর Grand Oriental Hotel-এ বক্তৃতা : Ideals of an Indian University.
১১ই মে	Indian Mercantile Chamber of Commerce-এর সংবর্ধনাসভায় বিশ্বভারতীর অর্থসাহায্যের আবেদন (*Daily News* : 12 May '34) ; দার্জিলিঙে লাট এণ্ডারসনের প্রাণনাশের চেষ্টার নিন্দাবাদ : গভর্ণরকে তার (*Daily News* : 12 May '34)
১২ই জুন	সংবর্ধনাসভায় ভাষণ (*Ceylon Observer* : 13 June '34 ; ঐ *Modern Review* : June '34. pp. 121-22)
২৩শে জুন	শান্তিনিকেতন প্রত্যাবর্তন
২৭শে জুন (?)	জার্মানীতে ইহুদীনির্যাতন সম্পর্কে N.E.B. Ezraকে পত্র (*Israel's Messenger* : 3 August '34)
১৬ই জুলাই	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ : "সাহিত্যের তাৎপর্য"
১৯শে জুলাই	গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎকার
১০ই আগস্ট	গান্ধীজীকে তার, পুনরায় অনশনের সংকল্পে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া (রবীন্দ্রসদন)
১৩ই আগস্ট	পঃ মালব্যের পত্রের জবাব : কলিকাতায় ন্যাশনালিস্ট কনফারেন্সে উপস্থিতির অক্ষমতা জানাইয়া (রবীন্দ্রসদন)

১৭ই আগস্ট	ভিয়েনাতে সুভাষচন্দ্রকে পত্রের জবাব : তাঁহার পুস্তকের পূর্বভাষণের জন্য বার্নার্ড শ ও এইচ. জি. ওয়েলস্‌কে অনুরোধ করিতে অক্ষমতার কথা জানাইয়া (রবীন্দ্রসদন)
১৮ই আগস্ট	ঐ সম্পর্কে পঃ মালব্যকে দ্বিতীয় পত্র ও তার (*Modern Review* : Sept. '34. pp. 347-48)
২রা সেপ্টেম্বর	শান্তিনিকেতনে খান্‌ আব্দুল গফ্‌ফর খাঁর বিদায় সংবর্ধনায় কবির ভাষণ (*Advance* : 5 Sept '34)
১৬ই সেপ্টেম্বর	গিলবার্ট মারেকে-রবীন্দ্রনাথের জবাবীপত্র (International Institute of Intellectual Co-operation-এর উদ্যোগে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত : *An International Series of Letters*, No. 4)
২২শে সেপ্টেম্বর	'চীনাভবন' ও 'ভারত-চীন' সাংস্কৃতিক সমিতির জন্য অর্থ-সাহায্যের আবেদন (*Visva Bharati News* : October '34. P. 28 ; কবির অপর একটি আবেদন (*The Christian Science Monitor* : 28 Sept. '34)
২৩শে সেপ্টেম্বর	পাণিহাটিতে বাসন্তী কটনমিল-এর উদ্বোধন উৎসবে ভাষণ (আনন্দবাজার পত্রিকা : ৮ই আশ্বিন, ১৩৪১ ; ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪) ; এই সময় S. C. Mitra-এর *A Recovery Plan for Bengal* গ্রন্থের সমালোচনা (*Statesman* : 10th October, '34)
৭ই অক্টোবর	গান্ধীজীর কংগ্রেস ত্যাগের সংকল্প ও কংগ্রেস গঠনতন্ত্র সম্পর্কে তাঁহার প্রস্তাব সম্পর্কে কবির বিবৃতি (*Statesman* : 8 Oct. '34)
১৭ই অক্টোবর	মাদ্রাজ ভ্রমণ সম্পর্কে ইন্দিরা দেবীকে পত্র (চিঠিপত্র ৫ম : পত্র ৫৫)
১৯শে অক্টোবর	মাদ্রাজ যাত্রা
২১শে অক্টোবর	মাদ্রাজে কর্পোরেশনের উদ্যোগে সভায় বক্তৃতা (*Visva Bharati News* : Nov. '34 P. '35)
২৬শে অক্টোবর	কুইন মেরী কলেজের সংবর্ধনা সভায় কবির বক্তৃতা (আনন্দ বাজার পঃ : ১৫ কার্তিক, ১৩৪১ ; ১লা নভেঃ '৩৪)
৩০শে অক্টোবর	Y. M. C. A-র ছাত্র ও সভ্যদের আলোচনা সভায় কবির মন্তব্য (*Ceylon Observer* : 2 Nov. '34)
৩রা নভেম্বর	ওয়ালটেয়ার-এ পৌঁছান
৫ই নভেম্বর	অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির ভাষণ : The Rule of the Gaint (*Madras Mail* : 8 Nov, '34)

১৫ই নভেম্বর	হোয়াইট পেপার ও জে. পি. সি রিপোর্ট সম্পর্কে অমিয় চক্রবর্তীকে খোলাচিঠি (প্রবাসী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২ ; পৃ. ১৫৮-৫৯)
২২শে নভেম্বর	জে. পি. সি. রিপোর্ট সম্পর্কে কবির মন্তব্য (*Liverpool Echo* : 23 Nov. '34)
২৩শে ডিসেম্বর	৭ই পৌষ উৎসবে শান্তিনিকেতন মন্দিরে কবির ভাষণ (প্রবাসী মাঘ ১৩৪১ : পৃ. ৫৪৭-৪৮) ঃ এই সময় "চার অধ্যায়" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।
২৭শে ডিসেম্বর	প্রঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে কবির অভিভাষণ : "বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ" (বিচিত্রা : মাঘ, ১৩৪১ ; ঐ, রবীন্দ্ররচনাবলী ২৩ 'শ খণ্ড ; পৃ. ৫২০-২৮)

১৯৩৫

৬ই ফেব্রুয়ারী	শান্তিনিকেতনে লাট এণ্ডারসন : ঐদিনই কবির কাশীযাত্রা
৮ই ফেব্রুয়ারী	কাশী 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে' সমবর্তন উৎসবে ভাষণ (আনন্দ-বাজার পত্রিকা : ২৭শে মাঘ ১৩৪১ : ১০ই ফেব্রুয়ারী '৩৫)
৪ঠা মার্চ	এলাহাবাদ, লাহোর ও লক্ষ্ণৌ ভ্রমণান্তে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন।
২৭শে মার্চ (?)	হোয়াইট্ পেপার ও জে. পি. সি. রিপোর্ট সম্পর্কে অমিয় চক্রবর্তীকে খোলা-চিঠি (প্রবাসী : বৈশাখ, ১৩৪২, পৃ. ৭০-৭৩ ; ঐ (কবিতা : চৈত্র, ১৩৪১)
১৪ই এপ্রিল	'নববর্ষ উৎসবে' কবির ভাষণ (প্রবাসী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২, পৃ. ১৫৭)
১৬ই এপ্রিল	শান্তিনিকেতনে সাঁওতাল পল্লীতে 'কো-অপারেটিভ স্টোর্স' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কবির ভাষণ (*Visva Bharati Quarterly* : May, 1935. pp. 113-14)
১২ই মে (?)	শান্তিনিকেতনে কুমারাপ্পার মাধ্যমে গান্ধীজীকে কবির অনুরোধ, কুটির-শিল্পের শিল্পগত মানোন্নয়ন সম্পর্কে (*Visva Bharati Quarterly* : May-July, 1935. pp. 111-13)
১৮ই মে	৪ঠা জ্যৈষ্ঠ মহাবোধি সোসাইটি হলে বুদ্ধজন্মোৎসবে কবির ভাষণ (বুদ্ধদেব : পৃ. ৭-১২)
১৬ই জুন	কেওরাতলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিস্তম্ভ উপলক্ষে কবির বাণী (আনন্দবাজার পত্রিকা : ১লা আষাঢ়, ১৩৪২)
১৫ই জুলাই	ডঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেনকে পত্রপ্রবন্ধ "শিক্ষা ও সংস্কৃতি" (দ্র. শিক্ষা : পৃ. ৩৮৫-৮৮)
১২ই সেপ্টেম্বর	বিশ্বভারতীর আর্থিক সমস্যা সম্পর্কে গান্ধীজীকে কবির পত্র (রবীন্দ্রসদন)

১৮ই সেপ্টেম্বর	মন্দিরে জীববলি সম্পর্কে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে পত্র (প্রবাসী : কার্তিক, ১৩৪২ : পৃ. ১২০-২১)
২১শে সেপ্টেম্বর	গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষে A.I.V.I.A.-এর নিকট শুভেচ্ছা জ্ঞাপক তারবার্তা (*Advance :* 23 Sept. '35)
২৬শে সেপ্টেম্বর (?)	মাদ্রাজে Indian Colonial Conference-এর জন্য বাণী প্রেরণ (*Civil & Military Gazette* : 1st October '35)
	এই সময় ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণ সম্পর্কে এণ্ড্রুজকে পত্র (*Manchester Guardian* : 1 Nov. '35)
৯ই অক্টোবর	বিশ্বভারতীর আর্থিক সমস্যার কথা জানাইয়া জওহরলালকে পত্র (*A Bunch of Old Letters* : P. 109) * *
৩০শে নভেম্বর	শান্তিনিকেতনে জাপানী কবি নোগুচিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন (নবশক্তি : ১১ই পৌষ, ১৩৪২ : ঐ *Visva Bharati News* : Dec. '35. pp. 44-47)
	বিশ্বভারতীর ছাত্রসম্মিলনী সভায় ভাষণ (প্রবাসী : অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ : পৃ. ১৬৯-৭০)
২৭শে ডিসেম্বর	কংগ্রেসের 'সুবর্ণ জয়ন্তী, উপলক্ষে রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট বাণী প্রেরণ (*Forward* : 29th Dec. '35.)
২৮শে ডিসেম্বর	'হরিজন'-এর জন্য প্রবন্ধ রচনা : ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলের পক্ষে : The Rice We Eat (*Visva Bharati News* : January '36. P. 51 : ঐ আনন্দবাজার পঃ : ১লা মাঘ, ১৩৪২ ; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৩৬)
২৯শে ডিসেম্বর	অধ্যাপক লেসনীকে (Prof. Lesny) 'চেক-ভারত সমিতি'র কাজে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য কবির ধন্যবাদসূচক পত্র (*Visva Bharati Quarterly* : No. 4. Spring, 1956-57. pp. 279-83)

গ্রন্থপরিচিতি

মানুষের ধর্ম (পুনর্মুদ্রণ ১৯৪৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
চিঠিপত্র-৩য় (অগ্রহায়ণ ১৩৪৯) „ „
চিঠিপত্র-৫ম (পৌষ ১৩৫২) „ „
পথে ও পথের প্রান্তে
(প্রথম প্রকাশ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫) „ „
কালান্তর (সং ১৯৬২) „ „
পল্লীপ্রকৃতি (সং ১৯৬২) „ „
পারস্য-যাত্রী (সং ১৯৬৩) „ „
শিক্ষা (ভাদ্র ১৩৬৭) „ „
বুদ্ধদেব (সং ১৯৬০) „ „
মহাত্মা গান্ধী (সং ১৯৬৩) „ „
রবীন্দ্র রচনাবলী-১৩শ খণ্ড (প্রথম প্রকাশ-কার্তিক ১৩৪৯)
রবীন্দ্র রচনাবলী-১৫শ „ („ „ চৈত্র ১৩৪৯)
রবীন্দ্র রচনাবলী-১৬শ „ („ „ ২২ শ্রাবণ ১৩৫০)
রবীন্দ্র রচনাবলী-১৮শ „ („ „ „ ১৩৫১)
রবীন্দ্র রচনাবলী-২০শ „ („ „ ৭ই পৌষ ১৩৫১)
রবীন্দ্র রচনাবলী-২২শ „ („ „ আশ্বিন ১৩৫২)
রবীন্দ্র রচনাবলী-২৩শ „ („ „ বৈশাখ ১৩৫৪)
রবীন্দ্রজীবনী-তৃতীয় খণ্ড (সং ১৯৬১) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্রজীবনী-চতুর্থ „ (সং ১৯৬৪) „ „
আত্ম-চরিত (তৃতীয় সং ১৩৫৫) জওহরলাল নেহরু
বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ (ভাদ্র ১৩৫৮) „ „
খণ্ডিত ভারত (প্রথম সং ১৩৫৪) রাজেন্দ্রপ্রসাদ
শিল্পীর নবজন্ম-রোমাঁ রোলাঁ (সরোজ দত্ত অনূদিত)
সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ
—বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো
অনামী—দিলীপকুমার রায়
The History of the Indian National Congress-Vol I.
(Reprinted 1946)—Pattabhi Sitaramayya.

History of Freedom Movement in India-Vol III.
(First Editon) by Dr. R. C, Mazumder.

Mahatma-Vol, III. (New Edition-revised 1961)
—D. G. Tendulkar.

Mahatma-Vol, IV. (New Edition-revised 1961)
—D. G. Tendulkar,

The Indian Struggle (Ed. 1964) Subhas Chandra Bose.

Selected Speeches of Subhas Chandra Bose (Ed. 1962)
Publications Division. Government of India.

A Bunch of Old Letters—(First Ed. 1958)
Edited by J. Nehru.

History of the Communist Party of the Soviet Union
(Moscow. 1951)—J. Stalin.

Rolland and Tagore (September 1945) Visva Bharati.

From Yeravda Mandir (4th Impression)
—M. K. Gandhi.

Khadi—Why and How (Reprint, April 1950 „ „

Village Swaraj (Second Revised Ed. May 1963)
—M. K. Gandhi.

For Pacifists (Reprint, January, 1960) „ „